**K. V. SEYNE & BROS**

*COLOR ENGRAVERS & COLOR PRINTERS*

"SEYNE" ALWAYS THE BEST.

FACTORY & OFFICE: 60 Mirzapur street, *Calcutta*.

THE LEADING HOUSE FOR THREE COLOR Blocks & Printings.

Telegraphic Address. "SEYNE, *Calcutta*"

VOL. 5. No. 1.

APRIL, 1915.

# THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,

AND

SATYENDRANATH BHADRA, M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . Rs. 5-6-0

Single Copy . . . 0-8-0

**EVERYBODY PRAISES WHAT IS HIS OWN**

But impartial verdict comes from the public and the Press

USE

# ORIENTAL SOAPS.

FOR

**They are the best for economy and complexion**

## THE ORIANTAL SOAP FACTORY,

*GOABAGAN, CALCUTTA.*

*Tel: "Kowstove," Calcutta.*

---

**By Special Appointment**

## To H. E. Lord Carmichael of Skirling Governor Of Bengal.

# S. A. MAJID & Co.

## Certificated Opticians

*12 Patuatuli, Dacca.*

**OPTO—Eye. METRY—to Measure.**

## A Peculiar Nationalist and Practical Unionist.

**Prescriber of needful Tonics for the chronical Idleness of India**

**Specialist in attractive Designs, as to touch Human Feelings, to raise any National Subscription successfully.**

**Professor for 10 years. in Eye-sight Testing and Spectacles Art.**

Our methods of examination and tests of the EYES for the adaptation of lenses for the correction of defects of vision and relief of eyestrain and its accompanying symptoms, are based upon accurate measurements of the refraction and the associated functions of the eyes. Glasses fitted under this system are invariably found satisfactory and curative. The latest and most approved apparatus for accurate sight testing are used in our dark room. Examination by appointment preferred.

Printed by A. C. BHADRA. at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca

and

Published by HARI RAM DHAR, B.A., Patuatoli, Dacca

**COMPOUND ELIXIR OF ASWAGANDHA WITH SODIUM GLYCEROPHOSPHATE & FORMATE.**

Now being prescribed by the leading physicians of Calcutta.

This preparation is similar in composition to the celebrated Aswagandha Rasayana of the ... in addition some of the most powerful tonic of modern pharmacopeia. A powerful tonic and sustainment for mental, nervous ... debility and a valuable sustainant during prolonged mental and physical exertion.

CURES MENTAL AND PHYSICAL WEARINESS.

Rs. 1-8 a BOTTLE.

**Bengal Chemical & Pharmaceutical Works, Ld.**

***9/1 Upper Circular Road, CALCUTTA.***

ট্রেড **“নির্ব্বেদিন”** মার্ক

**যাবতীয় বেদনা নিবারণে অমোঘ**

মাথাধরা, মাথার কট্‌কটানি ও আধ কপালে প্রভৃতি যাবতীয় শিরঃপীড়া, দন্তশূল, স্নায়ুশূল, কর্ণশূল প্রভৃতি সকল প্রকার শূল ব্যথা আমাদের “নির্ব্বেদিন” ট্যাবলেটে তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়।

ছাত্র, শিক্ষক, উকিল প্রভৃতি যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জন্য শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকেন তাঁহারা এই ঔষধ সেবনে উপকার পাইবেন।

মূল্য ১৬ ট্যাবলেট ।৵০ আনা।

**বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড**

**কলিকাতা**

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য কৃত

# টক কথা সংগ্রহ গ্রন্থাবলী

...রি অতুলনীয় সম্পদ লেখ যেমন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অধিগম্য করিয়া তুলিয়াছেন ... উদ্যমে সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্যের রুদ্ধ দ্বার আজ তেমনি করিয়া খুলিয়া গেল। সুবিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী ছবি ও ছাপার চরমোৎকর্ষে ভূষিত হইয়া খণ্ডে খণ্ডে গল্পাকারে বাহির হইতেছে। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী, এম-এ, বিদ্যাম্বুধি মহাশয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। প্রতিখণ্ডের মূল্য ৷৷৹ আনা। অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহক হইলে ( ১১ খণ্ডের জন্য ) সহ ডাকমাশুল ৪৷৷৹ টাকা।

বালক, যুবক, বালিকা ও যুবতীগণ অসঙ্কোচে পাঠ করিয়া ভারতীয় কবিগণের অলৌকিক কবিত্বের স্বাদগ্রহণ করিতে পারিবে।

**এণ্টিক কাগজ, চমৎকার ছবি ও চমৎকার প্রচ্ছদপট—উপদেশ ও উপহার গ্রন্থ একাধারে এরূপ আর নাই।**

২। লুপ্ত রত্নের উদ্ধার। মহাকবি ভাসের ( খৃঃ পূঃ ১৫০ ) সমগ্র সংস্কৃত নাট্য-গ্রন্থাবলীর অনুবাদ। দশ খণ্ড— প্রতিখণ্ডের মূল্য ।৹ আনা। এণ্টিক কাগজ, চমৎকার ছাপা। শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়,

সিটি লাইব্রেরী, পাটুয়াটুলী, ঢাকা। গুরুবন্ধু গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ও একমাত্র এজেন্ট।

---

## NOTICE.

1. Matriculation Pass guaranteed tutor. Apply for particulars with half-anna postage stamp to A. T. Mukherjee B. A. Kundala, Birbhum District.

2. Five silver medals to be awarded to students wo will write satisfactory Essays in English on "Victoria the Good"—an English poetical Reader price 4 ans. For particulars apply with half-anna postage stamp to A. T. Mukherjee B. A. Kundala (District Birbhum).

### "Victoria the Good"

A poetical Reader in English contains poetical pieces full of loyalty and deep devotion to Her late Gracious Majesty Victoria Empress of India. In these days we should like to see our young boys cherish such respect for and devotion to their benign sovereign. The book should be given as a prize book to our juvenile readers :—

# Edwards Tonic

**The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.**

*Sole Agents* :—**B. K. PAUL & CO.,** *7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.*

**Cytogen** AN IDEAL DIGESTIVE TONIC WINE

*Invaluable in* CONVALESCENCE *from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c., Extremely Useful in Anaemia, Nervous Debility, Loss of Appetite, Indigestion, Acidity &c.,*

**INDISPENSABLE AFTER PARTURITION**

Price Rs. 1-8-0 Per Bottle.

**B. K. Paul & Co.,**
CALCUTTA.

Branch Sovabazar Street.

Head office :—7 & 12 Bonfield's Lane Calcutta The Research Laboratory :—18, Sashi Bhusan Sarker's Lane

// ASHUTOSH LIBRARY.

**Proprietors: BRINDABAN DHAR & SONS,**

*PRINTERS, PUBLISHERS & BOOK-SELLERS.*

| 50/1, College Street, | Patuatooly, | Andarkilla, |
|---|---|---|
| CALCUTTA. | DACCA. | CHITTAGONG |

**LORD CARMICHAEL AT THE ASUTOSH LIBRARY.**

"Lord Carmichael one day last week at Chittagong when driving by the side of 'Asutosh Library' whose advertisement appears in the Herald, got down from his car and went into the Library and looked into the book-shelves leaving an order for a copy of Elphinstone's "History of India." His Excellency also enquired of the man there as to who the Proprietors were and His Excellency was told that it belonged to Asutosh Dhar Bros. of Dacca."—*The Herald*,

**Private Secretary to the Governor, Bengal.**

*Government House, Calcutta.*

5/5.

DEAR SIR,

Please send V. P. P. the copy of Elphinstone's History ordered from your Library.

*Yours faithfully*

(Sd.) W. R. GOURLAY.

*To The Manager*

ASUTOSH LIBRARY.

**When His Excellency the Governor of Bengal can favour us with his esteemed order, why don't you?**

*A TRIAL IS ALL WE ASK.*

When ordering please mention the Dacca Review

# আর্য্যাবর্ত্ত।

## প্রথম শ্রেণীর সচিত্র মাসিক পত্র।

সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

১৩১৯ সনের বৈশাখ হইতে ৩য় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ কৃতবিদ্য সুলেখকগণ আর্য্যাবর্ত্তের লেখক, এমন উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র বাঙ্গালায় আর নাই ছাপা, ছবি, লেখা ও কাগজের তুলনা হয় না।

প্রবন্ধ গৌরবে, গল্পমাধুর্য্যে, রচনা বৈচিত্র্যে, ধারাহিক উপন্যাসে আর্য্যাবর্ত্ত অতুলনীয়

আর্য্যাবর্ত্তে কখন অসার ও অপাঠ্য প্রবন্ধ ছাপা হয় না। যাহা সুখ-পাঠ্য, মনোরম অথচ শিক্ষাপ্রদ-তাহাই ছাপা হয়। এই জন্য আর্য্যাবর্ত্ত-বাঙ্গালা মাসিকের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের "স্মৃতিকথা", অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিপিনবিহারী গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার, ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রাণ গুপ্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, সখারামগণেশ দেওস্কর, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, রমণীমোহন ঘোষ, সুলেখক শশিভূষণ মুখোপাধ্যা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কেদারনাথ মজুমদার, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতির বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ, গল্প, কবিতা, প্রত্নতত্ত্ব, সমালোচনা ও সংগ্রহে আর্য্যাবর্ত্তের কলেবর মাসে২ সুশোভিত হয়। ইহা ভিন্ন সম্পাদকের একখানা উপন্যাস চলিতেছে।

আর্য্যাবর্ত্তের—প্রত্যেক চিত্র সযত্নে সংরক্ষার সামগ্রী!

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৷৷৹ আনা।

শ্রীদুর্গানাথ বসু—কার্য্যাধ্যক্ষ।

আর্য্যাবর্ত্ত কার্য্যালয়, ১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



বাঙ্গালার প্রিয় কবি

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত

সর্ব্বজনপরিচিত ও সুধীজন প্রশংসিত নব প্রকাশিত

## কাব্যগ্রন্থাবলী।

১। ধ্যানলোক। (স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, লিখিত ভূমিকা এবং কবির চিত্র পরিশোভিত।) মূল্য বার আনা; বাঁধাই এক টাকা।

২। তপোবন। (মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের অমর স্মৃতিতে উৎসর্গিত।) মূল্য বার আনা ও এক টাকা।

৩। অঞ্জলি। (কবিগুণাকর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস, বিদ্যাপতি, এম-এ, বি-এল, লিখিত ভূমিকা।) মূল্য আট আনা।

৪। শিশির। (মহিলা-কবি শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত এবং সুকবি জীবেন্দ্র বাবুর "আশীর্ব্বাদ" ভূমিকা।) মূল্য চারি আনা।

কলিকাতার সকল প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে এবং "ঘাট ফরাদ বেগ; চট্টগ্রাম।" ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম হইতে সকল পুস্তক একত্রে লইলে এক মাশুলে পাইবেন।

# তোষিণী।

## ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র।

ঘরে ঘরে আনন্দ ও হাসি।

যেমন ছবি, যেমন লেখা, তেমন ছাপা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী।

আগামী বৈশাখ মাস হইতে তোষিণী চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিবে বাংলা জননীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জন করিতে তোষিণী গত তিন বৎসরে কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। চতুর্থ বৎসরেও তোষিণীর পূর্ব্ব গৌরব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, আমরা সেই জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না। প্রতি সংখ্যা তোষিণীতে কৌতুক ছড়ান থাকে। শিশুদের আর কোনও কাগজেই এত বেশী ছবি থাকে না তোষিণী প্রকৃতই মনোমুগ্ধকর, হাস্যোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তোষিণী পাইলে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়। তোষিণীতে ছেলেখেলার হাসি, মধুর কবিতায় নীতি উপদেশ আছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা মাত্র। বিনা মূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না, প্রতি সংখ্যা নমুনার মূল্য তিন আনা মাত্র।

## বাঁধাই তোষিণী।

পুরু কাগজের মলাটে একত্র বাঁধাই গত ১৩১৮ সনের সমুদয় সংখ্যা তোষিণী দেড় টাকা স্থলে মায় ডাকমাশুল ভিঃ পিতে আঠারো আনায় দেওয়া হইতেছে। পারিতোষিক দেওয়ার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা জানিবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন, ৩নং অশোক লেন, ঢাকা।

বহুচিত্র, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতার একাধারে অপূর্ব্ব সমাবেশ।

# সৌরভ।

## সচিত্র মাসিক পত্র।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত।

প্রতি সংখ্যায় ৭। ৮ খানা করিয়া সুন্দর সুন্দর চিত্র থাকবে।

আর থাকিবে—

বাঙ্গলা ভাষায় অভিনব কাহিনী লর্ড কার্জ্জনের—সেই বিখ্যাত তিব্বত অভিযানের বিবরণ প্রথম সংখ্যা হইতে বহু চিত্র সহ প্রকাশিত হইতেছে।

আর বাহির হইতেছে—"সাহিত্য সেবক"।

বসুমতী বলিয়াছেন—"সৌরভের নূতনত্ব সেই জীবিত সাহিত্য সেবকগণের পরিচয় প্রবন্ধে।"

সৌরভ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইতেছে। চিঠি লিখিয়া গ্রাহক হউন। নতুবা পরে আর দিতে পারিবনা।

মূল্য দুই টাকা। আকার ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৪। ৫ ফর্ম্মা। ঠিক সম্মিলনের মত।

সৌরভ কার্য্যালয়, ময়মনসিংহ।

---

# রামেশ্বর দুর্গ।

( ঐতিহসাকি উপন্যাস )

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি, এ, প্রণীত

মূল্য ।৹ আনা ও ডাঃ মাঃ পৃথক।

এই উপন্যাসখানি "উপাসনার" সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। "উদ্ভ্রান্ত প্রেম" প্রণেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও "রাজস্থান" লেখক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে সযত্নে দেখিয়া দিয়াছেন। যমুনার ভক্তি ও ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত, চপলার আত্মোৎসর্গ, নির্ম্মলকুমারী ও কমলকুমারীর ভালবাসা সবই যেন পাঠককে পড়িতে পড়িতে বিহ্বল করে। স্ত্রীলোকদের পাঠের সম্পূর্ণ যোগ্য।

স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন—"ইহাতে বর্ণনায় ভাষার পারিপাট্য, এবং গল্পে রচনানৈপুণ্য যথেষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্রিত চরিত্রগুলি স্পষ্ট প্রস্ফুটিত হইয়াছে।"

কলিকাতা—শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ১৫।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ও ঢাকা—অতুললাইব্রেরী এবং খাগড়া—গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

## অধ্যাপক শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ এম, এ প্রণীত।

১। ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা ... ... ... ... ॥০

(2) Sanskrit learning in Bengal ... ... ... ॥০

(3) Pramâns of Hindu Logic ... ... ... ।০

আসাম, গৌহাটী গ্রন্থকারের বাসায় প্রাপ্তব্য।

---

### বহুচিত্রে শোভিত।

### প্রাইজ দেওয়ার নূতন পুস্তক।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

### ১। মহরম।

সকলজাতির নিকট সমান আদরের সেই মহরমের কাহিনী সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।
মূল্য ।৵০ আনা। ৪ খানা ছবি।

### ২। প্রহ্লাদ।

হরিভক্ত প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত সরল ভাষায় লিখিত। মূল্য ।৵০ আনা।

পপুলার লাইব্রেরী—ঢাকা।

---

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

# শক্তি ঔষধালয়

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড্। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট, ঢাকা।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন্ রোড্ (হাওরা পুলের নিকট)।
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১নং আপার সার্কুলার রোড্ (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—৭১।১ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—৭২ দশাশ্বমেধ ঘাট।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত—১০৲ সের।

ছাগলাদ্য ঘৃত—১০৲ সের।

মেধাস্মৃতি বর্দ্ধক ও ছাত্রগণের সহায়।
ব্রাহ্মীঘৃত—৮৲ সের)

দাদ্‌মার—৵০ কৌটা।
(এক দিনে দদ্রু নিশ্চয় আরোগ্য)।

দশন সংস্কারচূর্ণ—৵০ কৌটা।
(সর্ব্ববিধ দন্তরোগের মহৌষধ)।

মরিচাদি মলম—৶০ কৌটা।
(খুজলী পাঁচড়ার মহৌষধ)।

বহুরের ননী—॥০ শিশি।
(নালীঘা, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মহৌষধ)।

অমৃতারিষ্ট—॥০ আনা শিশি।
(ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত ও সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ)

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শক্তি বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ,
হিন্দুকেমিষ্ট এবং রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্‌মাষ্টার

সমাজ-চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক গ্রন্থকার

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর কবীন্দ্র-বিদ্যাবিনোদ বি, এ, প্রণীত

# পুস্তকাবলী।

## অনাথবালক

( সর্ব্বজন-পরিচিত গার্হস্থ্য উপন্যাস ) ৩য় সংস্করণ

## সুরবালা ১।০

আদর্শ হিন্দু পরিবারের এবং আদর্শ বঙ্গ-ললনার অতি মনোহর চিত্র। কিরূপে সাধ্বী, পতিব্রতা রমণী চরিত্রহীন স্বামীকে নরক হইতে উত্তোলিত করিয়া স্বর্গীয় সুখভোগের অধিকারী করিতে পারেন—মর্ত্ত্যে স্বর্গের সমাবেশ করিতে পারেন,—তাহা অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত আছে।

## ছ'আনাজ ৷৷০

ইহাতে এমন ছয়টি সুন্দর নীতিপূর্ণ গল্প সন্নিবেশিত আছে যে, উহার প্রত্যেকটি এক এক খানি সুবৃহৎ পুস্তকের সমান।

## পাপের পরিণাম ৷৷০

পল্লীবাসী পাপীর চিত্র, স্বর্গ ও নরকের অত্যুজ্জ্বল ছবি।

## সৎকথা ( গল্পের আকারে নীতিশিক্ষা ) ৷৷০

এই সকল পুস্তকের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। সমাজের এমন নিখুঁত ছবি, সুরুচি এবং সদ্ভাবের এমন একত্র সমাবেশ, বঙ্গ-সাহিত্যে দুর্লভ। অনাথবালক সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অমূল্য রত্ন। উপন্যাস-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র অনাথবালকের যে সুখ্যাতি করিয়াছেন, বাঙ্গালার অন্য কোন উপন্যাসের তেমন সুখ্যাতি করেন নাই। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, সুলেখক ও সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু, স্যার শ্রীগুরুদাস, পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ, রাজা শ্রীপ্যারিমোহন প্রভৃতি মনস্বিগণ মুক্তকণ্ঠে অনাথবালকের প্রশংসা করিয়াছেন। বঙ্গবাসী, হিতকরী, প্রকৃতি, সহচর, ইণ্ডিয়ান্ নেশন, ইণ্ডিয়ান্ মিরর্ প্রভৃতি সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের মতে অনাথবালকের ন্যায় সদ্‌গ্রন্থ ভাষায় অতি অল্পই আছে।

সমালোচক-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন,—"চন্দ্রশেখর বাবুর বহিগুলি এক এক খানি হীরার টুক্‌রা। তাঁহার গল্পগুলি দেশের "ঔপন্যাসিক ইতিহাস"। সরকার মহাশয় আরও বলেন,—আমরা আধুনিক বঙ্গবাসী—সম্প্রতি শিক্ষাবিড়ম্বনায় ঘোরতর বিড়ম্বিত। শিক্ষার নামে, শিক্ষার বেশে, কুশিক্ষা আমাদিগকে পূতনার মত পীযূষ-স্তন্যধারা প্রদানচ্ছলে বিষম বিষ প্রদান করিতেছে। আমরা সেই বিষপানে জর্জ্জরিত, মোহগ্রস্ত। ভালমন্দ বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। সেই পূতনানিধনকারী ভগবানের কৃপা ব্যতীত এই মোহ কাটাইবার শক্তি আমাদের নাই। তাঁহারই কৃপাবলে আজ চন্দ্রশেখর বাবু বঙ্গসমাজের ভাল দিক্‌টা দেখিতে পাইয়াছেন এবং সোজা কথায়, সহজ ভাষায়, সাদাসিদে গল্পে সেইটি আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। *** একই শিক্ষা নানাভাবে দিয়াছেন। এই শিক্ষা এক্ষণকার দিনে বড় সময়োপযোগিনী। বাঙ্গালার বালক বালিকা, বধূ প্রৌঢ়া, যুবক স্থবির সকলেরই চন্দ্রশেখর বাবুর গ্রন্থগুলি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকান, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরী এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

দি নিউ ফরমুলা কোম্পানী কোন প্রশংসা পত্র না ছাপাইয়া মফস্বল হইতে এত দম্ভ করিয়া পেটেন্ট ঔষধে অবিশ্বাসী রোগীকে আহ্বান করিতেছে কেন, একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশ্বাস করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন ?

**আমাদের আলছারিণে** পারদাদি দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে আদালতে দণ্ডনীয় হইব। ইহা শিশু ও বৃদ্ধের পক্ষে ঈশ্বর-প্রেরিত। **আলছারিণ** নালী ঘা, ভগন্দর, ফোড়া, বাগী, কারবাঙ্কল ও উপদংশের ব্রহ্মাস্ত্র। দূষিত, ক্ষত ও বিস্ফোটকের তীব্র জ্বালা সদ্যসদ্যই নিবারণ করিয়া থাকে—ইহা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নহে।

**আলছারিণে ক্ষত ধুইতে হয় না, ব্যাণ্ডেজ করিতে হয় না, অস্ত্র ও প্রুবের ছায়াও মাড়াইতে হয় না।**

এমন নির্দ্দোষ ও মূল্যবান ঔষধের মূল্যও এজেন্টগণের অনুরোধে গৃহস্থের সুবিধার জন্য পূর্ব্ব হইতে অনেক কম করা হইল। শিশি ৸৵০ ; ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। বিনামূল্যে আলছারিণের বিবরণ পত্র পাঠান হয়।

**আমাদের এণ্টাসিডি—সোডা ও এসিড বর্জ্জিত, সেবনে সুস্বাদু** যিনি ২।১ দিন অন্তর কাল কঠিন মলত্যাগ করেন, যাঁহার বাল্যকাল হইতে লিভারের দোষ আছে, আহারের পর পেটে বেদনা ধরে, যিনি দারুণ অম্লশূলে যন্ত্রণা পাইতেছেন, অম্লে যাহার বুক জ্বলিয়া খাক হইতেছে ; তিনি একবার কিছু দণ্ড দিলেন মনে করিয়াও আমাদের এণ্টাসিডি ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। মূল্য বড় শিশি ১।০, বিনামূল্যে বিবরণ পত্র পাঠাই।

**ভদ্রলোক ও স্কুলের** ছাত্রদিগের উপযোগী সুগন্ধি, জ্বালা নাই, পারা নাই, দাগ লাগে না, যে কোন দাদ ২ দিনে সারে। **দদ্রুলীন** মূল্য শিশি ।৵০।

**আমাদের বাতঘ্নী**—পেটেন্টের চরম উৎকর্ষ, যাবতীয় বাত, গাউট, রিউম্যাটিজিম্, গণোরিয়া ও উপদংশ-জনিত বাত ৩ দিনে নরম না পড়িলে মূল্য ফেরত দিব। শিশি ১।০।

দি নিউ ফরমুলা কোম্পানী।

কান্দী পোঃ—মুর্শিদাবাদ।

---

ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব গণিতাধ্যাপক

**শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম, এ, মহাশয়ের**

প্রতিষ্ঠিত

## "ধন্বন্তরি ঔষধালয়"।

গারুড়গা, পোঃ আঃ হাসাইল, জিঃ ঢাকা।

ব্যবস্থাপক কবিরাজ { শ্রীচন্দ্রভূষণ সেন কবিরঞ্জন। শ্রীইন্দ্রভূষণ দাশ গুপ্ত ভিষগরত্ন।

এই ঔষধালয়ে সর্ব্ববিধ তৈল, ঘৃত, বটিকা, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি অকৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত ও সুলভে বিক্রয় হয়। মফস্বলের রোগীদিগকে মনোযোগের সহিত ব্যবস্থা করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে অতি যত্নের সহিত ঔষধ পাঠান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। চিঠি পত্রাদি আমার নামে পাঠাইবেন।

গারুড়গা, পোঃ হাসাইল, ঢাকা। } কবিরাজ—শ্রীচন্দ্রভূষণ সেন কবিরঞ্জন।

# SELF-SUPPORTING INDUSTRIAL COLONY.

## In conjunction with the Indian Self-Supporting Educational Colonies Association.

The object is to form an industrial and educational organisation in which young men and boys will be trained to support themselves and pay for their training by their labour, and in which it is hoped that they will be able afterwards to remain, earning good remuneration and forming the nucleus of an industrial and agricultural organisation on the co-operative principle. After a year's training, however, they will be free to leave if they find that the experience they have gained opens up better prospects to them elsewhere.

The general plan is to employ the young men and boys under training about six hours a day on practical industrial work and to give them one and a half hour, mostly in the evening, of literary and theoretical instruction.

Training will be given at first in ELECTRICAL and MECHANICAL, METAL and CARPENTERING work for about fifteen pupils, TANNING about five, WEAVING and SCIENTIFIC AGRICULTURE about ten.

The establishment is under the immediate charge of Captain J. W. Petavel, Organising Secretary of the Educational Colonies Association, and under a committee presided over by the Hon'ble the Maharajah of Cossimbazar, who is founder and patron of the estabishment.

*The commitee will be pleased to hear from the guardians of young men who disire to join. They must be industrious and fit, physically and otherwise for the work.*

*A limited number of suitable candidates are being received free of board and all charges from the beginning.*

The regular charge for board is Rs 8 per month but after three months all will be expected to earn their board by their labour. Those failing to do that will not be kept in the Institution unless there is some reason for their failure.

Pupils reside at Berhampore, Bengal, in a house lent by the Hon'ble the Maharajah for the purpose.

Applications to be addressed to
CAPTAIN PETAVEL,
*Cassimbazar, E. B. S. R.*
(Murshidabad District) Bengal.

# অক্সফোর্ড প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকাবলী।

**আলেন্ কোয়াটারমেন্**—সুপ্রসিদ্ধ লেখক সার্ রাইডার হাগার্ড প্রণীত

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১০ ফর্ম্মা। মূল্য ৮০ আনা।

শ্রীজলধর সেন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ—

**প্রেমিক সন্ন্যাসী**—( The Cloister and Hearth নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ )

সুন্দর ছাপা ও কাগজ। মূল্য ।৹ আনা।

**লে মিজেরাবল্**—( প্রায় ৫০ ফর্ম্মা, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী )।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত এবং

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

( যন্ত্রস্থ )

## ইউরোপীয় মহাসমর সংক্রান্ত পুস্তকাবলী—

**ইউরোপের মহাসমর**—( ১৫ ফর্ম্মা ডবল ক্রাউন ) ইহাতে মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত সকল বিষয়ই লিখিত আছে। টেলিগ্রাম, পত্রাদি গতিবিধি এবং অন্যান্য সমুদয় ব্রিটিশ white, বেলজীয়ম, গ্রে-বুক প্রভৃতি সরকারী নথি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। মূল্য ৸৶৹ আনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

**রণ ভেরী**—( Sir Arthur Conan Doyleএর পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৴৹ আনা মাত্র।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অন্যান্য পুস্তক শীঘ্রই বাহির হইবে।

Oxford University Press.
London New york Melbourne Cape town.
Bombay Hornly Road. Madras Sankarram Chetty.
Agents for Vernacular Publications—
Das Gupta &c. 54/8 College Street, Calcutta.
City Library Patuatoly, Dacca.

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra. Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of he Magazine should be addressed to—

*The Manager*, "DACCA REVIEW,"
*5, Nyabazar Road, Dacca.*

*N.B.*—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among others we may mention the names of :—

His Honour Sir Charles Steuart Bayley K. C. S. I.
The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Shamshul Huda, M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A. D.L

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. H. Sharp, C.I.E., M.A.
„ Mr. N. D. Beatson Bell, C.I.E. I.C.S.
„ Mr. J. Donald, I. C. S.
„ Mr. W. W. Hornell, M.A.
„ Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
F. C. French Esq., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
„ Mr. L. J. Kershaw, C.I.E., I.C.S.
„ R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E. I.C.S.
„ Major W. M. Kennedy, M.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.
K. C. De, Esq., C.I.E., B.A., I.C.S
L. Birley, Esq., C. I. E., I. C. S
H. M. Cowan, Esq., I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A., I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
J. R. Blackwood, Esq., I.C.S.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London.)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A
„ Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
Professor J. R. Barrow, B.A.
„ R. B. Ramsbotham M.A.
„ J. C. Kydd, M.A.
„ W. Douglas, M.A., B. Phil.. B.D.
„ T. T. Williams .BA., B.Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
„ G. H. Langley, M.A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.Sc.
„ Aswini Kumar Mookerjee, M.A.
„ Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cossimbazar
The „ Maharaja Bahadur of Shushung.
The „ Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.
R. K. Doss, Esq.

Mr. Justice Digambar Chatterjee
Sir Gooroodas Banerjee, Kt., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
„ Mr. N. Bonham-Carter, I.C.S.
„ Mr. J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
„ Nawab Nawab Ali Chowdhuri.
„ Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
„ Nawab K. Mahomed Yousuff.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esqr., I.C.S.
B. C. Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Sarat Chandra Das, C. I. E.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandrs Singh
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
„ Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
„ Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L.
„ Radha Kamal Mukerji, M.A.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra.
„ Jaladhar Sen.
„ Jagadananda Roy
„ Benoy Kumar Sircar.

# CONTENTS.


| | | |
|---|---|---|
| The Evolution of the Religious Thought of the Hindus and its Pedagogical Aspects ... ... ... | Prof. Nagendra Nath Majumdar, M. A. | 1 |
| Economic History of Early India ... | Prof. J. Samaddar ... ... | 8 |
| Ancient and Popular Ideas of Comets ... | ... ... ... ... | 11 |
| Glories of the Sanskrit Literature ... | Gobinda Chandra Mookhopadhayya, M. A, B. L. | 16 |
| Note on Nine Coins of the Early Kings of Bengal. ... | H. E. Stapleton, M. A. B. Sc. ... | 22 |
| To a Sunset Cloud ... ... ... | Prof. Roby Datta, M. A. (Cantab) ... | 27 |
| Indian Music—a retrospect ... ... | Kunwar Sein, Bar-at-Law, Principal, Law College, Lahore ... | 28 |


# সূচী।


| বিষয় | লেখকগণের নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। হিমালয় প্রদেশ ... ... | শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত সরকার বি, এ, বি, টি, ... ... | ১ |
| ২। বর্দ্ধমানী সাহিত্য সম্মিলনের শিক্ষা | শ্রী—দর্শক ... ... ... ... | ৬ |
| ৩। মহামিলন (কবিতা) ... | শ্রীযুক্ত সুকুমার দাস গুপ্ত ... ... ... | ৮ |
| ৪। বাঙ্গালা নগরী ... .. | শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর ... ... ... | ৯ |
| ৫। দেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা | শ্রীযুক্ত রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায়, এম্, এ বিদ্যানিধি | ২৯ |

THE DACCA REVIEW.

VOL. V. APRIL, 1915. No. 1.

# THE EVOLUTION OF THE RELIGIOUS THOUGHT OF THE HINDUS AND ITS PEDAGOGICAL ASPECTS.

The religious thought of the Hindus, in ancient times, passed through different phases which may be styled its childhood, boyhood, and old age. The primitive Aryans who settled in the Indus Valley were deeply impressed with the most imposing manifestations of nature. These they deified and worshipped, performing sacrifices and composing hymns in their praise. Thus the activities of the Aryans in those days were largely perceptual or concerned with that which affected their immediate interests. But during the next stage of development of their thought, the mind of the great rishis passed beyond the natural phenomena to their relations of cause and purpose and it was held that nothing except Brahma, the creator of the universe, really exists. The distinctive feature of the period was the importance attached to sacrifice. The Brahmins were busy in elaborating ceremonials and supplementing manuals of worship. But in the Rationalistic or philosophical age which may be called the *old* age of thought some impatience appears to have been felt with the elaborate rites and sacrifices which the thinking men regarded as useless. Hence they began to speculate on the origin of the universe and the nature of the Supreme Being.* The thought that was thus set up ended in the belief that we find

* কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ ১। ১ম অধ্যায়
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

or "Is Brahman the cause? Whence are we born? Whereby do we live, and whither do we go? O, Ye who know Brahman, (tell us) at whose command we abide, whether in pain or in pleasure."

incorporated in the teachings of the Upanishad and Gita. They show the utter uselessness of all ritual performances and condemn every act which has for its motive a desire or hope of reward * and preach that God is the only Universal Being; all things else have their beginning, life and end in Him;† and hence to realise the existence of the Infinite in the finite, to see the unity between the individual self and the eternal self or in a word, to be able to attain eternal bliss ‡ by self-annihilation through self-realisation became with the Hindus, the *summum bonum* of life.

At this time when the caste system was tending to become rigid arose Buddhism which though it took its inspiration from Brahmanism, represented a reaction against it. It rejected caste distinctions and preached the equality of man and hence its founder may be called the Luther of India. It further insisted on the uselessness of sacrifices, ceremonials and prayers and held that the goal of life was a complete extinction of desire and the attainment of Nirvan. For sometime Buddhism made progress and became the principal religion of India under Asoka the Great who did for Buddhism what Constantine did for Christianity. But after Asoka, in the absence of a high ideal, it began to decline and in time degenerated

---

* যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪
২য় অধ্যায় গীতা

or "The state of mind consisting in firm understanding regarding steady contemplation does not belong to those, O son of Prithi! who are strongly attached to (worldly) pleasures and power, and whose minds are drawn away by that flowery talk which is full of (ordinances of) specific acts for the attainment of (those) pleasures and (that) power, and which promises birth as the fruit of acts—(that flowery talk) which those unwise ones utter, who are enamoured of Vedic words, who say there is nothing else, who are full of desires, and whose goal is heaven."

† (১) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত ।
ছান্দোগ্যোপনিষৎ

or "All this universe indeed is Brahma; from Him does it proceed; into Him is it dissolved; in Him it breathes. So let every one adore Him calmly".

(২) গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥
১৮, ৯ম অঃ গীতা

or '(I am the) goal, the sustainer, the lord, the supervisor, the residence (the seat of enjoyment) the asylum, the friend, the source and that in which it (universe) merges, the support, the receptacle and the inexhaustible seed."

‡ নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো
বিদধাতি কামান্ ।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী
নেতরেষাম্ ॥ ১৩
কঠোপনিষৎ । ৫ম বল্লী ।

or "Who is eternal in the non-eternal, who is life of the living, who though one, fulfils the desires of many. The wise who perceive Him within their self, to them belongs eternal peace, not to others."

into mere formalism. The Brahmins did not miss this opportunity and in the beginning of the 9th century A. D. a revival against Buddhism took place under Sankaracharya, which resulted in the rise of the modern form of Hinduism which represents a compromise between Brahmanism and Buddhism.

It has been mentioned above that in the last stage in the evolution of the *old* religious thought of the Hindus is found the belief that by total extinction of one's own desires or self-annihilation alone can one attain eternal bliss. This leads us to consider if the early Hindus emphasised a life of inaction. Like some of the foreign writers if we should say at once that herein we find "the highest philosophical expression of the oriental hostility to individuality"* it would surely reveal our complete ignorance of the principles laid down in our Sastras. We find distinctly laid down in our Sastras that when a man abandons actions (hence desires) merely as being troublesome, through fear of bodily affliction, he does not obtain the fruit of abandonment by making such passionate abandonment.† Thus, far from encouraging a life of inaction our philosophers emphasised as the slokas quoted below will show that the individual in order to be able to give up all desires and thus become fit for the last stage must pass through a stage of active life:

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে ।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥
৪ । ৩ অঃ, গীতা

or "a man does not attain freedom from action merely by not engaging in action, nor does he attain perfection by mere renunciation."

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥
২০ । ৩ অঃ, গীতা

or "by action alone did Janaka and the rest work for perfection; and having regard also to the keeping of people (to the duties) you should perform action"

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥
২২ । ৩য় অঃ, গীতা

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥
২৩ । ৩য় অঃ, গীতা

or "there is nothing, o son of Prithi! for me to do in (all) the three worlds, nothing to acquire which has not been acquired. Still I do engage in action, for should I at any time not engage without sloth in action, men would follow in my path from all sides"

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে ।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥
৩।৬ষ্ঠ অঃ, গীতা

or "to the sage who wishes to rise to devotion, action is said to be the means and to him, when he had risen to devotion tranquillity is said to be the means."

* History of Education—Monroe.

† দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥
১৮ অঃ, গীতা

Besides, it is said that in the early stages it is impossible for an individual to remain inactive for

“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥”
৫। ৩য় অঃ, গীতা।

nobody ever remains even for an instant without performing some action; since the qualities of nature constrain everybody, not having free-will (in the matter) to some action. The Hindus thus hold that the cessation of one's own desires is the last stage in the process of development which can be attained by the identification of one's own will and interests with the life around one *i.e.* by love and sacrifice for beings and not by separation from them. Hence it appears that the Hindus thoroughly understood that self-realisation depends entirely on *self-expression* and that "the soul grows by assimilating the spiritual forces that are about it." The different Upanishads also furnish us with instances to show that there was in the Hindu system sufficient scope for the development of individuality. In fact, self-annihilation does not mean, as is generally supposed, the suppression of the individual but it rather urges continual self-expansion till the *narrow ego* merges itself in the Eternal.

With the Hindu philosophers all souls were originally pure, but they have become contracted by their own acts (cp. Froebel). Hence by doing good deeds and through the mercy of God they will expand and become pure. The Hindus, therefore, like the modern educators saw that complete self-realisation was possible only through finding one's own relations to the world around him and this again was possible only through a self-active and harmonious life *i.e.* "from communion with one's fellow men and with the beauty and truth of the universe" (cp. Herbart). Hence though the first and second phases of Hindu religious thought were antagonistic to the teachings of the Upanishad the early Hindus did not reject them. On the other hand, they made it a general rule that to attain the last stage the individual must pass through the other two, each stage preparing for the next higher. Accordingly, it has been laid down that "ব্রহ্মচারী ভূত্বা গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ" জাবাল, ৪ or "let a man become a householder after he has completed the studentship, let him be a dweller in the forest after he has been a householder and let him wander away after he has been a dweller in the forest."

Similar ideas also occur in *Manu*

আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে॥
৩৪।৬অধ্যায়, মনু।

or "who after passing from order to order after offering sacrifices and subduing his senses, becomes an ascetic being tired with (giving) alms and offerings of food, gains bliss after death. Also

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানোব্রজত্যধঃ॥
৩৫।৬অঃ, মনুঃ।

or "when he has paid the three debts, let him apply his mind to (the attainment of) final liberation ; he who seeks it without having paid (his debts) sinks downwards."

The Hindus from a very early time have held that each man is born a debtor ; that he owes first to the sages, who were the founders and fathers of his religion ; secondly to the gods ; thirdly to his parents. The first debt he repays as a student by a careful study of the Vedas. The second he repays as a householder through the performance of a number of sacrifices. The third debt he repays by offerings to the Manes and by becoming himself the father of children. When a man has thus paid all the three debts he is considered free and becomes fit for applying himself to the attainment of final liberation.

The early Hindus therfore considered education as a life process and different duties were assigned to each stage in such a way that their due performance in any stage might prepare the individual for the next higher. In order to prepare himself for discharging self-actively the duties of manhood the individual must study in the first stage of life the Vedas to become acquainted with the moral precepts and life's duties and must learn self-control by subjecting his mind and body to a course of discipline.*

* "তস্যৈ তপোদমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্" or "feet on which that (Upanishad) stands are austerities, restraint, action ; the Vedas are all its limbs, the truth is its abode."

৮। ৪র্থ খণ্ড কেনোপনিষৎ।

Again to make himself fit for the third stage, as has been shewn before, he had to participate fully in the active life of manhood being self-controlled and self-active. During this period his whole life was controlled by the rules laid down in the Dharma-Sastras. These rules regulated every sphere of his activity ; hence not only his domestic and social life was regulated by them, but his studies, enjoyments, trades and the political life as well. And they have maintained such a strong hold on the minds of the Hindus that 'though the modern Hindu is far removed in ideas and practice from his ancestors, yet even to the present day the whole life of an orthodox and religious Hindu is controlled by rules and sanctions which he calls his Dharma'. To sum up then, in the first stage the mind was opened and disciplined and the body made fit to carry out the orders of the mind ; in the second, the individual *learned by doing* the true nature of the things of the world and of its round of duties and thus prepared, in the third, he turned his attention inward to recognise the true and intimate relation between the individual and the eternal self in which was found the explanation of the origin and the meaning of existence—both of man and nature. Hence with the early Hindu philosophers as with Froebel "the purpose of education was to expand the life of the individual until it should comprehend this existence through participation in

the all-pervading spiritual activity." Now it is clear that the Hindu philosophers instead of giving an expression to 'the hostility to individuality' aim at a greater development of individuality. Instead of suppressing their individuality "they attain their real individuality, infinitely beyond these little selves which we now think of so much importance. No individuality will be lost; an infinite and eternal individuality will be realized. Pleasure in little things will cease. We are finding pleasure in this little body, in this little individuality but how much greater the pleasure will be when this whole universe appears as our own body? If there be pleasure in these separate bodies, how much more when all bodies are one? The man who has realized this has attained to freedom, has gone beyond the dream and known himself in his real nature." So not only does identity with God which demands the cessation of all selfish interests and motives 'not imply the loss of individuality but it is the only means by which individuality, can be conserved and developed.' The ideal of the Hindus was therefore not a life of inaction and contemplation but the attainment of Divine wisdom through a self-controlled and self-active life of action. Hence the Hindu ideal like that of the Greeks of old included the two-fold ideal of '*the man of action*' and '*the man of wisdom.*' This is seen also from the slokas quoted below :

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯
ঈশোপনিষৎ।

or "all who worship what is not real knowledge (*i. e.* work only) enter into blind darkness; those who delight in real knowledge (*i. e.* without work) enter, as it were, into greater darkness.

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥১১॥ঈশ

or "but he who knows at the same time both knowledge and not-knowledge (*i. e.* action) overcomes death through not-knowledge and obtains immortality through knowledge."

It is interesting to note how an emphasis has been laid here on the combination of *knowledge with action and the corresponding pedagogical principle that no real abstraction is possible unless in and through the concrete experiences.*

## Pedagogical Aspects of Religion :

It may be noted here that from what has been said before may be inferred a few *pedagogical principles* of no mean value. By prescribing that the individual must pass through the different *asramas* the Hindus hold that every individual will have to take the steps which the human race has taken to come to the highest pinnacle of religious thought. This corresponds almost to what is called the *Parallelism between the Individual and Race Development.* Again, as we have seen, the Hindus have assigned to each *asrama* the culture material of the

corresponding stage of development of the race. This principle sounds like the modern *Culture Epochs Theory* which demands that the arrangement of the matter of instruction must be determined by the historical stages of human culture as well as by the stages of development of the race. Again by holding that only by active participation was one able to attain self-realisation, they anticipated another important pedagogical principle *viz. Learn by doing.* Thirdly, the Hindus have held that duties must be done for their own sake without any hope of a reward in this or future life.* Now the activities that are pursued for their own sake become the 'self-active representation of the inner—representation of the inner from inner necessity and impulse.' In fact the training the Hindu boy received during his pupilage was intended to develop in him such an attitude of mind and habit that he might perform *self-actively*, successfully and easily the duties of manhood in the second stage of life. Thus from the emphasis laid by the Hindus on doing one's duty for its own sake emerges the principle that one's action must always be *self-initiated.* Hence it appears that the Hindus had like Froebel for their motto *self-control and self-activity.* Lastly in holding that each stage of life was preparatory to the next higher one, the Hindus had given expression to the *principle of continuity* that is so much emphasised by the modern educators. Again it will not be out of place here to mention that Kapila the founder of the Sankhya philosophy first of all propounded the doctrine of evolution which now plays such an important part in the Biological and Pedagogical world. He says 'there cannot be production of something out of nothing; that which is not cannot be developed into that which is. The production of what does not already exist (potentially) is impossible, like a horn on a man."† Thus we find that almost all the important modern pedagogical principles can be deduced from the principle underlying the religion and philosophy of the Hindus.

NOGENDRA NATH MAJUMDER.

* কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।
৯,১৮ অঃ গীতা

or "When prescribed action is performed, O Arjuna! abandoning attachment and fruit also, merely because it ought to be performed, that is deemed to be a great abandonment."

† Hinduism—W. Moniers.

## ECONOMIC HISTORY OF EARLY INDIA.

( Second Paper ) :
BASED ON THE CHINESE TRAVELLERS.

### 1 Land.

Of all the Kingdoms of India, the towns of Magadha were specially large, and the people were rich and prosperous. The land of Hiranya Parvata[1] was well cultivated and productive.[2] The land of Champa[3] was level and fertile. It was regularly cultivated and productive.[4] The land of Kalimjhara[5] was loamy and was regularly cultivaed.[6] The soil of Maghada was rich and fertile and the grain cultivation was abundant. There was an unusual sort of rice grown in Magadha, the grains of which were extraordinarily large, sweet-scented, and of an exquisite flavour. It was commonly called "the rice for the use of the great." It was specially remarkable for its shining color.[7]

" An honest man should permanently keep away from tilling the land," that is what one of the Chinese travellers I-Tsing observes.[8] In another place he observes, "tilling of land should be done according to its proper manner (*i. e.* to till land for oneself is not permissible but to do so, for a Buddhist community is allowable). So, sowing and planting are not against the teaching of a great one. "The same traveller observes that." According to the Vinaya, it is allowable for a Vikshu to try to gain profits on behalf of the Brotherhood tilling land and injuring life is not permitted in the Budha's teaching for there is nothing so great in injuring insects and hindering proper action as agriculture.[9] Hence honest man hates the cumbersome work of a farm and permanently keeps away from it[10] carrying with him a pot and a bowl. He again observes, ' In the books written, we have not seen the slightest reference to acres of land that might lead to sinful and wrongful livelihood." I-tsing again lays down that " One must not dig the ground."[11]

### 2. Production.

We learn from the Chinese travellers that in Magadha rice was plentiful, but wheat was scarce. Ghee, oil, milk, were found everywhere. Millet was rare. There were sweet melons ; sugar-canes and tubers were abundant, but edible

(1) Mughyr

(2) Hieun Tsang—Beals Edition Vol 2, Page 191

(3) Country around Bhagalpore.

(4) Hieun Tsang 2. 191

(5) It has not as yet been fully identified : evidently it was near Champa

(6) Hieun Tsang Beal 2. 193

(7) Hieun Tsang Beal 2. 182

(8) I-Tsing : Dr. Takakusei's edition 61.

(9) I-Ibid. 62

(10) Has been explained by I-Tsing as (reject and gallop away for ever).

(11) I-Tsing 97

mallows were rare, indeed very scarce Turnip grew in sufficient quantities. Grain cultivation was abundant there. Flowers and fruits were abundant. There was a peculiar sort of rice produced in the regions of Hiranya Parvata scent of which when cooked could reach Rajgriha from Hiranya Parvat.[12]

## Share of the produce.

When a cornfield was cultivated by the Sangha a share in the produce was given to the monastic servants or some other families by whom the tilling was done. Every product was divided into six parts. and one-sixth was levied by the Sangha. The Sangha had to provide the bulls, as well as the ground for cultivation, while the Sangha was responsible for nothing else. Sometimes the division of the product was modified according to the seasons. In this connection two observations of I-Tsing are worth quoting. (1) "Most of the monasteries in the West follow the above custom. But there are some which are avaricious and do not divide the produce, but the priests themselves give out the work to servants, male and female, and see that the farming is properly done. Those who observe moral precepts do not eat food given by such persons, for it is thought that such priests themselves plan out the work and support themselves by wrong liveli-hood ; because in urging on hired servants, by force, one is apt to become passionate, the seeds may be broken, and insects be much injured while the soil is tilled. Hence an honest man hates the cumbrous work of a farm and permanently keeps away from it". (2) "When I for the first time visited Tamralipti, I saw in a square outside the monastery some of its tenants, who having entered there, divided some vegetables, into three portions and having presented one of the three to the priests retired taking the other portions with them. I could not understand what they did, and asked of the venerable Mahayana Pradip what was the motive? He replied "that the priests in this monastery are mostly observers of the precepts. As cultivation by the priests themselves is prohibited by the great sage, they suffer their taxable lands, to be cultivated by others freely, and partake a portion only of the products. Thus they live their just lives, avoiding wordly affairs, and free from the faults of destroying lives by ploughing and watering fields".[13]

## Cloth, Clothing etc.,

Silk was then evidently manufactured in India. I-Tsing observes "such deeds as begging personally for cocoons containing silkworms or witnessing the killing of insects are not permissible, even to a layman, much less to those whose hearts aspire to

12. Hieun Tsang : Beal 2. 193.

13. I-Tsing 62.

final emancipation." But supposing a donor should bring and present some such thing as silk cloth, then it should be accepted." These cocoons were used for preparing a Kashaya robe of a Brother.

The ecclesiatical garments used were stitched and sown at random without regard to the threads of cloth being lengthways and crossways. The period of making did not exceed 3 or 5 days.[14]

Kausaya was the name for the silk-worms, and the silk which was reared from them, was also called by the same name.[15] I-Tsing observes that "it is a very valuable thing and is prohibited to be used as a mattress." It appears that fine linen was then difficult to procure for the same traveller observes, "As to fine and rough silk, these are allowed by Buddha. What is the use of laying down rules for a strict prohibition of silk? The four Nikayas of the Vinaya of all the first parts of India use a silk garment. Why should we reject the silk which was reared from them and seek the fine linen that is difficult to be procured? But if the refusal of the use of the silk to exercise compassion comes from the highest motives of pity. because silk is manufactured by injuring life, it it quite reasonable that they should avoid the use of silk to exercise compassion on animate beings."

14. Ibid 59.
15. Ibid 60.

Besides silk-cloths, we meet with "Fine white cloth, Coloured cloth, and cloth used for screening one's bed. Pillow covers were made of linen. Embroidered or ornamented cloth was not allowed to be used by the Buddhists. Garments used by a houseless priest had to be dyed and various things are mentioned as used for dyeing. Dyes prepared from mulberry bark and blue and green colours were prohibited. Mention is also made of white soft cloth. More clothing was of course used in winter than in summer.

## Lands chattels, etc., mentioned in the Chinese accounts.

I-Tsing quotes a verse from the UDANA:

> Lands, houses, shops, bed-gear,
> Copper, iron, leather, razors, jars
> Cloths, rods, cattle, drink, food,
> Medicine, couches, the three kinds of
> Precious things made or unmade,
> These should be classed as divisible,
> Or indivisible according to their
> Character."

Iron and copper instruments or implements included large or small iron bowls, small copper bowls, door-keys, needles, gimlets, razors, knives, iron-ladles, braziers, axes, chisels; earthen utensils included, bowls, pitchers, oil-pots, waterbasins. Besides mention is also made of wooden and bamboo implements, leather bedding, male and female servants, liquor, food and corn, houses, vegetable gardens, cloaks, bathing shirts, water proofs, slippers,. There

were also double-cloaks, upper-garments, mat, water-strainer, etc.

The word liquor calls for some comment. The traveller I-Tsing says[16] "wine, if not, nearly sour, is to be buried in the ground, and when it has turned into vinegar, the priests may use it." But he continues "if it remains sweet, it must be thrown away but it must not be sold. For the great Buddha has said, "Ye Vikshus, who have been ordained by me must not give wine to others nor take it yourselves. Do not put wine into your mouths even so little as a drop fallen from the point of a reed."

### Honorarium to scholars and Sangharama

The land in the possession of the Nalanda Monastery contained more than 200 villages. They were bestowed upon it by kings of many generations. South-west of the convent of Gunamati, Hiuen Tsang came to a solitary hill on which was a convent which the master of the Sastras had caused to be built out of the funds of a village which was given to him by the king. I-Tsing also says that "the Indian monasteries possess special allotments of land and there is also mention of givers presenting villages or fields in order to maintain the priests in residence."[17]

J. SAMADDAR.

16. Ibid 191.
17. Vide my first article on this subject.

## ANCIENT AND POPULAR IDEAS OF COMETS.

BY IRENE E. TOYE WARNER.

Comets with historical associations of very interesting character are often heard of. It may, therefore, be of some service to give a few ancient and popular ideas as to the nature and supposed mission of these mysterious visitors from the boundless realms of space. It is strange that in the Middle Ages many erroneous ideas were prevalent, especially as the Chaldeans, according to some authorities, were practically modern and correct in their views, their belief being that comets like planets, move in regular courses, and are invisible at times, owing to their recession from the sun and earth, and their periods may be known by observation. Seneca also held these opinions, but he was in the minority, as is too often the case with those who are in advance of their Age.

The great philosopher, Aristotle, whose writings on many subjects held supreme sway over the civilised portion of the world until the Middle Ages, believed that the heavens were incorruptible and unchangeable, and that comets could not be reckoned as belonging to the heavenly bodies, but that they were only exhalations raised into the upper regions of the air, where

they blazed for a time and then were entirely destroyed as soon as they ceased to be visible. Other ancient ideas are equally wide of the truth. Amongst many that could be mentioned are those of: Metrodorus, who thought they were "reflections from the sun"; Democritus, "a concourse of several stars"; Strabo, "the splendour of a star envolped in a cloud"; Heracletes of Pontus, "an elevated cloud which gave out much light"; Epigenes, "some terrestrial matter that had caught fire and was agitated by the wind;" Anaxagoras, "sparks from the elementary fire"; and Xenophanes, "a motion and spreading out of clouds which caught fire." They were also considered wandering stars (the word "comet" literally means a "hairy star") and meteors, having a purely atmospheric origin.

There are a few allegorical descriptions in the New Testament which imply that the Biblical writers had noticed and knew something about comets. St. Jude speaks of "*wandering stars* for whom the blackness of darkness hath been reserved for ever"; and in Revelation we read, "there fell from heaven a great star, *burning as a torch*"; this expression is frequently used to describe a comet in ancient MSS. Perhaps the very vivid description of the dragon in Revelation served as a type to later writers, who possibly thought that the dire prophecies were being fulfilled by the apparitions they so much dreaded, and thus, in terror, they beheld in the sky the pictures they had conjured up in their imagination and invested with such awful portent. By comparing the account in Revelation with the descriptions of comets which appeared in the Middle Ages we are at once struck with the resemblance. The picture in the sacred Book is as follows:—"There was seen another *sign* in heaven; and behold, a great red dragon, having seven heads and ten horns, and upon his heads seven diadems. And *his tail draweth the third part of the stars of heaven.*"

With the acceptance of the Copernican conception of the Solar System, that is, the central and controlling positon of the sun, man was taught the true and subordinate position of the earth in the Universe. This was a blow to his pride, for whilst the Ptolemaic ideas held sway, the earth was regarded as of primary importance, and the whole heavens and the glory of them as merely created for the benefit of her inhabitants. Possibly it was as much for this very human reason as for a mistaken notion of the teaching of the Scriptures that the Copernican theories did not gain ground very rapidly. It is little wonder, then, that such an apparation as that of an unknown "blazing" star was beheld with awe, and more often dismay, as presaging evil to some potenate or a great calamity to the nations; but sometimes, happily, the idea of its baleful influence gave way to a more healthy feeling,

and the comet was regarded as a herald to announce the birth of a great man, or a " pillar of cloud by day and of fire by night " to lead a favourite general on to victory. No doubt clever leaders took advantage of the popular superstition and fostered the belief of their followers that it was an omen of success and a visible pledge of the Divine assistance thus bringing about the desired result, although from a different reason to that assigned. Diodorus Siculus says ( B. C. 344 ) : " On the departure of the expedition of Timoleon from Corinth for Sicily the gods announced his success and future greatness by an extraordinary prodigy ; a burning torch appeared in the heavens for an entire night and went before the fleet into Sicily. " In the year B. C. 48, during the war between Cæsar and Pompey, Lucanus says that " a comet, that terrible star which upsets the powers of earth, showed its portentous hair."

The fall of famous cities has been connected with the apparition of these dreaded visitors, such as the comet which shone over Constantinople when great misfortunes were impending in the year A. D. 400, and also when the city was captured by the Latins in 1204. The fall of Rome was preceded by a comet, when the Eternal City fell into the hands of Alaric, the Goth. Josephus records that a large comet appeared over Jerusalem when it was besieged by Titus, and that it was visible for a whole year. Another caused great consternation in A. D. 1000, and was thought to announce the end of the world, as this event had been predicted to take place in that year.

*Cometary Legends.*—In the year B. C. 1194 we are told by Hyginus that " on the fall of Troy, Electra, one of the Pleiades, quitted the company of her six sisters and passed along the heavens towards the Arctic Pole, where she remained visible in tears and with dishevelled hair, to which the name of comet is applied." This probably refers to a comet which passed from Taurus to the North Pole. We are informed by Pliny that in B. C. 975 the Egyptians and Ethiopians felt the dire effects of a comet. It " appeared all on fire, and was twisted in the form of a wreath, and had a hideous aspect ; it was not so much a star as a knot of fire." It is strange how ignorance invested a truly beautiful sight with such a repulsive and terrifying aspect. According to the same historian a comet in the form of a horn was visible at the time of the battle of Salamis (B. C. 480).

In the legendary history of Merlin, the ancient British enchanter, it is stated that on the appearance of a comet he prophesied that Uter, the brother of, Ambrosius, on the death of the latter should rule the kingdom ; that a ray form the comet which pointed towards Gaul presaged a son who should be born to him and who should be great in power ; and that the ray " that goes towards

Ireland represents a daughter, of whom thou shalt be the father, and her sons and grandsons shall reign over all the Britons." These prophecies were justified by facts, but they were probably written, like so many others have been, *after* the event.

*Comets which have "announced" birth and death.*—At the birth of Mithridates a comet appeared, which remained visible for 70 days. We are told that "the heavens appeared all on fire; the comet occupied the fourth part of the sky, and its brilliancy was superior to that of the sun." And the same kind of comet is reported to have been visible for 70 days when that monarch ascended the throne. A comet which appeared in A. D. 132 was regarded as the *soul* of Antinous. In A. D. 858 a comet was seen before the death of Pope Benedict III.; in 869 another announced the death of Lotharius the Younger; in 875 that of Louis II.; and in 877 that of Charles the Bald. A brilliant comet was visible for 40 days and 40 nights at the time of the Emperor Constantine's birth in A. D. 904, and another heralded his death in 959. A comet which appeared for three weeks in the year 942 caused, according to the chroniclers, "a great deal of mortality amongst oxen!" Boleslas I. and Casimir, kings of Poland, saw one of these portents before their death. Our own kings were not neglected, for a comet "announced" the death of Richard I., "the Lion heart," and another that of James II., King of Scotland, in 1460. The Jews thought the comet of 1208 was a sign of the coming of their long-expected Messiah. A brilliant and beautiful comet which appeared in B. C. 40 or 43 was regarded by the Romans as *the soul* of the great Julius Cæsar endowed with divine honours!

*Pliny's Description.*—This historian has given us a very quaint description of the different kinds of comets. "Some," he says, "frighten us by their blood-coloured mane; their bristling hair rises towards the heaven. The bearded ones let their long hair fall down like a majestic beard. . . The horse-comet represents the mane of a horse which is violently agitated as by a circular, or, rather, cylindrical motion." He made a very good guess at the truth in the latter statement, for modern observation has taught us that the tails of some comets do rotate about the nucleus or head. He continues: "There are bristling comets; they are like the skins of beasts with their hair on, and are surrounded by a nebulosity. Lastly, the hair of a comet sometimes takes the form of a lance."

In A. D. 1500 there appeared a "comet of bad omen," which was popularly held responsible for the storm which caused the death of Bartholomew Diaz on his voyage from Brazil to the Cape of Good Hope. There is an extremely thrilling and dramatic account of the comet of 1527, which, I think, was written by

an observer gifted with a most remarkable and lively imagination. He says: "The length (of the comet) was of a bloody colour, inclining to saffron. From the top of its train appeared a bended arm, in the hand whereof was a huge sword in the instant posture of striking. From the star proceeded dusky raies, like a hairy tail; on the side of them other raies like javellins or lesser swords, as imbrued in blood, between which appeared human faces of the colour of blackish clouds with rough hair and beards!" Many people were ill with sheer fright on beholding this truly "awful comet."

Those who prophesied misfortune on the apparition of a comet left themselves a convenient loop-hole of escape if the expected calamity did not take place. If things occurred as they predicted, well and good, and they were regarded as great prophets, but if they did not, then "the prayers of penitence had turned aside the wrath of God," so that whatever happened, the astrologers were right in the eyes of the multitude. They also taught that any event foretold by the comet might not take place for one or more periods of 40 years.

In the "History of Prodigies" we read: "These signs and prodigies give warning that the end of the world is come, and with it the terrible last judgement of God," and this idea was held by most people until about the end of the 17th century. The comet of 1630 was associated by Ripamontius with a great pestilence.

A very brilliant comet which ppeared in 1680 was, perhaps, the last to be regarded as a prodigy. The wildest terror prevailed, some believing that another deluge was coming as "water was always announced by fire." Many people made their wills and gave their property to the Church; whilst others thought that some person of exalted rank would die. To add to the general panic, it was reported that a hen at Rome had laid an egg on which was drawn the picture of a comet. Bernouilli said at this time: "That if the body of a comet is not a visible sign of the anger of God, *the tail may be.*" Even Whiston considered it possible that the approach of a comet caused the Biblical deluge. Newton, on the contrary, maintained that they were beneficial, and fed the sun with light and heat. He also thought that the most useful parts of the atmosphere were derived from them.

*Modern Panics.*—In 1773 all Paris was terrified by the approach of a comet which, according to a memoir by Lalande, might come within about 40,000 miles of the earth and cause (through pressure) the sea to leave its bed and cover part of the land. The popular fear subsided when he stated that, in any case, this would not happen until after 20 years. Biela's comet, which returned in 1832, also caused much dismay when Damoiseau found

by calculation that it would pass through the plane of the earth's orbit on October 29. The papers immediately concluded that a collision would take place, and that our globe would be destroyed ; whereas, as a matter of fact, the earth was about a month's journey from the threatened point in her orbit. Similar scares occurred in 1840, 1857, and 1872. With the advance of science and the spread of astronomical knowledge, all fears have passed away, and there are but few writers left who seriously believe that any terrible calamity would happen, even if a cometary body succeeded in penetrating the dense atmosphere of the earth. In these days, when celestial occurrences are subjected to rigid scientific inquiry, leaving little room for imagination, it is, perhaps, of some interest to quote again the ancient records of the time when men groped for the truth, and lived daily in a world of "wonders" far beyond their powers of description or comprehension, and with every modern discovery of the laws of the Universe, our awe but increases until we are constrained to cry : "Great and marvellous are Thy works, and Thy wonders past finding out, and in Thy temple everything saith 'Glory.' ;

THE KNOWLEDGE."

---

## GLORIES OF THE SANSKRIT LITERATURE.

### VI.

We shall now turn to another characteristic quality of the Tanmatras or subtle elements, viz, their liability to to ceaseless change. Although there are but few texts directly connecting the Tanmatras with this quality, their liability may be inferred from other texts of a common nature quoted below :—

(১) ক্ষরং প্রধানং। শ্রুতিঃ॥ That is to say, primordial cosmic matter is liable to ceaseless change—Sruti. Nilkanth defines ক্ষরং as প্রতিক্ষণ পরিণামিত্বং or that which undergoes change every instant.

(২) অচেতনা পরার্থা হি নিত্যা সততবিক্রিয়া। শ্রুতিঃ॥ Primordial matter though eternal is devoid of consciousness and undergoes ceaseless change for (the enjoyment) of another than herself—Sruti.

(৩) পরিণামস্বভাবাঃ হি গুণাঃ। সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী। The Gunas or attributes are by nature liable to change—Sankhya-Tatwa-Koumudi.

(৪) উপমর্দপয়ন্ ধর্ম্মঃবিকরোতি হি ধর্ম্মিণম্। ন্যায়দর্শনম্। By the accretion and seggregation of qualities is brought about the change of the qualified—Nyaya-Darsan.

(৫) কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণাম স্বভাবজঃ। স্মৃতিঃ। The differentiation of qualities is brought about by time, while constant change is an inherent quality of matter. —Smriti.

(৬) ভাবপদার্থঃ সর্ব্বত্র ক্ষণিকঃ। বৌদ্ধদর্শনম্ ॥ Impermanence is the characteristic quality of all substances at all times and under all circumstances—Buddhistic Philosophy. Nowhere has the doctrine of impermanence been carried to such rigorous extremity as in the philosophical writings of the Budhists. Says, Professor Rhys Davids in his 'Early Budhism': "With them there is no Being, there is only a Becoming. The state of every individual is unstable, temporary, sure to pass away. Even in things we find, in each individual, Form and other Material qualities. In living organisms there is a continually ascending series of mental qualities. It is the union of these that makes the individual. Every person or thing or god is therefore a putting together, a compound. And in each individual without any exception, the relation of its component parts is ever changing, is never the same for two consecutive moments."*

According to the Rishis of ancient India, change or modification is of two kinds, *Vikara* ( বিকার ) and *Vivarta* ( বিবর্ত ). The distinction between the two is aptly described in the following couplet :-

---

* It may not be generally known that the Budhist Theory of the Universe includes no soul. The five senses, sensations arising from objects and all emotions and intellectual processes constituting the Vijnana ( বিজ্ঞান ) of the Budhists, takes up the place of "soul" of the orthodox systems of Indian philosophy. But unlike soul, it is liable to ceaseless change and is dependent upon and really bound up with the body. It is very doubtful whether Budha himself laid down any positive opinion on the existence or non-existence of soul or left it as a matter of mere uncertainty. The latter is probably the right surmise as will appear from a perusal of the following passages occuring in the 'Potthapa'da Sutta.' In the Sutta, to the question whether the soul is the same as the body or different from it, asked by Potthapada, Budha answers : -'This question is not calculated to profit, it is not concerned with the Norm (Dhamma), it does not redound even to the elements of right conduct, nor to detachment, nor to purification from lusts, nor to quietude, nor to tranquilisation of heart, nor to real knowledge, nor to the insight (of the higher stages of the Path), nor to Nirvana. Therefore is it that I express no opinion on it." In another part of the same Sutta, he says "Some things, Potthapada, I have laid down as certain, other things I have declared uncertain. The latter are those ten questions that you raised and for the reasons given I hold them matters of uncertainty." In his discourse entitled the 'Foundation of the kingdom of Righteousness, preached at Beneras to his five first disciples, instead of any positive opinion on the nature of soul, we find him very cautiously dilating on the *absence of any sign of soul* in the constituent elements of a human body. In another place we find him answering an itinerant questioner of the nature of soul, eternity etc. that none but a Buddha can understand these things. It is very probable that the rapid discussions of these most intricate as well as the highest problems of human knowledge by the uninitiated as well as the half-initiated—which instead of bringing any good to society as well as the individuals composing it were productive of unending evils in the time of Budha, such as, profitless

সতত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্তঃ ইত্যুদীরিতঃ॥
স্মৃতিঃ।†

That is to say when a cause undergoes a substantial change of name and form to produce an action or effect, it is called 'Vikara' or Parinam (পরিণাম); but when no such actual change of name and form takes place, it is called 'Vivarta.' In 'Vikara' there is not only a change of name and form but of substance also, such as the change of milk into curd, while 'Vivarta' is an apparent change as when through defect of vision or of light a rope appears like a serpent.

According to sage Ya'ska, the change or modification called Vikara (বিকার or পরিণাম) consists of six phases viz. birth, existence, growth, slight daily change, daily wear-and-tear and destruction.* Every material substance is liable to these six kinds of modifications. By 'birth and destruction' is to be understood change of conditions only and not the production of something which did not at all exist before, nor the total annihilation of that which existed just now: অবস্থান্তরাপত্তিরেব সতো দ্রব্যস্যোৎপত্তির্বিনাশশ্চ। বলদেবঃ॥†

According to the Sánkhyists, Prakriti or undifferentiated cosmic matter does not of itself undergo any change, unless and until its equilibrium is disturbed by the presence of Purusha or Soul, when changes are induced in it in the same way as a magnet converts a piece of iron into a temporary magnet, by imparting its properties to it, the moment the iron is brought under the influence of the magnet.‡ The changes or modifications undergone by Prakriti or Cosmic matter are of the nature of Vika'ra or Parina'm as the following

wranglings, diversity of opinions, uncertainty of conduct, resentment &c.—made a deep impression on Budha as evidenced by his discourse entitled 'the Brahmajala Sutta.' Hence we find him strictly interdicting the discussion of these questions called 'Indeterminates' by any of his disciples treading along the Aryan path chalked out by him, whose ultimate goal was the attainment of Arahatship. A practical, supplemental and reformative religion like the one preached by Budha, might well leave out these problems of a merely speculative nature as matters of faith only, but would that justify one in declaring that Budha himself denied the existence of soul? As a matter of fact these 'Inderterminates' of the time of Budha are still the indeterminates of the various systems of Hindu philosophy and resting as they do on a basis of faith, await the magical wand of Science to be turned into conviction.

† অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।
স্যাত্ ক্ষীরং দধি মৃৎকুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা॥
অবস্থান্তরভানং তু বিবর্ত্তো রজ্জুসর্পবত্।
নিরংশেঽপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাত্॥
পঞ্চদশী॥

* অস্তি জায়তে বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি চেতি ভাববিকারাঃ ষট্‌পঠিতা যাস্কেন।

† নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ গীতা।

‡ তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবত্। সাংখ্যসূত্রং।

couplet quoted from the Sankhya-Karika will show :—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারঃ ন প্রকৃতির্নবিকৃতি: পুরুষঃ॥
সাংখ্যকারিকা।

Primordial Cosmic matter is not the effect or modification of any cause, the seven principles beginning with Mahat being the modificatory causes and the modified effects of their immediate successors and predecessors respectively, partake of the nature of both Prakriti or originating cause and Vikriti or modified effects, while the other 16 principles consisting of the ten organs of sense and action, mind and the five gross elements are to be considered as modifications only. Purusha or Soul is neither the modificatory cause of any effect nor the modified effect of any cause. The Sa'nkhyists do also uphold the co-eternity of matter and a plurality of (individual) souls as the following texts will verify :—

(1) অতঃ ঊর্দ্ধং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্মে ব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা—উভাপ্যনাদী, উভাপ্যনন্তৌ, উভাপ্যলিঙ্গৌ, উভাবপি নিত্যৌ। একা তু প্রকৃতিরচেতনা ত্রিগুণা বীজধর্ম্মিণী প্রসবধর্ম্মিণ্যমধ্যস্থধর্ম্মিণী চেতি। বহবস্তু পুরুষাশ্চেতনাবন্তোঽগুণা অবীজধর্ম্মিণোঽপ্রসবধর্ম্মিণো মধ্যস্থধর্ম্মিণশ্চেতি। সুশ্রুতসংহিতা॥

"We shall now describe the points of similarity and dissimilarity between Purusha (Soul) and Prakriti (Cosmic matter). These are—both are without beginning, both infinite, signless and eternal. Primordial cosmic matter is one, insensible, endowed with three qualities, containing within itself the productive potentiality of a seed* and is moreover non-indifferent. Purushas (Souls) are many in number, sentient, devoid of qualities, devoid of any productive potentiality and are also indifferent—Susruta-Sanhita.

(2) অব্যক্তৈকত্বমিত্যাহুর্নানাত্বং পুরুষাস্তথা। মহাভারতম্। †

The Sankhyists say that Avyakta or undifferentiated cosmic matter is one, while Purushas or Souls are many-Mahabharat. The Sankhyists do also maintain that the modifications of Prakriti or Cosmic matter are only for the enjoyment and liberation (ভোগাপবর্গ) of the individual Soul‡ which

* The productive potentiality of the seed has ever been a theme of unending interest to poets and men of letter of every civilised nation of all ages and climes, but perhaps nowhere so beautifully expressed as in the following couplets by Henry Baker :

"Each seed includes a plant : that again,
Has other seeds, which other plants contain :
Those other plants have all their seeds, and those
More plants again, successively inclose.
"Thus, every single berry that we find,
Has, really, in itself whole forests of its kind,
Empire and wealth one acorn may dispense,
By fleets to sail a thousand ages hence."

† জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব॥
সাংখ্যকারিকা।

‡ (1) পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥
সাংখ্যকারিকা॥

(2) প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যং।
পাতঞ্জলদর্শনম্।

does not in any way influence the successive modifications except by inducing a change in the equipoised qualities of the cosmic matter through close poximity or contiguity.* Kapila is also against the assumption of a secondless supreme God, hence his system of philosophy is known as 'Niriswara Sankhya' *i. e.* Sankhya without God. +

It will be seen from the above that although Sankhya system of philosophy upholds the evolution of the universe to have resulted from the interaction of life and matter, it does not in any way clear up the mystery of the nature of that interaction. The Sankhyists do simply say that the modifications of the nature of Vikara or Parinam are of inert cosmic matter and do spontaneously take place in the presence of Purusha or individual Soul, just as milk spontaneously flows in the udder of the cow when its calf is present near by.*

The Vedantists, on the other hand, while maintaining the essential unity of creation and the eternal existence of a supreme creator without a second, are much divided amongst themselves regarding the ultimate nature of Soul and matter, the manner of interaction of the two as well as the nature of the modifications brought about by such interaction. Of the most famous exponents of the vedantic system of philosophy Sankara perhaps stands unique in his persistent denial of the existence of any other entity than an Impersonal Self without a second, which is the only reality, full of consciousness, full of bliss unalloyed with bitterness of any kind *i. e. Sachidanandamaya Brahma.* With Sankara the universe with its heterogeneity is an illusory concept brought about by ignorance or avidya ( অবিদ্যা ). Hence, with the destruction or disappearance of ignorance and the rise of true knowledge or vidya the illusion disappears when the individual merges in and becomes unified with the Universal Soul or Paramatma. Thus we find Sankara to be an advocate of what is called the vivarta-vada ( বিবর্ত্তবাদ ), according to which the

*(1) তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥
সাংখ্যকারিকা।

(2) তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং।
গুণ-কর্তৃত্বে চ তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥
সাংখ্যকারিকা।

+ ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিরিতি।
সাংখ্যদর্শনং।

The system of philosophy promulgated by Patanjali is generally called 'Seswar' or theistic Sankhya in opposition to the 'Niriswara' or agnostic Sankhya of Kapila, because in this system, also known as Yoga-Darsan, the existence of God is acknowledged, although Patanjali's God is a kind of Purusha devoid of liability to pain, action and their results, as well as desires :

"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"
পাতঞ্জলদর্শনম্।

*বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥
সাংখ্যকারিকা।

heterogeneity is to be regarded as the apparent and not the real modifications of Brahma, brought about by the illusive character of Maya. * Sankara's 'Maya' is something which can only be expressed in his own language :—

সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা ন।
ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা ন।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গাপ্যুভয়াত্মিকা ন।
মহাদ্ভুতানির্ব্বচনীয়রূপা॥

"It (Maya) is neither existence nor non-existence, nor partaking of the nature of the two, although divided, it is really undivided but does not partake of the nature of both, though corporate it appears as incorporate, but certainly is not made up of the nature of the two. It is something extremely wonderful and not capable of being described in words."—Sankara.

( *Continued* )

* The difference between 'Maya' and 'Avidya' is very clearly expressed in the following couplets quoted from the Panchadasi of Madhavacharjya generally known as Vidyaranya Swami. It will be seen that according to Madhavacharjya, equipoised Prakriti reflecting Brahma called Chidanandamaya ( চিদানন্দময় ) becomes divided into two kinds, namely 'Maya' and 'Avidya.' When there is a preponderance of pure Satwaguna, such Prakriti is then called 'Maya' and as such is subject to Brahma for creative purposes, who is then called the ominiscient creator. With a preponderance of impure Satwaguna, Prakriti is called Avidya and as such overpowers the omniscience and omnipotence of Brahma, changing him into a variety of individual Souls or Jivas, all pa vipotent, parviscient and dependent :—

চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব সমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥ পঞ্চদশী॥

That pain, ignorance and individuality are but the links of a chain is also the opinion of Professor Rhys Davids as shown in the following extract from his 'Early Budhism' :—"One can express that in more modern language by saying that the conditions that make an individual are precisely the conditions that also give rise to pain. No sooner has an individual arisen, become seperate, than disease and decay begin to act upon it. Individuality involves limitation, limitation involves ignorance, ignorance ends in sorrow."

# EASTERN BENGAL NOTES AND QUERIES.

## XI.

### Edited by H. E. Stapleton.

## NOTE ON NINE COINS OF THE EARLY KINGS OF BENGAL. (1350-1420 A. D.)[1]

### By the Editor.

Coins of the mediaeval Kings of Bengal are still comparatively rare, and it was, therefore, with great pleasure that I acceded to the request of Babu Kedar Nath Majumdar, Editor of the "Saurabh", to describe nine coins of this period. These coins were recently obtained from a village in the north of the Dacca District (near the Mymensingh border), and three of them are of special interest, as they belong to a Hindu King whose existence, up till two or three years ago, had been completely forgotten. The coins will be described in order of accession of the Kings in whose names they were minted.

I. SIKANDAR SHAH, SON OF SHAMSUDDIN ILYAS SHAH. The reconquest of Bengal by Muhammad ibn Tughluq about 1327 A. D. had practically no permanent effect, as the Governors whom he placed in charge of the three provinces of Bengal—Lakshnauti, Satgáon and Sunárgáon—soon either died or were assassinated. The usurpers carried on amongst themselves an internecine strife which was finally ended about 1352 A. D. by one of them, Haji Ilyás, conquering his rivals and establishing himself firmly as Sultan of Bengal under the title of Shamsuddín Ilyás Sháh. His coins range from 740 to 758 A. H. (1339-1356 A. D.) and he was succeeded by his son Sikandar. Sikandar seems to have been allowed to mint coins in the lifetime of his father, as Thomas[2] has recorded coins minted in Sikandar's name at Fírúzábád from 750-760 and also coins of Sunárgáon, dated 756 and 757. The first coin, however, that I describe below, is of much later date, viz, 784 A. H.

Plate I, (1) and (1[1])

*Obverse.*

1. Al-Wáthiq-Bita'íd
2. Al-Rahma'n Abú-al-Muja'hid
3. Sikandar Sha'h Ibn Ilya's
4. Sha'h al-Sulta'n

*Margin*,—illegible except the name of the Ima'm Ali.

Translation.—One who trusts in the support of the Merciful, Father of the Warrior, Sikandar Shah, son of Ilya's Shah, the Sultan.

*Reverse.*

1. Yamín
2. Khalífat Alla'h Na'sir
3. Amír al-Múminín Ghauth al-Islàm

---

[1] This paper originally appeared in a Bengali translation in the "Saurabh" of *Chaitra*, 1321 B. S. Several of the coins described are now in the Dacca Museum, to which they have been presented by Babu Krishna Nath Chakladar.

[2] *Chronicles of the Pathan Kings of Delhi*, *p.* 269.

Plate I.

(1) (3)

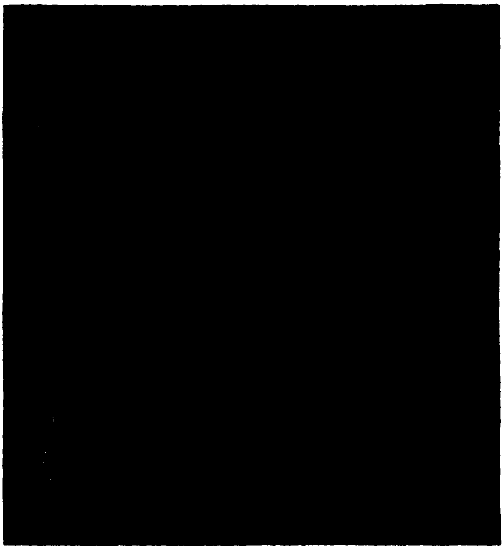

(2) (4)

(1¹) (3¹)

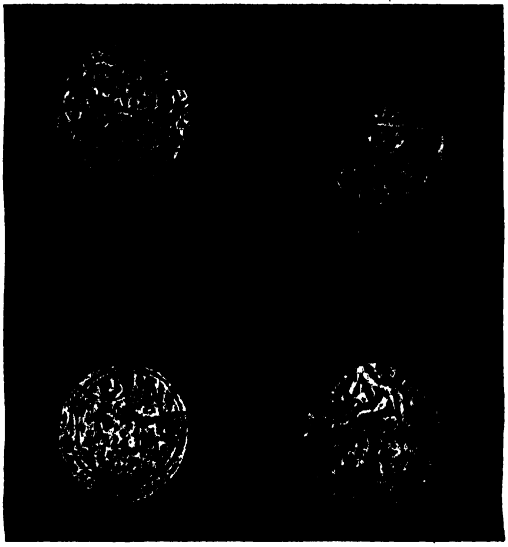

(2¹) (4¹)

Plate II.

(5) (7)

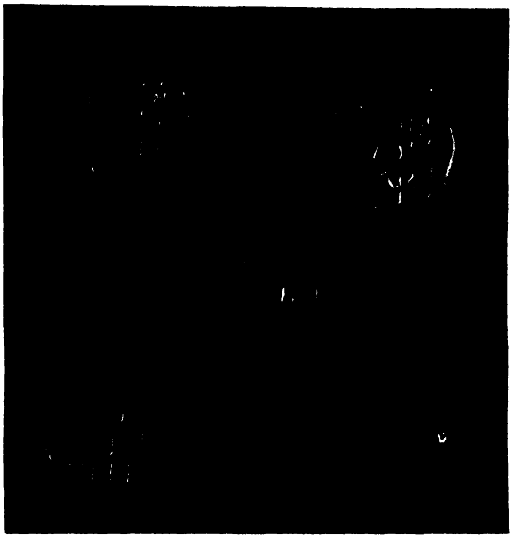

(9)

(6) (8)

(5') (7')

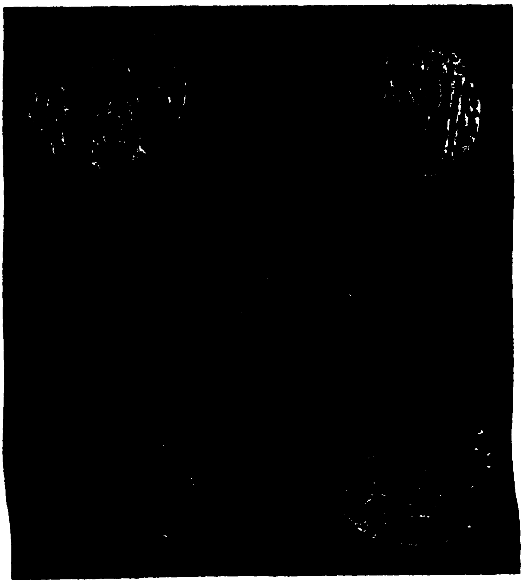

(9')

(6') (8')

4. Wa al Muslimín Khaladat Khil-a'fa'tuhu

*Margin*—Dharb Ha'dh al-Sikkah al-Muba'rikah....Sanah Arba wa Thama'nín Wa Saba Miatin.

Translation.—The right hand of the God's Vicegerent, Aider of the Commander of the Faithful, Succourer of Islam and the Muslims. May (God) protect His Khalifate.

*Margin*—This famous coin was struck at.........in the year 784 (1382 A. D.).

The coin is similar to the Indian Museum Catalogue coin No. 52, and was probably minted at Firuzabad, but the mint name is cut off.

At the commencement of his reign, Sikandar Shah had to meet an invasion from the Delhi Emperor, Firuz Shah. He was besieged in the fort of Ekdala, and finally had to buy off Firuz Shah by presenting him with forty elephants and agreeing to pay an annual tribute, This invasion, however, does not appear to have had any marked effect on Sikandar Shah's enterprising spirit which, even as early as the first year after his father's death, had led him to invade Kamrup and mint coins there (*vide* I. M. C. coin No. 38). A sign of his firm settlement on the throne of Bengal is seen in the building of the famous Adina Mosque at Pandua near Gaur which was finished in the year 770 A. H. He appears to have survived until 792, but, for 20 years previously, he had allowed the sovereignty of Bengal to be shared with his favourite son, Ghya'suddín Azam, and in the "*Riyázus Sala'tín*" it is said that Sikandar was finally killed in a battle against his son.

II. GHYASUDDIN AZAM SHAH. Ghyasuddin appears to have been practically independent in Eastern Bengal during his father's lifetime, for quite apart from the evidence of his coins, the well-known Ode which the Persian poet Háfiz addressed to him as "Sultan" must have been written before 791, the year in which Háfiz died. From the story of the Qa'zi given in the *Riya'z*, and often quoted in English Selections used in High Schools, he appears to have been an upright King, anxious to maintain the authority of justice and religion. His coins range in date from 772-812, but there is a gap between 799 and 812 which is not understood. Although the date of the coin given below has been cut off, it may possibly be one of a year in this interval, as the obverse is almost identical with that of the 812 coin given by Dr. Blochmann in his Third Essay on the History and Geography of Bengal (J. A. S. B., 1875, p. 287) and the date appears to have the unit number 4.

Coin of Ghyasuddin Azam Shah—Plate I, (2) and (2¹)

*Obverse* : in quatrefoil

1. Ghyásudduniya
2. Wa al dín abú al-Muzafar
3. Azámsha'h ibn Sikandar
4. Sháh al Sultán

*Margin*—Illegible.

*Reverse* : in circle
1. Násir Al Imám al-Múminín
2. Ghauth al Islám
3. Wa al Muslimín
4. Khalad Alla'hu Mulkahu

*Margin*—Illegible, except mint name Satga'on, and possibly Arba (four), the unit of the date.

III. SHIHABUDDIN BAYAZID SHAH. On the death of Ghyasuddin (or perhaps even previously) anarchy broke out in Bengal, but we have very little certain knowledge as to the events of the succeeding 10 years. From the coins, however, that I will now describe, it is certain that the dynasty of Ilyas Shah came temporarily to an end, being supplanted first by a Muhammadan called Shihábuddín and then by Jaláluddín Muhammad, who is said to have been the son of a Hindu, called Raja Kansa. A rebellion also seems to have broken out against Jalaluddin, which led to the temporary appearance of the names of two Hindu Kings on the coinage. I hope to deal with this period in greater detail in a subsequent paper with the assistance of other numismatic material in my possession.

Coins of Shihábuddín Báyazíd :—

(A) A much mutilated coin without legible date. Plate I, (3) and (3[1])

*Obverse* :—
1. Al-Muáyíd Bitáíd al-Rahmán
2. Shihábudduniya wa al dín
3. Abú al Muzafar
4. ... ... ... ...

*Reverse* :—(Almost illegible ; perhaps)
1. Násir Amír al Múminín
2. Ghauth al Islám
3. Wa al Muslimín

*Margin* :—illegible

(B) Plate I, (4) and (4[1])—In multifoil of 16 small arcs.

*Obverse* :
1. Al-Mua'yíd Bitáíd al-Rahmán
2. Shihábuddiniya wa
3. l-din abú al-Muzafar
4. Báyazíd Sháh
5. Al-Sultán

*Reverse* :—(In enclosure of 8 arcs turned inward) Same as in previous coin.

*Margin*:—Almost illegible, but date probably 816.

Coins of Shihabuddin dated 812 and 817 have also been recorded.

IV. JALALUDDIN MUHAMMAD. No epigraphic evidence exists as to the parentage of this king, who, like Shihabuddin, refers to himself simply as Al-Sultan, but in Muhammadan Histories he is said to have been the son of Raja Kans of Bhaturia, an area which corresponds roughly to the modern districts of Rajshahi and Pabna. Raja Kans is said to have seized the whole kingdom of Bengal and so oppressed the Muhammadans that Sultan Ibrahim Sharqi of Jaunpur was invited by the Muhammadan saint Nur Qutbu-l-Alam to invade Bengal and turn out the oppressor. Raja Kans in fear begged forgiveness of the saint and asked him to intercede on his behalf with the King of Jaunpur. Qutbu-l-Alam refused unless Raja Kans agreed to become a

Muhammadan. This the Raja would not do, but he offered instead his son Jadu, who was then 12 years old. "Qutbu-l-Alam thereupon put some *pàn* which he was chewing into Jadu's mouth, taught him the creed, and thus made him a Muhammadan, giving him the name Jaláluddín. According to the Raja's wish he also sent a proclamation through the town ordering the people to read the Friday prayer in the name of the new King." Sultan Ibrahim was was then induced to return to Jaunpur; but shortly afterwards Raja Kans broke his word and again seizing the sovereignty of Bengal, he is said to have endeavoured to reconvert Jalal to Hinduism by making several cows of gold and pulling Jalal through their bodies from mouth to back. The gold of the figures was then distributed amongst Brahmins. Jalal, however, remained faithful to his new belief, and the story goes on to say that when shortly afterwards he became King he wreaked his anger on the Hindus who had received the gold from the figures of the cows by compelling them to eat beef. The only thing that is certain is that Jalaluddin followed Shihabuddin on the throne in 818 A. H., and possibly his too fervent zeal for Muhammadanism led to the insurrection of the Hindus which I have already referred to.

Coins of Jalaluddin Muhammad :—

(A) PLATE II, (5) and (5[1]) :—*Obverse*: in scallopped margin of 12 arcs.

1. Jala'l
2. Al-duniya wa-al-din.
3. Abū al-Muzafar.
4. Muhammad Sha'h.
5. Al-Sulta'n.

No marginal inscription.

*Reverse*:

1. Na'siru—
2. Al-Isla'm.
3. Wa al-Muslimin.
4. Khalad Mulkahu.

Marginal inscription illegible except date 818 A. H. (= 1415 A. D.).

(B) Plate II, (6) and (6[1]) :—*Obverse*:

1. Al Sulta'n
2. Al A'dil Jala'l al duniya.
3. Wa al din abu
4. Al-Muja'hid Muhammad Sha'h
5. Al Sulta'n.

Reverse :—in a square within and at right angles to another square : the same inscription as on the reverse of III (A).

Margin—illegible except for Ashar wa thama'n miatin—the first two figures of the date—81-A. H.

V. DANUJ MARDDANA DEVA (and, VI. MAHENDRA DEVA). Only 3 coins of these Hindu Kings have hitherto been recorded. The first, belonging to Danuj Marddana and dated 1339 *Sakabda*, came from Basudebpur in the Khulna District and from the propinquity of its find-spot to Chandradwip, Prof. S. C. Mitra, who first described it in the "Prava'si" of Srava'n, 1319 B. S., seems to have been led to conclude that it was minted at Chandradwip. The other two coins—one of Danuj Marddana and the other of Mahendra Deva—were

found near Pandua, the old capital of Bengal, 12 miles north of Gaur. The latter two coins have only been discussed by Babu Rakhal Das Banerji in the same number of the "Prava'si" from a reproduction in the "Rangpur Sahitya Parishad Patrika", and while both seem to have been minted at Pandunagar, Mahendra's is said to be dated (1)336 *Sakabda.* The three coins I will now describe below clearly show that Danuj Marddana minted at Pandunagar both in 1339 and 1340 and also that a different mint was probably at work in the latter year as well.

Coins of Danuj Marddana :—

(A) Plate II, (7) and (7¹) *Obverse*: in circle.

1. Sri Sri Da
2. nūj Mardda
3. na Devasya

No inscription in margin

*Reverse*: in a square

1. Sri Chandi
2. Charana Pa
3. ra'yana

Margins (reading from bottom clockwise)–Pa' (ndu) nagara't Saka'bda' 1339.

(B) Plate II, (8) and (8¹) : exactly the same except that the date is 1340 instead of 1339.

(C) Plate II, (9) and (9¹) : Obverse :— the same except that the 3rd line ends in *Deva.*

*Reverse* :—the same as in the 1st coin except that the date 1340 appears to the left of the inscription instead of to the right.

The margins are mutilated, and so no certain reading is possible, but the mint name is evidently different from that of the other two coins. These two dates, 1339 and 1340, correspond almost exactly with the Hijira dates 820 and 821, and it is noteworthy that in the Indian Museum Catalogue no coins of Jalaluddin are found minted from Firuzabad, *i. e.*, Pandua, in these two years. It seems therefore possible that Jalaluddin was temporarily evicted from Pandua at this time and only regained his kingdom after a struggle with two Hindu chiefs–very possibly his own relations. I can make no suggestion at present of the reading of the mint on the third coin, but I may add that the Basudebpur coin which I have recently had the opportunity of examining at the rooms of the Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta, was certainly not minted at Chandradwip. The only legible letters are the first two, which are clearly চা. From another coin in my possession, the mint is seen to be *Cha'tigram*, a place which also appears to have been a mint town of Jalaluddin Muhammad (*vide* I. M. C. coin No. 110 which Mr. Nelson Wright reads as having been minted at Chatga'nw in 834 Hijira). I am also inclined to doubt whether the date 1336 suggested by Babu Rakhal Das Banerji for the Pandua coin of Mahendra is correct, as the only date I have myself found on coins of Mahendra is 1340 *Saka'bda'*. This coin, I am told, is now in the possession of

the Rangpur Sahitya Parishad, and I at some future date of examining it trust that I may have the opportunity personally.

H. E. S.

## TO A SUNSET CLOUD.

Fly not from the sunset sky,
Seraph-wing'd!
Wipe not red thy sun-lit eye;—
Smear thy form with rainbow hue,
Veering in the sleepy blue;
Wear, O wear thy radiance new,
Lightning-ring'd!

Face of fire and amethyst,
Blaze thou on;
Glisten yet, sweet shape of mist,
On mine eye O glisten yet,
Streak'd with white and freak'd with jet;
From thy throne in heaven set,
Gaze thou on.

Rush into the dreaming eye,
Vision bright!
Clothe the soul with all thy dye;—
Let me mingle in my core
All thy hues and beauty's store,
Till on One Sweet Form I pour
All thy light.

Such as thou art, mellow cloud,
Such I'll make her:
In her voice nor low nor loud,
In her hues so red, so white,
She shall fling her sound and light
On my soul, while to her might
I awake her.

ROBY DATTA.

## INDIAN MUSIC.

### A RETROSPECT.

There is a common saying in the Punjab that Raga (Music) had its birth in the Deccan, its youth in Bengal—it became old in the Punjab and died in Kashmir. Considering the dearth of good musicians and good taste in our province to-day, perhaps the saying is not far wrong. You don't find much of vocal or instrumental music even in the places of worship e. g. temples and Dharmasalas—at least not good classical music. In a Punjabi's home there is little or none of it. This is much to be deplored—the more so, because the saying above quoted, so far at least as the land of the five rivers is concerned, reverses the historical order of events. It was on the banks of the Sindhu, Chandradhaga, Iravati and the Saraswati that the Vedic Richas were first chanted before they came to be repeated on the Jamuna, the Ganges and the Godavari. It could not have been very far away from the very spot where we are assembled to-day* that the old Rishis and Munis sang in unison the Sam and the Gandharva Vedas. Forgotten or nearly forgotten are those old tunes by us here in the toil and trouble of a humdrum life. And with our becoming unmusical we have lost touch with those verities which help to elevate a people. There is however consolation in the knowledge that our literature and traditions are replete with these divine arts and if we do but refuse to turn away from them, nor let ourselves be cut adrift from their golden bonds, we may yet attain to something like a prophetic strain.

In the history of Sanskrit and even Hindu literature it were difficult to find any period when music and poetry were wanting. There is no pre-musical and non-poetical period in Hindu history. Long before the art of writing came into use, Srutis and Smritis, as indeed all forms of learning, were handed down from father to son, from Guru to Chela and thus from generation to generation by means of song. This art was thus at once a source of pleasure and of utility. An excellent help to mimicry and a powerful awakener of emotion, it served to illumine and expand the individual and national consciousness of the early Aryans.

Musical instruments are distinctly mentioned in the two later Vedas and Upanishads—the Damru ( the drum ) being perhaps the oldest and also the simplest of them. This is the instrument characteristic of Siva. Then comes Vina which is dear to Saraswati. To these two instruments—symbols of Tal and Sur are referred in Hindu Mythology the origin of Language and

* The Gandharva Mahavidyala is located near the bank of the Ravi.

Science, Arts, everything.* And if there is any other musical instrument that nearly comes up to these it is the Lute—the Bansari of Srikrishna—which in later ancient Hindu history plays such an important part. The whole of ancient Hindu history may thus be grouped round these three instruments. For in no period of Hindu culture has music been neglected. From the Vedic, Brahmanic, Epic times through the Bouddha or Pauranic period down to the period of Mahomedan supremacy there have always been some additions made to this edifice till it stands at the present day, a monument of a nation's genius and traditions.

Of the Vedic period I have already given a hint that music was then chiefly if not wholly religious—all forms of ritual, Yagnas and prayers were in song. In the Epic period we find much greater complexity and secularity making its way into this art. The sphere of music thenceforth was not confined to the sacred limits of the temple or the Yagna. Nevertheless it must be remarked that the rigid classification of music into sacred and profane perhaps had not yet come into being in India It was cultivated in those days in a truly religious spirit. Men and women sang in temples every morning and evening, even the Kanchanis—a class of rofessional singers and dancers proably dedicated themselves to the temples. These professional artistes are mentioned in no mean contemptuous terms in the Ramayana and the Mahabharata. When Raja Ramchandra was to be married to Sita or when he came to take the Raj of Ajodhya after fourteen years of victorious exile—when Yudhishtira celebrated the creation of a new capital at Indraprastha there came musicians and singers of sorts with their divers instruments and trained voices to sing the glory of their Lord and Sovereign. But Srikrishna's Lute works havoc with the tender hearts of a hundred Gopis of Gokul and even a single note from it not only calls in the thousand cows to the fold, it serves to unite in devotion and loyalty as many lusty lads of Brindaban. What a far-reaching effect this music had on the evolution of Hindu thought and culture may be estimated by the fact that nearly half of the Hindu poetical literature turns on this theme.

In the life history of the great Gautama we learn that in a small principality of Kapilavastu King Sudhodhana had arranged for every variety of music, instrumental and vocal, in the Palace of pleasure especially erected for his contemplative son Prince Sidharta. And reference may be made to the scene described in the Lalitavistara

* Cf. The origin of Sanskrit alphabet is described in the following Sloka :—

নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো
ননাদ ঢক্কাং নব পঞ্চবারান্ ।
উদ্ধর্ত্তু কামঃ সনকাদি সিদ্ধান্
এতদ্ বিমর্শে শিবসূত্রজালম্ ॥

(so well adapted in the Light of Asia by Sir Edwin Arnold) of that extremely pathetic incident when the newly married prince leaves for ever his ch·rming and devoted wife Yasodhara. Women singers and musicians have all dropped asleep over their instruments and on the velvet couch his sweet Yashodhara—a sleeping beauty—a heavenly nymph—with her lovely babe close to her breast. The once tremulous fingers under the weight of sleep are still on the strings—these are silent. Yet their echoes are hovering about over the angelic faces of the mother and child and are wafting sweet fragrance of Jasmine and rose when Prince Sidharta softly comes upon the scene in his firm resolve to bid farewell to all that was so dear to him.

Readers of Sakuntala and Vikramorbaci will readily recall the numerous scenes of heaven-resounding harmonies that are called forth by the singers and musicians of the court of Vikramaditya. Of the nine gems * of this court one was a musician. Every Hindu King before and since has always had a court minstrel. And from now we find that this art though essentially religious and still retaining much of its deeply sacred character (for is not love sacred ?) has taken for its object, at least in part, to please and to amuse. Lighter music, comedy, and chorus now make their appearance. It is very probable that foreign' influences have begun to come into play at this point of its history.

It is declared by competent critics that the five centuries beginning from the 5th century and ending with the 12th were the golden age of Hindu Music. I have not been able to find the original authorities on which this opinion is based. Tradition has ascribed the palm of perfection to Narada, Tambura (the originator of Tambura and Tamburi—Tumri, Huhu and Bharat. † When these semidivine singers flourished I have no means of ascertaining. The probabilities, however, are that they are much older than the Christian or even Budhistic era.

At any rate leaving aside tradition for a moment it seems to me that the general principle holds good in Hindu history that the periods of great achievments in the various forms of art are usually synchronous. And if the art of dramatic composition was at its perfection (as it is now generally accepted) in the first century before or after Christ it seems probable that music too must have attained to a high degree of perfection at about the same time.

It is often said and not without good reason that the development of Indian art received a great check during

* ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য ॥

† Other names are Sumeshwar, Hanooman, Coolnath, Ravan and Arjun.

Mahomedan ascendency.* The proposition, however, requires to be qualified. It is true that the Pathan conquerors were generally averse to idolatry in all its forms. And music and even painting came in for a large share of discouragement in the 13th, 14th and, 15th centuries. But for sometime during the Khiliji rule there continued to flourish excellent musicians. Gopal Nayak for example was contemporary of Sultan Alauddin and Amir Khusro. And the Moghuls themselves, I think, had some elements of poetic and artistic appreciation in them. This sense, inklings of which we find even in the adventurous Tamerlane and Babar developed into a passion in Akbar and Shahjehan.

One of the nine gems (Navaratna) of the court of Akbar was Tansen the the greatest and the best known of modern singers. Tansen's name indeed has become proverbial for perfection in this art. And yet it is said that when one day Akbar asked Tansen if there was a better singer alive Tansen named Baju Bawara and Haridas. Lover of art as he was, Akbar wanted those celebrities to be brought to his court forthwith; but was respectfully told by the court musician that the Bawara being the aknowledged Emperor of the realm of song would not condescend to come to the court of even the great Akbar, and might perhaps decline to sing to an earthly king. As the thirsty must go to the fountain so too the seeker after true art must himself go to the Master and that in a spirit of humility and receptiveness. It is related that on two different occasions Akbar the Emperor went incognito as an instrument-bearer with Tansen to listen to the ravishing songs sung to the accompaniment of their own instruments by these masters.

Devotional songs of a popular order found currency in the whole of India during these two centuries viz. 15th and 16th centuries due to the religious awakening, brought about by Guru Nanak, Cobir, Chaitanya and Miranbai.

Even more interesting in a sense than Akbar's may be said to have been the period of Oudh, particularly of Nawab Wajid Ali Shah of Lucknow. It was a period of decadence of art of every kind. Classic music was a thing of the past no doubt. But new forms and tunes-perhaps vulgar airs—had already caught the fancy of the fast disappearing aristrocracy of the upper India. But two noticeable features seem to me to have made their appearance in this period. The first of these was the attempt at utilizing orthodox Hindu forms of Ragas and Raginis *e. g.* Thumries and Hories (=Holees) to serve as vehicles of expression of purely Islamic sentiment and passion such for example as the desire to see Mecca, Medina, or the Prophet &c. And the second was the introduction of new

* *Vide* Anand Coomarswami—Essays and Captain A. Willard—Music of the Hindus.

tunes and airs which have become recognised forms of singing. These are Khayals and Qovowlis—and Ghazals.

Whatever our views may be, however, as to the chronology and cause of its development, there can be no doubt whatever that our system of music has a long history of growth behind it. It would be strange indeed if one form of artistic development in a country should be absolutely stunted and dwarfed while others are gigantic and vigorous. A people capable of producing a drama like Sakuntala,—the admiration of a Goethe or a Philosophy like Purva Mimansa, the despair of a Kant—or the paintings of Ajanta or *bas relief* of Barhut must needs be seemingly lacking in native talent if they had no music to be placed by the side of Gounod and Mendlessohn. For it is my settled conviction and the verdict of the best critics, that Art is all one, it is its different modes of expression that are named sculpture, painting, music, and poetry.

What is said of poetry is doubly true of Music that it is a mode of expression of the permanent elements of human nature or of that deep-seated emotion which is the very soul of humanity, nay, it awakens a consciousness of our kinship with Nature. There is what is known as sympathy in sounds. Play upon any musical instrument—a Sitar, a Vina for example and another instrument if attuned to the same notes will play of its own accord. There are echoes evoked on the banks of lakes and rivers or in mountain valleys. It is not mere idle metaphor when we say the wind sighs or the rippling rivulet murmurs or the torrent roars and so on. The man who has attuned his ears to the voices of the elements hears sermons in stones reads books in the murmuring brooks and finds joy in everything. It requires but a little more stretching of the imagination beyond Wordsworth and Shelley and we begin to hear with the Greek and Indian mystics the music of the Spheres.

It was with something like this sense of the sublime and beautiful in nature that the Hindus conceived of music. No orthodox Hindu would commence singing or strike a note on his Vina without bowing low in thought and utterance before the Sada Siva—the personification of Song. I have not been to the cave of Amarnath but having read the illuminating descriptions of it by the Rev. Mr. Andrews, I can picture to myself the awe-inspiring mountain scenery that would be, I am sure, a fitting inspirer of Bhairab Rag. Bur that is not all. It is at best but a material counterpart of the music which we hear around us. The Soul of art lies behind the sensuous,—it is in the idea. It is there that Truth and Beauty, which, as Keats says, are one are to be sought. Not divorced from the objects of sense nor absolutely opposed to them but certainly not

limited and circumscribed by them. "Look into thine own heart and write" exclaimed a poet in a moment of inspiration and henceforth he wrote true poetry. So, too, with regard to good music. It is not the slavish imitation of sounds outside us. It comes from within—from the Nabhi as Hindus would say. It labours to find expression and this must be through some convention. And elaborate and complex are the webs of conventions which human ingenuity in the course of ages has spun to materialize this ethereal beauty. It seems to me however that even as the Dipak Rag bursts into flame, the spirit of true music often burns away as tissue paper all these conventions and reasserts its universal nature.

In order to form a clear conception of the Hindu system of music with any degree of adequacy one must be prepared to wade through a mass of conventions —a task which is as much beyond my powers (for I am not at all versed in the art) as it would be tedious to you. And this is one of the principal reasons why it has not been often appreciated at its true worth by foreigners. The fine arts like the customs, traditions, habits and even laws of a nation are intimately associated with the peculiarities of the particular people. And herein lies their peculiar strength and vitality. It is idle to decry these idiosyncracies and conventions. If we are to understand a people's art we must accept their conventions too or else give up the idea. To give an example. In order properly to enjoy Charles Gounod's *Nazareth* or *Faust* we must not only be familiar with the forms and meaning of rhythm and harmony which it has taken Europe a couple of centuries to develop but we must be conversant with the history of Jesus Christ and the legend of Dr. Faust and yet however much we may say we enjoy them (as I believe I did while in England) it is difficult to be persuaded that either of these masterpieces could evoke exactly all those sentiments in an Indian heart which they do in a European's. And why? Because to the common people here in India Christmas means little beyond a Baradin on which Sahibs receive Christmas cards or Dalis. It is devoid of those merry associations which a European Christian, particularly an Englishman has learnt to cherish in connection with that festival as celebrating the birth of Christ. So, too, Dr. Faust's name scarcely visualizes to us those incidents in the story which have become part of the European boy's mental equipment. To us however Hories and *Malars* are instinct with meaning and suggestion which fall flat on any but an Indian. The Phag of Brij with Krishna as the moon and Gopies as the stars fills our poetical and musical firmament. So deeprooted is the sentiment that when under the Mahomedan regime music had a recrudescence those

indigenous forms of *Horis* and Thumries were freely employed as vehicles to convey even orthodox Islamic passion.

The basic principles of the science and art of Hindu music are the following :—

*Nad* or Sound is eternal and everlasting and co-existent with the Supreme Brahma; it is of two kinds. The *Anhad Nad* which is beyond human imitation and is sometimes spoken of as Surt and the *Ahad Nad* —the physical sound, which latter is sub-divided into three. *

(i) Vina Sambhav nad = sound produced by stringed instruments.

(ii) Vinad Sambhav Nad—wind instruments.

iii) Kaya Sambhav Nad—Vocal sounds. This last is again subdivided into,

A. Anbad 1. Alap 2. Tarana 3. Tirwet 4. Sargam.

B. Nabad 1. Dhurpad 2. Vishnupad 3. Tamburi 4. Rag Mala 5. Khayal 6. Toppa 7. Ghazal 8, Kawanli.

The gamut or Sargon which is believed to have been the discovery of the of the Hindus, consists of seven principal or pure notes which are called

1 2 3 4
Khairaj-Likhab-Gandhar-Maddham-
briefly called
সা রি গা মা
5 6 7
Pancham-Dhamist-Nishad.
পা ধা নী

These notes have a proportion which in modern scientific terminology may be called the vibration frequency proportion of

| সা | রি | গা | মা | পা | ধা | নী | সা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 48 |

and correspond exactly to the

| Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| or C | D | E | F | G | A | B | C. |

of the Modern European scale.

In fact the European scale has been taken bodily from the east-whether from India or China, it is not certain.

Now between these principal notes there are intermediate notes inserted. The intervals between them are called Shrutis—and correspond to the so-called intervals of semi-tones or Quarter tones of European Music. The number of these shrutis varies—the orthodox number is 22 but it is sometimes increased to as many as 25.

The twenty two are thus distributed.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | between | সা | and | রি |
| 2 | „ | রি | and | গা |
| 4 | „ | গা | and | মা |
| 4 | „ | মা | and | পা |
| 3 | „ | পা | and | ধা |
| 2 | „ | ধা | and | নী |
| 4 | „ | নী | and | সা |
| 22 | | | | |

* Another classification of instruments is (1) Tat=stringed instrument e. g., Vina (2) Bitat=Skin instruments e. g., Mridang, (3) Ghazal=instruments of percussion e. g., 'hanjh and (4) Sooghar=wind instruments e.g., Bansari.

It was believed that if the octave were divided into 22 roughly equal parts all the notes in use could be obtained. They called these small intervals "*Shrutis*" but this also varies with different schools.

All songs are composed in one or other of the *Ragas*. Raga is more than a tune or air. "The name of the Raga connotes a scale bearing a fixed relation ship to the drone with its harmonic structure determined by a Vadi and Samvadi, a chief note occurring more frequently than others, a lower limit and occasionally a upper limit also; certain characteristic turns of melody recurring with frequency, certain rules regarding the employment of embellishments, and a stated time of the day for its performance." *

Briefly put, a Raga may be styled a melody-type or a melodic extension of certain notes of a particular scale or mode according to certain fixed rules." Raga literally means a passion or affection of the mind. According to Bharat's definition of it, each Raga or mode or melody-type was intended to move one or other of our simple or mixed affections.

It is this division of music into Ragas that makes it so very difficult of comprehension to a beginner and westerner, who is apt to suppose Indian music as highly artificial, rigid and monotonous.

* Clement's Introduction to the study of Indian Music.

But the charge is of the same order as applied to the Sanskrit language which on account of its highly inflectional character offers great obstacles to English speaking races whose language is idiomatic—The Ragas do not make the system rigid any more than grammar does a language. Although the principal Ragas are six, they are divided into 36 Raginis and eight times the number of further Sub-divisions metaphorically called the sons (putras) and Bharyas of the Ragas etc. So the number of Ragas and Raginis becomes exceedingly large.

Nor does the division into Ragas, make the music monotonous. "It is a common practice, after singing an air in a Raga to improvise a series of free fantasia passages, each returning in due course to a characteristic snatch of the melody only to wander off again in still more elaborate variations." This gives as great a variety as is desirable to the performance. It is true that "the whole performance must be within the Raga, that is without transgression of the elaborate rules governing its structure"—and in this pecularity differs in a marked degree from the European music where no such limitations are observed. But it must not be forgotten that to an ear trained under the Indian system much of European music—even good classical music—strikes as hopeless medley—as their own composition styled the Maniac, does to them.

It would take me far a-field if I were to attempt to give even the bare outline

of how Ragas are framed. Suffice it to say that there are several modes of classification employed. First and foremost they classify Raga according to the *Surs* employed. *Badi sur* is the principal or chief note that is dominant; *Sambadi Sur* is the next most dominant which accompanies and thus distinguishes the Badi sur—*Annabadi Sur*—the note which occurs in but does not dominate a particular Raga—*Bibadi Sur* is the note which does not and must not occur in a given Raga.

Thus Ragas may be classified according as to which notes do or do not occur in them and occurring, which are dominant and sub-dominant. *Bhairav* Rag, for instance has the following :—

Dha, Ni, Sa, Re, Re, Sa, Re, Resa, Ma, Ma, Ga, Ga, Re, Re, Re, Ga, Ga, Ga, Ma, Ga, Re, 'Re, Re, Sa, Sa, Sa.

*Antara*—Pa, Pa, Pa, Dha, Dha, Dha, Sasa, Dha, Ni, Sa, Re, Re, Sa, Re, Re, Sa, Ni, Dha, Pa, Ma, Ga, Ga, Re, Sa, Ni, Dha. Pa, Ma, Ga, Re, Re, Re, Sa, Sa, Sa.

According to this classification there are 6 principal Ragas and 6 Raginis under each.

A second mode of classification is the number of notes employed in a particular Raga.

This gives only 3 divisions :—Odav—in which there are five. Khadav in which there are 6 notes. Sampuran in which there are all the seven notes employed.

There is yet another mode of classification and that is according to the school to which a Raga belongs. *Marag* is the classical music which owes its origin to the masters, *eg.* Narad, Bharat.

*Desi*—Local or provincial *e.g. Punjabi Tappas, Pahari, Multani.*

There may be several other classifications suggested such as those according to the time of the day or the year or the dominant passions which they appeal to.

I shall however say a few words on the *Dhyan* of the various Ragas—what are they? Every classical Raga or Ragini has a picture attached to it. And I have seen some splendid specimens of them in S. M Tagore's book as also in some Museums here and abroad. I have also noticed not only Europeans but also our own Indian young men, educated young men—laugh these to scorn. What possible connection, say they, can there be between a piece of music and a picture—how can sound be converted into sight? some critics have characterised them as merely arbitrary and fanciful; others supposed the Ragas as associated with the seasons in order to preserve the tunes or save them from being forgotten. The true answer, however is to be found I think in the simple English word Imagination or the orthodox word Dhyan—which as is well known "bodies forth the forms of things unknown and gives to, airy nothing a local habitation and a name."

Why was the musical composition styled as the Maniac? Did not the

author and after him the whole European world see the ravings of a mad man in the peculiar rises and falls of the musical notes in the superb composition? So, too, if you only allow yourself to feel as the author felt the notes and cadences which found vent in what is known as Bhairavi Ragini it is not at all unlikely that you might feel as if you were transported to a distant mountain, where before a temple of Shivaji a charming young maiden in saffron Sari, Vina in hand is offering a hymn to her Isht-Deva.

Bhairavi Ragini symbolises devotion and harmonises so well with our mood at early dawn that in the code of musical ethics it would be rank heresy to sing it at any other time of the day or for any other purpose.

Dryden in his, remarkable poem styled Alexander's Feast, beautifully describes the varying moods into which Timotheus—the musician—worked Alexander the world's conqueror by sheer force of music. Could the musician or the singer influence or hypnotise his listener unless he himself were carried away by the force of his compassion or visualised his images more vividly than the listener? It seems to me that these ancient Indian masters must have discovered or invented these Ragas while they had been in or when they had worked themselves into the passions representing them—perhaps it would be more correct to say that where a trained singer found or put himself or herself in an inspiring environment, the spontaneous expression in song, received the indelible marks and impress of the whole situation and by frequent repetition became too intimately associated with it to suggest any but the same feelings and sentiments :—Sir William Jones says "The Hindu System of music has, I believe, been formed on truer principles than our own; and all the skill of the native composers is directed to the great object of their art; the natural expression of strong passions."

* The great part of the effect of Indian vocal music, depends on the peculiar manner and the skill with which the Singer dwells on certaian notes, which are varied and trilled—'vibrating like a bird above the water before it pounces upon its prey" but not to the extent of a semi-tone above or below the main note. The same effect Gomak is produced in stringed instruments by the tension of the string by deflection; such effects, so intimately dependent on the degree and manner of their expression upon the musician's individual moods and powers cannot be written down and so it is that an Indian air set down upon the staff and pricked out note by note on a piano or harmonium becomes the most thin and jejune sort of music that can be imagined, and many have abandoned in despair

* Anand Coomar Swami's Essays in National Idealism pp. 1172-3.

all such attempt at record. The music moreover is so personal, and so capable of variation according to the singer's mood that no record can quite adequately interpret it. The same singer may vary his own rendering from verse to verse, and improvise upon the main theme according to his mood or environment.

As compared with modern European, Indian music has little of what is technically called 'Harmony' beyond the continuous 'Drone' accompaniment. But, it is rich in melody and in the words of Dr. Burney "notwithstanding the dependence of melody upon harmony and the sensible influence which the latter *may* exert upon the former; we must not however, from thence conclude with some celebrated musicians, that the effects of harmony are preferable to those of melody.' Experience proves the contrary."

No description or criticism of Indian Music would be complete without a reference to that class of professional singers and dancers who go by the name of Nautch girls and as such carry the stigma of ill repute with them. That there are and have been notable exceptions among them in the persons who are or were passionate devotees of the art, cannot be denied. Nor is there any doubt that at one time they dedicated themselves to the temples not in mere name as they sometimes now a days do but even as Miranbai did—in true spirit of devotion and loyalty to the Art. Nevertheless true it is that for centuries past Indian society has condemned wholesale this class of artists. And the result is that with them the art itself has become degraded. Indians have thus to thank themselves for having become more or less devoid of taste and talent in this fine art, because they first drove it away from their own houses and temples to find refuge in a limited class of professionals in the street, and then outcasted those monopolists. Saraswati revenged herself by laying a curse on her calumniators.

A story is told of an Indian fanatical monarch * who in a moment of puritanic zeal made up his mind that he would purge society of this unworthy class that combined the heretical art of song with impure practices. It is said that in consultation with his favourite minister he hit upon a novel plan of doing way with these unfortunates Orders went forth that His Majesty would hold a Jashan at night on the river—and that all the Nautch girls without exception would be rewarded —provided they came in boats richly attired and adorned. At the appointed evening hour the river presented a brave show. Amidst fairy lights and fire works pretty little boats with their fair contents flitted about coquettishly like fireflies, while the gorgeous gondola of the Emperor floated gaily up and down the river. Music and perfume filled the

* Was it Aurangzeb?

atmosphere and the surface of the water reflected an infinity of light and colour. Presently a whisper went round from boat to boat that curdled the blood in the veins of the merry company. At midnight all the boats were to be overturned and the fair occupants drowned one and all! The order was believed to be no other than the monarch's own—and who but God or the Prophet could cancel it? A hurried consultation took place amongst the would-be victims. A charming young girl, the most bewitching of them in point of voice and appearance, rose and took it upon herself to advocate the forlorn cause. Dressed in snow—white costume and decked in ornaments of sweet smelling flowers, gajras of Jasmine buds, Hars of Motia—and Budhdhi's of Raibel—she bade her boat ply next to the Emperor's and sang that song of Hafiz which contains the pathetic verse (Dar kove neknami mara guzar nadadand—Gar to namé pasandi taghyir kun kazara).

(In the street of good report we have not been permitted access. If thou dost not like it better alter the decrees of fate). Her graceful swanlike form had come as a fairy vision. Now her voice instinct with pathos and emotion born of a forlorn hope, caught something of the fire of Orpheus or the glow of the Gandharvas—and went straight to melt the heart of the iron—willed monarch. The cruel order was forth with cancelled.

The class survives to this day. But how long would it take yet to drag it out of the degradation into which it has sunk?

It need hardly be greatly emphasised that our music is bound up in a hundred different ways with our national culture. It is through this that we were lulled to sleep in our infancy by our mothers; it is in this that we had our boyish games. When we are married our women folk sing Ghori, Bannas, Kamins, Tonas. When the girls leave their parents to go to their husband's, pathetic songs (Suhag) are sung—On all the festive occasions music is played, songs sung. Hindu prayers most of them are in the forms of hymns—How can we throw all this aside? We could not, even if we would. Then turn your ears to the humble, the lowly, the the labourers and the peasants. They have their harvest songs and their love songs—simple and dircet—that have very little of the elaborate art of classical music. "Oh why hast thou forsaken me? Why hast thou turned away thy attention from me? On the high pipul trees swings have been thrown—Sakhis (Ping) have all come together—to enjoy themselves with swings—But Oh! Do thou but give me a swing before going away.

Keri galin chit cha laya
Uchi uchi piplin pingan payan
Ral mil sakhiyan jhootan aiyan
Ik jhoota dejain wi kadira"

Take another Punjabi lyric or two rendered into verse by my friend Mr. Usborne:—

## A ROSE SONG.

The East wind stirs the trees,
The leaves in the sunshine quiver ;
Spring sparkles on the river ;
Blown by the breezes, all
The leaves are flying—flying
And scattered as they fall
The flowers are dying—dying.

The lonely cloud retreats,
Behind the hills and hollows,
Birds seek their leafy seats,
And homeward fly the swallows.

All these have their homes, but I
Have naught that I can cling to,
No breast where I can fly
No Queen that I can sing to,

So here I'll lie all day
Till her secret the moon discloses.
While I drink red wine as I play
And sing to the Fragrant Roses.

## THE RAVI RIVER

Come back to me, Beloved, for love is better far
Than all the gold of Kabul or the wealth of Kandahar ;
Can't you hear the cranes a-calling? Can't you hear the grey geese soar
As they wing their way through cloudland towards the white roofs of Lahore?
Oh ! that quaint old stone-carved door
And the inlaid marble floor,
The minarets of Shahdara and the temples of Lahore?

Have pity on me, dearest, as all forlorn I lie
Oh, turn your bridle towards me, beloved, or I die.
Oh come back to where the Bela grass waves all along the shore
Of the lazy Ravi River out to westwards of Lahore.
Oh, come sit with me once more
As we used to sit before
By the banks of Ravi River as it ripples past Lahore.

Come, leave your Persian merchandise, your shawls from Samarkand
For your own-true love is calling, and you will not understand.
Oh, you leave your strings of Camels, and come back to Lahore
Where the Parrots scream at day time and at night the jackals roar
Where the green-tailed parrots scream,
Through the branches of the Nim
And the saucy squirrels scamper through the gardens of Lahore.

These are the untutored outpourings of genuine feeling with as little of studied art as are the sweet sings of Koel and More in the jungles or of Bulbul in the garden. For my part I am often tempted to give them the preference over some of so-called best classical songs.

Not the least popular are the songs of the wandering minstrels—also very simple—played on Iktara and Khartala or of the Snake charmers sung to the tune of the Bin and Kharons. The former command a great deal of popularity and are justly regarded as carrying down the traditions of the past. These songs mostly circle round Ram and Krishna.

Instances of the opening lines of these minstrel songs may be given :—

In the town of Ayodha, and in the house of Jasrath, Ram Chandra took incarnation :—

Puri Ayodhia Yasrath ghar men Ram chandra autar liya.

Whose boys are in the company of the Muni (Vishwamitra)?—boys whose eyes are red as blood and fire.

Mooni sang Balak Kaki Ratnar nainar jaki.

—In the palace of (my) mind, and in the street of love—does abide the prince of the Yadavas (i.e. Sri-Krishna).

Man Ko Mahal preet Kunj ta men jadorai.

But in the words of Anand Coomar Swamy "there is a music which comes once or twice only to you, and which it is vain to seek. The very greatest of Indian musicians are not professionals but wandering holy men, players of the Tans, or Sarangi or Vina, or Singere. Some evening in a northern town such an one passes by your door. You press him eagerly to lodge with you, if he

will to play for you; and he consents. You invite a few friends and seated on the floor in an upper room prepare to listen. A brass lamp burns by your side and all is still. The player chooses a simple theme. "These many days I have not seen thee." He sings and plays and varies infinitely the expression of this one idea. He becomes almost a part of his instrument and it and the sound are one. You lose consciousnses of things external and forget to trim the wick which burns dimly and more dimly still. As he plays on, "these many days I have not seen thee" this passionate cry materialises before your eyes as a dancing figure, it may be as the Lord Krishna himself, it may be as Radha, it may be in the form of one beloved on earth, whomsoever your thoughts are set on and to whom your love is given. You forget all else and see only this rhythmic sweet appearance. At last the player ceases, leaving you silent and breathless and the vision is gone like a dream. What did you see, you ask of one another and you find that each saw before him his own thought the one he loved best and for whom in his heart was lamentation made—"These many days I have not seen thee."

That this description given by an illustrious art critic of India is not imaginary will be borne out by instances within the memory of many of you. I can cull one from my own experience. At a *Jalsa* where a renowned singing party were giving a musical entertainment, there came up by chance a Sadhu a wandering ascetic—who at once attracted the attention of the company by his intelligent remarks as to the merits of the performance. Before long he was overwhelmed with requests to give a specimen of his singing. Reluctant at first he yielded to entreaties which came from every quarter. He had about him an iron Chimta (pair of tongs) in which were dangling a number of rings of sizes. He wore a pair of Kharaons (wooden sandals). Holding the Chimta a little inclined to the vertical in his left hand he jingled the rings up and down it by the fingers of the right hand, and thus struck a tune which excited the admiration of all, including the professional musicians. Presently he sprang to his feet and tucking up his meagre Dhoti he began to dance—his Kharaons keeping time wonderfully true. And just when the whole party were breathlessly lost in the tune and dance he started singing—the following lines from Kabir:—

Even as the moon is—so art thou O' my Beloved—in a dark night. And like unto the clouds and dust storms. are my prejudices and passions that shut out thy glorious vision from my sight—when however, I let loose the rain of prayer and emotion, the storm is subsided—the clouds disperse and lo! Thou emergest clear and bright from behind them and fillst my tear-washed eyes.

It is many years since I heard the Sadhu. But the whole scene and the song are as fresh as if they were of yesterday. "These echoes roll from Soul to Soul and grow for ever and for ever."

KUNWAR SEIN.

# ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৫ম খণ্ড। ঢাকা—বৈশাখ, ১৩২২ সাল। ১ম সংখ্যা।

## হিমালয় প্রদেশ।

### প্রথম অধ্যায়।

( যাইবার পথ,—কাশ্মীর,—শিম্‌লা,—শিবালিক,—হরিদ্বার )।

**পামির**—ভূমণ্ডলের প্রাকৃতিক দৃশ্যব্যঞ্জক ভূগোলক বা ভূমণ্ডলের মানচিত্রের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। ঐ দেখ, ধরিত্রীর বক্ষঃস্থলে চূর্ণকুণ্ডলবৎ নিবিড়বনরাজিপরিবৃতা শুভ্রকিরীটমণ্ডিতা ভারতের সীমন্তে সিন্দুরবিন্দুবৎ একটি ক্ষুদ্র মালভূমি,—নাম 'পামির'। তথা হইতে বিশাল শৈলশ্রেণী ত্রিধাবিভক্ত হইয়া, সসাগরা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। দেখিয়া বোধ হয় যেন ভারত মাতা তিন দিকে বিশাল বাহু প্রসারিত করিয়া দূরদূরান্তরের দেশ মহাদেশ সকলকে আপন বক্ষে টানিয়া লইতেছে।

**ভুমণ্ডলের প্রধান প্রধান পর্ব্বত শ্রেণীর সহিত হিমালয়ের সম্বন্ধ**—পশ্চিমাভিমুখে এসিয়া খণ্ডের আফ্‌গানিস্থান, পারস্য, তুর্কিস্থান্, এসিয়ামাইনর ও তথা হইতে কৃষ্ণসাগর পার হইয়া, ইউরোপখণ্ডের ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন্ ও পর্ত্তুগলের উপর দিয়া, একবাহু অতলান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। অপর বাহু উত্তরাভিমুখে এসিয়াখণ্ডের তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, ও রুষিয়া এবং তথা হইতে বেরিং প্রণালী পার হইয়া, উভয় আমেরিকার পশ্চিমোপকূল বহিয়া প্রশান্ত ও অতলান্ত মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে জলধিগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এবং তৃতীয় বাহু পূর্ব্বাভিমুখে ব্রহ্মদেশের স্কন্ধ ও চীনের কটিদেশ আবরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে অদৃশ্য হইয়াছে। এই শেষোক্ত বাহুর নাম হিমালয়। কে জানে, এমন একদিন আসিবে না, যেদিন প্রাচীন ভূমধ্যসাগরের ন্যায় এই সমস্ত সাগরবক্ষ উত্তোলিত হইয়া, সাগর গর্ভে নিমজ্জিত এই সকল শৈলবাহু হিমাচলের মত বিশালদেহ ধরিত্রী-বক্ষে বিরাজ করিবে? ভারতের উত্তর, পূর্ব্ব এবং পশ্চিমেরও কিয়দংশ ব্যাপিয়া এই হিমালয় শ্রেণী দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকাররূপে বিদ্যমান। পুরাণাদিতে হিমাচল ও তৎসন্নিহিত কৈলাসপর্ব্বত দেবাদিদেব মহাদেব ও

গন্ধর্ব্বকিন্নরগণের লীলাচল বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ মহাদেবের ন্যায় মহাযোগীর পক্ষে হিমালয় যে প্রশস্ত তপোবন, তাহাতে সন্দেহ কি? এবং আজও যে কত সহস্র সহস্র উর্দ্ধবাহু যোগীপুরুষ হিমালয়ের নিভৃত কক্ষে যোগাসনে বসিয়া, ধ্যানাস্তিমিতনয়নে ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত, তাহা কে বলিতে পারে?

খাইবার পথ—হিমালয়ের এই দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া পরপারে যাতায়াতের পথ অতি অল্পই বিদ্যমান। পশ্চিমোত্তর কোণে 'গোমল', 'টচি', 'কুরাম', ও 'খাইবার', নামে যে চারিটি সঙ্কীর্ণ পথ বিদ্যমান, তন্মধ্যে খাইবার পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ত্রিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যসন্তানগণ ইরাণ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া, এইপথে ভারতে প্রবেশ করিয়া, আর্য্যাবর্ত্তে বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন। গ্রীকবীর সেকেন্দর গ্রীকবাহিনী সঙ্গে করিয়া, এই পথেই ভারতে আসিয়া, সিন্ধুনদের পারে মহারাজ পুরুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর 'হূণ', 'পাঠান' 'মোগল' প্রভৃতি আততায়িগণ সকলেই এই পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গ্রীসীয়দিগের এই পথে ভারতে যাতায়াতের দুই একটি নিদর্শন অদ্যাপি এই প্রদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। এদেশের 'হেকিমী' চিকিৎসা প্রণালী গ্রীসীয় চিকিৎসা প্রণালীরই রূপান্তর মাত্র। গ্রীক আততায়িগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা অদ্যাপি এ প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরীস্থিত প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তির সহিত অবিকল একভাবাপন্ন বহুসংখ্যক প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি আজও এই প্রদেশে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত দৃষ্ট হয়।

আফ্রিদিজাতি—বলা বহুল্য যে, গিরিবর্ত্ম মাত্রই অতি ভীষণ ও দুর্গম। খাইবার পথও তদ্রূপ। একটি সঙ্কীর্ণ গভীর খাতের মধ্য দিয়া পথ,—উভয় পার্শ্বে তুঙ্গ দণ্ডবৎ পর্ব্বতশ্রেণী। সুতরাং পদেপদেই পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতগাত্র হইতে স্খলিত প্রস্তর চাপে পথরুদ্ধ ও বিপজ্জনক হইবার সম্ভাবনা। তদুপরি, পথিপার্শ্বে অসভ্য দুর্দ্দান্ত আফ্রিদি জাতির বাস। আফ্রিদিরা অতি ভীষণ ও ক্রূর প্রকৃতি। অকারণেই লোকের সঙ্গে কলহ করিতে তৎপর; অসহায় পথিক পাইলে, এবং অর্থাদি সামান্য প্রলোভনের কারণ থাকিলে তো কথাই নাই।

এই স্বনামখ্যাত ভীষণ ও দুর্গম গিরিবর্ত্ম অধুনা ভারতগবর্ণমেণ্টের যত্নে সুরক্ষিত। গবর্ণমেণ্ট আফ্রিদি জাতির সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, ভারতের রাজকোষ হইতে উহাদিগকে বার্ষিক কিছু কিছু সাহায্য করা হইবেক; এবং উহারা সপ্তাহে দুই দিন আপন সৈন্য দিয়া পথে পাহাড়া দিবে। ফলে, মঙ্গলবার ও শুক্রবার খাইবার পথ দিয়া গমনাগমন সম্পূর্ণ নিরাপদ। অন্য দিনে পথিককে অতি সন্তর্পণে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয়।

আফ্রিদিদিগের মধ্যে 'জাক্কাখেল্' সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ নিষ্ঠুর প্রকৃতি। জাক্কাখেল্ রমণীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, সে উহাকে গবাক্ষে কিম্বা প্রাচীরস্থিত কোটরে রজ্জু সংযোগে আলম্বিত করিয়া, "তুই চোর হ" "তুই তস্কর হ", বলিয়া আশীস্ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। এবং বলা বাহুল্য যে, জননীর এই শুভাশীর্ব্বাদের ফলে, সন্তান চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়াই জীবনপাত করিয়া থাকে।

কাশ্মীর—খাইবার পথ হইতে উত্তরপূর্ব্বদিকে পামির মালভূমির ঠিক দক্ষিণে প্রকৃতির রমণীয় উদ্যান—কাশ্মীর! সুমহান্ মাটুস্তাগ্ পর্ব্বতশ্রেণীর দুইশত মাইল পরিমিত শিখরদেশ ব্যাপিয়া কাশ্মীর রাজ্য অবস্থিত। এই বিস্তৃত রাজ্যের পশ্চিমে 'হিন্দুকুশ' পূর্ব্বে 'কেরাকোরম', উত্তরে 'আলতাই', ও দক্ষিণে হিমালয় শ্রেণী এবং উত্তরপূর্ব্বকোণে 'আলতাই' ও 'কেরাকোরমের' সন্ধিস্থলে ভীমকায় 'গড্উইন্ অষ্টেন' 'গাসারবরণ' ও 'রাকাপুসি' শৃঙ্গ; শ্রীনগরের উত্তরে নঙ্গপর্ব্বত, ও উলার হ্রদের স্বচ্ছ সুনীল বক্ষে প্রতিফলিত 'হরমুখ' পর্ব্বত; এবং দক্ষিণে 'পীরপাঞ্জাল' পর্ব্বতশ্রেণী প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তিতে বিরাজমান। দেখিয়া বোধ হয় যেন, এই সকল বিশাল পর্ব্বত ও মাঝে মাঝে অভ্রভেদী শৃঙ্গসকল কাশ্মীরের চারিদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও ভীমকায় প্রহরীরূপে অবস্থান করিতেছে।

মানস সরোবরের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া,

কাশ্মীরের উত্তর ও পশ্চিমদিক দিয়া সিন্ধুনদ প্রবাহিত। কোথাও কুলুকুলু নাদে মৃদুমন্দগতিতে কঙ্করাস্তীর্ণ অগভীর পার্ব্বত্য পথে, কোথাও বা ভীম কল্লোলে প্রচণ্ডবেগে নিবিড়বনাবৃত অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীর খাতে আবর্ত্তন করিতে করিতে, সিন্ধু ত্বরিতগমনে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। আর কাশ্মীরের বক্ষোনিঃসৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ হইতে ক্ষীরধারাগ্রহণে শতদ্রু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদী পরিপূর্ণযৌবনা হইয়া, উন্মুক্ত পথে লীলামন্থরগমনে, এবং বনপথে আকুলি বিকুলি করিয়া, অবশেষে ত্বরিত গমনে আবেগভরে সিন্ধুনদে আলিঙ্গন করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। বস্তুতঃ প্রকৃতি যেন হিমালয়-প্রাচীরের বহির্ভাগে মানস সরোবর হইতে উত্তর ও পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র, এবং উত্তর ও পশ্চিমদিকে সিন্ধুনদরূপ বিশাল গভীর পরিখা খনন করিয়া, দেবনিকেতন ভারত ভূমিকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

শৈলপ্রাকার বেষ্টিত কাশ্মীরের এই বিশাল বক্ষঃ একটি উচ্চ সমভূমির ন্যায় সমতল ভাবে বিস্তৃত,—মালভূমির ন্যায় বন্ধুর নহে। স্থানটি এত উচ্চে অবস্থিত যে, অপেক্ষাকৃত নিম্ন অক্ষাংশে স্থিত হইলেও, ইহার জলবায়ু অনেকাংশে ইংলণ্ডের জলবায়ুর সমতুল। ভারতের অন্য কুত্রাপি এতাদৃশ মনোহর জলবায়ু বিদ্যমান নাই। ফলতঃ যদি ভারতবর্ষে কুত্রাপি অতঃপর কোন শ্বেতোপনিবেশ স্থাপিত হয়, তবে তাহা এই মন্দার-পারিজাত-শোভিত কামদুঘা স্রোতস্বতী সমাকুল কাশ্মীর প্রদেশেই প্রতিষ্ঠিত হইবেক।* ভারতের অন্যান্যপ্রদেশবাসিগণ যখন নিদাঘের উৎকট তপনতাপে প্রপীড়িত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, কাশ্মীরবাসিগণ তখনও ইংলণ্ডের ন্যায় সুশীতল সমীরণ সেবনে দৈহিক ক্লান্তি অপনোদন করিয়া সুখে বিচরণ করে। কাশ্মীরের বর্দ্ধিতাংশ গিল্‌গিট্, ও চিত্রল ব্যতীত, সিমলা, নৈনিতাল, দারজিলিঙ্ প্রভৃতি হিমালয় প্রদেশের অপরাপর শৈলনিবাস কাশ্মীর হইতে অনেক নিম্নাংশে অবস্থিত। শীত ঋতুতে পৌষ মাঘ দুই মাস কাল মাত্র কাশ্মীরের অধিত্যকার সানুপ্রদেশ তুষারে আচ্ছন্ন থাকে। ফাল্গুনের শেষেই তুষার অদৃশ্য হইয়া যায়; এবং বসন্তাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এই রম্যকানন শ্যামল শষ্পাস্তীর্ণ, অজস্রনবকিশলয় ও নবোদ্গত পুষ্পসজ্জায় পরিশোভিত হইয়া, স্বর্গের নন্দনকাননরূপে বিরাজ করিতে থাকে। আহা! কাশ্মীরের তৎকালীন শোভা কিরূপ চিত্রিতবৎ মনোহর! চতুর্দ্দিকে চক্রবালাকারে দিগন্তবিস্তৃত তুঙ্গশৈলবলয়; তাহার উজ্জ্বলসৌরকরোদ্দীপ্ত শুভ্র তুষার মণ্ডিত প্রবণদেশ; এবং তন্নিম্নে পাদদেশে অধিত্যকাবক্ষে বায়ুভরে তরঙ্গায়িত ধান্য গোধুমযবসর্ষপাদি-ওষধি-সমাকীর্ণ স্নিগ্ধশ্যামল বিশাল প্রান্তর; এবং তুঁত অক্ষোট বাদাম প্রভৃতি বিটপীসমাকীর্ণ উদ্যানপরিবেষ্টিত স্তরে স্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী ও জনস্থান! "প্রভাতে মৃদুপবনহিল্লোলে ঈষদান্দোলিত বৃক্ষপত্রোপরি উদীয়মান সূর্য্যের কিরণসম্পাতে এক অপূর্ব্ব শোভার সঞ্চার হইয়া থাকে,—বোধহয় যেন, সুবর্ণমণ্ডিত বৃক্ষপত্রে আলোকরশ্মি নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে!" আর চতুর্দ্দিক হইতে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি আনন্দবিস্ফারিত নেত্রে নৃত্য দেখিয়া হাসিয়া কুটপাট হইতেছে!

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর বা 'সূর্য্যনগর' বিতস্তানদীতীরে এক বিচিত্র সহর। অব্যবহিত উত্তরে 'জাস্কর' ও দক্ষিণে 'পীরপাঞ্জাল' পর্ব্বতশ্রেণী প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তিতে বিরাজমান। প্রাকৃতিক শোভা, রচনাকৌশল ও অপূর্ব্ব দারুশিল্পে শ্রীনগর ভারতে অদ্বিতীয় স্থান। বিতস্তানদী শ্রীনগর ভেদ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ ও রাজপ্রাসাদের ভিত্তিমূল স্পর্শ করিয়া কুলুকুলুনাদে প্রবাহিত। অসংখ্য জলবর্ত্ম সহর ভেদ করিয়া ইতস্ততঃ বিস্তৃত; জলবর্ত্মের উভয়পার্শ্বে দ্বিতল, ত্রিতল ও বহুতল বিশিষ্ট শ্যামলতা-

* "The physiography of Kashmir in relation to the peninsula of India is economically most important in as much as the great reservoirs from which is drawn the water supply that fertilises the vast plains of the land of five rivers; * * Economically, again, the climatic conditions of the country are important; for it is here that the European colonisation is to succeed, if it succeeds anywhere in India. The English race has never yet taken root in India, but it seems possible that with more facilities for occupation Kashmir might become a white man's country" *Imperial Gazetteer of India*—vol 1. p 16.

জালে মণ্ডিত সারিসারি উচ্চ দারুময় সৌধশ্রেণী এরূপভাবে অবস্থিত যে, উহাকে 'এসিয়াটিক ভিনিস' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (১)

শিমলা—কাশ্মীর হইতে পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সম্মুখে শিপকীপুর; এবং এই শৈলস্তূপ ভেদ করিয়া তিব্বতে যাতায়াতের একটি পথ। এই পথিপার্শ্বে শিমলা নগরী অবস্থিত। স্মরণাতীত যুগ হইতে লোকে বাণিজ্যোপলক্ষে এই পথে ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে গমনাগমন করিয়া আসিতেছে। এবং সম্ভবতঃ এই কারণে শিমলা নগরীর অবস্থান ইহারই সন্নিধানে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। শিমলার কলেবর ও প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পথটিরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু বাণিজ্যবর্ত্মরূপে পথটি কোনকালেই তাদৃশ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে তেমন না হইলেও, ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান শাসনকর্ত্তার গ্রীষ্মাবাস বলিয়া শিমলা অতিশয় গৌরবশালিনী। বৈশাখের শেষ যখন ভারতের ভাগ্যবিধাতা প্রধান প্রধান অমাত্য ও রাজকর্ম্মচারী সহ সদলবলে এই শৈলাবাসে আগমন করেন, তখন শিমলা ভারতপ্রবাসী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের লীলাচলে পরিণত হইয়া, নূতন রাগে, নূতন সাজে, সজ্জিতা হইয়া এক মনোহর অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। এসময়ে প্রতিদিনই শিখরিণী সকলের পাদদেশে সংক্রমজাতীয় পাইন্-ফার-সিডার-প্রভৃতি-উচ্চতরুবলয়াবৃত শাদ্বল শৈলবক্ষে স্থানে স্থানে বিচিত্র রূপের হাট বসিয়া থাকে। এখানে একদল সৌখীন নরনারী, ওখানে একদল নিদাঘক্লিষ্ট কর্ম্মক্লান্ত আগন্তুক রাজকর্ম্মচারী স্নিগ্ধপাদপচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্ত। আর চতুর্দ্দিক হইতে নবকিশলয় ও পুষ্পসম্ভার গৌরবে পরিপূরিতা লতাগুল্মশ্রেণী আপন আপন সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকাশ করিয়া গৌরাঙ্গ সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

কুঞ্জাকারে ঘনসন্নিবিষ্ট তরুগুল্ম-শ্রেণী-পরিবৃতা শিমলা নগরী দেখিলেই স্কটলণ্ডের কোন নিবিড়বনাচ্ছন্ন শৈলপুরী বলিয়া ভ্রম জন্মে। শিমলা প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব শান্তিনিকেতন। সম্মুখে অদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশান্ত নীলগিরিশ্রেণী; আর চতুর্দ্দিকে বহুদূরে তুষারমণ্ডিত দিগন্তবিস্তৃত অত্যুচ্চ শৈলমালা নীরবে দণ্ডায়মান। সত্যবটে, এরূপ জনকোলাহলশূন্য নীরব, গম্ভীর শান্তিধামে আসিয়া কর্ম্মক্লান্ত মানব নৈসর্গিক প্রভাবে বিষয়ভাবনা স্বতঃই বিস্মৃত হইতে প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু দুর্দ্দৈব! এখানে আসিয়াও বিষয়ী মানব অহর্নিশ বিষয়কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত! রাজপুরুষগণ রাজ্যশাসনসংক্রান্ত জটিল ও গুরুতর কার্য্য সকল এখানে বসিয়াই সম্পন্ন করেন। মণে মণে সরকারী চিঠি ও কাগজপত্র প্রতিদিনই ডাকে আসিতেছে ও যাইতেছে; আর প্রভাত হইতে নিশীথ সময় পর্য্যন্ত লালছাপকান্ ও লালচাপরাস মণ্ডিত রাজদূতগণ অশ্বারোহণে অবিশ্রান্ত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। বস্তুতঃ শিমলা এক বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। বিপুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যাবতীয় কর্ম্মসূত্র শিমলাতে গ্রথিত। এখান হইতে ভূমণ্ডলের একষষ্ঠাংশ লোকের বিধিলিপি নির্ম্মিত হইয়া, প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতেছে। গ্রীষ্মপ্রধান রাজধানীতে অবস্থান করিয়া গুরুতর মানসিক শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অশক্ত হইয়াই, রাজপ্রতিনিধি যুগপৎ কর্ম্ম ও বিশ্রাম করিতে শৈলাবাসে আগমন করেন। প্রত্যুতঃ শিমলা তাঁহার বিলাসকানন নহে। কর্ম্মবীর কাহাকে বলে, এবং কিরূপে যুগপৎ কর্ম্ম ও বিশ্রাম করিতে হয়, যদি দেখিতে ও শিখিতে চাও তবে এই কর্ম্মক্ষেত্র ও শান্তিনিকেতন শৈলাবাসে একবার আসিয়া দেখিয়া যাও। ফলতঃ সংসারে যাঁহারা কর্ম্মবীর এ জীবনে তাঁহাদের বিশ্রামের অবসর কোথায়?

শীত ঋতুতে শিমলা জনমানবশূন্য শ্মশান। এসময়ে রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী ও সৌখীন নরনারী সকলেই রাজধানীতে প্রতিগমন

(১) শ্রীনগরের দারুশিল্প অতিশয় প্রসিদ্ধ। এখানকার অধিকাংশ গৃহ দারুময় ও সুনিপুণ কারুকার্য্যে শোভিত। ১৯১১ সালের দিল্লিদরবারে সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ কাশ্মীরাধিপতির বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত দারুময় শিবিরতোরণ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলে, কাশ্মীরপতি ঐ তোরণ সম্রাটকে উপহার দেন; এবং সদাশয় সম্রাট উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যান।

করেন। এবং এই ক্ষুদ্রপুরী তখন শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় বিষণ্ণা, মলিনা, শ্রীহীনা ও হিমাঙ্গিনী হইয়া শুভ্র তুহীনাবরণে সর্ব্বাঙ্গ আবরিয়া নীরবে ঘুমাইয়া পড়ে; বহুদিন পর্য্যন্ত আর সাড়াশব্দ থাকে না।

**শিবালিক**—শিমলা হইতে পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, সম্মুখে তিব্বতের যাতায়াতের দ্বিতীয় পথ আল্‌মোরা পুঞ্জ ভেদ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভারত ও তিব্বতের মধ্যে আবহমান কাল এই পথে মেষবাহনে পণ্য দ্রব্য সরবরাহ ও লোক চলাচল হইয়া আসিতেছে। মনে হয় এই কারণেই বা আল্‌মোরা ও নৈনিতাল সহরের অবস্থিতি ইহার পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। আল্‌মোরা পুঞ্জের পূর্ব্বদিকে একটা গভীর খাত। মানস সরোবরের সন্নিকটবর্ত্তি স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া ঘর্ঘরা নদী এই খাত দিয়া প্রবাহিত। হিমালয়ের এই অংশের দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে একটি বিস্তীর্ণ সমভূমি। এই সমভূমির পার্শ্ব ব্যাপিয়া প্রাচীরাকারে একটি শৈল জাঙ্গাল—নাম শিবালিক। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের নিকট এই শিবালিক পর্ব্বত বড়ই আদরের বস্তু। মৃত্তিকা খনন করিয়া শিবালিকের স্তরে স্তরে পাষাণীভূত প্রাচীন জীবজন্তুর অস্থি কঙ্কালাদি দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল জীবদেহাবশেষ ও হিমালয়ের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত ইত্যাকার বহুনিদর্শন ও অন্যান্য প্রমাণপ্রয়োগের সাহায্যে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই বিশাল হিমাচল এককালে জলধিগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ভূগর্ভ নিহিত শক্তির প্রভাবে সাগরতল উত্তোলিত হইয়া এই বিশাল পর্ব্বত ভূপৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছে। শিবালিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য তাদৃশমনোহর নহে—শিবালিক শ্রেণী কতকগুলি ভগ্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শৈলস্তূপ মাত্র। এই শিবালিক শ্রেণী লঙ্ঘন করিয়াই হিমাদ্রির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে হয়; এবং এই শিবালিক শ্রেণী ভেদ করিয়াই পতিতপাবণী জাহ্নবী আর্য্যাবর্ত্তের সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

**হরিদ্বার**—শিবালিক শ্রেণী অতিক্রম করিয়া যে সঙ্কীর্ণ গভীর গিরিপথে গঙ্গার নীল ফেনিল বারিরাশি ভীমকল্লোলে গোমুখে পড়িয়া নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারই পার্শ্বে পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বার। ভীমাবর্ত্তে নিবিড়বনাচ্ছন্ন দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া, হরিদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াই সুরধুনী চিরতরে দুর্গম ও বন্ধুর গিরিবর্ত্ম পরিহার পূর্ব্বক, কুলু কুলু নাদে ধীর মন্থর গমনে নিজ আগমনী গাহিয়া যেন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়াছেন। হরিদ্বারের প্রধান রাজপথটি গঙ্গার খাতের পার্শ্ব বহিয়া সমান্তরাল ভাবে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। অন্যান্য পথগুলি উন্নত পর্ব্বত গাত্রে সোপানবৎ ঊর্দ্ধাধঃ বিন্যস্ত। গঙ্গাবক্ষঃ হইতে ভাগীরথীর উত্তরকূলে সংস্থিত হরিদ্বারের সারি সারি মন্দির ও অবতরণিকা শ্রেণী দেখিতে অতীব মনোহর; এই হরিদ্বারের সন্নিধানেই মহাভারেতোক্ত মহাপ্রস্থান পথ। সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে এই পথে হরিদ্বার হইতে হৃষিকেশ পর্ব্বত ও লছমন্ ঝোলা পার হইয়া, ক্রমে কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। জাহ্নবীর পবিত্র হিমসলিলে অবগাহন করিবার নিমিত্ত আজও সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী বৎসরান্তে একবার হরিদ্বারে আগমন করিয়া থাকেন। তখন জনকোলাহলে মুখরিত হরিদ্বার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট শুভ্র শিবির সন্নিবেশে ঘনঘোরগর্জ্জনমুখর ফেনিল উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল বিশাল সাগর বক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

শ্রীমন্ত সরকার।

---

# বৰ্দ্ধমানী সাহিত্য সম্মিলনের শিক্ষা।

চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি রাজভোগ্য উপকরণে সাহিত্যিকের অগ্নিমন্দা ক্ষুধার তর্পণ করিয়া, সে বিরাট্ রাজসূয়যজ্ঞের 'দীয়তাম্ ও ভুজ্যতাম্' ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিয়া, তাহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বোধ হয় অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইবে। এই আশ-ঙ্কায় আজ কালি কলম ও কাগজ খরচ করিতে বসিলাম।

প্রথমেই বলিতে হয়, অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি, এই রাজসূয়যজ্ঞের হোতা, 'শাল প্রাংশু বৃষস্কন্ধ' বিশালবপুঃ বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের কথা। তাঁহার সৌজন্য, তাঁহার অমায়িকতা, তাহার আতিথেয়তা— অতুল, রাজারই যোগ্য। সুদূর প্রবাসে বিরহ-বিধুর 'কবীন্দ্র'দিগের জন্য কোনও সুব্যবস্থা তিনি করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, জানিনা; কিন্তু উদর-জ্বালা-কাতর বিগত-রস সাহিত্যিকদিগের প্রতি তাঁহার যে বিশেষ দৃষ্টি ছিল, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কাগজে দেখিয়াছিলাম, "পুকুর-ভরা মৎস্য তিনি দান করিয়াছেন—তখন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িয়াছিল, মৎস্যই কি শুধু আমিষশ্রেণীভুক্ত? 'সীতাভোগ' 'মিহিদানা'টা কি দামোদরের বন্যা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে! কিন্তু যাইয়া দেখিলাম, দামোদরের স্রোতে মানুষ, গরু, বাড়ীঘর ভাসিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু উপভোগ্য সকলই রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ এ বন্যায় বৰ্দ্ধমান বিশেষরূপেই বৰ্দ্ধিতমান হইয়াছে—বিক্রমপুরটা ভাসিতে ভাসিতে কলিকাতার বাগবাজার দিয়া একেবারে কালনার দেবগ্রামে যাইয়া পৌঁছিয়াছে; আরও দূরে হয়ত ভাসিয়া যাইত, কিন্তু মহার্ণব মহাশয় যাইয়া "ত্বম্ অত্রৈব তিষ্ঠ" বলিয়া তাহাকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন! আরও দেখিলাম, ভাওয়ালের কবি যতই অনাদৃত হউন না কেন, ভাওয়ালের জঙ্গলটাও বৰ্দ্ধমানের অতি সন্নিকটেই যাইয়া ঠেকিয়াছে, কাজেই আমার মত আমিষ-আহারীদিগের কোনই অসুবিধা হয় নাই।

এ বিরাট উৎসব সম্পাদনে রাজকোষ হইতে প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে—বিশ্বকোষ যখন তাহাতে আবার বিশেষরূপে যোগদান করিয়াছেন, তখন ব্যয়ের জেরটা আরও কিছুদিন চলিবে, বলিয়াই আশা করা যায়। এই হিসাবে সম্মিলন ব্যাপারটা খুবই সার্থক হইয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু সম্মিলনের উদ্দেশ্যটা কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপেই বিবেচ্য। বৰ্দ্ধমানের সুবিখ্যাত 'বৃহন্নাজুন' মহাশয়দিগকে ভীত, উত্যক্ত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তামাসা-দর্শন ও সাহিত্যিকগণ যে এই কয় দিন কোলাহল করিয়া আসিলেন, তাহার সার্থ-কতাটা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি?

সম্মিলনের প্রথম উদ্দেশ্য—সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে আলাপ-পরিচয়ের আদান-প্রদানের সুবিধা করা। বৰ্দ্ধ-মানের নৈমিষারণ্যে সে সুযোগ খুবই কম ঘটিয়াছে। একমাইল দেড়মাইল দূরে দূরে অবস্থিত হইয়া পরিচয় লওয়ার এবং পরিচিত হওয়ার সুবিধা কতটা হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বাসায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে পরিচয় করা, তাহার সময়ই বা কোথায়? প্রাতে সভা, অপরাহ্নে সভা, রাত্রে আমোদ-প্রমোদ; দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারেও যথেষ্ট সময়েরই আবশ্যক হইয়াছে। এই জন্য সম্মিলনের প্রথম উদ্দেশ্য এক প্রকার ব্যর্থই হইয়াছে বলিতে হইবে। তবে, রাজকোষ হইতে যদি সুদূরাগত সাহিত্যিকদিগের পাথেয় প্রদানের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্যটা না হয়, উপেক্ষাই করা যাইত। তিন দিনের রাজভোগে, রাজানুগ্রহে, যখন সাহিত্যিক কেন, কেহই বাঁচিতে পারে না, তখন স্বভাবতঃই ব্যয়ের ও কষ্টের তুলনায় লাভের মাত্রাটা খতাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়, এবং দেখিলেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়ে।

সম্মিলন-ক্ষেত্রেও অপরিচিতের সঙ্গে পরিচয়ত' দূরের কথা, পরিচিতের সঙ্গেও অনেক সময় সাক্ষাৎই ঘটে নাই। আলোচ্য বিষয়গুলি সহজেই চারি শাখায় বিভাগ করা চলে, এবং করাও হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের বিশ্বপ্রেমিক সাহিত্যিকদিগের মধ্যে কয়জন যে কোন্ নির্দ্দিষ্ট শাখার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হইয়াছেন

বা হইতে চাহিবেন, তাহা বোধ হয় শাখা-কর্ত্তাদিগের বিচারে আসে নাই। তাই শাখা-বিভাগের ফলে দর্শক ও সাহিত্যিকগণ শাখামৃগের মত শাখা হইতে শাখান্তরে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন। এ দৃশুটি বৰ্দ্ধমান ও তৎপ্রেষিক-দিগের নিকট বিসদৃশ না হইলেও আমাদিগের নিকট খুবই বিসদৃশ বোধ হইয়াছে, এবং ইহাতে যথেষ্ট অসুবিধাও হইয়াছে। যাঁহাকে ঐতিহাসিক মনে করিয়া ইতিহাস-মণ্ডপে খুঁজিতে গিয়াছি, তিনি হয়তঃ তখন বিজ্ঞানের মণ্ডপে বসিয়া বন্ধুর সঙ্গে খোসগল্পে ব্যস্ত।

এই কারণে সম্মিলনের অন্যান্য উদ্দেশুও ব্যর্থ হইয়াছে। কল্লোলিনীর প্রবাহের মত জন-স্রোতের নিয়ত মুখরিত প্রবাহে হাবুডুবু খাইয়া প্রবন্ধ লেখক আপনার নিবন্ধ অনুৎসাহে পড়িয়া গিয়াছেন—শ্রোতাও অমনোযোগে দুই চারিটি কথা শুনিয়া শাখান্তরে উঠিয়া গিয়াছেন। উলু বনে মুক্তা ছড়ানই সার হইয়াছে। দর্শন এবং সাহিত্যের সভাপতি মহাশয়গণও আবার আপনার ভাবে এমনই বিভোর রহিয়াছেন যে, যে দুই চারিটি কথা কখনও তাঁহাদের মুখ দিয়া বিনির্গত হইয়াছে, তাহাও এমনই মিহিসুরে, ঘুমন্তভাষায়, উচ্চারিত হইয়াছে যে, পার্শ্বের দুই চারিজন ব্যতীত অন্য কেহই তাহার রস গ্রহণ করিতে পারে নাই।

কিন্তু প্রবন্ধপাঠের অধিকার দানে কোন কোন সভাপতি যেভাবে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া 'সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়' কথাটার সার্থকতা বিশেষভাবেই উপলব্ধি হইয়াছে। অবশ্য, 'বিদ্যাসুন্দরের' পীঠস্থানে ইহার অন্যথা হইলেই বোধ হয় অসঙ্গত হইত। জগতে সুন্দর বলিয়া বিশেষ কিছুই নাই—তাহা হইলে কি মায়ের কাণা ছেলে পদ্মলোচন হয়? বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্যতা দ্বারা সৌন্দর্য্য নির্ণীত হয় না। জবাকুসুম, কুন্তলীন খরচ করিবার শক্তি যাহার যত অধিক, কর্ত্তার দলে ভুক্ত হইয়া গিয়া কর্ত্তার সঙ্গে 'পুকুরকাৎ' করিয়া চলিবার কৌশল যাহার যত অভ্যস্ত সেই কর্ত্তার নিকট তত সুন্দর, কর্ত্তার তত প্রীতিভাজন, কর্ত্তার তত অনুগৃহীত। সাহিত্যক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। রাক্ষসের জীবাণু মুদ্রারাক্ষসের স্তব না করিলে 'ট্যাসটেমি' 'চীনাটিকির' যতই আদর হউক না কেন, তোমার প্রভাতের, নিশীথের, নিভৃতের চিন্তার কপালে আগুন! যাঁহারা সভাপতি হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ত মানুষ—স্বপ্রদেশপ্রীতি, স্বভাবকপ্রীতি, স্বমতানুবর্ত্তি-প্রীতি লইয়া তাঁহারা এই গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাই প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইলে, হয়, তাঁহাদের সঙ্গে 'ম' স্থানে 'ব' ও 'ব' স্থানে 'ম' উচ্চারণ করিতে হইবে, নয়ত তাঁহাদের মনের প্রতিধ্বনি করিতে হইবে, আর নয়ত, তাঁহাদের চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলির অর্ঘ্য দিতে হইবে। তাহা না হইলে, পরীক্ষকদিগের যতই মনোনীত হউক না কেন, যত লোকই সে প্রবন্ধ শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করুন না কেন, বাদ-ছাদ দিয়া সে প্রবন্ধ পড়িতে হইবে অথবা তাহা 'পঠিত বলিয়া গৃহীত' হইবে। ইহার বেশি কিছুই হইবে না। কোন শাখায় এমনও দেখা গিয়াছে, কোনও অভাবক প্রবন্ধলেখককে প্রবন্ধ পড়িতে বলিয়াও, তিনি দণ্ডায়মান হইবার পরে সভাপতি মহাশয় অতি মোলায়েম ভাবে বলিয়াছেন "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, এখন যিনি আসিলেন, ইনি পড়িয়া লউন।" ইহার অপেক্ষা সভাপতিত্বের অগৌরবের কথা আর কিছু হইতে পারে কি?—বিশেষতঃ, উপেক্ষিত প্রবন্ধলেখকের বক্তব্য শুনিবার জন্য বহুলোকের অনুরোধ সত্বেও যদি সভাপতি সময়ের অভাব বলিয়া তাঁহাকে আর দাঁড়াইবার সুযোগই না দেন, তবে সভাপতিকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা হয়?

এই সকল দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয়, যাঁহাদের আত্মসম্মানেবোধ আছে, স্বপ্রদেশের গৌরবরক্ষা করা যাঁহারা আপনাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের এইরূপ পক্ষপাত দুষ্ট সভাপতি অলঙ্কৃত সম্মিলনে যোগদান করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। যদি সভাপতি নির্ব্বাচনে সমপ্রদেশের মতামত লওয়া হয়, যদি প্রবন্ধের গৌরব প্রবন্ধের গৃহীত ও পঠিত হইবার প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহা হইলেই সম্মিলনের উদ্দেশ্য কতক সার্থক হইতে পারে এবং তাহাতে যোগদান করা

বিদ্বেষ। নতুবা টাকা খরচ করিয়া মনস্তাপ ও বিদ্বেষ—ভাব ক্রয় করিবার আবশ্যকতা কি ?

দর্শক।

---

## মহামিলন।

আসিছে যখন জগৎ ব্যাপিয়া ভীষণ তুষার রাশি,
ঘোষিছে যেন কে, "নিকট সময়" যখন অট্ট হাসি'—
ঢাকিবে কি তবে, বিষাদ কালিমা, হাসির লহরী চয় ?
উঠিবে না গান কণ্ঠ ভেদিয়া ? মরণে করিব ভয় ?

যদিও রজনী গভীর-তিমিরে—ঝঞ্চা আসিছে ঘিরে,
যদিও সমুখে রয়েছে দাঁড়ায়ে প্রহরী শত্রুপুরে,
ভীতির দেবতা, নিকট ভীষণ—তবুও সবার হায়,
যেতে হবে সেথা বারতা আসিলে হোক না সে দৃঢ় কায়।

ফুরায়েছে মোর ভ্রমণের পথ, দূরে সীমান্ত রেখা,
বাকী শুধু আছে একটী সমর, সে আজি দিবে যে দেখা ;
সমরক্লান্ত বিজয়ী গরবে লভিব পুরস্কার,
মহা নাটকের শেষ যবনিকা—এতদিন খোঁজে যার।

যোদ্ধার বেশে আছি চিরকাল, নাহি আর বড় বাকী,
শেষের মধুর সে সময় বিনা, তাও আজ নিছে ডাকি ;
সে মরণে মোর ঘৃণার উদয়, চাহিনা ঘৃণিত রীতি,
আবরিবে আঁখি, জরাতে দহিবে, যে মরণে নিতি নিতি।

সে মরণ আমি চাহিনা চাহিনা, বক্ষ পাতিয়া আজ,
লইব বজ্র বীরের মতন ধরিয়া বীরের সাজ।
আর নিমেষে শুধিব মহা সুখময় জীবনের যত ঋণ,
দুঃখ দৈন্য, বিপদ বিষাদ, যাহা কিছু সব হীন !

মহাবীর কাছে আসিবে সহসা হীন যা সত্তের রূপে,
প্রকৃতির সেই মহা হুঙ্কার ধ্বনিত যা শেষ কূপে—
সর্ব্বাসি লুকাবে, ফুরাবে সকলি, রবেনা ভীষণ হাসি,
আসিবে তখন, শান্তি-কিরণ, বিদূরি' বিষাদ রাশি।

বিনাশি' তমসা আসিবে চকিতে, বিমল আলোক রেখা,
তারপর তব, মানস-প্রতিমা, বক্ষ দিবেগো দেখা !
তখন আবার, পাষাণী আমার, তোমারি ধরিয়া বুকে,
দেবপদতলে, উভয়ে নীরবে, লভিব নির্বৃতি সুখে।

শ্রীসুকুমার দাস গুপ্ত।

# "বাঙ্গালা" নগরী।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসু ঠাকুর লিখিত।

(৪) যে, মানচিত্রসমূহে "বাঙ্গলা" নগরীর উল্লেখ নাই, তাহাদের বিবরণ।—যে মানচিত্রসমূহে বাঙ্গালা নগরী চিহ্নিত আছে উপরে তাহাদের বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন মানচিত্রসমূহ আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা নগরীর গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল; কারণ আমরা তৎকালের এমন একখানা মানচিত্রও পাই নাই যাহাতে বাঙ্গালা একটি সুবৃহৎ নগরী বলিয়া চিহ্নিত হয় নাই। কিন্তু, অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বোধ হয় উহার অধঃপতন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অঙ্কিত কোন কোন মানচিত্রে বাঙ্গালা নগরীর উল্লেখ আছে, আবার কোন খানাতে বা নাই। কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অঙ্কিত কোন মানচিত্রেই আর উহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধই যে বাঙ্গালা নগরীর অস্তিত্ব অথবা সমৃদ্ধিলোপের সন্ধিকাল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। Major Rennell ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে গভর্ণর Vansittart কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বঙ্গদেশ পরিমাপ করিয়া এক মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ইহাই এতদ্দেশের সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে অঙ্কিত মানচিত্র, এবং অদ্যাপি ইহা বিশেষ আদৃত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত Major Rennell পর্য্যন্ত যে সমস্ত মানচিত্রে বাঙ্গালা নগরী চিহ্নিত নাই, নিম্নে তাহার তালিকা ও বিবরণ প্রদত্ত হইল।

আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বার্ণিয়ারের গ্রন্থসংলগ্ন মানচিত্রই সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর একমাত্র মানচিত্র যাহাতে বাঙ্গালা নগরীর উল্লেখ আছে কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। Francois Bernier ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে Angersএ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভূমি ফরাসীদেশ পরিত্যাগ করিয়া তিনি সিরিয়া, মিশর, আরব, এবং ভারতবর্ষের বহুস্থান ভ্রমণ করেন। তিনি দ্বাদশ বৎসরকাল ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেবের গৃহ চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার চিত্তাকর্ষক ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৬৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। Constable ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাহার এক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। উহাই বর্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরেজী অনুবাদ। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে প্যাঁরি নগরীতে বর্ণিয়ারের মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত সংলগ্ন মানচিত্রের নাম—"L' EMPIRE DU GRAND MOGOL". উহাতে মানচিত্রকরের নাম কিংবা অঙ্কনের তারিখ প্রভৃতি কিছুই লিখিত নাই। এই মানচিত্র বার্ণিয়ারের অঙ্কিত কিনা, তাহাও নিশ্চিতরূপে বলিবার উপায় নাই; তবে উহা যে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রায় একই সময়ে (১৬৭০—৭১) অঙ্কিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মানচিত্রে বাঙ্গালা নগরী চিহ্নিত নাই, একথা ঠিক বলা চলে না; কারণ, ইহাতে বঙ্গের পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। এই সময়ের সমস্ত মানচিত্রেই চাটিগাঁর পূর্ব্বদিকে বাঙ্গালা নগরী চিহ্নিত। কিন্তু, বার্ণিয়ারের মানচিত্রে চাটিগাঁওই পূর্ব্বসীমা, তৎপূর্ব্বস্থ প্রদেশসমূহ ইহাতে অঙ্কিত হয় নাই। অঙ্কিত হইলে হয়ত বাঙ্গালা নগরীও চিহ্নিত হইত।

যে সমস্ত মানচিত্রে বাঙ্গালা নগরী চিহ্নিত হয় নাই, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

| মানচিত্র-কারের নাম। | মানচিত্রের নাম। | মানচিত্রের তারিখ, অথবা অন্যভাবে যে গ্রন্থে উহা প্রকাশিত হয়,তাহার তারিখ। | মানচিত্র যে গ্রন্থ-সংলগ্ন তাহার নাম। | মানচিত্রে আলোচ্য যে যে নগরের উল্লেখ আছে, তাহার নাম। | মন্তব্য। |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattheus van den Broucke | "Nieuwe Kaarte van't Koninkryk Bengale." | Dordrecht, ১৭২৪-২৭ (যে গ্রন্থ সংলগ্ন, তাহার তারিখ।) | Francois Valentyn's "Beschryving van oost-Indien," Vol. V, Dordrecht, 1724-27. | Xetigam (চাটিগাঁও); Chatgam (সাতগাঁও); Oegli (হুগলি); Decca, Sonnergam (সোণারগাঁও); Baccala (বাকলা); Thanda (টাঁড়া)। | দেখিয়াছি। |
| J. Van Braam et G. onderde Linden | "Tabula Indiæ Orientalis et Regnorum Adjacentum." | ঐ | Valentyn's 'Atlas to Old and New East Indies.' | Xetigam (চাটিগাঁও); Chatigam (সাতগাঁও); Ougli (হুগলি); Dekka; Sonnewaron (সোণারগাঁও)। | ঐ |
| Hasius | এসিয়া | Nurnberg, ১৭৪৪ | ... | Satigan (চাটিগাঁও)। | দেখি নাই।—British Museum এ সংগৃহীত আছে।—Badger কৃত তালিকা-ভুক্ত। |
| Mayer | ভারতবর্ষ | Nurnberg, ১৭৪৮ | ... | Chatigan (চাটিগাঁও)। | ঐ |
| Blair | Hindoostan. | London, ১৭৭১ | ... | Chittagong or Shatigan (চাটিগাঁও)। | ঐ |

| মানচিত্রকরের নাম। | মানচিত্রের নাম। | মানচিত্রের তারিখ, অথবা অভাবে যে গ্রন্থে উহা প্রকাশিত হয়, তাহার তারিখ। | মানচিত্র যে গ্রন্থ-সংলগ্ন তাহার নাম। | মানচিত্রে আলোচ্য যে যে নগরের উল্লেখ আছে, তাহার নাম। | মন্তব্য। |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | "Descripcao do Reino de Bengala." | ১৭৭৭ (যে গ্রন্থ-সংলগ্ন, তাহার তারিখ।) | Joao de Barros's "Da Asia," Tom. IV., pt. 2., Lisboa, 1777. | Chatigam; I. Bacala (বাকলা দ্বীপ); Daca; Sornd [স্বর্ণ (গ্রাম)] *; Govro (গৌড়); Rara (টাঁড়া); Satigam (সাতগাঁও)। | দেখিয়াছি। |
| I: Sinex | "A new map of India and China from the latest observations." (Inscribed to East India Company). | অষ্টাদশ শতাব্দী। | কলিকাতা Imperial Libraryর সিঁড়িতে টাঙ্গান আছে। কোন গ্রন্থসংলগ্ন ছিল, তাহা অজ্ঞাত। | Tanda. | ঐ |
| Herman Moll, *Geographer.* | "A Map of East Indies." | ঐ | ঐ | Chatigam. | ঐ |
| Major James Rennell | "Bengal and Bahar". | ১৭৭৯ | Major Renell's "Bengal Atlas"; 'The Journal of Major James Rennell," Ed. by T. H. D. La Touche, *Memoir A. S. B.*, Calcutta, 1910. | Chittagong; Dacca; Sunergong (সোণার-গাঁও); "Ruins of Gour;" প্রভৃতি। | ঐ |

* গঙ্গা এবং "Caor" নদীর সঙ্গমস্থলে একটী দ্বীপাকৃতি ভূখণ্ডে, ঢাকার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে, এবং বিক্রমপুরের (Bicaram) কিঞ্চিৎ উত্তরে "Sornd" নগরী চিহ্নিত। অবস্থান দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ইহাই স্বর্ণ (গ্রাম)—সোণারগাঁও। এই মানচিত্রে স্থানসমূহের নামের শেষার্দ্ধ অনেক স্থলেই বাদ পড়িয়াছে; যথা—"Bicaram" (বিক্রমপুর), "Sundar" (সুন্দরবন), ইত্যাদি।

## দ্বিতীয় খণ্ড।—"বাঙ্গালা" নগরার স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলী, এবং তাহার সমালোচনা।

মেজর জেমস্ রেণেল।—মেজর রেণেল তদীয় *Memoir of a Map of Hindoostan* নামক গ্রন্থে বাঙ্গালা নগরী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'প্রাচীন মানচিত্র এবং ভ্রমণবৃত্তান্তসমূহে বাঙ্গালা নামক একটি নগরীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় : কিন্তু অধুনা তন্নামধেয় কোন স্থানের অস্তিত্ব নাই। এই নগরী গঙ্গার পূর্ব্ব মুখের নিকটে অবস্থিত ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে, এবং আমার বোধ হয়, উহা নদীতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঐ স্থানের কাছাকাছি এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড নদীগর্ভে অদৃশ্য হইয়াছে বলিয়া আমার মনে পড়িতেছে। বিগত (সপ্তদশ) শতাব্দীর প্রথমভাগেও বাঙ্গালা নগরীর অস্তিত্ব ছিল বলিয়া প্রতীত হয়।'*

মেজর সারুওয়েল, এবং মিঃ এচ্, জে, রেইণী।—খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. H. J. Rainey বাঙ্গালা নগরী সম্বন্ধে মেজর রেণেলের অভিমত সমর্থন করিয়া Mookerjee's Magazineএ *The Lost City* নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধ মধ্যে তিনি অনেক কবিত্বময় কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের সার মর্ম্ম এই,—Bibliotheque Republique সভার ভৌগোলিক শাখার কর্ম্মাধ্যক্ষ ফরাসী পণ্ডিত M. Cartambard রেইণী সাহেবের নিকট (১) Barros's "Da Asia" গ্রন্থসংলগ্ন মানচিত্র, (২) N. Sanson এর মানচিত্র—১৬৫২, (৩) Van den Broucke এর মানচিত্র— ৭২৪, এই তিনখানা মানচিত্রের প্রতিলিপি প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত মানচিত্রেই চাটিগাঁর বিপরীত তীরে বাঙ্গালা নামক একটি বৃহৎ নগরী চিহ্নিত দৃষ্ট হয়। এখন ইহার অস্তিত্ব নাই, এবং সম্ভবতঃ এই নগরীর নামানুসারেই বাঙ্গালা দেশের নামাকরণ হইয়াছে। এই বাঙ্গালা নগরী কোথায় অবস্থিত ছিল?

'কার্টমবার্ডের এই প্রশ্নে রেইণী সাহেবের এতদ্বিষয়ে অনুসন্ধানস্পৃহা জন্মে, এবং ইহার কিছুদিন পরেই তিনি বঙ্গীয় সৈন্য বিভাগের Major Sherwell লিখিত *The Gangetic Delta* নামক প্রবন্ধে (Calcutta Review, Vol. xxxii, ৫ ও ৬ পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত) বাঙ্গালা নগরী সম্বন্ধে মেজর রেণেলের পূর্ব্বোদ্ধৃত মত পাঠ করেন। সেই মত সমর্থনার্থ তিনি লিখিয়াছেন :—

'রেণেলের উল্লিখিত ভূখণ্ডের নিমজ্জন সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে না, কারণ, ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমস্থ সমুদ্রতট অন্যূন ১০ ফিট বসিয়া গিয়াছিল। একদিকে যেরূপ এই ভূখণ্ড জলনিমজ্জিত হইয়াছে, অপরদিকে তদ্রূপ উহার দক্ষিণ দিকে কিঞ্চিৎ দূরে 'Nagrais' অন্তরীপের সন্নিকটস্থ ভূভাগ ক্রমোত্থিত হইতেছিল। ভূগর্ভস্থ প্রচ্ছন্ন আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ভিন্ন এইরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লব হইতে পারে না বলিয়া আমাদের ধারণা। বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগে প্রচ্ছন্ন, স্ফুরিতগর্ভ আগ্নেয় গিরিশ্রেণী বর্ত্তমান আছে। স্মরণাতীত কালে সুন্দরবন সাগর নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল, এবং নিমজ্জনের পূর্ব্বে উহা বৃক্ষাদিপূর্ণ উচ্চ ভূমি ছিল, ইহা সুপরিজ্ঞাত ব্যাপার।

---

* "In some ancient maps, and books of travel, we meet with a city named *Bangella*; but no traces of such a place now exist. It is described as being near the eastern mouth of the Ganges, and I conceive that the site of it has been carried away by the river, as in my remembrance a vast tract of land has disappeared thereabouts. Bengalla appears to have been in existence during the early part of the last century."——Major J. RENNELL, *Memoir of a Map of Hindoostan*, p. 57.

Major Sherwell মাতলা তীরস্থ ক্যানিংটাউনে, ও যশোহর-খুলনা জেলাতে, এবং আমরা ( রেইনী ) বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যে, সুন্দরবনের অন্তর্গত, হরিণঘাটা নদীর তীরস্থ চিলেরগাঙ্গ অথবা সাপনেজা নামক স্থানে পুষ্করিণী খনন কালে প্রায় ২০ ফিট মাটির নীচে সাড়ি সাড়ি সুবৃহৎ সুন্দরী বৃক্ষের গুঁড়ি প্রাপ্ত হওয়াতে এই ব্যাপার নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

ক্যানিং টাউন, মাতলা, এবং সাপনেজা, এই স্থানত্রয় সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে ও কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সুতরাং, স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, গাঙ্গেয় বদ্বীপসমূহের দক্ষিণাংশের গভীর ভূগর্ভে অরণ্যানীসমাবৃত মৃত্তিকান্তর প্রোথিত রহিয়াছে।

Major Sherwell তদীয় প্রবন্ধে Major Rennell কৃত মত—( অর্থাৎ, বাঙ্গালা নগরী সমুদ্র অথবা নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে, এই মত )- সমর্থন করিয়াছেন। Mr. H. J. Rainey ও মেজরদ্বয়ের মতানুসরণ করিয়া বাঙ্গালা নগরীর ধ্বংসের দিনের কল্পনা চিত্র রঞ্জিত ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন। বর্ণনার প্রারম্ভেই তিনি আভাষ প্রদান করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ কোনরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবে বাঙ্গালা নগরী বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত হইয়া চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। *

* "Our attention was first prominently attracted to the subject...by a letter addressed to us by a French savant M. Cartambard, the head of the Geographical Department of the then *Bibliotheque Republique*, who was good enough to forward to us tracings from 3 ancient maps, to wit :—

(1) Barros's Da Asia, 16th Century.

(2) The Chart of the Kingdom of Great Mughul, By N. Sanson, 1652.

(3) The New Map of the Kingdom of Bengal, by order of the noble Sire Mathews Van den Broncke, in the Atlas of Francois Valentyn, to illustrate his another work "Old and New East India," 1724.

"In transmitting the aforesaid manuscripts M. Cartambard wrote as follows—"Opposite Chatigan or Xatigan ( the present Chittagong ) very nearly all the maps of the 17th century show a large town, Bengallah.—Cf. Valentyn. What is this town which no longer exists, and which perhaps gave name of Bengal ?"

"This enquiry having excited our curiosity, we commenced to sedulously search for information on, what may be called the moot point, and very shortly after came across a passage in an article entitled "The Gangetic Delta" (By Major Sherwell, Bengal Army), vide Cal. Rev., Vol. XXXII, pp. 5 & 6. It is an enact from writing by Major Rennell, the first Indian Geographer and Surveyor, written towards the close of the 18th century ( A. D. 1788 ), and he therein succinctly alludes to the even then long submerged city of Bingálah !"

[ For the quotation from Rennell, which follows, vide the just preceding footnote. ]

"With regard to the subsidence of lands referred to by Rennell, there can not be the slightest doubt that it did actually take place ; for in A. D. 1762, or exactly one century and a decade ago the coast to the south-west of Chittagong sank no less than 10 ft. The depression of the earth surface in this part appear to be compensated by the upheaval which is said to be going on some distance to the south of it, *i. e.* towards the cape Nagrais, etc. Such phenomenon can not but be attributed, we are of opinion, to the volcanic action, for, what is termed "the active volcanic train" runs in that direction. It is a fact sufficiently known, that the whole tract of the Sunderban must have at one of the times of which we have no record whatsoever, been entirely submerged. This is incontestably proved by the tops of large trees of Sundari being found some 20 ft. below the present level of the country, when excaviting tanks by Major Sherwell at the town of Canning on the Mutlah, or Division of Khulna in Jessore—and ourselves at a location in the Sundarban called Schillergaug or Sapneja, on the Huringhata River in Backerganje District. These three places may be considered as represented, respectively, the western, central, and the two Sunderban, being situated in those parts thereof,

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র তদীয় নবপ্রকাশিত গ্রন্থ "যশোহর-খুলনার ইতিহাসে" ( প্রথম খণ্ড, ৪:১ পৃঃ ) সংক্ষেপে রেইনী সাহেবের মতই বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন।

**মেজর রেণেল, মেজর সারওয়েল, এবং মিঃ রেইনীর মতের সমালোচনা**।—মেজর রেণেলের মতে বাঙ্গালা নগরী নদীকুক্ষিগত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। মেজর সারওয়েল এবং মিঃ রেইনী এই মত সমর্থন করিয়াছেন। রেণেলের মতবাদ কোনরূপ প্রমাণ কিংবা বিচারসহ ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে,—উহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত অনুমান মাত্র। অনুমানের স্বপক্ষে তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন যে, গঙ্গার পূর্ব্বদিকস্থ মোহানার সন্নিকটে যে স্থানে বাঙ্গালা নগরীর অবস্থান প্রদর্শিত হয়, সেই স্থানের কতকটা ভূমি নদীগর্ভস্থ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে পড়ে।

প্রথমতঃ, বাঙ্গালা যদিও দুই একখানা মানচিত্রে বর্ণিতরূপ চিহ্নিত আছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানচিত্রেই ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সুতরাং বাঙ্গালাকে গঙ্গার মোহানার উপর স্থাপিত মনে করিবার কোন কারণ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, গঙ্গার মোহানা বহুশত মাইল ব্যাপী। উহার কোন স্থানে বাঙ্গালা অবস্থিত ছিল তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা না থাকা সত্বেও কোন স্থানবিশেষ নদীগর্ভস্থ হইয়াছে বলিয়াই ঠিক ঐ স্থানেই বাঙ্গালার স্থাননির্দ্দেশ করিতে হইলে অসংযত কল্পনার রশ্মি বড়ই শ্লথ করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া আমাদের মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, বাঙ্গালার অবস্থান নির্ণয়ের আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। নিতান্ত অপারগ হইলে অগত্যা আমরা negative প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া উহাকে বিলুপ্ত মনে করিতে পারি। কিন্তু, মেজর রেণেল কোনরূপ চেষ্টা কিংবা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন নাই। Rev. Hostenও বলেন যে, অধৈর্য্য হইয়া বাঙ্গালাকে সুন্দরবনের অন্তর্গত এবং নদীকুক্ষিগত অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই। *

Dr. James Taylor মেজর রেণেলের মতের সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,—বাঙ্গালা নগরী নদীকুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে, এরূপ কোন কিংবদন্তী পর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত নাই। নদী কবলিত প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের বিবরণ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কেবল নদীস্রোতবিলুপ্ত শ্রীপুর এবং কোটীশ্বরের বিষয় অবগত আছে; নদী কবলিত বাঙ্গালা নগরীর নাম পর্য্যন্ত কেহ কখনও শোনে নাই। †

---

Thus it is disclosed that a forest lies far below that now flourishing in the southern portion of the Gangetic Delta.

"Let us imagine the last days of Bangalah, the utter annihilation of a populous city. How was this overwhelming calamity brought about, did it sink beneath the surface of the dark waters of the Bay, amid the convulsions of nature ?"—H. J. RAINEY, *The Lost City*, in *Mookerjee's Magazine*, New Series, Vol. I.

* "There is no reason why we should get impatient and speak of Bengala as a mythical city, or fancy that it was somewhere in the Sundarbans and has long since been swept away by a tidal wave. This theory... has no chance of finding favour."

——Rev. H. HOSTEN, *The Twelve Bhuiya's of Bengal*, in J. & Proc. A. S. B., *New Series*, Vol. IX., pp. 444, 45.

† "The opinion of Bengalla having been carried away by the river, is not supported by any tradition in this part of the country. The natives, who are well acquainted with the sites of the ancient places of note in the district, and of the changes occasioned by the inroads of the rivers, mention two cities called Serripore and Kotesur as having been thus destroyed, but of the existence of Bengalla, they have never heard."

——TAYLOR, *Topography of Dacca.*, p. 93,

শ্রীযুক্ত রেইনী সাহেব তদীয় প্রবন্ধমধ্যে লিখিয়াছেন,—বার্ণিয়ারের ভারত ভ্রমণকালে বাঙ্গালা নগরী নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তৎকালে উহার অস্তিত্ব থাকিলে বার্ণিয়ারের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু পর্য্যটক অবশ্যই তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে উহার উল্লেখ করিতেন। *

কিন্তু রেইনী সাহেব বোধ হয় অবগত ছিলেন না যে, বার্ণিয়ারের পরবর্ত্তী অনেক পর্য্যটকের মানচিত্রে বাঙ্গালা নগরীর উল্লেখ আছে বার্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৬৭০—৭১ খৃষ্টাব্দে প্রথমে প্রকাশিত হয়। উহার পরে Berey (১৬৭১), De Witt (১৬৮০), Tavernier Mandeslo (১৬৮৩), Dankerts (১৬৯০), Coronelli (১৬৯১), Sanson (১৬৯৬), Visscher (১৭১০), Mathys (১৭১৫), Pierre Vander (১৭২৭), Seutler (১৭৩০), Ottens (১৭৪০), প্রভৃতি অঙ্কিত বহু মানচিত্রে বাঙ্গালা নগরী চিহ্নিত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা নগরীর অস্তিত্ব ছিল কিনা যদিও তাহা বিশেষ সন্দেহজনক, তথাপি বার্ণিয়ারের সময় বাঙ্গালা নগরী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, রেইনী সাহেবের এই সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়।

<u>ভার্থেমা, পার্সি ব্যাজার</u>।—ভার্থেমার ভ্রমণবৃত্তান্ত John Winter Jones ইংরেজীতে অনুবাদ করেন, এবং George Percy Badger ঐ গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া Hakluyt Societyর গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়া প্রকাশিত করেন। ভার্থেমার বিবরণে যে স্থানে বাঙ্গালা নগরীর উল্লেখ আছে, তথায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া Badger পাদটীকাতে লিখিয়াছেন,—'ভার্থেমার ভ্রমণকালে গৌড় বঙ্গের রাজধানী ছিল, কিন্তু সাধারণতঃ—বিশেষতঃ বৈদেশিকগণকর্ত্তৃক—প্রদেশের নামানুসারেই উহার রাজধানীর নামাকরণ হইত। Ramusio বাঙ্গালা রাজ্যের অন্তর্গত সুবৃহৎ বাঙ্গালা নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন; ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি Nunno de Cunnar শাসনকালে যখন পর্ত্তুগীজগণ বঙ্গে প্রথম দুর্গ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন, তখন গৌড় বঙ্গের রাজধানী ছিল; ১৫৮৩—৯১ খৃষ্টাব্দে রাল্‌ফ্ ফিচের এতদ্দেশ ভ্রমণকালে বাঙ্গালা রাজ্য মোগলাধিকৃত হইয়াছিল, এবং তখন গৌড়ের পরিবর্ত্তে টাঁড়া বঙ্গের রাজধানী হইয়াছিল; মেজর রেণেলও বলেন যে, ফেরিস্তার বিবরণ অনুসারে গৌড়ের জলবায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠাতে বঙ্গের রাজধানী তথা হইতে টাঁড়াতে স্থানান্তরিত হয়, এবং গৌড় ক্রমে জনশূন্য হইয়া পড়ে। আমরা (Badger) এই সিদ্ধান্ত করি যে, বঙ্গের রাজধানী গৌড় ও পরে টাঁড়া বাঙ্গালা নগরী নামে অভিহিত হইত। Mandelslo তদীয় বিবরণে গৌড় ও টাঁড়া হইতে স্বতন্ত্র এক বাঙ্গালা নগরীর উল্লেখ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। †

---

* "Bengalah had evidently ceased to exist when M. Fasncis Bernier journeyed in this "Land of the East and clime of the sun," which was during the middle of the 17th century, for that amusive and inquisitive traveller would surely have left some record of it in his "Travels in Mughal Empire."—RAINEY, *The Lost City* in *Mookerjee's Magazine*, New Series, vol. I.

† *Gour* was undoubtedly the capital of Bengal at this period (at the time of Varthema), but it appears that the name of the province was very commonly applied to the city, more especially by the foreigners. The following is from Barbosa :—"............The sea forms a gulf which bends towards the north, at the head of which situated a great city inhabited by Moors, which is caled *Bengala*." (RAMUSIO, vol. i., p. 330.) In 1537 during the viceroyalty of Nunno de Cunna, when the Portuguese first attempted to establish a fort in Bengal, "*Gowro*, the capital city, extended three leagues in length along the Ganges, and contained 1,200,000 families." (GREENE, vol. i., p. 84.) In Ralph Fich's time, 1583—1591, Tanda appears to have succeeded *Gour* as the capital of the kingdom, which had then become tributary to the Moghul Emperor.........The following is from Major Rennell on this subject :—"........According to Ferishta's acconnt the nnwholesomeness of its (Gour's) air occasioned it to be deserted soon after, and the seat of Government was removed to Tanda or Tanrah, a few miles higher up the river......I conclude, therefore, that Mandelslo errs in enumerating Bengalla as a city of that province distinct from Gour and Tanda."—BADGER, *The Travels of Ludorico di Varthema*, Hakluyt, p. 210, footnote.

ভার্থেমার বিবরণ সম্পাদনের সময় Badger বাঙ্গালা নগরী সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেন। কিন্তু এতদ্বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করিয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয়। Col. Henry Yule তাঁহার মতের সমালোচনা করিয়া Badgerকে এক লিপি প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি চাটিগাঁও অথবা সাতগাঁর সহিত বাঙ্গালার অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু Patavinoর গ্রন্থ পাঠে Badger এর প্রতীতি জন্মে যে, তিনি নিজে ও Col. Yule উভয়েই ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, Patavino বাঙ্গালাকে গৌড়, চাটিগাঁও, এবং সাতগাঁও হইতে স্বতন্ত্র নগরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। [ Patavinoর বিবরণ হইতে এতদংশ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ] মেজর রেণেলও তদীয় *Memoir of a Map of Hindoostan* নামক গ্রন্থে সাতগাঁও ও বাঙ্গালাকে পৃথক স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে Badger এর পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তিত হয়, * এবং তিনি তদীয় *Travels of Varthema* গ্রন্থের ভূমিকাতে এক postscript সংযোগ করিয়া বাঙ্গালা নগরী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এক স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেন। নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

Badger বাঙ্গালা নগরী সম্বন্ধে Varthema ও Barbosaর বিবরণ এবং Ramusioর সংগ্রহ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত *Sommario de' Regni*, etc. নামক পুস্তকের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া বলেন,—'এই বিবরণসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালা নগরীর অস্তিত্ব ছিল, উহা সমুদ্রতীরস্থ একটী বাণিজ্যপ্রধান বন্দর ছিল, এবং উহা হুগলী নদী ছাড়াইয়া বঙ্গোপসাগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল।'

'পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত কেবলমাত্র Purchas ও Mandelsloর গ্রন্থে বাঙ্গালার উল্লেখ আছে, অন্য কোথাও নাই।'

'Barbosaর পরে যে সমস্ত পর্য্যটক ভারতে আগমন করেন, তন্মধ্যে Cæsar Federick, Ralph Fitch, Hamilton প্রভৃতি, এবং তাৎকালীন ঐতিহাসিকগণের মধ্যে De Barros, De Faria y Souza প্রভৃতি কাহারও গ্রন্থে বাঙ্গালার কোন উল্লেখ নাই।'

'Varthema এবং Barbosaর পরে Purchas ও Mandelslo ব্যতীত অপর কোন পর্য্যটক অথবা ঐতিহাসিকের গ্রন্থে বাঙ্গালার কোন উল্লেখ নাই, অথচ, এসিয়া ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রাচীন মানচিত্রে বাঙ্গালা ও চাটিগাঁর উল্লেখ, এবং এমনকি উহার অনুকরণে তৎপরবর্ত্তী দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত সমস্ত মানচিত্রে এই নগরীদ্বয়ের পুনরুল্লেখ থাকা একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয়।' ব্রিটিস মিউজিয়ামে এসিয়া ও ভারতবর্ষের যে প্রাচীন মানচিত্র সমূহ সংগৃহীত আছে, Badger অতঃপর তাহার এক কালানুক্রমিক তালিকা প্রদান করিয়াছেন। [ এই তালিকাভুক্ত সমস্ত মানচিত্রই বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। Badger এর তালিকাভুক্ত সমস্ত মানচিত্রেই বাঙ্গালা ও চাটিগাঁও চিহ্নিত আছে। ]

'প্রাচীন মানচিত্রসমূহে বাঙ্গালা নগরী কোনস্থানে চিহ্নিত আছে, তাহা নির্ণয় করা অতঃপর আমাদের কর্ত্তব্য। Patavino ও Hondius অঙ্কিত মানচিত্রদ্বয়ে গঙ্গার পূর্ব্বমুখের দক্ষিণ তীরে বঙ্গোপসাগরের উপকণ্ঠে বাঙ্গালা নগরী অঙ্কিত হইয়াছে। Gastaldiর মানচিত্র তালিকাভুক্ত মানচিত্রসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। তদ্ব্যতীত তালিকার সমস্ত মানচিত্রেই বাঙ্গালা চাটিগাঁর পূর্ব্ব, উত্তর-পূর্ব্ব, অথবা দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে চিহ্নিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ও চাটিগাঁর পূর্ব্ববর্ণিত যে কোন অবস্থান প্রকৃত বলিয়া ধরিয়া লইলেও, চাটিগাঁও না ভাঙ্গিয়া মেজর রেণেলের মতানুসারে বাঙ্গালা নগরী কিরূপে নদী অথবা সাগর কবলিত হইতে পারে, ইহা নিতান্ত সন্দেহের বিষয়।

* BADGER, *The Travels of Varthema*, Introduction, p. lxxx.

পক্ষান্তরে, পরস্পরের স্থান বিনিময় করিয়া লইলে, অর্থাৎ, চাটিগাঁর স্থানে বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালার স্থানে চাটিগাঁর স্থাননির্দ্দেশ করিলে, কেবল যে রেণেলের অনুমান সম্ভবপর হয় তাহাই নহে, পরন্তু তদ্দ্বারা প্রাচীন মানচিত্রসমূহের তুলনায় আধুনিক কালে চাটিগাঁর দিকে বঙ্গোপসাগরের আপেক্ষিক গভীরতা, এবং চাটিগাঁও হইতে গঙ্গার পূর্ব্ব মুখের দূরত্ব বৃদ্ধি, এই দুইটি বিষয়ে সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। এই অনুমানের পোষকতার জন্য ইহা বলা যাইতে পারে যে, Gastaldiর মানচিত্রে ( প্রাচ্য ভূভাগের প্রাচীনতম মানচিত্রে ) প্রকৃত প্রস্তাবেই বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে চাটিগাঁও অঙ্কিত আছে।'

'De Barros এবং De Faria y Souza, এতদুভয়েই গঙ্গানদীর যেরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ( Badgerএর ) অনুমান সমর্থিত হয়। তাঁহারা উভয়েই বহুমুখী গঙ্গার বিবরণ দিতে যাইয়া সাতগাঁওকে গঙ্গার মুখের পশ্চিম সীমানাতে এবং চাটিগাঁওকে উহার পূর্ব্ব সীমানাতে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। কিন্তু, বাঙ্গালা প্রকৃত প্রস্তাবে যদি Barbosaর বিবরণ অনুযায়ী গঙ্গার নিম্নমুখের তীরে, এবং চাটিগাঁর দক্ষিণ-পূর্ব্ব অথবা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত হইত, তাহাহইলে Barros ও Souza চাটিগাঁর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালাকেই গঙ্গার মুখের পূর্ব্বসীমানা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।'

'যদিও এই যুক্তিসমূহ ক্ষীণ ভিত্তির উপর স্থাপিত, তথাপি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে অগত্যা ইহাদের সাহায্যেই আমরা (Badger) এইরূপ অনুমানে উপনীত হইয়াছি যে, ব্রহ্মপুত্রের আধুনিক মুখের সন্নিকটবর্ত্তী হাতিয়া এবং সন্দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে বাঙ্গালা নগরী অবস্থিত ছিল ; এবং ব্রহ্মপুত্রই প্রাচীন ভৌগোলিকগণ বর্ণিত গঙ্গার পূর্ব্ব শাখা, এইরূপ অনুমিত হয়। আমাদের অনুমান ভুল হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক, ইহা জানিয়াও ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানকারীগণের সাহায্য ও উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য বাঙ্গালা নগরীর স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত অনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল।' *

Badger যে ভাবে মেজর রেণেলের মতের অনুকূল যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার মত এই যে, বাঙ্গালা নগরী পূর্ব্বে হাতিয়া ও সন্দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, কিন্তু ( রেণেলের মতানুসারে ) পরবর্ত্তীকালে সাগর অথবা নদীর কুক্ষিগত হইয়া উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সমালোচনা।—গৌড় কিংবা টাঁড়ার সহিত বাঙ্গালার অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়া Badger প্রথমে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই প্রত্যাহার করিয়া স্বতন্ত্র মতাবলম্বী হইয়াছেন। সুতরাং, তদ্বিষয়ে আর কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় মত সমর্থনের জন্যও তিনি যে কয়েকটি যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার কোনটিই সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয় না। রেণেলের মত সমর্থনার্থ তিনি চাটিগাঁও ও বাঙ্গালার স্থান বিনিময়ের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় যেন তিনি প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত স্থাপন না করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত সমর্থনার্থ যে কোন কল্পনমূলক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। যে মনীষীবর্গ বাঙ্গালা নগরী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে Badger কৃত আলোচনা সর্ব্বাপেক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খ, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু, তিনি এরূপ কল্পনাশ্রিত, অলীক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাতেই প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে পারেন নাই। Gastaldiর মানচিত্রে বাঙ্গালার

---

* Badger এর মত ও যুক্তিসমূহ মূল গ্রন্থ হইতে ইংরেজীতে বিবৃত করিতে হইলে পাদটীকা অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। সেইজন্য এইস্থানে উহা উদ্ধৃত হইল না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক Hakluyt Societyর গ্রন্থাবলীভুক্ত George Percy Badger সম্পাদিত *The Travels of Ludovico di Varthema* গ্রন্থের ভূমিকা'তে Postscript ( CXIV হইতে CXXI পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ) পাঠ করিতে পারেন।

স্থাননির্দেশ তাহার কল্পনার অনুকূল সত্য, কিন্তু, সমস্ত মানচিত্র উপেক্ষা করিয়া Gastaldi কেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে আমরা অক্ষম। Gastaldiর মানচিত্রেও অন্যান্য প্রাচীন মানচিত্র সমূহের ন্যায় শত শত ভ্রম দৃষ্ট হয়।

বঙ্গোপসাগরের আপেক্ষিক গভীরতা এবং চাটিগাঁও হইতে গঙ্গার পূর্ব্বমুখের দূরত্বের হেতু নির্ণয় করিতে যাইয়া যদি বাঙ্গালা ও চাটিগাঁর স্থান বিনিময় সমর্থন করিতে হয়, তবে তাহা যেন অনুমানপ্রবণতার আতিশয্য ব লয়াই বোধ হয়।

Badger যে কয়েকটি যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই রেণেলের মত সমর্থনার্থ বলিয়াই যেন আমাদের নিকট বোধ হইল। বাঙ্গালা নগরী হাতিয়া ও সন্দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবস্থিত ছিল, তাঁহার এই মতের অনুকূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনরূপ প্রমাণই তিনি উপ স্থত করেন নাই। "In the absence of any direct proof to the contrary, beyond the not very reliable information contained in the old atlases, I am inclined to infer that *Bengala* occupied a position between the Hattia and Sundeep islands situated at the present mouth of the Brahmaputra."—Badger তাঁহার মত সমর্থনার্থ এইমাত্র বলিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন সুতরাং, তাঁহার মতের মূল্য যে অধিক নহে, পাঠকবর্গ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। Badger নিজেও তাঁহার সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন, তাহা নিশ্চয়। কারণ, তিনি নিজেই বলিয়াছেন, —"This alone is but slender ground whereon to form an hypothesis"

কর্ণেল হেন্‌রী ইউল্।—Mr. George Percy Badger সম্পাদিত *The Travels of Ludovico di Varthema* নামক গ্রন্থে বাঙ্গালা নগরী সম্বন্ধে তদীয় অভিমত পাঠ করিয়া Colonel Henry Yule তাহার সমালোচনা করিয়া Badgerকে এক লিপি প্রেরণ করেন। তদীয় গ্রন্থের ভূমিকাতে Badger এই লিপির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে Col. Yule Badger এর অভিমতের ( অর্থাৎ, বাঙ্গালা ও গৌড় অভিন্ন, এই মতের ) সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—ভার্থেমার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বাঙ্গালা সমুদ্রতীরস্থ একটি বন্দর ছিল, সুতরাং উহা গৌড় হইতে পারে না। Genoa নগরীর Hotel Royalএ অবস্থান কালে তত্রস্থ পুস্তকাগারে Dutch Latin ভাষা নবদ্ধ একখানা পুরাতন ভূগোল পুস্তকে J. and C. Blaen অঙ্কিত কয়েকখানা অতি উত্তম মানচিত্র দেখিতে পাই। ঐ মানচিত্রসমূহে কোন নাম নাই, কিন্তু তৎকাল ইংলণ্ডে প্রথম চার্লসের রাজত্বকাল, এইরূপ উল্লেখ থাকাতে বোধ হয় যে, তৎসমূহ আনুমানিক ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত। তাহাতে বাঙ্গালা নগরী চাটিগাঁর সন্নিকটে, উহার বিপরীত দিকে চিহ্নিত আছে। যদিও এই মানচিত্রের উপর আমি অধিক আস্থা স্থাপন করি না, তথাপি চাটিগাঁও, অথবা ইবন্ বতুতার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এক শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুবৃহৎ বন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ, হুগলী নদীতীরস্থ সাতগাঁও বাঙ্গালা নগরী বলিয়া অনুমিত হয়।*

* "I think, it is to be deduced from what Varthema says, that the 'city of Banghalla' was a seaport, and therefore could not be Gour. In an old Dutch Latin geography book, which I have chanced on in the *salle* of this hotel ( Hotel Royal, Genoa,) with wonderfully good maps, by J. and C. Blaen, ( no title : date about 1640, as Charles I. is spoken of as reigning,) I find *Bengala* put down as a town close and opposite to *Chatigam* (Chittagong). I don't lay much stress on this : but I suspect it was either Chittagong, or Satgong on the Hoogly, which was the great port one hundred years later, and also in Ibn Batutah's time"—Col. Yule's letter, as quoted in BADGER, *Travels of Varthema*, Introd., p. lxxx.

Badgerএর গ্রন্থের ভূমিকাতে Col. Yuleএর পূর্ব্বোক্ত লিপির উল্লেখ আছে; ঐ গ্রন্থ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। Col. Yule ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে Hakluyt Society কর্ত্তৃক প্রকাশিত তদীয় *Cathay and the way thither* নামক গ্রন্থে বাঙ্গালা নগরী সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথমোক্ত মত পরিবর্ত্তনের হেতু কি, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন:— 'বাঙ্গালা নগরীর সহিত অভিন্নতার দাবীতে সোণারগাঁও চাটিগাঁর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। এসিয়ার মধ্যযুগের ভূগোল যাঁহাদের আলোচনার বিষয়ীভূত, বাঙ্গালা নগরী লইয়া তাঁহারা যথেষ্ট মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়াছেন; Mr Badger তৎসম্পাদিত ভার্থেমার বিবরণের ভূমিকাতে এতৎসম্বন্ধে প্রভূত চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভারত উপদ্বীপে মালাবার নামক কোন নগর ছিল কিনা, (চীনদেশের অন্তর্গত) ক্যাণ্টন্ (Canton) নগর প্রকৃতই মহাচীন নামে অভিহিত হইত কিনা, এই সমস্ত বিষয় যেরূপ সন্দেহের বিষয়ীভূত, সেইরূপ কোন নগরের প্রকৃত প্রস্তাবেই বাঙ্গালা নাম ছিল, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, প্রদেশের নামানুসারে তদ্দেশের প্রধান বন্দরের নামাকরণ হইবার রীতি প্রচলিত ছিল: কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রকৃত নামের সহিত যখন ঐ স্থানেরই উপ-নাম পাশাপাশি ভাবে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়, তখন ঐ উপ-নাম অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

সমালোচনা।—কর্ণেল ইউলের প্রথমোক্ত মতের,— অর্থাৎ চাটিগাঁও অথবা সাতগাঁও এবং বাঙ্গালা নগরী অভিন্ন, এই মতের) সমালোচনা করিয়া Badger লিখিয়াছেন, ('সাতগাঁও দ্বারা বোধ হয় কর্ণেল ইউল্ যে Sadkawan নগরে ইব্ন্ বতুতা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ করেন এবং যাহা সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া ইব্ন্ বতুতা বর্ণনা করিয়াছেন, সেই নগরকেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু, ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Patavinoর ভৌগোলিক গ্রন্থে বাঙ্গালা গৌড়, চাটিগাঁও এং সাতগাঁও হইতে স্বতন্ত্র স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা কর্ণেল ইউলের মত ও তৎসঙ্গে আমার মত (অর্থাৎ, গৌড় ও বাঙ্গালা অভিন্ন, এই মত), উভয়ই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। মেজর রেণেলও বাঙ্গালা এবং সাতগাঁওকে বিভিন্ন স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।' †

Badger কর্ণেল ইউলের মতের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র Patavino ও রেণেলের নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু, এই মতের প্রতিকূলে আরও বহু বক্তব্য আছে। Gastaldi (১৫৬১), William Baffin (১৫১৯), N. Sanson

---

* "Sunarganw must dispute with Chittagong the claim to be that "city of Bengala" which has so much troubled those interested in Asiatic medieval geography, and respecting which Mr. Bedger has an able disquisition in his preface to Varthema. That there was a town *properly* so-called, I decline to believe, any more than that there was a city of the Peninsula *properly* called Ma'bar, or that Canton was *properly* called Mahachin; but these examples sufficiently show the practice which applied the name of a country to its chief port. The name becomes a blunder only when found side by side with the proper name as belonging to a distinct place."—Col. H. YULE, *Cathay and the way thither*, Vol. II., p. 465.

† "By *Satgong*, I presume the Colonel indicates Ibn Batuta's *Sadkawan*, which the latter describes as "the first town he entered," [in Bengal,] and as being "large and situated on the sea-shore." [Lee's translation, p. 194]. But a statement from Patavino, whose work was published in 1597, seems to upset my friend's deduction as well as my own; for it also describes *Bengala* as a town distinct from either Gour, or Chittagong, or Satgong."

[ Patavinoর মূল গ্রন্থ হইতে এই অংশ ইতিপূর্ব্বে পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা দ্রষ্টব্য। ]

"I find, moreover, that Rennell likewise recognices *Satgong* and *Banghella* as distinct towns, and gives some clue towards determinning the position of the latter."—BADGER, *Travels of Varthema*, Introd., pp. lxxx, lxxxi.

( ১৬৫০ ), Philippi Chetwind ( ১৭৬৬ ), Pierre Vander ( ১৭২৭ ), প্রভৃতি অঙ্কিত বহু মানচিত্রে বাঙ্গালা, চাটিগাঁও ও সাতগাঁও এই তিনটি স্থানই স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, Badger কর্ত্তৃক তদীয় গ্রন্থের ভূমিকাতে উল্লিখিত পঞ্চদশাধিক মানচিত্রে বাঙ্গালা ও চাটিগাঁও বিভিন্ন জনপদ বলিয়া চিহ্নিত আছে। Fra Mauroর মানচিত্রে বাঙ্গালা ও সাতগাঁও পৃথক স্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। সুতরাং, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাঙ্গালা এবং চাটিগাঁও অথবা সাতগাঁও কোনক্রমেই অভিন্ন হইতে পারে না,—উহার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র নগর।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Badgerএর গ্রন্থে Col. Yuleএর যে মত প্রকাশিত হয়, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত স্বীয় গ্রন্থে তিনি তাহা হইতে স্বতন্ত্র মত প্রদান করেন। তাঁহার এই পরিবর্ত্তিত মতের সহিত আমাদের মতের ঐক্য আছে। সেইজন্য তিনি এই মতের অনুকূলে যে যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক আলোচনা যে স্থানে আমাদের স্বীয় মত প্রকাশ করিব, সেইস্থানে লিপিবদ্ধ হইবে। একাধিকবার এক বিষয়ের আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

<u>ডাক্তার জেম্‌স্ টেলার</u>।—Dr. James Taylor বহুদিন ঢাকার সিভিল সার্জ্জন ছিলেন। তিনি ঢাকার ইতিহাসের বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca* প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ গভর্ণমেণ্টের আদেশে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ডাক্তার টেলারের মতে ঢাকা ও বাঙ্গালা নগরী অভিন্ন। তিনি লিখিয়াছেন,—'আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ঢাকা নগরীর উল্লেখ না থাকিলেও উহা বঙ্গে মোগলাধিকারের পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ স্থান রূপে পরিগণিত ছিল। কিংবদন্তী এই, ঢাকাতে ৫২টি বাজার এবং ৫৩টি রাজপথ বর্ত্তমান ছিল, এবং তজ্জন্যই চলিত ভাষায় ইহা "বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলি" নামে অভিহিত হইত। এই বায়ান্ন বাজারের মধ্যে একতম—বাঙ্গালা বাজার—অদ্যাপি ঢাকা নগরীতে বর্ত্তমান আছে, এবং আমার (টেলারের) বিশ্বাস, উহা বঙ্গদেশের একটি অতি প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বহু ইউরোপীয় পর্য্যটক বাঙ্গালা নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের মানচিত্রে উহা ঢাকা নগরীর স্থানে চিহ্নিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা এবং "বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলি," এতদুভয় নগরী অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। শেষোক্ত নগরীর অন্তর্গত বাঙ্গালা বাজার হয়ত বিদেশীয় বণিকগণের বাণিজ্য স্থান ছিল; ক্রমে তাহারা আয়াসোচ্চারিত ও সুদীর্ঘ "বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলি" নাম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা বাজার নামানুসারে সমস্ত নগরীকেই বাঙ্গালা নামে অভিহিত করিতে থাকে। বাঙ্গালা ও ঢাকা একই স্থান ছিল, এই অনুমাণের সমর্থনার্থ ইহা বলা যাইতে পারে যে, কোনও পর্য্যটক এতদুভয় স্থান একত্র উল্লেখ করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ Methold বঙ্গদেশের নগরসমূহের নাম করিতে যাইয়া রাজমহল ও বাঙ্গালাকে সুন্দর নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; পক্ষান্তরে, তাঁহার সমসাময়িক Herbert এবং Mandelslo রাজমহল ও ঢাকার উল্লেখ করিয়াছেন—বাঙ্গালার উল্লেখ করেন নাই।* Mandelsloর

* "Though Dacca is not mentioned in the Ayeen Akbery, it would appear, nevertheless, from the statement of the natives, to have been a place of considerable extent prior to the Moghul conquest. The tradition is, that it originally consisted of 52 bazars and 53 streets, and that from this circumstance, it obtained the long and somewhat inconvenient name of "Bauno Bazar and Teppun Gullee." One of these bazars called the Bengalla Bazar still exists, and is knonwn, I believe, throughout the country, as one of the most ancient places of trade in Bengal. During the 16th, and the early part of the 17th century, the city of Bengalla, it may be remarked, is frequently mentioned by European travellers, and is laid down in their maps apparently in the situation of Dacca...It is not improbable

মানচিত্রে বাঙ্গালা একটি বৃহৎ নগর বলিয়া চিহ্নিত আছে, অথচ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে রাজমহল, ঢাকা, পিপলীপত্তন এবং চাটিগাঁও ( অথবা সাতগাঁও ) বঙ্গদেশের প্রধান নগর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,—পুস্তকে বাঙ্গালা নগরীর কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, একই স্থানের ঢাকা ও বাঙ্গালা এই উভয় নামই প্রচলিত থাকাতে Mandelslo-র মানচিত্রে ঐ নগরকে বাঙ্গালা, এবং তাঁহার গ্রন্থে উহাকে ঢাকা নাম প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং, ঢাকা ও বাঙ্গালা, এই নগরীদ্বয় অভিন্ন। *

ডাক্তার টেলার আরও বলেন,—এতদ্দেশে নদীকবলিত শ্রীপুর, কোটীশ্বর প্রভৃতি প্রাচীন নগরসমূহের স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই ; কিন্তু, বাঙ্গালা নগরীর নাম পর্য্যন্ত এতদ্দেশবাসীগণ কখনও শোনে নাই। এতদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, ইউরোপীয় বণিকগণ সুদীর্ঘ "বাম্নার বাজার তেপ্পান্ন গলির"র পরিবর্ত্তে সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা নামই ব্যবহার করিতেন। ঐ নাম তাহাদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, জনসাধারণ ঐ নাম ব্যবহার করিত না। ঢাকার পশ্চিমাংশে যেস্থানে ঢাকেশ্বরী দেবীর মন্দির বিরাজিত, সেই অঞ্চলকেই লোকে সচরাচর ঢাকা বলিত, এইরূপ প্রতীত হয়। †

**সমালোচনা।**—প্রথমতঃ, ঢাকার বাঙ্গালা বাজারের নাম হইতে বাঙ্গালা নগরীর নামোৎপত্তি হইয়াছে, ডাক্তার টেলারের এই অনুমান উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত এক অভিনব কল্পনা। যে ক্ষীণ ভিত্তির উপর তাঁহার এই অনুমান স্থাপিত, তাহা কতদূর বিচারসহ হইয়াছে, তাহা বিবেচ্য। বাঙ্গালা বাজার ও বাঙ্গালা এই স্থানদ্বয়ের নামগত সাদৃশ্য দেখিয়াই উভয়কে অভিন্ন কল্পনা করা সমীচীন নহে।

দ্বিতীয়তঃ, টেলার লিখিয়াছেন,—কোনও পর্য্যটক ঢাকা ও বাঙ্গালা এই উভয় নগরের একত্র উল্লেখ করেন নাই, দুয়ের যে কোন একটির উল্লেখ করিয়াছেন। [ "Only one of them ( Dacca or Bengalla) is ever mentioned by the same traveller." ] কিন্তু, তাহার এই উক্তি প্রকৃত নহে। ডাক্তার টেলার বোধ হয় অবগত ছিলেন না যে, Sebastion Manrique-এর বিবরণে, এবং William Baffin, N. Sauson, Tavernier Mandeslo, Pierre Vander. প্রভৃতির মানচিত্রে ঢাকা ও বাঙ্গালা এই উভয় নগরীই উল্লিখিত আছে। এই একটি মাত্র যুক্তি দ্বারাই ডাক্তার টেলারের মতের অলীকত্ব প্রমাণিত হয়।

---

that "Bauno Bazar and Teppun Gullee" was the city" in question, "and that the name of Bengalla, by which one of its many bazars was known, was applied by Europeans to the whole town, from the circumstance, perhaps, of this bazar being the place, in which trade was then chiefly carried on with foreigners. What tends to confirm this opinion of the identity of *Dacca* and *Bengalla*, is the circumstance that only one of them is ever mentioned by the same traveller. Methold in enumerating the principal cities of Bengal for instance, mentions Rajmahl and Bengalla, which he designates "faire cities", while Herbert and Mandelslo, who travelled about the same period, specify Dacca and Rajmahl, but make no mention of Bengalla."

——TAYLOR, *Topography of Dacca*, pp. 91-93.

* "The Editor of the East Indian Chronologist mentions, that he possesses a Map by Mandeslo in which Bengalla is laid *down as a large city which is also in favour of the supposition of Bengalla and Dacca* being the same place : for the former is not mentioned in his book. "The principal cities being *Rajmahl*, Dacca or Kaka, Phillipatan and Satigan." ——*Ibid.* p. 92, footnote.

† "The natives...mention two cities called Serripore and Kotesur as having been destroyed, but of the existence of Bengalla, they have never heard, a circumstance that tends to support the opinion, that the name was originally used by foreign traders instead of "Bauno Bazar, and Tuppun Gullee," or of Dhaka, which latter appellation appears to have been exclusively applied to the western quarter of the town in the vicinity of the town "Dehaka Serry." ——*Ibid.* p. 93.

তৃতীয়তঃ, Methold রাজমহল ও ঢাকার উল্লেখ করিয়াছেন, স্মতরাং বাঙ্গালা ও ঢাকা অভিন্ন, এইরূপ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই বিচারসহ হইতে পারে না। কারণ, এইরূপ যুক্তি ভ্রমাত্মক ( fallacious ), এবং ইহার সাহায্যে যে কোন নগরদ্বয়ের অভিন্নতা অনুমান করা যায়।

চতুর্থতঃ, East India Chronologist এর সম্পাদকের নিকট Mandelslo অঙ্কিত একখানা মানচিত্র আছে, ডাক্তার টেলার এইরূপ লিখিয়াছেন। Mandelslo নিজে কোন মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন কিনা, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে, কারণ তাহাহইলে Mandelslo অন্ততঃ স্বরচিত গ্রন্থে তাহা অবশ্যই সংলগ্ন করিতেন। কিন্তু, তাঁহার *Voyages Celebres & remarquables, Taits de Perse Aux Indes Orientales* নামক ভ্রমণ বৃত্তান্তে Pierre Vander অঙ্কিত প্রাচ্য দেশ সমূহের কতিপয় মানচিত্র, এবং Olearius রচিত *The Voyages and Travells of the Ambassadors* নামক গ্রন্থে ( যাহাতে Mandelsloর ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় ) D. Christoph. Bathurst অঙ্কিত মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই উভয় গ্রন্থ সংলগ্ন সমস্ত মানচিত্রই আমি নিজে দেখিয়াছি। East Indian Chronologist এর সম্পাদকের নিকট বোধ হয় ইহারই একখানা আছে।

পঞ্চমতঃ, Mandelsloর গ্রন্থে রাজমহল ও ঢাকার উল্লেখ আছে—বাঙ্গালানগরীর উল্লেখ নাই, অথচ তাঁহার মানচিত্রে বাঙ্গালা চিহ্নিত আছে; স্মতরাং, বাঙ্গালা ও ঢাকা অভিন্ন, ডাক্তার টেলার এইরূপ যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু, পর্য্যটকগণের গ্রন্থ ও মানচিত্র তুলনা করিলে বহুস্থলে এতদনুরূপ ব্যাপার লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—Sir Thomas Rooর গ্রন্থে বাঙ্গালানগরীর উল্লেখ নাই, অথচ তৎসংলগ্ন মানচিত্রে ঐ স্থান চিহ্নিত আছে। সেইজন্য বাঙ্গালানগরীকে Rooর গ্রন্থোল্লিখিত অন্য কোন স্থানের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

ডাক্তার টেলার যে যুক্তি সমূহের বলে বাঙ্গালা ও ঢাকা নগরীর অভিন্নতা নির্দ্দেশে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহার কোনটিই দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে। বিশেষতঃ, আমাদের দ্বিতীয় সমালোচনা দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে। স্মতরাং, বাঙ্গালা নগরীর স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ডাক্তার টেলারের মত ভ্রমাত্মক ও পরিবর্জ্জনীয়।

মিঃ বেভারিজ।—Mr. H. Beveridge বাখরগঞ্জ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি *The District of Bakarganj* নামক বাখরগঞ্জ জেলার একখানা বহু তথ্যপূর্ণ ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ ৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পরিশিষ্টে খৃষ্টীয় পর্য্যটকগণের বিবরণ এবং তৎপ্রসঙ্গে বাঙ্গালা নগরী সম্বন্ধে আলোচনা অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। বেভারিজ সাহেব লিখিয়াছেন,—'বাঙ্গালা নগরী ও রাল্‌ফ ফিচ্‌ বর্ণিত বাকলা আমার অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। Marseilles নগরবাসী ফরাসী পর্য্যটক Le Blanc ফিচের দশ বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে বঙ্গদেশ পর্য্যটন করিয়া লেখেন যে, বাঙ্গালা বঙ্গদেশের প্রধান নগরী, এবং দেশবাসীগণ সাধারণতঃ বাঙ্গালাকে 'বাটাকুটা' ( Batacouta ) নামে অভিহিত করে। Faria Y Souza এবং বোধ হয় আরও কেহ কেহ বাকলাকে 'বাটিকালা' (Baticala) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 'বাটাকুটা' এবং 'বাটিকালা' নামদ্বয় পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত; এবং ইংরেজ বর্ণমালার *t* এবং *l* এর মধ্যে আকৃতিগত প্রভেদ অতি সামান্য হওয়াতে প্রাচীনকালে পাণ্ডুলিপি ছাপা হওয়ার সময় মুদ্রাকর প্রমাদ হওয়াও অসম্ভব নহে।'* হয়ত ছাপার ভুলে 'কালা' স্থানে 'কুটা'

---

*"It has occured to me that Bengala is indentical with Fitch's Bacola Le Blanc of Marseilles, who was in Bengal some ten years before Fitch, speaks of Bengala as being the principal town of Bengal, but adds the impor-

হইয়াছে,—মূলতঃ একই নামের বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র। 'বাটাকুটা' এবং 'বাটিকালা' বাকলা শব্দেরই বৈদেশিককৃত বিকৃতি বলিয়া অনুমিত হয়।

**সমালোচনা।**—প্রথমতঃ, বেভারিজ সাহেব যে যুক্তির উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে। তিনি বাঙ্গালা ও Batacouta, এবং বাকলা ও Baticala এক বলিয়াছেন, এবং তাহার প্রমাণ প্রয়োগও করিয়াছেন। ইহা মানিয়া লইলেও, Batacouta এবং Baticalaর অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কেবল নামগত সামান্য সাদৃশ্য ভিন্ন এতদুভয়ের একত্বেরঅন্য কোন প্রমাণই নাই। এই ক্ষীণ ভিত্তির উপর সিদ্ধান্ত স্থাপন করা নিরাপদ নহে।

দ্বিতীয়তঃ, বেভারিজ সাহেব নিজেই পাদটীকাতে লিখিয়াছেন—"There was also a Baticala in Canara and another in Ceylon." আমাদের বোধ হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত নামের তিনটি স্থানকে বিদেশীয় পর্য্যটকগণ বিকৃত করিয়া Baticala নামে অভিহিত করিয়াছেন। Baticala কোন স্থানেরই প্রকৃত নাম নহে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একই নামযুক্ত তিনটি স্থানের অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এরূপাবস্থায়, একটা বিকৃত নামের সহিত অন্য আর একটা নামের সাদৃশ্য দেখাইয়া তাহা হইতে স্বতন্ত্র অন্য দুইটি স্থানের একত্ব প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া আমাদের নিকট নিতান্ত কষ্টকল্পনা বলিয়া বোধ হয়। Batacouta ও Baticala, এতদুভয় নামের যে সাদৃশ্য আছে, তদপেক্ষা বাঙ্গালা ও বাকলা শব্দদ্বয়ের মধ্যে অধিকতর সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে করি। নামগত সাদৃশ্য দেখিয়া একত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে বেভারিজ সাহেব ত কষ্ট করিয়া Batacouta ও Baticala র সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও পারিতেন। কিন্তু এরূপ যুক্তি কেহ গ্রহণ করিবে কি?

তৃতীয়তঃ, বেভারিজ সাহেব যদি আরও অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া বাঙ্গালা নগরী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন তবে দেখিতে পাইতেন যে, Sebastian Mauriqueএর (১৬২৮—৪১) বিবরণে, এবং Hondius (১৬১২), Philippi Chetwind (১৬৬৬), Tavenier Mandeslo (১৬৮৩), Pierre Vander (১৭২৭), প্রভৃতি অঙ্কিত মানচিত্রে বাঙ্গালা নগরী ও বাকলা এতদুভয়ই স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত আছে। এতগুলি পর্য্যটক ও ঐতিহাসিকের এই বিষয়ে ভ্রম হইয়াছে, এরূপ অনুমানের কোন কারণ নাই। অতএব, বাঙ্গালা ও বাকলা যে এক হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রথম দুই যুক্তিতে যাঁহাদের সংশয় নিরসিত হয় নাই, আশা করি, এই তৃতীয় যুক্তিতে তাহা সিদ্ধ হইবে।

<u>রেভারেণ্ড এইচ্ হষ্টেন্</u>।—Rev. H. Hosten, S. J. ১৯১৩ সনের নভেম্বর মাসের Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকায় *The Twelve Bhuiyas or Landlords of Bengal* শীর্ষক একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তাহাতে তিনি প্রসঙ্গ ক্রমে বাঙ্গালা নগরী সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পর্য্যটকগণের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, সোণারগাঁও, সাতগাঁও, চাটিগাঁও, এবং এমনকি হুগলী ও চন্দননগর পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে বাঙ্গালা নগরী নামে অভিহিত হইয়াছে; প্রকৃত প্রস্তাবে তৎসাময়িক প্রধান বন্দরই ঐ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজ মানচিত্রকরগণ চাটিগাঁতে বাঙ্গালা নগরী চিহ্নিত

tant observation that the native name of it was Batacouta. Faria Y Souza, and perhaps some other writers, seem to call Bacola sometimes Baticala, which is very near to Le Blanc's word, especially when we consider how easily *t* may be mistaken for an *l* in printing from a manuscript.——H BEVERIDGE, *The District of Bakarganj*, Trubner Series, 1876, Appendix VII, p. 445.

করিয়াছেন কেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। চাটিগাঁওই প্রথম পর্তুগীজ উপনিবেশ, এবং ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহারা ঐ স্থানে বাস করে। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী নগরী স্থাপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনও পর্তুগীজের পক্ষে বাঙ্গালাদেশে আসা অর্থ ছিল—চাটিগাঁতে আসা। সুতরাং, বাঙ্গালা একবার চাটিগাঁতে চিহ্নিত হওয়ার পর হইতেই ঐ ভ্রম প্রাচীন ভৌগোলিকগণের মধ্যে পর পর সংক্রামিত হইতে লাগিল। এমনকি ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভুলের জের চলিয়াছে। Lubinus নামক একজন Augustinian সম্প্রদায়ভুক্ত লেখক হুগলী গির্জ্জাকে বাঙ্গালা দেশস্থ গির্জ্জা বলিয়া বর্ণিত দেখিয়া উহাকে চাটিগাঁতে, এবং এমনকি Cosmi (Bassein) নদীর তীরে চিহ্নিত করিয়াছেন। চন্দননগর হইতে লিখিত কয়েকখানা প্রাচীন পত্র আমাদের নিকট সংগৃহীত আছে। তাহার শিরোভাগে—'বাঙ্গালা হইতে'—এইরূপ লিখিত আছে। এখন, কোন সময়ে কোন পর্য্যটক কোন স্থানকে বাঙ্গালা বলিয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কিন্তু, তাই বলিয়া অধৈর্য্য হইয়া এরূপ বলিবার কোন কারণ নাই যে, বাঙ্গালার অস্তিত্ব জনশ্রুতিমূলক, অথবা উহা সুন্দরবনের কোনস্থানে অবস্থিত ছিল, এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না।

. . . . . . . .

'Manrique বলিয়াছেন,—বাঙ্গালার নৃপতি পূর্ব্বে গৌড়ে বাস করিতেন, এবং তাঁহার অধীনস্থ দ্বাদশটি রাজ্যে দ্বাদশ জন সামন্ত নৃপতি (বারভূঞা) ছিলেন। ["The monarch of Bengala, who resided formerly at Gaur, had under him twelve petty Kings in the twelve Provinces under him."] এই উক্তি হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাঙ্গালাতে বঙ্গের তাৎকালীন নৃপতির রাজধানী অবস্থিত ছিল।

'ম্যান্রিকের বঙ্গ পর্য্যটন কালে (১৬৪০ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গের বারভূঞাগণের অধিকাংশই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, গৌড় নগরী তৎকালে ভগ্ন স্তূপে পরিণত, সাতগাঁও ধ্বংসমুখে পতিত, এবং ম্যান্রিকের উক্তি অনুসারে ঢাকা ও রাজমহলে দুইজন ভূঞার রাজধানী অবস্থিত। সুতরাং, এরূপাবস্থায় ম্যান্রিক্ বর্ণিত বাঙ্গালার ভূঞার বাসস্থান কোথায় নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষ বিচার্য্য বিষয়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর তারিখে Fr. John Cabral, S. J. কর্ত্তৃক লিখিত একখানা অপ্রকাশিত লিপিতে বঙ্গে মুসলমান (মোগল) অধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালার অধিপতি Massacan এর পুত্র Minimican এর উল্লেখ আছে। ইহাতে আমরা (Rev. Hosten) আরও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি: কারণ, বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর মতে এই Massacan সোণারগাঁও অথবা কত্রাভূর অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলির পুত্র মুসা খাঁ। সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া আমি এই মতে উপনীত হইয়াছি যে, ম্যান্রিকের সময়ে বাঙ্গালার ভূঞা টাঁড়া অঞ্চল শাসন করিতেন। গৌড়ের পরে টাঁড়াই বঙ্গের রাজধানী, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গের মোগল শাসনকর্ত্তাগণের প্রিয় প্রবাসভূমি ছিল। *

সমালোচনা।—Rev. Hosten প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, বিভিন্ন পর্য্যটক সোণারগাঁও, সাতগাঁও, চাটিগাঁও, এবং এমনকি হুগলী এবং চন্দননগরকে পর্য্যন্ত বাঙ্গালা নামে অভিহিত করিয়াছেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তসমূহের মধ্যে এত অধিক অনৈক্য দৃষ্ট হয় যে, তৎসমূহ নিবিষ্ট হইয়া আলোচনা করিলে প্রকৃত প্রস্তাবেই ঐরূপ একটা ধারণা মনে উপস্থিত হয়। কিন্তু, এই পরস্পরবিরোধী বিক্ষিপ্ত উপকরণাবলীর

* Rev. Hostenএর মত মূল ইংরেজী ভাষায় বিবৃত করিতে হইলে পাদটীকা অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক J. Proc. A. S. B., *New Series*, vol. IX. (1913) এ প্রকাশিত Rev. Hosten লিখিত *The Twelve Bhuiyas or Landlords of Bengal* শীর্ষক প্রবন্ধের ৪৪৩ ও ৪৪৫ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন।

মধ্য হইতেই ছাট কাট দিয়া এমন একটা সাধারণ ভিত্তি বাহির করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে বাঙ্গালা নগরীর স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া যায়। যথাস্থানে আমরা তাহার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া এস্থানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

Rev. Hostenও তাঁহার এই মত পরিত্যাগ করিয়া শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ম্যান্‌রিকের সময়ে টাঁড়া ও বাঙ্গালা নগরী অভিন্ন ছিল। দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহার এই মতও সমর্থন করিতে পারি না। প্রথমতঃ, তিনি গৌড়, সাতগাঁও, চাটিগাঁও, ঢাকা, রাজমহল, প্রভৃতি কোন নগরীর সহিতই বাঙ্গালার ঐক্য নির্দ্দেশে অক্ষম হইয়া শেষে অগত্যা টাঁড়ার সহিত বাঙ্গালার অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এতদ্বিষয়ে তিনি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই,—negative প্রমাণই তাঁহার অবলম্বন।

দ্বিতীয়তঃ, ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন শুনিয়া Rev. Hosten হতবুদ্ধি হইয়াছেন। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে হতবুদ্ধি হইবার কোন কারণ নাই। তিনি যদি অগ্রে সিদ্ধান্ত করিয়া পরে প্রমাণ সংগ্রহে অগ্রসর না হইয়া, নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিতেন, তবে Cabral এর পত্রের মর্ম্মে হতবুদ্ধি না হইয়া বরং প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে পারিতেন; কারণ, সোণারগাঁওই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা নগরী।

তৃতীয়তঃ, ম্যান্‌রিকের সময়ে, অর্থাৎ ১৬২৮ হইতে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ও তাহার পরে টাঁড়া ও বাঙ্গালা নগরী অভিন্ন ছিল, Rev. Hosten এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু, ম্যান্‌রিকের সমসাময়িক Mandelslo (১৬৩৮—৪০, তদীয় গ্রন্থে বাঙ্গালা নগরী ও টাঁড়ার স্বতন্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। Peter Heylyn এর বিবরণে (১৬৫২ খৃষ্টাব্দ), এবং Tavernier Mandeslo (১৬৮৩), ও Pierre Vander (১৭২৭), প্রভৃতি অঙ্কিত মানচিত্রে টাঁড়া ও বাঙ্গালা নগরী, এতদুভয় স্থান স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত আছে। ইঁহারা ম্যান্‌রিকের প্রায় সমসাময়িক। সুতরাং, Rev. Hosten এর মতানুযায়ী টাঁড়া ও বাঙ্গালা এক হইতে পারে না।

## তৃতীয় খণ্ড।—“বাঙ্গালা” নগরীর স্থাননির্দ্দেশ।

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা নগরীর স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে বহু মনীষীর মত বিবৃত করিয়া সমালোচনা দ্বারা তাহা খণ্ডিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমাদের মত এই যে, বাঙ্গালা নগরী ও সোণারগাঁও অভিন্ন। নিম্নে তদ্বিষয়ক যুক্তিসমূহ বিবৃত হইল।

(১) ইতঃপূর্ব্ব প্রদত্ত মানচিত্রের তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, চতুর্দ্দশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অঙ্কিত যে ত্রিংশাধিক সংখ্যক মানচিত্রে বাঙ্গালা নগরী চিহ্নিত আছে, তাহার একখানাতেও পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধতম স্থান সোণারগাঁও চিহ্নিত নাই। কোন পর্য্যটকের বিবরণে অথবা কোন প্রাচীন মানচিত্রে বাঙ্গালা ও সোণারগাঁর একত্র উল্লেখ আছে বলিয়া আমরা জানি না। ইবন্ বতুতা ও রাল্‌ফ্ ফিচ্ সোণারগাঁর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালা নগরীর কোন উল্লেখ তাঁহাদের গ্রন্থে নাই। তদ্রূপ, অষ্টাদশ শতাব্দীর Van den Broucke, Van Braam, De Barros, Major Rennell, প্রভৃতির মানচিত্রেও সোণারগাঁও চিহ্নিত আছে, কিন্তু বাঙ্গালা নগরী নাই। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাঙ্গালা ও সোণারগাঁও একই স্থানের বিভিন্ন নাম বলিয়া কোন স্থানেই দুই নাম একত্রে ব্যবহৃত হয় নাই।

(২) Ramusio, V. le Blanc, Purchas, প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বাঙ্গালা নগরী বঙ্গদেশের রাজধানী

অথবা প্রধান নগরী ছিল, এবং উহার নামানুসারেই সমগ্র বঙ্গদেশের নামাকরণ হইয়াছে। গৌড়, টাঁড়া, ঢাকা, রাজমহল, ও সোণারগাঁতে কিয়ৎকাল করিয়া সমগ্র বঙ্গের অথবা প্রাদেশিক রাজধানী অবস্থিত ছিল। সুতরাং, ইহারই মধ্যে কোনটির বাঙ্গালা নগরী হইবার সম্ভাবনা। প্রথমোক্ত নগরচতুষ্টয় যে বাঙ্গালা নহে, তাহা পূর্ব্বেই নিঃসন্দেহরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং, সোণারগাঁওই বাঙ্গালা নগরী বলিয়া অনুমিত হয়।

(৩) Rev. Hosten এর মত লিপিবদ্ধ করার সময়েই লেখা হইয়াছে যে, ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর তারিখে Fr. John Cabral, S. J. কর্ত্তৃক লিখিত একখানা অপ্রকাশিত লিপিতে বঙ্গে মুসলমান (মোগল) অধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালার অধিপতি Massacan এর পুত্র Minimican এর উল্লেখ আছে। এই Massacan সোণারগাঁর ভূঞা সুপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ। মুসা খাঁ বাঙ্গালার নৃপতি বলিয়া উল্লেখ থাকাতেই বাঙ্গালা ও সোণারগাঁও অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

(৪) Ramusioর সংগ্রহ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত *Sommario de' Regni* নামক পুস্তকে লিখিত আছে, বাঙ্গালা নগরীতে প্রায় ৪০,০০০ বাড়ী আছে; কিন্তু এক রাজপ্রাসাদ ভিন্ন সমুদয় বাড়ীই তৃণাচ্ছাদিত। এই উক্তির সহিত রাল্‌ফ্ ফিচের সোণারগাঁও বর্ণনার প্রভূত ঐক্য আছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"The houses here (in Sanargaon) are very little, and couered with strawe, and haue a fewe mats round about the wals, and the doore to keepe out the Tygers and the Foxes."

(৫) Hondius, William Baffin, Philippi Chetwind, Tavernier Mandeslo, Pierre Vander, প্রভৃতির মানচিত্রে বাঙ্গালা নগরী ব্রহ্মপুত্রের (Cosmin flu) মোহানায় একটি বদ্বীপের মধ্যে চিহ্নিত। পক্ষান্তরে, ইব্‌ন্ বতুতাও সোণারগাঁওকে ব্রহ্মপুত্রতীরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্যাপি সোণারগাঁও ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন ধারার উপর অবস্থিত।

পিটার হেলেন লিখিয়াছেন,—'ইহার (বাঙ্গালা নগরীর) নিম্নবাহিনী নদীর জল পবিত্র বলিয়া উহাতে স্নান করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয় বলিয়া হিন্দুগণ বিশ্বাস করে; এবং তজ্জন্য ইহা তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। • • • • তিন চারি লক্ষ তীর্থযাত্রী এই স্থানে আগমন করে না, এরূপ এক বৎসরও যায় না।' সম্ভবতঃ, বাঙ্গালা অথবা সোণারগাঁর নিম্নবাহিনী ব্রহ্মপুত্রে অষ্টমী স্নানের কথা পিটার হেলেন লিখিয়াছেন। সোণারগাঁর পার্শ্ববাহী ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন ধারা এখন শুষ্ক,—উহার নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ লাঙ্গলবন্ধ প্রভৃতি স্থানে অষ্টমী স্নানের সময় লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী অদ্যাপি সমবেত হয়।

(৬) Varthema, Barbosa, Purchas, Mandelslo, Peter Heylyn প্রভৃতির বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে, বাঙ্গালা নগরীতে অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র উৎপন্ন হইত, এবং তাহা প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ খানি জাহাজ বোঝাই হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র, এবং এমনকি সুদূর তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব, এথিওপিয়া, প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। পক্ষান্তরে, Ralph Fitch তদীয় বিবরণে সোণারগাঁও সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"Sinnergan is a towne sixe leagues from Serrepore, where there is the best and finest cloth made of cotton that is in all India.... Great store of Cotton cloth goeth from hence.......where-with they serue all India, Ceilon, Pegu, Malacca, Sumatra, and many other places." এই দুই বিবরণ পাশাপাশি ভাবে পাঠ করিলে ইহা মনে হয় না কি যে, বাঙ্গালা নগরী ও সোণারগাঁও অভিন্ন ছিল? ঢাকা ও তদন্তর্গত সোণারগাঁও, ধামরাই, ডেমরা প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র বহু প্রাচীন কাল হইতেই উৎপন্ন

হয়। এমনকি রামায়ণী যুগেও এতদঞ্চলে বয়ন শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, রামায়ণে এইরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।* ঢাকা অঞ্চলের মসলিন দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেও বিদেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক এমনকি রোম প্রভৃতি স্থানেও নীত হইত। রোমান পণ্ডিত Pliny খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এতদঞ্চলজাত সূক্ষ্ম বস্ত্রের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী রোমেও উহা ধনীর বিলাস সামগ্রী বলিয়া আদৃত হইত।

(৭) কোন কোন পর্য্যটক বাঙ্গালা নগরীকে সমুদ্রতীরস্থ একটি বন্দর বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। এরূপাবস্থায় আপত্তি হইতে পারে যে, সোণারগাঁও কখনও সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল না, সুতরাং বাঙ্গালা ও সোণারগাঁও এক হইতে পারে না। কিন্তু, উক্ত গ্রন্থের বিবরণ যথার্থ নহে। ভার্থেমার বিবরণে আমরা প্রাপ্ত হই যে, Sarman নগরবাসী কতিপয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বণিকের সহিত যখন ভার্থেমা বাঙ্গালা নগরী হইতে পেগু যাত্রা করেন, তখন পেগুযাত্রী একখানা অর্ণবপোত বাঙ্গালা হইতে দুই দিনের পথ দূরে অবস্থান করিতেছিল, এবং ভার্থেমা সেই জাহাজেই পেগু গমন করেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাঙ্গালা সমুদ্র হইতে অন্ততঃ দুই দিনের পথ দূরে ছিল। *Sommario de' Regni* গ্রন্থেও বাঙ্গালা নগরী গঙ্গাসাগরসঙ্গম হইতে দুই দিনের পথ দূরে অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে। Barbosaর বিবরণেও বাঙ্গালা বঙ্গোপসাগরের একটি খাঁড়ির উপকণ্ঠে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত আছে। পিটার হেলেনও তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালাকে গঙ্গা নদীর এক শাখার উপর অবস্থিত বলিয়াছেন। এরূপাবস্থায়, বাঙ্গালা নগরী যে ঠিক সমুদ্রতীরস্থ ছিল না, পরন্তু সাগরোপকণ্ঠে ব্রহ্মপুত্রের প্রায় মোহানার নিকটে অবস্থিত ছিল, এইরূপই অনুমিত হয়।

ইব্‌ন্‌ বতুতা কামরূপ হইতে ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া সোণারগাঁওতে উপস্থিত হন, এবং তথায় যাভা গমনোদ্যত সমুদ্র পোত দেখেন। ইহা দ্বারা সোণারগাঁও সমুদ্রোপকণ্ঠে ব্রহ্মপুত্রতীরে অবস্থিত ছিল, ইহাই প্রতীত হয়। সুতরাং, প্রাচীন পর্য্যটকগণের বিবরণ হইতে বাঙ্গালা ও সোণারগাঁর অবস্থানের যে বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতেও উক্ত উভয় স্থান অভিন্ন, এইরূপই মনে হয়।

(৮) Varthema, Barbosa, Purchas, Mandelslo, Peter Heylyn, প্রভৃতি সকলেই বাঙ্গালাকে একটি বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র, ও তথায় সমস্ত জিনিষই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, Ralph Fitch প্রভৃতি সোণারগাঁর এইরূপ বর্ণনাই প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং, এক্ষেত্রেও কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা নাই।

(৯) পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীগণ ঢাকা অঞ্চলের লোককে 'বাঙ্গাল' বলিয়া বিদ্রূপ করে। এই 'বাঙ্গাল' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? বাঙ্গালা দেশ হইতেই যদি উহার উৎপত্তি হইত, তবে

* রামায়ণে এইরূপ একটি শ্লোক আমরা প্রাপ্ত হই :—

"মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাংস্ত্বঙ্গাং স্তথৈব চ।
ভূমিঞ্চ কোশকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাম্॥"—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। ৪০।২৩।

কোশকার শব্দের অর্থ গুটিপোকা। সুতরাং, এতদঞ্চলে রামায়ণী যুগেও গুটিপোকার ব্যবহার জানিত। গুটিপোকা হইতে রেশম বাহির করিয়া পট্টবস্ত্র বয়ন প্রণালী সে যুগেও প্রচলিত ছিল, তাহা প্রতীত হইতেছে; কারণ, তাহা না হইলে কোশকার শব্দের উল্লেখ নিরর্থক হইয়া পড়ে।

পুণ্ড্র এবং অঙ্গ দেশের সন্নিকটেই এই কোশকার উৎপাদক দেশ অবস্থিত ছিল। সুতরাং উহা আলোচ্য সোণারগাঁও অঞ্চল বলিয়াই অনুমিত হয়।

সমস্ত বঙ্গবাসীই ঐ নামে অভিহিত হইতে পারিত। সোণারগাঁও অথবা বাঙ্গালা নগরীর অধিবাসীগণ বাঙ্গালা নগরীর নাম হইতেই 'বাঙ্গাল' বলিয়া অভিহিত হইত, এবং অদ্যাপি হয়; বাঙ্গালা নগরীর নাম হইতেই 'বাঙ্গাল' শব্দের উৎপত্তি। বক্তিয়ার খিলিজি পশ্চিম বঙ্গ অধিকার করিলে, এই ঢাকা জেলার বাঙ্গালগণই মুসলমানের গতিরোধ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আরও দুই শতাব্দী হিন্দু রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল; পাঠান শাসনের অধঃপতন কালেও বাঙ্গাল চাঁদ রায় কেদার রায় ও বাঙ্গাল ঈশা খাঁ মসনদ-ই আলি বহুকাল মোগল অধিকার হইতে পূর্ব্ববঙ্গকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গবাসীগণ বীরত্বে বাঙ্গালের সহিত কখনও প্রতিযোগিতা করিয়া পারে নাই। তাই, বলবানের প্রতি দুর্ব্বলের আক্রোশের চিহ্ন স্বরূপ তাহারা আর কিছুতে না পারিয়া শেষে কথার ত্রুটি ধরিয়া বাঙ্গালকে বিদ্রূপ করে কিন্তু, এই বিদ্রূপের নীচেও যে ঐতিহাসিক কারণ রহিয়াছে, তাহাই এস্থানে আলোচ্য। বাঙ্গাল তাহার বীরত্বটুকু হারাইয়া তাহারই আভাস স্বরূপ গোয়ার্ত্তুমিটুকু লইয়া আজও পশ্চিমবঙ্গবাসীগণের হৃদয়ে মাঝে মাঝে ভীতি উৎপাদন করে।

যাহাহউক, পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, "বাঙ্গালা" নগরী ও সোণারগাঁও অভিন্ন ছিল।

---

# বৰ্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলন

## দেশে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা।

### বিদ্যা ও বিজ্ঞান, কলা ও বার্ত্তা।

সাহিত্য-সম্মিলনে আলোচ্য বিষয় চারিশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একশাখা, বিজ্ঞান। আমরা দেশের বিজ্ঞান-বিষয়ে আলোচনা করিতে সমবেত হইয়াছি।

আলোচনার পূর্ব্বে বিষয়টা একটু বুঝিয়া লইলে ভাল হয়। বিদ্যা কি, তাহা আমরা বুঝি। বিদ্যা যা, জ্ঞানও তা। কিন্তু প্রয়োগে আমরা বিদ্যা ও জ্ঞানের একটু প্রভেদ করিয়া থাকি। শিশুর জ্ঞান অল্প, বৃদ্ধের অধিক। বৃদ্ধ জ্ঞানী হইতে পারেন, বিদ্যাবান্ না হইতে পারেন। তেমনই, বালক বিদ্যাবান্ হইলেও জ্ঞানী না হইতে পারে। বস্তুতঃ অধ্যয়নাদিজনিত জ্ঞান বিদ্যা; এবং জ্ঞানের নিমিত্ত যাহা অধ্যয়নযোগ্য তাহাও বিদ্যা। সংসারধর্ম্ম আচরণ করিতে যাহা কিছু জানা আবশ্যক, সবই বিদ্যার বিষয়। প্রাচীনেরা অষ্টাদশ শাখায় বিদ্যা বিভাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বিদ্যার এত ভাগ না করিয়া অল্প করিয়াছিলেন। নীতিকার শুক্রাচার্য্য রাজাকে চারি বিদ্যা সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন। সে চারি বিদ্যা এই,—(১) আন্বীক্ষিকী—স্থূলতঃ তর্ক-বিদ্যা, (২) ত্রয়ী—অঙ্গ উপাঙ্গ সহ তিন বেদ, (৩) বার্ত্তা—যাহা বৃত্তি করিয়া প্রজার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, (৪) দণ্ডনীতি—রাজ্যশাসননীতি। যাবতীয় বিদ্যা এই চারি ভাগের অন্তর্গত হইয়াছে।

সাহিত্য-সম্মেলন বিদ্যার্থীর সম্মেলন। এখানেও বিদ্যা চারি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান—এই চারি শাখা। বিদ্যা-বৃক্ষের এই চারি শাখা কল্পনা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না, সম্প্রতি সে বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞান কি তাহা বুঝা যাউক। কেহ কেহ বলিয়াছেন, কোন বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান বি-জ্ঞান, কিংবা যাবতীয় বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞান। এই অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। একটু সঙ্কোচ করিয়া মোক্ষ-বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞানের বহির্ভূত করা হইয়াছে। অমরকোষের মত,—শিল্প ও শাস্ত্রের যে জ্ঞান, তাহা বিজ্ঞান—শিল্প চিত্রাদি, শাস্ত্র ব্যাকরণাদি। এই অর্থও বিস্তৃত হইল। আর একটু সঙ্কোচ করা যাউক। অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ বলেন, বিরূপং জ্ঞানং বিজ্ঞানং। বিভিন্ন রূপের যে জ্ঞান তাহা বিজ্ঞান। চিত্রশিল্পে বিভিন্ন মূর্ত্তি, ব্যাকরণ-শাস্ত্রে শব্দের নানা রূপ প্রদর্শিত হয়। এই কারণে শিল্প ও ব্যাকরণ বিজ্ঞান। কিন্তু এই অর্থ আমাদের আলোচ্য বিজ্ঞানের নহে। নানা রূপে প্রকৃতি কার্য্য করিতেছেন; প্রকৃতির এই যে অসংখ্য রূপ, রূপপরিবর্ত্তন-প্রবৃত্তি তাহার জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। ক্ষিতি-অপ্-তেজাদি পঞ্চভূত আমাদের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। এই পাঁচভূতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভৌতিক বিজ্ঞান। প্রকৃতি বহুভেদবিশিষ্ট বিচিত্র। ইহার উপাদান জড় কল্পিত হইয়াছে; শক্তি জড়কে স্পন্দিত করিতেছে। এই জড়শক্তিময়ীর জ্ঞান বিজ্ঞান, জড়-বিজ্ঞান। আমরা যে ভাবেই দেখি, সেই একেরই জ্ঞান; এই হেতু বিজ্ঞান সংজ্ঞা দ্বারা, প্রাকৃতিক, ভৌতিক বা জড়বিজ্ঞান বুঝি।

কখন কখন গ্রামাজন কলেজের বিজ্ঞানশালায় আসিয়া সজ্জা ও উপকরণাদি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে, এখানে আপনারা কি করিতেছেন? বলিতে হয় খেলা করিতেছি; পণ্ডিত দেখিলে বলিতে হয় প্রকৃতির সহিত খেলা করিতেছি। এই উত্তরে পণ্ডিত দর্শক সন্তুষ্ট হন না। কিন্তু বুঝাইবার উপায় নাই। পঠন, পাঠন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ইহাই ত বিদ্যালয়ে হইয়া থাকে। পঠন পাঠনাদি বিদ্যালয়ের কাজ বটে; কেন না বাগ্‌দেবী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। শুক্রাচার্য্যও বলিয়াছেন, যদ্ যৎস্যাৎ বাচিকং সম্যক্ কর্ম্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞকম্, যাহা যাহা সম্যক্ বাচিক কর্ম্ম তাহা বিদ্যা। বিদ্যালয়ে মনন ব্যতীত বাগিন্দ্রিয় প্রধান; বিজ্ঞানালয়ে মননব্যতীত চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রধান। বিজ্ঞানালয়ে এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞানার্জ্জন হইয়া থাকে।

কিন্তু দর্শক এই উত্তরেও সন্তুষ্ট হন না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ফল কি? বিদ্যার ফল কি? বিদ্যারাশ্চ ফলং জ্ঞানং, আর, বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।

বিদ্যার ফল জ্ঞান আর বিনয়; বিজ্ঞানেরও ফল তাই। বোধ হয় বিজ্ঞানের দ্বারা বিনয় অধিক লাভ হয়। কারণ জ্ঞানের মূলে জ্ঞানেন্দ্রিয়, যাহার সাহায্যে আমরা সৎ অসৎ, সত্য মিথ্যা পরীক্ষা ও বিবেক করিয়া থাকি। প্রকৃতির নিকট প্রতারণার ঠাঁই নাই। জ্ঞান ও বিনয়, এই দুই কাম্য করিয়া বলা যায়, বিদ্যার্থে বিদ্যা অভ্যাস কর, বিজ্ঞানার্থে বিজ্ঞান অভ্যাস কর। দুই-ই ফলে এক।

কিন্তু জ্ঞান ও বিনয় এই দুইএর প্রয়োজন কি? চরকে ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন, মানবের তিন এষণা, অন্বেষণ ইচ্ছা আছে। প্রথম প্রাণৈষণা, প্রাণ রক্ষার ইচ্ছা কারণ প্রাণত্যাগ সর্ব্বত্যাগ। প্রাণৈষণার পর ধনৈষণা, ধন প্রাপ্তির ইচ্ছা। কারণ ধন না থাকিলে পাপী হইতে হয়, আয়ু দীর্ঘ হয় না। অনন্তর পরলোকৈষণা, পরলোকে সদ্গতির চিন্তা। এই তিন এষণার পক্ষে জ্ঞান ও বিনয় সহায়। প্রাণৈষণা হইতে আয়ুর্বিদ্যার, ধনৈষণা হইতে বার্ত্তা ও কলার, এবং পরলোকৈষণা হইতে দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞান দ্বারা প্রথম দুই এষণার কতদূর সিদ্ধি হইয়াছে তাহা পৌরজনের নিকট অবিদিত নাই। নীতিকার শুক্রাচার্য্যও বলিয়াছেন, সংসৃতৌ ব্যবহারায় সারভূতং ধনং স্মৃতম্—সংসারে ব্যবহারের নিমিত্ত ধনই সার। ধন নহিলে প্রাণরক্ষা হয় না—ইহা ত প্রত্যক্ষ হইতেছে। কিন্তু কিসে ধন আসিতে পারে? সুবিদ্যায়াসু সেবাভিঃ শৌর্য্যেণ কৃষিভিস্তথা। কৌসীদ বৃদ্ধ্যাপণ্যেন কলাভিশ্চ প্রতিগ্রহৈঃ। যয়া কয়াচাপি বৃত্ত্যা ধনবান্ স্যাৎ তথাচরেৎ॥ উত্তমবিদ্যা, উত্তমসেবা যেমন রাজসেবা; শৌর্য যেমন সৈনিকের, কৃষি, কুসীদবৃত্তি যেমন মহাজনি বেঙ্কিং, বাণিজ্য, কলা ও প্রতিগ্রহ দান প্রাপ্তি ও গ্রহণ, ইত্যাদি বৃত্তি এমন আচরণ করিবে যাহাতে ধনবান্ হইতে পারে। ইহাই আমাদের দেশের নীতি, সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের নীতি। জ্ঞান ও বিনয় থাকিলে এই সকল বৃত্তি সম্যক্ আচরিত হয়। কিন্তু কলা কাহাকে বলে? সংস্কৃত কলনা বশীভূতত্ব, বশতা। ইহা হইতে, অনেক রূপাবিভাবকৃতিজ্ঞানং কলা স্মৃতা। এক পদার্থের নানা আকারে আবির্ভাব করিবার জ্ঞানের নাম কলা। যেমন কার্পাসের সূত্রকর্তন এক কলা, বস্ত্রবয়ন আর এক কলা। করিতে জানার নাম কলা। একারণ শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, শক্তো মূকোঽপি যৎকর্ত্তুং কলাসংজ্ঞং তু তৎ স্মৃতম্—যাহা মূক ব্যক্তিও করিতে পারে তাহা কলা। মূক বিদ্যাবান্ হইতে পারে না। বিদ্যা বাচিক কর্ম্ম, কলা হস্তকর্ম্ম, বিজ্ঞান বুদ্ধীন্দ্রিয় কর্ম্ম। কারু হস্ত কর্ম করে এবং যে কারু কলাভিজ্ঞ ও কলাসংস্কর্ত্তা তিনি শিল্পী। সংস্কর্ত্তা তৎকলাভিজ্ঞঃশিল্পী প্রোক্তো মনীষিভিঃ (শুক্র)। প্রকৃতিদত্ত পদার্থে বুদ্ধিপ্রয়োগ করিয়া হস্তদ্বারা সিদ্ধির নাম কলা। আকর হইতে লৌহবহিষ্করণ লৌহকলা, বালুকা ও ক্ষারযোগে কাচকরণ কাচকলা, এবং পুষ্পমাল্যরচনা মাল্যকলা, গীতবাদ্যাদি সঙ্গীতকলা, ইত্যাদি। কোন কলা লৌকিক উপযোগের নিমিত্ত, কোন আনন্দের নিমিত্ত। কারুকলা ও নন্দকলা বলি, ভাগ যাহাই করি, বিদ্যাহ্যনন্তাশ্চ কলাঃ সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে—বিদ্যা ও কলা অনন্ত, সংখ্যা করিতে পারাযায় না। কিন্তু বিদ্যাও কলা অভ্যাসব্যতীত জীবিকার অপর উপায় আছে। তন্মধ্যে বৈশ্য অর্থাৎ প্রজাবর্গের যে বৃত্তি তাহা বার্ত্তা।

কুসীদকৃষিবাণিজ্যং গোরক্ষা বার্ত্তয়োচ্যতে।—কুসীদ প্রয়োগ দ্বারা ধন বৃদ্ধি, কৃষি বাণিজ্য ও পশুপালন এই চারি বার্ত্তা নামে কথিত হয়। কৃষি ও পশুপালনের নিমিত্ত মানুষ আয়োজন করে, কিন্তু ফল প্রকৃতিদত্ত। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাবিশেষ; কিন্তু চিকিৎসাবৃত্তি বিদ্যা নহে, কলা নহে, বার্ত্তাবিশেষ। তেমনি কুসীদ বৃত্তিও বিদ্যা নহে, কলা নহে। বাণিজ্য-বৃত্তি ত্রিবিধ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়। (১) স্বচ্ছন্দলব্ধ দ্রব্যের, যেমন মণি মুক্তার ও কাষ্ঠ ও অরণ্যবৃক্ষ ফলাদির; (২) কৃষি ও পশুপালন দ্বারা লব্ধ দ্রব্যের যেমন ধান গমের ঘি দুধের; (৩) কলাজাত দ্রব্যের বাণিজ্য ব্যতীত সমাজ টিকিতে পারে না এবং কলা ও বার্ত্তার নিমিত্ত বাধুর্ষির প্রয়োজন।

বার্ত্তা ও কলা হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি। বার্ত্তা ও কলায় বিজ্ঞানের স্থিতি। জীবনধারণ প্রবৃত্তি বার্ত্তা

ও কলার জননী বার্ত্তা ও কলার অনুষ্ঠানে প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ্ আরম্ভ হইয়াছিল। একথাও স্বীকার্য্য,— জ্ঞানান্বেষণা, জ্ঞানৈষণা মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই এষণার মূলে কিন্তু জীবনসংগ্রাম বিদ্যমান। প্রকৃতি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিছুই দেন না; সব বুদ্ধিবলে কাড়িয়া লইতে হয়। আমি আহার বিনা পড়িয়া থাকি, প্রকৃতি বলেন, কর কি! কিন্তু এই পর্য্যন্ত। তারপর আমাকে দেখিয়া শুনিয়া শিখিয়া খুজিয়া লইতে হইবে। কোথায় কোন্ দেশে কোন্ গাছে সুমিষ্ট ফল পাকিয়াছে, তাহা আমাকে খুঁজিয়া লইতে হইবে। তেমন ফল আমার দেশে আমার গ্রামে বাড়ীর কাছে ফলাইতে পারি কি না, এই এষণা আসিবে! এইরূপ এষনা হইতে বিজ্ঞানের জন্ম। কৃষক উত্তম শস্য অন্বেষণ করে; অধিক শস্য আকাঙ্খা করে কিন্তু পায় না। দেখে, কোথায় উত্তম শস্য অধিক শস্য জন্মিয়াছে। কেন জন্মিয়াছে, তাহার কারণ অন্বেষণ করে। কারণ ঠিক কি না পরীক্ষা করিয়া দেখে। হয়ত কারণ অসিদ্ধ হয়, হয়ত সিদ্ধ হয়। অসিদ্ধি ও সিদ্ধি, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, চলিতে থাকে, বিজ্ঞানেও তাই। বিজ্ঞানের অনুসন্ধানমার্গ পুরাতন। চরকে, পার্থিব উদ্ভিদ জঙ্গম এই ত্রিবিধ দ্রব্য কথিত হইয়াছে। ইহাদের জাতি গুণ ক্রিয়া অনুসন্ধানে জ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞানের পরীক্ষা চতুর্বিধ, প্রত্যক্ষ অনুমান, যুক্তি ও আপ্তোপদেশ। আত্মা মন ইন্দ্রিয়ও ইন্দ্রিয়বিষয় অর্থাৎ পঞ্চভূত, ইহাদের যোগে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। অনুমান ত্রিবিধ; ধূম হইতে বহ্নির অনুমান—কার্য্যলিঙ্গানুমান; বৃক্ষ হইতে বীজের অনুমান —কারণ লিঙ্গানুমান; বীজদর্শনে তৎকারণভূত ফলের প্রত্যক্ষ দ্বারা তৎকার্য্য ভাবী ফলের অনুমান—কার্য্য কারণলিঙ্গানুমান। লিঙ্গ অর্থে হেতু। যে বুদ্ধি বহু কারণ যোগজাত ফল দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তাহার নাম যুক্তি অর্থাৎ অনেক কারণের যোগে ফল বলিয়া যুক্তি। জল কৃষি বীজ ও ঋতুর যোগে শস্য হয়। ইহা যুক্তি। যাহারা জ্ঞানী ও শিষ্ট, যাহাদের জ্ঞান নির্ম্মল ও সর্ব্বদা অব্যাহত, তাঁহারা আপ্ত। আপ্তের বাক্যে সংশয় নাই, তিনি সত্য কহেন। আমরা আপ্তোপদেশ ব্যতীত একদণ্ড চলিতে পারি না। কণাদ অনুপরমাণু গণিয়াছেন, কণাদ আপ্ত; নিউটন মাধ্যাকর্ষণে পৃথিবীকে ঘুরাইয়াছিলেন; নিউটন আপ্ত। অণুপরমাণু গণিবার, মাধ্যাকর্ষণ প্রমাণ করিবার বুদ্ধি আমার নাই। সে বুদ্ধি আমার থাকিলে কণাদ ও নিউটনকে আপ্ত বলিতাম না। আপ্তোপদেশ মানিলে চিন্তা যে স্বাধীন হইতে পারে, তাহা আমাদের দর্শনে ও ধর্ম্মবিশ্বাসে সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

কার্য্যকারণ অনুসন্ধানের পূর্ব্বে ভূয়োদর্শন আবশ্যক। বহুবার দর্শন এবং দর্শন হইতে অনুমান করিলে ভূয়োদর্শ বলা যায়। জল বিনা বীজের অঙ্কুর হয় না; ইহা কৃষক জানে, ভূয়োদর্শনে জানে। কিন্তু কৃষকের দৃষ্টি এটা ওটা সেটার প্রতি, যে যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এটা ওটা নহে, এ বীজ সে বীজ নহে; তিনি দেখিলেন যাবতীয় বীজ বীজ নামায়, বীজবর্গ জল না পাইলে অঙ্কুরিত হয় না। কৃষকের জ্ঞান অস্পষ্ট, তাহার চিন্তাপদ্ধতি অস্পষ্ট, তাহার ভূয়োদর্শন গৌণ। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান স্পষ্ট, তাঁহার পদ্ধতি স্পষ্ট, তাঁহার ভূয়োদর্শন মুখ্য। ভূয়োদর্শন হইতে বর্গীকরণ, আরোহ, তাঁহার উদ্দেশ্য। যে বিজ্ঞানে বর্গীকরণ যত, সে বিজ্ঞান তত উন্নত বলা যায়। দ্রব্যের বড় বড় তালিকা, গুণের বিশদ বর্ণনা, কিংবা ক্রিয়ার পূর্ব্বাপরত্বসূচনা বিজ্ঞান নহে। কিন্তু একটা মুখ্য উদ্দেশ্য, একটা সূত্র ধরিয়া দ্রব্য ও গুণ ক্রিয়া বর্ণিত হইলে বিজ্ঞান হইতে পারিবে। নদীর বালি গণিয়া মাপিয়া জুখিয়া ভাঙ্গিয়া আকৃতি বর্ণ প্রভৃতি লিখিয়া এক বিপুল গ্রন্থ পূর্ণ করিলেই বালুকা-বিজ্ঞান হইবে না। নানারূপতার মধ্যে একরূপতার সাধন চাই। নানারূপ এক নির্দ্দিষ্ট সূত্রে গাঁথা চাই। ভূয়োদর্শন উদ্দেশ্যানুসারে বিন্যস্ত হইলে বিজ্ঞান হয়, নতুবা দর্শনমাত্র হয়। একারণে বলা যায়, সুবিন্যস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান।

কিন্তু জ্ঞানের অভাবে, উপাদানের অভাবে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। সাংখ্যকার বলিয়াছেন, অতিদূরত্ব হেতু, অতিসামীপ্য হেতু, সূক্ষ্মত্ব হেতু, অন্য বস্তুর ব্যবধান হেতু, অল্পপদার্থের দ্বারা অভিভব হেতু, সমান বস্তুর সহিত মিশ্রণ হেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে। তখন সূত্রের

বিশ্বাসে সংশয় আসে। সংশয় ও বিতর্কে সূত্র কম্পিত হয়, উহা আশ্রয় করিতে হয়। নূতন-লব্ধ জ্ঞান পুরাতন সূত্রের উহের অন্তর্গত না হইলে উহা পরিবর্তন করিতে হয়। অতএব মনে রাখিতে হইবে, উহা বিজ্ঞান নহে, উহা আপ্ত নহেন। সংশয় চিরদিন থাকিবে, সংশয় মোচনের প্রয়াস-গবেষণাও চিরদিন থাকিবে।

কিন্তু এত চেষ্টা এত গবেষণা কাহার নিমিত্ত? প্রকৃতি কার্য্য কারণের হেতু; পুরুষ সুখ দুঃখের হেতু। সেই পুরুষের সেই আমার নিমিত্ত, আমার বর্দ্ধন নিমিত্ত বিজ্ঞান। আমাকে ছাড়িয়া বিজ্ঞান নহে। আমার সৌখ্যচিন্তা বিজ্ঞানের কর্ত্তব্য না হইলে বিজ্ঞানে কি ফল? আজিকার কালিকার আমি নহে, এ গ্রামের সে গ্রামের স্বদেশের বিদেশের আমির সৌখ্য নহে, মানবের সৌখ্য বিজ্ঞানের চিন্তা। ইহার দেশ বিস্তীর্ণ, কাল বিস্তীর্ণ, পাত্র বিস্তীর্ণ। এই হেতু বিজ্ঞানের সমাদর, পূজা, বিজ্ঞানের মহত্ব।

## দেশে বিজ্ঞানের স্থিতি।

বিজ্ঞান-সেবীর সভায় বিজ্ঞানের গুণকীর্ত্তন অনাবশ্যক। এখানে অনেক বিজ্ঞান-অধ্যাপক উপস্থিত আছেন; তাঁহাদিগকে আমি একটা প্রশ্ন করিতেছি। তাঁহারা বিজ্ঞানের সার্থকতা দেখিতেছেন কি? কয়জন ছাত্র পাইয়াছেন, যাহারা বিজ্ঞানের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, যাহাদের চরিত্রে বিজ্ঞানের বিনয় ও জ্ঞানের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসংগ্রহ মুখ্য উদ্দেশ্য না করিয়া বিজ্ঞানশালায় প্রবিষ্ট হইয়াছে? আমার জানায় শত জনের পাঁচজনও হয় কিনা, সন্দেহ। কিছুকাল বিজ্ঞানশালায় কাটাইলে বৈজ্ঞানিক মার্গে চলিলে বিনয় অবশ্য অভ্যাস হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার যোগ্য জ্ঞানও অবশ্য হয়। কিন্তু ইহাই কি পরম লাভ বলিতে হইবে?

কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞান অভ্যাসের সফলতা দেখিতে অভিলাষী। এই যথার্থ অভিলাষ পূর্ণ হইতেছে না কেন? ছাত্রের দোষে? আমাদের ছাত্রেরা জড়বুদ্ধি, অধ্যবসায়হীন? বিলাতের লোকেরা, অধ্যাপকেরা কিন্তু আমাদের ছাত্রদিগের মেধা দেখিয়া চমৎকৃত হন। কেহ কেহ বলেন, আমাদের, অধ্যাপকবর্গের অসিদ্ধিহেতু ছাত্রগণেরও অসিদ্ধি। যাঁহারা স্বয়ং অসিদ্ধ, তাঁহারা অপরকে সিদ্ধ করিতে পারেন না। কথাটা একেবারে অমূলক বলিতে পারি না; কিন্তু ইহাও স্মরণ করিতে হইবে, অধ্যাপকবর্গের অসিদ্ধিরও কারণ আছে। অধিকাংশ সময় দৈনন্দিন অধ্যাপনায় কাটে। ইহার পর ক্লান্তি আসে, শরীর মন বয় না। যাঁহারা এই গুরুকর্ম্মের পর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে রত হইতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অসাধারণ। হয়ত তাঁহারা লোহার দেহ পাইয়াছেন, কিংবা দেহটা ক্ষণভঙ্গুর করিয়াছেন। এখানে মধ্যমের কথা সাধারণের কথা আলোচ্য। চারিপাঁচ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলেজের অধ্যাপকের নিজের বলিতে একটু সময় থাকিত না; এমন ঘটনাও জানা আছে অধ্যাপকের গবেষণার প্রতিকূলতা করা হইত। কলেজের বাহিরের লোকে এ সব সংবাদ রাখেন না, অধ্যাপনার ঘণ্টা গণিয়া অধ্যাপকের শ্রমের পরিমাণ করেন। তাঁহারা জানেন না, ছাত্রদিগের বিজ্ঞানকর্ম্মশালায় তাহাদের সহিত দুই ঘণ্টা পরিশ্রমের কি ক্লান্তি ও অবসাদ আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশযোগ্য হইলেই সকল ছাত্র মেধাবী ও শ্রমশীল হয় না। গ্রীষ্মের অবকাশ আছে বটে, কিন্তু সকল দেশ দার্জ্জিলিঙ্গ নহে; এবং নহে বলিয়া অবকাশ দেওয়া হইয়া থাকে। তথাপি কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাপকগণের নিকট গবেষণা আশা করা অন্যায় নহে।

কি কারণে এদেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, তাহার পর্য্যালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। ডাঃ বসু কিংবা ডাঃ রায় কিংবা তাঁহার দুই চারিজন ভাগ্যবান্ ছাত্রের দ্বারা দেশের দশা ফিরিতে পারে না। সকল বিষয়েই মধ্যম লইয়া বিচার করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধানে ছাত্রের জ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ় হইতেছে। এখনও ইহার ফলভোগের সময় আসে নাই, কিন্তু অধিক প্রত্যাশার হেতুও দেখিতেছি না। এই নূতন বিধানও আমাদের দোষে সম্যক্ ফলদায়ক হইতেছে না। অধিকাংশ বিজ্ঞানকর্ম্মশালায় ছাত্রেরা

চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে, যে বিষয়ের অধ্যাপনা হইয়াছে, যাহা ছাত্রেরা শুনিয়াছে দেখিয়াছে, তাহারই পুনরাবৃত্তি করে। ইহাতে তাহাদের হাত আসে, কিন্তু বুদ্ধি আসে না। হাত আন চাই না, নহে; কিন্তু কেবল অভ্যাস উদ্দেশ্য নহে। বহু বহু ছাত্র চোখ বুজিয়া অভ্যাস করে; অধ্যাপকের উপদেশ শুনিয়া কিংবা কর্ম্মপুস্তকে মুদ্রিত উপদেশ পড়িয়া যথাযথ ভাবে এ দ্রব্যের সহিত সে দ্রব্যের যোগাযোগ করে। অর্থাৎ তাহারা অনুকরণে দক্ষ হয়, প্রকরণে হয় না। বলা বাহুল্য, প্রকরণের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মে অভ্যাস জন্মিতে পারে। কলেজে প্রথম বর্ষ হইতে ছাত্রকে গবেষণায় প্রবৃত্ত করিতে পারিলে তাহার কর্ম্মশক্তি, আত্মপ্রত্যয় জন্মে, শিক্ষায় উৎসাহ হয়। কখনও কোন ছেলেকে মগ্ন করিতে ব্যগ্র দেখিয়াছেন কি? দেশের ছুতারের ছেলে কি বাটালি করাত লইয়া কিছুদিন হাত করে, না প্রথম হইতেই ছোট ছোট কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্য গড়ে, কিংবা পিতার সাহায্য করে? চেষ্টা করিলে আমিও পারি, আমিও মানুষ; এই প্রত্যয় দৃঢ় হইলে আর কিছু দেখিতে হয় না। অন্ততঃ জ্ঞানান্বেষণা, গবেষণার নামে ভয় ঘুচিয়া যায়। অবশ্য, কথাটা বলা যত সোজা, কথার মতন কাজ করা তত সোজা নহে। তথাপি এই আদর্শ ধরিয়া চলিতে চলিতে উপায়ও আসিতে পারিবে। বস্তুতঃ, আমরা যে বিজ্ঞানের অন্বেষণ করিতেছি, তাহা ধনশালী ইয়ুরোপের বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যয়সাধ্য; ইয়ুরোপে ও আমেরিকায় যেখানে ছাত্রের শিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থা আছে সেখানে আরও ব্যয়সাধ্য। অথচ আমরা সে দেশের সিদ্ধির সহিত এদেশের কৃত কর্ম্মের তুলনা করিতে চাই। বামুনের গরু সুলভ নহে। অবশ্য এমন বিষয় আছে, যাহার এষণায় প্রচুর অর্থব্যয় আবশ্যক হয় না। নাই হউক; কিন্তু যে ছাত্রের অন্নচিন্তা চমৎকারা, তাহার নিকট অন্য চিন্তা উপহাস্য নহে কি? কি কায়ক্লেশে অধিকাংশ ছাত্র বিদ্যা অভ্যাস করে, তাহাত আমাদের অজ্ঞাত নহে। আগে প্রাণৈষণা, তার পর অন্য কথা। প্রাণৈষণার পর ধনৈষণা স্বাভাবিক। আমরা চাই, জ্ঞানৈষণা। আমরা চাই, আমাদের ছাত্রেরা ধন মান তুচ্ছ করিয়া, মরি বাঁচি পণ করিয়া জ্ঞানমার্গে ধাবিত হউক। কিন্তু চাইলেই আকাশের চাঁদ হাতে চলিয়া আসে না। যে সমাজ জ্ঞানৈষণার আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু উপায় করে না, সে সমাজের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। এই ঘোর কলিকালে, জ্ঞানার্থে জ্ঞান অর্জ্জন, ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মাচরণ কদাচিৎ সম্ভবে। সত্য যুগেও বিনা আয়োজনে বিনা ব্যয়ে যজ্ঞ সমাধা হইত না। অন্যকে যজ্ঞকারীকে ঋত্বিক্‌গণের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইতে হইত। যখন উপযুক্ত ছাত্র সমাজকে জিজ্ঞাসা করে, কেন তাহাকে অনশনে নিষ্কাম ব্রতের আদেশ হইতেছে, কেন সেই "চৌর্য্যাপরাধে দোষী" হইয়াছে, কেন সে উকীল হাকিম হইয়া অপর দশজনের তুল্য সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে না, তখন সমাজের উত্তর কি আছে, জানি না। ডাক্তার রায়ের কয়েকটি কৃতী ছাত্র গবেষণা ত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে ধনোপার্জ্জনে মনোযোগী হইয়াছে। আমি ইহা দুষ্য মনে করিতে পারিতেছি না। আমাদের আশাভঙ্গ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে কি প্রত্যাশা দিয়াছিলাম? এই দুশ্চিন্তার সময় স্যার তারকনাথ পালিত ও মহোদয় রাসবিহারী ঘোষ বদান্যতার দ্বারা আমাদিগকে কিঞ্চিৎ আশান্বিত করিয়াছেন। কিন্তু আরও পালিত, আরও ঘোষ মহাশয়গণের আবির্ভাব না হইলে দুশ্চিন্তার হ্রাস হইবে না।

বিজ্ঞানার্থী ছাত্র নির্ধন, দেশও নির্ধন; ধনসাধ্য বিজ্ঞান তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানের উদ্দেশ্য—ছাত্রকে কেবল বিনয় ও জ্ঞানদান নহে। সে উদ্দেশ্য হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি দুইটি বিষয়ে আবদ্ধ রাখিতেন না, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় শিখিবার, মনে রাখিবার পরীক্ষা করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণকে এক এক বিষয়ে প্রাজ্ঞ করিতে অভিলাষী। বিলাতে যাহা সম্ভাবিত হইয়াছে, এদেশেও তাহা হইবে, এই আশায় বিলাতী বিদ্যালয় এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সে আশা সম্যক্ ফলবতী হইতেছে না।

দেশের প্রজা উত্তম হউক, বিদ্বান্ হউক, জ্ঞানী হউক, প্রথমে এই কামনা। কেহ কেহ এক এক বিষয়ে প্রাজ্ঞ হউক, ইহা দ্বিতীয় কামনা। প্রথমে সমাজদেহ পুষ্ট ও বলবান্ হউক, তার পর আবশ্যক অঙ্গ হউক। এই ভাবে দেখিলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম হইতেই প্রাজ্ঞ উৎপাদনের ব্যবস্থা না করিলে ভাল হইত। প্রজাবর্গ সামান্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, ইহা অবশ্য দেখিতে হইবে। এই নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মিলন বাঞ্ছনীয় হইতেছে। সাধারণের নিমিত্ত বিশেষ বিদ্যা বিশেষ বিজ্ঞান অনাবশ্যক মনে হইতেছে।

সমাজের সহিত এই কথার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এখানে সে সম্বন্ধ প্রদর্শনের লোভ ত্যাগ করিয়া উপস্থিত প্রসঙ্গ অনুসরণ করি। বিলাতে বিজ্ঞানার্থে বিজ্ঞান-চর্চ্চা আছে, এই চর্চ্চার নিমিত্ত যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে; আর আছে ধনার্থে বিজ্ঞানচর্চ্চা। সে দেশে তিন শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন। কেহ জ্ঞানার্জ্জনেই জীবন যাপন করিতেছেন, সে জ্ঞানের প্রয়োগ দেখিতেছেন না, ভাবিতেছেন না। ইঁহারা বৈজ্ঞানিক সন্ন্যাসী। এরূপ সন্ন্যাসী কোন দেশে অধিক হইতে পারেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক কলাশালায় কলার উন্নতি সাধনের ব্যয়লাঘবের চিন্তা করিতেছেন। ইঁহারা নিজেদের জ্ঞান দ্বারা কলাস্বামীর সেবা করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতেছেন। তৃতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক স্বয়ং কলাস্বামী। ইঁহারা অভ্যস্ত বিজ্ঞান কলায় প্রয়োগ করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতেছেন। স্বামী ও কর্ম্মী দুইই হইতে হইলে কেবল বিজ্ঞানে কুলায় না, স্বামীত্বের, প্রবর্ত্তনের জ্ঞানও প্রচুর আবশ্যক হয়। এদেশে আমাদের বৈজ্ঞানিক ছাত্রদিগের নিকট এই তিন ক্ষেত্রের একটাও নাই। দেশে এমন কলাকারখানা নাই, যাহার স্বামী বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত করিতে পারেন। এক যে ঔষধ করণশালা হইয়াছে, তাহাতে কয়েকজন কৃতী রাসায়নিক নিযুক্ত আছেন। কারখানা থাকি-লেও বৈজ্ঞানিকের কর্ম্মাভ্যাস এমন নাই যাহাতে কলার উন্নতি সাধিত হইত। এই কারণে কয়েক বৎসর হইতে কয়েকজন সদাশয়ের চেষ্টায় ইয়ুরোপ আমেরিকাও জাপানে কলা ও মূর্ত্ত বিজ্ঞান শিখিবার নিমিত্ত আমাদের শিক্ষিত যুবক যাইতেছেন। কয়েকজন কৃতকর্ম্মা হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা ফলে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিনা। আমার মনে হয়, কর্ত্তৃপক্ষ দুই বিষয়ে যথোচিত মনোযোগী হন নাই। প্রথম এই কলা-বিজ্ঞান শিখিলেই কলা স্থাপিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় এই, দেশ না দেখিয়া, বিদেশে শেখা কলাবিজ্ঞান সহজে কার্য্যকারী হয় না। বস্তুতঃ কলা প্রবর্ত্তনের চারি পাদ আছে। ধন, নির্ব্বাহন, কলাজ্ঞান ও উপাদান। এই চারি পাদের একটির অভাব ঘটিলে কলা চলে না। যুবকেরা কলাজ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু অপর তিন পাদ পূর্ণ করিবে কে? আমরা নানা সময়ে, প্রায় সর্ব্বদা, কলাবিজ্ঞানালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সরকারের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু অন্য তিন পাদ কোথা হইতে জুটিবে তাহা ভাবিতেছি না। বোধ হয় এখন আমরা বুঝিতেছি, হঠাৎ কিছু করিতে পারা যায় না; দেশে একটা কিছু করিতে গেলে অন্য কিছুও করা আবশ্যক হয়।

অথচ নিশ্চিন্ত মনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও দেশে বিজ্ঞান-বিস্তার ঘটিবে না। যখন বিজ্ঞান-বিস্তার খুজি, তখন কেবল জ্ঞানমার্গে চলি না। বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের ধনবৃদ্ধিও খুজি। এই কথায় কেহ কেহ চমকাইতে পারেন। তাঁহারা বিজ্ঞানের পদচ্যুতির শঙ্কায় কাতর হইতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? বিজ্ঞানালোচনার আনন্দে যাহার দিন চলে না, তাহাকে বিজ্ঞানার্থে বিজ্ঞান বলায় নির্ম্মমতা হয় না কি? বিদ্যার্থে বিদ্যা কথাটায় নিষ্কাম ব্রতের উচ্চ ধ্বনি শুনিতে পাই বটে, কিন্তু যে সংসারে বাস করিতেছি সেটা অগ্রাহ্য করা বুদ্ধিমানের যোগ্য নহে। আমাদের ছাত্রেরা কি শিশু নির্ব্বোধ যে তাহারা হিতাহিত বিবেক করিতে পারে না? তাহারা কি মনে করে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাইবার অন্য পন্থা নাই বলিয়াই কলেজের দ্বারস্থ হইয়াছে? তাহারা জানে ডিগ্রি না পাইলে বৃত্তিহীন হইয়া অর্দ্ধাশনে থাকিয়া ঘরে বাহিরে লোকগঞ্জনায় দিন কাটাইতে

হইবে? যখন পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগিনী কাতরস্বরে বলেন, "হায় সে ফেল হইয়াছে", সে বৈজ্ঞানিক হইল না, মূর্খ হইয়া রহিল, এই শোকে কি হাহারব করেন? সকাম হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিলে ফল হয় না, ইহা বিশ্বাস করি না। যে কাজ করিয়া ধনমান লাভ হয় না, সে কাজে কয়জন অভিনিবিষ্ট হইতে পারে? কবিসিংহ মনে মনে কাব্য রচনা করিয়া কিংবা নির্জ্জনে লিখিয়া নিজে পড়িয়া তৃপ্ত হন না; ধনের আশা না করিলেও যশের আশা করেন। কাব্য ছাপাইয়া প্রচারিত করেন। "নিষ্কাম" বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা যশের আশা করেন। নতুবা প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষাভাগী হইতেন না। যিনি সৌভাগ্য-সম্পৎকরী সকল বিভবসিদ্ধি বাগ্‌দেবীর পূজা করেন, তিনি বিদেশে মান্য স্বদেশে ধন্য হন। পরা বিদ্যা নির্জ্জনে সাধনীয়া; অপরা বিদ্যা লোকসমাজের হিতের নিমিত্ত, নিজেরও হিতের নিমিত্ত, একারণ শিক্ষণীয়া। বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে, ইহা আমাদেরই দেশের নীতি; আর আমরাই বিদ্যাং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি বলিয়া ঠাকুরের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিই। বিদ্যাহীন মানুষ পশুর সমান, এ কথা সবাই জানে। বিদ্যা চাই নতুবা বাঁচিতে পারি না। জ্ঞানের নিকট সংসারের মান অপমান কিছুই নহে। কিন্তু জ্ঞানীর জীবন-সংগ্রাম মায়াময় নহে।

মূর্ত্ত-বিজ্ঞান সাহায্যে আজি কালি কি অভাবনীয় কাণ্ড সাধিত হইতেছে, তাহা আমাদের অবিদিত নাই। বিলাতী দীপশলা হইতে তড়িৎদীপের উদ্ভাবনা পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেই মাথা ঘুরিয়া পড়ে। শস্ত্র-চিকিৎসায়, বিষের প্রতিষেধে, অনুজীব ধ্বংসের উপায়ে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিলাতী মূর্ত্ত-বিজ্ঞান বিশেষতঃ মূর্ত্ত-রসায়ন ও চিকিৎসা-বার্ত্তার উন্নতি নিমিত্ত বহু বহু লোক অহোরাত্রি পরিশ্রম করিতেছেন।

অমূর্ত্ত বিজ্ঞান হইতে মূর্ত্ত বিজ্ঞানের জন্ম। কিন্তু মূর্ত্ত-বিজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অমূর্ত্ত বিজ্ঞানের প্রসার বাড়িয়াছে। প্রকৃতির শক্তি কাড়িয়া লইতে হইলে সে শক্তির পরিচয় প্রথমে চাই। গেলিলিও লণ্ঠন দুলিতে দেখিয়া দোলকের দোলনসূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানভিক্ষু ছিলেন। তাঁহার আবিষ্কারে সংসারের কি হিত হইবে, তাহা তিনি ভাবেন নাই। অন্য দিকে, টেলিগ্রাফের ইতিহাস স্মরণ করুন। ভল্টা তাড়িত-প্রবাহ আবিষ্কার করিলেন। তাহার পর কেহ চুম্বকের প্রতি তাড়িত প্রবাহের ক্রিয়া দেখাইলেন। টেলিগ্রাফি সৃষ্টি হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার প্রয়োজন হইল। নূতন পরিমাণ-যন্ত্র, সূক্ষ্মযন্ত্র, মান প্রভৃতি আবশ্যক হইল। ক্লার্ক—মাক্স্‌বেল এই ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে ঈথরের তরঙ্গ সিদ্ধ করিলেন। ইহা হইতে ক্রমে বিনা তারে বার্ত্তা প্রেরণ সম্ভাবিত হইয়াছে। অমূর্ত্ত বিজ্ঞান নূতন কিছুর সংবাদ শোনায়; মূর্ত্ত-বিজ্ঞান তাহার প্রয়োগ বৃদ্ধি ও পুষ্টি করে। একের সহিত অন্যের এই অভেদ্য বন্ধন আছে বলিয়াই আমরা বিজ্ঞান বিজ্ঞান রব করিতেছি।

বিজ্ঞান দ্রব্য গড়ে না, কলা গড়ে। বিজ্ঞান কলা গড়িবার সন্ধান বলিয়া দেয়। বিজ্ঞান জ্ঞান লইয়া সন্তুষ্ট, কলাবিজ্ঞান (কলার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান) জ্ঞান ও কর্ম্মের যোগ ঘটায়। কৃষি চিকিৎসা প্রভৃতির অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান বার্ত্তা-বিজ্ঞান। কলা-বিজ্ঞান ও বার্ত্তা-বিজ্ঞান মূর্ত্ত-বিজ্ঞান। অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান বিস্তীর্ণ, জগৎব্যাপী; আকাশের নাড়ী নক্ষত্র হইতে পাতালের নীচে কূর্ম্ম ছিল কি না, তাহার অনুসন্ধান করে। এই বিশাল বিজ্ঞানের মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। এই কারণে বিজ্ঞানের নানা শাখা-কল্পনা। ইহাদের মধ্যে ক্ষিতিতি-বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অন্য শাখারও উপজীব্য। এই দুই বিজ্ঞান অধিকাংশ মূর্ত্ত-বিজ্ঞান আদি। মূর্ত্ত-বিজ্ঞান ক্ষুদ্র; আমার তোমার যাহাতে হিত হইতে পারিবে তাহার বিজ্ঞান। এই কারণে, খণ্ডিত। কিন্তু অধিকারী-ভেদ ত আছে। যে জ্ঞান কেবল জ্ঞান না থাকিয়া ফলদায়ক হয় এবং যাহা লাভ করিতে ছাত্রের উৎসাহ হয়, তাহা মূর্ত্ত-বিজ্ঞান হউক, কলা-বিজ্ঞান হউক, তাহা হিতকর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকাল কলেজ, টিচার-ট্রেনিং কলেজ, ল কলেজ, এ সব কলেজের ছাত্রদিগের জ্ঞান ও বিনয় হয় না, বলিতে পারি না। ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকাল

কলেজ ধরুন। এখানে বার্ত্তার আবশ্যক নানা বিজ্ঞান শেখানা হয়, সবই খণ্ডিত; মেডিকাল কলেজে সুস্থ দেহের রক্ষা ও রুগ্ন দেহের আরোগ্য এই দুই বিষয় লইয়াই বিশাল বিজ্ঞান শেখান হয়। কিন্তু এই দুই কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র ও অমূর্ত্ত বিজ্ঞান-কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রের তুলনা করুন। শেষোক্ত ছাত্র জীবনসংগ্রামের যোগ্য নহে। বিশ বৎসরের যুবক বি, এ, বি, এস্‌সি পাশ করিয়া খণ্ডিত জ্ঞানের ফলে সংসার-ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ থাকে।

বিলাতের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে মূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিবার কলেজ আছে, অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিবারও আছে। জর্ম্মাণীর বর্ত্তমান আস্পর্দ্ধা ও বাহ্বাস্ফোটে অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান চর্চ্চার পরিধি পাওয়া যাইতেছে। বার্ত্তাশ্রয় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচুর আয়োজন সত্বে চারি বৎসর পূর্ব্বে বার্লিনে জর্ম্মাণ সম্রাট্ নিজের নামে এক "ইনৃষ্টি-টিউট্" প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের যাবতীয় কলার বার্ত্তার বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল দৃঢ় ও পুষ্ট করিয়াছেন। চরক বলিয়াছেন, সম্যক্ প্রয়োগং সর্ব্বেষাং সিদ্ধিরাখ্যাতি কর্ম্মনাম্—সর্ব্বকর্ম্মে সম্যক্ প্রয়োগ করিতে পারিলে সিদ্ধি বলা যায়। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে মূর্ত্ত-বিজ্ঞান বলে বার্ত্তা ও কলার উত্তম সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। প্রাচীন কালে যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণে শুল্ব-সূত্রের আরম্ভ হইয়াছিল, ক্ষেত্রবিভাগে ক্ষেত্র-তত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। নিম্ন সোপান হইতে উচ্চে উঠিতে বাধা হয় না। তেমন মূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিলে অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিতে বাধা হয় না।

অতএব দাঁড়াইল এই, অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান যিনি শিখিতে চান শিখুন, কিন্তু মূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিবার আয়োজন আবশ্যক। মূর্ত্ত-বিজ্ঞান দ্বারা অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান-জাত বিনয় লাভ হইবে, লৌকিক জ্ঞান হইবে, আর সেই জ্ঞান প্রকৃত হইবে। ইহাতে পারগ ছাত্র হাকিম হউন, উকিল হউন, এই দেশের সম্পর্কে থাকিবেন, তাঁহার অধীত বিদ্যা প্রয়োগের সুযোগ পাইবেন, এবং যত্ন করিলে মূর্ত্ত মার্গ ধরিয়া অমূর্ত্ত মার্গে উপস্থিত হইতে পারিবেন। ফলে দেশে বিজ্ঞান-বিস্তার হইবে। এত দিন অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিক্ষার ফল দেখা গেল; এখন মূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিলে কি হয়, তাহাও ত দেখা কর্ত্তব্য।

দেশে বিজ্ঞানপ্রচারের তৃতীয় অন্তরায় বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা। এই বিদেশী ভাষা, ইংরেজী ভাষা এত কঠিন যে, শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত দশ বার বৎসরের যত্নে ও শ্রমে যৎকিঞ্চিৎ আয়ত্ত হয়। মস্তিষ্কের শক্তি অফুরন্ত নহে, আমাদের বয়সও নহে। এই ভাষা শিখিতে আমাদের কত রক্ত জল হইতেছে; কত শক্তি তাপ হইতেছে, তাহা চিন্তা করুন। অথচ এই বিদেশী ভাষা শিক্ষা আমাদের কাম্য নহে; কাম্য বিজ্ঞান। কাম্যের চতুর্দ্দিকের কণ্টকের প্রাকার ভেদ করিতেই শক্তি সামর্থ্য ক্ষয় হইতেছে। ইহাও সহ্য হইত; মাতৃভাষায় না শেখাতে বিদেশী বিজ্ঞান বিদেশী থাকিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু বলিতে কিছু লিখিতে হইলে বিদেশী ভাষায় বলিতে লিখিতে হইতেছে; চিন্তা করিতে হইলেও বিদেশী শব্দমূর্ত্তির উপাসনা করিতে হইতেছে। কারণ, অন্য সাধন জানা নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে, সভাসমিতি আপিশ আদালতে যাইতে হইলে গৃহ প্রবেশ ত্যাগ করিয়া যেমন সভ্যবেশ পরিধান করি, এবং সেখান হইতে আসিয়াই সে বেশ ত্যাগে সুস্থ বোধ করি, আমাদের পক্ষে বিজ্ঞানও তেমন হইয়াছে। উহা দেশের ধাতুতে মিশিতেছে না, বাহিরে বাহিরে শোভাসম্পাদনের নিমিত্ত থাকিতেছে। ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখিতে ছাত্রের যত বৎসর লাগিতেছে, মাতৃভাষায় শিখিলে অর্দ্ধেক সময় লাগিত না। গত বৎসর শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্য সম্মিলনে বাঙ্গলায় বিজ্ঞান অধ্যাপনার সুবিধা বর্ণন করিয়াছিলেন। এখানে আর এক বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতেছি। কয়েক বৎসর আমাকে কটকের মেডিকেল ইস্কুলে রসায়ন-বিজ্ঞান শিখাইতে হইয়াছিল। ছাত্রদিগের শিক্ষনীয় বিষয় অল্প ছিল না; এখানকার আই, এস, সি পরীক্ষার নিমিত্ত যতখানি আছে প্রায় ততখানি ছিল। ছিল না কর্ম্মাভ্যাস। কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যে অধ্যাপনা শেষ করিতে হইত। আমরা কলেজে কত কুড়ি দিন দিয়া থাকি, তাহা সবাই জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশে অন্যূন সাতকুড়ি দিন অধ্যাপনা করিতেছি। এই প্রভেদের প্রধান কারণ ভাষার প্রভেদ। মেডিকেল ইস্কুলের ছাত্র মাতৃভাষায় শিখিত। দেখিয়াছি, ইংরেজীতে

যাহা এক ঘণ্টা বুঝাইয়া ছাত্রের হৃদ্‌গত করিতে পারি নাই, অল্প বাঙ্গলা কথায় তাহা অক্লেশে পারিয়াছি। জল কেন ছাঁকি, কি কাজে কেমন ছাঁক্‌নি চাই, ইত্যাদি হাজার বলি, এক "ফিল্‌টার" শব্দে একটা বিদেশী অজান: অদেখা বস্তুর আব্‌ছায়া মনে ভাসিতে থাকে। বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে বয়সে যত বিদ্যা আয়ত্ত করে, সে বয়সে তত বিদ্যা আমাদের ছাত্রেরা পারে না। এই যে ভাষা-বিভীষিকা যাহার জন্য আমাদের ছাত্রদিগের দেহ মন জড়ভাবাপন্ন হইতেছে, ইহার প্রতিকার কি হইবে না? ইংরেজী ভাষা, বিদেশী ভাষা শিখিলে হিত হয় না, কিংবা বিনয় অভ্যাস হয় না, এমন বলি না। বলি, কি মূল্য দিয়া এই হিত ক্রয় করিতেছি? মাতৃ-ভাষায় শিখিলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব মনে গাঁথা হইয়া যায়, বিদেশী ভাষায় বহু সময় লাগে! আরও দেখুন, বিদেশী ভাষা হেতু শিক্ষার ফল দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে না। বিজ্ঞান জনকয়েকের অধিকৃত থাকিতেছে, সকলের ভোগে আসিতেছে না।

## কৃষিবার্ত্তা দ্বারা বিজ্ঞান-প্রচার।

দেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্রগণের প্রতি দৃষ্টি প্রথমে পড়ে। চারি পাঁচ বৎসর যথোচিত যত্ন ও শ্রম করিয়া যে বিজ্ঞান আয়ত্ত হয়, তাহা সংসারে প্রবেশ মাত্র পরিত্যক্ত হইতে পারে, ইহা প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস হইত না। দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ প্রকৃত নহে, কিংবা কালবৈগুণ্যে অনুরাগ স্থায়ী হয় না।

বিলাতে অপরেও বিজ্ঞানের বহু বিষয় আলোচনা করেন। এক এক জন লব্ধকাম হইয়া প্রাজ্ঞ হন। এদেশে এরূপ লোক অত্যল্প। কিম্বিতি-বিজ্ঞান কিংবা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তুল্য অমূর্ত্ত-বিজ্ঞানচর্চ্চায় সজ্জিত কর্ম্মশালা আবশ্যক হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অনেক শাখা কেবল ভূয়োদর্শনে পুষ্ট হয়। এমন কি, কেহ কেহ বিজ্ঞানকে পরিসংখ্যাবিদ্যাও বলিয়াছেন। উদ্দেশ্য অনুসারে বৃত্তান্তসংগ্রহের নাম পরিসংখ্যা। বস্তুতঃ, পরিসংখ্যা ব্যতীত ভূয়োদর্শন সম্পন্ন হয় না। বিনা গণিতে বিনা দূরবীক্ষণে জ্যোতির্ব্বিদ্যা, বিনা যন্ত্রে আবহ-বিদ্যা, বিনা উপকরণে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, কীটপতঙ্গ মৎস্য পক্ষী বিদ্যা, বিনা খনিত্রে ভূপৃষ্ঠবিদ্যা প্রভৃতির এক অংশ সম্যক্‌ সাধিত হইতে পারে। আজিকালি বাঙ্গালী দেশভ্রমণ করিতেছে। কখনও রোগের তাড়নায়, কখনও অবকাশের তাড়নায় স্থানান্তরে যাইতেছে, কোথাও দুই এক মাস প্রবাস করিতেছে। এই সময় নিজের দেশের গ্রামের সহিত নূতন দেশের তুলনার সুযোগ আপনি হয়। উদ্দেশ্য অভিমুখে চলিতে অভ্যাস করিলে বিধেয় আপনি চোখে পড়ে। জ্ঞানৈষণা দোসর করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পরিসংখ্যানও সিদ্ধ হয়।

যাঁহাদের নিমন্ত্রণে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহাদের ইচ্ছা আমরা দেশে কৃষিরসায়ন জ্ঞানের প্রচার চিন্তা করি। তাঁহাদের ইচ্ছা অবশ্য পূরণীয়া। কিন্তু বিষয়-গৌরব স্মরণ করিয়া বিমূঢ় হইতেছি। যে বার্ত্তা আমাদের প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে চারি জনের একমাত্র জীবিকা, সে কৃষিবার্ত্তার অভ্যুদয়-চিন্তা কদাপি অধিক হইতে পারে না। ইহা ভাবিয়া কৃষি উপলক্ষ্য করিয়া আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি।

কৃষিকর্ম্মে যে বিজ্ঞান আবশ্যক, অথবা কৃষিকর্ম্মের অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান কৃষি-বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। ইহা মূর্ত্ত-বিজ্ঞান, এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ইহার অমূর্ত্ত আকার। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানেও অপর সমুদয় বিজ্ঞান আবশ্যক হয়। আকাশ হইতে পাতালের স্থাবর অস্থাবর সকল দ্রব্যের, কোন স্থলে গভীর কোন স্থলে অগভীর জ্ঞান আবশ্যক হয়। মৃত্তিকা-জল-বায়ুর ভৌতিক বিজ্ঞান, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের স্বভাব নির্ণয় প্রভৃতি হইতে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান পৃথক্‌ করিতে পারা যায় না। বৃক্ষের জীবনধারণ, বর্দ্ধন, পোষণ, সন্তানজনন প্রভৃতি ব্যাপার ভৌতিক জড়ধর্ম্ম বলিয়া অদ্যাপি প্রমাণিত হয় নাই। বস্তুতঃ যখনই জন্মমরণ বলি তখনই এক অজ্ঞাত অনির্দ্দিষ্ট, বোধহয় চির অজ্ঞেয়, সত্ত্ব স্মরণ হয়। বাহ্য-প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষেত্র জীবকে কতদিকে নিয়মিত করিতেছে, তাহারই মধ্যে জীব জন্মিতেছে, বাড়িতেছে, মরিতেছে, কিছু রাখিয়াও

যাইতেছে। ইহার তুলনায় ভানুমতী-বাজি কিছুই নয়। আচার্য্য বসুর জগৎবিখ্যাত আবিষ্কারে জন্তুর সহিত উদ্ভিদের বিলক্ষণ সাদৃশ্য স্পষ্ট হইতেছে। রাসায়নিকের গোটা দশ বার মূল পদার্থ পাইলে এক একটা বৃক্ষ জীবিত বৰ্দ্ধিত ফলপ্রসূ হইতে পারে, কিন্তু রসায়ন-বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু আছে।

সেটা কি, কে জানে। কিন্তু জানি সর্ষপবীজ ও বটবীজ এক ক্ষেত্রে উপ্ত হইলেও সর্ষপ ও বটবৃক্ষ এক হয় না। কৃষক ভূয়োদর্শনে ভর করিয়া শস্য জন্মাইতেছে, বীজ সংগ্রহ করিতেছে, মাটি বিচার করিতেছে, বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিতেছে, ক্ষেত্র বীজাঙ্কুরোৎপত্তির যোগ্য করিতেছে, বৃক্ষের শত্রু বিনাশ করিতেছে, নবজাত বৃক্ষশিশু পালন করিতেছে। মাটি জল বায়ু রবিকর তেজ অব্যাহত রাখিয়া ফলের প্রত্যাশা করিতেছে, একটা বীজ হইতে বহু পাইতেছে। বীজের সেটা কি শক্তি যাহাতে তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াও পূর্ণ থাকিতেছে? যে সর্ষপ সে সর্ষপ, যে বট সে বট থাকিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বহু হইতেছে। জীবন ত দ্রব্যগুণ বলিতে পারা যায় না। অথচ সরিষা ক্ষেতের দুইটি সরিষা গাছ অবিকল এক নহে, আম-বাগানের সব গাছের আম সমান বড় সমান মিষ্ট নহে। তবে, বৃক্ষের আকার প্রকার স্বভাব চরিত্র পরিবৃত্তিশীলও বটে। দেখিলে বোধ হয়, প্রকৃতি জাতিভেদ করেন নাই; আমরা করিয়াছি। আমাদের স্বল্প জ্ঞানে ভেদাভেদ আসিয়াছে। যাহা বিজ্ঞান বলি, বিজ্ঞানের সূত্র বলি, তত্ত্ব বলি, তাহা মানুষের কল্পিত রচিত; প্রকৃতির তত্ত্ব আমরা জানিতে চাই, জানিতে পারিতেছি না।

এ কথা প্রাণী সম্বন্ধেও সত্য। উচ্চ প্রাণী সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইয়া এক সত্ব। ইহার আয়ু নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার যাবতীয় অঙ্গ সেই একের জীবন-নির্ব্বাহ করিতেছে, সত্ব রক্ষা করিতেছে। একটা অঙ্গ ছিন্ন হইলে উহা বিকলাঙ্গ হয়, হয়ত মরিয়া যায়। ছিন্ন অঙ্গ পচায় না, বাড়ে না, আর একটা সত্বের উৎপত্তি করে না। গাছের এরূপ নহে। গাছের আয়ু স্থির নাই; ইহার ডাল মাটিতে পড়িলে পচায়, পাতা ফুল ফল ধরে, বীজ উৎপাদন করে। অথচ উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের যে ভূত-পদার্থে জীবন ব্যক্ত হইতেছে সে প্র-পঞ্চ রাসায়নিক উপাদানেও প্রাকৃতিক লক্ষণে এক বোধ হইতেছে।

ফলোৎপত্তির পক্ষে বীজ প্রধান কি ক্ষেত্র প্রধান, তাহা লইয়া পূর্ব্বকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত বিলক্ষণ বিতর্ক চলিতেছে। বৃক্ষের, ইহা জোগ পালার ফুলফলের স্থিরতা আছে, নাই-ও। ইহা নিত্য দেখিতেছি। একের মধ্যে বহুরূপতার দৃষ্টান্ত জীবেই পাই। যখন ডাল হইতে গাছ হয়, এবং বহু বৃক্ষ জীব বিনা অরণ্য হইয়া পড়ে, তখন বীজোৎপত্তির বিচিত্র ব্যবস্থা কেন হইয়াছে? ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় পশু-বর্দ্ধক ও বৃক্ষ-বর্দ্ধক জনক জননী নির্ব্বাচন করিয়া কখনও ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত সন্তান জন্মাইতেছে। পিতা মাতা হইতে সন্তান কি কি গুণ হরণ করে, তাহার পরিসংখ্যান সমাপ্ত হইতে বিলম্ব আছে। এই হারিতার কারণ কি, কে জানে? এ বিষয়ে কে কি বলেন, তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রোয়জন। জন্মহ হইতে জাতের প্রভেদ হয়, জাত অধিক হয়, সকলের খাইবার থাকিবার সম্ভাবনা হয় না, যোগ্যের জয় হয়, এবং যে পরিবৃত্তি হেতু জয় তাহার কিছু কিছু হারিত হয়। এসব কথা জীববিজ্ঞানে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। যোগ্যের জয় বলি, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলি, এসব কথার কথা মাত্র। অসৎ হইতে সতের উদ্ভব হয় না, যাহা নাই তাহার সঞ্চয় হইতে পারে না। অতএব বীজে কিছু থাকে যাহা হেতু জাত জীব জন্মদের সদৃশ হয়, সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু কথা এই, সন্তানে যে পরিবৃদ্ধি লক্ষিত হইল তাহা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বাড়িয়া চলিতে পারে কি? মাঠে হাজার মূলা গাছের মধ্যে দশটা পুষ্ট হয়, সে দশটার বীজ হইতে জাত মূলা আরও পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ফুলিয়া কলাগাছের মতন মোটা হইতে পারে কি? মানুষের বেলা এরূপ প্রশ্ন তুলিলে জিজ্ঞাস্য হয় পাণ্ডিত্য বংশের পুত্র পৌত্রেরা ক্রমে ক্রমে অতি-পাণ্ডিত্য হইয়া উঠিবে কি? কিন্তু ভূয়োদর্শনে জানা যায় যে তাহা হয় না। অষ্ট্রিয়াবাসী মেণ্ডেল বর্ণ সংকরণে প্রচুর পরীক্ষা ও ভূয়োদর্শন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন

যে বর্ণ সংকরণের ফল দৈবায়ত্ত। দৈবায়ত্ত বলিয়া কিন্তু অন্ধ দৈবঘটনার তুল্য সন্তানের দ্বারা জন্মদের গুণ হরণ গণিত-বিদ্যায় সাধিত হইতে পারে।

তা বলিয়া ক্ষেত্র যে কিছু নহে এমন নহে। বরং দেখা যায়, ক্ষেত্র অনুসারে গাছের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবৃত্তি হয়।

এবং হয় বলিয়াই কৃষক ঈপ্সিত ফল প্রত্যাশা করে। বস্তুতঃ—কৃষিকর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, বীজকর্ম্ম ও ক্ষেত্রকর্ম্ম। বীজকর্ম্মে বীজ নির্ব্বাচন, বপন, অঙ্কুরোদ্গমন, জাত বৃক্ষের পালন, এবং শেষে বীজ রক্ষণ। ক্ষেত্রকর্ম্মে মাটির উৎপত্তি স্থিতি জলবায়ু ও রবি-তেজ নির্ব্বাহ, বৃক্ষের শত্রুর বিনাশ প্রভৃতির নিমিত্ত কর্ম্ম। ইহার এক এক কর্ম্মে প্রচুর বিজ্ঞান আছে, অনেক গবেষণা করিবার আছে। এক মাটিই—ধরি। দেখা যায়, যে মাটি স্বভাবতঃ অধম তাহাতে হাজার রসায়ন প্রয়োগ করি, তাহা কদাপি উত্তম মাটির তুল্য সুফলা হয় না। ফলসহিত বৃক্ষদেহ ভস্মীভূত করিলে মাটির প্রায় যাবতীয় উপাদান ভস্মে পাওয়া যায়। অথচ নির্দ্দিষ্ট পদার্থ মিশ্রিত করিয়া জলে বৃক্ষ জন্মাইলে গোটা দশ বার মূল পদার্থ পর্য্যাপ্ত হয়। এইরূপে জানি, নাইট্রোজেন গন্ধক ফস্ফরস্ পটাসিয়ম্ মেগনিসিয়ম্ কেলসিয়ম্ লোহ এবং বোধ হয় সোডিয়ম্ ও ক্লোরিম্ মাটিতে না থাকিলে নয়। নাইট্রোজেন গন্ধক ফস্ফরস্ প্রপক্ষে আছে। অতএব এই তিন কেন আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারি। সেইরূপ অক্সিজেন হাইড্রোজেন কার্ব্বন কেন চাই, তাহা বুঝিতে কষ্ট নাই। অপর কয়টা সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখনও স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে না। পটাসিয়ম্ বিনা বৃক্ষপত্রে পললীয় (শ্বেতসার) উৎপন্ন হয় না, কেলসিয়ম্ বিনা ব্যাপ্ত হয় না, লোহ বিনা পত্রের রঞ্জক অর্থাৎ পললপিত্ত উৎপন্ন হয় না, এবং বোধ হয় মেগনিসিয়ম্ বিনা পললপিত্তের প্রাচুর্য্য হয় না। ভূয়োদর্শনে জানিতেছি, হয় না; কিন্তু ভূয়োদর্শন ত বিজ্ঞান নহে। আমাদের দেহের পুষ্টির কারণ যেমন অজ্ঞাত ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি কিসে, তাহাও প্রায় সেইরূপ অজ্ঞাত।

এখানে এক বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে। আমার এক উদ্‌যোগী বন্ধু কৃষিকর্ম্ম নিমিত্ত পাঁচ ছয় শত বিঘা জমি কিনিয়াছিলেন। সে জমিতে কি ফসল উত্তম জন্মিতে পারিবে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে জমির কিছু মাটি এক রাসায়নিকের বিশ্লেষণের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। বিশ্লেষণ-ফল রসায়নের সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত হইয়া আসিল। এই সঙ্কেত বুঝিতে না পারিয়া বন্ধুবর বুঝাইয়া বলিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। তখন আমার যে সঙ্কট উপস্থিত হইল, তাহা আপনারা অনুমান করিতে পারেন। মাটিতে বালি এতভাগ, আলুমিনা এতভাগ, ইত্যাদি শুনিয়া তিনি অধীর হইয়া যে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। তিনি জানিতে চান, কি শস্য উত্তম জন্মিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, ইহার উত্তর রসায়ন বিজ্ঞান দিতে পারে না। পরদিন জমি হইতে স্বচ্ছন্দ-জাত বৃক্ষাদি আনাইয়া দিলেন। দেখিয়া বলিলাম, ভূমি অনুর্ব্বরা, এমন অনুর্ব্বরা, যে প্রচুর অর্থব্যয় করিলেও কয়েক বৎসর ধান, কলাই, ভাল জন্মিবে না। জাত বৃক্ষের বৃদ্ধি ও পুষ্টির সহিত মাটির উপাদান মিলাইয়া দেখিলে উর্ব্বরতা অনুমান করিতে পারা যায়, নতুবা নহে। পরে শুনিলাম বন্ধুবর এক পাহাড়ের ধারে জমি কিনিয়াছেন।

বস্তুতঃ, কৃষি-বিজ্ঞান এত অজ্ঞাত যে ভূয়োদর্শন ব্যতীত কৃষি চলিতে পারে না। এ কারণ, জমি নূতন, বীজ নূতন হইলে অর্থাৎ ক্ষেত্র ও বীজ দুইই অজ্ঞাত হইলে ভাবী ফলও অজ্ঞাত থাকে। মৃৎকুণ্ডে দুই চারিটা আখ্ গাছ যত্নে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিতে পারা যায়; কিন্তু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, এবং সেটা কাজের কথা, কৃষকের বর্ত্তমান সহায়-সম্পত্তি লইয়া পারা যায় কি না, সেটাই গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যার পূরণ না হইলে কৃষি-বিজ্ঞান আর উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান প্রায় এক থাকিয়া যায়, কৃষি-বার্ত্তা দাঁড়াইতে পারে না। দেশের কৃষক জানে, গোবর জমির "সার", এ কারণ সারকুড়ে সারগাদা করিয়া রাখে। গোবরের উপাদান কি, তাহা জানে না; কিন্তু জানে কোন্ মাটিতে কোন্ ফসলের পক্ষে গোবর হিতকর, কিসের পক্ষে খইল হিতকর। মাঠের মাটি পরীক্ষা করিয়া জানি, জমিতে নাইট্রোজেন ফস্ফরস্ ও

পটাসিয়মের ন্যূন। আশঙ্কা করিবার কথা। সব মাটিতেই কিছু না কিছু আছে, কিন্তু একটার ন্যূনতায় বৃক্ষ-জীবন-ক্রিয়া আটকাইয়া যায়। নাইট্রোজেনের সম্ভাব কদাচিৎ হয়, এ বৎসর সম্ভাব হইলেও পর বৎসর হয় না। কারণ বৃক্ষকে যে সো্ণ আকারে নাইট্রোজেন লইতে হয়, তাহা জলে ধুইয়া চলিয়া যায়, জমিতে থাকে না, এ কারণ কৃষক গোবর, গোমূত্র, অন্য পশুর বিষ্ঠা মূত্র চর্ম ও শৃঙ্গ চূর্ণ, গাছ-পচা প্রভৃতি দ্বারা নাইট্রোজেন নির্ব্বাহ করে। বরাহের বৃহৎ-সংহিতায়, অগ্নিপুরাণে শুক্রনীতিতে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ আছে। পূর্ব্বকালে দ্রব্যগুণ প্রচুর আলোচিত হইয়াছিল। আমাদের আয়ুর্ব্বেদে যে দ্রব্যগুণ বর্ণিত আছে, তাহা যে কত ভূয়োদর্শনের ফল তাহা ভাবিলে এই বিজ্ঞানের দিনেও পূর্ব্ব পিতামহদিগের প্রতি মস্তক আপনি নত হয়। দ্রব্যগুণ জানিলে লৌকিক কাজ চলে বটে বিজ্ঞান এষণা তৃপ্ত হয় না ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে পূর্ব্বকালের মানব অপেক্ষা আজি-কালির মানব অধিক বুদ্ধিশালী। স্মর বালেসের প্রমাণে বলিতেছি, বুদ্ধি পূর্ব্বাপর সমান আছে; পূর্ব্বেকার জ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞান যুক্ত হইতেছে। ইহাতেই, এই উত্তরাধিকারিত্বেই, সভ্য মানবের বড়াই। পূর্ব্বকাল হইতে "কণশঃ কণশঃ সাধিত" জ্ঞান একত্র হইয়া আধুনিক বিজ্ঞান। পূর্ব্বে ও এখন দেশ বিদেশে যে জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, তাহা আমাদের সকলের ভোগে আসিবার সুযোগ হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদের কৃষিকর্ম্মে প্রয়োগ করিয়া বুঝিতেছি গোবর ও খইলে নাইট্রোজেন ফস্‌ফরাস্ পটাসিয়ম্ আছে বলিয়া জমির সার হইয়াছে। দেশের কৃষক হাড়ের গুণ জানিত না। তাহার জানিবার প্রয়োজন ঘটে নাই; গ্রামের গবাদির হাড় গ্রামেই পড়িয়া থাকিত, দূর দেশান্তরে চলিয়া যাইত না। নদী-মাতৃকা ভূমি, যে ভূমি নদীর পলি হেতু মাতৃস্বরূপা হইয়া শস্য দ্বারা প্রজাপালন করে তাহার গুণ আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। আমরা নদীর দুই পাশে অবিচ্ছিন্ন বাঁধ বাঁধিয়া উর্ব্বরতা শক্তি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেছি। দামোদরের বন্যা বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঘর বাড়ী নষ্ট করে বটে, কিন্তু যে কৃষক দামোদরের পলি পায় সে অপর সার খইল খোঁজে না। দেশের জ্বালানি কাঠ দুর্লভ; কৃষক গোবর না পোড়াইয়া পারে না; গোবরের নাইট্রোজেন বায়ুসাৎ হয় তাহা জানিয়াও গোবর পোড়ায়। খইল মহার্ঘ; গরুকেই খাওয়াইতে পারে না। এই অবস্থায় প্রকৃতিদত্ত পলির অপচয় চলে কি? নদীর পলি খাল ডোবা বুজাইয়া দেশ ভরাইয়া উচা করে, যে ম্যালেরিয়া পশ্চিম বঙ্গ উৎসন্ন করিতেছে তাহারও নাকি প্রতিকার করে। বস্তুতঃ কৃষির একটা মূল কথা এই যে, ভূমি হইতে শস্য রূপে যাহা উঠাইয়া লইবে, কোন-না-কোন আকারে প্রত্যর্পণ করিবে, নতুবা ভূমি নিঃসার হইয়া পড়িবে। এতএব দেশ হইতে তিল তিসি গম কাপাস-বীজ প্রভৃতি স্থানান্তরিত হইলে খইল দিয়া ভূমি-ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

নাইট্রোজেন ফস্‌ফরাস্ পটাসিয়মের ন্যূনতা শঙ্কায় জমিতে প্রচুর গোবর খইল হাড় শিংগুঁড়া প্রভৃতি ঢালিলেই কর্ম্ম নিষ্পত্তি হয় না। গোমূত্রে মাটির তেজ বাড়ে বটে, কিন্তু অবস্থা গুণে গাছ জ্বলিয়াও যায়। জল বিনা গাছ বাঁচে না, কিন্তু আধিক্যে মরিয়া যায়। মাটির গুণে রবির তেজে শস্যের পক্ষে অধিক জল অল্প হয়; ক্ষেত্র-ভেদে অল্প জল অধিক হয়, রন্ধনকলায় অনভিজ্ঞ পাচক মস্‌লার আধিক্য ঘটাইয়া ব্যঞ্জন সুস্বাদু করিতে চায়; কিন্তু যেমন মাত্রাজ্ঞ পাচক শ্রেষ্ঠ, মাত্রাজ্ঞ কৃষক ও তেমন শ্রেষ্ঠ। জল ও সারের মাত্রা, বৃক্ষানুসারে মাত্রা সম্বন্ধে পরীক্ষা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু অদ্যাপি ভূয়োদর্শনে নির্ভর করিতে হইতেছে। কিসে কখন কোন্ শস্যের পক্ষে মাত্রা অধম, কখন উত্তম হয়, তাহার বিজ্ঞান ত জানি না।

এই কারণে বলিয়াছি আমাদের নিমন্ত্রকবর্গের ইচ্ছা শুনিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি। দেখিতেছি, কৃষিকর্ম্মের এক ক্ষুদ্র অংশেও আমাদিগকে দৈবের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইতেছে। সৎক্ষেত্রে মূর্খ দ্বারাও বীজ উপ্ত হইলে উপচয় হয়। আশা এই যে আমার ক্ষেত্র সম্মুখে পশ্চাতে চারিদিকে বিস্তৃত। আমরা যে বার্ত্তা আশ্রয় করিয়া জীবিকা করিতেছি, ক্ষেত্রস্বামীগণ তাহার উপায় বিধান করিবেন।

কৃষিবার্ত্তা দৃষ্টান্ত করিবার অপর উদ্দেশ্য আছে। (১) দেখা যায় এই বার্ত্তা ধরিয়া দুরূহ বিজ্ঞানে প্রবেশ করিতে পারা যায়। যে সকল ছাত্র মূর্ত্ত-বিজ্ঞান সহজ মনে করেন, তাঁহারা দেখিবেন কৃষি কর্ম্মের এক এক বিজ্ঞান অদ্যাপি অজ্ঞাত। (২) গবেষণা জাগ্রত করিবার পক্ষে কৃষি-বার্ত্তাও সুন্দর উপায়। গবেষণা শব্দের মূলার্থ নাকি গরু খোজা। গরু হারাইলে লোকে খুজিতে বাহির হয়। কৃষি-বার্ত্তায় অসংখ্য গরু, মূল্যবান্ গরু, খুজিবার আছে, যে গুলা পাইলে আমাদের বহু মঙ্গল হইবে। চাণক্য নাকি বলিয়াছেন, কৃষির্যস্য ন বাণিজ্যং গাবো যস্য ন ধেনবঃ। দারিদ্র্যং সততং তস্য গৃহে তস্য কুভোজনম্॥ আমাদের গৃহে যে কুভোজন হইতেছে, তাহা পল্লীতে প্রবেশ করিলেই প্রত্যক্ষ হয়।

এই যে অভাব-বোধ হইতে গবেষণা তাহাই প্রকৃত; অন্যের দেখাদেখি যাহা তাহা কৃত্রিম। আরও দেখিতেছি কৃষি ধরিয়া প্রায় যাবতীয় বিজ্ঞান শিখাইতে পারা যায়। বিজ্ঞানের এমন শাখা মনে হইতেছে না যাহা ইহাতে কিছু না কিছু না লাগে। ইহাই ত প্রজাসাধারণের আবশ্যক। বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্ব প্রচারিত হউক, পরিচিত কৃষি-বার্ত্তার দৃষ্টান্তে প্রচারিত হউক। দেশের আপামর সাধারণে প্রচারিত হউক; পুস্তক দ্বারা হউক, কথা দ্বারা হউক। কিন্তু দেখিবেন যেন পুস্তক ও কথা দ্বারা পাঠক ও শ্রোতার মনে বিজ্ঞানের প্রতি আদর জন্মে। তাহাদের জ্ঞাত বিষয় লইয়া বিজ্ঞান প্রচার করিবেন; কেন না তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। উহা উল্লেখ করিতে পারেন, কিন্তু তদ্ দ্বারা অজ্ঞতা ঢাকিতে চেষ্টা করিবেন না। পাঠক ও শ্রোতা হাজার বিষয়ে অজ্ঞ হউন, তাঁহারা মানুষ, বুদ্ধিশালী মানুষ, এ কথা কদাপি ভুলিবেন না।

আমাদের বৈজ্ঞানিক যুবকের নিকট কখনও কখনও দ্বিবিধ প্রশ্ন শুনিয়াছি (১) গবেষণার কি বিষয় বাকি আছে যাহা তিনি আরম্ভ করিতে পারেন। (২) গবেষণার বিষয় থাকিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান-কর্ম্মশালা নইলে ত কিছুই করা যাইতে পারে না। প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রায় দিয়াছি; দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বলি, বিজ্ঞান-শালার পরীক্ষার পূর্ব্বে প্রথমে ভূয়োদর্শন চলুক। পরিসংখ্যান কিংবা ভূয়োদর্শনের নিমিত্ত বিজ্ঞান-শালার প্রয়োজন হয় না। উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া চলিতে থাকিলে বিষয় আপনি জুটিবে। আমরা সংসার-বৃত্তিতে "বাবু" হইয়া পড়িয়াছি। আমার মনে হয় জ্ঞানের পথে চলিবার সময়ও ভোগাসক্তি ভুলিতে পারি না। আমরা আর্য্য ঋষি মহর্ষি ইত্যাদি নাম উচ্চারণ দ্বারা মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করি। কিন্তু যাহাদের জ্ঞানের জন্য আমাদের গর্ব্ব, তাঁহারা কি টানা-পাখার বাতাসে বসিয়া ভোগ-বিলাসে থাকিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন? বিজ্ঞান-শালা নাই, যন্ত্র-পাতি নাই; নাই থাক এমন বিষয়ও ত আছে যাহাতে যন্ত্র-পাতি লাগে না। মানুষই বড়, যন্ত্র ত বড় নহে। এইত সে দিন ওড়িশার চন্দ্রশেখর সিংহ দুই খণ্ড কাষ্ঠ লইয়া অসাধ্য-সাধন করিয়া গিয়াছেন। যে পঞ্জিকাসংস্কার-কোলাহলে কর্ণ পীড়িত হইয়াছে, দুই খানা কাঠির জোরে ওড়িশায় সে কোলাহল উঠিতে দেন নাই।

তৃতীয় প্রশ্নও শুনিয়াছি। বিজ্ঞান-শালা আছে, অবসরও আছে। কিন্তু কোন বিষয়ে গবেষণা কতদূর হইয়াছে তাহা জানি না, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পত্র দেখিতে পাই না, যাবতীয় ভাষাও বুঝি না। ইহাদিগকে আমার নিবেদন এই যে, দেশের বার্ত্তা কিম্বা কলা ধরিয়া গবেষণা করুন, তাহা নিশ্চয়ই নূতন এবং নিশ্চয় অফুরন্ত আছে। যে কোন একটা ধরুন, সেটা শেষ হইতে না হইতে দশটা আক্রমণ করিবে। সেটার বিজ্ঞান অন্য কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকিলেও ক্ষতি হইবে না। দেশভেদে পাত্রভেদে ব্যাখ্যা ভেদ হইতে পারে, পূর্ব্ব আবিষ্কার সত্য কি না পরীক্ষা হইবে। ইহাও না হয়, আপনার চেষ্টিত দ্বারা আপনার শক্তি বাড়িবে। আত্মশক্তি লাভ শ্রেয়স্কর। হলাণ্ড দেশীয় ডি ভ্রিজ্ নামক উদ্ভিদ্‌বেত্তা তাঁহার বাগানের একটা গাছের পরিবৃত্তি দেখিয়া তাহার তত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে ডার্বিনের মতের অপবাদ ধরিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে জন্তু ও উদ্ভিদের জাতি-বাহুল্য

ঘটে নাই, অর্থাৎ জীবসৃষ্টি অবিচ্ছিন্ন ভাবে নাই। তাঁহার গবেষণার সময় তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী মেণ্ডেলের গবেষণার ফল কিছুই জানিতেন না। ডি ভিরিজ বর্ণ সংকরণ দ্বারা গুণহারিতা অনুসন্ধান করিতেছিলেন, মেণ্ডেলও সে বিষয়ে গবেষণা করিয়া এমন এক তথ্য পাইয়াছিলেন যাহা এখন মেণ্ডেলের সূত্র নামে প্রচারিত হইয়া বিবর্ত্তনবাদীর মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডি ভিরিজ মেণ্ডেলের সূত্র অবগত থাকিলে হয়ত তাঁহার গবেষণা পাইতাম না, কিম্বা তাঁহার চিন্তা প্রসূত অনুমানও আসিত না। অতএব দেখা যাইতেছে, কে কোথায় কি তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা না জানিলেও গবেষণার ফল ব্যর্থ হয় না।

তবে এ কথা মানি, কাজের একটা শৃঙ্খলা থাকিলে ভাল হয়। সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গলা গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতেছেন, এই নিমিত্ত কর্ম্মী নিযুক্ত করিয়াছেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে কি ফল ফলিয়াছে তাহা আমরা সবাই জানি। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ম্মীর দল বাঁধিতে পারিয়াছেন এবং আমাদের দেশের ইতিহাস উদ্ধারে নিযুক্ত হইয়াছেন। দেশের বিজ্ঞানৈষণার এইরূপ এক সমিতি হইলে অনেক অকর্ম্মা ও নিষ্কর্ম্মা কর্ম্মীর দলে পড়িয়া কর্ম্মের পথ দেখিতে পাইতেন। মনে করুন যেন তাঁহারা দেশের সকলেই আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, আসুন আমরা দেশের বাজার বিজ্ঞান উদ্ধার করি। এ কাজে ছোট বড় ভেদ নাই, দেহের হাত ছোট কি পা ছোট, তাহা যেমন নিরর্থক প্রশ্ন, এ কাজের কাজীদিগের ছোট বড় নাই। যিনি আবহ-বিদ্যা ভালবাসেন, তিনি কৃষি ও আবহের সম্বন্ধ স্থির করুন। কোন্ মেঘে কখন কি পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে, অমাবস্যায় পূর্ণিমায় বৃষ্টি হয় কি না "চাঁদের শোভা নিকট জল" এ কথা সত্য কি না, বাতাসে ঝড়ে কোন্ শস্যের কি ক্ষতি হয়, ক্ষতি হয় কেন, আমের মুকুলের কোন্ অবস্থায় কুয়াসা হিতকর নহে, ইত্যাদির উত্তর সংগ্রহ করুন। যিনি রাসায়নিক গবেষণা ভালবাসেন, তিনি কৃষির পক্ষে মাটির তিন আবশ্যক উপাদানের হ্রাস বৃদ্ধি পরিমাণ করুন; শস্যের সহিত মাটির উপাদানের সম্বন্ধ নির্ণয় করুন, শস্যের পরিমাণ ও গুণের সহিত করুন, কিংবা শস্য বৃক্ষের বয়স অনুসারে করুন, ইত্যাদি। এইরূপ নানা বিষয় আছে। যিনি যে শাখা ভালবাসেন তিনি সেই শাখাতেই জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন। ডাক্তার কবিরাজ সকলেরই কাজ করিবার আছে। বিজ্ঞান ছাড়িয়া অর্থবিদ্যারও প্রচুর ক্ষেত্র আছে। উপরে যে সমিতির উল্লেখ করিয়াছি, সে সমিতি প্রশ্ন ছাপাইয়া, কোথাও কোথাও মার্গ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়া দেশের মধ্যে বিতরণ করিবেন। আমার বিশ্বাস, এইরূপে দেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। যাহার ফল সদ্য সদ্য পাই, তাহার দিকে আমরা স্বভাবতঃ ধাবিত হই। এই কারণে কৃষি-বার্ত্তা ধরিয়া বিজ্ঞান প্রচার করিতে বলিতেছি।

কিন্তু বিজ্ঞান প্রচারের কথা উঠিলেই ইহার ভাষা পরিভাষার প্রশ্ন উপস্থিত হয়। গত বৎসর রামেন্দ্র বাবু এ বিষয়ে বলিয়াছেন। আমারও মনে হয় আমরা পরিভাষা-সমস্যা যত কঠিন মনে করি, বস্তুতঃ তত নহে। এ বিষয়ে দুই চারি কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

ব্যাকরণে শব্দের চারি প্রবৃত্তি বা অর্থ ধরিয়া শব্দসমূহ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। জাতি শব্দ, গুণ শব্দ, দ্রব্য বা সংজ্ঞা শব্দ, এবং ক্রিয়া শব্দ।—এই চতুর্বিধ শব্দের মধ্যে দ্রব্য শব্দ সম্বন্ধে সঙ্কট মনে হইয়াছে। কথাটা এই, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন বলিব, না অন্য নামে বলিব? এরূপ বিতর্ক ওঠে কেন, তাহা বুঝা কঠিন। গরুকে গরু বলিব, না অন্য কিছু বলিব, এ বিতর্ক যেমন, অক্সিজেন কে অক্সিজেন বলিব, না অম্লজান বলিব, সে বিতর্কও তেমন। নূতন দ্রব্য যাহার নিকট পাই, সে যে নাম বলে, সে নামেই তাহা পরিচিত হয়। সকল ভাষাতেই ইহা সাধারণ নিয়ম। সংস্কৃত কোষে গ্রীক ও আরবী নাম পাইবেন; বাঙ্গলা কোষে, ইংরেজী কোষে নানা ভাষার শব্দ পাইবেন। কত ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালায় চলিতেছে স্মরণ করুন। সে সকল শব্দ কেবল দ্রব্য-বাচকও নহে। ইয়ুরোপে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়; আমরা সে বিজ্ঞান ইংরেজীতে শিখিতেছি। সুধু বাঙ্গালী নহে, ভারতবর্ষের সকল

প্রদেশের লোক শিখিতেছে। সকল প্রদেশের সহিত মিলিয়া ভারতবর্ষের নিমিত্ত সংজ্ঞা শব্দ নির্ণয় করিতে পারিলে অন্ততঃ কিছু সুবিধা হইত। কোন্ প্রদেশে অক্সিজেনকে কি বলা হইতেছে তাহা জানা নাই। মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষে কেবল সংস্কৃতমূলক ভাষা নহে, মুসলমানী ভাষা ও দ্রাবিড় ভাষা চলিত আছে। যদি বিভিন্ন প্রদেশে অক্সিজেনের বিভিন্ন নাম হয়, তাহা হইলে এক ইংরেজী নাম স্থানে পঁচিশ নাম আসিয়া জুটিবে। যদি অধিকাংশ প্রদেশে অক্সিজেন কিংবা ইহার কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত নাম চলে, তাহাতে আমাদের সকলের সুবিধা। প্রদেশভেদে বিভিন্ন নাম না হইলে মাতৃভাষা ছাড়িয়া ইংরেজী পড়িতে গেলে নূতন নাম শিখিতে হয় না। ইয়ুরোপের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বৈজ্ঞানিক নাম কিন্তু এক রহিয়াছে। যে নাম পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, সে নাম আছে, বৈজ্ঞানিক নামও আছে। লোহা না বলিয়া সব স্থানে যে আয়রণ কিম্বা অয়স বলিতে হইবে, তাহা নহে। ছেলের ডাকনাম রাখার মতন দুই পাঁচটা ইংরেজী নামের বাঙ্গলা ডাকনাম রাখিলে ক্ষতি নাই। জাপানীরা বৈজ্ঞানিক নাম জাপানী ভাষায় অনুবাদ করে নাই, কাজ বেশ চলিতেছে। যখন আমরা কোন দ্রব্য আবিষ্কার করিব তখন বিশেষ কারণ না থাকিলে, আমাদের প্রদত্ত নাম ইয়ুরোপেও চলিবে।

একটা কথা এই, কোন কোন ইংরেজী নাম আমাদের মুখে সহজে উচ্চারিত হয় না, আমাদের কানে ভাল শোনায় না। বড় বড় শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, ইংরেজী শব্দ, আরবী ফারসী শব্দ বাঙ্গালাতে কিছু কিছু বিকৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু বিকারের সূত্র জানা আছে। সেই সূত্র ধরিয়া ইংরেজী নাম শব্দের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে বাঙ্গলা ভাষায় স্বচ্ছন্দে মিশিয়া যাইবে। যিনি ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখিবেন, তাঁহাকে একেবারে নূতন নাম শিখিতে হইবে না, বাঙ্গালায় যাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে দেখিয়াছেন, তাহাই পূর্ণ আকারে পাইবেন। এমন কি ইংরেজী নামের জেন অম অম প্রভৃতি কাটিয়া দিলে যৌগিক নাম রচনায় সুবিধা হয়। অক্সিজেন—অকিস, সল্‌ফর—সল্‌ফ, পটাসিয়াম পটাসি করিলে ক্ষতি দেখি না। ইংরেজী নাম লইলে আপত্তি হয় যে নামটা একেবারে সঙ্কেত থাকিয়া যায়। কিন্তু আমরা কয়টা শব্দের ব্যুৎপত্তি স্মরণ করিয়া মনে রাখি কিংবা প্রয়োগ করি? রূপাকে কেন রূপা বলি, তাহা জানি না; গন্ধক নাম কেন দেওয়া হইয়াছিল তাহা অন্বেষণ না করিয়াও আমরা বাজার হইতে গন্ধক কিনিয়া আনি। দ্রব্যের গুণ লক্ষ্য করিয়া নামরচিত হইলে মনে রাখার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু অন্য অসুবিধা ঘটে। ইংরেজীতেও অনেকগুলা রাসায়নিক মূল পদার্থের নামের অর্থ নাই; নামকর্ত্তার সখ বই আর কিছু নাই। গুণবাচক শব্দ সংজ্ঞা করিতে সংস্কৃত ভাষা অদ্বিতীয় ছিল। প্রাণী ও উদ্ভিদের এমন সংস্কৃত নাম প্রায় নাই যদ্দ্বারা লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। এখন সংস্কৃতের কাল নহে, অপর এক ভাষারও নহে। মনে রাখার সুবিধা হইবে ভাবিয়া অক্সিজেন অম্লজান, হাইড্রোজেন উদজান, জলজান ইত্যাদি না বাঙ্গালা না সংস্কৃত না ইংরেজী এমন অদ্ভুত নাম রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল রসায়ন বিজ্ঞানের অক্সিজেন হাইড্রোজেন নহে, ইহাদের অসংখ্য যৌগিক দ্রব্যের নাম আছে। এই এক কারণে সংস্কৃত নাম করণ ব্যর্থ হইবে। ভূবিজ্ঞানের অসংখ্য মণির নাম বাঙ্গলায় রচিত হইবে কি? গাছপালা জীবজন্তুর নাম কি হইবে? লেটিন্ নামের সঙ্গে সঙ্গে কি এক একটা সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক নাম রচনা করিতে হইবে? প্রয়োজন অনুসারে দেশী গাছপালা পশু পক্ষীর দেশী নাম বাঙ্গলা নাম না থাকিলে গড়িতে হইবে, কিন্তু সকল স্থলে নহে, কিম্বা শ্রেণী বিভাজনে নহে। ইংরেজীতেও ডাকনাম ও বৈজ্ঞানিক নাম আছে। উদ্দেশ্য, ও অধিকারীভেদে কোথাও ডাকনাম কোথাও বৈজ্ঞানিক লেটিন্ নাম করিতে হয়। এখানেও বোধ হয়, দীর্ঘ লেটিন নামগুলা বাঙ্গালায় সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে। ইহাতে দোষ হইবে না, কারণ বাঙ্গালাতে লেটিন নামের অর্থ কিংবা ব্যাকরণ কিছুই জানা থাকিবে না। আকাশের তারার গণ-নাম ও জাতি-নাম যোগে ইংরেজী নাম হয় নাই। তারার নামে সে রীতি চলিতে পারে

না। বোধ হয়, নক্ষত্র নাম বাঙ্গলায় করিয়া তারার নাম প্রভৃতি ধরিয়া এক দুই তিন অক্ষরার রচনা করিতে হইবে। সংজ্ঞা শব্দ ব্যতীত গুণ ক্রিয়া অবশ্য বাঙ্গালায় বলিতে হইবে। কদাচিৎ ইংরেজী শব্দও লইতে হইবে। এ বিষয়ে বহুবার বহুস্থানে আলোচিত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, যদি সাহিত্য-পরিষৎ উপযুক্ত লেখক দ্বারা এক এক বিজ্ঞান বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণিত পুস্তক লেখাইয়া ইহা প্রচার করিতেন, তাহা হইলে এতদিনে একটা পথ দেখা যাইত। লেখার গুণে দুরূহ বিষয় সুবোধ্য হয়। সংজ্ঞা বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু লেখার দোষ থাকিলে সংজ্ঞায় ভয় সঞ্চার করে।

এখন উপসংহার করি। আপনাদের নিকট পিষ্ট-পেষণ করিলাম, পেষণ শব্দে কর্ণপীড়াও জন্মাইলাম। গ্রামবাসীর নিকট গ্রামের সংবাদ ব্যতীত অন্য কিছু আশা করিলে আপনাদের ভূয়োদর্শিতায় দোষ স্পর্শিবে। সময়ে অসময়ে আমরা কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি। সব সময় বুঝিয়া করি না। এই হেতু কলার লক্ষণ, কলার সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, বিজ্ঞান শব্দের অর্থ স্থিতি মার্গ ধরিয়া অনুবোধন করিয়াছি। দেখিয়াছি প্রাচীনে ও নবীনে বিজ্ঞানের মার্গ এবং তর্ক বিদ্যা এক। অতএব আধুনিক বিজ্ঞানে আমাদের অগ্রসর হইবার বিঘ্ন দেখা যাইতেছে না। তথাপি দেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। আমার অভিজ্ঞতাসিদ্ধ প্রতিকার জ্ঞাপন করিয়াছি। বহুর নিমিত্ত যুক্ত বিজ্ঞানের প্রয়োজন দেখাইয়াছি। শেষে কৃষিবার্ত্তা উপলক্ষ্য করিয়া দেশের সকলকে, বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক, গ্রামবাসী ও পুরবাসী, সকলকে সম্বোধন করিয়াছি। মানব সমাজ যেমন হউক, তাহার আয়ুর্ব্বেদ নিশ্চয় থাকে, বার্ত্তাও থাকে। আমাদেরও ছিল ও আছে। চরক লিখিয়াছেন, বায়ু বিনা অগ্নি জ্বলে না, মেঘের সৃষ্টি হয় না, জলের বর্ষণ হয় না, পুষ্প ফলের উৎপাদন, উদ্ভিদের উদ্ভেদন, শস্যের বর্দ্ধন, লৌহ পিত্তলাদি ধাতুর প্রভেদকরণ, প্রভৃতি হয় না। এ সব কথা নিশ্চয়ই ভূয়োদর্শনের ফল, পরীক্ষার ফল। এইরূপ কৃষিবার্ত্তায় কত বিজ্ঞান লুকায়িত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনারও সময় নাই। আমরা কোন কোন বিষয়ে চারিশত কোন কোন বিষয়ে দুই একশত বৎসর ইয়ুরোপের পশ্চাতে পড়িয়াছি। এখন আমাদিগকে দৌড়াইতে হইতেছে। তার উপর, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অল্প বয়সেই এত লাফাইতেছে এত দৌড়াইতেছে যে আমরা পেছু ধরিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমাদিগকে নানা বিবিধ পাপের ফল ভুগিতে হয়। কালকৃত পাপে আমরা বাধা দিতে পারি না, যদিও ফলভোগ করিতেই হয়। ইহার উপর, আলস্য ও প্রমাদজনিত পাপ জুটিলে উদ্ধারের আশা থাকে না।

কিন্তু এক বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। সে কালের একগ্র অসির পরিবর্ত্তে এই যে ইয়ুরোপে শতঘ্ন বাণ নির্ম্মিত হইয়াছে, প্রকৃতির উপর আধিপত্যলাভে ইয়ুরোপ ও আমেরিকার ভোগ প্রবৃত্তির আস্ফালনে দিগন্ত কম্পিত হইতেছে, তাহা হইতে বিরত হইতে হইবে। যে বিদ্যা বা বিজ্ঞান বিনয় না দেয়, যাহাতে "জ্ঞান" না জন্মায়, সে বিদ্যা বা বিজ্ঞান পয়োমুখ বিষকুম্ভ জানিতে হইবে। এদেশ চিরদিন মোক্ষাভিলাষী; এদেশ নির্ব্বাণের দেশ, বৈষ্ণবের দেশ। এদেশে শক্তিও বৈষ্ণবীমূর্ত্তিতে পূজিতা হন। নাস্তিক্যের প্ররোচনা বর্জ্জন করিয়া শ্রেয়ের পথে চলিতে হইবে। আমাদের প্রাচীনেরা এ কথা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শন এক করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন প্রকৃতির জ্ঞান বা বিজ্ঞান খণ্ড জ্ঞান। সে জ্ঞান দ্বারা আমাদের সত্তা ও জীবনের লক্ষ্য বুঝিতে পারা যায় না। ইদানীং দর্শন হইতে বিজ্ঞান পৃথক করা হইয়াছে। প্রকৃতির মন্দিরে প্রবেশ-পথে আধুনিক বিজ্ঞান নিম্ন সোপান হইয়াছে; দর্শন উচ্চে রহিয়াছে। কিন্তু উভয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের কৃত্রিম কলহ সৃষ্টি হইয়াছে। আজিকালির অধিকাংশ বিজ্ঞান-সেবী ধূলা কাদা লইয়া খেলা করিয়া জীবন কাটাইতেছেন। কদাচিৎ কেহ খেলাঘর ছাড়িয়া দূরদর্শী হন, প্রকৃতি-বিকৃতি ছাড়িয়া মূল-প্রকৃতি দর্শন করেন; ভাগ্যবান কেহ বা ইহারও ঊর্দ্ধে প্রকৃতি-পুরুষের যুগল-মিলন প্রত্যক্ষ করেন। ইঁহারা ধন্য, ইঁহাদের সাধনা ধন্য। বিজ্ঞানকে ধূলাখেলা সার মনে করিলে, প্রকৃতির লীলা, নর্ত্তনে আনন্দ পাইলেও তাহাতে বিমোহিত হইলে, আমাদের দেশের বিজ্ঞান ভুলিলে বিজ্ঞান চর্চ্চা সার্থক হইবে না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

**COMPOUND ELIXIR OF ASWAGANDHA WITH SODIUM GLYCEROPHOSPHATE & FORMATE.**

**Now being prescribed by the leading physicians of Calcutta.**

This preparation is similar in composition to the celebrated **Aswagandha Rasayan** of the ancients and contains in addition some of the most powerful tonic of modern pharmacopoeia. A powerful tonic and stimulant for mental, nervine and muscular debility and a valuable sustainant during prolonged mental and physical exertion.

CURES MENTAL AND PHYSICAL WEARINESS

**Rs. 1-8 a BOTTLE.**

**Bengal Chemical & Pharmaceutical Works, Ld.**

***91 Upper Circular Road, CALCUTTA.***

ট্রেড **"নির্ব্বেদিন"** মার্ক

## যাবতীয় বেদনা নিবারণে অমোঘ

মাথাধরা, মাথার কট্‌কটানি ও আধ কপালে প্রভৃতি যাবতীয় শিরঃপীড়া, দন্তশূল, স্নায়ুশূল, কর্ণ-শূল প্রভৃতি সকল প্রকার শূল ব্যথা আমাদের "নির্ব্বেদিন" ট্যাবলেটে তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়।

ছাত্র, শিক্ষক, উকিল প্রভৃতি যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জন্য শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকেন তাঁহারা এই ঔষধ সেবনে উপকার পাইবেন।

মূল্য ১৬ ট্যাবলেট ।৵০ আনা।

**বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড**

**কলিকাতা**

Regtd. No. C. 746.

VOL. 5. No. 3.

JUNE, 1915.

# THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.

AND

SATYENDRANATH BHADRA, M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . . Rs. 5-6-0

Single Copy . . . . 0-8-0

**EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN**

But impartial verdict comes from the public and the Press

**USE**

# ORIENTAL SOAPS.

FOR

**They are the best for economy and complexion**

## THE ORIANTAL SOAP FACTORY,

*GOABAGAN, CALCUTTA.*

*Tel: "Kowstove," Calcutta.*

**By Special Appointment**

## To H. E. Lord Carmichael of Skirling Governor Of Bengal.

## S. A. MAJID & Co.

### Certificated Opticians

*12 Patuatuli, Dacca.*

**OPTO--Eye. METRY--to Measure.**

### A Peculiar Nationalist and Practical Unionist.

**Prescriber of needful Tonics for the chronical Idleness of India**

**Specialist in attractive Designs, as to touch Human Feelings, to raise any National Subscription successfully.**

Professor for 10 years. in Eye-sight Testing and Spectacles Art.

Our methods of examination and tests of the EYES for the adaptation of lenses for the correction of defects of vision and relief of eyestrain and its accompanying symptoms, are based upon accurate measurements of the refraction and the associated functions of the eyes. Glasses fitted under this system are invariably found satisfactory and curative. The latest and most approved apparatus for accurate sight testing are used in our dark room. Examination by appointment preferred.

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca,

and

Published by HARI RAM DHAR, B.A., Patuatoli, Dacca.

# Edwards Tonic

**The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.**

*Sole Agents* :—**B. K. PAUL & CO.,** 7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.

**Cytogen** An Ideal Digestive Tonic Wine

*Invaluable in* CONVALESCENCE *from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c., Extremely Useful in Anaemia, Nervous Debility, Loss of Appetite, Indigestion, Acidity &c.,*

**INDISPENSABLE AFTER PARTURITION**

Price Rs. 1-8-0 Per Bottle.

**B. K. Paul & Co.,**
CALCUTTA.

Branch Sovabazar Street.

Head office :—7 & 12 Bonfield's Lane Calcutta The Research Laboratory :—18, Sashi Bhusan Sarker's Lane

# ASHUTOSH LIBRARY.

**Proprietors: BRINDABAN DHAR & SONS,**

*PRINTERS, PUBLISHERS & BOOK-SELLERS.*

50/1, College Street, CALCUTTA. | Patuatooly, DACCA. | Andarkilla, CHITTAGONG

**LORD CARMICHAEL AT THE ASUTOSH LIBRARY.**

"Lord Carmichael one day last week at Chittagong when driving by the side of 'Asutosh Library' whose advertisement appears in the Herald, got down from his car and went into the Library and looked into the book-shelves leaving an order for a copy of Elphinstone's "History of India." His Excellency also enquired of the man there as to who the Proprietors were and His Excellency was told that it belonged to Asutosh Dhar Bros. of Dacca."—*The Herald*,

**Private Secretary to the Governor, Bengal.**

*Government House, Calcutta,*

5/5.

DEAR SIR,

Please send V. P. P. the copy of Elphinstone's History ordered from your Library.

*Yours faithfully*

(Sd.) W. R. GOURLAY.

*To The Manager*

ASUTOSH LIBRARY.

**When His Excellency the Governor of Bengal can favour us with his esteemed order, why don't you?**

*A TRIAL IS ALL WE ASK.*

When ordering please mention the Dacca Review

# আর্য্যাবর্ত্ত

## প্রথম শ্রেণীর সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

১৩১৯ সনের বৈশাখ হইতে ৩য় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ কৃতবিদ্য সুলেখকগণ আর্য্যাবর্ত্তের লেখক, এমন উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র বাঙ্গালায় আর নাই ছাপা, ছবি, লেখা ও কাগজের তুলনা হয় না।

প্রবন্ধ গৌরবে, গল্পমাধুর্য্যে, রচনা বৈচিত্র্যে,ধারাহিক উপন্যাসে আর্য্যাবর্ত্ত অতুলনীয়

আর্য্যাবর্ত্তে কখন অসার ও অপাঠ্য প্রবন্ধ ছাপা হয় না। যাহা সুখ-পাঠ্য, মনোরম অথচ শিক্ষাপ্রদ-তাহাই ছাপা হয়। এই জন্য আর্য্যাবর্ত্ত-বাঙ্গালা মাসিকের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের "স্মৃতিকথা", অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিপিনবিহারী গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার, ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রাণ গুপ্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, সখারামগণেশ দেওস্কর, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, রমণীমোহন ঘোষ, সুলেখক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অজয়চন্দ্র সরকার, কেদারনাথ মজুমদার, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতির বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ, গল্প, কবিতা, প্রত্নতত্ত্ব, সমালোচনা ও সংগ্রহে আর্য্যাবর্ত্তের কলেবর মাসে২ সুশোভিত হয়। ইহা ভিন্ন সম্পাদকের একখানি উপন্যাস চলিতেছে।

আর্য্যাবর্ত্তের—প্রত্যেক চিত্র সযত্নে সংরক্ষার সামগ্রী!

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।

শ্রীদুর্গানাথ বসু—কার্য্যাধ্যক্ষ।

আর্য্যাবর্ত্ত কার্য্যালয়, ১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গালার প্রিয় কবি

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত

সর্ব্বজনপরিচিত ও সুধীজন প্রশংসিত নব প্রকাশিত

## কাব্যগ্রন্থাবলী।

১। ধ্যানলোক। (স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, লিখিত ভূমিকা এবং কবির চিত্র পরিশোভিত।) মূল্য বার আনা; বাঁধাই এক টাকা।

২। তপোবন। (মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের অমর স্মৃতিতে উৎসর্গিত।) মূল্য বার আনা ও এক টাকা।

৩। অঞ্জলি। (কবিগুণাকর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস, বিদ্যাপতি, এম-এ, বি-এল, লিখিত ভূমিকা।) মূল্য আট আনা।

৪। শিশির। (মহিলা-কবি শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত এবং সুকবি জীবেন্দ্র বাবুর "আশীর্ব্বাদ" ভূমিকা।) মূল্য চারি আনা।

কলিকাতার সকল প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে এবং "ঘাট ফরাস বেগ; চট্টগ্রাম।" ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকটে পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম হইতে সকল পুস্তক একত্রে লইলে এক মাশুলে পাইবেন।

# তোষিণী।

## ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র।

ঘরে ঘরে আনন্দ ও হাসি।

যেমন ছবি, যেমন লেখা, তেমন ছাপা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী।

আগামী বৈশাখ মাস হইতে তোষিণী চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিবে। বাংলা জননীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জন করিতে তোষিণী গত তিন বৎসরে কতটা কৃতকার্য হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। চতুর্থ বৎসরেও তোষিণীর পূর্ব্ব গৌরব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, আমরা সেই জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না। প্রতি সংখ্যা তোষিণীতে কৌতুক ছড়ান থাকে। শিশুদের আর কোনও কাগজেই এত বেশী ছবি থাকে না। তোষিণী প্রকৃতই মনোমুগ্ধকর, হাস্যোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তোষিণী পাইলে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়। তোষিণীতে ছেলেখেলার হাসি, মধুর কবিতায় নীতি উপদেশ আছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা মাত্র। বিনা মূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না, প্রতি সংখ্যা নমুনার মূল্য তিন আনা মাত্র।

## বাঁধাই তোষিণী।

পুরু কাগজের মলাটে একত্রে বাঁধাই গত ১৩১৮ সনের সমুদয় সংখ্যা তোষিণী দেড় টাকা স্থলে সহ ডাকমাশুল ভিঃ পিতে আঠারো আনায় দেওয়া হইতেছে। পারিতোষিক দেওয়ার পক্ষেইহা সম্পূর্ণ উপযোগী। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা জানিবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন, ৩নং অশোক লেন, ঢাকা।

বহুচিত্র, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতার একাধারে অপূর্ব্ব সমাবেশ।

# সৌরভ

## সচিত্র মাসিক পত্র।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত।

প্রতি সংখ্যায় ৭। ৮ খানা করিয়া সুন্দর সুন্দর চিত্র থাকবে।

আর থাকিবে—

বাঙ্গলা ভাষায় অভিনব কাহিনী লর্ড কাজ্জনের—সেই বিখ্যাত তিব্বত অভিযানের বিবরণ প্রথম সংখ্যা হইতে বহু চিত্র সহ প্রকাশিত হইতেছে।

আর বাহির হইতেছে—"সাহিত্য সেবক"।

বসুমতী বলিয়াছেন—"সৌরভের নূতনত্ব সেই জীবিত সাহিত্য সেবকগণের পরিচয় প্রবন্ধে।"

সৌরভ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইতেছে। চিঠি লিখিয়া গ্রাহক হউন। নতুবা পরে আর দিতে পারিবনা।

মূল্য দুই টাকা। আকার ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৪। ৫ ফর্ম্মা। ঠিক সম্মিলনের ন্যায়।

সৌরভ কার্য্যালয়, ময়মনসিংহ।

# রামেশ্বর দুর্গ।

( ঐতিহাসিক উপন্যাস )

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি, এ, প্রণীত

মূল্য ।৹ আনা ও ডাঃ মাঃ পৃথক।

এই উপন্যাসখানি "উপাসনার" সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। "উদ্ভ্রান্ত প্রেম" প্রণেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও "রাজস্থান" লেখক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে সযত্নে দেখিয়া দিয়াছেন। যমুনার ভক্তি ও ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত, চপলার আত্মোৎসর্গ, নির্ম্মলকুমারী ও কমলকুমারীর ভালবাসা সবই যেন পাঠককে পড়িতে পড়িতে বিহ্বল করে। স্ত্রীলোকদের পাঠের সম্পূর্ণ যোগ্য।

বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন "ইহাতে বর্ণনায় ভাষার পারিপাট্য, এবং গল্পে রচনানৈপুণ্য যথেষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্রিত চরিত্রগুলি স্পষ্ট প্রস্ফুটিত হইয়াছে।"

কলিকাতা—শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ১৫।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ও ঢাকা—অতুললাইব্রেরী এবং খাগড়া—গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

# অধ্যাপক শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ এম, এ প্রণীত।

১। ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা ... ... ... ॥০
(2) Sanskrit learning in Bengal ... ... ... ॥০
(3) Pramāns of Hindu Logic ... ... ... ।০

আসাম, গৌহাটী গ্রন্থকারের বাসায় প্রাপ্তব্য।

---

## বহুচিত্রে শোভিত।

## প্রাইজ দেওয়ার নূতন পুস্তক।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

### ১। মহরম।

সকলজাতির নিকট সমান আদরের সেই মহরমের কাহিনী সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা। ৪ খানা ছবি।

### ২। প্রহ্লাদ।

হরিভক্ত প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত সরল ভাষায় লিখিত। মূল্য ।৵০ আনা।

পপুলার লাইব্রেরী—ঢাকা।

---

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

# শক্তি ঔষধালয়

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড্। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট, ঢাকা।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন্ রোড্ (হাওরা পুলের নিকট)
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১নং আপার সার্কুলার রোড্ (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—
১৷১ রসারোড কালকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—১২ দশাশ্বমেধ ঘাট।

## আয়ুর্ব্বেদের পুনরভ্যুত্থানের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত—১০৲ সের।

ছাগলাদ্য ঘৃত—১০৲ সের।

মেধাস্মৃতি বর্দ্ধক ও ছাত্রগণের সহায়। ব্রাহ্মীঘৃত—৬৲ সের)

দাদ্‌মার—৵০ কৌটা।
(এক দিনে দদ্রু নিশ্চয় আরোগ্য)।

দশন সংস্কারচূর্ণ—৵০ কৌটা।
(সর্ব্ববিধ দন্তরোগের মহৌষধ)।

মরিচাদি মলম—৵০ কৌটা।
(খুজলী পাঁচড়ার মহৌষধ)।

বহরের ননী—॥০ শিশি।
(নালীঘা, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মহৌষধ)।

অমৃতারিষ্ট—॥০ আনা শিশি।
(ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত ও সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ)

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত পাঁজি বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ,
হিন্দুকেমিষ্ট এবং রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার

সমাজ-চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক গ্রন্থকার

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর কবীন্দ্র-বিদ্যাবিনোদ বি, এ, প্রণীত

# পুস্তকাবলী।

## অনাথবালক

(সর্ব্বজন-পরিচিত গার্হস্থ্য উপন্যাস) ৩য় সংস্করণ ১৲

## সুরবালা ১।০

আদর্শ হিন্দু-পরিবারের এবং আদর্শ বঙ্গ-ললনার অতি মনোহর চিত্র। কিরূপে সাধ্বী, পতিব্রতা রমণী চরিত্রহীন স্বামীকে নরক হইতে উত্তোলিত করিয়া স্বর্গীয় সুখভোগের অধিকারী করিতে পারেন—মর্ত্ত্যে স্বর্গের সমাবেশ করিতে পারেন,—তাহা অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত আছে।

## ছ'আনাজ ॥০

ইহাতে এমন ছয়টি সুন্দর নীতিপূর্ণ গল্প সন্নিবেশিত আছে যে, উহার প্রত্যেকটি এক এক খানি সুবৃহৎ পুস্তকের সমান।

## পাপের পরিণাম ॥০

পল্লীবাসী পাপীর চিত্র, স্বর্গ ও নরকের অত্যুজ্জ্বল ছবি।

## সৎকথা (গল্পের আকারে নীতিশিক্ষা) ॥০

এই সকল পুস্তকের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। সমাজের এমন নিখুঁত ছবি, সুরুচি এবং সদ্ভাবের এমন একত্র সমাবেশ, বঙ্গ-সাহিত্যে দুর্ল্লভ। অনাথবালক সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অমূল্য রত্ন। উপন্যাস-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র অনাথবালকের যে সুখ্যাতি করিয়াছেন, বাঙ্গালার অন্য কোন উপন্যাসের তেমন সুখ্যাতি করেন নাই। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, সুলেখক ও সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু, স্যার শ্রীগুরুদাস, পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ, রাজা শ্রীপ্যারিমোহন প্রভৃতি মনস্বিগণ মুক্তকণ্ঠে অনাথবালকের প্রশংসা করিয়াছেন। বঙ্গবাসী, হিতকরী, প্রকৃতি, সহচর, ইণ্ডিয়ান্ নেশন, ইণ্ডিয়ান্ মিরর্ প্রভৃতি সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের মতে অনাথবালকের ন্যায় সদ্‌গ্রন্থ ভাষায় অতি অল্পই আছে।

সমালোচক-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন,—"চন্দ্রশেখর বাবুর বহিগুলি এক এক খানি হীরার টুক্‌রা। তাঁহার গল্পগুলি দেশের "ঔপন্যাসিক ইতিহাস"। সরকার মহাশয় আরও বলেন,—আমরা আধুনিক বঙ্গবাসী—সম্প্রতি শিক্ষাবিড়ম্বনায় ঘোরতর বিড়ম্বিত। শিক্ষার নামে, শিক্ষার বেশে, কুশিক্ষা আমাদিগকে পূতনার মত পীযূষ-স্তন্যধারা প্রদানচ্ছলে বিষম বিষ প্রদান করিতেছে। আমরা সেই বিষপানে জর্জ্জরিত, মোহগ্রস্ত। ভালমন্দ বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। সেই পূতনানিধনকারী ভগবানের কৃপা ব্যতীত এই মোহ কাটাইবার শক্তি আমাদের নাই। তাঁহারই কৃপাবলে আজ চন্দ্রশেখর বাবু বঙ্গসমাজের ভাল দিক্‌টা দেখিতে পাইয়াছেন এবং সোজা কথায়, সহজ ভাষায়, সাদাসিধে গল্পে সেইটি আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। *** একই শিক্ষা নানাভাবে দিয়াছেন। এই শিক্ষা এক্ষণকার দিনে বড় সময়োপযোগিনী। বাঙ্গালার বালক বালিকা, বধূ প্রৌঢ়া, যুবক স্থবির সকলেরই চন্দ্রশেখর বাবুর গ্রন্থগুলি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকান, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরী এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

**দি নিউ ফরমুলা কোম্পানী** কোন প্রশংসা পত্র না ছাপাইয়া মফঃস্বল হইতে এত দম্ভ করিয়া পেটেণ্ট ঔষধে অবিশ্বাসী রোগীকে আহ্বান করিতেছে কেন, একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশ্বাস করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন ?

**আমাদের আলছারিণে** পারদাদি দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে আদালতে দণ্ডনীয় হইব। ইহা শিশু ও বৃদ্ধের পক্ষে ঈশ্বর-প্রেরিত। **আলছারিণ** নালী ঘা, ভগন্দর, ফোড়া, বাগী, কারবাঙ্কোল ও উপদংশের ব্রহ্মাস্ত্র। দূষিত, ক্ষত ও বিস্ফোটকের তীব্র জ্বালা সদ্যসদ্যই নিবারণ করিয়া থাকে—ইহা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নহে।

**আলছারিণে ক্ষত ধুইতে হয় না, ব্যাণ্ডেজ করিতে হয় না, অস্ত্র ও প্রুবের ছায়াও মাড়াইতে হয় না।**

এমন নির্দ্দোষ ও মূল্যবান ঔষধের মূল্যও এজেণ্টগণের অনুরোধে গৃহস্থের সুবিধার জন্য পূর্ব্ব হইতে অনেক কম করা হইল। শিশি ৸৵০ ; ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। বিনামূল্যে আলছারিণের বিবরণ পত্র পাঠান হয়।

**আমাদের এণ্টাসিডি—সোডা ও এসিড বর্জ্জিত, সেবনে সুস্বাদু** যিনি ২।১ দিন অন্তর কাল কঠিন মলত্যাগ করেন, যাঁহার বাল্যকাল হইতে লিভারের দোষ আছে, আহারের পর পেটে বেদনা ধরে, যিনি দারুণ অম্লশূলে যন্ত্রণা পাইতেছেন, অম্লে যাহার বুক জ্বলিয়া খাক হইতেছে ; তিনি একবার কিছু দণ্ড দিলেন মনে করিয়াও আমাদের এণ্টাসিডি ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। মূল্য বড় শিশি ১৷০, বিনামূল্যে বিবরণ পত্র পাঠাই।

**ভদ্রলোক ও স্কুলের** ছাত্রদিগের উপযোগী সুগন্ধি, জ্বালা নাই, পারা নাই, দাগ লাগে না, যে কোন দাদ ২ দিনে সারে। **দদ্রুলীন** মূল্য শিশি।৵০।

**আমাদের বাতঘ্না—**পেটেণ্টের চরম উৎকর্ষ, যাবতীয় বাত, গাউট, রিউম্যাটিজিম্, গণোরিয়া ও উপদংশ-জনিত বাত ৩ দিনে নরম না পাড়লে মূল্য ফেরত দিব। শিশি ১৷০।

দি নিউ ফরমুলা কোম্পানী।

কান্দী পোঃ মুর্শিদাবাদ।

---

ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব গণিতাধ্যাপক

**শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম. এ. মহাশয়ের**

প্রতিষ্ঠিত

## "ধন্বন্তরি ঔষধালয়"।

গারুড়গা, পোঃ আঃ হাসাইল, জিঃ ঢাকা।

ব্যবস্থাপক কবিরাজ { শ্রীচন্দ্রভূষণ সেন কবিরঞ্জন।
শ্রীইন্দ্রভূষণ দাশ গুপ্ত, ভিষগরত্ন।

এই ঔষধালয়ে সর্ব্ববিধ তৈল, ঘৃত, বটিকা, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি অকৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত ও সুলভে বিক্রয় হয়। মফস্বলের রোগীদিগকে মনোযোগের সহিত ব্যবস্থা করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে অতি যত্নের সহিত ঔষধ পাঠান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। চিঠি পত্রাদি আমার নামে পাঠাইবেন।

গারুড়গা, পোঃ হাসাইল, ঢাকা } কবিরাজ—শ্রীচন্দ্রভূষণ সেন কবিরঞ্জন।

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of he Magazine should be addressed to—

*The Manager*, "DACCA REVIEW,"
*5, Nyabazar Road, Dacca.*

*N.B.*—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among others we may mention the names of:—

His Honour Sir Charles Steuart Bayley K. C. S. I.
The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Shamshul Huda, M.A., B.L.
The Hon'bl Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A. D.L

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S
„ Mr. H. Sharp, C.I.E., M.A.
„ Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. Donald, I. C. S.
„ Mr. W. W. Hornell, M.A.
„ Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
F. C. French Esq., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
„ Mr. L. J. Kershaw, C.I.E., I.C.S.
„ R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
K. C. De, Esq., C.I.E., B.A., I.C.S.
L. Birley, Esq., C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq., I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A., I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
J. R. Blackwood, Esq., I.C.S.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. I C. Ray, C.I.E. M.A, D.Sc. (London.)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
„ Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
Professor J. R. Barrow, B.A.
„ R. B. Ramsbotham M.A.
„ J. C. Kydd, M.A.
„ W. Douglas, M.A., B. Phil., B.D.
„ T. T. Williams .BA., B.Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
„ G. H. Langley, M.A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.Sc.
„ Aswini Kumar Mookerjee, M.A.
„ Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Shushung.
The „ Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.
R. K. Doss, Esq.

Mr. Justice Digambar Chatterjee
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
„ Mr. N. Bonham-Carter, I.C.S.
„ Mr. J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
„ Nawab Nawab Ali Chowdhuri.
„ Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
„ Nawab K. Mahomed Yousuff.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esqr., I.C.S.
B. C Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Sarat Chandra Das, C. I. E.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandrs Singh
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
„ Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
„ Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L.
„ Radha Kamal Mukerji, M.A.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra.
„ Jaladhar Sen.
„ Jagadananda Roy
„ Benoy Kumar Sircar.
„ Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.

# CONTENTS.


| | | |
|---|---|---|
| Our Visitors ... | | |
| The Influence of War on Art | Percy Brown, A. R. C. P., Principal Govt. School of Art ... .. | 79 |
| The Caste System and its Pedagogical Significance | Prof. Nogendra Nath Majumdar M.A. ... | 90 |
| The Indo-Aryan Marriage Laws | N. Mukerjee, M.A. Bar-at-law .. | 97 |
| Glories of the Sanskrit Literature | Gobinda Chandra Mookhopadhyya, M.A., B.L. ... | 104 |
| The Firmament ... | Bahar-Ud-din Ahmed ... .. | 109 |
| Psychical Research ... | | 110 |


# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখকগণের নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। রাজতন্ত্র ... ... ... | শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত ... ... | ৮৭ |
| ২। কোনও মহিলা কবির প্রতি (কবিতা) | শ্রীযুক্ত পারমলকুমার ঘোষ বি, এ | ৯৮ |
| ৩। হিমালয় প্রদেশ ... ... ... | শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত সরকার বি, এ, বিটি | ৯৮ |
| ৪। প্রয়াণ (কবিতা) .. ... | শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দে ... ... | ১০১ |
| ৫। বাঙ্গলার ইতিহাস ... ... ... | শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্, এ, | ১০২ |
| ৬। গৌরাঙ্গের প্রস্থান দর্শনে নবদ্বীপ বাসিনী অবলাগণের খেদ (গান) ... ... | স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি,আই,ই | ১১৪ |
| ৭। কবির বিপদ (গল্প) ... ... | শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস, সি ... ... | ১১৫ |
| ৮। ভাঙ্গাকপাল (কবিতা) ... ... | শ্রীযুক্ত জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী ... ... | ১১৯ |
| ৯। আলোচনা ... ... ... | শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত ... ... | ১২০ |
| ১০। প্রায়শ্চিত্ত (গল্প) ... ... | শ্রীযুক্ত সুকুমার দাস গুপ্ত ... ... | ১২৪ |

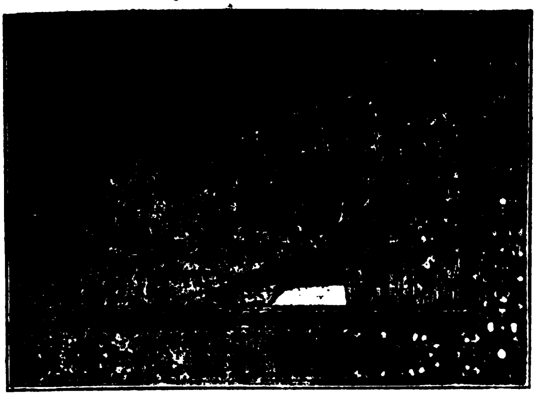

Battle scene from an Indian Picture

lptured bas relief of combat between Greeks and Persians from the Sarcophagus of Alexander the Great.

ulptures at Rheims Cathedra before the bombardment.

Græco-Buddhist type.

Græco-Buddhist statue of the goddess Athene.

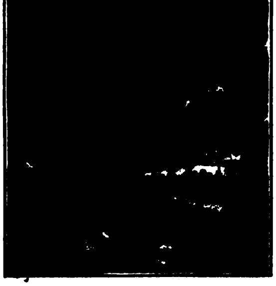

Belgium 1914-15.

Sreenath Press, Dacca.

# OUR VISITORS.

We cannot issue this number of the Dacca Review without making some reference to the visit of Their Excellencies Lord and Lady Carmichael. They come at a time when we are all somewhat anxious. The war in which we are engaged is of so terrible a nature, is waged on so vast a scale, moreover is of such tremendous importance to all of us, that we may be forgiven if we can think of little else. Even here we are at an advantage over others in having the genial presence of our ruler with us and we are sure that he will inspire and sustain our confidence as he goes in and out among us. The presence, too, of so many of our well-known public men is not without its influence.

The advent of Their Excellencies however does raise other thoughts. The Dacca University seems still a beautiful dream. The book which describes its stately avenues and pleasant playing fields is still occasionally looked into with mingled hope and fear. Are these things to materialise or are they to join the band, the not uninteresting band, of unrealised Indian projects?

We ourselves are optimists and we hear with joy the cry of the bricklayers behind the Secretariat; it is a beginning at all events. A new secretariat too, fast nearing completion, is full of promise to those who can read the signs of the times.

We look with confidence to Their Excellencies to foster these good works. The great machine of the P. W. D. marches as we all know with deliberation to success. More power to its elbow is what we all wish to see in regard to those Dacca schemes! If it be properly nourished, there is no reason why the visions of the Committee should not become the commonplaces of the man in the street.

A hearty welcome to all our distinguished visitors, and may they each year see the many projects for the improvement of our ancient city—the widow, the importunate widow of Bengal,—a little nearer completion.

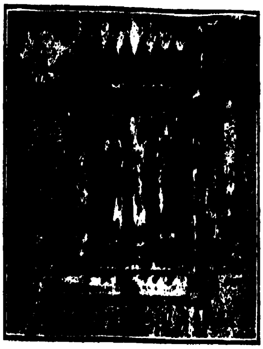

Sculptures on the West Front of Rheims Cathedral showing the effect of the bombardment.

Rheims Cathedral previous the bombardment.

Ancient Egyptian Sculptured bas-relief depicting Rameses the Great engaged in battle.

Cartoon by Cornelius, the German artist.

Illustration from the German publication "Jugend".

Roman relief representing a battle scene.

# THE DACCA REVIEW.

VOL. V. JUNE, 1915. No. 3.

## THE INFLUENCE OF WAR ON ART.

In order to dispose of any misconception that it is possible may arise in connexion with the subject of my remarks, it seems necessary that I should first clear the air by plainly defining the title of my lecture. In the first place by "War," I do not mean the present great conflict, but war in general; in the second place, by "Art," I intend largely to confine myself to the so-called Fine Arts of Painting and Sculpture. This explanation seems required because the war which is now raging over almost all the world is so much in the foreground of life's picture, that it may be thought I intend to deal solely with the the influence of the present crisis on the daily art of our time. This aspect will naturally form a portion of my remarks, but it is in the broad manner I have indicated that I propose to approach my subject this evening.

The direct effects of war on art are obvious. So much so that they are apt to perplex the judgment, and bias the opinion with regard to the equally important, but less focussed, indirect effects. At no time have the direct effects of war been brought so prominently into our vision than at present, especially with regard to architecture. From the earliest times these immediate influences have been recorded, in the destruction of cities containing unique collections of art, and buildings which have displayed the grandest architectural qualities. And the present war has most graphically supplied another expressive illustration of the devastating effects of war on art. Never has destruction been so complete, and there appears to be every reason to suppose that it has been carefully calculated destruction. Science has usurped the place of Art in many ways, but it remained to science in war to do the greatest damage to art, that is the depriving of future generations of the art which existed before science was known.

It was an art which sprang from the religion, the devotion and the sense of service in the world; that sense of service which not only impelled men to work for religious ends, but aroused that pride of citizenship which raised the great municipal buildings of the Middle ages and made men so proud of their crafts and trades that they built such magnificent buildings as the Cloth Hall at Ypres, and hundreds of other places where the Guilds had their centres. In the words of an artist who has seen these and written to me, with the sense of the havoc done recently in his mind, "These places the Germans seem to have taken a special delight in destroying. It is as though they wished to remove all evidences of a previous civilization, and on the ground thus cleared to erect their own dull, stupid, uninteresting buildings in the style their scientific minds seem to delight in."

It is however the less obvious, but more far-reaching, results of the "indirect influences" to which I propose to call your attention, and, as an introduction to this, a brief investigation of the effects of great wars on art, as chronicled in history, may be undertaken.

One of the earliest civilizations, that of Egypt, was characterised by a profoundly artistic nature, and at the same time its history is a record of constant warfare. The purpose of Egyptian art was always to give a faithful representation of fact. In interpreting the former much of the mural sculpture portrays the victories of great kings over innumerable enemies, while a favourite subject is an illustration of bands of prisoners accompanied by huge captures of loot. During the period of the 18th dynasty, about 1500 B. C., Egypt, under Tothmes III, became essentially a military state, and at this time many of the noblest of her monuments were executed. The artistic importance of the school of sculpture which flourished at this time has only recently been recognised, but it plainly indicates the main source of inspiration of a subsequent and greater art, that of the Greeks. At this time the virility and intense energy of the Egyptians in all their glory found an outlet in war, and simultaneously in raising great buildings lavishly decorated with bas-reliefs of their victories.

The Assyrians were warriors and hunters, and scenes commemorating their prowess in both these spheres predominate in the remains of Babylon and Nineveh. One of the earliest records found in the Mesopotamean valley illustrates a most realistic picture of war. It is the famous "Stele of the Vultures," now in the Louvre, but originally a monument of victory. The details of this battle seem to have made a vivid impression on the artist's mind, and all the horrors of war are faithfully depicted. In one scene the king stands in his chariot with a curved weapon in his right hand, while his kilted and helmeted followers, lance in hand march behind. In another a flock of vultures

is feeding on the bodies of the fallen enemy; in a third a tumulus is being heaped up over the slain. Elsewhere we see the victorious prince beating down a vanquished enemy, and superintending the execution of other prisoners who are being sacrificied to the gods. Scenes of this nature occur frequently in the early sculptures of Babylonia and indicate that in those days war and art progressed hand in hand. The Assyrians were a hardy vigorous people, fighting for dominion, and this is repeatedly shewn in their pictorial bas-reliefs.

Ancient India provides us, in its greatest epics, with excellent illustrations of war and art, as the main theme of the Mahabharata is based on the destructive conflict waged between the Kurus and Panchalas, and ending in the overthrow of the Kuru dynasty. The incidents of this classic, and especially its descriptions of heroic fighting, have formed popular subjects with Indian artists for thousands of years. From the Ramayana, too, Indian painters and sculptors have taken their pictures of war, notably the splendidly dramatic attack by the monkey army on the stronghold of Ravana at Lanka in Ceylon; while sanguinary battles and the sack of cities were frequently represented by the Indian miniaturists of Moghul times.

But when we turn to the history of ancient Greece we find the most interesting illustration of the influence of war on a country's Art. It is true that certain schools of modern thought have endeavoured to depreciate the artistic production of the classic age, but, in spite of this, Greek art is still generally regarded as the highest form of aesthetic culture the world has ever seen. In it idealism and ethical purpose predominate, and in all good examples we find the fundamental beauty of tone and line and mass and colour which is always present in every true work of art. Greek statuary demonstrates that the Greek people managed to invent and live by a practical ideal. That ideal was a good Athenian citizen, only more so. It was a citizen rather richer rather braver, bigger, nobler, stronger, more eloquent, intelligent and comely than any citizen they had ever happened to meet. Further this ideal citizen, in fact every Greek, was necessarily a soldier. The result was that the martial spirit permeates the whole atmosphere of the country. It is the foundation of their literature, their art, and all their public institutions.

Some explanation of this is to be found in the early history of the nation. From the first, Greece found herself fighting for her very existence against the great power of Persia in the 6th Century B. C. In this momentous conflict it must be realized that not only the ascendency of Greece, but in its broad aspect the whole future of European civilization was at stake. As time went on, the Greeks came to realise

more and more clearly that the great conflict in which they were involved was one not merely for national, but for spiritual issues. The story of the great battles which brought about the national unity of Greece is reflected in the art which followed these epochmaking events. These bitter years of devastation, of struggle that must often have seemed futile and hopeless, leading up to the final repulse of the Persians at Salamis and Platoea, brought the Greeks to a proud consciousness of a glorious national destiny, and to an unfaltering faith in, and pursuit of, those enlightened ideals for which they had fought. Their ultimate victory was a splendid moment in the history of a richly dowered race; the great events of the Persian wars were vivid and recent in their remembrance, and it was the persistence of such memories which formed the foundation of much of the art of Greece. But it did not take the form of a portrayal of its scenes of conflict and victory. Instead it became idealised into a representation of a spiritual struggle of the Hellenic race for those ideals of light and liberty and reason and order which had been at stake. In their art the Persian wars were forgotten, but the spiritual conflict which they typified remained as a recurring theme whose significance was for all time. Indeed it may be said that this spiritualised conception of conflict, in which the upward-reaching Hellenic spirit is represented as contending with the powers of darkness and licence and social anarchy, is the central motive of Greek sculpture; and it was the vivid national sense of this conflict that enabled the Greeks to achieve that noble pinnacle of beauty which their art attained. The gods and heroes whom they fashioued in bronze and marble stood for the ideals and aspects of ordered reason. Their satyrs and other wild beings were types of the licence and disorder of nature. And in their friezes and pediments, decorated with battles of Greeks with Amazons, Lapiths with Centaurs, and gods with giants, we read the same story of perpetual conflict with anti-social, unruly and destructive forces.

From Greece the natural historical sequence is Rome. Rome occupies a singular position in the annals of Literature and Art. She is, as it were, the link between the ancient and the modern world. In the pride of her prime the rays of intellectual life converged on her as on a focus; in her downfall, she was the centre, from which they were scattered over the whole of the ancient world.

It is impossible to disassociate any of the Roman genius from her military successes. Her intellectual productions, including her art, such as they are presented to us, demonstrate undeniably the influence of her strenuous fighting history. Certain direct effects which are always produced in a greater or lesser degree on the art of a victorious

people, by the extent of territory consequent on a long series of triumphs, are very evident in the records of Rome. Her wide dominions were necessarily favourable to intellectual advancement for from these she was to accumulate artistic treasures, to enlist the talent of other countries, and to supply incentives, materials, and models for the development of art. We read that painters were in requisition to furnish the necessary ornaments of the Roman triumph. The Athenians sent Metrodorus to Paulus Emilius for that purpose. Pictorial models of numerous cities were displayed in the procession which celebrated the victory of Scipio over Antiochus. It is recorded that Messala first exhibited a picture of his victory over the Carthagenians; Scipio and others followed his example. Mancinus was said to have owed his consulship to the enthusiasm excited among the people by a painting which represented his successful assault on Carthage. The designs on Roman coins were suggested by conquest, such as the figures emblematic of subjugated provinces, and the delineations of triumphal arches and public edifices. Rome, in art became truly "the epitome of the world"; her galleries and shrines were adorned with the choicest spoils of Corinth, of Sicyon. and of Athens; in fact it has been said at the time that her population of statues rivalled in number her population of citizens. It was the singular privilege of Rome to command at once by force of arms the stores of Asia and the skill of Greece.

It may be pointed out however that these brilliant results of conquest are balanced by some evils. Rome appertained more to a Museum than a School of Art, and that this fact, and her vast extent of territory comprehending a variety of different types, tended to produce an aestheticism of a somewhat composite nature. While the wars of Greece established harmony between the character of different Greek tribes with the result of harmony in the orders of their architecture, the Roman conquests led to extensive but heterogenous dominions and a style made up of diverse and sometimes discordant elements. Ruskin's evidence is that while the Romans were in every sense adepts at war and great fighters, they were wholly deficient in the true aesthetic instinct; and in their hands the classic arts were extinguished. To summarise, the devotion of Rome to war during the first five centuries of her history diverted her from the refined occupation of art. At the end of that period, war, in the from of conquest, began to exercise a contrary influence, and a people, who had previously been characterized by a contempt for everything aesthetic, became willing at once to admire, to imitate, and to preserve. This however was largely the extent to which their aspirations led them, for the art of Rome is not usually classed with the great schools of history.

Time does not permit of an investigation of the Crusades in their influence on art, regarding which there is much conflicting evidence. There is however little doubt that the art of Western Europe, including England, received an impetus from these religious wars, for they brought people into contact with records of an older and more complete civilization than that with which they were previously acquainted. In Byzantium where numbers of them spent some time, they would see examples of art richer, especially in colour-richness, than anything they had ever dreamt of. Commerce might ultimately have brought about the same results but it would have been by slower methods. Then there is that period of warfare in the 16th Century, in which, throughout the whole of English life, in every phase and every grade of it, there is that exaltation, that spiritual exultancy, which finds its supreme expression in Elizabethan literature, in the great dramatists of that time, in Marlowe and Shakespeare and Ford, in Webster, in Beaument and Fletcher, in that outburst of thought and of art which has no parallel in world-history. The 16th century marks a chain of art which stretched across the world from England to China; the Italian school of Painting, Moghul Painting in India, Persian Paint-ing under Shah Abbas, the wonderful Ming Dynasty in China, and the Elizabethan period in England.

From this preliminary survey, we may turn back to the Greek period again, to a momentous historic episode, closely related to our subject, which it is desired to emphasize because of its intimate bearing on the country of India and and its art. I refer to Alexander the Great's expedition into Asia in the 4th Century B. C. It is now not unusual to hear this marvellous achievement somewhat disparagingly alluded to as a raid, and its direct effects on India as being of no great significance. Also that the Hellenisation of the East would have progressed on practically similar lines had Alexander's expedition never taken place. This view however has not been generally accepted, and in any case the march of Alexander may be regarded as immediately leading to the consummation of Occidental influence in the Orient during these early years of history.

The story of Alexander's campaign in the East is outside the limits of my subject, but in its bearing on Indian Art a few essential facts may be brought forward. In the first instance it seems clear that the early artistic efforts of the Greeks were inspired by their contact with the comparatively advanced civilization of the Persians. Travelled Greeks found themselves confronted with the achievements and memorials of a highly developed oriental culture, with traditions which must have appealed to their receptive nature. But Greek Art and Literature, though proceeding

from Eastern origins, soon manifested a spirit of self-reliance, and took up an independent and indigenous character. By the 5th century B. C. the reflex action was in force, and Greek culture was making itself felt in the Near East. In art it was its strength and beauty, its worship of the "Wholeness of Life" which made it so supreme, and led to it being carried into all parts of the then known world. But the great driving power which caused it to make an indelible mark on many of the institutions of the East was Alexander's invasion of Persia and India between the years 334 and 326 B. C.

This expedition was a far more complete undertaking than expeditions are realized in later days. Apart from the military contingent which comprised the nucleus of the force, there was a large attendant, somewhat cosmopolitan, community of a civil nature, who carried their trades and occupations with them. This, as we know, was a feature of most expeditions which had invasion as their object in ancient days, but it is understood that in this case the entire operation was organized in a remarkably elaborate and thorough manner. That Alexander's pre-conceived plan was something far superior to a raid may be gathered from an incident quoted from Professor Cramb. On the night before Alexander of Macedon started for the East on that career of conquest in which, like Achilles, his great exemplar, he was to find his glory and an early death, he had a farewell interview with the man who had been his tutor, now the master of a rising school of thought in the shades of the Lyceum. And towards the close of the interview Aristotle said to the Macedonian :—

"You are about to start upon an enterprise which will bring you into many lands and amongst many nations, some already celebrated in arts and arms, some savage and unknown. But this last counsel I give you. Whithersoever your victories lead you, never forget that you are a Greek, and everywhere draw hard and fast the line that separates the Greek from the Barbarian."

"No," answered the youthful conqueror—he was barely two-and twenty-"I will pursue another policy, I will make all men Hellenes. That shall be the purpose of my victories."

The wisdom of a soldier for once went deeper than the wisdom of the greatest architect of thought that Time has known. And undoubtedly the famous Macedonian's plan, either for better or for worse, was most rigorously put into effect, and carried out to the letter. Colonies of Greeks were planted in various localities, with one of the results that the influence of Hellenic art has been traced even as far east as Japan. In Northern India the imprint of the Greek is most strikingly manifested n those mounds of shattered sculptures in the neighbourhood of Peshawar, which mark the site of the ancient

country of Gandhara. A comprehensive collection of these carvings may be seen in the Archæological section of the Indian Museum, a careful study of which is strongly advised. In it we may observe, most plainly portrayed, the influence of a warlike invasion on art. But that is, except in connexion with my subject, a comparatively unimportant feature of these remains. The chief point they illustrate is the overlapping of the civilisations of the East and West which took place some two thousand years ago. And the principal concrete evidence of this historic episode is revealed in these records of contemporary art. Here we may see the Greek Corinthian capital combined with the Indian figure of Buddha, soldiers with classic arms and armour but Indian draperies, Greek features but the figures clothed with Indian costumes, and many other composite conceptions depicting an intermingling of Eastern and Western symbols and ideas. But the influence of the Greeks was not only confined to the north, although in that portion of the country it is most plainly discernible. South, as far as Madras, it is traceable, in the bas-reliefs of Amaravati, but in a much less pronounced form, and in various intermediate centres, such as Muttra in the United provinces, the dynamic touch of the classic hand has left its distinctive mark. How much of this may be traced to the soft flowing current of peaceful intercourse, or to the stormy stream of Alexander's warlike enterprise, it is difficult to decide, but that the latter had no small share in spreading classic influence in Indian Art seems more than probable.

We may now, having briefly reviewed some of the various historic examples of our subject, endeavour to formulate a general deduction.

In the first place it is ordinarily understood that a time of peace is the great stimulant to the production of art; that when countries are engaged in their peaceful occupations of trade or manufacture, then architecture, sculpture and painting flourish; that tranquillity and harmony of life encourage artistic activity, and, under these quiet and orderly conditions the artist prepares his masterpieces, undisturbed by strife and violence. In other words that peace is the parent of art. On the other hand several authorities have demonstrated that the entire opposite is the case, and that far from being the fruits of peace, the great arts of the world have been founded on war. In the words of Ruskin "there is no great art possible to a nation but that which is based on battle;" in the times of peace the arts decline and among wholly tranquil nations wither utterly away.

Now I am inclined to think that the records of history mainly point out that both peace and war are, other things being equal, required to produce a great art. These other things are, art instinct, without which of course art is impossible, and most important of all

the character of the war in which the country is engaged. It is quite possible that one of the reasons why Roman art never attained greatness was that the Roman wars were mainly wars of conquest. Inversely, some of the grand quality of the Grecian art may be due to the fact that the wars of Greece were largely struggles for national ideals. A great fight for right principles inspired the people with a sense of exultation and a feeling of moral strength that found expression in a noble art. The balance of historical evidence seems to indicate that the period of peace immediately succeeding a war waged solely for the sake of fundamental ideas, is the most favourable time for the development of the arts.

It remains now for us to apply this deduction to the present state of affairs and to see if possible what may be the course of art in the near future. To carry out this undoubtedly difficult proposition it will be necessary to realize the condition of art previous to this great crisis, and to note the trend of art-thought during the last few years.

The historian of the future will I think determine that the 19th century was not a great one for art. But he will probably refer to the fact that the first years of the 20th century marked a period of æsthetic unrest. This unrest is known to most of us by numerous examples of painting and sculpture of an unusual character which have been recently exhibited and reproduced in most of the countries of Europe, and also elsewhere. It may be asked what were the events which led up to what has almost culminated in a state of artistic anarchy? The answer is one which extends far outside the realm of art, and is to be found in the condition of mankind itself. It may be likened to an earth tremor, more convulsive in some places than in others, but a general seismic wave which disturbed the balance of mind in several parts of the world. But unlike an earthquake it gave some warning of its action. In art it showed itself in overmuch frivolity and license. Particularly was this noticeable in much of the modern German art, which revealed a coarseness and wantonness which is significant in the light of very recent events. Here it may be remarked that of modern German artists only three, Bocklin, Lenbach and Menzel, have risen to any attempt at greatness. The pompous and inflated compositions of Carstens and Mengs, of Schnorr, Cornelius and Kaulbach, have passed into an oblivion from which life, character and humanity, whereby art retains its hold on men, have alike vanished. To realize the art of Germany's rising generation we have only to refer to modern students' journals, which largely illustrate freaks of design, or frantic models posturing in front of toy cypresses and plaster temples.

It is not difficult to believe that the enervating influences of peace were

indirectly responsible for the state of art generally during the last few years. For from peace nations passed to prosperity, from prosperity to luxury, and from luxury to an insatiable desire for something new and exciting in life. In the art world this restlessness and craving for novelty took a revolutionary form, or, as some would have it, created æsthetic hysteria.

And so came into being the Passeists and Futurists, the Divisionists and Pointillists, the Intimists (who belong to the same group) and the Fauvists (or savages), the Orfeists and Cubists, the Expressionists, Vorticists and Dynamists. The manifesto of the Futurists issued in February 1909 will give some idea of their character and programme.

" The essential elements of our art shall be courage, daring, and rebellion.

'There is no beauty except in strife.

'We shall paint the great crowds in the excitement of labor, pleasure, or rebellion; of the multi-colored and polyphonic surf of revolutions in modern capital cities; of the nocturnal vibration of arsenals and workshops beneath their violent electric moons; of the greedy stations swallowing smoking snakes; of factories suspended from the clouds by their strings of smoke; of bridges leaping like gymnasts over the diabolical cutlery of sun-bathed rivers; of adventurous liners scenting the horizon; of broad-chested locomotives prancing on the rails, like huge steel horses bridled with long tubes; and of the gliding flight of aeroplanes, the sound of whose screw is like the flapping of flags, and the applause of an enthusiastic crowd.

'Erect on the topmost pinnacle of the world, once again we fling our defiance to the stars.'

This manifesto, read in cold blood, sounds like pure revolutionary rant; but a deeper study of this programme reveals considerable bed rock of reason. In other words it means a violent reaction against the shackles of tradition, and the worship of precedent. Freedom is their battle-cry, and their war is against weakness and sentimentality, invalidism, comfort, softness, luxury and effeminate excess.

With this the thinking man will no doubt sympathise, but when it comes to an understanding of their manifesto, materialised into art, the ordinary individual stands aghast. It is in the interpretation of their object that they fail to convince, and the question then arises as to whether it is possible to translate intelligibly their revolutionary ideas into concrete art. An abstract of Marinetti's recitation of one of his poems on battles, may convey some of what this Futurist calls "wireless imagination". "The event described took place outside Adrianople in 1913 and depicts a train of Turkish wounded, stopped and captured on its way by Bulgarian troops and guns. The noise,

the confusion, the surprise of death, the terror and courage, the grandeur and appalling littleness, the doom and chance, the shouting, curses, blood, stink, and agony all were combined into one great emotion by that amazing succession of words, performed or enacted by the poet with such passion of abandonment that no one could escape the spell of listening. Mingled anguish and hope as the train started ; rude jolts and shocks and yet hope ; the passing landscape, thought of reaching Stamboul. Suddenly, the air full of shriek and boom of bullets and shells ; hammering of machine-guns, shouting of captains, crash of approaching cannon. And all the time one felt the deadly microbes crawling in the suppurating wounds, devouring the flesh, undermining the thin walls of the vitals. One felt the infinitely little, the pestilence that walks in darkness, at work in the midst of gigantic turmoil making history. That is the very essence of war. That is war's central emotion".

In effect, something of that kind was to be the fundamental idea of this higher aestheticism, but before people had quite decided how to receive it, the shadow of the great war blotted out all these apparent side issues, and the world was brought sharply back to first principles. And so, for the time being, art is at a standstill, except for the comparatively narrow avenue of journalistic illustrations. Further, it is likely to remain stationary until the world settles down to peace again. But in the meantime, subconsciously, the art of the future is being forged and annealed by the powerful flame of war. War has destroyed much, as we have seen, but it has created far more than it ever destroyed. It has destroyed the shallowness of national life which is reflected in a superficial art, and in its place it is building up a new sense of national thought and tendency. And the awakening of this deeper nature should lead to a deeper contemplation of artistic ideals. A people's art has, and must have, some relation to and some movement with the strong stream of national life. The artist's use of his eyes and ears and mind reflects, and must reflect, the habit aud race of his time.

So through this great conflict we may reasonably hope for great artistic issues. Belgium, ever an artistic country, will, when peace is eventually secured, no doubt rise to the occasion and display her artistic spirit, just as she has so brilliantly shewn her fighting spirit. Out of the very catastrophe with which Belgium has been overwhelmed, from the experience of war, defeat, spoliation, and ultimate victory will surely rise, Phoenix-like, an artistic revival. The impious and wanton destruction to which she has been subjected, may be the means of tuning and concentrating her artistic talent, and, in the restoration of her national monuments, she will have a unique opportunity for the

exercise of her genius. France has, in a lesser degree, undergone a similar harrowing experience, and, with her great and undoubted reputation for art great things may be expected. And the anticipated example of these two countries will no doubt stimulate others which are now being subjected to the bitter discipline of war. As a result of this discipline it seems more than probable that, in that vague "Afterwards", a great revival of art will take place, on a sounder and more exalted plane than has ever been possible since the 16th century.

PERCY BROWN.

## THE CASTE SYSTEM AND ITS PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE.

In the Vedic times when the Aryans were still in the Sutlej valley the Rishis did not form a separate and exclusive class. Each Rishi was a priest, a warrior and a cultivator and the society was therefore then marked by the absence of those rules and restrictions which form the distinctive feature of the present complex Hindu society. But even then some families obtained pre-eminence by their special knowledge of the ways of performing religious sacrifices and their gift of composing hymns; others again excelled in military prowess. In course of time the Aryans crossed the Sutlej and moved down the valley of the Ganges. While they were settling down here the society was becoming complex and their culture material in its different phases began to show considerable development. In fact, the religious ceremonials which represented one of the phases of their culture attained such complexity that certain Rishis had to devote more or less exclusively all their time and energies to the efficient carrying out of religious duties and the handing down of the sacred tradition in their families. So to keep pace with the growing needs and complexity of society differentiation became a necessity. Hence the Indo-aryans, like Plato, made an intelligent application of the principle of the *division of labour* and became gradually divided into four classes or castes according to their occupation and innate qualities as appears from the sloka quoted below "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্মবিভাগশঃ (Gita IV, Sloka 13) or "the fourfold division of castes was created by me according to the apportionment of qualities and duties."

According to the Hindu philosophers *prakriti* ( প্রকৃতি ) which determines the temperament of an individual is made up of three constituent principles or *gunas viz.* goodness or purity ( সত্ত্ব *sattva*), passion or activity ( রজঃ *raja*) and darkness or stolidity ( তমঃ *tama*).

These are not conjoined in equal quantities but in varying proportions, one or other being in excess in different individuals. Hence the temperament of an individual is determined according to the predominance of goodness, passion or darkness. Thus the castes which now appear as artificial and are marked in most cases by the absence of their true significcance in respect of *guna* and *karma*, developed naturally in ancient India to represent the different phases of the civilisation of the early Indo-aryans.

For a long time caste distinctions did not become rigid and intermarriage was permitted. The following slokas will bear this out:

(১) "ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রীং তথৈবচ।
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্যা প্রবেদয়॥
ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিতঃ।
গুণে সত্যেচ ধর্ম্মেচ তত্রাস্য রমতে মনঃ॥

or "Inform me of the maiden who possesses these qualities, whether she be the daughter of a Brahmin, a Kshatriya, a Vaisya or a Sudra; for my son (Gautama) is not particular about family or lineage; his mind delights in merit, in truth and and in virtue." *Lalita Vistara Canto 12.*

(২) শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

মনু ২। ২৩৮।

or "one should acquire with faith good knowledge from even one of the lowest caste and *secure a gem of a woman* even from a low family."

Besides, the members of the warrior and industrial classes had access to the literary schools kept by the members of the higher class. Nay, many Kshatriyas like Janaka,* Jaibali,* Chaitra* and Ajatasatru* were so versed in the *sastras* that the Brahmins often went to them to receive instruction in the *Divine wisdom* (ব্রহ্মজ্ঞান). But owing to the difficulties of the Vedic literature the Kshatriyas, in general, never availed themselves of their privileges to any extent, so that the charge often brought against the Brahmins as having withheld their sacred literature from any but their own caste has hardly any foundation. Far from withholding it, the Brahmins had always been striving to make its study *obligatory* on all the Aryans and as the sloka quoted below from Manu will show. Severe penalties were threatened on those who neglected it.

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদানন্যত্র কুরুতেশ্রমম্।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

২। ১৬৮ মনু।

or "that twice-born, who not having studied the Veda, applies himself to other (and wordly study) soon falls, even while living, to the condition of a Sudra and his descendants (after him)."

These facts show clearly that in those days learning and good qualitles were the passport to the highest honour and to the highest caste though learning without self-control was deprecated as the sloka quoted below will show.

* Upanishad—Hirendra Nath Dutt P 58 79.

"সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥

২। ১১৮ মনু।

or "a brahmin who knows but only *Gayatri*, but who is thoroughly self-restrained, is rather to be preferred; but a brahmin—though he may know the three vedas-who is not self-restrained, who eats everything (*i.e.* prohibited things) is by no means to be preferred."

Hence the Brahmins who devoted their time and energies to the study of the vedas, gave religious instruction, presided at sacrifices and were self-controlled, were held in highest esteem. Again, though the study of the Vedas was enjoined on all Aryans yet as appears from the following sloka the respective occupation of each and the corresponding training were held to have been far more important.

" বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥

মনু ২। ১৫৫।

or "the seniority of Brahmins is from (sacred) knowledge, that of Kshatriyas from valour, that of Vaisyas from wealth in grain (and other goods) but that of Sudras alone from age."

The early Hindu philosophers impressed this because like the modern philosophers they saw the importance of one's own personality. Thus in the spirit of the modern educators who hold that one's own method though in itself inferior, is far better than an ideal borrowed, we have in Gita,

শ্রেয়ান্‌স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

১৮। ৪৭।

or "one's duty, though defective, is better than another's duty well performed. Performing the duty prescribed by nature one does not incur sin."

In fact, it would be absurd if in every other thing as in teaching we were to impose any particular duty or method on any particular individual without any consideration of what really suits his own tastes and ways of doing things; for the success of an individual in anything depends mainly upon the intelligence with which he works. "It is," says Herbert Spencer, "a trite remark that, having the choicest tools, an unskilled artisan will botch his work: and bad teachers will fail even with the best methods. Indeed, the goodness of the method becomes in such a case a cause of failure; as, to continue the simile, the perfection of the tool becomes in undisciplined hands a source of imperfection in results."*

Again let us see what may happen if an individual belonging to one class were to follow the vocation of another, which may be good in itself but for which he is ill-fitted. First of all, such a man may ruin himself and his family by making such an effort: or if he succeeds partially, he will become unfit for the duties which belong to his family and at the same time not quite fit to

* Spencer—Education P. 83.

become a recognized member of the society whose calling he has adopted. Thus giving up the duties of his own family or class of which, with his better intelligence, he might be a very useful member, he not only becomes unfit for either but actually becomes a burden to the family or society to which he belongs. Hence we have in Gita the warning,

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩।৩৫।

or "one's own duty, though defective, is better than another's duty well performed. Death in (performing) one's own duty is preferable; (the performing of the) duty of others is dangerous."

In fact, an individual should not give up the duties of his own class but rather should keep himself in active touch with them and receive himself or give his children such education and training that he or his family and if possible, his relations may rise to such a position that he or his posterity may easily take to the duties of a better class and continue doing so without causing any inconvenience to himself or his family: for, to satisfy the last condition the individual must have not only sufficient means but certain social and hereditary influences making him fit for carrying on work on the new lines. Again, though our philosophers warned us to be careful to change our duties for those of a better class yet the Platonic ideal did not remain unrealized and no inseparable barrier was set up between the different orders. On the other hand, as the following slokas will show, if a child of the inferior class possessed qualities characteristic of a superior class, he was admitted to that class.

শৃণু যক্ষ কুলং তাত ন স্বাধ্যায়ো ন চ শ্রুতম্।
কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ।

মহাভারত বনপর্ব্ব—৩১২ অঃ। ১০৩।

or "O honoured Jaksha, hear (me), doubtless the actions alone and not lineage, perusal of sacred books and Vedic learning are the determinants of brahmin hood".

শূদ্রে চ যত্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥ (২৫)

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥ (২৬)

মহাভারত, বনপর্ব্ব—১৮০ অঃ

or "what is noticed in a Sudra does not exist in a Brahmin. A Sudra is not necessarily a Sudra nor a Brahmin—a Brahmin. O Sharpa, only he is called a Brahmin in whom such (characteristics of a Brahmin) actions are found and O Sharpa, where these are lacking one should designate him a Sudra".

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥" (৩৫)

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৭ম স্কন্ধ ১১ শ অধ্যায়।

or "if in an individual there appears worth other than that characteristic of his class, he should be designated accordingly."

All these go to show that in India

there was in early times a much freer possibility of change among the social ranks than is usually supposed. It thus answered the flexibility of a *democratic curriculum* which the present western world is so very anxious to provide to secure the efficiency of citizens. Hence the society in ancient India was an organic whole, the castes representing but the *different phases of its culture*.

From what has been stated above it may well be said here that even in those early times the Indo-Aryans saw that, for social efficiency, the individual should be allowed to develop along the lines of his greatest power. It thus appears that even then the Brahmins saw the necessity of adapting the knowledge to the *needs* and *capacities* of the individual of a society. Indeed, it is bad policy to spend time and energy in making an indifferent priest out of a citizen who could have become an excellent soldier. That the Hindus realized this also appears from sloka 113 Manu (Chapter II) which states.

"বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন ত্বেনামিরিণে বপেৎ॥"

or "even in times of dire distress a teacher of the Veda should rather die with his knowledge than sow it in a barren soil."

In fact, in ancient times greatest care was used to be taken to discover the aptitude and fitness ( অধিকার )* of an individual to receive any particular kind of education. The teachers then thoroughly realized that disastrous results were sure to ensue if knowledge were to be imparted without any consideration of what suited one's tastes and ways of doing things. Thus we have,

(1) বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥
২২ ৬ অঃ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

or "this highest mystery in the vedanta, delivered in a former age, should not be given to one whose passions have not been subdued, not even to the son or disciple if he is unworthy."

(2) "Let no man preach this most secret doctrine to any one who is not his son or his pupil or who is not of a serene mind. To him alone who is devoted to his teacher only and endowed with all necessary qualities, may he communicate it."

Maitrayana Brahmana Upanishad VI, 29.

(3) বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাম্।
অসূয়কায় মাং মাদাস্তথা স্যাং বীর্যবত্তমা॥ ১১৪
২য় অঃ মনু।

or "(the goddess of) learning coming to a Brahmin says: "I am your treasure, guard me Do not impart me to a spiteful man, then I shall be strongest."

(4) যমেব তু শুচিং বিদ্যা নিয়তং ব্রহ্মচারিণম্।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে॥
১১৫ ২য় অঃ মনু।

or "But impart me to that Brahmin who guards his treasure, is never careless, and whom you may know to be a pure

* Lectures on Hindu Philosophy (2nd year) by Mahamahapadhaya Chandra Kanta Tarkalankara. Pp. 245 and 248.

and self-restrained student observing the vow of celibacy."

Besides, the method adopted by Vishnu Sarma (the Indian Frœbel), who had the charge of the ignorant and vicious sons* of king Sudarsana of Pataliputra, clearly shows that the modern principle of suiting matter and method to the nature and needs of the child was not unknown in ancient India.

Hence the fact that the study of sacred literature was withheld from the Sudras does not go to show the narrow-mindedness of the Brahmins but argues that even in those early days, they got an insight into one of the most important modern pedagogical principles. The Sudras were, *in general*, denied the study of the vedas only becsuse they had neither any tradition nor aptitude for acquiring the language and spirit of the vedic literature.* Here it may be said that this was not the distinctive feature of the early Hindus alone; even worse features could be traced in the Greek system. According to Aristotle "slaves and artisans cannot attain to citizenship and hence not to the good life, since 'it is not possible to care for the things of virtue, while living the life of the artisan or the slave." Plato's system also was none the less aristocratic in this respect. He held that the philosophers only should be the rulers, for a philosopher was he who knew the highest good and 'this longing for the supreme good' was, according to him, to be found only in a few.

Again in ancient India the struggle for existence was not at all keen and there was very little social and economic pressure. So the people were more or less free from any anxiety as to the immediate future; this fact combined with the assurance that an individual in any class had as to his position, purpose and value to the society, did not make him feel the necessity of changing his own vocation.* As a natural consequence through social habit the occupation of each class became to a great extent hereditary. Hence the Brahmins who devoted their time and energies to the study of the vedas and the sciences originating therefrom and to the acquisition of a knowledge of sacrificial rites, gradually acquired a practical monopoly of higher learning. It is urged now that this has led to the rigidity of the existing caste system, which for a long time to come 'is likely to be the curse of India.' But for this the Brahmins are not much to blame. For, besides the causes mentioned before the peculiar isolated and fortified position of the country shutting out all outside influences, the fertility of the soil and the fact that the outside world was for a long time sunk in deep ignorance—all these tended to make

* Cf. Also Havell—The Ideals of Indian Art. —p. 7.

* Industrial Arts of India by Sir George Birdwood.

the vocations hereditary; these therefore were more or less responsible for the loss of elasticity which existed in ancient India and which is so urgently needed under the political and economic condition of modern India. In fact, until late the Brahmins did never place 'so strict an interpretation' upon the caste system, for though the causes mentioned above tended to produce rigidity in the system there always existed strong reactionary forces to stop this natural tendency, the highest culmination of which was reflected in Buddhism. The efforts of Nanak, Kabir and Chaitanya against the rigidity of the caste system in the mediæval period also bear this out. In fact, it was only when the Aryans came under foreign influences that hygienic considerations and the fear of spiritual contamination through suggestion as well as the desire to preserve the purity of their blood —all these led the Brahmins to make the caste rules strict.

Though the caste system in its present form has many defects it, however, serves at least one function. As a fence protects the growing tender plant so it protects the growing child of the individual society from being affected by alienating influences. Indeed "the caste system is a splendid organisation. Its wonderful persistence is the proof of it." It saved society once though its life is now fled having lost its true significance with respect to *guna* and *karma*. It exists now more or less by *inertia*. How to overcome this inertia is the problem of the present generation.

It must be stated here that caste system in its natural form exists more or less everywhere in the world. Don't you form a separate caste when you call yourselves educated classes or belonging to the genteel class? Lastly it is interesting to note the strange parallelism that existed between the caste system of India and the mediæval European institutions. The clergy, the knighthood and the people of Europe in the Middle ages answered in some respects to the Brahmins, the Kshatriyas and the Vaisyas of India. Learning in Europe, as in India, for a long time flourished under the fostering care of the clergy; and so strong was their hold upon it that during the development of the National System of education, the State had often to fight hard with the church to secure the full control of the system of education.

NOGENDRA NATH MAJUMDAR.

## THE INDO-ARYAN MARRIAGE LAWS.

The Indo Aryan Matrimonial law with its highly complex rules as to Exogamy (marriage outside one's *clan*) and Endogamy (marriage inside one's *caste*) and its long catalogue of forbidden degrees (for marriages, by the law of *Manu*, are prohibited of every degree in the direct line; and, in the collateral, to the seventh degree on the paternal, and fifth degree of the maternal line,) constitutes a kind of special science in itself, and is stamped with a degree of rigidity without parallel in the history of Jurisprudence.

*Pari Passu* with the caste-system, the Indo-Aryan marriage law became, and not without reason, as rigid as the caste-system itself, and, indeed, the same causes which contributed to the rigidity of the one would appear to have contributed to the rigidity of the other. In the later *Vedic* age, as pointed out by Donald A Mackenzie in his "*Indian Myth and Legend*" (page 79), the original cleavage by occupation of the Indo-Aryan tribes into Priests, Warriors, and Traders developed into "a rigid system of castes, the result, apparently, of having (i) to distinguish between Aryans and Aborigines at first and subsequently, (ii between various degrees of Aryans who had intermarried with aliens." Thus, it would seem, the caste-system, by the growing rigidity of its rules, succeeded in checking, if not altogether putting down any further admixture or commingling of *Aryan*, with *Alien*, blood, thereby preventing the merging of the small Aryan community in the surrounding mass of the native population, which would otherwise have been its fate to-day.

Doubtless, the highly complex marriage laws of the Indo-Aryans were directed, in the first place, against intermarriage with aboriginal native women, non-Aryan women, whether Aryanized or not, in order—

*Firstly*, to maintain, (whether from pride of race or caste *varna* = "colour" as from the supposed unwillingness of the *Manes* to receive the offerings of of aliens in blood or which comes to the same thing, of descendants of mixed blood), the pristine purity of Indo-Aryan blood.

*Secondly*, to provide Aryan husbands for Indo-Aryan women themselves, and these rules had for the latter much the same effect "as the protective duty or rather the prohibitive duty for home consumption."

Undoubtedly, there appears to have existed, at one stage or another in the history of the Indo-Aryan colonisation in India, a keen rivalry between Aryan, and Aryanized Native, women—as witness, among other instances which will leap to the memory, that between *Devayani*, an Aryan woman, and

*Sarmistha* a Non-Aryan Princess for an Aryan husband Yojati.

This tendency to mesalliances, apparently due to a disparity between the numbers of Aryan men and Aryan women in ancient India. may be accouuted for by more than one hypothesis.

*In the first place*, the ranks of the Indo-Aryans were smaller by hte admission, by what is called the *Varta* rite, of aliens into their community and, as a consequence, there were more Indo-Aryan men (i. e. pure-blooded Aryans and naturalized foreigners) than there were pure Aryan women to go round. In some cases the Aryan Princes conferred on the aborigenes factitious titles and received them into the general body of the Aryan community. In this connection may be mentioned the historic rivalry between *Vasistha* and *Viswamitra*; "throughout the story", said Mr. Justice Ranade in 1909, "*Viswamitra* represents the view of those who try to admit the Non-Aryans into the Aryan community and seek to elevate them The story of *Trishanku*, for instance. notwithstanding its exaggeration, has a moral of its own".

*Vasistha* had, without justice, condemned *Trshanku* to be a *Chandal* simply because he aspired to go to heaven by the force of his merits. *Viswamitra* took up his cause and performed his *Vagnyas* because *Trishanku* had saved his wife and children during a great famine".

*Secondly*, another cause, which affected Aryanwomen *indirectly*, was *the system of concubinage* which partly owing to the comparatively smaller number of Aryan women in India, came into, general vogue among the Indo-Aryans.

"The Indo-Aryans either expelled the mild aborigines into more sterile regions, or converted them inro Hindus *partly by intermarriage, a rather concubinage.*

*Thirdly* the original bands of Indo-Aryans, in the course of migrations from their cradle—it may be in Central Asia —to seek new homes to the eastward of the *Indus*, would naturally bring with them as few women as possible,—because too many women would have proved an *encumbrance* rather than a help on the march. Also because their maintenance which was the private concern of their own husbands while at home, would during the migration devolve upon the shoulders of the migrating community and, therefore, be a public charge (" the evolution of the Aryan", Of course such a luxury during a period of migration would have been out of the question, for the simple reason that it would have seriously crippled the limited resources of the community; and for the same reason superfluous female children, born on the march, were systematically exposed, or discarded—a practice which survived, long after the reason for its origin had disappeared or been forgotten even into later *Vedic* times. " In the *Vedic* period," observes Donald A. Mackenzie

in his "*Indian Myth and Legend,*" (page 60), "the exposure of female children is not unknown; indeed the practice is referred to in the *Yajur Veda*. " It is sorrowful to have a daughter," exclaims the writer of one of the *Brahmanas*."

This practice of exposure of superfluous female children, begun during the Migration,—or its later phase——infanticide—perhaps marked, it may be observed in passing, a necessary stage in the evolution of Indo-Aryan Marriage laws; indirectly as the result of this practice there came into existence the custom of *Betrothal,* which proved the veritable salvation of female offspring.

The parents of a girl would save her provided only she could be betrothed early to an Aryan husband, and such a custom, besides effecting its primary object, viz the saving of particular female children, proved beneficial to society in other respects as well, viz.

*Firstly,*—it interposed a reasonable pause before young parties entered into all the unknown risks of a family.

*Secondly,*—it gave an opportunity of discovering any cause, which might make the marriage unsuitable.

*Thirdly & lastly,*—perhaps, as a sort of probationary period; it was not without its good effect on the morals and temper of both sexes.

Thus, besides other causes, but owing, mainly, to the fewness of the Aryan women brought over by the immigrants and rendered still fewer by the ravages of an untried climate, as well as, to the practice of exposure of superfluous female children then in vague, there occurred,, as one might have expected, a serious dearth of Aryan women, and a consequent tendency to *mesalliances* or mixed unions with Aryanized native women, such as now prevails, (and originally for the same, or similar reasons,) amongst the *Nambudri* Brahmans in southern India.

For example, *Arjuna* had effected such an alliance—an *exogamous* marriage according to matriarchal customs—with *Chitrangada* a Manipuri princess of by no means Aryan blood, and a similar union with *Ulupi*, daughter of the *Naga* king, *Vasuki.*

Similarly, for the Military Aristocracy the seizure of the bride from the bosom of her family—"marriage by capture" or *Khátra* marriage as it is more aptly termed—was sanctioned by Manu and other Indo-Aryan law-givers presumably because there was far from a "glut" of Aryan women in India; for if indeed, Aryan women were available in anything like considerable numbers, there would then, be no necessity for the men to seek for wives amongst alien tribes, instead of amongst their kith and kin—a real scarcity of Aryan women, therefore, made wife-hunting a necessity rather than an interesting diversion or pastime for the military caste. "Raids often took place for the purpose of obtaining wives, and these were invariably the

cause of much bloodshed ("*Indian Myth and Legend*" page 60).

At first such raids, *thanks to the practice of exogamy amongst the Indo-Aryans*, used to be made amongst alien tribes, but subsequently no distinction was observed between Aryan and Alien in this respect, and wife-hunting was sometimes carried even into the Aryan camp. Thus *Arjuna* carried off *Suvadra*, sister of Srikrishna, and the latter in his turn carried off *Rukhini*, the betrothed of *Sisupal* the *Chedi* king.

Again, if further proof were needed as to the prevalence, at one time, of mixed unions between Aryans and Non-Aryans, reference may be made in passing to the historic origin of the twin customs of *Sati* and early marriage. These customs apparently originated, in the case of early marriage for girls, "*as a safeguard against pre-marital unchastity on the part of tribes taken from indigenous tribes*; in the case of *Sati as a means of preventing wives taken from indigenous tribes from returning in the death of their* (*Aryan*) *husbands to their original practices*". "This theory" it has been said, "is more probable when one remembers that in the *Vedic* period *Purdah* and *Infant Marriage* were unknown, and women, in essentials at any rate, were on a footing of absolute equality with men".

Again, Non-Aryan wives had to be procured by other means than capture. Thus simultaneously with "Marriage by capture" for the Military Caste, there had come into vogue another mode of marriage—the *Asura* form, so called presumably because it had at first prevailed, as the name implies, amongst the *Asuras* or Non-Aryans, as contra-distinguished from the *Surás* or Aryans that is, "Marriage by purchase" originally in cattlemoney or kine—so hard pressed indeed, were our pirmitive forefathers for "wives", as for "sons", *of any description ?*

Again, brides had to be procured by hook or by crook for with our forefathers all was fair in love and in war, as the saying goes.

Owing, perhaps, to the weakness of executive authority, a curious form of "Marriage by Fraud or Outrage", as one writer (Mayne) has nicknamed it, came, in the interest of the victim of the fraud or outrage herself, to be recognised and enforced inorder to confer a sort of patent of wife-hood on her, and all the rights the recognition this status involved. As might have been expected outrages of this kind very often occurred owing to the paucity of women, and more frequently, it would appear, amongst the wild aborigines than amongst the civilised Aryans—apparently amongst certain low class aboriginal natives nick-named *Pishaches* by their Aryan conquerors ; and in as much as women amongst these tribes presumably were reckoned little better than goods and chattels, nothing could have been a greater punishment than to have compelled the ravisher to take to wife, or

at any rate maintain for life, the victim of his ravishment.

Similar to,—but whether identical with, the *Asura* form is a moot point—is the *Arsha* form of marriage practised, as a rule by the *Rishis*, (whence the name). The *Arsha* form seems to have been modelled on the *Asura*, only in the case of the former the Bride-price is fixed at a pair or two of kine, or at a cow or a bull at the most while in the case of the latter it was *unlimited* or, (which comes to the same thing), limited only—to use a phrase of political economists—by "ability to pay" on the part of the bridegroom.

Dr. Siromani in his "Hindu law" thus identifies the *Arsha* with the *Asura* form of marriage. "The commentator" observed Mr. Justice Ranade in 1891 *(Fifth social conference)*, "may have been right in his view *to the extent of seeking to establish some resemblance between the two forms.* The *money consideration* in this (*Asura*) case cannot under any circumstances, fall within the *gift* of a cow or two permitted in the *Arsha* form of marriage."

*Manu* in like manner goes to the length of controverting the view of his contemporaries, or it may be, of his predecessors, that the *gift* of a cow or two to the bride in the *Arsha* form was within the meaning of *Shulka* or bride-price as in the *Asura* form of marriage. (3 Manu 53).

Manu goes even so far as to sanction the payment of what is called the bride-price provided it be paid to the bride herself and severely animadverts upon the conduct of her relations converting the gift to their own use (3 Manu 52). Thus, the controversy as to whether the *Arsha* was but a modification or adaptation of the *Asura* form of marriage seems to be well-founded or the sages would not have agreed to differ on the point. Be that as it may, the payment of the bride-price was insisted upon or at least sanctioned in the ancient Indo-Aryan Society; but to-day by a curious inversion the case, the "bridegroom price" instead of the bride-price is the rule. *Apropos* of the "bridegroom price", "we must not lose sight of the fact that under our present laws daughters inherit in very few cases and that the dowries given on their marriages form the principal part of their personal property. Large dowries within the means of the persons giving them are not to be deprecated in societies in which early betrothal is followed by marriage at an age at which the bride-groom, though past minority, has not entered the world and has not begun to earn his own livelihood." *(Seventh Social Conference).*

Next the *Daiva* form of marriage may well be bracketed together with the *Arsha* and *Asura* in that the priest officiating at a sacrifice to the gods or *devas* (whence the name), received the bride *in lieu of his fee*, the bride in fact, representing the market price of his spiritual services. Whatever may be the view of the law-givers and commen-

tators, this, to all intents and purposes, amounts to a sale of the bride, for she is given away by her father to the officiating priest for a fee. At any rate there appears to be a sort of family resemblance, too strong to be accidental, between the *Asura* form on the one hand and the *Asura* and *Daiva* on the other.

Perhaps, the form of marriage, which found most favour with the ancient military aristocracy and appears to offer a sort of *deus ex machinea* to Indian Folk-lorists in honourably bringing the lovers in their folk-tales together is the *gandarva*, now associated with the well-known romance of *Sakuntala and Dusmanta*, and in this form the bridegroom and bride become, (as humorously put by an old Bengal poet, Bharat Chandra Roy), their own match-makers and their only priest is Cupid himself. Of course in the forms denominated *Gandharva, Rakshasa and Pishacha, cohabitation, at a rule, precedes marriage,* but the marriage itself would not be complete unless celebrated subsequently in accordance with the usual religious rites such as *Hema*. (*Nirnoya-Sindhu* ch. III. l. 33). In the *Raxasa* form the bride is won by right of conquest and consequently there can be no gift of her properly speaking, wneither can there be one in the *Hema* form as the bride is sold for money and a *sale is not the same as a gift.* In the *Gandarva* and *Pishacha* forms, on the other hand, there is no legal bar to a gift of the bride to the bridegroom. As the *Asura* form now stands, the bride is given away as in the most approved forms of marriage, notwithstanding the payment of the bride-price, which turns it into a sale of the bride.

The *Gandarva* form of the marriage is so called probably because it may have prevailed among the *Gandarvas* or people of classical *Gandhar* (now identified with the region round about Kandahar) and was, in all but name, a sort of *Gretna Green* union, which once loomed so large in English novels. Of all the eight forms of marriage, sanctioned by Manu, the *Prajapatya* is by far the most matter of fact, its sole object being summed up in the Biblical injunction—"Marry and multiply". "Go ye and do your duties together" is the laconic matrimonial sermon preached to the bridegroom and bride by the father of the bride as he gives her away. All these various forms of marriage however, have died out except the *Brahma* and *Aguru*, and in some nooks and corners, perhaps the *Gandharva* too with such legal effect as custom may give to it. In connection with these forms of marriage one thing may be borne in mind—gifts of money among other things are contemplated as in the *Brahma* form to complete the gift of the bride and so should not be confounded with the *Sulka* or bride-price as in the *Asura* form.

Thus, thanks, mainly, to the paucity of Aryan women, every eligible bride,

whether Non-Aryan, alien, or naturalised (Aryanised) by the *Varta* rite, was, by these different forms of marriage, swept into the Indo-Aryan matrimonial net. Moreover, foreign women, and, indeed, whole conquered populations, used, from the earliest times, to be dumped down into the Indus Valley and as far away as Bactria and Afganistan by the war-like Emperors of Persia ("the land gates of India"), and Greek women, in particular, often found their way into the *harems* of the Aryan Princes, such as *Dushmanta*.

By and by, however as the caste-system took firm root, each of the higher castes began to take for wives women belonging to the castes or classes below them, instead of seeking for wives amongst alien tribes. Thus arose the *Anuloma*, as opposed to the *Pratiloma* system of marriage, and *Pratiloma* marriages, which were little favoured by Indo-Aryan public opinion, were at first, few and far between and ultimately came to be forbidden under the pains and penalties of social ostracism or outlawry. Thus, by the *Anuloma* law, *Brahmins*, *Khastriyas* and *Vaisyas* alone could lawfully marry wives of castes below their own: a Brahman, for instance, could marry, in addition to a wife of his own caste, a *Khastriyani*, a *Vaisyani* and a *Sudrani*; a *Khastriya*, besides one of his own caste, a Vaisyani and a *Sudrani*; and a *Vaisya*, besides a *Vaisyani*, one of the Sudra caste.

Thus the sage *Agastya* married the daughter of the king of *Vidarbha*. Another prince, by name *Lomapada*, gave his daughter in marriage to a sage, *Rishyashringa*. The king *Trinabindu* gave his daughter to *Pulasti*, and *Bhagiratha* gave his daughter to *Koutsha Rishi*. The daughter of the king *Sharyati* was similarly given in marriage to *Chyavanya Rishi*. On the other hand there are two instances of *Pratiloma* marriage on record. Thus *Shukracharya's* daughter, *Deva-jani*, was given in marriage to *Jajati*, and *Kritivi* to *Aunha*.

The *Anuloma* form of marriage, perhaps marked a necessary stage in the development of the Indo-Aryan marriage laws, for, ultimately, as each of the primary castes grew into a race by itself and produced a sufficiency of brides, such inter-marriages between the castes ceased to take place nor was this the sole cause of the disappearance of the practice, for with the growing refinement of ideas no less than with the elaboration and development of the doctrine of what is called *Pitrijanya* (*shradh*) or ancestral *Sacra*, which laid much store, in a religious point of view, on legitimate offspring by one or other of the approved forms of union or wedlock, marriages within one's caste only were allowed and so, (automatically, as it were,) all disapproved forms of marriage (save the *Asura* now shorn of its objectionable features) disappeared, and with these, all the various substitutionary sons, leaving the field to the *Aurasa* (legitimate) and the *Duttaka* (adopted).

Now, just as there are two descriptions of sons—the *Aurasa* and the *Duttaka*—, so there are two descriptions of marriage —the *Brahma*, and the *Asura*, (or rather *Brahma-cum-asura*. By far the most approved form of marriage recognised amongst the ancient Indo-Aryans was —and still is the *Brahma form*, and *in this form the wife brought a dowry to her husband*, as opposed to the *Asura* form in which the dowry, or rather or bride-price as it is called, was received from the husband.

This opposite principle *viz* receiving the dowry, or bride-price from the husband, "is founded on the idea of buying the bride ; the dowry represents the market-value of the woman with this difference—that the father or relations who gave her away did not receive it, *as in days of old, the woman getting it. The former (which is the approved Aryan practice), expresses the beautiful idea that the bride enters the husband's house free and on an equality with the man —she brings him what she has.* Thus she occupied from the very first a higher and more respected position than when she entered the husband's house, empty-handed". (The Evolution of the Aryan.) In this sense domestic law formed the brightest spot in Indo-Aryan law.

N. MUKERJEE.

## GLORIES OF THE SANSKRIT LITERATURE.

It is a definition which instead of defining, renders the defined more obscure than it perhaps really is. In fact Sankara has not been followed in his monistic theory of the universe * as supplemented by his indescribable sub-theory of illusion by other equally famous exponents of the Vedantic system of philosophy, such as Ramanuj-swami, Madhvacharya ( মধ্বাচার্য্য ), Nimbarka, Vallavacharjya and Baladeva Vidyabhusan, who, at the same time as they, uphold the one supreme God (Paramatma) as the ultimate originating cause of all causes and effects, do nevertheless maintain the separate existence and essential difference of life (chit) and matter (achit), especially in the evolved condition of the universe. †

* The sum and substance of Sankara's opinion is very tersely expressed in the following couplets :--

শোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।<br>
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈবনাপরঃ। ইতিঃ।

† If we are to believe tradition, the great Vyasa himself is to be regarded as one of the commentators of his own work. Chaitanya and his followers did firmly believe that Srimad-Bhagavat ( শ্রীমদ্ভাগবত ), the authorship of which if ascribed to Vyasa, is the only correct and natural exposition of the Vedanta Darsan and that any other commentary deviating from it is to be considered as unauthentic and misleading.

As we do not in the least intend to enter into a discussion regarding the ultimate nature and originating cause of life and matter, we think we are quite justified in closing up the subject with the short remarks that the majority of the illustrious exponents of the Vedanta-Darsan do agree in upholding the essential difference of chit (life) and achit (matter), although they might ultimately be traced back to one supreme universal entity whether as different phases or as component parts, that the modifications are real and of the nature of Vikara or Parinam and not apparent or illusory as in the 'Vivarta-vada' of Sankara.

Before diving deep into the subject of interaction between life and matter and the modifications brought about thereby, we would like to say a few words as to whether life or consciousness *perse* undergoes any change. When life interacts with matter and a complex substance results, it is possible that both life and matter might have undergone modifications in some form or other. The Vedantists say that although both may have changed, there is a difference between the changes undergone by each of them. Life *per se* is soul and as such is identical with pure consciousness and cognition* and being immatereal in nature is not liable † to those six kinds

Chaitanya himself left no work of his own, but his opinion found expression in the writings of his followers, hence we find Srijiva, one of his followers, expressing this opinion in very strong language in his commentary on the Bhagavat:—

"ব্রহ্মসূত্রাণাম্ অর্থঃ--তেষামকৃত্রিমভাষ্যভূতঃ ইত্যর্থঃ, তস্মাৎ তদ্ভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্বাচীনমন্যদন্যৎ-ভাষ্যং স্ব স্ব কপোলকল্পিতং, তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে।

But even including 'Bhagavat' as one of the free commentaries of the Vedanta-Darsan, no reason arises to change the opinion expressed above, for even there the distinction of chit (soul) and achit (matter) is distinctly maintained although both originate from Brahma:—

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া॥ শ্রীভাগবতং।

The first four substantives of the first couplet are but different forms of 'achit' or matter, while 'Jiva' refers to the individual Soul, the last couplet refers to the Supreme Soul or Paramatma on whose omnipotent will the others are said to depend for existence and non-existence.

*(1) অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মমপূর্ব্বমনপরম্। শ্রুতিঃ
(2) আনন্দরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ। শ্রুতিঃ।
(3) স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবেতি। শ্রুতিঃ। (4) সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।

†(1) অয়মাত্মা অজড়ঃ অমৃতঃ। শ্রুতিঃ।(২) তমসঃ সাক্ষী সর্ব্বস্য সাক্ষী। শ্রুতিঃ। (3) মায়াঽসংসর্গত্বস্য তদ্বৎ। শ্রুতিঃ। (4) পরিণামিনো হি ভাবাঃ ঋতে চিতিশক্তেঃ। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

(4) The highest philosophy of the *Yoga* is based upon this fact, that the Purusha (soul) is pure and perfect and is the only 'simple' that exists in this universe. The body and mind are compounds, and yet we are ever identifying ourselves with them. This is the great mistake that the distinction has been lost. When this power of discrimination is once attained, man sees that everything in this world, mental and physical, is a compound and, as such, cannot be the Purusa—Svami Vivekananda on Raja-yoga.

of modifications enumerated before to which every material object is liable. The only change or modification to which life is liable consists in the contraction of its characteristic quality of omniscience brought about through interaction with matter, for be it said that according to the opinion of the majority of the Indian Vedantists everything except soul or chit i. *e.* consciousness *perse*) is material. According to Baladeva Vidyabhusan the modifications undergone by inert, insensible matter, that are for the enjoyment of the Jiva or individual soul, are substantially different from each other, being of the nature of Vikara or Parinam, while the only modification to which Jiva or Soul, the enjoyer is liable, consists in the contraction and expansion of its inberant cognitive faculty or knowledge প্রধানাদেরচেতনস্য ভোগ্যভূতস্য স্বরূপেনান্যথাভাবো জীবস্য তু ভোক্তুর্জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাশাভ্যামেবেতি। বেদান্তীয়ে গোবিন্দভাষ্যে॥ The nature of the modification undergone by Jiva is very clearly explained in the following couplets said to have been uttered by Rishi Sounaka :—

যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষালনান্মণেঃ।
দোষপ্রহাণাৎ ন জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা॥
যথোদপান খননাৎ ক্রিয়তে ন জলাম্বরং।
সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ॥

শৌনকবাক্যং।

Just as when a jewel cleansed of its impurities accidentally attached to it, sheds forth no new light, except its own natural one which was obscured before, just as by the removal of the surface soil water appears, which lay all the time underneath it, so when individual soul is purified by separation from its material environment, which is as it were its dross, it shines forth in its pure *original* light which is knowledge infinite; for how can that appear which did not *at all* exist before?"*—Saunaka.

As to how this obscurity of omniscience is brought about is concisely explained by Ramanuj-Swami in his celebrated commentary on the Vedanta-Darsan called Sri-Bhashya (শ্রীভাষ্য) :—

অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াং কর্ম্মণা সঙ্কুচিতস্বরূপং তত্তৎকর্ম্মানুগুণতরতমভাবেন বর্ত্ততে; তচ্চেন্দ্রিয়দ্বারেণ ব্যবস্থিতং। তমিমমিন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞানপ্রসরমপেক্ষ্যোদয়াস্তময় ব্যপদেশঃ প্রবর্ত্ততে। জ্ঞানপ্রসারে তু কর্ত্তৃত্বমস্ত্যেব তচ্চ ন স্বাভাবিকম্, অপি তু কর্ম্মকৃতমিত্যবিক্রিয়াস্বরূপ আত্মা। এবং স্বরূপাবিক্রিয়ত্বং জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানস্বরূপস্যাত্মন এবেতি, ন কদাচিদপি জড়স্যাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বসম্ভবঃ।

বেদান্তীয়ে শ্রীভাষ্য।

"Hence when omniscient soul is individualised by assuming the condition of a Kshetrajna or Jiva, its omniscience undergoes contraction in a more or less degree according to the action destined to be performed by it but this contraction or obscurity is brought about through the instrumentality of the organs both external and internal. That is to say, with an increase and development of the organs there is a corresponding expansion and growth of the

*(1) তদক্ষরং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী। শ্রুতিঃ॥

(2) প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি। বেদান্তদর্শনং॥

stock of knowledge possessed by the Jiva, while with their decrease a corresponding contraction and obscurity of knowledge. Even in such expansion and contraction within certain limits, the final authority rests with Soul *per se*, although the modifications through the instrumentality of the organs are directly brought about by Karma or Fate. Hence soul *per se* undergoes no real change, only that its omniscience is limited and obscured by individualisation. Besides, such immutability and omniscience can only be the possible attributes of Soul *per se* which is cognition itself, but never of Ahankara or Individuality which is material and therefore insensible"—Ramanuja in Sree-Bhashya."

That Karma or Fate is the originating cause of the organs is also confirmed by the following text quoted from the Mahabharat :—

কর্ম্মণা বীজভূতেন চোদ্যতে যদ্ যদিন্দ্রিয়ং।
জায়তে তদহঙ্কারাদ্রাগযুক্তেন চেতসা॥
মহাভারতম্।

"Whatever organs are required by pristine deed do rise from Ahankara or individuality through the effort of the mind enveloped in desire—Mahahharat."

The following text quoted from the Vrihadaranyakopanishad does also corroborate the statement of Ramanujswami that the differentiation of knowledge and finally the differentiation of the Jivas themselves are brought about through differentiation of the organs, which needless to say are material in nature :—

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেতি। অয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ। শ্রুতিঃ।

"He the supreme soul entering the various bodies created by Him became their exact image, so that they might finally become cognisant of His real nature. The Supreme Lord, though one and indivisible, became many and heterogeneous through the power called 'Naya.' Just as the horses yoked to a chariot carry the charioteer to various places for enjoyment, so organs of innumerable quantity and quality connected with the Jivas make them enjoy various kinds of pleasures and pains. The Supreme Lord seems infinitely divided through connection with the infinitely divisible organs"—Sruti.

According to the gloss of Ramanuj, the 'Naya' of the Sruti-text cited here is used in the sense of wonder working Prakriti or Primordial cosmic matter as in Swetaswataropnishad (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্) 'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ' and as having a real existence and not something entirely illusory.*

* The following is an extract from Ramanuja's commentary on the 'Vedanta-Darsan' containing his critique on the *Mayabad* (মায়াবাদ) of Sankara and his own opinion on 'Maya' as occuring in the Sruti-texts :—'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ' ইতি মায়াশব্দেনাভিধানাদনির্ব্বচনীয়ত্বং ইতি চেৎ, নৈতদেবং; মায়াশব্দস্যানির্ব্বচনীয়ত্ববাচিত্বং ন দৃষ্টমিতি। মায়াশব্দস্য মিথ্যাপর্য্যায়ত্বেনানির্ব্বচনীয়মিতি চেৎ, তদপি নাস্তি। নহি সর্ব্বত্র মায়াশব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ; অসুররাক্ষসশস্ত্রাদিষু সত্যেষ্বপি মায়াশব্দপ্রয়োগাৎ। যথোক্তং

Thus we learn from the texts quoted above that according to the most authoritative systems of philosophy prevailing in India and as explained by a majority of their famous commentators, the modifications undergone by inert and insensible matter are of the nature of '*Vikara*' as described before and that the diversity of the universe is brought about through interaction of life and matter and that the only modification which the soul per se undergoes consists in the contraction or obscurity of its all pervading knowledge through its mysterious connection with matter.

The ultimate nature of matter and soul and of the manner of their interaction have always remained an inscrutable problem to the metaphysicians of other countries and climes and the diversity of opinions prevailing on the subject, such as those of the Sankhyists, the atomists, the Buddhists and the Vedantists would testify that even in India the problem has not been solved to the satisfaction of all parties. The Vedantists themselves are not unanimous on the points as will be evidenced by the different interpretations given to the vedantic aphorisms by such celebrated commentators such as Sankara, Ramanuj, Madhwacharjya, Nimbarka, Baladeva and others.* The commentaries are the special objects of study of the different sects founded thereon.

G. C. MOOKERJEE.

*Continued.*

তেন মায়াসহস্রং তচ্ছম্বরস্যাশুগামিনা।
বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকাংশেন সূদিতম্॥

বিষ্ণুপুরাণম্।

অতো মায়াশব্দোবিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতেশ্চ মায়াশব্দাভিধানং বিচিত্রার্থসর্গ করত্বাদেব। 'অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।' ইতি মায়াশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেবিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি। পরমপুরুষস্য চ তদ্বত্তামাত্রেণ মায়িত্বমুচ্যতে নাজ্ঞত্বেন। জীবস্যৈব মায়য়া নিরোধঃ শ্রূয়তে। 'অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।' শ্রুতিঃ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" ইত্যত্রাপি বিচিত্রশক্তয়োঽভিধীয়ন্তে। অতএব হি 'ভূরি ত্বষ্টেব রাজতি' ইত্যুচ্যতে। নহি মিথ্যাভূতঃ কশ্চিদ্বিরাজতে। 'মম মায়া দুরত্যয়া' ইত্যত্রাপি গুণময়ীতি বচনাৎ সৈব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরুচ্যতে ইতি ন শ্রুতিভিঃ সদসদনির্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতিপাদনম্। বেদান্তীয়ে শ্রীভাষ্যে॥

* There is much reason to assume that the diversity of opinions prevailing amongst the comparatively modern commentators of the 'Vedanta Darsan' such as Sankara, Ramanuj etc originated in very early times as recorded in the Sutras themselves. Althogh almost all the commentaries current before the time of Sankara are lost, there is evidence enough to prove thaht those commentators were not unanimons on the points discussed here. For example Ramanuj-Swami in one of his works says that he is but elaborating the commentary ( বৃত্তি ) of Rishi Boudhayana, who flourished long before him : ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে। ইতি শ্রীভাষ্যে॥ Likewise Nimbarka-Swami is said to have followed in the track of Rishi Oudulomi ( ঔডুলোমি ). As regards Sankara, some say that he is unique in his exposition of the Vedanta, while others say that Sankara only followed in the track of his antecedents, amongst which the names of Gourpada and Dramidacharjya ( দ্রমিড়াচার্য্য ) may be mentioned.

## THE FIRMAMENT.

When I behold the firmament with wond'ring eyes,
Oh what delightful thoughts within my soul arise!
Sometimes the vast expanse looks like a canopy
Of gold-embroider'd silk, and sometimes as a sea
Whose heaving breast presents a most enchanting sight
Of floating lamps of various shapes and shades of light.
Sometimes it looks as if it is a dried-up sea
Or mine of diamonds that glitter ceaselessly;
And though it looks forsaken like a barren land,
The sight is none the less majestic, weird, and grand.
Bewilder'd I forget that what move through the skies,
Disguised as little stars that nightly meet my eyes,
Are in magnitude greater than this world of ours,
And not, as distance makes them look, as small as flowers.
Each star has its own sky, Sun, Moon, and range of hills,
Its brimming rivers, rivulets, and meand'ring rills;
And has its seasons, days and nights, its months and year,
And countless twinkling stars that ev'ry night appear.
Bewilder'd I behold these worlds of blazing stars, *
And wonder why should they be useless, as is Mars,
To serve as home of Man, as there is in the Word
"All things are made for Man"; and this is from the Lord.
We can, with telescopes the visible stars explore,
But quite out of their range there are a million more
Whose light has not yet reach'd as far as distant Earth,
Tho' trav'lling with tremendous speed from Phœbus' birth,
There are, in Nature, many a thing beyond our ken,
So how can we say that in Mars there are no men?
Admitting that as mortal men, our sight is dim,
Can we deny our God because we see not him?

* Some of the modern astronomers hold that Mars is not a seat of life and intelligence meaning that it is not inhabited by Man or any other intelligent being. This view is in direct opposition to the declarations of the Holy Bible and the Holy Quran.

Can we be faithless, and forget ourselves so far
As not to put our trust in Him from whom we are?
For what we do not know on others we depend,
Before the book of wisdom should we not then bend?
If in conceit we flourish trumpets of our own,
Will it, with dire alarm, shake Heaven's eternal throne?
If knowledge fail to make us wise, and teach us this,
What is the harm in thinking "ignorance is bliss"?
When wrappe'd in thought I gaze at the ethereal dome,
A voice unknown tells me "This world is not thy home.
When thy sojourn on Earth is over, it may be
That thou wilt dwell in one of them from bondage free,
With friends long lost but ne'er forgot, to welcome thee".
Oh what felicity is there in store for me!

BAHAR-UD-DIN AHMED.

## PSYCHICAL RESEARCH.

BY J. ARTHUR HILL.

IT is related of Mme. de Staël that she did not believe in ghosts, but that she was afraid of them all the same—*je ne les crois pas, mais je les crains.*" The witty Frenchwoman's epigram contains deep psychological truth; for our emotions are not ruled by our reasoned beliefs. And, in addition to its true psychology, it accurately describes the attitude of the average man, though he may not confess it so frankly. We dont believe in ghosts—oh, no, not really *believe* in them. But we are at times a little—just a little—afraid of them; say, for instance, when going to bed at two in the morning (at which hour, according to Napoleon, courage is at its lowest ebb) up the gloomy staircases and in the draughty corridors of an old and lonely house, with the wind soughing and sobbing and wailing in the trees outside—like the wraith of poor Cathy in "Wuthering Heights." At such times, we have inner qualms, step we never so boldly.

The recent advance in certain by-paths of science, however, seems likely to go far towards effecting a change in popular opinion and popular feeling. The ghosts, like everything else in this extremely scientific age, are now being studied and examined, and photographed and dissected (or would be, if they

had any insides to dissect), and the prospects are that before very long, we may get so well acquainted with these *animulae vagulae* that we shall no longer be afraid of them. Then we shall be able to reverse the epigram ; instead of disbelieving yet fearing, we shall believe but shall not fear. This consummation may be displeasing to the orthodox haunting ghost, whose business is (like the Fat Boy's in " Pickwick)," to make our flesh creep ; but, on the other hand, it will meet with the approval of all sensible and well-disposed spirits, such —for example—as the late Mr. Stead's friend Julia, of whom we have heard so much.

The "spirit" question, however, is the wrong end of the subject to attack. Of course, when an apparition does turn up it is the percipient's scientific duty (if he can keep his wits about him sufficiently to do it well) to observe it, to make careful notes at once, and to get them signed—along with a doctor's certificate of sobriety—by corroborating friends. Then, if the person represented by the spook is afterwards found to have died at the time of the vision, we have good evidence for some kind of supernormal agency. Or if—as is most likely—he did not die; if, indeed, he was in specially good health and spirits at the time; if, in short, our hallucination was due to indigestion (as the doctor probably assured us), we naturally feel a mild regret that the Society for Psychical Research should have lost a promising "case," but, on the other hand, we have at least retained our friend, who—perhaps equally naturally—will be apt to regard our aforementioned regret with a feeling akin to resentment. But, even in cases of veridical hallucination—*i.e.* hallucinations which seem somehow connected with distantly-occurring events, and which are therefore "truth-telling"—even in these cases, the scientific value of the phenomenon itself is perhaps less than that of many apparently less important happenings. For it is not the mere establishing of the actuality of an alleged phenomenon, that constitutes its value to pure science. It is the linking of it up with facts already known; the fitting of it into the mosaic of already organized knowledge; the bringing of it into the domain of law ;—it is here that the main business and interest of the philosophical scientific man are to be found. And, in the case of ghosts, this linking up, and fitting in, does not seem likely to be an easy matter, even if the facts are satisfactorily established.

It was therefore with deep wisdom that Sir Oliver Lodge, in " The Survival of Man " which is the latest important pronouncement on the subject, decided to begin at the other end. Instead of plunging into the description of phenomena which puzzle us because they seem so out of relation with our scientific knowledge, he starts by giving a lengthy and careful description of some experiments of his own which

seem to establish the fact of thought-transference or "telepathy." In these very matter-of-fact and unghostly experiments, the chief parts were played by two young ladies who were employed by a Liverpool firm, of which Mr. Malcolm Guthrie, J. P., was head. One of them--the receiver or "percipient" —was blind-folded, though as an aid to passivity of mind rather than as a precaution. The other—the "agent"—concentrated her mind on an object selected by Sir Oliver, trying to impress the idea of it on the mind of her friend. Care was taken, of course, that the latter was afforded no opportunity of seeing the object, or of gleaning any information of its nature by normal means. Many of the experiments were made with ordinary playing cards; for, by this means, the likelihood of chance coincidence could be mathematically determined. In one series which Sir Oliver quotes, the successes were ten out of sixteen. The chance of this occurring by accident can be shown to be less than one in ten million.

From this we go on to telepathy at a distance. Recent experiments between Miss Miles and Miss Ramsden, carried out in accordance with suggestions made by Professor Barrett, indicated clearly that some supernormal agency was at work. The distance between the experimenters varied, as one of them was travelling about; during part of the time it was about four hundred miles. Often, the exact idea sent by the agent was received by the percipient, who sat alone, at a specified hour, waiting passively for ideas to drift into her mind. At other times, the message received was not that which had been consciously sent, but nevertheless represented something which had been occupying the agent's subconsciousness, as well as the ordinary conscious level of the mind, may have something to do with the process.

With this in mind, we go on to consider a different class of phenomena, *viz.*, what is called by spiritualists "trance-mediumship," and by psychical researchers "motor automatism with obscuration of the supraliminal consciousness," or other terms to that effect.

It is a common thing for a sitter with a trance-medium to be told the most astonishingly correct and intimate details of his family life, the names of his relatives, and so on, although, so far as he knows, he is an entire stranger to the medium. The intelligence, or control, purports to be a guardian-angel sort of spirit, who habitually speaks through this medium, and who says that he or she is getting the information from spirits who are the sitter's deceased friends or relatives. Sometimes one of these latter is allowed by the "guardian-angel spirit" to take personal possession of the medium's body, and thus to speak directly. In such a case the astonished sitter (*i.e.* if he is a novice) finds himself addressed in characteristic fashion by some dead person, reminded of little experiences

which they had shared in life, and is perhaps ultimately convinced that he is veritably in direct communion with the disembodied mind of his relative or friend. When the medium wakes up, she (it is usually a "she") has absolutely no knowledge of what her vocal organs have been saying.

Now how are we to set about explaining all this?

The first thing to make sure of is, of course, that ordinary fraud is excluded. This is usually a fairly easy matter. When the sitter can question the "spirit" (as in these cases he always can) it is easy enough to get satisfactory assurance that common trickery is not the correct explanation; for questions can be asked concerning family matters, or mutual experiences, of which the medium could not be normally aware, even assuming the employment of skilful and energetic detectives. Moreover, in several cases known to me, the sitter gave either a false name, or no name at all. In one of these cases, the sitter was a friend of mine, living two hundred miles from London, where the sittings took place, and there is no reason to suppose that he was in the least degree known to the medium. He was not a spiritualist, had no spiritualistic friend, and had never sat with a medium before. Yet the guardian or "guide" gave my friend's two Christian names, with a good deal of true detail about his life, and at the second sitting, two days later, he was greeted by an intelligence purporting to be his recently-deceased mother, who alluded by name to all the near surviving relatives, with appropriate comment and attitude, and gave other evidence of a characteristic and convincing nature. My friend had gone into that room a sceptic, bent on "showing up" these tricky mediums; he came out absolutely convinced that he had spoken with his deceased mother. I express no opinion, except that some supernormal explanation seems to be required. (I may also remark that this case, considered in full detail, is much more evidential than this necessarily short description can indicate. It is described in full in my book. "New Evidences in Psychical Research." (William Rider and Son, Ltd. 3s. 6d.)

Fraud being excluded, we turn to other possible theories; and, bearing in mind the fact of thought-transference or "telepathy"—already established by experimental methods—we surmise that the medium has somehow read the sitter's thoughts. The fact that the trance-control's remarks do not coincide with what we were thinking of at the time, is no obstacle, for, as we saw in the case of Miss Ramsden, it is not always the agent's *conscious* thought that is reproduced. The medium's trance-consciousness may be able to rummage among our memories, selecting those which stick together round a given personality. As to the verisimilitude of the characterisation, this is easily comprehensible; for it is a

well-known and continually-observed fact that in the hypnotic state many subjects are excellent mimics, and hypnosis is undoubtedly related to "mediumistic" trance.

It follows, then that nothing more than thought transference need be supposed so long as the medium tell us nothing except what we already know. But what shall we say if things are told us—things characteristic of the *soi-disant* spirit—which have never been known to us, but which on investigation turn out to be true? Well, this certainly complicates matters, but, knowing that telepathy can be effected over great distances, as in Miss Miles' and Miss Ramsden's experiments, we are able to suppose that the fact in question has been somehow telepathically gleaned from some distant mind. It is, however, clear that in making this supposition we are treating two cases as analogous, which differ in important features. Miss Miles and Miss Ramsden are well known to each other, are, in fact, friends: and, though the consciously-attempted message sometimes failed, another (which was not "sent") taking its place, it must nevertheless be borne in mind that the two experimenters were thinking of each other frequently, and that there was thus a certain *rapport* between them. Whereas, in some of these trance messages, the person whose mind must be supposed to have supplied the information is a person who has never seen the medium; is not known by the medium; is unaware of a sitting being in progress, and therefore is not thinking of anything of the kind; is indeed perhaps unaware of the medium's existence, and hostile to psychical research and all its works. The conditions are therefore very different from those of experimental thought-transference. Still this latter fact having been established, and its possible range not yet being satisfactorily defined, we are bound by the law of parsimony to work telepathy for all it is worth, before turning to other and more far-fetched-seeming hypotheses. So long, therefore, as any living mind contains a fact which is retailed by a control as evidence of its identity, we must suppose that it may be a case of telepathy from that living mind.

I say we must suppose that it *may* be. It does not by any means follow that it *is*. Some of the cases quoted by Sir Oliver Lodge as occurring in his own experience with Mrs. Piper, though possibly explicable by telepathy, are nevertheless strongly suggestive of the action of a disembodied intelligence. For example, a "spirit-communicator in Mrs. Piper's trance claimed to be the deceased son of Mr. Rich, the then Postmaster at Liverpool. This entity wished a message to be sent to his father, who was said to be worrying specially about his son's death. The sitters knew Mr. Rich slightly, but knew nothing about the matter dealt with in the message. This latter, however was duly delivered, and turned out to be

appropriate to, and characteristic of, the deceased young man. The exceptional worry or grief was due to a slight estrangement, which would have been only temporary. If we are to invoke telepathy in this case (and it is only one of many similar ones) we are driven to the curious supposition that Mr. Rich subconsciously sent a telepathic message to Mrs. Piper (whom he did not know, and who did not know him) and that this message was dramatized and returned. In other words, that he sent a deceptive message to himself—*via* Mrs. Piper, and by means unknown to science—without knowing anything at all about it! It seems almost as easy to believe in the *primâ facie* explanation (*i.e.* genuine spirit communication) as in such marvellous telepathic exploits as this.

But is there—it may be asked—any way of putting it to the proof? Cannot telepathy be shut out, somehow? Cannot crucial tests be devised? On this very important point several acute brains have been cudgelling themselves for many years.

It was at one time thought that the best test would be the posthumous reading—through a mediumistic communication of a sealed letter left in the keeping of a friend. Such a letter was left with Sir Oliver Lodge by Mr. Myers; but the attempt by a *soi-disant* Myers-communicator to give, through Mrs. Verrall's automatic writing, a reproduction of its contents, was a complete failure. It is now recognized that the test is not a good one; for, even if it succeeded, it would not yield proof. It would still be possible to suppose that the deceased had, before dying, unconsciously "telepathed" the contents of this letter to some person or other, and that, when a medium somewhere produced the message correctly, it was through telepathy from the subconsciousness of this hypothetical person. Or, again, the letter, though sealed, might be read "clairvoyantly." Some such power is often alleged, and there is a good deal of evidence in its support. Further, is it not too much to expect that a spirit will remember what the letter contains? Sir Oliver Lodge has not prepared such a letter, for he is quite sure that he would forget what he had written. Probably most people will feel similar doubts about their *post-mortem* recollection of such matters.

The sealed-letter test, then is given up as unsatisfactory. What shall we turn to next?

It was thought by Mr. Myers and Professor Sidgwick that it would be rather good evidence if the same message could be obtained from the same spirit through two or more mediums. Some experiments in this direction were made, but apparently without much success. After the death of these two leaders in the research, it was natural to expect that they would themselves try something of the kind from "the other side", in order to give us evidence of their continued existence. And, as a

matter of fact, this seems to have happened. The same message, almost word for word, was received from a Sidgwick-control through Mrs. Thompson, in London (sitter, Mr. Piddington, Hon, Sec. of the society for Psychical Research), and Miss Rawson, in the South of France. But the telepathic difficulty again arises. The two messages were not exactly simultaneous. Is it not possible that Miss Rawson's subconsciousness made up the message (it was one giving some instructions to Mrs. Sidgwick about the preparation of her husband's "Life"), and then telepathed it to Mrs. Thompson? It is of course necessary to suppose, also, that the subconsciousness of the two mediums were in league to represent the message as coming from Dr. Sidgwick. But if the heart of man is deceitful above all things, and desperately wicked, there is no knowing to what depth of sin these newly-discovered "subliminals" may descend. We must hold them guilty until we have proved them innocent. In this case, once more then, telepathy is not excluded.

At this point the ingenuity of the earthly investigators seemed to come to a stand. There seemed no way of getting round this omniscient and omnipotent telepathy. It seemed impossible to devise any experiment which should shut out with reasonable certitude the agency of minds still in the body. Just about this time, however, a curious thing happened.

For some years after Mr. Myers's death in 1901, automatic writing had been regularly produced by several people of social and educational standing—not professional mediums, or even spiritualists—who were more or less in touch with the Society for Psychical Research, and whose script purported to emanate partly from the surviving mind of F. W. H. Myers. Chief among these automatists is Mrs. Verrall, Classical Lecturer at Newnham; others are Mrs. Holland (an Anglo-Indian lady, who did not know Mr. Myers) and Mrs. Forbes, the widow of a well-known judge. These scripts contained much evidential matter, but it was usually open to the telepathic explanation, though some of it admittedly strained that explanation rather severely. Still telepathy was *possibly* the true theory. But, in 1906, it was discovered by Miss Johnson (the Research Officer of the Society for Psychical Research) that there were curious concordances in these scripts, concordances which apparently had been going on for some time. It was found that one script, say Mrs. Verrall's would contain a piece of writing which was apparently meaningless, and which was so treated by the automatist, while another script, say Mrs. Holland's written about the same date, would contain a message equally meaningless in itself, but which, when compared with the similar one in Mr. Verrall's script, produced the most startlingly good sense. Here, then,

apparently, was found evidence of initiative "on the other side," for none of the living investigators had thought of this plan of splitting a communication up and giving it piecemeal through different automatists. (See *Proceeding of the Society for Psychical Research*, Vols. XXI and XXII).

These remarkable phenomena are, however, still not quite conclusive. Perhaps the ingenious and sportive subliminals of the automatists concerned have arranged an elaborate system of impersonation, telepathing these message-fragments to each other, while the normal consciousness remain ignorant of all this below-deck cross-firing. The hypothesis cannot be entirely put aside; though it seems very improbable to those who have made a careful study of the whole mass of evidence. As Sir Oliver Lodge has said, it is too early to formulate dogmas, or even to express opinions (on the spiritualistic question) except in hesitating and tentative fashion. But the evidence now certainly seems sufficient to justify the holding of at least a working hypothesis that in these experiments the minds of "dead" persons are really playing a part.

This, however, is a very different thing from an acceptance of "spiritualism", with all its crudenesses and follies. The spiritualists—or most of them—accept any sort of trance-ravings or automatic scrawlings, as genuine "messages" from "the beyond". Psychical research, on the other hand, critically examines the content of the messages, applying the most drastic tests before even admitting other than known causes. If the communications contain nothing that is not known to the medium, psychical researchers dismiss them as of no interest; unless, indeed, there is a cross-correspondence involved —*i.e.*, the same message, or a related one, being giventhrough an other medium. If the medium's own knowledge is undeniably insufficient to account for the facts, then telepathy is invoked, and is stretched to a fearsome extent, amidst the violent diatribes of the spiritualistic press, which stigmatizes the Society for Psychical Research as a Society for Suppressing Knowledge. If telepathy begins to seem insufficient, some few bolder spirits of the Society (incarnate ones) venture on the tentative hypothesis of "telepathy from the dead;" but with careful hesitancy, leaving the door open behind them in order that they may flee back to the safety of former and more orthodox views, if further investigation should render the new tentative hypothesis untenable. This perhaps undignified but certainly wise position is that which is at present occupied by Mrs. Sidgwick (the ex-President of the Society), Sir Oliver Lodge, and other leading members of the Society in question, adopts a similar attitude. Personal investigation has convinced him of the truth of Hamlet's well-worn remark to Horatio, and he is even inclined to think that some of the evidence justifies us in thinking that

(to be Shakespearian once more) not only can we call spirits from the vasty deep, but that sometimes they will come (though of their own free will) when we do call for them.

It is a difficult subject, not suitable for everyone. Emotional and unbalanced people should be warned off. Even religious people are doubtfully desirable: the investigation should be carried on, as far as possible, in the pure dry light of science, as it has deen in the past, by men like Sidgwick, Gurney, Myers, and Hodgson. We want no recurrence of witchcraft and superstition, of which, perhaps—after the materialistic extremes of nineteenth century science—there is some danger, the pendulum of popular opinion being apt to swing from one side to the other. But, this said, we may follow up our researches with an easy mind. We are certainly on the track of something, whether (in Professor Barrett's phrase) it be a "new world" of being, or not. Careful and honest and patient investigation will no doubt yield its reward; but no sudden revelation is to be expected or desired. It may require the labours of many generations to unfold the full significance of the discovories which are now being made. For it is not only in the (possibly) spiritistic direction that our pioneers are making progress; we are also finding out much concerning the unsuspected powers of the human mind (telepathy, clairvoyance, and so on), while it is still manifesting itself through a material brain in the ordinary earthly life.

---

# ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৫ম খণ্ড। ঢাকা—আষাঢ়, ১৩২২ সাল ৩য় সংখ্যা

## রাজতত্ত্ব।

ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলন কল্পে ইউরোপীয় এবং দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর সাধনার বিবরণ যেমন মনোরম, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এই পণ্ডিত মণ্ডলী কঠোর পরিশ্রম এবং অবিচলিত অধ্যবসায়ে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে অভিনব তত্ত্ব উদ্ধার করিতেছেন; তাঁহাদের প্রাণগত যত্নে ইতিহাসের বহু জটিল তত্ত্ব সরল হইয়াছে। ক্ষুদ্র কীট বহুকালের পরিশ্রমে ধীরে ধীরে যোজন ব্যাপী দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। জ্ঞানোপাসক পণ্ডিত মণ্ডলী দীর্ঘ কালের উৎকট সাধনায় তথ্যের পর তথ্য আবিষ্কার করিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাস গড়িয়া তুলিতেছেন।

বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে ভারতের অতীত গৌরব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল; ভারতবাসী আপনাদের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এরূপ সময়ে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ কালে কতিপয় জ্ঞানোপাসক ইংরেজ এসিয়ার ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অনুসন্ধান এবং আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং অদম্য উৎসাহ সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই ভাবে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সঙ্কলনের সূত্রপাত হইল। প্রখ্যাতনামা সার উইলিয়ম জোন্স বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সার উইলিয়ম জোন্স অল্পকাল মধ্যেই পরলোকগত হন। মনস্বী কোলব্রুক অগ্রসর হইয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার গ্রহণ করেন। কোলব্রুক ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে হোরেস হেম্যান উইলসন তাঁহার পদে বৃত হন। উইলসন সাহেবের পরবর্ত্তীকালে ডাক্তার মিলার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। সার উইলিয়ম জোন্স যে ক্ষীণ জ্ঞানধারা প্রবাহিত করেন, তাহা মুষ্টিমেয় জ্ঞানোপাসক ইংরেজের অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রমে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অতঃপর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রয়াল সোসাইটির প্রতিষ্ঠার

পর হইতে সমগ্র ইউরোপের পণ্ডিত মণ্ডলীর দৃষ্টি ভারতীয় পুরাতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হয়। তদবধি সার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক প্রবাহিত জ্ঞানধারা স্ফীত কলেবর হইয়া উঠিতেছে।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব নানা অংশে বিভক্ত; ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, রাজতত্ত্ব, স্থপতিতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব ইত্যাদি। এতন্মধ্যে রাজতত্ত্ব সঙ্কলনের বিবরণই আমাদের আলোচ্য।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের প্রথম প্রবর্ত্তক সার উইলিয়ম জোন্সই ভারতবর্ষের রাজবিবরণ সঙ্কলনের জন্যও অবহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি কেবল অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে থাকাতে তিনি উপকথা বর্জ্জিত রাজ বিবরণীর সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। এইচ্, এইচ্ উইলসন সাহেব বিষ্ণু-পুরাণের অনুবাদ করিয়া ভারতীয় রাজন্যগণের পুরাণ শাস্ত্রোক্ত বিবরণের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু পুরাণ শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার অনেক মতই অসমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। উইলসনের বহু কাল পরে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ পারজিটার সাহেব কলিযুগের রাজবংশ সমূহ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া পুরাণ শাস্ত্রোক্ত রাজবিবরণী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পূর্ব্বক অধিকাংশ বিষয়ের সুমীমাংসা করিয়াছেন।

ভারতীয় রাজ বিবরণের অনুসন্ধান ক্ষেত্রে জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। কুশাগ্রবুদ্ধি প্রিন্সেপ অশোকের অদ্ভুত অক্ষর-ক্ষোদিত অনুশাসন লিপি সকলের অর্থ উদ্ধার করিয়া বৌদ্ধযুগের ইতিহাস আলোকিত করিয়াছেন। অশোকের অনুশাসন লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াই প্রিন্সেপের অধ্যবসায় পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি পশ্চিম ভারতের সর্ব্বত্র প্রাপ্ত রাজমুদ্রা সকল সম্বন্ধে সবিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়া বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী রাজন্যবৃন্দেরও অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রিন্সেপ ভারতীয় রাজতত্ত্বের অনুসন্ধানকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং তদর্থে অতিশ্রমে ৪০ বৎসর মাত্র বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন।

ডাক্তার বার্ণেল দক্ষিণ ভারতের বর্ণমালার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তদ্দেশীয় মুদ্রা ও ক্ষোদিত লিপির পাঠোদ্ধারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

জেমস্ প্রিন্সেপ সমস্ত ক্ষোদিত লিপি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া প্রাচীন রাজতত্ত্বের আলোচনার সুবিধার জন্য প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু অকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে দীর্ঘকাল এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জেনারেল সার আলেক-জাণ্ডার কানিংহাম অশোকের অনুশাসনলিপিগুলি একত্রে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন। তারপর বোম্বের সিভিলিয়ান মিঃ ফ্লিট গুপ্তবংশের লিপিসকল একত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া পাঠক সমাজে উপহার দিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে গুপ্তবংশের সময় সম্বন্ধে দীর্ঘকালাবধি প্রবর্ত্তিত তর্কের সুমীমাংসা করিয়াছেন।

মিঃ কিলহরণ উত্তর ভারতের ক্ষোদিত লিপিসকল খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিয়া প্রাচীন ভারতের রাজতত্ত্বের অনুসন্ধানার্থীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। মিঃ লুদার কর্ত্তৃক ব্রাহ্মী লিপিসকল একত্র প্রকাশিত হওয়াতে তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা সহজসাধ্য হইয়াছে।

মিষ্টার লুইস রাইস দক্ষিণ ভারতের সহস্রাধিক ক্ষোদিত লিপির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এই অসাধারণ শ্রমসাধ্য কার্য্যে দক্ষিণ ভারতের রাজতত্ত্ব সঙ্কলন অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজমুদ্রা সম্বন্ধে যে সকল মহাত্মা পরিশ্রম করিয়াছেন এবং করিতেছেন, আমরা এখানে তাঁহাদের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। র‍্যাপসন (Indian coins) কানিং হাম (Coins of ancient India and coins of Mediaeval India), জন অলেট, পিঃ গার্ডনার (The coins of Greek and Sythian kings of Bactria and India in the British Museum) এবং ভি, এ, স্মিথ (The Gupta coinage, the Andhra History and coinage, catalogue of coins in the Indian Museum.)

এই সকল মহাত্মার কীর্ত্তির পরে উত্তর ভারতে জেমস্

ফারগুসানের, মার্কহাম কিটোর, এডোয়ার্ড টমাসের; দক্ষিণ ভারতে সার ওয়ালটার এলিয়টের; পশ্চিম ভারতে কর্ণেল মিডোস টেলারের ও ডাক্তার ষ্টিভেনসনের কার্য্য কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য।

জর্ম্মান পণ্ডিত ডাক্তার ফ্রাঙ্কি, অধ্যাপক লেপি, খ্যাতনামা এম, ফাউসার, অধ্যাপক গ্রুণওয়েডেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শকবংশ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া ভারতীয় রাজতত্ত্বের এক অধ্যায় সরল করিয়া তুলিয়াছেন। অধ্যাপক র‍্যাপসন শকদের প্রতিনিধি স্বরূপ ক্ষত্রপ উপাধিধারী রাজন্যগণের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

কর্ণেল টড রাজস্থানের রাজবিবরণ সংগ্রহ করিয়া কীর্ত্তিমন্দিরে স্থানলাভ করিয়াছেন।

আলেকজেণ্ডার কিনলক ফরবেস্ গুজরাটের রাজবৃত্ত প্রকাশ করিয়া ঐতিহাসিক পাঠক সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।

মিষ্টার ভিনসেণ্ট এ, স্মিথ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজবৃত্ত সহজবোধ্য প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দ্বারা সাধারণ পাঠক সমাজে ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানপ্রচার পক্ষে প্রভূত সহায়তা হইতেছে।

আমাদের স্বদেশীয় যে সকল মহাত্মা প্রাচীন ভারতের রাজতত্ত্ব সংগ্রহ জন্য আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। এই মহাত্মা অসাধারণ মনস্বিতা সহকারে বিপুলশ্রমে প্রাচীন ভারতের নানা রাজতথ্য প্রচারিত করিয়াছেন। এই সমস্ত মধ্যে পাল ও সেন এবং কেশরী ও গঙ্গা বংশ সম্বন্ধীয় আলোচনাই পাঠক সমাজে সমধিক পরিচিত।

মিত্র মহোদয়ের পর মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ভণ্ডারকরের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি দক্ষিণাপথের প্রাচীন রাজবিবরণ সঙ্কলন করিয়া ইতিহাসের একাংশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

আমরা ভণ্ডারকরের নামের সঙ্গে আর একজন মনস্বীর উল্লেখ করিতেছি। ইনি ডাক্তার ভাউদাজি। ভাউদাজি পশ্চিম ভারতের রাজতত্ত্ব সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়া অনেক নূতন তথ্যের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

মিত্র মহোদয় ব্যতীত আরো অনেক বাঙ্গালী মনস্বী প্রাচীন ভারতের রাজবৃত্ত সঙ্কলন আপনাদের জীবনের প্রধান কার্য্যরূপে পরিগণিত করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ এবং শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই সকল মনস্বীর সঙ্গে অকাল পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। রাজকৃষ্ণ বাবু লক্ষণাব্দের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ণ বাবু অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্রের ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে গবেষণায় নিরত হইয়াছিলেন।

আজমীর যাদুঘরের অধ্যক্ষ ওঝা মহাশয় চালুক্য বংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। মান্দ্রাজের পিলে মহাশয় তামিল দেশীয় রাজন্যগণের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া অনেক তথ্য পাঠক সমাজের গোচরীভূত করিয়াছেন।

বহু সুধী ব্যক্তি প্রাচীন ভারতের রাজবৃত্ত সঙ্কলন জন্য সাধনা করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের সাধনার বিবরণ প্রদান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব; আমাদের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ।

এই অসম্পূর্ণ বিবরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভারতীয় রাজতত্ত্বানুসন্ধানার্থী সুধীবর্গের সাধনার ফলে যে বহু বিস্তৃত ইতিহাস অদ্য পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, আমরা এখানে তাহার রেখাপাত করিতেছি

মহাভারতের সমকালে মগধে আর্য্যজাতীর বসতি স্থাপিত ছিল। মহারাজ জরাসন্ধ গিরি ব্রজপুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। রাজ প্রাধান্য লইয়া উত্তর ভারতের প্রধান নরপতি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁহার প্রতিদ্বন্দিতা উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠিরের পক্ষাবলম্বী শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে তিনি নিহত

হন। মহাভারতীয় যুগে মগধের প্রাধান্য লাভের চেষ্টা বিফল হইলেও পরবর্ত্তী যুগে মগধের রাজন্যবৃন্দ প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হন। তৎকালে মগধে ক্রমে ক্রমে বহু রাজবংশের অভ্যুদয় ও বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। ইহাদের অন্যতম শিশুনাগ বংশীয় বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্ব কালে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া সাংখ্য দর্শনের ভিত্তিতে বিশ্বপ্রেম ও বৈরাগ্যের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করেন।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালে ভারতবর্ষে যোড়শটী প্রধান রাজ্য বিদ্যমান ছিল। মগধের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট পঞ্চদশটির নাম এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। (১) অঙ্গ (২) কাশী (৩) কোশল (৪) বৃজি (৫) মল্ল (৬) চেদী (৭) বংশ (৮) কুরু (৯) পাঞ্চাল (১০) মৎস্য (১১) সুর সেন (১২) আস্‌মক (১৩) অবন্তী (১৪) গান্ধার (১৫) কাম্বোজ।

বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর মগধে শিশুনাগ বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন; মৌর্য্য বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। চন্দ্রগুপ্তের নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তির নিকট উত্তর ভারতের সমস্ত নরপতি হীনপ্রভ হইয়া পড়েন। তিনি পঞ্জাব হইতে বিহার পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ আপন আধিপত্যাধীন করেন। অতঃপর তদীয় পৌত্র মহারাজ অশোক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আপন বিমল প্রভায় সমস্ত সভ্য জগৎ আলোকিত করিয়া তুলেন। তিনি গিরিপৃষ্ঠ শিলাস্তম্ভ এবং পর্ব্বত গুহায় অনুশাসন লিপি ক্ষোদিত করেন। এই সকল অনুশাসন লিপি হইতে তাঁহার বিধি ব্যবস্থা, তাঁহার ধর্ম্মমত, তাঁহার নীতি পরায়ণতা, এবং তাঁহার জনহিতৈষিণার বিষয় জানিতে পারা যায়। গুজরাট হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে এই সকল অনুশাসন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাপ্রাণ অশোক আপন সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র পশুহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন; এবং লোক চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুশাসন লিপি পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি সিরিয়ার রাজা এণ্টিওক, মিশরের রাজা টলেমি, সিরিনের রাজা মাগ, মাসিডনের রাজা এণ্টিগোনাস এবং এপিরসের রাজা আলেকজাণ্ডারের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বহির্ভাগে,—এই সকল মিত্র দেশে ও অন্যান্য বিদেশে অশোক কর্তৃক ধর্ম্ম প্রচারকগণ প্রেম ও বৈরাগ্যের ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী ছিলেন। মহফি নামক একজন খৃষ্টান লেখকের মতে "খৃষ্টের আবির্ভাবের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ খৃষ্টের উপদেশ সদৃশ মত সকল দক্ষিণ পেলেষ্টাইনে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন; অতএব ইহা সত্য যে, ঐতিহাসিক মহাবিপ্লব মাত্রেরই পূর্ব্ব সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অশোক অতি বিস্তৃত ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার তিরোভাবের পর অল্পদিন মধ্যেই মৌর্য্য রাজবংশ বিলুপ্ত হয়। ইহার পর অন্য দুই বংশীয়গণ মগধে রাজত্ব করেন। এক বংশের নাম সুঙ্গ, অপর বংশের নাম কন্ব। এই দুই বংশের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই।

মগধ হইতে আর্য্যগণ পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। খৃষ্টের জন্মের অন্যূন এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ব প্রদেশে আর্য্য জাতির উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে দুইটী প্রধান রাজ্য স্থাপিত হয়। একটীর নাম কলিঙ্গ, অপরটীর নাম গঙ্গারাঢ়ী। বঙ্গদেশের একাংশ অতীত কালে গঙ্গারাঢ়ী নামে পরিচিত ছিল। গ্রীক লিখিত বিবরণ পাঠে অনুমিত হয় যে, প্রাচীন ভারতে গঙ্গানদীর সাগরসঙ্গম স্থান হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত সমগ্র সমুদ্র তীরবর্ত্তী প্রদেশ কলিঙ্গ রাজ্য নামে খ্যাত ছিল। কালক্রমে কলিঙ্গ রাজ্য হইতে তাম্রলিপ্তি (দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ), ওড্র (উড়িষ্যা) প্রভৃতি কতিপয় রাজ্যের উদ্ভব হয়, এবং কলিঙ্গ রাজ্যের সীমা চিল্কা হ্রদ হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

ভারতীয় আর্য্যগণ প্রাচ্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ভারতে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময় অন্ধ্র বংশীয়গণ দক্ষিণ প্রদেশের একাংশে অধিকার স্থাপন করেন এবং অচিরে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন।

অন্ধ্রগণ পশ্চিমাভিমুখে আর্য্যপ্রভাব বিস্তার করেন। এই প্রদেশে মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্ধ্রগণ কালক্রমে (২৬ খৃঃ পূঃ অব্দ) মগধ দেশ করতলগত করেন এবং সমগ্র উত্তর ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

আর্য্যগণ অন্ধ্রবংশে সংশ্লিষ্ট দেশ পশ্চাদবর্ত্তী করিয়া দাক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে তাঁহাদের সঙ্গে দ্রাবিড় জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে দক্ষিণ প্রদেশের একাংশের অধিবাসী ছিলেন। দ্রাবিড়ে সভ্যতা অসম্পূর্ণ ছিল। আর্য্য সভ্যতার সংস্পর্শে দ্রাবিড়গণ আর্য্যভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। তাঁহাদের অন্যতম নগরী কাঞ্চী আর্য্য শাস্ত্রালোচনার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতের শেষাংশে তিনটী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল রাজ্যে চোল, চের ও পাণ্ড্য বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান মাদুরা প্রভৃতি স্থানে পাণ্ড্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাণ্ড্য রাজ্যের উত্তরে চোল রাজ্য (মহীশূর প্রভৃতি স্থান) বিদ্যমান ছিল। কাঞ্চী অথবা কাঞ্চীভরম এই রাজ্যের প্রধান নগরী ছিল। বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর মালবার প্রভৃতি স্থানে চের রাজ্য সংস্থাপিত ছিল। বহুমানাস্পদ রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় খৃষ্টের জন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এই রাজ্য তিনটীর প্রতিষ্ঠা কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অশোকের অনুশাসন লিপিতে চোল ও পাণ্ড্য রাজ্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্ধ্রবংশের সমকালে (খৃঃ পূঃ ২২০—২২৯) গ্রীক এবং শকগণ ভারতবর্ষে উপনিবেশিত হইয়াছিলেন। মহাবীর আলেকজণ্ডার ভারতবর্ষের প্রথম গ্রীক বিজেতা। কিন্তু তিনি দুই বৎসর মধ্যেই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার ভারত অধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর শতাধিক বৎসর পরে ভারতবর্ষে গ্রীক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। আলেকজণ্ডার পরলোকগত হইলে তদীয় সাম্রাজ্যের অন্যতম অংশ পারস্য দেশ সেনাপতি সেলুকাশের হস্তগত হয়। সেলুকাশ পারস্য দেশে এক স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সেলুকাশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তদীয় রাজ্য বিনষ্ট হয়। সেলুকাশের শাসিত রাজ্য নানা ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ডিওডোটস নামক একজন গ্রীকবীর ইহার কতিপয় অংশ একত্রিত করিয়া খৃঃ পূঃ ২৫৬ অব্দে এক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লিকনগরে এই রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ডিওডোটসের উত্তরাধিকারিগণ দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠার ন্যূনাধিক ৮০ বৎসরের মধ্যেই মধ্য এসিয়া হইতে অসভ্য তুরেণীয়গণ ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক জাতির উপর প্রবল বন্যার জলের ন্যায় পতিত হয় এবং সে স্রোতের বেগে গ্রীক রাজ্য ভাসিয়া যায়। গ্রীকগণ রাজ্যচ্যুত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং নানা ক্ষুদ্ররাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিতে থাকেন।

গ্রীক জাতি কর্ত্তৃক আধুনিক পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের অনেক ভাগ যে অধিকৃত হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। অন্যূন ত্রিংশৎ সংখ্যক গ্রীক জাতীয় অধিপতির নামাঙ্কিত মুদ্রা পঞ্জাবে ও যুক্ত প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রার শেষ তারিখ খৃষ্টীয় ৫০ অব্দ। ফলতঃ গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে প্রায় ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সহিত গ্রীকজাতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল।

ভারতবাসীর নিকট মধ্য এসিয়া শকদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। এজন্য তদ্দেশবাসী তুরেণীয়গণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাধারণতঃ শকনামে কথিত হইয়াছে। মধ্য এসিয়ার তুরেণীয় বা শক নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। ইহাদের অনেকে একটীর পর একটী ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দ হইতে তাহারা ঐরূপ ভাবে ভারতে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। তাহারা প্রথমে ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্জাবে এবং গ্রীকরাজগণের অধিকৃত রাজ্যের পার্শ্বে পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে গ্রীকদিগকে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয় এবং আফগানিস্থান, কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ, গুজরাট, মালব প্রভৃতি সমস্ত দেশ অধিকার করে।

শকরাজকুলে মহারাজ কণিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাপন্ন ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। খৃষ্টের পর প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্ক রাজা কাশ্মীরের অধিপতি হন এবং কাবুল ও কাশগর হইতে আগ্রা ও গুর্জ্জর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কাশ্মীরে একটী সভা স্থাপন পূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনা ও টীকাদি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার শাসনকালে কাশ্মীর হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণ তিব্বত ও চীন দেশে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। ভারতবর্ষে শকাব্দ নামে যে অব্দ অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, সে অব্দ বৌদ্ধ রাজা কনিষ্কের সময় হইতে প্রচলিত হয়।

কনিষ্ক বংশীয়েরা প্রায় ১৯০ বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদে রাজ্য অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ স্থানে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। শক সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক অনেক নূতন রাজ্যের সূত্রপাত হয়। উজ্জয়িনীতে ক্ষত্রপ উপাধিধারী শকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাঁহারা পরাক্রান্ত শাসনপতি ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অন্ধ্রবংশীয়দের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ক্ষত্রপগণ চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; কিন্তু এই সময়ের বহু পূর্ব্বেই অর্থাৎ ২২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্ধ্রবংশের বিলোপ সাধিত হইয়াছিল।

মগধে প্রভুত্বকারী অন্ধ্রবংশের বিলোপ সাধিত হইলে পঞ্জাবের পূর্ব্বদিগবর্ত্তী উত্তর ভারত অন্ধকারে অচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তারপর চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে নবোদিত গুপ্তবংশের আলোক সম্পাতে ঐ প্রদেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। গুপ্তবংশের দ্বিতীয় রাজার নাম সমুদ্রগুপ্ত। তিনি ৩২৬খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমুদ্রগুপ্ত বিপুল ভূখণ্ডের অধিপতি ছিলেন। সমগ্র উত্তর ভারত তাঁহার শাসনাধীন ছিল। পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী নদী হইতে পশ্চিমদিকে যমুনা ও চম্বল নদী পর্য্যন্ত এবং উত্তরদিকে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণদিকে নর্ম্মদা নদীর তীর ভূমি পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সমতট, কামরূপ, দবাক (বর্ত্তমান বগুড়া, দিনাজপুর এবং রাজসাহী জেলা) কর ত্রিপুর রাজ্য (বর্ত্তমান কুমায়ুন আলমোরা, গাড়োয়াল এবং কাঙ্গরা) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া কর প্রদান করিত। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর ১০০ বৎসর মধ্যে সুবিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং গুপ্ত রাজন্যগণ প্রাদেশিক শাসনপতিরূপে পরিণত হন।

গুপ্তসাম্রাজ্যের সমকালে পঞ্জাব, পূর্ব্ব রাজপুতনা এবং মালব রাজ্যের শাসনভার এক বংশের হস্তে ন্যস্ত ছিল। যৌধেয় বংশীয়গণ শতদ্রুর উভয় তীরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মাদ্রকগণ মধ্য পঞ্জাবের অধিকারী ছিলেন। *

অর্জ্জুনায়ন ও আভীরগণ পূর্ব্ব রাজপুতনা এবং মালব দেশের অধীবাসী ছিলেন এবং প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। গুজরাটের অধিকাংশে বলভীবংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে অন্যতম শক সম্প্রদায় হূণগণ পঙ্গপালের ন্যায় পশ্চিম ভারতবর্ষ আচ্ছাদন করিয়া ফেলেন। পঞ্জাবের উত্তরাংশে তাঁহারা একটী বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল নামক নগরে এই হূণগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। হূণরাজকুলে মহারাজ মিহিরকুল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপান্বিত ছিলেন; তাঁহার নামে ভারতবর্ষীয়েরা কম্পিত কলেবর হইতেন। সমস্ত মধ্যভারত এবং মালব প্রদেশের অধিকাংশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মিহিরকুল বহুস্থান জয় করিয়াছিলেন।

* পঞ্জাবের রাজভাগ্য অতি পরিবর্ত্তনশীল ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পঞ্জাব পারস্যের অধিপতির অধীন হয়। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বেই পঞ্জাব এই অধীনতাপাশ উন্মোচন করে। আলেকজাণ্ডার পঞ্চনদ বিধৌত প্রদেশে পুরু, মালই, কাথই প্রভৃতি বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত দেখেন। আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক এই সকল রাজবংশ বিজিত হয়। আলেকজা'ণ্ডার ভারত পরিত্যাগ করিলে মৌর্য্যবংশের অভ্যুদয় হয়, এবং তাহার প্রতিষ্ঠিতা চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব আপন প্রভুত্বাধীন করেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের পরবর্ত্তীকালে মৌর্য্য বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অতঃপর প্রথমতঃ গ্রীকগণ ও তারপর শকগণ পঞ্জাবে আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহাদের আধিপত্য বিলুপ্ত হইলে মাদ্রক, যৌধেয় প্রভৃতি নূতন বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

উজ্জয়িনীর নবীন অধিপতি যশোধর্ম্মদেব বিক্রমাদিত্য তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। বিক্রমাদিত্য হূণগণকে মালব প্রদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। বস্তুতঃ বিক্রমাদিত্য বৈদেশিক রাজন্যকুলের দমনকারিরূপে অভ্যুত্থিত হন। এই কারণ বৈদেশিকেরা সম্মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিপুল পরাক্রমে অস্ত্র ধারণ করেন। ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মুলতান নগরের নিকটবর্ত্তী কোরুর নামক স্থানে বিক্রমাদিত্যের সহিত তাঁহাদের প্রবল যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে শকদের শক্তি পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়। বিক্রমাদিত্য সগৌরবে শকারি উপাধি ধারণ করেন।

হূণদের তাণ্ডবে গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তদ্বংশীয়গণ দীন ভাবে উত্তর ভারতের একাংশে, সম্ভবতঃ মগধে শাসন দণ্ড পরিচালন করিতে থাকেন। এই ভাবে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত হইলে গুপ্ত বংশের উচ্ছেদ সাধিত হয়।

গুপ্ত বংশের ধ্বংসাবশেষ হইতে এক নূতন গুপ্ত বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশীয় একাদশজন নরপতি পূর্ব্ব মগধে রাজত্ব করেন। এতৎকালে পশ্চিম মগধে মৌখরি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মৌখরিবংশের শেষ নরপতির নাম গ্রহবর্ম্মা। স্থানেশ্বরের অধিপতি প্রভাকরবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। মালব দেশের অধিপতি গ্রহবর্ম্মাকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রহবর্ম্মা নিহত হন। পশ্চিম মগধের রাজধানী কনোজ মালবীয় সৈন্যের হস্তে পতিত হয়। প্রভাকর বর্দ্ধনের পুত্র রাজবর্দ্ধন এই সংবাদ অবগত হইয়া মালবীয় সৈন্য আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে কনৌজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন ও কনৌজ অধিকার করেন। এই ভাবে স্থানেশ্বর ও কনৌজ ( পশ্চিম মগধ ) সম্মিলিত হয়। এই সম্মিলিত রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিপতির নাম হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য। শিলাদিত্য তৎকালের ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নর্ম্মদা নদীর কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক রাজা তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন। সুদূরবর্ত্তী কামরূপের অধিপতি কুমারও তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন।

শিলাদিত্যের রাজত্ব কালে চিরখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষে অশীতি সংখ্যক রাজ্য বিদ্যমান ছিল। এতন্মধ্যে অনেক অধিপতি করদ রাজা ছিলেন।

কাবুল, জালালাবাদ, পেশওয়ার, গজনি এবং বান্নু প্রদেশে যে সকল হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা কাপাসিয়ার পরাক্রান্ত নরপতির করদ ছিল। কাশ্মীরে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজবংশের আধিপত্য ছিল। পঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশীলা, সিংহপুরা উরশা, পুনাক প্রভৃতি রাজ্যের শাসনপতি কাশ্মীরের অধিপতিকে কর প্রদান করিতেন। মুলতান ও অরকট রাজ্যদ্বয় তাকি রাজ্যের অধীন ছিল। সিন্ধুদেশে শূদ্র কুলোদ্ভব বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রাজা রাজত্ব করিতেন। সিন্ধু রাজ্যের পার্শ্বে বলভী এবং গুর্জ্জর নামে দুইটী রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যাইত

মগধের গৌরব ও বৈভব অতীতের কুক্ষিগত হইয়াছিল। তৎকালে পাটলিপুত্র নগরের ভগ্নদশা উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে যে দেশ বঙ্গদেশ নামে পরিচিত হইতেছে, তাহা পাঁচ স্বতন্ত্র রাজ্যে ( পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণ সুবর্ণ ) বিভক্ত ছিল। এই পঞ্চ রাজ্যের অন্যতম রাজ্য কর্ণ সুবর্ণ পরাক্রান্ত ছিল।

কর্ণ সুবর্ণের পর ওড্র ( উড়িষ্যা ) রাজ্য বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। এই রাজ্য বন জঙ্গলে পূর্ণ এবং বন্য হস্তীর আবাসরূপে পরিণত হইয়াছিল। কলিঙ্গ রাজ্য অতিক্রম করিলে অন্ধ্র, কোঙ্কন, কোশল ধনকট প্রভৃতি রাজ্য দেখিতে পাওয়া যাইত। দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্র রাজ্য বিদ্যমান ছিল।

মহারাজ শিলাদিত্য ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় বিশাল রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর উত্তর ভারতে আর কোন নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। হর্ষ-

বর্দ্ধনের মৃত্যুর পর একশত বৎসর মধ্যেই তাঁহার সমকালিক সমস্ত রাজবংশের বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী একশত বৎসরের ভারতীয় রাজক্ষেত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

এই অন্ধকার অপসৃত হইলে আমরা নূতন রাজবংশ সকল বিদ্যমান দেখিতে পাই। এই সকল রাজবংশ ইতিহাসে রাজপুত ক্ষত্রিয় নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

কাশ্মীর, বিহার, বঙ্গদেশ, আসাম, উড়িষ্যা এবং মান্দ্রাজ ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে, দক্ষিণাপথে, গুজরাটে মালবে, রাজস্থানে, সিন্ধুদেশে, পঞ্জাবে, আজমীর ও দিল্লীতে, কনৌজে, বুন্দেল খণ্ডে, এবং গড়মণ্ডলে রাজপুত ক্ষত্রিয়গণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

কাশ্মীর প্রাচীন রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। বিহার ও বঙ্গদেশে পাল উপাধিধারী রাজন্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেন বংশীয়গণ বঙ্গদেশে এক নূতন রাজ্যের পত্তন করেন। অতঃপর পালগণ বিহারে ও সেনগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতে থাকেন। খৃঃ নবম শতাব্দী হইতে পাল রাজগণের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই সময় আসামে পালবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পালরাজাদিগের পতনের পরে আসামে আদিম অধিবাসীদিগের আধিপত্য স্থাপিত হয়। উড়িষ্যায় কেশরী বংশীয়গণের রাজত্ব বদ্ধমূল ছিল। মান্দ্রাজের একাংশে পল্লবগণ রাজত্ব করিতেন। মহীশূর গঙ্গাবংশীয়গণের অধিকারভুক্ত ছিল।

যে সকল উপাদান অবলম্বনে ভারতীয় পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী রাজবিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি। এই উপাদান চতুর্ব্বিধ। (১) শাস্ত্র ও সাহিত্য ধৃত রাজপ্রসঙ্গ ( ২ ) বৈদেশিকদের ইতিহাস ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত ( ৩ ) সমসাময়িক রাজবৃত্ত (৪) প্রত্নতত্ত্ব।

কাব্য, নাটক, ব্যাকরণে প্রসঙ্গক্রমে রাজকথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রেও স্থানে স্থানে রাজকথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

জৈনদের ধর্মশাস্ত্র হইতে অনেক রাজতথ্য জানিতে পারা যায়। এই সকল গ্রন্থে অনেক রাজার তথ্য এবং প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

জাতক এবং অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে প্রসঙ্গ ক্রমে বহু রাজকথা বর্ণিত হইয়াছে। তাদৃশ বর্ণনা হইতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। এই সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থ ঠিক সমসাময়িক না হইলেও তৎসমুদায়ে রাজন্যগণ সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তী বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল আছে।

পালিভাষায় লিপিবদ্ধ সিংহলের ইতিবৃত্ত হইতে ভারতবর্ষের অনেক রাজতথ্য জানিতে পারা যায়। এইরূপ দুইখানি ইতিবৃত্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ। একখানির নাম দীপবংশ, অন্যখানির নাম মহাবংশ। এই দুই পুস্তকে মৌর্য্যবংশের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে; অন্যান্য রাজ বংশের বিবরণও আছে। এই সকল বিবরণ স্থানে স্থানে অসংলগ্ন ও পরস্পর বিরোধী হইলেও মূল্যবান বিবেচিত হইয়া থাকে।

বৈদেশিকদের রচনা হইতে রাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পারস্যাধিপতি দরেয়াবুসের একখান ক্ষোদিত লিপিতেই সর্ব্বপ্রথমে বৈদেশিক ভাষায় ভারতবর্ষের রাজতত্ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই লিপি খৃঃ পূঃ অব্দে ক্ষোদিত হইয়াছিল। অতঃপর হিরোডোটসের ইতিহাসগ্রন্থ। হিরোডোটস ভারতবর্ষের সহিত পারস্য সাম্রাজ্যের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পারস্য দরবারের চিকিৎসক টিসিয়াস ভারতবিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রত্নোল্লিখিত রাজতথ্য নগণ্য।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতজয় এবং তদীয় সমভিব্যাহারী রাজপুরুষদের লিখিত বিবরণই ইউরোপের সমক্ষে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের কতিপয় সহচর রাজপুরুষ তাঁহার ভারত জয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এইরূপ ত্রয়োদশজন লেখকের নাম পাওয়া গিয়াছে।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর ন্যূনাধিক বিংশতি বৎসর

পরে সিরিয়া এবং মিশরের অধিপতিদ্বয় মৌর্য্য রাজ-দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম মেগাস্থিনিস, দেইমাকস্ ও দিওনিসিয়াস্। এই তিনজন দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করেন। তাঁহাদের লিপিবদ্ধ ভারতবিবরণ হইতে রাজকুল সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। মেগাস্থিনিসের নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কিন্তু অপর দুইজন দূত বিদ্বৎসমাজে তাদৃশ পরিচিত নহেন।

আমরা আরও তিনজন ভারতীয় রাজতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য গ্রীক লেখকের নাম প্রদান করিতেছি। পেট্রোক্লিস্, ইরোটোস্থিনিস্, পলিবিয়স্। পলিবিয়সের পর যে লেখক ভারতীয় রাজকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার নাম আরটিমিডোরাস।

আমরা যে সকল গ্রন্থকারের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম দুঃখের বিষয়, তন্মধ্যে এক হিরোডোটস্ ভিন্ন আর সমস্ত লেখকের গ্রন্থই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী লেখকগণ তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে যে সকল অংশ স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেবল তাহাই এখন বিদ্যমান আছে।

আলেকজাণ্ডারের সহচর সমসাময়িক লেখকগণ তাঁহার ভারতজয়ের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ছয় জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। দিওদোরাস, সিকুলাস, আরিয়ান, প্লুটার্ক, কিউকুরটিয়াস, জাষ্টিনাস, এই পাঁচ জন; ষষ্ঠ লেখকের নাম অপরিজ্ঞাত।

খৃষ্টের জন্মের পরবর্ত্তীকালে যে সকল গ্রীক লেখক ভারত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত আর কাহারও ভারতবর্ষের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় ঘটে নাই।

খৃষ্টীয় যুগের যে সকল গ্রীকলেখক ভারতের রাজতত্ব সম্পর্কীয় তথ্য সমূহের প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পেরিপ্লাসের অপরিজ্ঞাত রচয়িতা, প্লিনি, টলেমি, পরফিরি, ষ্টোবস্, কসমাস, ইণ্ডিকা প্লিসটিস এবং ষ্ট্রাবোর নাম সবিশেষ পরিচিত।

ভারতবর্ষের রাজতত্ব সম্বন্ধে যে সকল গ্রীক এবং রোমক লেখক লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন, আমরা যথাসাধ্য তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম। এই সমস্ত লেখকের গ্রন্থ ব্যতীত প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের নানাস্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে ভারতীয় রাজকথা আলোচিত হইয়াছে। *

ভারতবর্ষের রাজতত্ব সম্বন্ধে চৈনিক সাহিত্য সবিশেষ আলোচ্য। পুরাকালে বহু বৌদ্ধ পরিব্রাজক চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে আপনাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল ভ্রমণ বৃত্তান্তে রাজতত্ব প্রকটিত হইয়াছে। ফলতঃ ভারতীয় রাজতত্ব আলোচনাকালে চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত সর্ব্বথা অনুসন্ধানযোগ্য। অদ্যাবধি ন্যূনাধিক ৪৫ জন পর্য্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সকল ভ্রমণ বৃত্তান্ত ব্যতীত চৈনিক ইতিহাসেও প্রসঙ্গ ক্রমে প্রাচীন ভারতের রাজকথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের রাজতত্ব সম্বন্ধে তিনজন চৈনিক ঐতিহাসিক লেখকের বিবরণ সমধিক মূল্যবান। এই তিনজন লেখকের নাম সুমাশিন, পানকু এবং আটোয়ানলিন। সুমাশিন খৃষ্টের জন্মের একশত বৎসর পূর্ব্বে ইতিহাস রচনা করেন। †

চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত মধ্যে ফাহিয়ানের গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গুপ্তবংশের সমকালে অনুগাঙ্গ

---

* সোয়ানবেক এবং ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেব এই সমস্ত রচনা সংগ্রহ করিয়া পাঠক সমাজে অর্পণ করিয়াছেন। ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেব ছয় খণ্ডে। (১) Ktesias, (২) Indika of Megasthenes and Arrian, (৩) Periplus of the Erthyrean sea (৪) Ptolemy's Geography (৫) Alexander's Invasion (৬) Ancient India as described by other classical writers—এই সকল রচনার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

† ফরাসী পণ্ডিত এম, সাভানেস্ সুমাশিনের গ্রন্থের কিয়দংশের অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। চৈনিক ইতিহাস সমূহে লিপিবদ্ধ ভারতীয় রাজতত্ব উদ্ঘাটন জন্য ফরাসী লেখকবর্গ সবিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন। এতৎসম্বন্ধে জি. পি. যথিয়াস ডেহাজের গ্রন্থ অতি মূল্যবান।

প্রদেশের রাজ্যশাসন প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহার বিবরণ ফাহিয়ানের গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ্‌সঙ্গের ভ্রমণ বিবরণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের রাজতত্ত্ব অনুসন্ধানার্থীর পক্ষে এই গ্রন্থের আলোচনা অপরিহার্য্য। হিউএন্থ্‌সঙ্গের গ্রন্থ ভারতীয় রাজকথার আকররূপে নির্দ্দেশিত হইতে পারে; এই গ্রন্থ হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস গঠন পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। হিউএন্থ্‌সঙ্গের গ্রন্থে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যবৃন্দ সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী সযত্নে লিপিবদ্ধ হওয়াতে উহার উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

হৈসঙ্গ এবং সঙ্গ ইয়ান নামক আর দুইজন চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ্‌সঙ্গের একশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী তোমাকু নগরেই পরিব্রাজকদ্বয়ের ভ্রমণ পরিসমাপ্ত হওয়াতে এই দুইখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে। হিউএন্থ্‌সঙ্গের বিংশতি বৎসর পরে আই-ত সিঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক ভারতবর্ষের সুবিস্তীর্ণ স্থানে পর্য্যটন করেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে রাজপ্রসঙ্গ আছে।

৬৩৬ খৃষ্টাব্দে আরবদেশীয় মুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ইহাই মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রথম ভারত আক্রমণ। এই আক্রমণের পাঁচশত সাতান্ন বৎসর পরে পাঠান জাতীয় মুসলমানগণ উত্তর ভারতে অধিকার স্থাপন করেন। প্রাগুক্ত সময়-মধ্যে কতিপয় আরব্য লেখক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এইরূপে ছয়জন লেখকের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নাম সোলেমান, ইবন খুরদতবা, অল্‌মসুদি, অল-ইস্তখিরি, ইবন হৌকল এবং অল ইদ্রিসি। ইঁহাদের বিবরণী হইতে ভারতীয় রাজকুল সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়।

পূর্ব্বোক্ত ছয়জন আরব্য জাতীয় মুসলমান লেখক ব্যতীত আর একজন মুসলমান লেখক সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার নাম অলবেরুণী। অলবেরুণী সুলতান মাহমুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করেন। অলবেরুণীর বিবরণে ভারতীয় রাজকুলের অল্পগুলি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। *

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাই, আমরা এইরূপ চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি। ইহা যথার্থ। কিন্তু কয়েকখানি সংস্কৃত রাজবিবরণী দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি ইতিহাস বটে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজবিবরণী রাজতরঙ্গিণী। রাজতরঙ্গিণীর সমকালীন রাজবিবরণী প্রকৃত ইতিহাসের লক্ষণযুক্ত এবং নির্ব্বিচারে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার বিবৃতি কিম্বদন্তীর অসম্বদ্ধ সঙ্কলন মাত্র। বিচার পূর্ব্বক অগ্রসর হইলে এই সমস্ত কিম্বদন্তী হইতেও প্রকৃত রাজতত্ত্ব উদ্ধার করা সম্ভব।

* ফাহিয়ানের গ্রন্থের পাঁচখানা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ফাহিয়ান সর্ব্বপ্রথমে ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। রেমুসা, ক্লাপরথ এবং ল্যানড্রেসি মিলিত হইয়া এই অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ হইতে লেইডলে ইংরেজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। অতঃপর বিল, গিলস এবং লেগি মূল হইতে অনুবাদ প্রকাশ করেন। ফরাসী পণ্ডিত জুলিয়েন সর্ব্বপ্রথমে হিউএন্থ্‌ সঙ্গের গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করেন। তিনি এই অনুবাদ করিবার উদ্দেশ্যে অসাধারণ পরিশ্রমে অতি অল্পসময়ে দুরূহ চীনভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। হিউএন্থ্‌ সঙ্গের গ্রন্থের দুইখানি ইংরাজী অনুবাদ আছে। একখানি বিল সাহেব কৃত, অন্যখানির অনুবাদকর্ত্তা ওয়াটর্স। বিল সাহেব হৈসঙ্গ এবং সঙ্গ ইয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের অনুবাদ করিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিত চভানেস কর্ত্তৃকও এই দুইখানি অনূদিত হইয়াছে। এই অনুবাদ মনোজ্ঞ। ডাক্তার তাকাকুসু আই-তসিঙ্গের গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

* ইলিয়ট সাহেবের ইতিহাসে ছয়জন আরব্য লেখকের বিবরণের সারাংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। অলবেরুণীর বিবরণী Sachau সাহেব কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে।

বৈদেশিক ইতিহাস লেখক ও ভ্রমণকারীদের গ্রন্থে যে কেবল রাজতত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে তাহা নহে; এই সকল গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে; তাহাতে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, উৎসব, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মনোজ্ঞ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচরিত, বিহ্লন প্রণীত বিক্রমাঙ্ক চরিত, (এই পরাক্রান্ত রাজা দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের বিপুল অংশের শাসনপতি ছিলেন। ১০৭৮—১১২৬ খৃষ্টাব্দ তাঁহার শাসনকাল।) রামচরিত (এই গ্রন্থে পালবংশীয় রাজাদের চরিত বিবৃত হইয়াছে) হইতে অনেক রাজকথা অবগত হইতে পারা যায়।

জৈন সাহিত্যের কয়েকটী রচনায় চালুক্যবংশীয় রাজন্যগণের অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। তামিল সাহিত্যের কয়েকটী পদ্যে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধনামা নরপতিদের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

মধ্যযুগে প্রত্যেক রাজপুত রাজ্যে ভাট বা চারণগণ রাজচরিত কীর্ত্তিত করিতেন। এই সকল গাথা অতিরঞ্জিত হইলেও অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। ভাটচারণদের রচিত গাথার নাম রাসা। গুজরাটের ভাটচারণদের রাসা অবলম্বন করিয়া ফরবেস সাহেব রাসমালা নাম দিয়া গুজরাটের রাজবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। ভাটচারণদের গাথার মধ্যে চৌহান রাজকবি চন্দের পৃথ্বীরাজ রাসো অতি প্রসিদ্ধ। রাজপুত রাজাদের সম্বন্ধে আর এক প্রকার রচনা আছে, তাহার নাম ঢাল। সিঝাই নামে কতগুলি রচনা রাজপুতরাজ্যে পাওয়া যায়। তৎসমুদয়েও রাজাদের চরিত বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের সাহিত্য, শাস্ত্র এবং ইতিবৃত্ত এবং বৈদেশিকদের ইতিহাস ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে প্রাচীন ভারতের রাজতত্ত্ব সঙ্কলিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বই এতৎসম্বন্ধে প্রধান অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে গত ৭০ বৎসর মধ্যে বহুকাল বিস্মৃতযুগের রাজবৃত্ত উদ্ধার হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব বিবিধ। স্থপতিতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব এবং মুদ্রাতত্ত্ব।

ভারতে প্রাচীন মন্দির এবং স্তূপ অসংখ্য। রাজতত্ত্বের আলোচনা সম্পর্কে স্থপতি শিল্পের সাক্ষ্য তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে। তবে উহা হইতে প্রাচীন রাজবংশ সমূহের বৈভব এবং ক্ষমতা কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা উপলব্ধ হয়।

ক্ষোদিত লিপির সাক্ষ্য বহু বিস্তৃত এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য। ক্ষোদিত লিপি নানাপ্রকার। অশোকের অনুশাসন এক প্রকার লিপি। ভারতবর্ষের আর কোন সম্রাট শৈল পৃষ্ঠে লিপি ক্ষোদিত করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন নাই। আজমীর ও ধারের সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধীয় শিলালিপি আর এক শ্রেণীভুক্ত। চিতোর দুর্গস্থিত বিনষ্ট প্রায় লিপিতে স্থপতি শিল্পতত্ত্ব ক্ষোদিত রহিয়াছে। তীর্থ দর্শনের স্মারক লিপিগুলি লইয়া চতুর্থ শ্রেণী। পরিব্রাজকগণ এই সকল লিপিকর্ত্তা। কিন্তু অধিকাংশ লিপিই বিজয় চিহ্ন, দানপত্র অথবা মন্দির উৎসর্গকারিকা রূপে ক্ষোদিত হইয়াছিল। অধিকাংশ বিজয় লিপিই শিলা পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। দানপত্র সাধারণতঃ তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ হইত।

দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত ক্ষোদিত লিপির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ পর্য্যন্ত অনেক হাজার ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও হইবে বলিয়া ভরসা করা যায়। কিন্তু উত্তর ভারতের ক্ষোদিত লিপি সকল অধিকতর আদরণীয়। দুই একটী ব্যতীত দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত সমস্ত লিপিই দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন নহে পক্ষান্তরে দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন অনেক ক্ষোদিত লিপি উত্তর ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এখন ভারতীয় রাজতত্ত্বের শেষ উপাদানের বিষয় আলোচিত হইতেছে। প্রাচীন ভারতের অসংখ্য রাজমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রা বহুবিধ। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মুদ্রা চতুষ্কোণ তাম্রখণ্ড মাত্র। এই সকল মুদ্রার সংস্কৃত নাম কার্ষাপন। প্রথম অবস্থায় এই সকল মুদ্রা নিরক্ষর ছিল। তারপর জীবমূর্ত্তি অঙ্কিত হইত। সর্ব্বশেষে দুই একটী অক্ষর মুদ্রিত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পারসীক, গ্রীক, শক, প্রভৃতি বিজেতৃগণ ভারতবর্ষে যে সমস্ত মুদ্রা প্রচলিত করেন, তাহারও অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত মুদ্রা মধ্যে গ্রীক মুদ্রাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এজন্য জাতীয় রাজন্যকুলেরও কেহ কেহ গ্রীক মুদ্রার

অনুকরণ করিয়া স্ব স্ব মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রার ভাষাও নানারূপ। সংস্কৃত, নাগরী, গ্রীক পারসীক প্রভৃতি নানা ভাষার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত

# কোনও মহিলা-কবির প্রতি।

আজি বঙ্গভবনের চিরন্তন গৃহকোণ মাঝে
অয়ি বঙ্গকুলবধূ! বিরচিলে একি স্বপ্নলোক!—
গীতহীন বীণাতারে অনাহত একি ছন্দঃ বাজে!
আঁধার কারায় মরি নামি আসে নন্দন-আলোক!
কোন্ দিব্য অমরার সঞ্জীবন উৎসধারা খুলি'
উষর মরুভূ-বুকে বহাইলে অমিয়া-নির্ঝর,—
অবশ চেতনা আজি পুষ্পে তৃণে উঠিছে চঞ্চলি',
নীরব পিঞ্জরকোণে কলছন্দে জাগে কণ্ঠস্বর।
মুগ্ধ আজি আঁখি মোর ওই দীপ্ত যশোরশ্মি হেরি',
বিপুল সম্ভ্রমে হের পরিপূর্ণ সহস্র পরাণ;
তোমার কবিতালক্ষ্মী অলকার রূপসী অপ্সরী
চরণ মঞ্জীরাঘাতে বিকাশিছে কুসুম-বিতান।
ও উজ্জল প্রতিভার নবারুণ হেমবিভা নিয়া
আজি বঙ্গঅন্তঃপুর নবগর্ব্বে উঠে উজলিয়া।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

# হিমালয় প্রদেশ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

( গৌরিশঙ্কর-কাঞ্চনজঙ্ঘা-দুর্জ্জয়লিঙ্গ তরাই। )

গিরিরাজ হিমালয়কে পূর্ণৈশ্বর্য্যে দর্শন করিতে হইলে, চল আমরা হিমালয়শ্রেণীর কেন্দ্রস্থলে যাইয়া উপনীত হই। চারিদিকে চাহিয়া কি দেখিতেছ? পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ যে দিকেই দৃষ্টিপাত করনা কেন, সেই দিকেই কেবল শৃঙ্গ,—শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ,—তারপর শৃঙ্গ,—আবার শৃঙ্গ,—সীমা নাই—সংখ্যা নাই—অবধি নাই,—নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত শৃঙ্গমালা সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে বিরাজ করিতেছে। ঐ দেখ, দুই মহাশৃঙ্গ বিভূতি ভূষিত-দেহ, ধ্যানমগ্ন, ঊর্দ্ধবাহু, মহাকায় যোগি পুরুষের ন্যায় সুদূর নীল আকাশে গ্রীবা উন্নত করিয়া তোমার সম্মুখে অবস্থিত। আহা! কি বিশাল, গম্ভীর মূর্ত্তি! যে বিশ্ব-নিয়ন্তা বিধাতা এরূপ শত শত হিমাদ্রি সমন্বিত অসীম অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, না জানি, তিনি কত বিশাল! না জানি তাঁহার মূর্ত্তি কত সৌম্য!

উপর্য্যুক্ত শৃঙ্গ দুইটীর নাম দেবগিরি ও কাঞ্চনজঙ্ঘা। উচ্চতা ও বিশালতায় কাঞ্চনজঙ্ঘা অপেক্ষা দেবগিরি মহত্তর হইলেও, দর্শকের চক্ষে

দেবগিরি ও কাঞ্চনজঙ্ঘা

দেবগিরি তাদৃশ বিশাল ও মহিমাময় বলিয়া প্রতিভাত হয় না। কারণ, শৃঙ্গটী হিমালয় শ্রেণীর এত অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত ও এতাধিক সংখ্যক উচ্চামুচ্চ তুষারাবৃত শৈলবলয়ে কটিদেশ পর্য্যন্ত আবরিত যে, এই মহাশৃঙ্গের অধিকাংশই লোকদৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া, উহার বিশালত্ব বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ বাহ্যদৃষ্টিতে কাঞ্চনজঙ্ঘাই সমধিক ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশ চুম্বন করিয়া রণজিৎ নদীর যে খরধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার উপকূলে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, এই বিরাট শৃঙ্গের বিপুলায়তন সানুদেশ ও উন্নত বিশাল দেহ পূর্ণ-মাত্রায় দর্শকের দৃষ্টিগোচর আসিয়া, তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ভীত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া ফেলে! মূঢ় মানব! তুমি চীনের প্রাচীর আর মিসরের পিরামিড্ এবং রোড্‌স ও সাইপ্রাস্‌দ্বীপ মধ্যস্থ জগদ্দ পিত্তল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আত্মশ্লাঘায় অধীর! এস, একবার আসিয়া দেখিয়া যাও,—কোথায় বা চীনের প্রাচীর, আর কোথায় বা হিমালয়ের দুর্ভেদ্য শৈলমালা! কোথায় বা মিসরের পিরামিড্, আর কোথায় বা দেবগিরি কাঞ্চনজঙ্ঘা! কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া শৃঙ্গ দুইটী এখানে অক্ষতদেহে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং কত প্রলয়ের মহাঝটিকা ও

বজ্রসম্পাত এই দুই মহাশৃঙ্গের গাত্রে আঘাত করিয়া প্রতিহত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

হিমালয়ের দ্বিতীয় ঐশ্বর্য্য—বিভিন্ন শ্রেণীর তরুগুল্ম শোভিত বনরাজি। এই বিশাল পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্ব বহিয়া, ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলে, বিভিন্ন মণ্ডলে জাত বিভিন্ন শ্রেণীর তরুগুল্ম স্তরে স্তরে সজ্জিত দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়। সর্ব্বনিম্নস্তরে—গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ বৃহল্লতা জড়িত ঘন সন্নিবিষ্ট তরুগুল্মপূর্ণ ও বিচিত্রবর্ণ পুষ্পসম্ভারে সুশোভিত নিবিড় দুর্গম অরণ্যানী। এবং তদূর্দ্ধে—তালতমালকদলী-ভূচম্পক-সমাচ্ছন্ন বনস্থলী ও বংশ-ডুম্বর-নারেঙ্গাদির সুন্দর সুন্দর উপবন। এই সকল বন ও উপবন অতিক্রম করিয়া, আরও ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলে—ক্রমে সুখশীতল বায়ুপ্রবাহ অনুভূত ও সমমণ্ডলজাত নানাবিধ তরুগুল্মশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয় মণ্ডলের সন্ধিস্থলে শৈলপৃষ্ঠ উজ্জ্বল ক্রকচ পত্র উদ্ভিদ ও স্তরে স্তরে সজ্জিত পুষ্পিত রডোডেণ্ড্রণ ও ম্যাগ্নোলিয়ার মনোহর উপবনে সুশোভিত দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর বৃক্ষ যখন মুকুলিত হয়, তখন বনস্থলী এক অপূর্ব্ব মনোহর শোভা ধারণ করে। ম্যাগ্নোলিয়ার সাদা সাদা ফুল গুলি যেন বনময় শুভ্র তুষার খণ্ড বিস্তীর্ণ করিয়া শোভা পাইতে থাকে!

এখানে দ্বিতীয় স্তরে—চিরপরিচিত ওক্, বাদাম, শিশু বদরি প্রভৃতি বিটপী, ও বনক্ষুর, কণ্টিকারী মটখিলা প্রভৃতি গুল্ম ও কণ্টকবন দেখিয়া, ইংরেজ পবিব্রাজকের মনে স্বতঃই স্বদেশ স্মৃতি জাগিয়া উঠে। এবং খরস্রোতা স্রোতস্বতী, জলপ্রপাত ও নির্ঝরিণী সকল যখন পার্শ্ববর্ত্তী তরুগুল্ম ও পুষ্পপল্লবাদির গাত্রে উজ্জ্বল শুভ্র শিশির বিন্দুবৎ বারিকণা সকল উৎক্ষেপ করিয়া প্রবাহিত হয়, এবং সুরঞ্জিত পক্ষবিস্তার করিয়া বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতিকুল নয়ন সমক্ষে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে তখন কি অনির্ব্বচনীয় মনোহর শোভাই না পথিকের নেত্রগোচর হইয়া থাকে! দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া আরও ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলে—খর্ব্বকায় তরুগুল্মাদির উপবন সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে শৈলপৃষ্ঠ শষ্পাস্তীর্ণ ও বিরল সন্নিবিষ্ট ঝাউ, শিশু, দেবদারু প্রভৃতি দীর্ঘকায়তরুবলয়ে সজ্জিত দৃষ্ট হয়। এইরূপে বন উপবন পশ্চাতে ফেলিয়া আরও অগ্রসর হইলে, পথিক অবশেষে উন্মুক্ত আকাশ তলে বিস্তৃত শাদ্বল প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইবেন। এই প্রদেশ ঊর্দ্ধে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তৃণ ভুনিম্ব চেরিপোস্ত প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পল বৃক্ষে শোভিত। অতঃপর দিগন্ত প্রসারিত তুষার ক্ষেত্র, তুষারাচ্ছন্ন বিশাল প্রবণদেশ, ও তুষার মণ্ডিত বিরাট উন্নত শৃঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নেত্রগোচর হয় না। ইহারই নাম হিমালয়ের আল্পাইন্ প্রদেশ।

বস্তুতঃ "হিমালয় প্রকৃতির এক মহা প্রদর্শনী।" অনন্ত সৌন্দর্য্যের এই অক্ষয় ভাণ্ডারে তুমি যাহা চাও, তাহাই দেখিতে পাইবে। কোথাও ফলের পর্ব্বত কোথাও ফুলের পর্ব্বত, কোথাও লতার পর্ব্বত, কোথাও তরুগুল্মের পর্ব্বত, আর কোথাও বা ফলফুল লতার পর্ব্বত স্তরে স্তরে ইতস্ততঃ সজ্জিত দেখিয়া মনে হইবে, যেন কোন সুনিপুণ উদ্যানপাল সযত্নে ফলফুল নব কিসলয়ে তোরা বাঁধিয়া পদ্মতাকারে শৈলপৃষ্ঠে সারি সারি সাজাইয়া রাখিয়াছে! "এই বিজন বিপিনে অনাদৃত অবস্থায় ফুলরাশি যেন আপনি ফুটিতেছে, আপনি হাসিতেছে, আপনার সুগন্ধে আপনি মত্ত রহিয়াছে; আবার পথের পথিকও উপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া, অভিমানে মনের দুঃখে নীরবে ঝরিয়া পড়িতেছে!"

ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজ প্রতিনিধি মহামতি লর্ড কার্জ্জনের শাসন কালে ভারতবাহিনী দারজিলিঙ্ হইতে যেপথে তিব্বত অভিযান করিয়া- (দুর্জ্জয়লিঙ্গ দারজিলিঙ্) ছিল, আমরা সম্প্রতি তাহারই সন্নিধানে উপনীত। রেল পথে দারজিলিঙ্ আসিয়া, তথা হইতে হাঁটিয়া এখানে আসিতে হয়। দারজিলিঙ্ হিমালয় রেলপথ ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের এক অতুল কীর্ত্তি ও বিংশশতাব্দীর পূর্ত্তশিল্পের চরমোৎকর্ষের জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন। পথটী কোথাও বা উচ্চ লম্ববৎ পর্ব্বতের স্কন্ধদেশ বহিয়া কোথাও বা নিবিড় তমসাচ্ছন্ন সুরঙ্গপথে প্রবেশ করিয়া, পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, বন উপবন শোভিত

প্রদেশ অতিক্রম করিয়া, ক্রমশঃ উর্দ্ধাভিমুখে গমন করিয়াছে। সমভূমির যে স্থান হইতে দার্জ্জিলিঙ্‌ রেলপথ আরব্ধ হইয়াছে, তথা হইতে পর্ব্বত সহসা লম্বভাবে এত উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে যে, রেলপথের প্রথম ষ্টেসন কলিকাতা হইতে ৩০০ মাইল দূরবর্ত্তী হইয়াও, ৪০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে; কিন্তু এখান হইতে ৪০ মাইল যাইতে না যাইতেই, রেলগাড়ী একেবারে কিঞ্চিদধিক ৭০০০ফিট উচ্চ দারজিলিঙে আসিয়া উপনীত হয়।

দারজিলিঙ্‌ স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া সর্ব্বদাই লোক সমাগমে পরিপূর্ণ; শিমলার ন্যায় নির্জ্জনপুরী নহে। দারজিলিঙ্‌ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর শাসন কর্ত্তার গ্রীষ্মাবাস। দারজিলিঙের রাজপথে বিভিন্ন আচার ব্যবহার ও বিচিত্র বেশভূষা সম্পন্ন লোকের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। হাইদ্রাবাদের রাজপথে যেরূপ বিচিত্র সাজপোষাক ও নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত দেশীয় আরবীয় প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যের এক বিচিত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়, দারজিলিঙে তদ্রূপ নানা শ্রেণীর পার্ব্বত্য জাতির অপূর্ব্ব সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। একদিকে তিব্বতীয়গণ এক প্রকার জপচক্র ও বীজমন্ত্রাঙ্কিত জপপতাকা হস্তে ধারণ করিয়া পথ চলিতেছে, আর মাঝে মাঝে উপাসনা বা মন্ত্রজপকালে জপচক্র ঘূর্ণন করিয়া জপসংখ্যা গণনা করিতে; অপরদিকে নেপালের লাপ্‌চা রমণীগণ কর্ণে বৃহদাকার গুরুভার ইয়ারিং প্রভৃতি কর্ণালঙ্কার পরিয়া এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সিঁথি কাটিয়া সুদীর্ঘ কেশপাশ উভয় স্কন্ধে বিন্যস্ত করিয়া যাতায়াত করিতেছে; এবং সিকিমের ভুতরা রমণীগণ গলায় হার, মাথায় সিঁথিপাটী, নাকে নোলক, ও কর্ণে বড় বড় ইয়ারিং পরিয়া ও প্রত্যেকে এক একটী রৌপ্যনির্ম্মিত ভুবড়ীর ঝুলি কক্ষে করিয়া এবং পুরুষেরা পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘবেণী আলম্বিত করিয়া, স্ত্রীলোকদিগের সহযাত্রীরূপে, সতত রাজপথে বিচরণ করিতেছে। আর বেচারী কুলী কর্ম্মী সহযোগে ললাটাবদ্ধ বৃহৎ বৃহৎ মোট পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া কুব্জপৃষ্ঠ কুব্জদেহ হইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে অবিশ্রান্ত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে।

দারজিলিঙের নিম্নে হিমালয়ের পাদদেশ ব্যাপিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে বহুদূর বিস্তৃত প্রশস্ত ভূভাগের নাম টিরাই। ইহার পূর্ব্বে দুয়ার প্রদেশ।

**তরাই (টিরাই)**

দারজিলিঙের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তীর্ণ উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া, নিম্নাভিমুখে টিরাই পর্য্যন্ত প্রত্যন্ত পর্ব্বতের বিশাল প্রবণদেশ ব্যাপিয়া সারি সারি চাবাগান সুশোভিত। তাদৃশ বিশাল পর্ব্বতগাত্রে সারি সারি উদ্যানগুলি দেখিতে বড়ই মনোহর। দূর হইতে চাগুল্ম মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ শীল কুলীও কুলীরমণীগণে পরিপূর্ণ উদ্যান দেখিয়া, গালিভারের কথিত সেই তিন ইঞ্চি পরিমিত দেহ বিশিষ্ট মানব সমাকুল 'লিলি পস্তন' রাজ্যের কথা মনে পড়ে। চা ঝোপের চাকচিক্যশালী তাদৃশ কোন সৌন্দর্য্য নাই, সত্য; কিন্তু কাটাছাটা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝোপ্‌রা ঝোপ্‌রা চা গাছ পূর্ণ বাগিচাগুলি দেখিতে বড় বড় বাঁধাকপি পূর্ণ ক্ষেত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

টিরাই প্রদেশে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়, তেমনই একপ্রকার ভয়াবহ কম্পজ্বরেরও প্রবল প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিমালয়ের বিশালগাত্র বহিয়া যখন সহস্র সহস্র পয়োধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া উদ্বেলিত জলপ্রবাহ তীরভূমি প্লাবিত করে, তখন স্রোতস্বতী সকলের উপকূলবর্ত্তী ভূভাগ এক বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে পরিণত হইয়া থাকে। তদুপরি, এই প্রদেশে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক; সম্বৎসরে গড়ে ১৩০" ইঞ্চ পরিমিত বর্ষণ হইয়া থাকে। বর্ষণান্তে প্রখর সূর্য্যোত্তাপে জলাভূমি হইতে প্রভূত পরিমাণে বাষ্প ম্যালেরিয়া প্রভৃতির বীজাণু বহন করিয়া উর্দ্ধে ও চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এবং যাহারা এই জলীয় বাষ্পসিক্ত দূষিত বায়ু সেবন করিয়া ঐ স্থানে অবস্থান করে, তাহারা ভীষণকম্পজ্বরে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালের করাল কবলে পতিত হয়। টিরাই প্রদেশের স্থানে স্থানে মশকের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই ও অথচ সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং বলিতে হয় মশক ভিন্ন অন্য উপায়েও ম্যালেরিয়ার

বীজাণু মনুষ্যশরীরের সংক্রান্ত হইয়া কম্পজ্বর উৎপাদন করিতে পারে। স্থূল কথা, যেখানেই স্রোতহীন আবদ্ধ নদী, নালা, ডোবা প্রভৃতি জলাশয় বিদ্যমান, এবং তীরভূমি বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ, সেই খানেই ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং মশক তথায় থা'ক, আর না থা'ক, ম্যালেরিয়াজ্বরের আশঙ্কা তথায় স্বতঃই বিদ্যমান রহিয়াছে। টিরাইর কম্পজ্বর ইউরোপ বাসীদের পক্ষে অতীব সাঙ্ঘাতিক। স্থানীয় অধিবাসীরাও ইহার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় না। তন্মধ্যে কুলীদের দুর্দ্দশাই সর্ব্বাপেক্ষা অতিভীষণ ও রোমাঞ্চকর। বেচারীরা অষ্ট প্রহর জলে ভিজিয়া, রোদে পুড়িয়া উদ্যানে কায করে; এবং পুনঃ পুনঃ জ্বরে ভুগিয়া নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ, দুর্ব্বল ও কাহিল হইয়া, অবশেষে অকালে মানবলীলা সম্বরণ করে।

কুলীরা ঝোপ জঙ্গল কাটিয়া ও আগুনে পোড়াইয়া উদ্যানভূমি পরিষ্কার করে; পরে কোদালি লইয়া কর্ত্তিত গাছের গুঁড়ি ও মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত শিকড়গুলি উৎপাটিত করে। অবশেষে হাল দিয়া ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করে। ক্ষেতে সর্ব্বদাই নব নব ঘাস আগাছা প্রভৃতি শস্যহানিকর আবর্জ্জনা উদ্গত হইতে থাকে। আর দলে দলে কুলী উহা নিড়াইয়া ক্ষেত পরিস্কার রাখে। পরে যখন গাছ বড় হইয়া পাতাগুলি পরিপক্ক হইতে থাকে, তখন পালে পালে কুলী রমণী পরিপক্কপত্র সকল বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ করে, এবং কুলীরা ঝুড়ি ভরিয়া সংগৃহীত পত্রগুলি কুঠিতে আনিয়া জমা করে; আর কুঠির বাবুরা এ সকল সংগৃহীত পত্র ওজন করিয়া বেচারিদের দৈনিক কার্য্য ও মজুরীর হিসাব নিকাশ করে। এইরূপে পত্রগুলি ওজন হইয়া গেলে কুলীরা উহা বহিয়া গুদামে লইয়া যায়, এবং ঘরের মেজেতে কাপড়ের ডালার উপরে বিছাইয়া রাত্রিযোগে বায়ুতে শুকাইতে দেয়। রজনী প্রভাতে অর্দ্ধশুষ্ক পত্রগুলি পুনরায় সংগ্রহ করিয়া রোলিংমেসিন্ বা পাকযন্ত্রে ফেলিয়া অর্দ্ধঘণ্টাকাল রোল্ করে। অনন্তর পত্রানির্গতরসসিক্ত কুঞ্চিত পত্রগুলি যখন যন্ত্র হইতে স্তূপাকারে নির্গত হইতে থাকে, তখন কুলীরা স্তূপ ভাঙ্গিয়া ডালায় সাজাইয়া পুনরায় রৌদ্রশুষ্ক করে। সূর্য্যোত্তাপে fermentation (পাক) আরম্ভ হইলে, পত্রগুলিকে তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করতঃ একটা উত্তপ্ত যন্ত্রে ফেলিয়া কিয়ৎক্ষণ শুষ্ক করে; এবং চালনে বাছিয়া সূক্ষ্ম ও স্থূল পত্রগুলি পৃথক করত, আর একবার রৌদ্রতপ্ত করিয়া, বাজারে বিক্রয়োপযোগী প্যাক্ করিয়া কৌটাবদ্ধ করিয়া গুদামে সাজাইয়া রাখে। চা'র কুঠিতে পাকের ঘরই বেড়াইয়া দেখিতে অতি মনোরম। ঘরখানি চা'র মনোহর সুগন্ধে সর্ব্বক্ষণ পরিপূর্ণ থাকে। চা'র সুগন্ধ এই শেষোক্ত পাকক্রিয়া বা fermentation এর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এজন্য পাকক্রিয়া অতি সাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। পাক (fermentation) আসিবামাত্র অবিলম্বে চাগুলিকে স্থানান্তরে নিয়া উত্তপ্ত যন্ত্রে শুষ্ক করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে তাড়াতাড়ি বাছনি ও প্যাক্ করিয়া রাখা হয়।

শ্রীশ্রীমন্ত সরকার।

---

## প্রয়াণ।

পুঞ্জ পুঞ্জ স্বর্ণ ঢালি'  
  অস্তাচলে তপন মিলায়  
কুঞ্জে কুঞ্জে পুষ্প ঝরে  
  গন্ধ তার বাতাস বিলায়।

বিন্দু বিন্দু ঝরে মেঘ  
  বসুন্ধরা ফল শস্যে সাজে  
কবি যায়—বীণাতার  
  সুখীচিত্তে চিরদিন বাজে।

শ্রীকুলচন্দ্র দে

---

# বাঙ্গালার ইতিহাস। *

বঙ্গ বলিতে প্রাচীন কালে কতটুকু যায়গা বুঝাইত তাহার ঠিক সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন; তবে বর্ত্তমানে আমরা বাঙ্গালা দেশ বলিতে যাহা বুঝি, ৭০০-৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ও তাহা বুঝাইত না, ইহা নিশ্চিত। তখন গৌরব-স্মৃতিপূত বিক্রমপুরকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকের ভূভাগই যে বঙ্গ বলিয়া পরিচিত ছিল তাহা প্রমাণ করা কঠিন নহে। অভিধানে দেখা যায় যে হরিকেল এবং বঙ্গ একই দেশের নামান্তর মাত্র; সেই হরিকেলের রাজলক্ষ্মীর আধার ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুর হইতেই তাম্রশাসন প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। ভবদেব ভট্টের পিতামহ বঙ্গরাজের সচিব ছিলেন এবং ভবদেব নিজে যেই হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন তিনিও বিক্রমপুর রাজ। আর লক্ষ্মণ সেনের পুত্রগণ ত স্পষ্ট করিয়াই "বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে" ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। ই-চিং হরিকেলে কিছুকাল বাস করিয়া গিয়াছেন এবং লিখিয়া গিয়াছেন যে হরিকেল পূর্ব্ব ভারতের পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। রাজা চন্দ্র পূর্ব্বভারতে আসিয়া বঙ্গজয় করেন—সমুদ্র গুপ্তকে প্রত্যন্ত সমতট নৃপতি কর দিতেন। হিউএন সঙ্ কামরূপের দক্ষিণে যাইয়া সমতট পাইয়াছিলেন,—দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমণিপুর বাঙ্গালায় জন্মিয়াছিলেন,—রাজেন্দ্র চোল রাঢ় অতিক্রম করিয়া আসিয়া বড়বৃষ্টি সমাচ্ছন্ন বঙ্গালদেশে গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন,—লক্ষ্মণ সেন সমতট বঙ্গে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাহার পুত্রগণ তথায় আরও প্রায় দেড়শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন অর্থে বঙ্গ ধরিলে—বিক্রমপুরের ইতিহাস বা ঢাকার ইতিহাসকেই বাঙ্গালার ইতিহাস বলিতে হয়। প্রাচীন বাঙ্গালার সীমা যাহাই হউক, তাহা বর্ত্তমান ঢাকা বিভাগের চেয়ে বড় বেশী বড় ছিল বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গ ও সমতট একই দেশ না দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জনপদ তাহা স্থির হয় নাই। আমার বোধ হয়, এই দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি ভিন্ন জনপদ, এক এক যুগে এই ইহুএর এক একটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কালিদাসের রঘু নৌসাধনোদ্যত বঙ্গবাসীগণকে শাসন করিলেন, রাজা চন্দ্র বঙ্গ জয় করিলেন—কিন্তু সমুদ্র গুপ্তের প্রকাণ্ড লিপিতে বঙ্গের নাম পাই না। তাহার পরিবর্ত্তে জানিতে পারি যে সমতট তাহাকে কর দিত। হিউএন সঙের বিস্তৃত ভ্রমণ বৃত্তান্তে বঙ্গের নাম নাই—কিন্তু সমতট তখনও ৫০০০ লি পরিধি বিশিষ্ট পৃথক রাজ্য। পরবর্ত্তীকালে সেঙ্চি সমতটের সিংহাসনে রাজভট্টকে দেখিলেন এবং ই-চিং হরিকেল বা বঙ্গরাজ্যে এক বৎসর বাস করিলেন। সমতট যে কুমিল্লা অঞ্চলের প্রাচীন নাম সে বিষয়ে এখন আর কোনও সন্দেহ নাই। বিক্রমপুরকে কেন্দ্র, করিয়া যদি প্রাচীনবঙ্গের অবস্থিতি নির্দ্দেশ ঠিক হইয়া থাকে তবে বর্ত্তমান চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তরাংশ অর্থাৎ কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা লইয়া সমতট এবং বর্ত্তমান ঢাকা বিভাগ লইয়া বঙ্গ গঠিত ছিল বলিয়া মোটামুটি ধরিতে পারা যায়।

প্রকৃতি দেবী নিজহাতে বেড়া দিয়া সীমা বসাইয়া দেশ গড়িয়া তোলেন, মানুষের ইহাতে খুব বেশী হাত নাই। গারো পাহাড় ঘুরিয়া হিমালয় হইতে ব্রহ্মপুত্র নামিয়া আসিয়াছে, এদিকে আবার বরেন্দ্র ভেদ করিয়া পুনর্ভবা, করতোয়া, মহানন্দা ত্রিস্রোতা ইত্যাদি শীতলনাম্নী নদী সকল আসিয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। এই সকল স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই পূর্ব্ব ভারতের প্রাচীন দেশ সকল গড়িয়া উঠিয়াছে। গারো পাহাড়, ও ত্রিপুরার পর্ব্বত শ্রেণী মধ্যে দাঁড়াইয়া উত্তরদিগে-এক ভাগ পৃথক করিয়া দিল,—হইল তাহার নাম

* ১ম ভাগ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত, ৩২৬ পৃষ্ঠা পুরু এণ্টিকে ছাপা, উত্তম বাঁধাই ৩১ খানি এক রঙ্গের ও বহু রঙ্গের মূল্যবান চিত্র সমন্বিত, ১ম সংস্করণ, মূল্য ২॥০ টাকা।

কামরূপ! গারো পাহাড়ের নিম্নস্থ ভূমি ও ত্রিপুরা পাহাড়ের পশ্চিম ভাগ প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র দ্বারা পৃথক্কৃত হইয়া হইল সমতটের গঠন! পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিমে করতোয়া ও গঙ্গা এই বেষ্টনের মধ্যে বঙ্গদেশ গড়িয়া উঠিল। পূর্ব্বে করতোয়া পশ্চিমে মহানন্দা, এবং দক্ষিণে গঙ্গা লইয়া বরেন্দ্রদেশ ভাগ হইয়া গেল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইভাবে যে সকল দেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদের দিকে মনোযোগ দিয়া চাহিলে দেখা যাইবে যে উচ্চ পর্ব্বত দ্বারা পৃথক্কৃত কামরূপ এবং সমতট বা বঙ্গের মধ্যে সীমা রেখা যেমন স্পষ্ট, শুধু নদীদ্বারা সীমাবদ্ধ সমতট, বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ় ইত্যাদি দেশের মধ্যে সীমা রেখা তেমন স্পষ্ট নহে। তাই দেখিতে পাই যে কামরূপ তাহার সভ্যতা ও রাজবংশ লইয়া চিরদিন পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু সমতট, বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, মগধ ইত্যাদির যে কোনটার মধ্যে যেমনি কোন প্রবল রাজশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা অমনি অবহেলে এই সকল ক্ষুদ্র দেশের সীমা বন্ধনগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া সার্ব্বভৌম শ্রী লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে এবং সমতট বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র মিশাইয়া এক দেশ করিয়া ফেলিয়াছে! সমতট, বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ় ইত্যাদি দেশ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ধরিলে তাহারা নিমেষে নগণ্য হইয়া পড়ে। অবশ্য এই সকল নগণ্য দেশেরও গৌরবময় অতীত যে না আছে তাহা নহে। যে সমতট-বঙ্গ খড়্গ, চন্দ্র, বর্ম্ম, সেন ইত্যাদি রাজবংশের লীলাস্থল,-ধর্ম্মবীর শীলভদ্র, দীপঙ্কর ইত্যাদির জন্মস্থান তাহার গৌরব বোধ করিবার কারণ নাই এমন কথা কেহই বলিবে না। তেমনি বরেন্দ্র রাঢ়ের ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গর্ব্ব করিবার অনেক বিষয় আছে! পূর্ব্ব ভারতের ইতিহাসে এই সকল ক্ষুদ্র দেশের ও গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ ইহাদের ইতিহাস লইয়াইত পূর্ব্ব ভারতের ইতিহাস! কিন্তু সমগ্র ভারতের দিকে যখন দৃষ্টি পড়ে, তখন ক্ষুদ্র সমতট-বঙ্গ-বরেন্দ্র-রাঢ় অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্থান পায়—সমতটের ইতিহাস নহে, বঙ্গের ইতিহাসও নহে,—শুধু সমতট-বঙ্গ-বরেন্দ্র রাঢ়-মিথিলা প্রবল রাজশক্তির অধীন মিলিত হইয়া যখন দুর্ব্বার হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়কার ইতিহাস। তাহাই ভারত ইতিহাসরূপ প্রকাণ্ড বনস্পতির বৃহৎ একটি শাখা,—সমতট ইত্যাদির ইতিহাস তাহার ক্ষুদ্র প্রশাখা মাত্র।

পাল ও সেন বংশের অধীন সমতট-বঙ্গ-রাঢ়-বরেন্দ্র মিথিলায় ধীরে ধীরে এক ভাষা, এক সাহিত্য, এক সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়া উহাদিগকে এক দেশে পরিণত করিতেছিল। কিন্তু তাহাদের আমলেও গৌড় গৌড়ই, বঙ্গ বঙ্গই। এমন সময় মুসলমান আসিয়া তুমুল কোলাহলে গোবিন্দগীতির মদিরামোহ ভাঙ্গিয়া দিল। রাঢ় বরেন্দ্র তাহাদের সম্মুখে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল কিন্তু সমতট-বঙ্গ তখনও মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঠিক কারণ নির্দ্দেশ করা দুষ্কর, কিন্তু বোধ হয় বঙ্গের এই স্বাতন্ত্র্যগৌরবেই ধীরে ধীরে নবাগত যোদ্ধৃগণ বরেন্দ্র রাঢ়, ইত্যাদি নাম ভুলিয়া গিয়া সমস্ত দেশকে "বাঙ্গালা মুলুক" নামে অভিহিত করিতে লাগিল। অবশেষে যখন মোগল সম্রাট্‌গণ সমস্ত দেশটাকে মাপিয়া জুকিয়া সুবাতে ভাগ করিয়া ফেলিলেন—তখন পূর্ব্বাংশের নাম হইল "সুবে বাঙ্গালা" এবং ইংরেজগণ আসিয়া তাহাকে বেঙ্গল নামে পরিচিত করিয়া তুলিলেন। ভারতের পূর্ব্বাংশের ইতিহাস লিখিতে হইলে এখন তাহার নাম বাঙ্গালার ইতিহাস বা History of Bengal ই হইয়া থাকে এবং তাহাই হওয়া উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র বড়ই দুঃখে আদেশ করিয়াছিলেন "আমাদের ইতিহাস নাই, ইতিহাস লিখিত হউক।" আর সেদিন অক্ষয়চন্দ্র আবেদন করিয়াছেন—"ইতিহাস যদি লিখিত হয় ত যথাযোগ্য ভাবে লিখিত হউক।" বঙ্কিমচন্দ্রের আদেশের প্রভাবে দেশে রাতারাতি ইতিহাস নির্ম্মাণের চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই যে সকল বিদেশী লিখিত বিকৃত ইতিহাস পাঠে ক্ষুব্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র উক্তরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদেরই অনুবাদ, মর্ম্মানুবাদ ও অবলম্বনে লিখিত ইতিহাসে বাঙ্গালা দেশ ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু

আমাদের দেশের মহা সৌভাগ্য যে এই সকল ফরমাইসি ইতিহাস লেখকগণের সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্প সংখ্যার একদল প্রকৃত কর্ম্মী ও জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, যাঁহারা দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের অতীতান্ধকারকে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিলেন। তাঁহারা উর্দ্ধশ্বাসে বাঙ্গালা দেশের অথবা ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে ছুটেন নাই সত্য কিন্তু একমনে বসিয়া অশেষ পরিশ্রমের সহিত এক এক খানি ইষ্টক গড়িয়া তুলিতেছিলেন, যাহার দ্বারা ভবিষ্যতে প্রকাণ্ড ইতিহাসের প্রাসাদ গাঁথিয়া তোলা সম্ভবপর হইয়াছে।

এই সকল কর্ম্মী জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন এবং করিতেছেন বলিয়াই সেদিন শ্রদ্ধেয় মৈত্রেয় মহাশয় সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন যে শুধু ইতিহাস চাই না,—যথা যোগ্য ভাবে লিখিত ইতিহাস চাই। ইহা যে শুধু মৈত্রেয় মহাশয়ের আবেদন তাহা নহে ইহা ইতিহাসপ্রিয় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির আবেদন—ইহা সমগ্র দেশের আবেদন,—শুধু মৈত্রেয় মহাশয়ের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে মাত্র। ছেলেখেলার ইতিহাস লইয়া দেশের আর তৃপ্তি বোধ হইতে ছিল না,—"যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভুলাতে।"—এই ভাবে আর দেশের নব-জাগ্রত মন ভুলিতে চাহিতেছিলনা, তাই দেশের অন্তরে অন্তরে আবেদন জাগিয়া উঠিতেছিল যে খাঁটি জিনিস চাই। অধুনা প্রত্নতত্ত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিককে বিদ্রূপ করা একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বিদ্রূপকারিগণ ভুলিয়া যান যে অভাববোধ হইতেই উৎপত্তি হইয়া থাকে। নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ আকুল হইয়া দেশের অতীত গৌরবের কথা, দেশের লুপ্ত ইতিহাস শুনিতে চাহিতেছিল এবং এমন ভাব দেখাইতেছিল যে নকলে,—যা-হয়-একটা-কিছুতে সে ভুলিবে না। খাঁটি ইতিহাস চাই। কিন্তু খাঁটি ইতিহাস ত পুথির পাতায় নহে, জন প্রবাদেও নহে,—তাহা যে মাটির নীচে যাইয়া আত্মগোপন করিয়াছে! তাই দেখিতে দেখিতে দেশ সাহিত্য-পরিষদে ও সাহিত্য-সমাজে ছাইয়া গেল, যাহারা রাজধানীর বিজলীব্যজনযুক্ত গ্রন্থাগারে বসিয়া পুথির পাতার মধ্যে ইতিহাস উদ্ধারের সুখ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তাহাদের অনেকেই পুথিপত্র ফেলিয়া খনিত্র হস্তে মাঠে মাঠে বাহির হইয়া পড়িলেন। ফলে আমরা এমন জিনিস পাইয়াছি ও পাইতেছি যাহা দেশের ইতিহাস ক্ষুধা মিটাইতে পরিতেছে, এবং কোন কোনটায় আকণ্ঠ ভোজনের উপকরণ ও বিস্তদান।

গৌড়রাজমালা যখন বাহির হইল তখন এদিক হইতে আমরাই প্রথম আনন্দধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিলাম, গ্রহবৈগুণ্যে তাহা কাহারও কাহারও কাণে অন্যরূপে গিয়া বাজিয়াছিল। আজ রাখাল বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাসকে আমরা তেমনি নিঃসঙ্কোচ আনন্দ অভ্যর্থনা জানাইতেছি। আমাদের স্বল্পজ্ঞান বুদ্ধিতে যাহা লইয়াছিল সেই মতে গৌড়রাজমালার ত্রুটি বিচ্যুতি দেখাইয়াছিলাম,—অমন মূল্যবান্ গ্রন্থ খানিকে পরবর্ত্তী সংস্করণে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখিবার জন্য;—রাখাল বাবুর পুস্তক আলোচনা কালে ও হয়ত স্থানে স্থানে মতভেদ প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইব। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া রাখিতেছি যে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস আর বাঙ্গালা ভাষায় বাহির হয় নাই এবং ভিন্সেণ্ট স্মিথের ভারত ইতিহাস, গৌড়রাজমালা ও গৌড়লেখমালার পরে এমন সদা জাগ্রৎ ঔৎসুক্য ও আনন্দ লইয়া আর কোন ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ এপর্য্যন্ত পড়ি নাই।

পুস্তক খানির বহিঃসৌষ্ঠব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে; সুন্দর বাঁধাই, ভাল কাগজ, ৩১ খানা মূল্যবান একবর্ণ ও বহুবর্ণে মুদ্রিত ছবি এবং পরিপূর্ণ নাম-সূচী (Index) বা নির্ঘণ্ট। দ্বাদশ অধ্যায়ে পুস্তক সমাপ্ত; অধ্যায় গুলিতে যথা ক্রমে ২২, ২৬, ৩৮, ৯৭, ৮৭, ৪৮, ৯৩, ৯০, ৯৬, ১১৪, ৭৫, ও ৫৭ সংখ্যক নির্দ্দেশিকা (reference) আছে। যে সমস্ত আলোচনার যোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যাবলি পুস্তকের অভ্যন্তরে গৃহীত হইতে পারে নাই, তাহা ১ম ও শেষ অধ্যায় ব্যতীত আর সমস্ত অধ্যায় শেষে পরিশিষ্টে আলোচিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ে বাঙ্গালা দেশের প্রাগৈতিহাসিকযুগের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে প্রত্নপ্রস্তর

যুগ ( Palæolithic Age ) নব্যপ্রস্তরযুগ ( Neolithic Age ) এবং তাম্র যুগের কি কি নিদর্শন কোথায় কোথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়। দেখা যায় যে প্রস্তর যুগের নিদর্শন সমূহ অধিকাংশ ই পর্ব্বত সন্নিহিত বাঙ্গালার সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে পাওয়া গিয়াছে; বাঙ্গলার সমতল ক্ষেত্রে উহা বড় বেশী পাওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আলোচনার বিষয় বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ও আর্য্যবিজয়। খৃষ্ট জন্মের দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে লৌহ আবিষ্কার করিয়া স্ববলে বলীয়ান আর্য্যগণের এক শাখা কিরূপে ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড়গণকে জয় করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিয়াছিলেন তাহারই একটি সুশৃঙ্খল বিবরণ এই অধ্যায়ে দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে বেলুচীস্থানের প্রাচীন অধিবাসী ব্রাহুই জাতি ও বাবিরুষের অধিবাসিগণের সহিত ভারতের দ্রাবিড় জাতির সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। উপকরণ অভাবে যে এই বিবরণ সম্পূর্ণ যাতসহ হইয়া উঠে নাই তাহা লেখক মুখবন্ধেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন বস্তুতঃ ভারতে মাত্র একটি বাবিরুষির শীল ও দুই একটি বাবিরুষের ধরণের সমাধির আবিষ্কার হইতে প্রাচীন বাবিরুষের সহিত ভারতের দ্রাবিড়গণের সম্বন্ধ সংস্থাপন চেষ্টা অনেকটা কাল্পনিক হইতে বাধ্য। নৃতত্ব বিদ্যা যাহার আভাস দিয়া যায়, প্রত্নতত্বের প্রবল প্রমাণে তাহা ভালরূপ সমর্থিত না হইলে সেই তথ্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয় মৌর্য্যাধিকার ও শকাধিকার। বাঙ্গালা দেশে মৌর্য্য ও শকাধিকারের বড় বিশেষ চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। বাঁকুড়া শুশুনিয়া পাহাড়ে চন্দ্রবর্ম্মার খোদিত লিপি আছে, তাহার বিবরণ দিয়া এই অধ্যায় শেষ হইয়াছে। লেখক মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীর মত অর্থাৎ শুশুনিয়া গিরিলিপির চন্দ্রবর্ম্মা ও দিল্লী মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভের রাজা চন্দ্র যে এক ও অভিন্ন এই মত—গ্রহণ করিয়াছেন এবং সমুদ্রগুপ্তের এলাহবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্ত উত্তরাপথের চন্দ্রবর্ম্মা নামক এক নৃপতিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন এইরূপ উল্লিখিত দেখিয়া শুশুনিয়া ও মেহেরৌলির চন্দ্রের সহিত তাহার অভিন্নত্ব দৃঢ়তা সহকারে প্রচার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য শুধু নামসাদৃশ্যে অভিন্নত্ব প্রচার ঘাতসহ হয় কি না সন্দেহ। বঙ্গ বিজয়ী ও সিন্ধুর সপ্তমুখ উত্তীর্ণ হইয়া বাহ্লীক বিজয়ী রাজা চন্দ্র, সমুদ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক বিজিত উত্তরাপথের বহু নরপতির নামের মধ্যে অবিশেষিত নামা চন্দ্রবর্ম্মা না ও হইতে পারেন।

পরবর্ত্তী ৪র্থ পরিচ্ছেদে গুপ্তাধিকার কালের সুন্দর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে যতদিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন বাঙ্গালা দেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ ধরিয়া নেওয়া সম্ভবপর হয় না। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে হইলে গুপ্তাধিকার সম্বন্ধে যাহা লিখিতে হইত বাঙ্গালার ইতিহাসের বেলায় ও প্রায় অবিকল তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু সংক্ষিপ্তাকারে। কুমারগুপ্তের রাজত্ববর্ণনা প্রসঙ্গে রাখাল বাবু অনেক নূতন কথা শুনাইয়াছেন এবং বঙ্গ ও মগধের কোথায় কোন্ গুপ্তরাজার কি কি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার এক মূল্যবান্ ও কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ প্রত্যেক রাজার রাজত্ববর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করিয়াছেন। বৈস্কুকী লিপি উৎকীর্ণ যে বুদ্ধমূর্ত্তিটির বর্ণনা দিয়া অধ্যায় শেষ হইয়াছে তাহাকে গুপ্ত যুগের শিল্প নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করা অসমীচীন হইয়াছে। লিপিতত্ত্ববিশারদ রাখাল বাবু বোধ হয় বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এই মূর্ত্তি পৃষ্ঠস্থ লিপিকে গুপ্তযুগের বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনুরূপ কয়েকখানি বুদ্ধমূর্ত্তি আমরা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আবিষ্কৃত করিয়াছি, একখানি ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই সকল মূর্ত্তি ৯ম ১০ম শতাব্দীর ঐ দিকে যাইতে পারেনা বলিয়া আমাদের ধারণা; লিপিটিও সেই সময়ের বলিয়াই বোধ হয়।

৫ম অধ্যায়ে মগধের গুপ্তরাজবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মগধের গুপ্তরাজবংশের সুশৃঙ্খল বিবরণ পূর্ব্বে আর ভাল করিয়া কেহ দেন নাই। কাজেই রাখালবাবুর পুস্তকের এই অধ্যায় অত্যন্ত উপভোগ্য

ও সাবধানে আলোচ্য। স্থানে স্থানে একটু অনবধানতার পরিচয় থাকিলেও এই অধ্যায় মোটের উপর যোগ্যতার সহিত লিখিত। অনবধানতা যথা :—৭ পৃষ্ঠা ৯ম পংক্তি—ফরিদপুরের তাম্রশাসন গুলিকে কূটশাসন বলা হইয়াছে। এগুলি কূটশাসন বলিয়া রাখালবাবু ভিন্ন অন্য কাহারও ধারণা আছে কি না জানিনা, কিন্তু কূটশাসন নয় বলিয়া অনেকের ধারণা আছে, এইরূপ জানি। রাখাল বাবু ও এই সংশয়ের হেতুবাদে এই দলিল গুলি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করেন নাই বলিয়া পরিশিষ্টে উল্লেখ করিয়াছেন। এই অবস্থায় সহসা গ্রন্থমধ্যে "এই তাম্রশাসন কয়খানি কূটশাসন" এইরূপ নিশ্চয়াত্মক বাক্যের আবির্ভাব অনবধানতা বলিয়াই মনে করি।

৭৭ পৃষ্ঠায় ১২—১৩ লাইনে আদিত্যবর্ম্মা আদিত্য বর্দ্ধন হইবে।

৯০ পৃষ্ঠায় ভাস্কর বর্ম্মার নিধানপুর শাসনের কথা আলোচিত হইয়াছে। কামরূপরাজ ভাস্কর বর্ম্মার কর্ণসুবর্ণ বাসক হইতে তাম্রশাসন প্রদান বাস্তবিকই একটু রহস্যময়। কর্ণসুবর্ণ যে স্থায়ীভাবে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বদিক হইতে হর্ষবর্দ্ধনকে সাহায্য করিতে আসিয়া কামরূপরাজ কিছুদিনের জন্য কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, রাখালবাবুর এই অনুশাসনই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু রাখাল বাবু যে বলিয়াছেন যে স্কন্ধাবার বা বাসক শব্দে রাজধানী বুঝায় না তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না, বরং তাহার বিপরীত প্রমাণই পাওয়া যায়। কর্ণসুবর্ণ কিছুকালের জন্য কামরূপরাজের পূর্ব্বদিকের রাজধানী ছিল বলিয়াই মনে হয়।

শশাঙ্কের ইতিহাস উদ্ধার করিতে রাখালবাবু এই অধ্যায়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। দুই তিন স্থানে অনুমানের আশ্রয় লইয়া থাকিলেও এবং সেই সকল অনুমান তাঁহার লিখিত উপন্যাসে সত্যঘটনা রূপে স্থান পাইয়া থাকিলেও শশাঙ্কের বিবরণ অত্যন্ত সুলিখিত।

৯৫ পৃষ্ঠার শেষাংশে লিখিত আছে যে হর্ষবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়া তাহার মন্ত্রী অর্জ্জুন কান্তকুব্জের সিংহাসন অধিকার করেন। হর্ষবর্দ্ধনের হত্যার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে কি ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে হর্ষবর্দ্ধনের পতন ও গোপালের উত্থানের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে ও ভারতবর্ষে যে অরাজকতা বিরাজ করিয়াছিল তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই অধ্যায় মধ্যে বসু মহাশয়ের প্রতিপাদিত জয়ন্ত ও আদিশূরের অভিন্নত্ব খণ্ডন করিতে যে বাগ্‌বিতণ্ডা স্থান পাইয়াছে তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইলেই ভাল হইত। আদিশূর ও জয়ন্তের অভিন্নত্বে এখন কেহই বিশ্বাস করেন না; ইহা লইয়া অতখানি স্থান জুড়িবার কোনই আবশ্যকতা ছিল না।

বঙ্গে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলের পূর্ব্বপুরুষগণের আগমনের মূলে একজন রাজা সংশ্লিষ্ট আছেন কুলগ্রন্থ তাহাকে আদিশূর নামে অভিহিত করে। আদিশূরের অস্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোনও কারণ নাই, তবে আদিশূরের পরিচয় অদ্যাবধি অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। নূতন আবিষ্কারের আলোক না পড়িলে এক্ষেত্রের অন্ধকার দূর হওয়া দুরূহ এবং না হওয়া পর্য্যন্ত এ পক্ষ ও পক্ষ কোন পক্ষেই জোর করিয়া কথা বলা নিরাপদ্ নহে।

কুলদোষে প্রাপ্ত—

> ক্ষত্রিয়বংশে সমুৎপন্নো মাধবকুলসম্ভবঃ।
> বসু ধর্ম্মাষ্টকে শাকে নৃপোঽ ভু চ্ছাদিশূরকঃ॥

শ্লোক দেখিয়া মনে হইতেছে ক্ষত্রিয় মাধবগুপ্তের ছেলে, প্রস্তরলিপি খোদিতে গৌড়শিল্পিনিয়োগকারী এবং খুব সম্ভবতঃ গৌড়রাজ—আদিত্যসেনকে কুলগ্রন্থকারগণ আদিশূর বলিয়া লিখিয়া যান নাই ত ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের (ঙ) চিহ্নিত পরিশিষ্টে কুলশাস্ত্র সমূহের ঐতিহাসিক প্রমাণের মূল্য আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার এই মত প্রকাশিত করিয়াছেন যে কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুলি বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ যেখানেই সমসাময়িক অকাট্য খোদিত লিপির সাহায্যে কুলশাস্ত্র সমূহের বিবরণ পরীক্ষা করিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি সেই সেই স্থানেই উপর্য্যুপরি তাহাদের গলদ বাহির হইয়া পড়ায় কুলশাস্ত্রের উপর অনে-

কেরই আস্থা টলিয়া গিয়াছে। শ্যামল শস্প দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত গাভী যেরূপ তাহার দিকে ধাবিত হয় বাঙ্গালার ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস লিখিবার ব্যস্ততায় লোলুপ হইয়া তুলট কাগজে লিখিত অসংখ্য সহজলভ্য কুল-গ্রন্থের দিকে তেমনি ছুটিয়া চলিয়াছিলেন। এখন সেই গতির বেগ কমাইতে হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

এই পরিশিষ্টে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার আবিষ্কারে কিরূপে ঘটক কারিকা সকল এবং দেববংশ নামক নবাবিষ্কৃত কুলগ্রন্থ অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে সেই বিষয়ের আলোচনা আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়া রাখি যে রাখাল বাবু এবং সতীশ বাবু দনুজ-মর্দ্দনের মুদ্রায় যাহা চন্দ্রদ্বীপ পড়িতে চাহেন শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন্ তাহা চাটিগ্রাম পড়িতেছেন এবং বলিতেছেন যে চন্দ্রদ্বীপ পাঠ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এই দনুজমর্দ্দনের মুদ্রার আবিষ্কার ঐতিহাসিক আবিষ্কারতরঙ্গের এক অদ্ভুত বিভঙ্গ! রাজা কংসের পরে যে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্র দেব বাঙ্গালা দেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এ কথা একেবারে গোপন করিয়া গিয়াছেন। সহসা পাঁচশত বৎসর পরে দনুজ-মর্দ্দনের স্মৃতি যেন মাটি ফুড়িয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এত দিন চলিয়া গেল, ইহার মধ্যে দনুজমর্দ্দন বা মহেন্দ্র কাহার ও কোন মুদ্রা বা অন্য কোন অস্তিত্বের প্রমাণ বাহির হইল না—এমন কি কুলগ্রন্থের প্রমাণ ও না। সহসা পাণ্ডুয়ায় দুই মুদ্রা বাহির হইল ও রাখেশ বাবু রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তাহার বিবরণ দিলেন। পরে বাহির হইল খুলনা হইতে দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা এবং তাহার অব্যবহিত পরেই ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার সীমায় স্থিত কোন গ্রাম হইতে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্র দেবের অনেকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। পরে দেববংশ আবিষ্কৃত হওয়ায় দেখিতে দেখিতে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্র দেবের ব্যাপার বিশেষ ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে। রাখেশ বাবুর মুদ্রা দুইটি দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের নিকট দেখিয়াছিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদে পালবংশের অভ্যুদয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। একখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতায় ধর্ম্মপালকে রাজভটাদিবংশপতিত লিখিত দেখায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুমান করেন যে এই রাজভট পূর্ব্ববঙ্গের খড়্গ বংশের রাজভট হইতে পারেন। নগেন্দ্র বাবুর পূর্ব্বে আমিও ১৯১২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে এসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠার্থে শ্রীযুক্ত জষ্টিস্ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে অর্পিত এক প্রবন্ধে অনুরূপমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু রাখাল বাবুর মতে খড়্গ বংশের রাজভট্ট ধর্ম্মপালের পরবর্ত্তী। ১৪১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে অক্ষর তত্ত্বের বিচার দ্বারা তিনি যথাস্থানে তাঁহার মত সমর্থন করিবেন। কিন্তু যথাস্থানে, অর্থাৎ ২০৭ পৃষ্ঠায় খড়্গ-বংশের বিবরণের স্থানে সেই বিচার না দেওয়াতে পুস্তকে অসঙ্গতিদোষ ঘটিয়াছে।

এই অধ্যায়ে গোপাল ও ধর্ম্মপাল দেবের রাজত্বের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

১৭৪ পৃষ্ঠায় ১৫ পংক্তিতে উল্লিখিত ভগবান্ নন্ন নারায়ণ খুব সম্ভবতঃ ভগবান্ অনন্ত নারায়ণ হইবে। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনের পাঠ প্রকাশকারিগণ কেহই এই ভুলটুকু ধরিতে পারেন নাই। অনন্ত নারায়ণ প্রতিষ্ঠা প্রাচীনকালে খুব প্রচলিত ছিল। লোকনাথ ত্রিপুরা শাসনে অনন্ত নারায়ণ প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি দিয়াছেন। ভবদেব ভট্ট একাম্রকাননে অনন্ত নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদে দেবপাল দেবের রাজত্ব হইতে কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির হাতে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পরাজয় ও পাল সাম্রাজ্যের পতন পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ যোগ্যতার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অধ্যায়ে অনেক নূতন কথা ও নূতন শিলালিপি ইত্যাদির প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে।

নারায়ণ পালের ৫৪ রাজাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত ধাতুময়ী মূর্ত্তি খানি—১৯৭ পৃষ্ঠার পরে যাহার চিত্র দেওয়া হইয়াছে—তাহা যে পার্ব্বতী মূর্ত্তি তাহার কোন প্রমাণ আছে কি? থাকিলে উল্লেখ করা উচিত ছিল। কারণ মূর্ত্তিতত্ত্বের

আলোচনা বঙ্গদেশে অত্যন্ত কম, এ অবস্থায় অপরিচিত নূতন মূর্ত্তির একটা নাম দিতে হইলে বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদান করিয়া নামকরণ করা উচিত। ঢাকা যাদুঘরে এই ধরণের একখানা মূর্ত্তি আসিয়াছে। শিশু-কোলে যোগাসনে উপবিষ্টা স্ত্রী মূর্ত্তি, চারিহাতের এক হাতে একটি মৎস্য। নীচে বাহনের অভাব দেখিয়া বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। রাখাল বাবুর পুস্তকে প্রকাশিত মূর্ত্তিখানাও "দেয় ধর্ম্মোয়ং" ইত্যাদি বলিয়া দান করা হইয়াছে দেখিয়া বৌদ্ধ মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়।

আর একটি বিষয় এখানে আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। "কুঞ্জর ঘটা" বর্ষে কম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি বাণগড়ে শিবমন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ বাবু এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এবং পরে গৌড়রাজমালায় উহাকে ৮৮৮ শকাব্দ ও ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। রাখালবাবু ও ২১৫ পৃষ্ঠায় ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু ২০৫ পৃষ্ঠায় সেই মতই গ্রহণ করিয়াছেন দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু কুঞ্জর ঘটা শব্দ যে ৮৮৮ বুঝায় তাহার প্রমাণ কি? যতদূর জানি, এই বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ কোথাও উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। কাজেই এই ৮৮৮ শকাব্দা কে অতিশয় সাবধানতার সহিত গ্রহণ করা উচিত।

কাম্বোজ প্রদেশের অবস্থান নিয়া মতভেদ আছে। কাম্বোজ প্রদেশের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টার প্রতিভায় এক বিস্তৃত প্রবন্ধ বাহির হইতেছে।

অধ্যায় শেষে খড়্গ বংশের প্রসঙ্গ আছে। রাখাল বাবু অনুমান করিয়াছেন যে নারায়ণ পালের পরে পালবংশের অবনতির সময় পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে বিশেষ প্রবল প্রমাণ ভিন্ন এই মতবাদ গ্রহণ করা কঠিন।

৯ম পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্য অর্থাৎ মহীপালের পিতৃরাজ্য উদ্ধার হইতে বিগ্রহ পালের পরে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ নিপুণতাবে আলোচিত হইয়াছে। যে কয়টি বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আছে, লিখিতেছি।

২১ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্টন্ প্রদত্ত যে অপ্রকাশিত প্রবন্ধের প্রুফ হইতে পালরাজগণের সমতটে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণের বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে তাহা খুব সম্ভবতঃ আমরই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ, সোসাইটির পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

বাণগড়স্তম্ভলিপিতে কাম্বোজান্বয় গৌড়পতির নামোল্লেখ নাই—ইহা একটু বিস্ময়ের বিষয় বটে। রাখাল বাবু লিখিয়াছেন—"ইহা হইতে অনুমান হয় যে বিদেশীয় ও বিজাতীয় গৌড়েশ্বর শিবোপাসক হইলেও গৌড়রাজ্যে তাহার নাম সুপরিচিত হয় নাই।" এই যুক্তি ও অনুমান অত্যন্ত দুর্ব্বল; যাহারা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল বা লিপিটি খোদিয়াছিল, তাহারা দেশের রাজার নাম জানিত না, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। প্রকৃত কথা বোধ হয় এই যে লিপিটি বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপির মত authorised লিপি অর্থাৎ রাজার আদেশ অনুযায়ী খোদিত ও মন্দিরে সংযুক্ত লিপি নহে। যদি তাহা হইত তবে, ইহা বড় প্রস্তরফলকে খোদিত হইয়া মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের উপরে সংলগ্ন থাকিত এবং পাওয়া গেলে বীরদেব প্রশস্তির মত ভবদেব ভট্টের প্রশস্তির মত বা দেওপাড়া লিপির মত বিচ্ছিন্ন আকারে পাওয়া যাইত। এই লিপিটি মন্দিরের শিল্পী অথবা মন্দিরের পুরোহিত অথবা অনুরূপ অন্য কোন ব্যক্তি রাজপ্রসাদ কামনায় মন্দিরের একটি স্তম্ভের পাদদেশে খোদাইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে; গৌরবে রাজার নাম ধরিয়া উল্লেখ না করিয়া তাহার বংশ ধরিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে!

এই রাজার নাম বাণ নয় ত? পৌরাণিক বাণের বাড়ী শোণিতপুরে ছিল বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তাই দিনাজপুরের বাণগড় কোন ঐতিহাসিক বাণের হওয়াই সম্ভব। বাণগড়ে, করদাহ পরগণা, উষার বাড়ী, উষার খাড়ী ইত্যাদি পৌরাণিক বাণের কাহিনী সংশ্লিষ্ট স্থান লোকে নির্দ্দেশ করে। কিন্তু এই লোক প্রবাদ কত প্রাচীন তাহার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক।

২১৮ পৃষ্ঠায় ১৩শ পংক্তিতে মহীপালের বাণগড় শাসন তাহার নবম রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত বলিয়া উল্লিখিত

হইয়াছে। বাণগড় শাসনের রাজ্যাঙ্ক নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়াই জানি, রাখাল বাবু নব রাজ্যাঙ্ক কোথায় পাইলেন?

৯ম অধ্যায়ের পরিশিষ্টে শূররাজ বংশের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আলোচনার সিদ্ধান্ত এই "আদিশূর নামক কোন রাজার রাজ্যকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন ঘটিয়াছিল এই প্রবাদের উপরে নির্ভর করিয়া কুলাচার্য্যগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়াই বোধ হয়; কারণ শ্যামলবর্ম্মার প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইয়াছে যে, কুলশাস্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় সত্যের উপর স্থাপিত। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া প্রমাণ হইয়াছে যে শ্যামলবর্ম্মা বিজয় সেনের পুত্র নহেন বটে কিন্তু শ্যামলবর্ম্মা নামে বঙ্গদেশে একজন প্রকৃত রাজা ছিলেন।" (২৪৪ পৃষ্ঠা)

এই সিদ্ধান্তের পূর্ব্বাংশের সহিত যে আমরা একমত তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। শেষাংশে গুরুতর অসঙ্গতি দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ শ্যামলবর্ম্মার প্রসঙ্গে রাখাল বাবু বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে কুলশাস্ত্রগুলি একেবারে অবিশ্বাস্য। তাই এইখানে রাখাল বাবুকে কুলশাস্ত্রগুলি সুদৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবম্প্রকার বাক্য বলিতে দেখিয়া পাঠক ও এক বিষম আছাড় খাইবেন বলিয়া বোধ হয়। রাখাল বাবু অসাবধানতায়ই হঠাৎ এরূপ কোমল ভাবাপন্ন হইয়াছেন বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ কুলশাস্ত্রের ভিত্তি অধিকাংশ স্থলেই ঐতিহাসিক সত্য নহে, ঐতিহাসক জনপ্রবাদ। দশম পরিচ্ছেদে পালবংশের অধঃপতন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে বর্ম্মবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে পরিচিত পূর্ব্ববঙ্গের দুইটি রাজবংশের বিষয় ও আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গের এই সময়কার ইতিহাস উপযুক্ত উপাদান অভাবে এখনও সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে এমন ইতিহাস আলোচক নাই যিনি এই সময়ের ইতিহাসের বিষয়ে কিছু-না-কিছু না লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের সমবেত চেষ্টায়ও ইতিহাস সংশয়মুক্ত হইয়া বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাখাল বাবুও এই অধ্যায়ে নূতন আলোক বিশেষ কিছু দিতে পারেন নাই। তবে চন্দ্রবংশ বর্ম্মবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া তাঁহার যে সিদ্ধান্ত তাহা টিকিয়া যাইবে বলিয়াই বোধ হয়। এই অধ্যায় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

২৪৬ পৃষ্ঠা—৪—৬ লাইনে বলা হইয়াছে যে বিক্রমপুরের বর্ম্মদের আদিপুরুষ বজ্রবর্ম্মা রাজেন্দ্র চোল, দ্বিতীয় জয় সিংহ অথবা গাঙ্গেয়দেবের সহিত পূর্ব্ব ভারতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিশ্চয়াত্মক বাক্যের কোন ভিত্তি আছে বলিয়া জানি না। বেলাব তাম্রশাসনের বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে বজ্রবর্ম্মা একজন adventurer, freelance প্রকৃতির যোদ্ধা ছিলেন; যাহার সঙ্গে মিশিতেন তাহার আনুকূল্য করিতেন এবং যে তাহার শত্রুতা করিত তাহার শমনস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেন। (শমনইব রিপূণাং সোমবৎ বান্ধবানাং) তিনি পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এমন কোন কথা তাম্রশাসনে নাই। তাহার পুত্র জাতবর্ম্মা কর্ণের কন্যা বীরশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, জাতবর্ম্মায় প্রশস্তি সূচক শ্লোকের প্রথমাংশেই বীরশ্রীর সহিত তাহার পরিণয়ের উল্লেখ দেখিয়া এই কথা অনুমিত হয়। জাত বর্ম্মার পুত্র সামল বর্ম্মা কে প্রথম মঙ্গল নামধেয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় তিনিই প্রথম স্বাধীন রাজা হন।* এখন কথা হইতেছে এই যে বর্ম্মবংশে হরিবর্ম্মের স্থান কোথায়? বিনোদবাবুর মত এই যে হরিবর্ম্মের পুত্রের হাত হইতে সামল বর্ম্মা বিক্রমপুর কাড়িয়া লইয়াছিলেন, অথবা পাইয়াছিলেন। ইহা খুব যুক্তি সঙ্গত অনুমান। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সেদিন আমাকে বলিয়াছেন† যে হরিবর্ম্মের তাম্রশাসনে হরিবর্ম্মের পিতার নাম যে তিনি জ্যোতির্ব্বর্ম্মা পাঠ করিয়াছিলেন তাহা খুব সম্ভবতঃ জাত-

---

* রাজসাহীর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় এই মতের প্রবর্ত্তক এবং আমরা ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। লেখক

† তিনি তাঁহার নবপ্রকাশিত রাজন্যকাণ্ডেও এই মতই প্রকাশিত করিয়াছেন।

বর্ম্মা হইবে। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, তাম্রশাসন খানি তিনি যাহার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন তাহাকেই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কেহ উদ্যোগী হইয়া যদি মূল তাম্রশাসন খানি আনাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন তবে এক মুহূর্ত্তে হরিবর্ম্মা জাতবর্ম্মার ছেলে কিনা মীমাংসা হইয়া যায় এবং মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে অনর্থক কথার কাটাকাটি থামিয়া যায়।

কুল গ্রন্থের শ্যামলবর্ম্মার বিবরণে দেখা যায় বিজয় সেনের মল্ল ও শ্যামল নামে দুই পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ মল্লকে পিতৃসিংহাসনে আসীন দেখিয়া শ্যামল দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয় এবং বিক্রমপুর জয় করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

হরি বর্ম্মা যদি জাতবর্ম্মার ছেলে হয় তবে বুঝাযায় যে বিশৃঙ্খল ঐতিহাসিক প্রবাদ কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে কুলগ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। ঠিক ঐতিহাসিক ব্যাপার হইয়াছিল বোধ হয় এই:—জাত বর্ম্মার হরি ও শ্যামল নামে দুই পুত্র ছিল। হরিকে সিংহাসনে আসীন দেখিয়া শ্যামল দেশ বিজয়ে বহির্গত হয় এবং পরে হরির ছেলের হাত হইতে হয় কাড়িয়া, না হয় উত্তরাধিকারীর অভাবে বিক্রমপুরের সিংহাসন লাভ করে। পালবংশে কুমার পাল ও মদন পালের কালে ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

রামপালের বরেন্দ্রী উদ্ধার কাহিনী সম্পূর্ণ রামচরিত অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে, উত্তম হইয়াছে। রাখালবাবু লিখিয়াছেন (২৭৩ পৃষ্ঠা ১ম লাইন) যে রামপালের সঙ্গে কৈবর্ত্তরাজের কোথায় যুদ্ধ হইয়াছিল রামচরিতের টীকা হইতে তাহা জানা যায় না। স্থানীয় অনুসন্ধানে যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিলাম।

দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাট সবডিভিসনে পাল-রাজগণের বহু কীর্ত্তিচিহ্ন অবস্থিত। বালুর ঘাটের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রায় ১৪ মাইল দূরে ধীবর দীঘি বা দিবর দীঘি অবস্থিত। এই বৃত্তাকার দীঘীর ঠিক মধ্যেই নাগ কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে প্রকাণ্ড প্রস্তর স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত। গৌড় রাজমালায় ইহার চিত্র দেওয়া হইয়াছে। বালুরঘাট হইতে যে প্রাচীন রাস্তা ভাট-শালা মহীসন্তোষ ইত্যাদির নিকটে ডাঙ্গিঘাট নামক ঘাটে আত্রেয়ী নদী অতিক্রম করিয়া সোজা পশ্চিমে গিয়া একেবারে গঙ্গায় ঠেকিয়াছে এবং গঙ্গা অতিক্রম করিয়া রাঢ়দেশে প্রবেশ করিয়াছে ধীবর দীঘি তাহার উপরেই অবস্থিত। এই রাস্তা যে হিন্দু আমলের তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই রাস্তার উপরেই আগ্রাদুগুনের প্রকাণ্ড স্তূপ ইত্যাদি অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

অক্ষয় বাবু, রামপ্রসাদ বাবু ইত্যাদির মতে এই ধীবর দীঘি বা দিবর দীঘি কৈবর্ত্তরাজ দিব্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দীঘি। এই অনুমান সম্ভবপর, যদিও একেবারে ঠিক করিয়া কিছু বলা যায় না; কারণ নামটি ছাড়া আর কোন প্রমাণই নাই। স্তম্ভটির গায়ে কোন লেখা থাকিতে পারে কিন্তু স্তম্ভের নিম্নভাগ সারা বৎসর জলে নিমজ্জিত থাকায় সহজে তাহা নির্ণীত হইবার উপায় নাই এবং কেহ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া ও শুনি নাই। * ধীবর দীঘির চারিদিকে বহুদূর মধ্যেও দুই এক ঘরের বেশী কৈবর্ত্ত নাই। তাহাদের নিকট বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তাহাদের পূর্ব্ব গৌরবের কোন প্রবাদ ও তাহারা জানে বলিয়া অবগত হইতে পারিনাই।

ধীবর দীঘি যদি কৈবর্ত্তদেরই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তবে তাহারই নিকটে ভীমের ডমর বা উপপুর রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান করিতে হইবে। অনুসন্ধানে আমরা নিকটেই উপপুরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাইয়াছি। রাস্তার দক্ষিণে ধীবর দীঘি, রাস্তার উত্তরেই সরাইর কোট নামে অদ্যাপি পরিচিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ এক খণ্ড উন্নত ভূমির উপর বর্ত্তমান। সরাইর কোট এখনও ইষ্টক ও প্রস্তর ময়, লোকে এখনও খুড়িয়া খুড়িয়া তাহা হইতে অনবরত ইষ্টক লইয়া যাইতেছে। সরাইর কোট ও ধীবর দিঘির মধ্যস্থ এবং চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝাযায় যে পূর্ব্বকালে এখানে সত্য

---

*Archaeological Survey, Eastern circle—এর প্রভুরা ছাই মাটি কাজে সময় নষ্ট করিতেছেন। পাটলীপুত্র খুড়িয়া শতস্তম্ভ প্রাসাদের মরিচীকা দেখিলেই যেন আমাদের চতুর্ব্বর্গ লাভ হইবে আর কি। এদিকে বাঙ্গালাদেশে যে এক কোদাল মাটি ও উঠিলনা তাহার দিকে কাহার ও নজর নাই।

সত্যই একটি সহর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পশ্চিমদিক হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বদিকে বরেন্দ্রে প্রবেশ করিতে হইলে ধীবর দীঘির সম্মুখের রাস্তাই বোধ হয় সকলের চেয়ে সুবিধাজনক। এই স্থানটিও বরেন্দ্র প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে রাঢ়সীমার অদূরে অবস্থিত। কাজেই এই সরাইর কোটেই ভীম ও রাম পালের বল পরীক্ষা হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে।

২৬৬ পৃষ্ঠা ১ম লাইন :—২"য় শূরপালের রাজত্বকালে বর্ম্ম বংশীয় শ্যামলবর্ম্ম দেব বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।" প্রমাণ কি ?

২৬৭ পৃষ্ঠা ২য় লাইন। "সামন্ত সেন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকার।" সামন্ত সেন বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া ছিলেন এমন কোন প্রমাণ তো নাই ই, অনুমান করিবারও কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই।

পরিশিষ্টে চন্দ্রবংশের বংশাবলি আলোচিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গতঃ ময়নামতীর গানের ঐতিহাসিক মূল্য আলোচিত হইয়াছে। রাখাল বাবু ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং মৎসম্পাদিত ভবানী দাসের ময়নামতীর গান আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে ময়নামতীর গান একেবারে অবহেলার নহে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চুয়াইয়াও তাহা হইতে কিছু খাটি ঐতিহাসিক রস পাওয়া যাইতে পারে।

সন্ধ্যাকর নন্দী কায়স্থ জাতীয় ছিলেন বলিয়াই উপলব্ধি হয়, তাহাকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা বৃথা। ত্রিপুরা শাসনের সামন্তরাজ লোকনাথকে কায়স্থ বলিতে কোন দ্বিধা বোধ করিতেছি না। কারণ অধুনা যাহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত তাহারা একটা অবিমিশ্র জাতি নহে, নানা জাতির সমবায় মাত্র। সামন্তরাজ লোকনাথের বংশধরগণ এবং ঐ শ্রেণীর অনেক বংশ যে উদার কায়স্থ বা করণ নামের তলে আশ্রয় লাভ করিয়াছে সেই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

পরবর্ত্তী একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সেন বংশের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। নানা প্রকারে এই দুই অধ্যায় এই উৎকৃষ্ট পুস্তকের দুইটি দুর্ব্বলতম অধ্যায়। 'যাহা এখনও মত বাদের ( theory ) রাজ্যে রহিয়াছে তাহা পুস্তকের অভ্যন্তরে গৃহীত হইবে না' এই নীতি পুস্তকের আগা গোড়া অনুকরণ করিয়া সহসা এই দুই অধ্যায়ে তাহা রাখাল বাবু পরিত্যাগ করিয়াছেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না। সেন বংশের ইতিহাস, বিশেষতঃ লক্ষ্মণ সেনের ভাগ্যবিপর্য্যয় লইয়া বঙ্গীয় ঐতিহাসিক মহলে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। রাখাল বাবু এই মতাবলম্বী যে মহম্মদি বক্তিয়ার খিলিজি যে লক্ষ্মণ সেনের বৃদ্ধ বয়সে বাঙ্গালা দেশ বিজয় করিয়াছিল বলিয়া মিনহাজের পুস্তকে উল্লিখিত আছে তাহা মিথ্যা, লক্ষ্মণ সেন তাহার বহু পূর্ব্বেই পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। অপর পক্ষ এই মতাবলম্বী যে লক্ষ্মণ সেন সত্য সত্যই বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছিলেন তবে বক্তিয়ার খিলিজির আক্রমণ বঙ্গবিজয় মোটেই নহে, তাহা নদীয়া লুণ্ঠন মাত্র।

বঙ্কিম বাবু লিখিয়া গিয়াছেন যে ১৭ জন অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশটা বিজিত হইয়াছিল, ইহা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার। ১৭ জন অশ্বারোহী এই প্রকাণ্ড দেশটা জয় করিয়াছিল এই কথা যে বিশ্বাস করে তাহার মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। কিন্তু অদূরে বহু সৈন্য দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত ১৭ জন দুর্দ্ধর্ষ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক একটা অরক্ষিত, নিরস্ত্র, পাদচারী, নিরীহ, বৈষ্ণব অধিবাসী পূর্ণ ছোট সহরের লুণ্ঠন আরব্ধ হইতে পারে এ কথায় অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। শিবাজী কর্ত্তৃক মুষ্টিমেয় লোক লইয়া গিরিদুর্গগুলির অধিকারের ইতিহাস যাহারা অবগত আছেন তাহাদের নিকট ইহা কিছুই আশ্চর্য্যজনক বোধ হইবে না।

২৮৮ পৃষ্ঠা—১৬ পংক্তি—রামপালের সহায়তাকারিগণের মধ্যে বিজয় রাজার নাম আছে। ইনি বিজয়সেন নহেন এমন কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। কাজেই সেনবংশীয়গণ রামপালকে সাহায্য করেন নাই এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

২৮৯ পৃষ্ঠা ২৬ নং ফুটনোট ;—এই বাক্যটি কুল শাস্ত্রের নহে, যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় এটি দানসাগরের সেনবংশ প্রশস্তির মধ্যে আছে। বিজয় সেন যে বরেন্দ্রেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন দেওপাড়া প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির ও শিলালিপি তাহার প্রমাণ। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি যে বিজয় রাজার বাড়ীর বিষয় সাধারণে প্রচারিত করিয়াছেন তাহাই বিজয় সেনের বরেন্দ্রস্থিত রাজধানী হইতে পারে। ৩১ বা ৩৬ রাজ্যাঙ্কে বিক্রমপুর হইতে তাম্রশাসনের প্রচার দেখিয়া উপলব্ধি হয় যে শেষ বয়সে বিক্রমপুর জিত হইয়াছিল। বিজয়সেনের পর হইতে বিক্রমপুরেই সেন বংশের প্রধান রাজধানী (metropolis) প্রতিষ্ঠিত হয়

সামন্তসেন রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন, রাখাল বাবুর নিজের এই ভ্রান্ত মতবাদ এই পুস্তকে পুনরায় দেখা দেয় নাই দেখিয়া সুখী হইলাম। বস্তুতঃ সীতাহাটি তাম্রশাসন হইতে সামন্ত সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেন ভূপগণ সদাচারচর্য্যাপ্রৌঢ়রাঢ় দেশকে বহুদিন ধরিয়া ভূষিত করিতেছিলেন জানিয়াও সামন্ত সেনকে অন্য স্থান হইতে আগত বলিয়া বর্ণনা করা ভ্রমাত্মক। সেন রাজগণের পিতৃভূমি রাঢ়দেশ, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তবে তাহাদের বংশ অবশ্য কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশ

রাখাল বাবু লিখিয়াছেন—"খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।" (২৯২ পৃষ্ঠা—৬ষ্ঠ পংক্তি) এবং—"বল্লাল সেন ১১১৮ বা ১১১৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন।" (২৯৪ পৃষ্ঠা ১২শ পংক্তি)। পাদ শব্দটির মানে চতুর্থাংশ, কিন্তু ১১২৪ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সিংহাসনে আরোহণ করেন রাখাল বাবুর অভিপ্রায় অবশ্য তাহা নহে। রাখাল বাবুর উদ্দেশ্য এই যে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম ভাগ কত? ১১০৮? ১১০৯? বল্লাল সেনের সীতাহাটি শাসন ১১শ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত। ১১০৮ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেনের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকিলে ১১১৯ খৃষ্টাব্দে উহা প্রদত্ত। ওবাসু দেবশর্ম্মাকে বাস্তুভিটা দানের ফলে তাহার দ্রুত স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল দেখিতেছি! এর পরে যদি ২০শ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত বল্লালের একখানা তাম্রশাসন বাহির হইয়া পড়ে তবে রাখাল বাবু কিছু বিপদে পড়িবেন। বাঙ্গালা দেশের সমস্ত কুলগ্রন্থ, গান গল্প, প্রবাদ, স্থানীয় কিম্বদন্তী, সামাজিক বিভাগ ইত্যাদির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ বল্লালসেন বাঙ্গালা দেশে মোটে ১২—১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন এ কথা বলা রাখাল বাবুর মত প্রবীণ ঐতিহাসিকের পক্ষেও অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। বস্তুতঃ আমরা সামান্য কয়েকটা অঙ্ক কসিয়া দেখাইতেছি যে রাখাল বাবুর অনুমান কিরূপ অস্থিরভিত্তি।

বাঙ্গালার ইতিহাসের দুর্ভাগ্য ক্রমে উহাতে ভর করিয়া দাঁড়ান যায় এমন তারিখ অতি অল্প। যে কয়েকটি আছে তাহা লইয়াই বিচার করিতে হইবে। একটু দূর হইতে আরম্ভ করা যাক্।

৮৮৮ শকে অর্থাৎ ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে—কাম্বোজান্বয় গৌড়পতি কর্ত্তৃক বাণগড়ে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও তাহার কয়েক বৎসর পরে মহীপাল কর্ত্তৃক পিতৃরাজ্য উদ্ধার।

১০২৪ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল ও মহীপাল সংগ্রাম। মহীপালের ৫২ বৎসরব্যাপী রাজত্ব। কাজেই ১০২৫ খৃষ্টাব্দে মহীপালের রাজ্যাবসান ধরিলেও ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে মহীপালের রাজ্য লাভ। (রাখাল বাবুর মতে) নবম রাজ্যাঙ্কে বাণগড় শাসন প্রদত্ত হইয়াছিল, কাজেই সেই বৎসর বা তাহার পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ৯৮১ খৃষ্টাব্দে বরেন্দ্রী উদ্ধার। মহীপালের পরবর্ত্তী রাজা নয়পালের ১৫শ রাজ্যাঙ্কের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাই তাহার রাজ্যকাল অন্যূন ২০ বৎসর ধরা যায়। তাহা হইলে—

১০২৫+২০=১০৪৫ খৃষ্টাব্দে—নয় পালের রাজ্যাবসান। পরবর্ত্তী রাজা ৩য় বিগ্রহ পালের ১৩শ রাজ্যাঙ্কের লিপি বাহির হইয়াছে। কাজেই ১৩শ বৎসরকাল তাহার রাজত্ব ধরিলে—

১০৪৫+১৫=১০৬০ খৃষ্টাব্দে ৩য় বিগ্রহ পালের

রাজ্যাবসান, ও দ্বিতীয় মহী পালের সিংহাসনারোহণ ও অনীতিকারম্ভ রত হওয়া। তাহার দুই বৎসর পরে কৈবর্ত্তবিদ্রোহ হইলে—

**১০৬২ খৃষ্টাব্দে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ আরম্ভ, ও দিব্যের সিংহাসন লাভ।** কৈবর্ত্তগণ কত বৎসর প্রতাপান্বিত ছিল জানা যায় না। বিক্রমপুরের জাতবর্ম্মা দিব্যের সমসাময়িক; দিব্যের সহিত তাহার সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল (নিন্দন্দিব্য ভুজশ্রিয়ম্)। দি᾿য ও ভীমের মোট রাজত্ব ১০ বৎসর ধরিলে—

**১০৬২+১০=১০৭২ খৃষ্টাব্দে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ দমন ও রামপালের বরেন্দ্রী উদ্ধার।**

জাতবর্ম্মা এই সময় পরলোকগমণ করিয়াছিলেন বলিয়া ধরা যায়। কাজেই বৈদিক কুলগ্রন্থে যে লিখিত আছে যে ১০৭২ খৃষ্টাব্দে শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেণ তাহা সত্য বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করা যায়। এখন, ১০৭২ খৃষ্টাব্দে রামপাল বরেন্দ্রে ও শ্যামলবর্ম্মা বঙ্গে আসীন এবং হয়ত বিজয় সেন রাঢ়ে মাথা তুলিবার জোগাড় ছিল।

১০৬২ কৈবর্ত্তবিদ্রোহ ও ২য় মহীপালের রাজত্বের অবসান। ১০৬২ হইতে ১০৭২ পর্য্যন্ত কৈবর্ত্ত রাজত্ব। ইহার মধ্যে শূর পালের রাজত্ব ৩ বৎসর ধরিলে—

**১০৬৩ খৃঃ** হইতে রামপালের রাজ্যারম্ভকাল গণিতে হইবে। রামপাল ৪৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—কাজেই—

**১১১১ খৃষ্টাব্দে** রামপালের দেহত্যাগ ও কুমারপালের রাজ্যলাভ। এ দিকে ১০৭২ খৃষ্টাব্দে শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। শ্যামলবর্ম্মার মত বিখ্যাত রাজার রাজ্যকাল ১০ বৎসর ধরিলেও—

**১০৮২ খৃষ্টাব্দে** শ্যামল বর্ম্মার দেহত্যাগ ও ভোজবর্ম্মার রাজ্যপ্রাপ্তি। ভোজবর্ম্মার ৫ম রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে কাজেই তাহারও রাজত্বকাল ১০ বৎসর ধরা যায়। কাজেই—

**১০৯২ খৃষ্টাব্দে ভোজবর্ম্মার রাজ্যাবসান।** হরিবর্ম্ম ও তাহার পুত্র ভোজ বর্ম্মের পূর্ব্বে কি পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। কিন্তু সকলের মতেই তাঁহারা জাতবর্ম্মার পরবর্ত্তী। হরিবর্ম্ম দেবের ৩৯শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত পুথি আবিষ্কার হইতে প্রমাণিত হয় যে পিতাপুত্রে অন্ততঃ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। কাজেই ১০৯২+৪৫=১১৩৭খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমপুর বর্ম্মরাজাদের হাতেই ছিল।

১১১১ খৃষ্টাব্দে বরেন্দ্রে রামপাল, আর ১১৩৭ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরে বর্ম্মরাজগণ। এদিকে বিজয় সেন বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়া পরে ৩২শ রাজ্যাঙ্কে বিক্রমপুর হইতে তাম্র শাসন প্রচার করিয়াছিলেন। রাখাল বাবু অনুগ্রহ করিয়া এখন একবার বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেনের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়া দেখুন দেখি।

বস্তুতঃ একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায় পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে স্বীয়মত বজায় রাখিবার জন্য রাখাল বাবু কোন রকমে একটা ইতিহাস খাড়া করিয়াছেন। ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য সমস্ত ঐতিহাসিক সমস্যার সম্মুখে সাহস সহকারে দণ্ডায়মান হওয়া। পাশ কাটাইতে এবং বোকা-বুঝাইতে চেষ্টা করা, অন্ততঃ রাখাল বাবুর মত নিরপেক্ষ, তীক্ষ্ণধী, প্রবীণ ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য নহে। লক্ষণ সেন প্রসঙ্গে এই পাশ কাটাইবার চেষ্টা আরও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২৯৪ পৃষ্ঠা ১০ম পংক্তি—বল্লাল সেনের তাম্র শাসন গ্রহীতার নাম "শ্রীশ্রী শ্রীবাসুদেব" শর্ম্মা বলিয়া রাখাল বাবু অবধারিত করিয়াছেন। অবধারণটি ভুল হইয়াছে বলিয়া মনে করি কারণ ঃ—

(১) নামটি প্রকৃত পক্ষে ওবাসু। ও কে ৩ বলিয়া পড়িয়া শ্রীর ত্রিত্ব সূচক চিহ্ন বলিয়া রাখাল বাবু ধরিতে চাহেন, কিন্তু রাজার নামে এক শ্রী দিয়া লিখিয়া গ্রহীতা ব্রাহ্মণের নাম তিন শ্রী দিয়া লেখা অভূতপূর্ব্ব।

(২) রাখাল বাবুর মতে ব্রাহ্মণের নাম বাসুদেব এবং শর্ম্মা তাহার উপাধি। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণের সকলেরই বরাহ, ভদ্রেশ্বর, লক্ষ্মীধর ইত্যাদি পৃথক্ নাম

ও দেবশর্ম্মা এই উপাধি দেখা যায়। এক্ষেত্রে দেবশর্ম্মা এই উপাধি পৃথক করিয়া লইল শুধু বাসু থাকে; বাসু কখনও একটা নাম হইতে পারে না।

(৩) তাম্রশাসনের প্রথম পৃষ্ঠায় ২৮ পংক্তিতে আদিত্যোবাসুবিদ্বুষে কথাটিতে আদিৎ+ওবাসুবিদ্বুষে এইরূপ সন্ধি বদ্ধ হইয়া ওবাসু নামটিই আছে। আবার ২য় পৃষ্ঠার ৩১শ পংক্তিতে ওবাসু নামটিই আছে। যথা ওবাসু শাসনে কৃত দূতং ··· ···। এখানে কোন শ্রী ও নিকটে নাই।

২৯৬ পৃষ্ঠার সম্মুখে ২৫ নং চিত্রকে কোন্ প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বলিয়া অভিহিত করা হইল তাহা জানান উচিত ছিল। এইরূপ দাসী কর্ত্তৃক সেবিতপাদা, দক্ষিণ হস্তে কমল ধারিণী, উপাধানে বাম হস্তের উপর মস্তক রাখিয়া শয়ানা পাথরের স্ত্রীমূর্ত্তি বরেন্দ্রে অসংখ্য পাওয়া যায়। সময় সময় ইহাদের উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপ্তমাতৃকা মূর্ত্তি, শিবলিঙ্গ, কার্ত্তিক গণেশ ইত্যাদি উৎকীর্ণ দেখা যায়। সম্প্রতি এইরূপ একখানি মূর্ত্তি রাজসাহী চিত্রশালায় দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার উপর দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে "বংশোমাএ লক্ষীঅ" এই কয়টি কথা লেখা আছে। কথা কয়টি বোধ হয় তখনকার বাঙ্গলা ভাষার নমুনা। অর্থ বোধ হয় "বংশমাতা লক্ষী।" হাতে কমল দেখিয়া বোধ হয়, মূর্ত্তিটি লক্ষ্মীমূর্ত্তিই হইবে। লোক মাতা বলিয়া লক্ষী দেবীর শাস্ত্র প্রসিদ্ধি আছে। দেখা যাইতেছে যে বংশমাতা বলিয়াও তিনি প্রাচীন কালে পূজা পাইতেন।

লক্ষ্মণ সেনের প্রসঙ্গ লইয়া অধিক স্থান জুড়িবার প্রয়োজন নাই। রাখাল বাবু যখন জাগিয়া ঘুমাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন এই বিষয় নিয়া আলোচনা করা বৃথা। তবে এ কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি যে ১১৭০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, তাহার এই মতবাদের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রতিবন্ধক, সেই অশোকচল্লের ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দের লিপির বিষয় আলোচনা করিতে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া তিনি যে আশ্চর্য্য বিস্মৃতির পরিচয় দিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে প্রকাণ্ড অগৌরবজনক। এই বিষয় আমার যাহা বক্তব্য তাহা Indian Antiquary Dacca Review তে, প্রতিভায় ও গৃহস্থে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নূতনের মধ্যে পরগণাতি সনযুক্ত এত দলিল পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র বাহির হইতেছে যে ইহাকে উপহাসের ভয় দেখাইয়া উড়াইবার চেষ্টা বৃথা। একখানা দলিলে এই পরগণাতি সনকেই "সনবলালি" বলিয়া উল্লিখিত পাইয়াছি। কাজেই ১২০০ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ এই সনটি যে সেন বংশেরই সন সেই বিষয় আর কোনও সন্দেহই থাকিতেছেনা। লক্ষ্মণ সেনের দুর্ভাগ্যের স্মারক এই সনটি পূর্ব্ববঙ্গে বহুদিন ধরিয়া বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ অধ্যায়ে জয়চন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্রের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার রাখাল বাবুর এক স্মরণীয় কীর্ত্তি।

আমরা আমাদের সুদীর্ঘ আলোচনা শেষ করিলাম। বাঙ্গালা দেশে প্রকৃত ইতিহাসের আলোচনার সংখ্যা খুব বেশী নহে। তাঁহারা প্রত্যেকে যদি নিঃস্বার্থ ভাবে প্রাণপণে ইতিহাস উদ্ধারের জন্য পরিশ্রম করেন এবং পরস্পরে বন্ধুভাবে পরস্পরের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া ভ্রমগুলি দূর করিতে সাহায্য করেন তবে বাঙ্গালার ইতিহাস শীঘ্রই নবঔজ্জ্বল্যে ভূষিত হইয়া উঠিবে। তাহা না করিয়া যদি বাররাজপুতের তেরহাড়ি হইয়া দাঁড়ায় এবং সমালোচনা গুলি কণ্টকিতাগ্র হইয়া "ঐতিহাসিক রচনা কৌতুক" "ঐতিহাসিক রচনাগরল" ইত্যাদি কণ্টকধর্ম্মী নাম লইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে তবে ইহার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

## গৌরাঙ্গের প্রস্থান দর্শনে

### নবদ্বীপ বাসিনী অবলাগণের খেদ।

( ভাটিয়াল মনোহরসই ;—তাল লোভা। )

গোরা যায় যায় যায় রে,
মায়ের অঞ্চলের নিধি যায় যায় যায় রে,
দুখিনীর প্রাণধন যায় যায় যায় রে,
নৈদে আঁধার ক'রে যায় যায় যায় রে
গোরা কার কি ভাবে কি অভাবে,
চলেছে কোথায়।

নদিয়া নগরে সবে নিতুই নব উৎসবে,
নাচিত নূতন সুখে গোরার খেলায়,
গোরা কার লাগি সে খেলা ভাঙ্গি,
ছেড়ে যায় সবায়।

৩

কাঁচা সোণা গৌরমণি কোমল যেন নবনী
তুষিত সবারে কত মধুর কথায় ;
আজি কেমনে সে কি আবেশে
পাসরিল যায়।

৪

কনক লতার আভা নববধূ রূপপ্রভা
ভাসিলা আনন্দে শচী যুগল শোভায়,
আহা—বিষ্ণুপ্রিয়া কি কহিয়া
কিবা বুঝাব তোমায়।

৫

প্রেমের পুতুল গোরা তার প্রাণে কার কিসের পোড়া
কেন বাছা ভাসে দেখ নয়ন ধারায়,
গোরা হায় কি ব'লে যায়রে চ'লে
পাগলের প্রায়।

৬

গোরার অতুলরূপে নরনারী নবদ্বীপে
সতত থাকিত যেন শীতল ছায়ায়,
আজি জন্মের তরে আঁখি ভরে
দেখে লই গোরায়।

৺ কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর।

# কবির বিপদ।

## ( গল্প )

### (১)

হাবুলের বন্ধু প্রদ্যোৎকুমার যখন 'আকাশ প্রদীপ' নামে অতি চমৎকার একখানা গল্পের বহি লিখিয়া ছাপাইয়া ফেলিল এবং তাহাতে বন্ধুমহলে একটা হৈচৈ কাণ্ড বাঁধিয়া গেল, তখন কিজানি কেন হাবুলের মনটা কেমন ছ্যাৎ করিয়া উঠিল।

প্রদ্যোৎকুমারের সহিত হাবুলের বাল্যকাল হইতেই খুব ভাব ছিল। উভয়ে স্কুলের পর পেয়ারা গাছের উপর বা পেড়া ছাদের কোণে লুকাইয়া গল্পের বহি গিলিত, তাহাতে দুজনের প্রণয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথার কল্পনার গাছটিও বেশ গজাইয়া উঠিয়াছিল ; কাজেই আকাশে মেঘ করিয়া বিজলী চমকিলে বা সন্ধ্যার সময় ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিলে উভয়ে কাগজ পেন্সিল লইয়া খস্ খস্ করিয়া মুহূর্ত্তের ভিতর সাদা কাগজ কালো করিয়া ফেলিত! সুযোগ মত জলখাবারের পয়সা বাচাইয়া, ভাল বাঁধান খাতা কিনিয়া, তাহাতে কবিত গুলি পরিষ্কার করিয়া নকল করিত, এবং উভয়ে উভয়ের কবিতা পড়িয়া গলাগলি ধরিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিত, কবিতা গুলিতে এমনই করুণরস ছিল!

একদিন হাবুলের খাতাখানা তাহার দাদার হাতে পড়িল। কবিতা গুলি যে আজগুবী উপন্যাস পাঠের টাট্কা ফল তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না, এবং তাহার প্রতিশেধক,—কর্ণলতিকা ধারণ পূর্ব্বক মুখে ও মাথায় চটাচট্ চাপড় প্রদান করিলেন, এবং ব্যাধির এইরূপ উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে ঐ বাতিক কিছু কালের জন্য সারিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রদ্যোৎকুমারের বড় ভাই ছিল না, কাজেই সে নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে ঘরের কোণে বা ছাদে বসিয়া ভোর সন্ধ্যায় অবিরাম লিখিত, এবং তাহার ফলে অল্পদিনের ভিতরই 'আকাশ প্রদীপ' দেখা দিল। গ্রামময় একটা ভীষণ আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেহ বলিল—'সে কালে বঙ্কিম ঠাকুর দাঁড়াইবে, তাহার 'রসগজা' গল্পটা বঙ্কিমবাবুর 'আফিং গাছের' মত ;—কেহ বলিল 'তা নয়, সে নবীন দত্ত দাঁড়াইবে, কারণ 'রক্তজবার যুদ্ধ' ও 'যূঁই ফুলের লড়াইর' ভিতর কোনটা কাহার লেখা তাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও ঠাহর করা যায় না'; বাকি লোকেরা বলিল—"সে রবি চক্রবর্ত্তী দাঁড়াইয়াছে—তাহার 'ডোঙাকাটা' গল্পটা 'রেলডুবির' ছায়ামূর্ত্তি!"—

'নোবেল প্রাইজ' যে এবার প্রদ্যোৎ ই পাইবে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না ; এবং প্রদ্যোতের মাতা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া হাবুলের মাতার গলা ধরিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন" ওগো কর্ত্তা গো।

পাঁচবৎসর যাবত প্রদ্যোতের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সেই শোকে সম্প্রতি কেহ প্রদ্যোতের মাতাকে কাঁদিতে দেখে না,—আজ সহসা ঐ পুরাতন 'মরিচাধরা' শোকের এইরূপ জৌলস দেখিয়া হাবুলের মাতা আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। প্রদ্যোতের মাতা আপন মনে কাঁদিতে লাগিলেন—"ও কর্ত্তা গো, এ সময় তুমি কোথায় গো,—আমার দুধেরছেলে প্রদ্যোৎ গো!" হাবুর মাতা বাধা দিয়া বলিলেন "কি হয়েছে গো? প্রদ্যোতের ব্যামো নাকি?" ব্যামোর নামে প্রদ্যোতের মাতা 'ষাট্, ষাট্' করিয়া উঠিলেন।—"ব্যামো শত্তুরের হোক্। প্রদ্যোতের ব্যামো হ'তে যাবে কেন? সে কি কারুর অনিষ্ট করেছে, না কোনদিন কার ঠাঁই জাল-জোচ্চুরি করেছে? আমার বাছা প্রদ্যোৎ কি তেমন? সে কি কখন—?" হাবুর মাতা সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "না প্রদ্যোৎ তা কর্ত্তে যাবে কেন, সে যে ভাল ছেলে তা গেরামের কে না জানে?" প্রদ্যোতের মাতা হৃষ্ট হইয়া বলিলেন "তবেই ত দেখ,—সে কি তেমন ছেলে! আমার ঐ দুধের ছেলে প্রদ্যোৎ, যার নাক টিপ্‌লে এখনো দুধ বেরয়, সে কিনা অষ্টপ্রহর কেবল কবিতাই লেখে। খাওয়া নেই, পরা নেই—কেবল লেখেই লেখে! তাই বেলাতের সায়েবেরা খুসি হ'য়ে ওকে নয়বেলার পেরাইজ দিবে।* অষ্টপ্রহর লিখেছে কি না তাই আটবেলা,—আর এক বেলা ফাউ,—এই মোট নয়বেলা। পেরায় লাখ টাকা!"—

হাবুর মাতা অবাক হইয়া বলিলেন "লাখটাকা, বলকি! তা হ'লে কাঁদছ কেন? দেদার টাকা পাবেত!" "হাঁ, তাত পাবেই। লাখটাকা কি কম? পেরায় দশকুড়ি টাকা! আহা কর্ত্তা যদি আজ বেঁচে থাকৃত। কর্ত্তার পাতে একদিন পুঁটিমাছের মুড়োটুকু দিতে পারিনি, আর এখনথেকে বাড়ীতে কত চিংড়িমাছ গড়াবে!"

হাবুর মাতা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা দিলেন, এবং সুখ দুঃখ যে 'গরুর গাড়ীর চাকার মত ঘোরে' শাস্ত্রের দোহাই দিয়া একথা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

(২)

এ সংবাদ শুনিয়া হাবুল যখন ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিল তখন তাহার মাতা পাকশাল হইতে বাহির হইয়া বিনাসংবাদেই পাকের খন্তা হাবুলের পিঠে দমাদম্ বসাইয়া দিলেন,—তার পর বাঙ্গালা ব্যাকরণের 'অকাল কুষ্মাণ্ড', 'হতভাগা', 'চালকুমড়া' প্রভৃতি বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—"হাব্‌লে তোর সমান প্রদ্যোৎ বই লিখে নয়বেলার পেরাজ নিল, কত নাম কর্ল,—আর তুই কিনা একবেলার পেরাইজও পেলি না! ঢেঁকি, ঘরে বসে বসে খাস্ আর ঘাস কাটিস্।" হাবুল কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল যে তাহার দাদাই তাহার মাথাটা চর্ব্বণ করিয়াছে, নতুবা এতদিনে সে প্রদ্যোৎকে ডিঙ্গাইয়া যাইত এবং নিঃসন্দেহে ঐ নয়বেলার প্রাইজটা পাইত।

তাহার মাতা আঁচলের খুঁট হইতে চারি আনা খুলিয়া হাবুলের হাতে দিয়া বলিলেন "যা এখুনি দু দিস্তা কাগজ কিনে আন্, তার পর ঘরে বসে লেখ্। কোথাও বেরুতে পাবি না,—আর যতক্ষণ না লিখ্‌তে পারিস ততক্ষণ খেতেও পাবি না।"

লেখাপড়া ছাড়া আর সকল বিষয়েই হাবুলের স্ফূর্ত্তি, এবার মায়ের উৎসাহ আর দাদাও চাকুরী স্থলে। এরূপ স্বর্ণ সুযোগ পাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাগজ কিনিয়া আনিয়া বারান্দায় ছেঁড়া মাদুর পাতিল, এবং পা ছড়াইয়া বসিয়া, কোলের উপর কাগজ রাখিয়া লিখিতে বসিল। অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া, মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিয়াও যখন লিখিবার মত কোনও ভাব সংগ্রহ করিতে পারিল না, তখন অগত্যা চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল,—যদি লিখিবার মত কোন ভাব জুটিয়া যায়।

সহসা দেখিল গৃহ প্রাঙ্গনে নিমগাছের নিম্নে একটা কুকুর নিদ্রিত আছে। হাবুলের ছোট বোন তারকা লগুড় হস্তে সাক্ষাৎ চামুণ্ডা মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইয়া কুকুরকে প্রহার করিল;—কুকুর করুণরবে আর্ত্তনাদ

* নোবেল প্রাইজ (Nobel prize) যাহা কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাইয়াছেন।

করিতে করিতে পলায়ন করিল। হাবুলের মনে হইল—আরম্ভ করিবার ইহাই ঠিক বিষয়। প্রাকৃতিক কবিগণ ত চোখের সাম্‌নে যে সকল চিত্র দেখিতে পান তাহাই অঙ্কিত করেন,—তাহা হইলে সে কেন এই বিষয় নিয়া লিখিবে না, ইহাও তো তাহার চোখের সাম্‌নেই ঘটিল। হাবুল ঘস্ ঘস্ করিয়া লিখিতে লাগিল—

"সন্ধ্যাকালে নিমের তলে শুয়ে কুকুর নিদ্রাযায়,
লয়ে মুগুর দাপুর দুপুর দিলাম দু ঘা তাহার পায়।"

বাহবা, কি খাসা! হাবুল একবার দুবার তিনবার পড়িল; কিন্তু প্রথম লাইনটা কেমন খটমট লাগিল 'সন্ধ্যাকালে' আর 'নিমের তলে।' 'কালে' আর 'তলে' ঠিক মিলে না। অবশ্য অনেক কবি এরূপ গরমিল দিয়া থাকে, কিন্তু হাবুল ত সে শ্রেণীর কবি নহে, তাহার কবিতাতে কেন খুৎ থাকিবে। সে মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল—'কালের' সঙ্গে কি মিলে? আচ্ছা—কালে—খালে, থালে, তালে, ডালে, ঠিকঠিক। হাবুল আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। শুদ্ধ করিয়া লিখিল—

"সন্ধ্যাকালে নিমের ডালে শুয়ে কুকুর নিদ্রাযায়,
ল'য়ে মুগুর দাপুর দুপুর দিলাম দু ঘা তাহার পায়।"

চীৎকার করিয়া ডাকিল "মা, মা।" মা পাকশাল হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "লেখা হ'ল?" বিজয়োল্লাসে খাতা খানা মায়ের চোখের সাম্‌নে ধরিয়া হাবুল বলিল "লিখ্‌তে বস্‌লে কি আর সময় লাগে মা? দেখনা কেমন সুন্দর মিল।"

হাবুলের মাতা সন্দিগ্ধ ভাবে বলিলেন—"হ্যারে হাবু লেখাটা তোরত, না ঐ সূর্য্যঠাকুর * না কে খুব ভাল লেখে—তাঁর?" হাবুল হাসিমুখে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল "হা মা এই কবিতা দেখে অনেকেই সে কথা বল্‌বে; কিন্তু কারুরটা নকল কর্ব্বার লোক আমি নই। দাদা যদি বারণ না কর্ত্ত তা হ'লে এতদিনে রবিঠাকুরকে ডিঙিয়ে যেতাম,—রবিঠাকুরই আমার নকল কোর্ত্ত!"—

লেখাটা যথার্থ ই হাবুলের জানিয়া তাহার মাতা ভুল ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "হাবু পড়্‌ত আবার, দেখি ভুল টুল আছে নাকি।" হাবুল আবার পড়িল। মাতা চিন্তা করিয়া বলিল "হয়নি হাবু। কথাটা হচ্ছেকি—কুকুর গাছের ডালে ঘুমায় কি করে?" হাবুল এতক্ষণ এ কথাটা খেয়াল করে নাই। এখন দোষ বুঝিতে পারিয়াও বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া বলিল—"তোমরা মেয়েমানুষ ওসব বুঝ্‌বে না মা। ঐ রকম একটু ভুল টুল ইচ্ছা ক'রেই রাখ্‌তে হয়,—কবিরা অতটুকু রেয়াত পায়। কবিতা লেখা ত আর সহজ ব্যাপার নয়! যেমন সোণায় খাত না থাক্‌লে গয়না তৈরি হয় না, তেমন ভাষায় একটু ভুল না থাক্‌লে কবিতা বাঁধে না।" মা প্রশংসমান নেত্রে পুত্রেরদিকে তাকাইয়া বলিলেন "তা হবে। তবে কি জানিস্ হাবু পেরামের মুখ্য সুখ্য লোকেরা তোর কবিতা বুঝ্‌বে না। তুই গল্প লেখ্,—তাতে লোকেও খুসি হবে আর তুই ঐ নয়বেলার পেরাইজটা পাবি।"

( ৩ )

বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও হাবুল তাহার লেখনীকে গল্পরসদ যোগাইয়া দিতে পারিল না; কবিতা ও গল্প লিখিতে তাহার সমান ক্ষমতা। কল্পনা, ভাব ও ভাষা তিনটিতে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র করিয়াছিল যে হাবুলের এক একবার ইচ্ছা হইল ইহাদের Conspiracy caseএ ( ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা ) ধরাইয়া দেয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে ও প্রতিকূল কারণে মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইল।

অগত্যা কাগজ পেন্সিল সহ মাতার নিকট উপনীত হইল। আশা—মাতা বহুদর্শীতা লাভ করিয়াছেন, গল্পের প্লট (plot) যদি বলিতে পারেন।

মাতা তখন হাবুলের কবিত্বের কথা গাবুলের (হাবুলের দাদা) নিকট লিখাইতেছিলেন। লেখিকা হাবুলের ছোট ভগ্নী তারকাসুন্দরী চিঠি লিখিতে যাইয়া এক নূতন বাঙ্গালা কাব্যের সৃষ্টি করিতেছিল। এমন সময় হাবুল হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল "মা চিঠি পরে দিও। এখন আমার মাথায় বেশ ভাল ভাল ভাষা মজুত আছে, কেবল যদি গল্পের প্লট্‌টা বলে দিতে পার

* রবিঠাকুর।

তা হ'লে এমন একটা গল্প লিখে ফেল্‌তে পারি যে তা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক অবাক হয়ে হাঁ ক'রে থাক্‌বে। কবিতাটা বেশ জলের মত কলমের আগায় আসে; কিন্তু গল্প—সেটা চাষা ভুষা লোকের কি না, সেটাকে কলমদিয়ে মাথায় খুচিয়ে বার কর্ত্তে হয়। যাক্‌, তুমি বলত একটা গল্প, আমি লিখে ফেলি।"

( ৪ )

হাবুলের মাতা বলিতে লাগিলেন "তুই তখন খুব ছোট,—তোর সে কথা মনে নাই। আমার বাপের বাড়ী বেশ একটা জমকাল রকমের কাণ্ড ঘটেছিল।—পলাশপুকুরের জমিদার গোলাপগন্ধ বাবুর মেয়ে হাস্‌নাহানার সঙ্গে আমাদের গ্রামের পদ্মকোরকের বে' হয়। পদ্মকোরক গরীবের ছেলে হ'লেও তার খুব তেজ ছিল। শ্বশুর তাকে ঘরজামাই রাখ্‌তে চেয়েছিল কিন্তু সে তাতে স্বীকৃত হ'ল না, বোল্ল কুকুরের মত আজীবন শ্বশুরবাড়ী থেকে তাদের পদলেহন কর্ত্তে পার্কো না। সে তার স্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে আন্‌তে চাইল। শ্বশুর গোলাপগন্ধ বাবু বল্লেন "তোমাদের কুড়েতে গিয়ে আমার মেয়ে গোবর কুড়াতে পারবে না; দুবেলা নিজের খাবার সংস্থান নেই, এর ভেতর হেনাকে নিতে চাও, লজ্জা করে না! হেনার মাসিক বাজেখরচে তোমাদের সারাবছরের খরচ চলে যেতে পারে।—" পদ্মকোরক রাগ করে চলে গেল। কিছুদিন পরে পদ্মকোরকের মায়ের বড় অসুখ কোর্ল,—ক্রমে তা অন্তিম রোগ হ'য়ে দাঁড়াল। পদ্মকোরক আবার শ্বশুরের কাছে বৌ নেবার প্রার্থনা জানাল; কিন্তু গোলাপগন্ধ বাবুর সেই এককথা। তখন পদ্মকোরক রাগে দুঃখে অধীর হয়ে শ্বশুরকে শাসাল "বৌ না দিলে মোকদ্দমা করবে, গোলাপ বাবুকে নাস্তানাবুদ করবে, নাকের জলে চোকের জলে ভাসাবে।—" গোলাপ বাবু মদে টং হয়েছিলেন,—মদের ঝোঁকে আলমারী থেকে গুলিভরা পিস্তল বের করে পদ্মকে উপরি উপরি তিনটি গুলি কোর্ল। পদ্মকোরকের প্রাণহীন দেহটা মাটিতে লুটাতে লাগ্‌ল। হাস্‌নাহানা এ মর্ম্মান্তিক খবর পেয়ে বিষখেয়ে আত্মহত্যা কোর্ল। পুলিশে খবর পেয়ে তদন্তে গেল; কিন্তু গোলাপ বাবু মস্ত জমিদার, ভয়ঙ্কর ক্ষমতা,—টাকা দিয়ে সাক্ষীদের হাত কার কেল্লেন। দারোগা সাক্ষী পেলে না, কাজেই এম্‌নি এম্‌নি সেরে গেল।

আমাদের দাসী খেঁদীর মুখে এ ঘটনা শুনে আমরা কেউ না কেঁদে পারিনি। জমিদার বেটা কি নচ্ছার, নিষ্ঠুর। আহা! বিনাদোষে জামাইকে অমনিভাবে খুন কোর্ল। তুই এ ঘটনা নিয়ে বেশ জমকাল করে গল্প লেখ্‌। সত্যি ঘটনা, অনেকে এ ঘটনা জানে,—খুব আদর হ'বে। ঘটনাটা দিনের আলোর মত সত্য। খেঁদী নিজকাণে তাহার ননদের জায়ের বোনের সইয়ের কাছে শুনেছে।"

( ৫ )

শব্দকল্পদ্রুম হইতে বাছা বাছা বিশেষ্য, বিশেষণ, অলঙ্কার ও মোটা মোটা সারিবাঁধা শব্দ (যাহা উচ্চারণ করিতে ৪।৫ মিনিট সময় লাগে) ব্যবহার করিয়া এবং বঙ্কিম মাইকেল প্রভৃতি সাহিত্যরথীগণের বহি হইতে শব্দ ও ভাষা চুরি করিয়া হাবুল অল্পদিনের ভিতর 'জমিদার-রহস্য' নামে একখানা বহি লিখিয়া ছাপাইয়া ফেলিল। বহিখানা পড়িয়া মাতাকে শুনাইল। গল্পের কোন কোন স্থান পড়িয়া হাবুলের মাতা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিলেন;—এত প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল! বহি ছাপা হইয়া আসিলে আত্মীয়, অনাত্মীয়, চেনা অচেনা, যে যেখানে আছে বিনামূল্যে সকলকে দেওয়া হইল। হাবুল ও তাহার মাতা ভাবিলেন নরবেলার পেরাইজটা এবার হাবুলই পাইবে, এবং সেই শুভ মুহূর্ত্তের আশায় উৎকণ্ঠিতভাবে সময় কাটাইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরের দাবায় বসিয়া হাবুল তাহার মাতার নিকটে নিজের কবিত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিল, এমন সময় সহসা কাহারা সদর দরজার কড়া সজোরে নাড়িতে লাগিল।—"হাবুল বাবু, কবি হাবুল বাবু, বাড়ী আছেন?—" "কবি খ্যাঁ!"—তবে ইহারই ভিতর সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে।—হাবুল এক লম্ফে দাওয়া হইতে উঠানে নামিল, আর এক লম্ফে বাহিরে যাইয়া দ্বার খুলিল। অমনি একজন

গর্জ্জিয়া বলিল "বাঁধ হারামজাদকে। জমিদার গোলাপ বাবুর নামে এই ব্যাটাই কুৎসা রটিয়েছে।" হাবুত অবাক। কাঠের পুতুলের মত হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা হাবুলের হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া থানায় লইয়া গেল।

জমিদার গোলাপগন্ধ মানহানির মোকদ্দমা (defamation case) রুজু করিয়াছিলেন।

( ৬ )

কোর্ট লোকে লোকারণ্য। এত বড় জমিদারের নামে এরূপ সাংঘাতিক কুৎসা রটান সহজ কথা নহে। জমিদারের পক্ষে বড় বড় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিল। পদ্মকোরক সাক্ষীর স্থানে দাঁড়াইয়া বলিল "মিথ্যা কথা! শ্বশুর জামাতাকে গুলি করিবেন ইহা কি সম্ভব! আমি পিস্তল নিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলাম, গুলিভরা জানিতাম না,—সহসা এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।—জমিদারের কন্যা চিকের আড়াল হইতে বলিলেন "এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি আত্মহত্যা করি নাই।" হাবুল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমি কিছুই জানি না। মায়ের ভয়ে গল্প লিখিয়াছি। এ গল্প মাই বলিয়াছেন। এ দিকে শাস্তি ওদিকে প্রহার মাঝখানে আমি মারা যাই।" হাবুলের মাতা ভীত কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "আমি এ কথা খেঁদীর কাছে শুনিয়াছি।" খেঁদীর তলব পড়িল, কিন্তু খেঁদী তখন এ রাজ্যে ছিল না,—সে জীবনের খেয়া বহিয়া মরণের দেশে চলিয়া গিয়াছিল। সে দেশটা বিচারকের শাসনের বাহিরে বলিয়া খেঁদীকে আনান গেল না।

প্রবীণ বিচারক জেরা করিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিলেন। হাবুলকে মুক্তি দিয়া বলিলেন "বাপু, ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া লিখিও। কবির বড় বিপদ!—"

হাবুল নাকে খৎ দিয়া বলিল "আর কখন লিখিব না।"

কোর্টে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। সরকার হইতে 'জমিদার রহস্য' বহিখানা পোড়াইয়া ফেলা হইল।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

# ভাঙ্গা কপাল।

কি এক অপূর্ব্বস্মৃতি গিয়াছে ভাসিয়া,
আসিয়াছি বহুদূর কিসের ভুলিয়া,
কাহার সন্ধান করি,
যেখানে সেখানে ঘুরি,
জগতের প্রাণভরা গাঢ় নীরবতা,
কে দিবে ঘুচায়ে মোর গভীর জড়তা।

বাছিয়া লইব তারে পরাণে যাহার
লাগেনি আঘাত কভু পড়েনি আছাড়
আকুল পরাণে কাঁদিয়া
সেও রয়েছে হৃদয় বাঁধিয়া
আমি কাঁদি সেও কাঁদে কেহ কিছু বলে না,
শুধু নয়নে নয়নে চায় কাছে যেসেনা।

কথা কই কারে কই আমিই বুঝিনা,
আগে যাহা কহিয়াছি স্মরণ পড়ে না
আমি বুঝি জীবনে
রয়েছি শুধুই শয়নে,
আমার পরাণে যেন কিছুই জাগেনা
গত কথা চলে গেছে করিনা সূচনা।

পথ দেখে মনে হয় কে যেন গিয়েছে
সুন্দর চরণ-চিহ্ন পথেতে রয়েছে,
তাহারে করিব সাথী,
সে যে পথের পথি
গোপন কাহিনী গুলি জানাব তাঁহারে,
যত হাটি নাহি পাই চলে গেছে দূরে।

শ্রীজানকীনাথ চক্রবর্ত্তী

# আলোচনা।

## হিন্দুস্থানের সঙ্গীত

শ্রীযুত এ, এচ্ ফকস্ ষ্ট্র্যাঙ্গ্‌ওয়েজ্ (A. H. Fox Strangways) নামক জনৈক মহানুভব সহৃদয় ইংরেজ দি মিউজিক্ অব্ হিন্দুস্থান (The Music of Hindustan)—হিন্দুস্থানের সঙ্গীত—নামে একখানা গবেষণাপূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থলিখিয়া এবং অক্সফোর্ডের ক্ল্যারেণ্ডন্ ছাপাখানা (oxford Clarendon press) হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাশিত করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। উহার মূল্য ২১ শিলিং। গ্রন্থখানির উপযুক্ত সমালোচনা করিবার মত অভিজ্ঞতা আমার নাই। উক্তকার্য্য যোগ্যতর ব্যক্তির জন্য রাখিয়া গ্রন্থপাঠে যে আনন্দলাভ করিয়াছি তাহাই দুই চারি কথায় প্রকাশ করিলাম।

যে ভারতীয় সঙ্গীতকলা একসময়ে উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, আজ তাহার অধঃপতন দেখিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। এই অবনতি আবার বঙ্গদেশে যতটা ঘটিয়াছে উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশে তেমন ঘটে নাই। অবশ্য ঐসকল প্রদেশেও কি কণ্ঠসঙ্গীতকার, কি বীণাকার, কি রবাবী, কি সরদী, কি সুরশৃঙ্গার বাদক, ইহাদের মধ্য হইতে যে সকল প্রথম শ্রেণীর গুণীব্যক্তি চলিয়া যাইতেছেন তাঁহাদের স্থান অধিকার করিবার মত উপযুক্ত লোক আর হইতেছে না। ইহার প্রথম কারণ এই যে কোন ওস্তাদের ঘরানা বিদ্যা তিনি নিজবংশের লোকভিন্ন অন্য কাহাকে প্রাণান্তেও অর্পণ করিতে চাহেন না। এই রূপে সেই ওস্তাদের স্ববংশীয় কাহারও যদি দৈব ক্রমে শিক্ষাকরিবার যোগ্যতার অভাব হয় তাহা হইলে উক্ত বিদ্যা তাঁহার সঙ্গেই লোপ পায়। দ্বিতীয় কারণ আজকাল অতি অল্প লোকেই বিশেষ অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক বহুবৎসর সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হ'ন; কারণ এই কষ্টলব্ধবিদ্যা তাঁহাদের সসম্মানে জীবিকার্জ্জনের সহায় হয় না।

বঙ্গদেশে গানরাজ যদু ভট্ট এবং নিধুবাবুর সময় পর্য্যন্তই কালোয়াতি গান সৃষ্ট হইয়াছে। তখন ইহার বিশেষ আদর ও ছিল। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে এখন একেবারেই আদর চলিয়া গিয়াছে। তবে এ রসে রসিক লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য।

এখন যে আদর্শে বাঙ্গালা গান গুলি রচিত হইতেছে উহাতে রাগরাগিনী মাঠে মারা যাইতেছে। তদুপরি য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ঢঙ্গ মিশাইয়া রাগরাগিণীর রাজ্যে অসংখ্য কিম্ভূত কিমাকার বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইতেছে; কাহার সাধ্য শুনিয়া ওগুলির জাতি নির্ণয় করে? ওগুলি ঘরেরও নয় পরেরও নয়। এই সকল গান শুনিতে শুনিতে বাঙ্গালীর কাণ সুরবোধহীন হইয়া উঠিতেছে; তাই আজ আমাদের দেবদুর্লভ হিন্দু সঙ্গিতের এমন হতাদর; তাই এখন শিক্ষিত লোকের সভায় কলাবত-কণ্ঠের মধুর স্বরলহরী আর তেমন শুনিতে পাওয়া যায় না! দুই চারি জন রাজা জমিদার এবং অপর কতকগুলি লোক আদর করিয়া এখনও এদেশে ইহাকে কথঞ্চিৎ জীবিত রাখিয়াছেন। নচেৎ এই বিদ্যা একেবারেই লোপ পাইত। কিন্তু গায়কও যন্ত্রীকুল ত অনাহারে মরিতে চলিয়াছে, কে তাহাদের উপযুক্ত মর্য্যাদা করে? এ দেশে এম্, এ, পাশের অন্ন যুটে বটে, কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রে যিনি এম্, এ, পাশতুল্য, তাহার উপবাসের ব্যবস্থা! এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিরা উচ্চাঙ্গের হিন্দু সঙ্গীতের বড় একটা ধার ধারেন না। তাঁহারা এদিকে উদাসীন!

কিন্তু আজ বিদেশীয় লেখকের লেখনী হিন্দু সঙ্গীতের মনমোহিনী শক্তির উচ্চ প্রশংসায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে! ষ্ট্র্যাঙ্গওয়েজ্ মহোদয় ভারতীয় সঙ্গীতালোচনার জন্য ছয় মাস পর্য্যন্ত ভারতের বিখ্যাত স্থান সমূহে পরিভ্রমন করিয়া সঙ্গীত সম্বন্ধে যে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে যে নিরপেক্ষ তুলনা মূলক আলোচনা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। তিনি বিশেষ ভাবে দেখাইয়াছেন। যে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রাণ স্বরসংযোগ (Harmony) আর ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ সুরমাধুর্য্য

(Melody) দুইটিই সম্পূর্ণ বিভিন্নদিক হইতে উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়াছে। প্রকৃত সহৃদয় বোদ্ধার কাছে দুইটিই উপভোগ্য। একটির সঙ্গে অপরটির মিশ্রণ কখনই সম্ভব নহে।

তিনি ভারতের কুলিমজুরের গান হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্রুপদ, খ্যাল্, টপ্পা, ঠুম্রি, এমন কি বেদগান পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া বহুগানের স্বরলিপি প্রদান করিয়াছেন। প্রচলিত প্রসিদ্ধ রাগরাগিণী গুলির স্বরবিন্যাসের রীতি দেখাইয়া একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ) বাদন সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া য়ুরোপীয়দিগকে ভারত প্রচলিত তালের একটা মোটা মুটি জানদিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাল সংযোগে সঙ্গীতের মাধুর্য্য কত বৰ্দ্ধিত হয় তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য তদীয় গ্রন্থে য়ুরোপীয় ও হিন্দু-সঙ্গীতের যে রূপ তুলনা মূলক বিস্তৃত আলোচনা তিনি করিয়াছেন, প্রথোমোক্ত সঙ্গীত জানা না থাকায় উহা সম্যক বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

গ্রন্থকার একস্থানে অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন যে হারমোনিয়াম্ যন্ত্র আমাদের হিন্দু সঙ্গীতের কি ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিতেছে। অবশ্য আমাদের দেশীয় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতবেত্তামাত্রেই ইহা জানেন, তাঁহাদের নিকট একথা নূতন নহে। তবুও গ্রন্থকারের নিজের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের শিক্ষিত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন :—

"If the rulers of native states realized what a death-blow they were dealing at their own art by supporting or even allowing a brass band, if the clerk in a Government office understood the indignity he was putting on a song by buying the gramophone which grinds it out to him after his day's labour, if the Mohammedan "star" singer knew that the harmonium which he accompanies himself was ruining his chief asset, his musical ear, and if the girl who learns the pianoforte could see that all the progress she made was as sure a step towards her own denationalization as if she crossed the black sea water and never returned—they would pause before they laid such sacrilegious hands on Saraswati. Excuses may be made for such practices, but there is one objection fatal to them all; the instruments are borrowed. * * * To dismiss from India these foreign instruments would not be to check the natural, but to prune away an unnatural growth."—page 16, Music of Hindusthan.

মর্ম্মানুবাদ :—যদি দেশীয় নৃপতিবৃন্দ বুঝিতে পারিতেন যে ব্যাণ্ড্‌বাদকের দল পোষণ করিয়া বা ব্যাণ্ড্ বাজাইতে দিয়া তাঁহারা দেশীয় সঙ্গীতকলার উপর কি সাংঘাতিক আঘাত করিতেছেন, রাজকীয় আপিসের কেরাণী বাবুরা যদি বুঝিতে পারিতেন যে, যে গ্রামোফোন্ যন্ত্র তাঁহাদিগকে দিবসের কর্ম্মাবসানে ঘর্ষণধ্বনী সংযুক্ত কর্কশ সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়া শুনায় তাহা খরিদ করিয়া তাঁহারা উক্ত সঙ্গীতেরই কিরূপ অমর্য্যাদা করিতেছেন, যদি মুসলমান ওস্তাদ জানিতেন যে, যে হারমোনিয়াম্ যন্ত্রের সঙ্গে তিনি গান করেন উহা তাঁহার প্রধানসম্পত্তি সুরবোধ শক্তিই নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, এবং যদি পিয়ানো যন্ত্র শিক্ষার্থিনী বালিকা দেখিতে পাইতেন যে যতই তিনি উক্ত যন্ত্রে উন্নতি লাভ করিতেছেন ঠিক সেই অনুপাতেই তিনি জাতীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুতা হইতেছেন—এ যেন তাঁহার পক্ষে "কালাপানি" পার হইয়া চিরতরে বিদেশ যাত্রারই মত হইতেছে,—তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই সরস্বতীর অঙ্গে এইরূপ অপবিত্র হস্তার্পনের পূর্ব্বে একটু থমকিয়া দাঁড়াইতেন। এরূপ অভ্যাসের সপক্ষে বলিবার থাকিতে পারে বটে কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক আপত্তি আছে, তাহা এই যে ঐ সকল যন্ত্র সবগুলিই ধার করা।

এই সকল বিদেশীয় যন্ত্রগুলিকে ভারত হইতে উঠাইয়া দিলে সঙ্গীতের স্বাভাবিক উন্নতির দিকে বাধা দেওয়া হইবে না, কিন্তু উহার অস্বাভাবিক পরিণতিই দমন করা হইবে।

অধুনা যাঁহারা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের অনুকরণে হিন্দু-সঙ্গীতের ভিতর স্বরসংযোগ (harmony) প্রণালী প্রবিষ্ট করিতেছেন তাঁহাদের উদ্দেশে গ্রন্থকার এক স্থলে বলিয়াছেন :- -

" And the first thing that harmony would do, if now applied even tentatively to Indian Music, as some advocate, would be to get rid of that feeling and those functions, and with them of the grace-notes and all that makes *Rag* worth having. As the Rag now is, its notes are like the pieces on the chess-board ; harmony, by investing them all equally with powers of its own, would make them like the pawns. Hence the serious menace to Indian Music of the harmonium, which has penetrated already to the remotest parts of India. If dominates the theatre, and desolates the hearth ; and before long it will, if it does not already, desecrate the temple. Besides its deadning effect on a living art, it falsifies it by being out of tune with itself. This is a grave defect. * * * A worse fault is that it is a borrowed instrument, constructed originally to minister to the less noble kind of music of other lands. It has taken a century to invent and perfect the pianoforte ; if she must have the fatal facility of a Keyed instrument, India could well spare a century or two for inventing something that should do justice to "her music..........To add harmony to it (Indian music) is to kil! it."—Page 163-164, Music of Hindustan.

মর্ম্মানুবাদ :—ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরসংযোগ (harmony) প্রণালী যদি পরীক্ষা স্থলেও অবলম্বিত হয়—কারণ কেহ কেহ ইহার পক্ষপাতী,—তাহা হইলে রাগ রাগিনীর ভাব প্রকাশ ক্ষমতা, সূক্ষ্মস্বর সম্বলিত মূর্চ্ছনার সৌন্দর্য্য, এক কথায় উহার সকল বিশেষত্ব লোপ পাইবে। রাগরাগিনীগুলি বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থায় আছে তাহাতে ইহাদের বিভিন্নস্বরগুলি যেন দাবার-কোটের বিবিধ গুটির মত ; স্বরসংযোগ (harmony) প্রণালী উহার প্রত্যেক সুরের উপর সমভাবে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া সকল গুলিকেই ব'ড়েতে পরিণত করিবে। এই জন্যই হারমোনিয়ম্ যন্ত্র—যাহা ভারতের দূরতম প্রদেশেও প্রবিষ্ট হইয়াছে—ভারতীয় সঙ্গীতের সর্ব্বনাশ করিবার উপক্রম করিতেছে। ইহা নাট্যমন্দিরে প্রভুত্ব করিতেছে, এবং পারিবারিক সঙ্গীত বিনষ্ট করিতেছে, আর সম্প্রতি না করিয়া থাকিলেও অনতি-বিলম্বেই দেব-মন্দির অপবিত্র করিবে। ইহা জীবন্ত শিল্পকে ত নষ্ট করেই, তাহা ছাড়া নিজে নিজেই "বেসুরা" হইয়া শিল্পের বিশুদ্ধি নষ্ট করে। ইহা অতি গুরুতর দোষ। ইহার আরও গুরুতর দোষ এই যে ইহা ধার করা যন্ত্র। ইহা প্রথমতঃ ভিন্নদেশীয় নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গীত বাজাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। পিয়ানো যন্ত্রের আবিষ্কার ও বর্ত্তমান উন্নতি করিতে এক শতাব্দি লাগিয়াছে। যদি ভারত চাবিওয়ালাযন্ত্রে মারাত্মক নৈপুণ্য লাভ করিতেই চায় তাহা হইলে তাহার নিজ সঙ্গীতের উপযোগী কোন কিছু আবিষ্কার করিবার জন্য সে দুই এক শতাব্দি বেশ অপেক্ষা করিতে পারে। * * * ইহাতে ( ভারতীয় সঙ্গীতে ) স্বরসংযোগ ( harmony ) প্রণালী যোগ করা আর ইহাকে হত্যা করা একই।"

বস্তুতঃ হারমনিয়াম্ যন্ত্রের অবাধ প্রচলনে আমাদের কণ্ঠস্বরের মধুরতা লোপ পাইতেছে। এই যন্ত্র দ্বারা আজীবন স্বরগ্রাম অভ্যাস করিলেও কাহারও সুর-বোধ হয় না, ইহা পরীক্ষিত সত্য। ভারতীয় সঙ্গীতের মধুরতা বর্দ্ধক "শ্রুতি" (সূক্ষ্ম সুর) গুলি এই যন্ত্রে নাই সুতরাং ইহাতে কাটা কাটা সুর বাহির হয়। "গমক" মূর্চ্ছনাদি যাহা আমাদের সঙ্গীতের বিশেষত্ব—যাহ

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ঢেউ তুলিয়া দেয় তাহা এই যন্ত্রে কিছুতেই বাজান যায় না। সুতরাং ইহার সঙ্গে গান করিলে বা স্বর সাধন করিলে কাটা কাটা সুরই অভ্যাস হয়। অধিকন্তু এই যন্ত্রের প্রবল সুর কণ্ঠস্বরের দোষ গুলি সর্ব্বদাই ঢাকিয়া রাখে। সুরবোধ জন্মাইতে এবং কণ্ঠস্বর প্রস্তুত করিতে আমাদের বহু পুরাতন "তানপুরা"ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সকলেরই "তানপুরা"—অবলম্বনে স্বর সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আজকাল আমাদের দেশে আর এক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। কবি হইলেই অনেকে গান রচনা করেন; কিন্তু একাধারে "কালোয়াত" এবং কবি না হইলে উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত রচনা করিবার কাহারও অধিকার নাই। অনেকেই আগে কবিতা রচনা করিয়া পরে কাহারও সাহায্য উহাতে সুর-সংযোগ করেন। ইহা রীতি নহে, সুর অনুযায়ীই কথা হওয়া উচিত। দেহ অনুযায়ীই জামা হয়, ইহার বিপরীত হইলেই বিড়ম্বনা। বাঙ্গলাগান রচয়িতাদের মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে তাঁহাদের গান অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে। কিন্তু একাধারে "কালোয়াত" এবং কবি নাই বলিলেই হয়। আমাদের নিধু বাবুর মধ্যে এই গুণ ছিল, তাই তাঁহার গানে কবিত্ব ও রাগিনী কোনটাই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আজকালকার অধিকাংশ গানে কবিত্ব খুব আছে—এমন কি পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী আছে, কিন্তু রাগরাগিনী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের এত সাধের রাগ-রাগিনী, ঋষিরা ধ্যানে যাহাদের মূর্ত্তি পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের কি দুরবস্থা! এ গুলি যেন বেওয়ারিশ মাল, যাহার যেমন ইচ্ছা সে তেমনই করিয়া ইহাদের অঙ্গচ্ছেদ করিতেছে। সরস্বতীর শোভন কুঞ্জ আজ কণ্টকসমাকীর্ণ হইতে চলিতেছে।

আজ য়ুরোপের নিরপেক্ষ গুণী ব্যক্তিগণ আমাদের সঙ্গীতের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য কত অর্থব্যয় ও উদ্যম প্রকাশ করিতেছেন এবং ইহার মাধুর্য্যে মোহিত হইতেছেন, আর আমরা কিনা নিশ্চেষ্ট হইয়া ইহাকে কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দিতেছি!

এখনও সময় আছে। যে সকল মহা গুণী ব্যক্তি বিভিন্ন দেশে আজও জীবিত আছেন অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক এখনও তাঁহাদের নিকট দেশীয় প্রথায় সাধনা করিয়া এই বিদ্যার চর্চ্চা করিলে ইহা লোপ পাইবে না,—আমাদের জাতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যা রক্ষা পাইবে। আবার বাণীর বীণায় নবীন ঝঙ্কার উঠিবে, এবং কিন্নরকণ্ঠে দিঙ্‌মণ্ডল আপূরিত হইবে,—মায়ের মলিন মুখে প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিবে।

অধিকাংশ য়ুরোপীয়গণই যেমন না বুঝিতে পারিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের নিন্দা করেন, ভারতীয়গণ ও তদ্রূপ য়ুরোপীয় সঙ্গীতের নিন্দা করিয়া থাকেন। আলোচ্য গ্রন্থে উভয় দলের উদ্দেশে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা গ্রন্থকারের অকপট সহৃদয়তার পরিচায়ক। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল:—

"These two tunes epitosmize for us the music of West and East. On the one side a repression of what is petty, a rejection of what is transient, a soberness in gaiety, an endurance in grief. On the other a vivid insight, the eager quest after wayside beauty, the dexterous touch that turns it to account. The one seems to say—Life is puzzling, its claims are many, enthusiasms hardly come by; but we will hammar out a solution not by turning away from ugliness but by compelling it to serve the ends of beauty. The other—Life is simple, and beauty close at hand at every moment whenever we look or wherever we go; the mistake "is in ourselves if we do not train our eyes and ears and hearts to find it." "Who would wish to decide which way was the best? Both are human. There is no need to decry one in favour of, or to exalt one at the expense of the other."—Page 339-340, Music of Hindusthan.

মর্ম্মানুবাদঃ—"এই দ্বিবিধ স্বরবিন্যাস প্রণালী আমাদিগকে সংক্ষেপে পশ্চিম ও পূর্ব্ব দেশীয় সঙ্গীতকলার আদর্শ দেখাইয়া দেয়। একদিকে নীচতার দমন, ' ণশ্বায়ী বস্তুর বর্জ্জন, প্রফুল্লতায় ধীরতা, দুঃখে সহিষ্ণুতা দৃষ্ট হয়। অপরদিকে প্রত্যক্ষ অন্তর্দৃষ্টি, পথপার্শ্বস্থ সৌন্দর্য্য—"উপভোগে ব্যগ্র অনুসন্ধিৎসা, এবং সেই সৌন্দর্য্যের সফলতা সম্পাদন প্রয়াসী নিপুণস্পর্শের উপলব্ধি হয়। একটি যেন বলিতেছে—জীবনটা যেন গোলক ধাঁধা, ইহার দাবি বহু, ইহার আবেগ পূর্ণ বাসনা কদাচিৎ ফলবতী হয়; কিন্তু আমার উহার জঘন্যতা হইতে দূরে না সরিয়া উহাকে সৌন্দর্য্যের উন্মেষ সাধনে বাধ্য করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইব। অন্যটি বলিতেছে—জীবন টা অতি সরল, এবং আমরা যখন যে দিকে নিরীক্ষণ করি বা যাহাই শুনি, অথবা যেখানেই যাই—সর্ব্বত্রই প্রতিমুহূর্ত্তে সৌন্দর্য্য আমাদের অতিনিকটে বিদ্যমান; আমরা যদি আমাদের চক্ষু, কর্ণ বা হৃদয়কে এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার শিক্ষা না দেই, তবে সে ভুল আমাদেরই।

কে বিচার করিয়া মীমাংসা করিতে চাহে যে কোন পথ (য়ুরোপীয় কি ভারতীয়) সর্ব্বোৎকৃষ্ট? উভয়ই মানব মন সম্ভূত, এক পন্থাকে বাড়াইতে যাইয়া—অন্যটিকে অপ্রশংসা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।"

আশা করি বিদেশীয় গুণজ্ঞের এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি আমাদের দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে, এবং তাঁহারা ইহার যথোচিত অনুশীলনে মনোনিবেশ করিবেন। সুখের কথা সকল বিষয়েই যেমন ঘরের দিকে লোকের দৃষ্টি ফিরিয়াছে, দেশীয় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের প্রতিও সেইরূপ হইতেছে।

আমাদের অন্তঃপুরেও ক্রমশঃ সঙ্গীতচর্চ্চা প্রবেশ লাভ করিতেছে; বহু ভদ্র ঘরের দুহিতা ও বধূগণ সেতার এস্রাজ প্রভৃতি দেশীয় সুমধুর যন্ত্রগুলি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষাকরাও একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু হারমনিয়ম বা পিয়ানো যন্ত্র বর্জ্জন না করিলে উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষা করা অসম্ভব।

অবশেষে গ্রন্থকারমহোদয়কে তাঁহার অকৃত্রিম সহৃদয়তা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম প্রসূত এই উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

---

## প্রায়শ্চিত্ত।

কটক কলেজে পড়িবার সময় একটী মান্দ্রাজী যুবকের সহিত আমার বড় ভাব হইয়াছিল। বিদ্যালয়ে একই স্থানে উভয়ে উপবেশন করিতাম এবং একই নিয়মে উভয়ের পাঠাভ্যাস চলিত। আর বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে, যতদূর সম্ভব উভয়ে একত্রে মহানন্দে কালাতিপাত করিতাম।

কলেজের পাঠ সাঙ্গ হইলে সে তাহার সুদূর সাগর-পারের মাতৃভূমে চলিয়া গেল, আমিও আমার বঙ্গদেশের পল্লীকুটীরে ফিরিয়া আসিলাম। মাঝখানে পড়িয়া রহিল এক অনন্ত ব্যবধান। আজ উভয়েই আমরা সংসারী—কিন্তু পবিত্র পাঠ্যজীবনের মধুর স্মৃতি এখনও তেমনি সজীব রহিয়াছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এক একখানি সুমধুর লিপি দূর ব্যবধানকে ক্রমশঃ নিকটতর করিয়া দিতেছে।

গতবারের দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের সময় সুদূর মান্দ্রাজ হইতে বহু অনুরোধ পূর্ণ আমার একখানি নিমন্ত্রণ চিঠি আসিল। তাহার প্রতি অক্ষরটী সেই বহুদিনের পবিত্র স্মৃতি পরিমার করুণকাহিনী জাগ্রত করিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। অনেকবার তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছি, এবার আর মনকে প্রবোধ দিতে পারিলাম না।

অতদূরদেশে সেই আমার প্রথম যাত্রা। ক্রমাগত দুই তিন সপ্তাহ মান্দ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন স্থান বন্ধুবরের সহিত ভ্রমণ করিয়া তাহার আবাস ভূমি ত্রিচিনাপল্লীতে কিছুদিনের জন্য স্থায়ী হইয়া রহিলাম। সে স্থানে এক অপূর্ব্ব বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। একাকী সহরের উপকণ্ঠে ভ্রমণ

করিতে করিতে তাঁহার সহিত একদিন আমার পরিচয় হয়। বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী মান্দ্রাজবাসীর মধ্যে আমার বাঙ্গালীর বেশ দেখিয়া নিজেই সস্নেহে আমাকে ডাকিয়া লইয়াছিলেন। অঙ্গুলিসঙ্কেতে অদূরে তাঁহার আবাসস্থান প্রদর্শন করিয়া পুরাতন পরিচিতের মত আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহে লইয়া গেলেন। প্রথম দিবস তাঁহার সহিত আলাপের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে স্থির করিলাম, কাল আবার আসিতে হইবে।

তদবধিক কি এক মোহিনীমন্ত্র মুগ্ধ হইয়া আমি যেন তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। প্রতিদিন একবার তাঁহার আবাসে যাইতেই হইবে। কোনদিন বা আমার বন্ধুবর সঙ্গে থাকিতেন। কে এই স্বনির্ব্বাসিত মহাপুরুষ এই দুর্গম দূরদেশে সঙ্গীবিহীন অপূর্ব্ব জীবন যাপন করিতেছেন! পক্ষাধিক কাল তাঁহার পরিচয় পাইবার জন্ম কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল। এইমাত্র জানিলাম, তিনি একজন বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান।

লোকালয় হইতে প্রায় দেড়মাইল দূরে একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে কয়েক খানা কুটীর। চারিদিকে আর কোন জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। এমন এক স্থানে তিনি তাঁহার নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছেন। একদিন তিনি আমাকে তাঁহার কুটীরগুলি দেখাইতে লাগিলেন। আমি শুধু নির্ব্বাক হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখিতে লাগিলাম গৃহস্থগুলি কতিপয় ব্যধি বিষজর্জ্জরিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত নরনারীতে পরিপূর্ণ। বিস্ময়ের পর আরও বিস্ময় এই যে তাহারা সকলেই সে দেশবাসীর পরিত্যক্ত ঘৃণিত কুৎসিত 'পারিয়া' জাতি। তাহাদের রোগজীর্ণ দেহ দেখিবামাত্রই একটা ভীতির সঞ্চার হয়। আমার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, কে এই মহাপুরুষ—দলিত, পরিত্যক্ত এক পতিত জাতির সেবায় আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। দিনের পর দিন দেখিতে লাগিলাম,—অক্লান্ত পরিশ্রমে চির হাসিমুখে তিনি রোগীদিগকে ঔষধ পথ্য দিতেছেন—রাত্রি জাগিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন—নিজের সুখস্বাস্থ্যের দিকে একটুকুও দৃষ্টিপাত নাই। তাঁহার বয়স অনুমান পঞ্চাশতের কাছাকাছি হইবে; দেহের শক্তি অনেক ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে,—কিন্তু তাঁহার বদন মণ্ডল একটা চিরপবিত্র গৌরবপরিমায় দীপ্ত—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপবান যুবকের বদনেও বুঝি তাহা দুষ্প্রাপ্য। কেনই বা তাঁহার এই অপূর্ব্ব নির্ব্বাসন—আর অত্যদ্ভুত এই মহান্ জীবন যাপন। আজ আমাকে জানিতেই হইবে, এ জীবনের কোথায় আরম্ভ আর কোথায়ইবা পরিণতি।

মাসাধিককাল তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাই বড় সাহসে বুক বাঁধিয়া একদিন সকল জানিবার বাসনা তাঁহাকে জানাইলাম। আমার বাসনা পরিপূর্ণ হইল। তাঁহার জীবন কাহিনী বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া গেলেন—আমি চিত্রার্পিতের মত শুধু সেই অভূতপূর্ব্ব মহাবিস্ময় কাহিনী শুনিতে শুনিতে শিহরিয়া উঠিলাম—

"শোন তবে নিষ্ঠুর যুবক! এ জীবনে কাহাকেও জানিতে দেই নাই অস্থিচর্ম্মসার এই দেহের আড়ালে কি ভয়ঙ্কর বহ্নি আমাকে দিবানিশি খাক্ করিয়া দিতেছে। আজ পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত জগৎকে শুধু প্রতারণা করিয়াই আসিতেছি; কিন্তু এই জীবন রেখার সীমান্তে দাঁড়াইয়া আর প্রতারণা করিতে সাহস পাইনা। তাই এখন হইতে নির্ভীক হৃদয়ে সকল লজ্জা দূর করিয়া আমার কলঙ্ক-কাহিনী জগতকে জানাইব। ইহাই আমার প্রায়শ্চিত্ত।

ঢাকা জেলার একটী পল্লীগ্রামে আমার জন্ম হয়। সংসারে পিতামাতা ছাড়া আর কেহই ছিলেন না, আমিও তাঁহাদের একমাত্র সন্তান ছিলাম। পিতামাতা আমার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। অতি যত্নে লালিত পালিত হইয়া বড়ই আব্‌দারে হইয়াছিলাম। বাল্যকাল অবধিই গ্রাম্য দুর্দ্দান্ত বালকদের সহিত অতি আনন্দে কালাতিপাত করিতাম। পিতামাতার শাসন কাহাকে বলে জানি নাই। মাঝে মাঝে একটু আধটু পড়াশুনায় মনঃসংযোগ করিতাম। তাই একুশ বৎসর বয়সে উপর্য্যুপরি তিন বার অকৃতকার্য্য হইয়া চতুর্থবারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।

তদবধি ধরাটা আমার কাছে সরাখানার মতনই জ্ঞান হইতে লাগিল। পিতা আমাকে কালেজে পড়িতে কলিকাতায় পাঠাইলেন। সেখানে গিয়া আমি নূতন

সঙ্গীদের সহিত নিত্য নূতন রঙ্গে জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। এদিকে যত মূর্খ, যতদুর্দ্দান্তই হই পিতামাতা আমাকে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ মনে করিতে লাগিলেন। তাই তাঁহারা বড় জাকজমকে আমার বিবাহোৎসব করিতে মাতিয়া গেলেন। পিতা প্রতিজ্ঞা করিলেন, দশহাজার টাকার কমে তাঁহার সোণার ছেলের বিবাহ দিবেন না। এই আশায় বুক বাঁধিয়া বহু কন্যাকর্ত্তার পাঁচ হাজারের প্রস্তাবকে তিনি কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শেষে একদিন সত্য সত্যই তাঁহার মৃগ-তৃষ্ণা সফল হইতে চলিল।

পিতার দ্বারে একজন ধনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার প্রার্থনীয় যাহা কিছু সকলই দিতে তিনি প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু পিতা আমার অতুল অর্থরাশির উন্মাদনায় আর কিছুই দেখিতে চাহিলেন না। একবার তাঁহার পুত্রের মতের প্রতীক্ষা করিলেন না। শুধু বধিরের মত শুনিয়া গেলেন—মেয়েটী কালো কুৎসিত।

এ পাপমুখে আর আমার পূজনীয় পিতৃদেবের নিন্দা করিয়া লাভ কি? আমিও অর্থরাশিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলাম। তখন আমার ভাবিবার সময়ও তেমন শক্তিও ছিলনা, যে যাহাকে ইহকাল পরকালের সঙ্গী করিতে হইবে তাহার বিষয় একবার আমার বিবেক বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করি।

বিপুল ঐশ্বর্য্য বহন করিয়া নববধূ গৃহে আসিল। গ্রাম্য সকলে বৌ দেখিতে আসিয়া পিতাকে গালি দিয়া চলিয়া গেল—মাতা নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন—আর আমি পিতার সহিত কন্যাকর্ত্তা প্রদত্ত বহুমূল্য দ্রব্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুদিন চলিয়া গেল। পত্নীরদিকে চাহিয়া তখন তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। তাহার শত পরিপাটী গৃহ কাজটীতেও আমি নূতন নূতন ক্রটী দেখিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলাম। কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশী, যাহারা তাহাকে কুৎসিত বলিয়া ঘৃণা করিত দুই একমাস মধ্যেই সকলে তাহার রমণীজনোচিত মধুর স্বভাব ও অন্যান্য গুণরাশিতে মোহিত হইয়া গেল। তাহার চরিত্রমাধুরী পিতামাতার হৃদয় জয়করিল—পাড়াপ্রতিবেশীর আশীর্ব্বাদ কাড়িয়া নিল; কিন্তু বহু চেষ্টাতেও হতভাগিনী তাহার উদ্ধত স্বামীর স্নেহলাভ করিতে সমর্থ হইল না।

কয়েক বৎসর পরে পিতা সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কালেজে পড়িবার অছিলায় মাতাকে ফাঁকি দিয়া কলিকাতায় থাকিয়া অধঃপাতে যাইতে লাগিলাম, দিনের পর দিন আমার অর্থতৃষ্ণার সহিত রূপতৃষ্ণাও বাড়িতে লাগিল। তখন বিশাল নগরীর পাপসাগরে অবাধে জীবনকে ভাসাইয়া দিলাম। তুলিয়া উঠাইতে আমার কেহ রহিলনা—অন্তরঙ্গ বন্ধুবৃন্দ ঢেউয়ে ঢেউয়ে আমাকে অকূল সাগরে নিয়া চলিল।

মতার আকুল ক্রন্দনে একবৎসর পরে আবার গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু সে পবিত্র স্থান ত আমার ন্যায় মহাপাপীর জন্য নহে। ক্রমশঃই সাধ্বী, সরলা কুৎসিত পত্নী আমার চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। তাহাকে অকারণে নিষ্ঠুর ভাবে কত যাতনা প্রদান করিয়াছি, আজ তাহা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। একদিনের কাহিনী শ্রবণ কর, অরে আমি শয্যাগত। মাতা বিশেষ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় আমার কুৎসিত সুরমাকে (সেই ছিল তাহার নাম) দিয়া পথ্য পাঠাইয়া দিলেন। একে রোগযন্ত্রণায় অস্থির, তদুপরি তাহাকে দেখিয়া আমি উন্মত্ত হইলাম। পথ্যের বাটী সজোরে সেই অভাগিনীর দেহের উপর নিক্ষেপ করিলাম। তাহার কপাল কাটিয়া দরদর ধারে রক্ত বাহির হইতে লাগিল—অমনি সেই স্থানে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া অচেতন ভাবে পড়িয়া রহিল। কিন্তু তাহাতে এ নিষ্ঠুর পাষাণ হৃদয় একটুমাত্রও বিচলিত হইল না। নীরবে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শুইয়া রহিলাম। পতন শব্দে মাতা আসিয়া তাঁহার গৃহলক্ষ্মীকে বহুযত্নে চেতনাদান করিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। আমাকে গালি দিতে দিতে তাঁহার নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, সে দিনটা অনশনে কাটাইয়া দিলেন।

এমন কাণ্ড বহুদিন ঘটিয়াছে—কিন্তু এ কঠিন হৃদয় নরম হইল না। অবশেষে একদিন শুনিয়া তুমি শিহরিয়া

উঠিবে, এই দেখ আমারাও স্মরণ মাত্রে হৃৎকম্প হইতেছে—একদিন সন্ধ্যার পরে নেশার ভরে হেলিতে দুলিতে স্থির করিলাম—আজই উহাকে ইহলোক হইতে বিদায় দিতে হইবে। মাতাকে নিদ্রিতা দেখিয়া সাহস বাড়িল। একটা তীক্ষ্ণ ছোড়া হাতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, হতভাগিনী নিদ্রিতা রহিয়াছে। দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়াছি, তথাপি সভয়ে এদিকওদিক চাহিয়া যেই তাহার বক্ষোপরি শাণিত ছোড়াখানি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছি—আমার চকিত পদক্ষেপনে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ছোড়াখানি সহসা ভূপতিত হইল; মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম—সজল নয়নে, করুণদৃষ্টিতে হতভাগিনী আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সে দৃষ্টিতে চকিতে আমার সকল নেশা টুটিয়া গেল—আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না, ঘর্ম্মাক্ত দেহে বাহিরে ছুটিয়া আসিলাম।

পরদিনই কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। কয়েকদিন কলেজ ব্যতীত মেসের বাহিরে যাই নাই। পুরাতন সাথীসঙ্গীরা আসিয়া ফিরিয়া গেল। দিবানিশি শুধু কি এক চিন্তায় অন্তরে অন্তরে জ্বলিতে পুড়িতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইত সেই তীক্ষ্ণ ছোড়াটা নিজবুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া পাপময় জীবন শেষ করিয়া দিই।

শুনিতে পাইলাম সেই ভীষণ রাত্রি শেষ হইতেই সুরমা জ্বরাক্রান্ত। এতদিন পরে একটু বিচলিত হইলাম। মনে পড়িতে লাগিল অভাগিনীর সে দিনের করুণদৃষ্টি। কিছুদিন পরে মাতা চিঠি লিখিলেন,—'সুরমা বিকারগ্রস্ত—হতভাগা, একবার আমার সোণার গৃহলক্ষ্মীকে শেষ দেখা দিয়ে যা।' তাহারই সাথে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আর একখানি চিঠি রহিয়াছে—"ইহজীবনের দেবতা আমার,—বহু পুণ্যফলে তোমার পদে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু জন্মান্তরের পাপরাশিতে সকল বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গেল। তুচ্ছ, ঘৃণিত আমার এ নারীজীবন দিয়া তোমার কিছুই করিতে পারিলাম না বরং তোমার অশান্তির মাত্রায় আরও আহুতি দিয়াছি। তাই মরণ সময়ে ভয় হইতেছে আমার ন্যায় মহাপাতকীর যেন কি ভয়ঙ্কর শাস্তির ব্যবস্থা হয়। জীবনে তোমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করি নাই—আজ আমার প্রথম ও শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিবে কি? মৃত্যুশয্যায় শায়িত হতভাগিনীকে একবার পদধূলি দিয়া যাও—আমার সমস্ত জীবনের দুঃখ তাহা হইলে মরণের শান্তিতে ঘুচিয়া যাইবে।'

ইহাই তাহার প্রথম ও শেষ বাণী। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের গায়ত্রীগাথার আজও তাহা আমার বক্ষঃস্থলে অঙ্কিত রহিয়াছে।

পত্র পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। অসহ্য বেদনায় অভিভূত হইয়া সেই দিনই গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভগবানে বিশ্বাস ত কোন দিনও ছিল না—কিন্তু সেদিন পথে পথে কেন যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে চলিলাম—"ভগবান, আমার সুরমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।" দুস্তর পথ যেন আর কমিতে চাহে না—এক মুহূর্ত্ত এক একটী দীর্ঘ দিবসের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। অতি কষ্টে তৎপরদিবস রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় নিজ গ্রামপ্রান্তে পৌঁছিলাম। অন্ধকারে ভয় পাইলাম না, একাকী নিজ গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিলাম—মনে মনে শুধু আমার সেই প্রার্থনা, "ভগবান, সুরমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।" হঠাৎ আমার দ্রুতগতি মন্থর হইয়া গেল—হস্ত পদ অবশ হইয়া পথপ্রান্তে বসিয়া পড়িলাম। রজনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া ঐ কিসের কোলাহল শোনা যাইতেছে। হরি, হরি, বুঝি সব শেষ হইয়া গিয়াছে! দূরগগনে আর্ত্তকণ্ঠে রব শুনিতে পাইলাম—"হরিবোল" "হরিবোল।" কাননভূমি কম্পিত করিয়া সে বিকটধ্বনি আমার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল—"হরিবোল" "হরিবোল।" অতিকষ্টে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দূর হইতে দেখিলাম—এক বিকট শ্মশান দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে—তারই পাশে পাগলিনীর মত মা আমার আর্ত্তনাদ করিতেছে প্রতিবেশীগণ অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মাঝে মাঝে সেই পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, "হরিবোল" "হরিবোল।"

আর কাহাকেও এ পোড়ামুখ দেখাইলাম না।

শুধু সেই শ্মশানের অগ্নিরাশি বুকে ধরিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন নগর নগরী ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে অপর প্রান্তে ছুটিয়া আসিলাম কোথাও আমার শান্তি মিলিল না। লক্ষ বৃশ্চিক দংশনের মত অহর্নিশি সেই চিতার আগুন আমার বুকে জ্বলিতে লাগিল। উন্মত্তের মত এক গভীর রজনীতে এই সহরপ্রান্তে ঘুরিতে ঘুরিতে নদীতীরে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। মনে হইতে লাগিল—আমার মত মহাপাপীর আর জীবন ধারণ করিয়া লাভ কি? আর ত এ পাপময় দেহপিণ্ড বহন করিতে পারি না! আজ এইখানেই এ জীবনের অবসান হউক! তাহারই সাথে আবার সেই চিতাগ্নির স্মৃতি জ্বলিয়া উঠিল। আর না; এই ত খরস্রোতা নদী বহিয়া চলিয়াছে—উহারই গর্ভে আজ এ পাপ জীবন বিসর্জ্জন করি।

এই ভাবিয়া উন্মাদের মত নদীবক্ষে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি, সহসা কিসের আর্ত্তনাদে যেন আমার প্রবলবেগ রুদ্ধ হইয়া গেল। আমি চমকিয়া তীরে উঠিলাম। তীব্র আর্ত্তনাদধ্বনি আরও সুস্পষ্টতর শুনিতে পাইলাম। দূর হইতে সে ধ্বনি আমার মর্ম্মস্পর্শ করিল। এ কর্ণে ত কত দুঃখীর, কত ব্যাধিপীড়িতের আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি—পাষাণ প্রাণে কোন দিনও ত তাহা এমন স্পর্শে করে নাই। আজ এ ব্যাকুলতা কোথা হইতে আসিল!

ছুটিয়া আসিয়া দেখিলাম একখানি ভগ্ন কুটীরে কতিপয় সহরের পরিত্যক্ত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হতভাগাগণ ব্যাধিযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিকট চীৎকারধ্বনি তুলিয়াছে। এক বিন্দু জলের জন্য কত না কাকুতি মিনতি করিতেছে। চারিদিকে জনমানবের সারাশব্দ নাই। তাহাদের বিষম যন্ত্রণা দেখিয়া জীবনে সেই প্রথমদিন পরের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আবার সেই চিতার আগুন হুহুকারে জ্বলিতে লাগিল—সে বিকট স্মৃতি মনে করাইয়া দিল, ব্যাধির কি যাতনা, অত্যাচারের কি যাতনা।

আর মরিবার বাসনা রহিল না। এতদিন পরে আমার কর্ম্ম জুটিয়া গেল। দিনের পর দিন দেখিতে লাগিলাম, এ প্রদেশের হিন্দুমণ্ডলী 'পারিয়া' জাতির উপর পশুর ন্যায় নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকে। ব্যাধিপীড়িত হইলে একবিন্দু জল কেহ মুখে তুলিয়া দেয় না। কুষ্ঠ রোগীগণকে অমন করিয়া সহরপ্রান্তে ফেলিয়া রাখে। ঘৃণিত, দলিত, ব্যাধিপীড়িত সেই কুৎসিত জাতিকে আমি মাথায় তুলিয়া লইলাম। স্থির হইল ইহাদের সেবায় তুচ্ছ জীবন অতিবাহিত করিব।

আর বঙ্গদেশে ফিরিয়া যাই নাই। মাতৃদেবী তাঁহার অবশিষ্ট জীবন ৺কাশীধামেই যাপন করিয়াছিলেন—বাকী সম্পত্তি তদবধি এই কার্য্যেই ব্যয় করিতেছি।

আমার স্বদেশীয় যুবক! একদিন কালো কুৎসিতকে ঘৃণা করিয়াছিলাম, আজ তাহারই প্রায়শ্চিত্তের জন্য—সকলের ঘৃণিত, কুৎসিত এক জাতির রোগপলিত পদতলে বসিয়া ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি; ইহারাই আমার নারায়ণ। লোক চক্ষুর অন্তরালে পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত একাকী ইহাদের সেবা করিয়া কালাতিপাত করিতেছি। দিনেকের জন্যও আজ পর্য্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ি নাই। অহর্নিশি সেই চিতার আগুন ধিকি ধিকি বুকে জ্বলিতেছে। তাহারই বিকট স্মৃতি এই ব্রতে চিরদিন আমাকে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছে। তাহারই শেষ করুণদৃষ্টি আমার পাপপঙ্কিল নিরাশ হৃদয়ে আশার আলো প্রদান করিতেছে। ধ্যানে, জাগরণে, শয়নে, স্বপনে অহর্নিশি এই দীন কুটীরে—এই বক্ষপিঞ্জরে জাগ্রত রহিয়াছে আমার সেই অতীত-প্রতিমা।

পঁচিশ বৎসর ত এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। তবু আজ এই পঞ্চাশতের পরপারে—এই জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, নিশিদিন কাঁপিয়া উঠিতেছে—বুঝি আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত শুধু এ জীবনে পূর্ণ হইবার নহে!

শ্রীসুকুমার দাসগুপ্ত

# DHARMA SAMAVAYA LIMITED.

## A CENTRAL CO-OPERATIVE ORGANISATION FOR PROMOTING UNION FOR CREDIT, THRIFT, TRADE, INDUSTRY, AGRICULTURE, INSURANCE, SANITATION AND EDUCATION.

**Registered under the Indian Company's Act, in June, 1910**

Dividends on Shares, paid for the last three years, have been 25 per cent per annum. Dividends will be distributed quarterly for future years beginning with July, 1914.

The Memorandum of Association of the Samavaya provides for one hal of the net profits of each year being devoted to promotion of Religion Co-operation, and Economic Development of the Natural Resources.

Business transacted :—Builders, Engineers, Architects and Contractors-protectors of Cattle ; Suppliers of pure and wholesome Dairy Produce ; Purchase Sale and Efficient Management of Land ; Establishment and Administration of Schools and Sanitariums ; Housing on the Hire-purchase System ; Land, Improvement on Co-operative Principles ; Intensive Cultivation, Town-planning and Tenant-Co-partnership, on the Garden-City and Suburb methods.

**SPECIAL NOTICE.**

Shares of DHARMA SAMAVAYA LIMITED, subscribed and paid for but between 16th April, 1914, and 31st May, 1914, will earn one-fourth of the Dividend, to be declared for our current financial year, ending 30th June, 1914. The list of Share-holders will remain closed, for the said year, during the month of June, 1914, and no sale or transfer of Shares will be transacted therein as for that year. Shares taken in June, 1914, will be sold at par value and earn full dividends from our next financial year, beginning with 1st July, 1914.

*Particulars supplied on application.*

SAMAVAYA MANSIONS,
CORPORATION PLACE, CALCUTTA.
*17th April*, 1914.

**A. C. UKIL,**
*Organiser.*

# অক্সফোর্ড প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকাবলী।

আলেন্ কোয়াটার্মেন্— সুপ্রসিদ্ধ লেখক সার্ রাইডার হাগার্ড প্রণীত

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১০ ফর্ম্মা। মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীজলধর সেন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ—

প্রেমিক সন্ন্যাসী—( The Cloister and Hearth নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ )

সুন্দর ছাপা ও কাগজ। মূল্য ॥০ আনা।

লে মিজেরাবল্—( প্রায় ৫০ ফর্ম্মা, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী )।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত এবং

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

( যন্ত্রস্থ )

ইউরোপীয় মহাসমর সংক্রান্ত পুস্তকাবলী—

ইউরোপের মহাসমর ( ১৫ ফর্ম্মা ডবল ক্রাউন ) ইহাতে মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত সকল বিষয়ই লিখিত আছে। টেলিগ্রাম, পত্রাদি সন্ধিবিধি এবং অন্যান্য সমুদয় ব্রিটিশ white, বেলজিয়ম, গ্রে-বুক প্রভৃতি সরকারী নথি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। মূল্য ৸৵০ আনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

রণ ভেরী—( Sir Arthur Conan Doyleএর পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ। মূল্য /০ আনা মাত্র।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অন্যান্য পুস্তক শীঘ্রই বাহির হইবে।

Oxford University Press.

London New york Melbourne Cape town.

Bombay Hornly Road. Madras Sankarram Chetty.

Agents for Vernacular Publications—

Das Gupta &c. 54/8 College Street, Calcutta.

City Library Patuatoly, Dacca.

# SELF-SUPPORTING INDUSTRIAL COLONY.

## In conjunction with the Indian Self-Supporting Educational Colonies Association.

The object is to form an industrial and educational organisation in which young men and boys will be trained to support themselves and pay for their training by their labour, and in which it is hoped that they will be able afterwards to remain, earning good remuneration and forming the nucleus of an industrial and agricultural organisation on the co-operative principle. After a year's training, however, they will be free to leave if they find that the experience they have gained opens up better prospects to them elsewhere.

The general plan is to employ the young men and boys under training about six hours a day on practical industrial work and to give them one and a half hour, mostly in the evening, of literary and theoretical instruction.

Training will be given at first in ELECTRICAL and MECHANICAL, METAL and CARPENTERING work for about fifteen pupils, TANNING about five, WEAVING and SCIENTIFIC AGRICULTURE about ten.

The establishment is under the immediate charge of Captain J. W. Petavel, Organising Secretary of the Educational Colonies Association, and under a committee presided over by the Hon'ble the Maharajah of Cossimbazar, who is founder and patron of the estabishment.

*The committe will be pleased to hear from the guardians of young men who disire to join. They must be industrious and fit, physically and otherwise for the work.*

*A limited number of suitable candidates are being received free of board and all charges from the beginning.*

The regular charge for board is Rs 8 per month but after three months all will be expected to earn their board by their labour. Those failing to do that will not be kept in the Institution unless there is some reason for their failure.

Pupils reside at Berhampore, Bengal, in a house lent by the Hon'ble the Maharajah for the purpose.

Applications to be addressed to
CAPTAIN PETAVEL,
*Cassimbazar, E. B. S. R.*
(Murshidabad District) Bengal.

**COMPOUND ELIXIR OF ASWAGANDHA WITH SODIUM GLYCEROPHOSPHATE & FORMATE.**

**Now being prescribed by the leading physicians of Calcutta.**

This preparation is similar in composition to the celebrated **Aswagandha Rasayan** of the ancients and contains in addition some of the most powerful tonics of modern pharmacopoeia. A powerful tonic and stimulant for mental and nervous and muscular debility and a valuable sustainant during prolonged mental and physical exertion.

CURES MENTAL AND PHYSICAL WEARINESS

**Rs. 1 8 a BOTTLE.**

**Bengal Chemical & Pharmaceutical Works, Ld.**

***91 Upper Circular Road, CALCUTTA.***

ট্রেড **"নির্ব্বেদিন"**

## যাবতীয় বেদনা নিবারণে অমোঘ

মাথাধরা, মাথার কট্‌কটানি ও আধ কপালে প্রভৃতি যাবতীয় শিরঃপীড়া, দন্তশূল, স্নায়ুশূল, কর্ণশূল প্রভৃতি সকল প্রকার শূল ব্যথা আমাদের "নির্ব্বেদিন" ট্যাবলেটে তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়।

ছাত্র, শিক্ষক, উকিল প্রভৃতি যাঁহারা অত্যাধিক মানসিক পরিশ্রম জন্য শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকেন তাঁহারা এই ঔষধ সেবনে উপকার পাইবেন।

মূল্য ১৬ ট্যাবলেট ।৵০ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

অধ্যাপক শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য কৃত

# সংস্কৃত নাটক কথা সংগ্রহ গ্রন্থাবলী

১। সেক্সপীয়র নাট্যের অতুলনীয় সম্পদ ল্যেম্ব যেমন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অধিগম্য করিয়া তুলিয়াছেন গুরুবন্ধু বাবুর অভিনব উদ্যমে সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্যের রুদ্ধ দ্বার আজ তেমনি করিয়া খুলিয়া গেল। সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকারগণের গ্রন্থাবলী ছবি ও ছাপার চরমোৎকর্ষে ভূষিত হইয়া খণ্ডে খণ্ডে গল্পাকারে বাহির হইতেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম-এ, বিদ্যাম্বুধি মহাশয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। প্রতিখণ্ডের মূল্য ॥০ আনা। অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহক হইলে ( ১১ খণ্ডের জন্য ) সহ ডাকমাশুল ৪॥০ টাকা।

বালক, যুবক, বালিকা ও যুবতীগণ অসঙ্কোচে পাঠ করিয়া ভারতীয় কবিগণের অলৌকিক কবিত্বের স্বাদগ্রহণ করিতে পারিবে।

এণ্টিক কাগজ, চমৎকার ছবি ও চমৎকার প্রচ্ছদপট—উপদেশ ও উপহার গ্রন্থ একাধারে এরূপ আর নাই।

২। লুপ্ত রত্নের উদ্ধার। মহাকবি ভাসের ( খৃঃ পূঃ ১৫০ ) সমগ্র সংস্কৃত নাট্য-গ্রন্থাবলীর অনুবাদ। দশ খণ্ড—প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ আনা। এণ্টিক কাগজ, চমৎকার ছাপা।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়,
সিটি লাইব্রেরী, পাটুয়াটুলী, ঢাকা। গুরুবন্ধু গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ও একমাত্র এজেণ্ট।

VOL. 5. No. 4.

JULY, 1915.

# THE Dacca Review

CONDUCTED BY
BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,
AND
SATYENDRANATH BHADRA, M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . Rs. 5-6-0
Single Copy . . . . . 0-8-0

SAHITYA PARISHAD LIBRARY

**EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN**

But impartial verdict comes from the public and the Press

**USE**

# ORIENTAL SOAPS.

FOR

**They are the best for economy and complexion**

## THE ORIANTAL SOAP FACTORY,

*GOABAGAN, CALCUTTA.*

*Tel: "Kowstove," Calcutta.*

**By Special Appointment**

## To H. E. Lord Carmichael of Skirling
## Governor Of Bengal.

# S. A. MAJID & Co.

## Certificated Opticians

*12 Patuatuli, Dacca.*

**OPTO—Eye. METRY—to Measure.**

**A Peculiar Nationalist and Practical Unionist.**

**Prescriber of needful Tonics for the chronical Idleness of India**

**Specialist in attractive Designs, as to touch Human Feelings, to raise any National Subscription successfully.**

Professor for 10 years. in Eye-sight Testing and Spectacles Art.

Our methods of examination and tests of the EYES for the adaptation of lenses for the correction of defects of vision and relief of eyestrain and its accompanying symptoms, are based upon accurate measurements of the refraction and the associated functions of the eyes. Glasses fitted under this system are invariably found satisfactory and curative. The latest and most approved apparatus for accurate sight testing are used in our dark room. Examination by appointment preferred.

---

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Mayabazar Road, Dacca,

and

Published by HARI RAM DHAR B.A. Pataatoli, Dacca

# Edwards Tonic

**The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.**

*Sole Agents* :—**B. K. PAUL & CO.,** *7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.*

**Cytogen** AN IDEAL DIGESTIVE TONIC WINE

*Invaluable in* CONVALESCENCE *from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c.,*

*Extremely Useful in Anæmia, Nervous Debility, Loss of Appetite, Indigestion, Acidity &c.,*

**INDISPENSABLE AFTER PARTURITION**

Price Rs 1-8-0 Per Bottle.

**B. K. Paul & CO.,**
CALCUTTA.

Branch Sovabazar Street.

Head office:—7 & 12, Bonfield's Lane Calcutta. | The Research Laboratory :—18, Sashi Bhusan Sarker's Lane.

# অধ্যাপক শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ এম, এ প্রণীত।

১। ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা ... ... ... ... ||০
(2) Sanskrit learning in Bengal ... ... ... ||০
(3) Pramāns of Hindu Logic ... ... ... |০

আসাম, গৌহাটী গ্রন্থকারের বাসায় প্রাপ্তব্য।

---

## বহুচিত্রে শোভিত।

## প্রাইজ দেওয়ার নূতন পুস্তক।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

### ১। মহরম।

সকলজাতির নিকট সমান আদরের সেই মহরমের কাহিনী সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা। ৪ খানা ছবি।

### ২। প্রহ্লাদ।

হরিভক্ত প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত সরল ভাষায় লিখিত। মূল্য ।৵০ আনা।

পপুলার লাইব্রেরী—ঢাকা।

---

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

# শক্তি ঔষধালয়

অধ্যক্ষ—শ্রী মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ, হিন্দু কেমিষ্ট ও ফিজিসিয়ান। ঢাকা।

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট, ঢাকা।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন্ রোড্ (হাওড়া পুলের নিকট)
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১নং আপার সার্কুলার রোড্ (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—
৭১।১ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—১২ দশাশ্বমেধ ঘাট।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের।
অমৃতপ্রাস ঘৃত—১০৲ সের।
ছাগলাদ্য ঘৃত—১০৲ সের।
মেধাস্মৃতি বর্দ্ধক ও ছাত্রগণের সহায়। ব্রাহ্মীঘৃত—৬৲ সের)

দাদ্‌মার—৵০ কৌটা। (এক দিনে দদ্রু নিশ্চয় আরোগ্য)।
দশন সংস্কারচূর্ণ—৵০ কৌটা। (সর্ব্ববিধ দন্তরোগের মহৌষধ)।
মরিচাদি মলম—৵০ কৌটা। (খুজলী পাঁচড়ার মহৌষধ)।

বহুরের ননী—৷০ শিশি। (নালীঘা, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মহৌষধ)।
অমৃতারিষ্ট—৷০ আনা শিশি। (ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত ও সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ)

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শক্তি বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ,
হিন্দুকেমিষ্ট এবং রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্‌মাষ্টার

**দি নিউ ফরমুলা কোম্পানী** কোন প্রশংসা পত্র না ছাপাইয়া মফঃস্বল হইতে এত দম্ভ করিয়া পেটেণ্ট ঔষধে অবিশ্বাসী রোগীকে আহ্বান করিতেছে কেন, একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশ্বাস করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন ?

**আমাদের আলছারিণে** পারদাদি দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে আদালতে দণ্ডনীয় হইব। ইহা শিশু ও বৃদ্ধের পক্ষে ঈশ্বর-প্রেরিত। **আলছারিণ** নালী ঘা, ভগন্দর, ফোড়া, বাগী, কারবাঙ্কোল ও উপদংশের ব্রহ্মাস্ত্র। দূষিত, ক্ষত ও বিস্ফোটকের তীব্র জ্বালা সদ্যসদ্যই নিবারণ করিয়া থাকে—ইহা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নহে।

**আলছারিণে ক্ষত ধুইতে হয় না, ব্যাণ্ডেজ করিতে হয় না, অস্ত্র ও প্রোবের ছায়াও মাড়াইতে হয় না।**

এমন নির্দ্দোষ ও মূল্যবান ঔষধের মূল্যও এজেন্টগণের অনুরোধে গৃহস্থের সুবিধার জন্য পূর্ব্ব হইতে অনেক কম করা হইল। শিশি ৮৵০ ; ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। বিনামূল্যে আলছারিণের বিবরণ পত্র পাঠান হয়।

**আমাদের এণ্টাসিডি—সোডা ও এসিড বর্জ্জিত, সেবনে সুস্বাদু** যিনি ২।১ দিন অন্তর কাল কঠিন মলত্যাগ করেন, যাঁহার বাল্যকাল হইতে লিভারের দোষ আছে, আহারের পর পেটে বেদনা ধরে, যিনি দারুণ অম্লশূলে যন্ত্রণা পাইতেছেন, অম্লে যাহার বুক জ্বলিয়া খাক হইতেছে ; তিনি একবার কিছু দণ্ড দিলেন মনে করিয়াও আমাদের এণ্টাসিডি ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। মূল্য বড় শিশি ১।০, বিনামূল্যে বিবরণ পত্র পাঠাই।

**ভদ্রলোক ও স্কুলের** ছাত্রদিগের উপযোগী সুগন্ধি, জ্বালা নাই, পারা নাই, দাগ লাগে না, যে কোন দাদ ২ দিনে সারে। **দদ্রুলীন** মূল্য শিশি ।৵০।

**আমাদের বাতঘ্নী**—পেটেণ্টের চরম উৎকর্ষ, যাবতীয় বাত, গাউট, রিউম্যাটিজম্, গণোরিয়া ও উপদংশ-জনিত বাত ৩ দিনে নরম না পড়িলে মূল্য ফেরত দিব। শিশি ১।০।

দি নিউ ফরমুলা কোম্পানী।
কান্দী পোঃ—মুর্শিদাবাদ।

---

ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব গণিতাধ্যাপক

**শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম. এ. মহাশয়ের**

প্রতিষ্ঠিত

## "ধন্বন্তরি ঔষধালয়"।

গারুড়গী, পোঃ আঃ হাসাইল, জিঃ ঢাকা।

ব্যবস্থাপক কবিরাজ { শ্রীচন্দ্রভূষণ সেন কবিরঞ্জন।
শ্রীইন্দ্রভূষণ দাশ গুপ্ত ভিষগরত্ন।

এই ঔষধালয়ে সর্ব্ববিধ তৈল, ঘৃত, বটিকা, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি অকৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত ও সুলভে বিক্রয় হয়। মফস্বলের রোগীদিগকে মনোযোগের সহিত ব্যবস্থা করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে অতি যত্নের সহিত ঔষধ পাঠান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। চিঠি পত্রাদি আমার নামে পাঠাইবেন।

গারুড়গী, পোঃ হাসাইল, ঢাকা। } কবিরাজ—শ্রীচন্দ্রভূষণ সেন কবিরঞ্জন।

# DHARMA SAMAVAYA LIMITED.

A CENTRAL CO-OPERATIVE ORGANISATION FOR PROMOTING UNION FOR CREDIT, THRIFT, TRADE, INDUSTRY, AGRICULTURE, INSURANCE, SANITATION AND EDUCATION.

**Registered under the Indian Company's Act, in June, 1910**

Dividends on Shares, paid for the last three years, have been 25 per cent per annum. Dividends will be distributed quarterly for future years beginning with July, 1914.

The Memorandum of Association of the Samavaya provides for one hal of the net profits of each year being devoted to promotion of Religion Co-operation, and Economic Development of the Natural Resources.

Business transacted :—Builders, Engineers Architects and Contractors· protectors of Cattle ; Suppliers of pure and wholesome Dairy Produce ; Purchase Sale and Efficient Management of Land ; Establishment and Administration of Schools and Sanitariums ; Housing on the Hire-purchase System ; Land, Improvement on Co-operative Principles ; Intensive Cultivation, Town-planning and Tenant-Co-partnership, on the Garden-City and Suburb methods.

**SPECIAL NOTICE.**

Shares of DHARMA SAMAVAYA LIMITED, subscribed and paid for but between 16th April, 1914, and 31st May, 1914, will earn one-fourth of the Dividend, to be declared for our current financial year, ending 30th June, 1914. The list of Share-holders will remain closed, for the said year, during the month of June, 1914, and no sale or transfer of Shares will be transacted therein as for that year. Shares taken in June, 1914, will be sold at par value and earn full dividends from our next financial year, beginning with 1st July, 1914.

*Particulars supplied on application.*

SAMAVAYA MANSIONS,
CORPORATION PLACE, CALCUTTA.
*17th April,* 1914.

**A. C. UKIL,**
***Organiser.***

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra. Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of he Magazine should be addressed to—

*The Manager*, "DACCA REVIEW,"
*5, Nyabazar Road, Dacca.*

*N.B.*—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among others we may mention the names of :—

His Honour Sir Charles Steuart Bayley K. C. S. I.
The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Shamshul Huda, M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt. C.S.I., M.A. D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S
„ Mr. H. Sharp, C.I.E., M.A.
„ Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. Donald, I. C. S.
„ Mr. W. W. Hornell, M.A.
„ Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
„ F. C. French Esq., I.C.S.
„ W. A. Seaton Esq., I. C. S.
„ Mr. L. J. Kershaw, C.I.E , I.C.S.
„ R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
„ Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
K. C. De, Esq., C.I.E., B.A., I.C.S.
L. Birley, Esq., C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq., I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
J. R. Blackwood, Esq., I.C.S.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., MA., LL.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London.)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
„ Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
Professor J. R. Barrow, B.A.
„ R. B. Ramsbotham M.A.
„ J. C. Kydd, M.A.
„ W. Douglas, M.A., B. Phil., B.D.
„ T. T. Williams .BA., B.Sc.
Egerton Smith, M. A.
G. H. Langley, M.A.
Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.Sc.
Aswini Kumar Mookerjee, M.A.
Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Shushung.
The „ Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.
R. K. Doss, Esq.

Mr. Justice Digambar Chatterji
Sir Gooroodas Banerjee, Kt., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
Mr. N. Bonham-Carter, I.C.S.
Mr. J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
„ Nawab Nawab Ali Chowdhuri.
„ Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
„ Nawab K. Mahomed Yousuff.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esqr., I.C.S.
B. C. Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Sarat Chandra Das, C. I. E.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandrs Singh
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhusha
„ Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
„ Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L.
„ Radha Kamal Mukerji, M.A.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra.
„ Jaladhar Sen.
„ Jagadananda Roy
„ Benoy Kumar Sircar.
„ Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.

# CONTENTS.


| | | |
|---|---|---|
| On the relation and absolute advantages of Science and Literature in Collegiate Education ... | The late Babu Prosunna Kumar Sarbadhicary Principal, Sanskrit College, Calcutta | 119 |
| The Tomara Coinage ... ... | Mrityunjoy Roy Chowdhury, M R A.S.'Lond' | 134 |
| My Flower Room ... .. | Miss. Wilcox ... ... | 138 |
| Glories of the Sanskrit Literature ... | Gobinda Chandra Mukerjee, M. A., B. L. | 139 |
| Nature and Art ... ... | Moulvi Bahar-uddin Ahmed ... | 147 |
| Richard Cobden ... ... | Prof. Nirmal Chandra Gupta M. A. ... | 147 |


# সূচী


| বিষয় | লেখকগণের নাম | পত্রাঙ্ক। |
|---|---|---|
| ১। হিন্দু জড়-বিজ্ঞানের কয়েকটী নিদর্শন ... | শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্, এ, বিদ্যানিধি | ১২৯ |
| ২। অদৃষ্টের পরিহাস ... ( গল্প ) ... | শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ... | ১৩৪ |
| ৩। মেঘদূত ( কবিতা ) ... ... | শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ বি, এ ... ... | ১৪০ |
| ৪। জড় ও পরমাণু ... ... ... | শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রভূষণ অধিকারী ... ... | ১৪২ |
| ৫। কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও তদীয় কাব্য অন্নদামঙ্গল ... ... ... | শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ... | ১৪৮ |
| ৬। মায়ের কাছে চৈতন্যের বিদায় প্রার্থনা ... | স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই, ই ... | ১৫৬ |
| ৭। তীর্থ ভ্রমণ ... ... ... | শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ ভাগবতশাস্ত্রী | ১৫৭ |
| ৮। সারনাথ দর্শনে (কবিতা) ... ... | শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ... ... | ১৬৩ |
| ৯। নাদ-বিন্দু ঐ ... ... | শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দে ... ... | ১৬৩ |
| ১০। শান্তির গীতি ঐ ... ... | শ্রীযুক্ত চারুভূষণ দেব ... ... | ১৬৪ |
| ১১। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ... ... | ... ... ... ... | ১৬৪ |

BANGIYA SAHITYA PARISHAD LIBRARY.

# THE DACCA REVIEW.

VOL. V. JULY, 1915. No. 4.

## ON THE RELATIVE AND ABSOLUTE ADVANTACES OF SCIENCE AND LITERATURE IN A COLLEGIATE EDUCATION.

*Read before The Bethune Society, on Thursday 11th November 1852.*

The potent agency of education in the formation and moulding of human character has been admitted in every quarter. The phrenologist as well as the metaphysician has acknowledged and commented upon its vital importance. The State and the politician are no longer its avowed enemies, but are its warm advocates. Ministers of religion have ceased to look upon it with an evil eye and have made themselves its persevering and zealous friends. There is scarcely a nation on the face of the earth, which has made any progress in civilization, that has not begun to think of plans for the universal diffusion of education. Even ordinary common sense is not blind to its advantages. If we contemplate on what our superiority over the brute creation consists, we shall see that it is only in the possession of our intellectual powers and moral faculties. Anything that tends to the strengthening and enlargement of them contributes to the increase of our power and happiness. The office of education is to do all this. The patrimony of intellect which we have received from our ancestors and the possessions that have been left us by a Homer and a Kalidasa, by a Shakespeare and a Milton, by a Newton and a Laplace, are brought to their use by the aid of education. When rightly conducted, education lays the foundation of our future happiness, and the usefulness of ourselves to the race we belong to.

Society is at present so constituted that years if not centuries, must elapse before we can hope for the universal diffusion of knowledge in all its completeness. A graduated scale of education must of necessity be in force

till circumstances are ripened to admit of plans and methods for the thorough education of all human beings. The education which is to be received in a College should be of the highest possible order. Its nature should be such as to enable its recipients when they enter life to take the lead in the nation to which they belong and to make that nation inferior to none in the world. The educated youth should receive that degree of mental culture when within College walls as will enable them to put their shoulders to the wheel and further the advancement of their national prosperity, to be active agents in the assimilation of their uneducated countrymen to their own body, to develop the resources of their country, to ward off thereby all sorts of misery from their native land, to create within themselves a resource which will make them happy and independent of all external circumstances, and to appreciate if not to share the conquests of mind over matter.

The two main channels into which knowledge divides itself are science and literature distinctively so called. We are to see the relative and absolute importance of each in a collegiate education.

Whatever thoughts have been recorded, whatever events have been commemorated, whatever doctrines have been handed down, whatever production of fancy or imagination have been in store to beguile our troubled hours, whatever scientific truths have been discovered and preserved to make us the "Lords of the creation" (in which, apart from our moral and intellectual existence, we are but insignificant atoms) and to ennoble our nature and bring it nearer to the divine original from which it emanated, have been through the medium of language. A familiar acquaintance with and an analytical study of the language in which are to be found the productions of master minds are therefore absolutely required on the part of those who wish to place themselves on a firm footing as rational beings. But to have this familiar acquaintance with and an analytical study a familiarity with the classic authors of the language must be cultivated. Canons of cirticism are but secondary aids to the thorough appreciation of the beauties of a language. The authors themselves must be our study. The life-like truth of Shakespear's descriptions enrobed in fairy colours, the sublime flights of Milton's genius, the manly dignity of Dryden's muse, the easy and sparkling flow of Pope's versification, the indolent sweetness of Thomson, the sweet but sad colouring of Gray's poetry, the exuberant beauties and voluptuous sweetness of Moore's Lallah Rookh and his Irish Mclodies, the fire and impassioned beauty of Byron, the soul-dissolving strains of Shelley, and the mild but declicious effusions of Rogers, Campbell and Wordsworth have to their admirers and students direct advantages besides the

collateral. In common with other intellectual pursuits the study of those authors and their like make us happy in defiance of all the frowns of fortune. When we are perusing the productions of these mighty intellects, we seem to be in communion with beings raised far above the dissensions and the vain desires fo the world. The daring imagination of Shakespere moving with lightning-like rapidty touches our heart with more than electric influence. A single sentence from him has the mighty power of transfusing what is gloomy and overcast into cheerfulness and mental sunshine. When the spirit and soul of poetry have entered into us and have been absorbed into our spiritual nature, truly are we then "lapped in Elysium". In whatever locality we may happen to be, whether in the midst of the howls of jackals and tigers in the Soonderbuns or gliding in a boat under the effulgence of the moon along the placid bosom of the Pudma in the vernal month of March or April, poetry is ever delightful. When a doctrine of morality is taught by a poet it reaches our heart with such impressive eloquence, that it never loses its place there. In addition to all this, familiar acquaintance with great poets, greatly facilitates the study of the moral, the political and the natural sciences. Hence the necessity of attending to poetic literature in a collegiate education.

Essay writers, when they happen to be men of of merit contribute a great deal to the sharpening of our judgment and to the strengthening of our morals. The truths they teach being in less recondite forms than are to be found in philosophical works, are learnt with little effort and treasured up in our minds, to fructify at every step of our progress in the pursuit of knowledge. They prepare the ground for the reception of philosophical ideas. There is a wholesome effect therefore in their forming a part of college studies.

There is another department of polite literature whose importance in a collegiate education we have yet to see. Though mentioned last its uses and advantages are not the least. History by making us familiar with past events and past deeds introduces us into the great laboratory of social experiments. To know what has been the success of particular lines of conduct in particular states of society is doing away with many of the obstacles in our own way. We profit by the experience of the past ages. Were we not to be benefited by by the folly nnd wisdom of our ancestors we would always remain in primitive ignorance. When we compare the histories of different nations, many a prejudice, contracted from narrowness of observation, leaves us altogether. Example being always better than precept we are benefited a great deal by the study of history. Whatever profession we adopt we find history always pleasing to us. We find there moving pictures of all descriptions of men. After

we have made ourselves familiar with history, a vast store of facts is to reason upon all social affairs. What an amount of pleasure again in the study of history when we are perusing the pages of a great historian, what an amount of interest do we feel in the narrative! Does not even the most phlegmatic, a person native of whatever country he may be, feel some sparks of patriotism when he reads that portion of English history where the virtues of a Pym and a Hampden shine with brilliant lustre? Do we not find in Washington the realization of the half fabulous Cincinnatus? Do we not sympathize with our own agricultural population when we are reading the history of the Plebeians of republican Rome and dedicate ourselves, to the cause of humanity? Do we not find our pride humbled when we read the history of Hannibal or Napoleon? Do we not in the frequently recurring French Revolutions, with all our admiration for the master intellects who took the lead in them learn a lesson of patient perseverance on constitutional matters. Do we not feel an indescribable pleasure when we are told by the historian that the same age which witnessed the victories of Napoleon and Wellington had also a Laplace to boast of? When we are reading the history of Mahomedan India, do we not feel pity for our poor distressed country, and thus make it dearer to us by every wrong she suffered? Do we not again in reading the history of India under Akbar feel a degree of elasticity and cheerfulness in finding amongst foreign rulers a benefactor to our country? And does not that again endear our country to us? Is not political philosophy based on history? Last of all, do we not learn weighty lessons of morality from the perusal of history?

The study of history therefore should from an important part of a collegiate education. But the range of historical literature is too wide to be mastered in a college course of studies. There are advantages, however in laying during the college career the foundation of historical knowledge; when once properly initiated we cannot fail to develop a familiar acquantance with it in after life.

Biography is an important branch of history. What a world of sweets is embosomed in its domain! What an intensity of interest in its volumes! what the state of the mind when we hear from biographers of the modest reluctance of Newton to publish his Principia and Optics! What an elevation of spirit when we read of the martyrdom of Galileo on the altar of Science! What a lesson of perseverance in the life of Kepler! What a beautiful enjoyment to observe the gradual transformation of Sir William Herschel from a muscian's boy to one of the greatest astornomers of his age! What pleasure to trace the career of William Roscoe from the time when he

carried on his head baskets of potatoes to the market to his becoming one of the first literary characters of his day and being courted as a companion and correspondent by the nobles of the land and associating on equal terms with the Wilberforces and the Romillys and others who stood first in the intellectual ranks of society?" What lesson unfolded in the glorious but chequered life of Bacon? How interesting and instructive to read the lives of the wild Rousseau, of the meek and philosophic Hume, of the versatile Voltaire and of the poetically misanthropic but really philanthropic Byron! Read the life of Cavendish and see what a beautiful picture is presented before the eye.

He was a Duke's grandson, he possesed a princely fortune, his whole expenditure was on philosophical pursuits, his whole existence was in his laboratory or his library. He had a thorough grasp of all branches of mathematics and natural philosophy; he lived retired from the world among his books and instruments, never meddling with the affairs of active life; he passed his whole life in storing his mind with the knowledge imparted by former inquiries and in extending its bounds.

There is indeed something altogether captivating in the life of a great intellect. What a sumptuous banquet of reason and imagination in the life of him who was emphatically Nature's darling or of him who rode on the seraph wings of ecstacy. What pleasure again to see in the pages of biograghy examples of mortal greatness. When we read of a Fenelon or of a Howard what an enjoyment of bliss! If there be one whose parental solicitude for the welfare of the youths of Bengal has been unequalled and who has spent the whole of his competence for the education of Hindu youths, if there be one again who is the benefactor of our country, who came down from his high position amongst the rulers to mix with the poor and the lowly and to be concerned in their welfare, whose secret charities enabled many a helpless youth to prosecute his collegiate studies, and who tried heart and soul to elevate our daughters from intellectual degradation, who is there that will not feel interested in the study of their lives, what educated native's heart does not thrill both with sorrow and joy when he comes to know the particulars of the lives of David Hare and John Eliot Drinkwater Bethune? many circumstances conspire to make biography an interesting walk of literature. Its bearings on the philosophy of mind are many. The time is not far distant when the true theory of the constitution of mind shall have to be confirmed by an appeal to the facts recorded in the pages of biographers just as the theory of universal gravitation is confirmed by all previous astronomical observations. But the utility of biography and its fascinating beauties are so easily appreciated that it requires not the protection of the

College authorities. It introduces of itself into the closet of the student, it has for him charms that novels have the light readers.

This last description of literary productions has not been mentioned as they as they are not generally fit subjects for collegiate studies. Whatever effects they may have in improving the style of the youthful writer or of cultivating the romantic in his bosom, or of beguiling the troubled hours of a man of active life they have something injurious in them to the mental habits of him whose character has not yet been quite formed. If he falls once in love with them he becomes quite unfit for severe studies. There is a seducing spirit in them that turns his head and would not allow him to being in graver company. He would be under the influence of that spirit even if novels of inoffensive character and moral tendency were in his hands—even if they were from the pen of Scott or Warren.

It now remains to consider the advantages of the study of science in a collegiate education.

It has been stated above that a collegiate education should be of the highest possible order. Whatever studies have a disciplinary effect on the mind, whatever pursuits have for their object national prosperity and national advancement, whatever studies ennoble human nature, in short, whatever studies have a tendency to make us happy and useful should have place within the range of such an education. Scientific stidies have all these characteristics in a pre-eminently distinguished form. Of all the sciences mathematics should have the first place in a college education. It sharpens the intellectual powers and impresses on them a precision, which they can derive from no other source except perhaps from logic. The closeness of reasoning with which we become familiar in the course of our mathematical studies gives a peculiar mould to our reasoning powers, and cultivates within us a principle which forms the safeguard against the intrusions of fallacy in all our researches. Mathematical reasoning being perfection itself a familiarity with its nature enables us to adapt all other reasoning to it; Physical truths especially those of the dynamical and optical sciences, are not understood and appreciated to their full extent and worth without a knowledge of mathematics. It seems to be the corner-stone of all those sciences which deal of matter as occupying space and having its phenomena occurring in time. Its applications to so many departments of physical science being of so intimate a nature a writer of first rate ability has in full fervour of admiration for mathematics stated that it seems to be the instrument by which we can share the counsels of the Almighty. By its aid have Leverrier and Adams—worthy disciples in the school of Newton and Laplace been enabled to assign a definite place in illimitable space to a

planet, as if saying in an humble but confident tone :—Here shalt thou Almighty Father place a planet to preserve the harmony and regularity of the solar system or what thy favourite Newton has said shall come to nothing or shall receive modifications. Since mathematics can do all this it should have a place in the education of youth, even if it had not other uses But by a singular ordination of Providence whatever is beautiful, sublime and soul-ennobling is not wanting in utility in the sense the term is understood in the world. To mention a few homely examples. The carpenter, the mason and the superintendent of embankments do their work in a much better style when they are grounded in mathematics than when they ignore it altogether. High authorities in all learned professions advise their pursuers to receive mathematical training if they wish to have success in the profession they wish to enter. Warren the celebrated author of the immensely intersting works of fiction —Diary of a late Physician and Now and Then, occupying a high place among the Lawyers of England has in his Introduction to Law Students quoted a passage from Bacon to shew the importance of mathematics to the mental discipline of students of law. But independent of the uses of mathematics in its application to astronomy and other departments of physical science, independent of its disciplinary effect on the mind, it has some thing within it, which renders its study positively pleasing. Any one who has overcome its first difficulties can bear testimony to the fact that it has an inexhaustible treasure to bestow. Isn't there something exceedingly beautiful in the properties of the Conic sections, in the nature of the vanishing fractions, in the solution of the maxima and minima questions, in the tracing of curves, and in the finding of the unknown constant ? So, from whatever light we view it we cannot but see the paramount importance of mathematics in a collegiate education. The period of youth is the most susceptible period. Whatever mental habits are then neglected are perhaps neglected forever.

Akin to mathematics is logic. It has as good a disciplinary effect on the mind as mathematics itself. As mathematics makes herself a helping instrument in many departments of physical science, so logic is the only guide. We acknowledge its importance in all the moral sciences and in most of the physical Being the science of reasoning, we do not see why it should not be of so universal an application. We would not make blunders in reasoning if we would wish to be sure in every chain of reasoning that we employ, we should cultivate a familiar acquaintance with logic—not the logic of the scholastic ages but the logic of modern Europe, for notwithstanding the former may have paved the way for the latter, the latter, is by far the superior. In a collegiate

scheme of education logic as it has come out from the pen John Stuart Mill or as it might come out from the pen of Sir John Herschel should be included, the more so as those that may not have an aptitude for mathemathics may find in logic a worthy substitute. If testimony from high quarters on a subject so clear like the present were required that would not be wanting. Liebig standing high among the philosophers of the present age, wss an enthusiastic admirer of logic. What Bacon, Locke or Reid has said in disparagement of this science is quite beside the point. Their sarcasms were directed against this noble study from their observing perhaps to what an extent it had been abused by the scholastic writers. They might as well have proscribed iron from man's use for from it daggers and other offensive weapons are fashioned Our distance from the scholastic age has kept us clear of all such prejudices ; we feel the paramount importance of ratiocinative and inductive logic, we feel its necessity disguised under whatever name it may be to the advancement of science.

We have now to see the importance of natural science in a collegiate education.

The universe in which our lot has been cast and in which we are no unconcerned beings, is governed by a system of laws unvarying and and open to the inspection of all who come with a devout heart and with the necessary preparation to know them. The explanation and expounding of these laws constitute natural science. As nature is subdued by submission if we would keep our place as lords of the creation we must cultivate a familiar acquaintance with physical science. The lofty position to which civilized man has been raised has been through the mighty work of science. The loftier station, which his present position promises to raise him to, shall be through the aid of science. It is science that enabled the powerful genius of Archimedes to defend his country against the overwhelming force of the Romans. It is through the aid of physical science, that we are enabled to travel hundreds of miles in a day and to pierce the Alps the crossing of which required the mighty genius of a Hannibal or of a Napoleon to accomplish in bygone days. It is physical science that enables us, with a small quantity of water, to have work done which would have required the labours at least of a hundred Hercules of the fabulous ages. Science has enabled the sailor to ply his vessel across the wide expanse of the ocean with that degree of exactitude and certainty with which he would have been moving from one room to another in his own apartments. By science have we been able to catch hold of the fleeting shade and to give it a permanent existence. By science have we been able to convert the most noxious weed and vegetable to the most nutritious food and to transform the most worthless object into the most useful.

By science have we been able to make wind and water subserve many of our purposes and be obedient to our will. Science has made provision for our walking with lights in perfect safety while we are in the midst of the most inflammable and explosive atmosphere of the subterranean regions. It is science that has provided us with a medium to waft a sigh from the Indus to the Pole with a velocity surprisingly great. If we look with an observing eye at the social condition of the civilized nations we shall see how much physical science has done for its bettering. We shall them feel the truth of the statement that by the aid of science the condition of a European Prince is now as far superior in the command of real comforts and conveniences to that of one in the middle ages as that to the condition of one of his own dependents. All our arts are either derived from or perfected by science. Anything that is detrimental to the interests of the latter is also detrimental to the interests of the former. But even putting aside all interested motives, what an amount of enjoyment in the study of the sciences! When we are told by the scientific enquirer that the fall of the apple and the motion of the planet, as well of the wandering comet and of the seemingly irregularly falling aerolite is guided by the same laws; when we are told by him that the law of gravitation holds true in the most distant stellar system; when he describes Saturn's Ring with a minute accuracy, as if it was one shining with brilliant lustre on his own little finger; when he is giving us a chart of the moon as if it was one of his own native district; when he informs us that there is an ebb and flow in the aerial ocean as in the aqueous. When he tells us what the state of the world was before the family of man was in existence, when he tells us that linen rags being immersed in sulphuric acid produce a greater quantity of sugar than their original weight, that a gnat's wing in its ordinary flight beats many hundred times in a second; that in acquiring the sensation of redness our eyes are affected four hundred and eighty two millions of millons of times, do we not feel ourselves lost in wonder? Do we not feel the importance of those branches of learning which teach us these miraculous truths? What an exquisite pleasure then in the study of the natural science! look again at their subserviency to Natural Theology. The sublime truths of that sublime science are but imperfectly understood without a familiarity with Natural Philosophy. The stability of the solar system, the nature of the resisting medium, the beautiful provision of the harvest moon, the relationship between the eye and the light, the equilibrium of effects between the animal and the vegetable creations, the provision for the sustenance and production of the human frame and the sixfold utility of the atmosphere are a few of the many truths

which we cannot understand and therefore cannot appreciate unless we have made ourselves familiar with physical science. Many of us do think that we may take them for granted and have thus the obstacles to the study of Natural Theology at once overcome. But we should then bear in mind that traditional prejudice is far different from rational conviction. From these considerations we feel not the least doubt that physical science should occupy the most prominent place in the collegiate education. If the aim of all our attempts be to make ourselves and the human family at large happy we should not deny ourselves the benefit of a scientific education. Any thing substantial that we can do for the good of our country or for the good of our race shall be through the aid of science Even if physical were wanting in all physical utility its study would be necessary for its moral advantages. Familiar contact with the operations of nature in her immensely large scale and the observing of harmony in every department of Nature's works have a peculiarly soothing effect on the mind. In the language of him whose name graces that of our society and whose soul was imbued with the purest and the most profound doctrines of philosophy knowledge of physical science is not only power but it is humility and its piety also. When we are in pursuit of science we seem to be in communion with our Creator. If we have any regard for truth and abhorrence for falsehood, if the ideas of the divine mind be worthy of greater respect than the idols of the human mind we should include physical science in the course of a college education, if for nothing else. Our moral constitutions are well adapted for appreciation of truth and so much is our admiration for discoverers of scientific truth that the mere mention of the names of Gallileo, Newton, Clairaut, D'alembert, Euler, Franklin, Herschel, Cuvier, Lagrange, and Laplace make a passage far more eloquent than if its periods had received the brightest polish from the pen of the most eloquent writer.

The study of the moral science is no less useful and pleasing than the physical. No education may be said to be complete in which they are neglected. The constitution of the human mind and the constitution of human society form the two principal subjects of these sciences. To be familiar with the analysis of our moral and mental nature is going a great way in the improvement of our moral and mental constitution. To know the details of the structure of society, how its operations are going on, how its affairs are to be improved, how governments are to be conducted with the least inconvenience to the governed, is certainly very interesting. The wonderful machinery by which we perceive, remember, associate reason or love so far as it is open to our observation, cannot but be

observed with an intensity of interest. The laws of social relations are of too great an importance to neglect their study with impunity. Hence the necessity of the study of moral and mental philosophy and of political philosophy especially one of its departments—political economy. But how far they should be included in a college education is still a matter of doubt. Many departments of moral inquiry have still the inductive method to be applied to them to raise them on a solid basis. Till they may properly be classed amongst the inductive sciences they are not fit subjects of study for unripe intellects. They may form subjects of discussion among philosophers and of observation to scienctfic inquiries. But those portions of moral science which have assumed a demonstrative appearance and which have received the approbation of all philosophical inquiries, political economy for instance, should be included in the course of a college education. The substratum of everything that is to be learnt in after life should be laid during our collegiate existence as any department of knowledge then neglected is most likely in the majority of cases to be neglected all the while. What is of more universal application in social affairs than the truths of political economy? From the highest statesman to the everyday labourer, from the princely Duke to the humblest tenant on other's lands, from her gracious Majesty Queen Victoria down to her poorest ragged subject starving in an obscure nook of the 24 Pergunnahs or the Hooghly district, every one has an interest, whether he would be wise enough to know it or not, in the science of political economy. In its true appreciation, endowed as we are by our all benevolent Creator with natural powers to carry into effect its doctrines, depend the welfare of individuals as well of nations. In this complex state of society in its present advanced condition, many a time mere common sense is not sufficient to make us understand what our interests are. Many a time we see a distorted picture and many a time a false one. Altogether political economy being the science of society, if we would not resign our place there, we must make ourselves familiar with its truths. On social matters if we are wise without it, our wisdom is. based on empirical knowledge. And it remains to determine whether science or empiricism is to be preferred. Certainly no one in his senses can recommend the latter. Political economy then should form a portion and an important portion of college studies. Select portions of moral philosophy, including within that term intellectual philosophy as well as ethics, may be taught with advantage. I say select portions because all portions have not shared equal scientific investigation. Many portions again are still under discussion amongst scientific inquirers. Those portions of the philosophy of mind which will

remain unaffected by any discoveries that are made with regard to its nature are of too important a character to be neglected in a college education. They touch our dearest and noblest concerns. That the ultimate laws of mental and moral phenomena, even in those portions have not yet been discovered, or those that are said to be discoveries are not acknowledged as such by scientific inquiries is most true. But should we therefore leave our hold of them altogether? Should we not rather take a resting place in the derivative laws of unquestionable validity and push forward thence our inquiries? Would it have been wise on the part of Kepler to abandon his elliptic theory only because there may possible be some ultimate law of planetry motion? Certainly not. But at the same time it may be said with a great deal of truth that this sort of duty falls on the philosopher only and not on the student. On the other hand it may be said also that the youth who is receiving the highest order of education should at least have his soul imbued with the constant portions of philosophy. He should feel to some extent with the poet,

How charming is divine philosophy
Not harsh or crabbed as dull fools suppose,
But musical as is Apollo's lute.
And a perpetual feast of nectar'd sweets
Where no crude surfeit reigns.

Natural theology holds a prominent place among the moral sciences, but after a scientific education its study may be omitted in the college course. The study of the sciences will keep us prepared to enter on its study when we have finished our collegiate course of education. No new initiation shall be required to appreciate its worth. The immensity of interest that is attached to its study and the sublime grandeur that pervades through its whole domain are of themselves sufficiently inducing motives to the prosecution of its study. All that we have to do in the college is to give the proper bent to the mind.

After all that has been said before it appears that science and literature are the two necessary ingredients in a liberal education. Neglect any one of them and the education is incomplete. Your so-called educated youths would then receive but half their education. We connect ourselves in feelings and thoughts with the remotest antiquity by the study of literature. We establish our supremacy in this sublunar world by the study of science. Literature besides its direct uses, has an important share in enabling us to prosecute scientific studies. In neglecting it, then, we neglect all our dearest concerns. We are at once and the same time deprived of the treasures and delights kept in store by the sweetest bard and by the most profound philosopher. So in a college course of education the study of literature in itself and in its relation to scientific studies and

pursuits is highly advantageous. But to pay exclusive attention to mere literary studies is resigning more than half of our privileges and rights. The power and happiness that science confers are altogether lost. We reduce ourselves to a state very near to that of mere sentimental beings. To confine ourselves all the while to literature because it is preparatory to our being able to study science, is the same kind of policy as would make us learn the alphabet all our boyhood because without them it is impossible to read. In fact that training, which would give us no scientific education, which would provide us with no instrument to claim our birthright to the lordship of this universe, is but a very poor training. In this age of social reforms, in this age of brilliant discoveries, when new sciences are starting into existence, when the whole field of nature is ransacked for the increase of our scientific knowledge, when steam navigation is an ordinary occurrence, when railroads are traversing almost every region of the habitable globe, when a network of electric telegraphs is spreading over the whole of the civilized world tendering forth its services to carry our thoughts from its one extremity to the other in the course of a few hours, when attempts are being made to bind wandering winds in the magic of numbers and the still more fluctuating oscillations of the deep are about to be brought under the pale of the self-same charm, a person without a scientific education is far behind the age in this age of Humboldts and Herschels, Airys and Aragos, Whewells and Brewsters Lardners, Babbages, Bucklands and Lyells, Liebigs and Jussieus Gausses and Mitscrlichs. Any system of collegiate education that would omit the teaching of physical and natural sciences would be radically faulty. The functions of education shall be but imperfectly done. The present age is emphatically an age of progress and of scientific enterprise. Volunteers for the reconnoitring of science have come down from the highest rank of scientific merit. Why did Herschel bid farewell for some years to the most intellectual regions of the north, and take his residence in the southern part of the continent of negroes but for the advacement of science? Why was Ross sent to the Antartic regions but for the advancement of science. Why was Humboldt in the midst of Tartary but for the advancement of science? To whatever country of Europe we direct our attention we see brilliant clusters of scientific men making the most strenuous exertion for the increase of the domain of human knowledge, and of necessity, the increase of human happiness. In an age like the present to remain in youthful age uninitiated in science and not to be allowed to enter the precincts of the "sanctuary of scientific truth is a singular misfortune. Certainly he who comes out of his

college without a stock of scientific acquirements, and purposes to take a share in the world in the middle of the nineteenth century, comes very ill provided. If the youth who are educated in the colleges be designed to take the lead of the nation to which they belong, they must receive a high scientific education. Without that they can do almost nothing for their country since in the words of Sir David Brewster, "Science in these days constitutes the the power and wealth of nations." A leading philosopher of the age, the vernerable Baron Humboldt, who may be styled the Nestor of the present age, in his introduction to the Course has a passage somewhat bearing on the subject and confirming the proposition. "An equal appreciation" says he "of all the branches of mathematical physical and natural sciences is a special requirement of the present age in which the natural wealth and the growing prosperity of nations are principally based upon a more enlightened employment of the products and force of nature." The most superficial glance at the present condition of Europe shows that a diminution or even a total annihilation of national prosperity must be the reaward of those states who shrink with slothful indifference from the great struggle of rival nations in the career of industrial arts. Since such is the case, the importance of science in a collegiate education is paramount. The condition of India is to be improved by the aid of science and by no other means. The starving population of a more than hundred millions has to look up to no other resource but the almighty agency of science. Scientific methcds of agriculture shall have to be introduced before we can hope to be out of the grasp of penury and famine. Botany, Chemistry and Geology when called to the former's assistance shall spread plenty all around and infuse a new vigour into the Indian soil. They have transformed arid tracts and marshy bogs into smiling cornfields. What prospect then is not there of the enriching of India when along with mechanics and engineering they shall operate on the already fertile plains of Bengal of the Doab and of the Dekkan? What task again remains for physiology to do? Sanitary reforms on any large scale cannot take place until the people or at least those that move in the higher circles of society have made themselves familiar with the truths of the physiological science. Physiology has to remove from amongst the educated natives and by their example from amongst the uneducated vulgar that which superstition with her inaudible feeble voice has not been able to displace.—I mean that poisonous liquor of which,

Soon as the potion works their human countenance
The express resemblance of the gods is changed,

Into some brutish form of wolf or bear
Or ounce or tiger hog or bearded goat,
All other parts remaining as they were,
And they so perfect in their misery,
Not once perceive their foul disfigurement
But boast themselves more comely than before.

Political economy has to teach the poor and physiology has to teach both the poor and the rich what innumerable evils are ensuing from early marriage. What social misery and intellectual prostration from that single source! In short if we wish to be our own farmers, if we wish to be our own manufacturers, if we wish to beautify our country and increase its resources without external aid and if we wish to keep our body and soul in health and harmony we must cultivate science and include it in the college curriculum of studies. Other wise we shall be doing injustice to ourselves and to our posterity. We will be able to talk much but to do little. Again in a country like ours where an immense structure of superstition has been rising in the minds of the inhabitants for more than three thousand years, the including of science in the scheme of a college education is absolutely necessary. Everything Hindu is subject to the thraldom of superstition. Superstition interweaves itself with all the affairs of Hindu life. Every sort of improvement is retarded in its progress by the all-spoiling powers of supersitition. The Hindu mind has been pulled down to a low level by the oppressive load of superstition. No other study is so sure to destroy this giant fabric as the study of science. Science being the embodiment of truth it is from its very nature opposed to superstition and bigotry. In the course of a scientific study nothing is taken on trust. Every proposition has its proof. The absurdities of superstition appear glaring by the light of science. Let it not be understood however that all that has been said above is with a view to undervalue literature. Science and literature go hand in hand. They both aim at human happiness. The one is as much necessary as the other to make us great.

PROSUNNOCOOMAR SURBADHICARY.

## THE TOMARA COINAGE.

BY MRITYUNJOY ROY CHOWDHURY.

Modern research has, convincingly if not definitely proved that Bardic chronicles and genealogical tables are not reliable, that the Maharanas of Udaipur are not descended from the Sun or the Maharajas of Marawar or Jodhpur from the Maharaja Joychandra of Kanauj and Benares. The time has now arrived for a re-examination of the coins attributed to this dynasty.

The existence of such a dynasty and and the fact that it ruled over Delhi and the surrounding country as far as Ajmir has never been doubted. The celebrated Pehoa inscription of the Pratihara Emperor Mahendrapala records that some Tomara chiefs erected a temple of Visnu during his reign.[1] The Palam Boali inscription records that the country of Hariyanaka was at first ruled by Tomaras, then by Chauhanas and then by some Saka Kings *i. e.* Sahavadma (Shahabuddin Ghori).[2] In the Harsha inscription of the Chahamana Vigraharaja it is stated that a Tomara prince named Rudrena was defeated by Chandana, the grandson of Guvaka I.[3] But no inscription of this dynasty has come to light as yet.

1. Epi. Ind. Vol. I. P. 238.
2. J. A. S. B. Vol. XLIII Pt. I P. 108.
3. Epi. Ind. Vol. II, P. 119.

In the field of Indian Numismatics the Tomara dynasty is better known than in that of Epigraphy. Cunningham named five Kings of this dynasty and described two different types of coins in all sorts of metals. These Kings are :—

(1) Sallakshanapala, (2) Ajayapala, (3) Kumarapala, (4) Anangapala, and (5) Mahipala. But of these five only the last-named seems to have coined both in Billon and in gold. Sallakshanapala and Anangapala seem to have coined in Billon only, Ajayapala in silver and Kumarapala in gold. Only Anangapal is known from contemporary records besides coins. Coming to the types of the coinage of these princes we find that the silver and gold coins were of the Central Indian type *i. e.* of the same type as the gold coins of Gangeyadeva of the Kalacari dynasty having the Kings named in two or three lines on the obverse and a four-armed seated goddess, most probably copied from that on Gupta gold coins, on the reverse. But the Billon coins are invariably of the Bull and Horseman type which is found for the first time in the coinage of the Shahiyas or the Hindu Kings of Kabul or Shind. Now the Bull and Horseman type of Billon or copper coinage remained the

recognised type of North-western India for a considerable length of time. It is to be found in the coinage of the Kings of Kabul or Sind, the coinage of the Tomaras,[1] of the Gahadavalas of Kanuj,[2] the bantranas of Ajmir and Delhi,[3] the dynasties of Narwar[4] and the Kings of Kangra.[5] The coins of Shalapatideva of the Sind or Kabul dynasty stand out as the best among coins of this type. The type was continued by the earlier Mahammadan Sultans of Delhi up to the time of Nasiruddin Mahammed Sha (1246-65 A. D.).

I have had the opportunity of examining the Tomara coins in the Indian Museum at Calcutta and to me it seems that the coins assigned to this dynasty need revision very badly. In the first place I think the gold coins have been wrongly assigned to this dynasty. My reasons are:—

(1) No gold coins of the princes who undoubtedly belonged to this dynasty have been discovered as yet. Take for instance Anangapal, who defended the North-western frontier for a long time against the Mahammadans; no one has as yet described his gold coins.

(2) The gold coins of the so-called Tomaras have been found over a much wider area than what was included in their dominions even when their power was at its highest. Take for example Mahipala; Mahipala's gold coins have been found at Ghosrawan (?) in the Patna District.[9] In 1905 when the cabinets of the Asiatic Society of Bengal and the Indian Museum were catalogued by Mr. V. A. Smith, none of them contained a single gold coin of Mahipala, as the catalogue does not describe any.[10] In 1912 the Indian Museum received one specimen of Mahipala's gold coinage from the Buldana District C. P. Two coins which are reproduced here were purchased at Benares. The Empire of Tomaras never included the whole of Northern India, and their coinage had no such decided advantage over the gold coinage of other Central Indian dynasties, as to make it particularly acceptable throughout the length and breadth of Hindustan.

Naturally, the question arises to whom these coins are to be assigned. The answer is quite clear. These five princes did not all belong to the Tomara dynasty. Sullakshanapala, Anangapala and Mahipal may, so long as trustworthy evidence is not forthcoming about the Tomaras, still be included in the Tomara group. Kumarapala and Ajoyapala must have belonged to different dynasties and at the same time it should be stated that the Mahipala who struck gold coins on the model of those of Gangeyadeva, was a different person

1. Ibid. P. 259.
2. Ibid. P. 260.
3. Ibid. P. 261.
4. Ibid. P. 259.
5. Ibid. P. 275-79.

9. Cunninghan's Archaeological Survey Report Vol. XI. P. 117. Pl XLIII.
10. V. A. Smith, I. M. Cat. Vol. I, P. 206.

from the Tomaras Mahipala. We shall come to consider his identity later. It may be stated that the Tomaras may have had different types for their gold, silver and copper coinage and Mediaeval Central Indian dynasties for their gold and copper coinages. But it must be remembered that we have yet no conclusive evidence about the genealogy of the Tomara Kings, and many of the names on Cunningham's list are well known in other dynastic lists and all other North-western dynasties who coined in gold, copied the ancient Kushan-Gupta standing King type, *i. e.* the various dynasties of Kashmir.[1]

There is no difficulty in assigning coins of Kumarapala and Ajayapala. They were issued by the Kumarapala of the Chalukya dynasty of Anatulapataka.[2] Kumarapala's certain dates range from 1145 to 1169 A. D. One of Ajayapala's inscriptions was found at Bhelsa in N. Malwa.[3] Cunningham stated that some of the gold coins of Kumarapala were found at Kabul,[4] but it may be that it formed a part of Gujrat loot. I have been informed that all sorts of ancient Indian coins are to be found in the Bazars of Kabul and Candahar. The gold coins of Mahipala are more difficult to assign.

1. Ibid. P. 267-273.
2. Epi. Ind. Vol. XVIII. P. 344.
3. Ind. Ant. Vol. XVIII.
4. Coins of Mediaeval India. P. 85.

In addition to the Tomara Mahipala we have the Pala Mahipala of Bengal. The Kachchhapaghala Mahipala Bhuvanaiamalla and the Pratihara Emperor Mahipala. But with the exception of the last named no other prince possessed an Empire so extensive as to include most, if not all, of the find places of Mahipala's gold coins.

Cunningham stated that the four-armed figure of Lakshmi has been "copied from Chedi coins of Gangeya Deva." Gangeya Deva and his son Karuna Deva were, no doubt powerful princes but their suzerainty did not last long whereas the Empire of the Pratiharas lasted in name at any rate for about a century after Mahipala. So it is more probable that the type of Central Indian coinage adopted by the Kalacaris of Tripuri, the Haihayas of Ratnapura and the Gahadavalas of Kanauj were copied from the coin

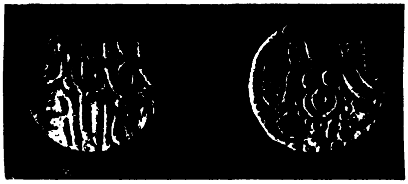

of the Gurjara Pratihara Emperor Mahipala.

So three names are left in the list of Tomara kings :—

(1) Sullakshanapala, (2) Anangapala and (3) Mahipala.

To these must be added one more—Madanapala. The coins of this prince

have so long been assigned to the Gahadavala Madanapala, the father of the celebrated Govinda-Chandra. In doing so Cunningham did not take into consideration two facts. In the first place the coins assigned to the Gahadavala prince are of the Bull and Horsemen type. Then the reverse bears the additional legend *Madhava Sree Samanta*[1] which has been found on the coins of the Kings of Kangra and those of Pipala.[2] There is very little evidence in favour of the assignment of these coins to the Gahadavala King of Kanauj. A dynasty of Kings with the patronymic *pala* ruled at Delhi and in the North-west. We know of the existence of Anangapala from Mahammadan records. A prince named Sallakshanapala is stated to have been the Minister of the Chahamana Vigraharaja or Visaladeva in 1164 A.D.[3] If the country around Delhi and Ajmir is systematically examined it is possible that fragments of the records of Mahipala and Madanapala may also be discovered. And this fact makes it evident that the Madanapala of the coins cannot be the same person as Madanapala son of Chandradeva. The majority of the known coins of Madanapala came from the Punjab ; out of eight coins of Madanapala catalogued by Mr. V. A. Smith, one is of silver and the remaining seven of copper. Out of these seven coins again four belonged to the cabinet of the Museum and the remainder to that of the Asiatic Society of Bengal. Nothing is known about the find-spots of No. 1 and 8. No. 4 was presented by the Government of India in 1890, but the remaining two (No. 2 and 3) were found in the Punjab, and were presented by the Punjab Government. There is no evidence on record to prove that coins of Madanapala have ever been found outside the Punjab. It is therefore safer to assign the coins of Madanapala to a prince of the same name in the Tomara dynasty than to one of the Gahadevala dynasty. I am very much indebted to Babu Rakhal Das Banerjee for information about the find-spots of coins.

1. Ibid. P. 87, see also I. M. Cat. of coins, Vol. I. P. 250.
2. I. M. Cat. of coins Vol. I. P. 263.
3. Ind. Ant. Vol. XIX. P. 218.

## MY FLOWER ROOM.

BY MISS. WILLCOX.

My flower-room is such a little place,
Scarce twenty feet by nine, yet in that
Space
I have met God ; yea, many a radiant hour
Have talked with Him, the All-Embracing cause,
About His laws.
And He has shown me, in each vine and flower,
Such miracles of power
That day by day this flower room of mine
Has come to be a shrine.

Fed by the self-same soil and atmosphere,
Pale, tender shoots appear,
Rising to greet the light in that sweet room.
One speeds to crimson bloom,
One slowly creeps to unassuming grace,
One climbs, one trails,
One drinks the light and moisture,
One exhales.
Up through the earth together, stem by stem,
Two plants push swiftly in a floral race,
Till one sends forth a blossom like a gem,
And one gives only fragrance.
In a seed,
So small, it scarce is felt within the hand,
Lie hidden such delights
Of scents and sights,
When by the elements of Nature freed,
As paradise must have at its command.

From shapeless roots and ugly bulbous things,
What gorgeous beauty springs !
Such infinite variety appears,
A hundred artists in a hundred years

Could never copy from the floral world
The marvels that in leaf and bud lie curled.
Nor could the most colossal mind of man
Create one little seed of plant of vine
Without assistance from the First Great Plan,
Without the aid divine.

Who but a God
Could draw from light and moisture, heat and cold,
And fashion in earth's mould,
A multitude of blooms to deck one sod?
Who but a God?
Not one man knows
Just why the bloom and fragrance of the rose,
Or how its tints were blent;
Or why the white camellia, without scent,
Up through the same soil grows;
Or how the daisy and the violet
And blades of grass first on wild meadows met?
Not one, not one man knows,
The wisest but suppose.
This flower-room of mine
Has come to be a shrine,
And I go hence
Each day with larger faith and reverence.

## GLORIES OF THE SANSKRIT LITERATURE.

Anyhow the interaction of life and matter occurs. There is no question about that; it is an affair of common experience and is conspicuous to any one who considers his own powers. Although the ultimate nature of matter and soul may have remained an insoluble problem till the present time, we think sufficient hints have been given by the Rishis showing the way in which life interacts with matter which even if tested in the strict and impartial balance of modern science would not be found entirely wanting.

We have seen that the Sankhyists instead of explaining the mysterious

way in which life interacts with matter leaves the question just where it is, simply saying that the modifications of Primordial cosmic matter do spontaneously arise in the presence of Purusha or soul, which is to be considered as the mere enjoyer or sight-seer of those modifications. They do deny any active participation of the soul in bringing about these modifications as the following text will show :—

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ॥

সাংখ্য কারিকা।

"Thus from the points of similarity dissimilarity between Purasha (individual soul) * and Prakrity (undifferentiated cosmic matter) discussed before, the former will appear to be a mere witness, single (*i. e.* alone,) indifferent, sight-seer and inactive" —Sankhya Karika.

The Vedanta. on the other hand, while admitting that Jiva or individual soul is the enjoyer (ভোক্তা), further lays it down that it is an actor also. For example in Sutras 31, 32, 33 and 34 of Chapter II, Sec III, of the Vedanta-Darsan, the active agency of Jiva is plainly referred to †, although the initiation of that activity is, in Sutra 39 of the same chapter, shown to be from the Supreme Soul or Paramatma ‡. The Vedantists also differ from the Sankhyists in upholding that inert and insensible matter cannot of itself undergo any modification, cannot change its position of rest or motion unless actively interfered with by something else which must be essentially different from it. This something different from matter is none other than 'Chiti-Sakti' or consciousness *per se*, called also vital force (vide Vedanta-Darsan Chapter II Sec. II, sutras 1, 2, 3, 4, 5, and 6).

Unlike Kapila, all classes of Vedantists do unanimously maintain the existence of a Universal Soul or Entity called Para Brahma or Paramatma. This Entity, they say, is endowed with certain powers * * which may be reduced to two principal ones,

* There cannot be any doubt that the *Purusha* of the Sankhyists is the same as the Jivatma of the Vedantists, for both maintain the heterogeneity and plurality of such souls brought about by Karma or Fate. But while the Sankhyists maintain that such souls are by nature omnipresent and *omniplenum*, the Vedantists uphold that such souls being of a micro-organic nature are discrete and parviplenum.

(১) অসঙ্গ চিদ্বিভুর্জীবঃ সাংখ্যোক্তস্তাদৃগীশ্বরঃ। পঞ্চদশী॥

(২) পুরুষস্ত নিষ্ক্রিয়ো নির্গুণো বিভুশ্চিন্মাত্রো ঘটিকাহং চিন্ময়ঃ সর্ব্বাত্মপদার্থসম্বন্ধেশ্চ ইতি :—বলদেবীয়ে বেদান্তভাষ্যে।

(৩) অণবোহস্মাদাচ্যাৎ। বেদান্তদর্শনম্॥

† কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ। বেদান্তদর্শনম্॥ জীব এব কর্ত্তা ন গুণাঃ। কুতঃ শাস্ত্রেতি। স্বর্গকামো যজেতাত্মানমেব লোকমুপাসীতেত্যাদিশাস্ত্রস্য চেতনে কর্ত্তরি সতি সার্থক্যাৎ গুণকর্ত্তৃত্বেন তদনর্থকং স্যাৎ। ইতি বেদান্তীয়ে গোবিন্দভাষ্যে॥

‡ পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ। বেদান্তদর্শনম॥ তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। তৎকর্ত্তৃত্বং জীবস্য পরাৎ পরেশাদেব হেতোঃ প্রবর্ত্ততে। কুতঃ তচ্ছ্রুতেঃ। অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি, এষ এব সাধুকর্ম্ম কারয়তীত্যাদৌ তথা শ্রবণাৎ। ইতি।—

বেদান্তীয়ে গোবিন্দভাষ্যে॥

* * পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া চ। শ্রুতিঃ॥

viz. 'Tama-Sakti' and Kshetrajna-Sakti* and that it is by the interaction of these two powers that the evolution of the universe is brought about. Tama-Sakti may be denominated the material power of Para Brahma and is identical with Maya † and Prakriti. It is in fact matter in its subtlest undifferentiated condition—a condition in which the difference between matter and its in-dwelling potentiality is minimised to the lowest numerical figure—where losing its grossness assumes the subtlety of *super-etherial finis*, where no matter is distinguishable as such, but is, as it were, spiritualised. The other power called ' Kshetrajna-Sakti is known as the Cognitive faculty of the Supreme Lord and is identical with what is otherwise known as' Chit-Sakti' perceptible in our own body *. The term 'Kshetrajna' literally means that which knows the ins and outs of Kshetra and as such is applied to the soul which is said to know the ins and outs of Kshetra or primordial cosmic matter as the following texts will show :—

(১) বহুন্যা প্রকুর্বীত প্রকৃতিং প্রসবাত্মিকাম্ ।
তচ্চ ক্ষেত্রং মহানাত্মা পঞ্চবিংশোঽধিতিষ্ঠতি ॥
অধিষ্ঠাতেতি রাজেন্দ্র প্রোচ্যতে যতিসত্তমৈঃ ।
অধিষ্ঠানাদধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥
ক্ষেত্রং জানাতি চাব্যক্তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চোচ্যতে।
মহাভারতম্ ।

" The soul makes Prakriti or undifferentiated cosmic matter—which contains within itself the potentiality of heterogeneous productions—assume various

* (১) বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ।
বিষ্ণুপুরাণম্ ॥

According to the gloss of Sreedhar Swami 'Vishnu-Sakti' is identical with Para-Brahma, the same as the 'Sanbit' (সংবিৎ) of Panchadasi (vide Vishnu-Puran Pt. VI. Ch. 7. verses 61 and Pt. II. Ch. II. verses 11 and 18, as well as Panchadasi, Tattwa-Viveka, verses 7 and 10. The third power of Brahma called Avidya and Karma is explained by Sreedhar to refer to the 'Maya-Sakti' which is identical with what is otherwise known as the 'Tama-Sakti' (vide ante). As 'Vishnu-Sakti' is identical with Para-Brahma it scarcely deserves the name of a power. Gita also mentions the two working powers of God as material and vital :—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ গীতা ॥

Nilkantha explains জীবভূতাং as প্রাণধারণ নিমিত্তভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাং ।

* (1) মায়াং তু তমোরূপেতি । শ্রুতিঃ ॥
(2) মায়া চেয়ং তমোরূপা তাপনীয়ে তদীরণাৎ
অনুভূতিং তত্র মানং প্রতিজজ্ঞে শ্রুতিঃ স্বয়ম্ ॥
পঞ্চদশী ॥

† (1) F. H. Skrine in his new book on 'Bahaism' says :—"Idealism is the noblest efflorescence of every religious belief held by scions of the Aryan stock. It is a manifestation of aesthetic instinct which craves for union with the source of life, light and love. Beyond this material universe, there is, an ocean whose waters sparkle in the human life—a realm impenetrable by the cold clear light of intellectual and objective research. It is a fact of the highest significance that Lord Kelvin found himself absolutely forced by science to admit and believe in a creative and directive power as an influence other than that of physical, dynamical and electrical forces."

(2) চিচ্ছক্তির্জ্ঞাতো যাব শরীরেষূপলভ্যতে । পঞ্চদশী ।

forms. This primordial matter together with its various modifications is called Kshetra (*i. e.* productive field). It is presided over by soul which is great and is the 25th principle of the Sankhyists. The foremost of the Jatis say that the soul is the Presider. Indeed the Srutis say that on account of soul's presiding over all Kshetras, it is called the Presider. And because it (soul) knows the ins and outs of the unmanifest cosmic matter which is Kshetra, therefore soul is called Kshetrajna ".

(২) ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥
গীতা।*

" O Bharat, know that I am both Kshetrajna and Kshetra in all things created by me. Hence a true knowledge of the real nature of the two is really a true knowledge of myself (*i. e.* the supreme being)"—Gita.

(৩) ন গুণাঃ বিদুরাত্মানং স গুণান্ বেত্তি সর্ব্বশঃ। মহাভারতম্॥ The material attributes do not know the soul, but the soul, knows them all—Mahabharat.†

(৪) যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াত্। শ্রুতিঃ॥

" That by which everything is known, how can that be known by anything else, how can the knower be known by any other thing "—Sruti.

In the texts quoted above 'Kshetrajna' is used in the sense of the cognitive faculty of the Supreme soul or Param-atma, while 'Kshetra' is synonymous with Primordial cosmic matter. But these terms are generally used in a more restricted sense: Kshetrajna signifying an individual soul cognisant of the ins and outs of a special material body called 'Kshetra' as the following texts which testify :—

(১) ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি
তদ্বিদঃ॥ গীতা॥

* (১) প্রবিশতি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং নির্গুণাত্মকম্
সর্ব্বাবাসং বাসুদেবং ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি তত্ত্বতঃ।
মহাভারতম্॥

(২) তস্মাদ্ গুণাংশ্চ সত্ত্বং চ পরিত্যজ্যেহ ধর্ম্মবিৎ।
ক্ষীণদোষো গুণাতীতঃ ক্ষেত্রজ্ঞং প্রবিশত্যথ।
অনুগীতা।

গুণান্ বৃত্তান্ সত্ত্বং বুদ্ধিং দর্শনে করণভূতাং পরিত্যজ্য ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মানং প্রবিশতি। নীলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে

† The following extracted from the address of Professor J. S. Macdonald given to the British Association already referred to in a previous issue, is very apposite :—

"Though originally the eye may have been formed by the action of light, our own individual eyes were not so formed, since they came into existence before light had any access to them. Therefore some power which is not light has prepared an exquisitely perfect optical instrument, just as though it knew all that light can require and could imitate all that light can do. It needs a soil to make an eye. So that brain is not the maker of the brain or at least the soul is something which has for its own purposes seized on matter in a certain combination. What is the force that in this case imitates the action of light? Some force must be held as arranging the several parts of the eyeball in front of the developing retina and it was probable that before discovering it they would have to refer to the properties of the retina for an answer"—The soul that made the eye,

O Kounteya those who know the real nature of Kshetra and Kshetrajna call this body of ours 'Kshetra' and that which knows its inner and outer mechanism, they call 'Kshetrajna'—Gita. Nilkantha explains 'Kshetra' as matter where the seed of action may be fructified through the agency of the individual soul.

(২) আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব তু বিনির্ম্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ॥
মহাভারতম্॥

'When the soul is circumscribed by material attributes it is called 'Kshetrajna.' When freed from those attributes it is designated Paramatma or Supreme soul.—Mahabharat.

In fact, in the restricted sense 'Kshetrajna, is identical in meaning with 'Jiva' or 'Jivatma' that is to say the individual soul:—

এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ।
মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা॥
পদ্মপুরাণম্॥

" Being so qualified, Jiva, which is but a part and parcel of the supreme Being and symbolically called 'Makara' is also known as 'Kshetrajna' being always dependant by nature.—Padma-Puran."

To sum up then, the Vedantists hold that there is a supreme creator of the universe over and above the Prakriti (matter) and Purusha (individual soul) of the Sankhyists*, who is omniscient and omnipotent †. That He is endowed with certain powers, amongst which 'Tama-Sakti' and 'Kshetrajna-Sati' are the principal ones. That 'Tama-Sakti' is identical with 'Maya or Prakriti-Sakti' or the material power, while 'Kshetrajna-Sakti' is His cognitive faculty and as such is immaterial. That these powers are inherent in Him and cannot be differentiated, for although objectively ceasing in the cyclic period of destruction, they exist potentially or subjectively in Him.‡ As the consuming flame of the fire imparts an idea of its force, so the potentiality of force present in Para Brahma is plainly seen in the

* (1) প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ। শ্রুতিঃ॥
(2) ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ। ক্ষরাত্মানাবীশতে দেবঃ একঃ। শ্রুতিঃ॥

(3) প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ।
ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ॥
বিষ্ণুপুরাণম্(

† (1) এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং। শ্রুতিঃ॥
(2) সর্ব্বশক্তি পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমব্যয়ম্।
যোগবাশিষ্ঠং॥

(3) It is the Eternal and Intinite Energy, out of which Humanity has quite recently emerged and into which in course of time it must subside—Herbert Spencer.

‡ (1) শক্তিঃ শক্তাদপৃথঙ্ নাস্তি। পঞ্চদশী॥ (2) তমোঽভিধানাতিসূক্ষ্মা নিত্যা চ পরস্য শক্তিরস্তি; "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ।" সা কিল প্রলয়ে তেন সহ ঐক্যং গতা ন তু তত্র বিলীনা তিষ্ঠতি 'পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে,' 'তম একী ভবতি পরস্মিন্ ইত্যাদি। শ্রুত্যা পৃথিব্যাদীনামক্ষরান্তানাং তমসি লয়কথনাৎ তমসস্তু পরস্মিন্নৈবাক্য কথনাৎ। তদৈক্যং নামাভিন্নবৃত্তিত্বেনাপি ভানার্হত্বেন নাস্তুং। ইতরথা তম একীভবতি ইতি চিৎপ্রত্যয়াসামঞ্জস্যাৎ। ইতি বেদান্তীয়ে গোবিন্দ-ভাষ্যে॥

ব্রহ্মধর্ম্ম শক্তিমেদকং বস্তু, 'ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা' ইতি স্মৃতেঃ ব্রহ্মশক্তির্জীবো ব্রহ্মৈকদেশত্বাৎ ব্রহ্মাংশো ভবতীতি। বেদান্তীয়ে গোবিন্দভাষ্যে॥ (Vide also Vedanta Darsan chap. II. Sec iii, Sutra 16 also chap iv, Sec ii Sutra 16).

objective world.* And that lastly it is by the interaction of these two powers, viz. 'Tama-Sakti' and 'Kshetrajna-Sakti' that the evolution of the universe with its heterogeniety is brought about. †

Now then let us see, if we can make out something from the vedantic philosophy of India as to the nature and origin of the interaction between life and matter and the result produced thereby. We have seen that with the Sankhyists, the Purusha or individual soul is the passive enjoyer ( ভোক্তা ) and sight-seer ( দ্রষ্টা ) of the modifications undergone by Prakriti or Primordial cosmic matter in its presence. We have also shown that according to the vedantists Atma or Jivatma ‡ is not only the

(2) প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মন ॥ বিঃ পুরাণম্ ॥

(3) তদেতত্ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ
পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধা সোম্যভাবাঃ ( চিজ্জড়াত্মিকাঃ )
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥ শ্রুতিঃ ॥

* (1) তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্।
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং ॥ শ্রুতিঃ ॥

This is explained by Ramkrishna, the Commentator of the Panchadasi, as follows :—মুনয়ঃ কালস্বভাবাদি কারণ-বাদেষু দোষদর্শনবন্তঃ জগৎকারণ-জিজ্ঞাসয়া ধ্যানযোগসমাহিতা অধিকারিণঃ দেবাত্মশক্তিং দেবস্য দ্যোতমানস্য স্বপ্রকাশচিদাত্মনঃ অত্যপভিন্নস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিং মায়ারূপাং স্বগুণৈঃ স্বকার্য্যভূতৈঃ স্থূলসূক্ষ্মশরীরৈঃ বিভয়াং গূঢ়াং আবৃতামপশ্যন্ সাক্ষাৎকৃতবন্তঃ ইত্যর্থঃ।

(2) কার্য্যাদাশ্রয়তশ্চৈষা ভবেচ্ছক্তির্বিলক্ষণা।
স্ফোটাঙ্গারৌ দৃশ্যমানৌ শক্তিস্তত্রানুমীয়তে ॥ পঞ্চদশী

(3) Alluding to the recent announcement of Sir William Ramsay to the chemical society that by passing an electric discharge through a vacuum tube, he and Professor Collie and Mr. Patterson have succeeded in making helium aud neon, the 'Nation' says :

"Metaphysicians had long ago analysed the solidity out of the category of substance. Physicists had ceased to use irreducible matrer even as a working hypothesis. They had envisaged the world, after a first reduction to atoms, as a complex in which the single and simple thing is the electrical unit, capable of endless combinations, whose internal politics give us the chemical elements, each with its familiar properties. And now it seems as though electticity in a form, which to our unsophisticated thinking is what we call "energy," could be transmuted by a cunning but simple experiment into a thing which we readily recognise as "matter." Matter to unsophisticated thought was the thing repugnant to will, which might be subdued by it, but might as probably prove recalcitrant and triumphant. Physical science invites us to-day to dismiss 'matter' in this ultimate sense as an obsolete hypothesis. It has not yet said that in the beginning was the 'word' (*cf.* অথাতো বিভূতয়োহস্য পুরুষস্য বাচা সৃষ্টা পৃথিবী চাগ্নিশ্চেতি ॥ শ্রুতিঃ ॥) ; but equally it denies that in the beginning was the fact. It starts from notion of creative energy—creative by its infinite capacity for entering into novel and various combinations"—"Nation."

†(1) য একোহবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ।
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি ॥ শ্রুতিঃ ॥

(2) গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে।
গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে দ্বিজোত্তম।
প্রধানতত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎসমাবৃণোৎ ॥ বিষ্ণুপুরাণম্ ॥

(3) যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ গীতা ॥

‡ In the Vedanta-Darsan, chap II. sec. iii, sutras 16-51, the word 'Atma' is used in the sense of Jivatma or individual soul, while Para or Paramatma or Paratma is the name for the Supreme or Universal soul.

enjoyers *, but is also the active participator in bringing about the modifications of matter. Sutras 1, 2, 3, 5 and 9 of Chap II. sec. ii of the Vedanta-Darsan do plainly refer to the active participation of the soul or consciousness in bringing about the modifications of inert matter. The question now arises, even admitting that the modifications of matter are brought about by soul, whether the Supreme soul or the individual soul is to be regarded as the direct and immediate modifier of matter. That Paramatma or Supreme soul permeates everything whether material immaterial or both, is the fixed opinion of all classes of Vedantists, based as it is upon the Sruti-texts† and it is probable that they do also hold that the first *junction* ‡ of matter and life at the beginning of the evolutionary cycle might have been brought about through the direct interference of the Supreme Lord* but the subsequent modifications of cosmic matter seem to have resulted from the active agency of Jivatma or individual soul as the following extracts will show :—

"অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে
ব্যাকরোৎ।" শ্রুতিঃ ॥

Ramanuja-Swami in commenting on the above passage says :—ব্রহ্মাত্মজীবানুপ্রবেশেনৈব সর্ব্বেষাং বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম্; 'তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ' ইত্যনেনৈকার্থ্যত্বাৎ। জীবস্যাপি ব্রহ্মাত্মকত্বং ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে। অতশ্চিদচিদাত্মকস্য সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মতাদাত্ম্যমাত্মশরীরভাবাদেবেতি অবগম্যতে। ইতি শ্রীভাষ্যে ॥ It is through the entrance of the Jiva, which

---

*(1) স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ বেদান্তদর্শনং ॥

(2) আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ শ্রুতিঃ

(3) দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
শ্রুতিঃ ॥

† (1) স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি।
স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন
কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্ ॥ শ্রুতিঃ ॥

(2) বেদাহমেত অজরং পুরাণং
সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ ॥ শ্রুতিঃ ॥

(3) মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ গীতা ॥

‡ With strict regard to the opinion of the Rishis, it cannot be said that there is any real union or junction between soul which is immaterial and other things which are material.

(1) নিঃসঙ্গস্য সসঙ্গেন কূটস্থস্য বিকারিণা।
আত্মনোঽনাত্মনা যোগঃ বাস্তবো নোপপদ্যতে ॥
তত্ত্ববার্ত্তিকং ॥

(2) অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ ॥ শ্রুতিঃ ॥

* তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ ॥ শ্রুতিঃ
According to the gloss of Nilkantta the word তুচ্ছ of the text is used in the sense of Tamas ( তমঃ ) as a negligible thing, so that the text means that in the beginning when the earth was void and without form, matter (which is a negligible thing) in the form of darkness enveloped everything and that soul although lying in it was not united with it in any way. Later on the Snpreme Being united the two, when the evolution of the universe commenced.

(1) আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ ॥ শ্রুতিঃ ॥

(2) বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি তেঽন্যে
রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র।
তস্যৈব তেঽন্যেন ধৃতে বিযুক্তে
রূপেণ যৎ তদ্ দ্বিজ কালসংজ্ঞম্ ॥ বিষ্ণুপুরাণম্ ॥

The last couplet is explained by Sreedhar as follows :—তস্য বিষ্ণোরেবান্যেন রূপেণ তে দ্বে রূপে ধৃতে সর্গকালে সংযোজিতে বিযুক্তে চ প্রলয়কালে। তদেতৎ কালসংজ্ঞং রূপান্তরং। শ্রীধরস্বামী।

is essentially at one with Brahma, that everything becomes differentiated into name and form ; the Sruti-text that he entering became 'sat' and 'tyat' is identical in meaning with the text quoted here. Because Jiva is permeated by Brahma, therefore he is said to be at one with Brahma. Thus all things whether inert matter or conscious Jiva being, as it were, part and parcel of Brahma are essentially identical with His self—Sree-Bhashya.

The following texts cited from Vrihadaranyakopanishad are explicit on the meaning to be attached to namarupa ( নামরূপ ) and the words 'Sat' ( সৎ ) and 'Tyat' ( ত্যদ্ ):—

(১) তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত হসৌনামায়মিদং রূপ ইতি।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ॥

This is explained by Nityananda Muni as follows :—তদিদং ব্যাকৃতং জগৎ তর্হি তদোৎপত্তেঃ প্রাগব্যাকৃতমনভিব্যক্তনামরূপং হি কিলাসীৎ। তদব্যাকৃতং নামরূপভ্যাম্ নাম্না রূপেনৈব চ ন স্বরূপেণ ন প্রত্যগাত্মনা স্বয়মেব ব্যাক্রিয়ত। According to Ramkrishna, the commentator of Panchadasi, the অব্যাকৃত the of the text means Brahma enveloped in the disguise of maya and from such Brahma the world consisting of names and forms is said to have evolved. এবং বৃহদারণ্যকেহ প্যব্যাকৃতশব্দবাচ্যান্ময়োপাধিকাদ্‌ ব্রহ্মণো নামরূপাত্মকং জগদুৎপন্নং ইতি রামকৃষ্ণরচিত পঞ্চদশীটীকায়াং। অব্যাকৃত literally means that which has not undergone any change or modification, hence 'namarupa' includes every modification of the subjective and the objective world constituting its heterogeniety *.

(২) দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ মর্ত্ত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ। তদেতন্মূর্ত্তং যদন্যদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাচ্চ তন্মর্ত্ত্যমেতৎস্থিতমেতৎ সৎ। অথামূর্ত্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতমেতদ্যদেতত্ত্যৎ।

শ্রুতিঃ ॥

"Brahma disguised in maya has two semblances; one endowed with form and the other formless. That which is endowed with form is also mortal, limited (*i.e.* occupying definite space) and visible while the formless one is (comparatively) immortal, unlimited and invisible. The three elements, earth, water and light as distinct from the elements, ether (antariksha) and gas (vayu) are designated the semblance of Brahma with form and being mortal, limited and visible are known by the collective name of Sat ( সৎ ). The elements ether and gas constitute the formless semblance of Brahma and being comparatively immortal, illimitable and invisible are collectively called 'Tyat' ( ত্যৎ )"—Sruti.

*(To be continued)*

GOBINDA CH. MUKERJEA.

অব্যাকৃতং পুরা সৃষ্টেরূর্দ্ধং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা।
অচিন্ত্যশক্তির্মায়ৈষা ব্রহ্মণ্যব্যাকৃতাভিধা ॥
সচ্চিৎসুখাত্মকং ব্রহ্মনামরূপাত্মকং জগৎ।
তাপনীয়ে শ্রুতং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণং ॥ পঞ্চদশী

## NATURE AND ART.

Whenever in my walks I've seen a river-view,
Or climb'd a wooded hill that overhangs a lake,
Or sought some limpid stream my mid-day thirst to slake,
To mine enchanted eyes they have appear'd as new ;

And though I've come across some noble works of Art,
The mute memorials of what once engaged my thought,
A sea without its waves, or statue finely wrought
Has never, with delight or wonder, fill'd my heart.

No mortal man, with all his skill, has ever done,
Or with his gifts can ever do, a thing as well
As Nature only can, with joy our hearts to swell,
Such as the liquid pearls that sparkle in the sun.

Oh, how we marvel at the firmament and Earth
Altho' with both we are familiar from our birth!

BAHAR-UD-DIN AHMED.

## RICHARD COBDEN.

*(A paper read at the Regents' Park Hall on the 11th August 1915).*

My subject is the life of Richard Cobden with special reference to his relation with the Freetrade movement. Cobden like, Gladstone, is a subject not a little difficult to write on but I am not going to deal with the man in all his aspects. I am going to deal with the public life of the great statesman with a rough and running story of his life.

Recent developments of Politics and Public life in India have brought us face to face with an interesting and amazing fact about the character of public menin India. A careful study of some of the public acts of Indian leaders has induced me to pause and compare our public men with the public men of England and other countries. As

the result of my comparison I have found to my utter grief and disappointment that public life in India as we find it to-day leaves much to be desired. I have come to the conclusion though I am sorry for this that our public men have yet to learn a good deal from English and continental public men. A spirit of selfsacrifice is the one great thing lacking in our public leaders. A spirit of public duty has yet to come in India and so long as that does not happen it would not be wrong to say that there is no public life in India. When I am taking such a pessimistic view, please do not think that I am slow to give the credit where it is due. I am ever ready to praise men like the late Mr. Gokhale, whose life has been a monumental example of self-sacrifice and men like Mr. Gandhi, whose sufferings in the cause of Indians in South Africa can not but wring the praise and admiration of even the most unwilling critic.

I should like to point out the difference between a public leader in England and a public leader in India. I shall point out how as a public man Cobden sunk his private individual self in the public cause and how he made the nation's cause the polestar of his life. The one great triumph of Cobden's life was the introduction of Freetrade into England and Free-Trade is responsible for the commercial prosperity of the nation. So for the nation's prosperity Cobden sacrificed his private interest. Now it is this feature of the man that has appealed to me more than anything else and in the following lines I desire to bring out this point.

The other important point which I desire to bring out in Cobden's character is what will appear to you as an evident paradox. It will be easily admitted that Cobden was an intense patriot devoting himself to the cause of national good ; but at the sametime Cobden was a cosmopolitan philanthropist. The ordinary student of History will say that patriotism and philanthropy can never go together but I think it is only the false patriotism that identifies itself with selfishness that can not go hand in hand with philanthropy. But in Cobden's case things were entirely different. He was an intense patriot as well as a philanthropist.

Now all these considerations have rendered the subject attractive to me and I shall now proceed to tell you the story of Cobden's life.

In a beautiful and sequestered corner of West Sussex, Richard Cobden was born on June 3, 1804, the fourth of a family of eleven children. His father William Cobden, who was descended from a pretty old family, was a farmer of very modest means. At the time of Richard's birth, the Cobdens were having rather a happy time. This was due to the general prosperity which all farmers were having during the great Napoleonic war. But a great disaster overtook the family with the return of peace in 1814

and when the crash came after the return of peace, Cobden's farm was sold up and the family was reduced to poverty. When this happened the charge of Richard Cobden was given to one of his mother's brothers-in-law, a London merchant who sent him to school in Yorkshire, supposed to be the ideal of Charles Dickens' immortal Dotheboys Hall, a place full of horrid cruelties. There it was a very poor schooling that Cobden had and so unsatisfactory was the education that, Morley has aptly described it was the "mockery of an education." The comparative poverty of his education determined once for all that is was as a business man that Cobden was to have his training and not as a scholar or man of letters. It was in 1819 that Cobden became a clerk in his uncle's warehouse in Old Change. There too his days were not very pleasantly spent and it was with considerable relief that he accepted the offer of a situation in Ghent in 1822. Though the prospects of the situation at Ghent seemed bright yet as his father disapproved of the scheme Cobden remained where he was. All this time although, he was deriving a very small income he was trying his best to make his younger brothers comfortable, Cobden continued to work with industry and from a petty clerk he was advanced to the position of a travelling agent. From this point of his career in life Cobden had a splendid opportunity of getting experience and observation in life, which he turned to highly useful account. Cobden valued and that very wisely too, observation and experience. He often said that much of what is best worth knowing is never written in books. He visited Scotland and Ireland in the course of his business laying by all the time a rich store of information. After spending sometime as a travelling agent Cobden took a very momentous step in the year 1828. In this year he in co-operation with two friends started a business of his own. He made arrangement for selling goods on commission from some big firm of calico-printers. After thriving for sometime in that line Cobden thought of printing his own goods and in 1831 Cobden started a calico-printing firm at a village called Sabden near Blackburn in Lancashire. From the very outset Cobden was very confident of success. He like Napoleon was of opinion that diffidence is the sign of incompetency, but honest confidence in one's own powers is bound to succeed. Consequently we find that his firm at Sabden began to flourish. This was however the seedtime of his soul for we know that although he was working hard for his firm he was also making an intellectual progress which stood him in great stead in later life. While on the one hand he took to tract-writing he was acquainting himself with poets and writers.

Having spent sometime in private reading, Cobden left England for foreign

travels in the year 1835. First of all he made a voyage to the United States where it was not long before he could find out like Martin Chuzzlewit of Charles Dickens, the fact that the Americans are a people full of vehement and sometimes unreasonable self-esteem. While he noticed this defect of the American people he did not shut his eyes to the genius of activity which is a special characteristic of the American people. After return from America Cobden remained at home for fifteen months, during which period the most important thing connected with him is the publication of a tract on "Russia." In 1837 Cobden once more set out on his foreign travels in the East. He visited Turkey, Greece, Egypt and gathered a very useful experience of the Eastern nations but the details of these travels need not detain us here.

It is from after the return of Cobden to England that a momentous era began in the history of his life. England at this time was passing through very strange times. A mental and intellectual activity had begun to show itself in the growth of various movements, like the Prison Reform Act, Abolition of slavery. A great wave of human feeling was passing over the country and writers of the time had begun to urge for a social regeneration. Now this human feeling which was at the bottom of the great humanitarian movement also exercised its magic influence on Cobden who felt that the hour had come when he too must exert his powers and solve one of the vital problems of the country namely the economic problem. For sometime he had been watching the economic condition of the country. As a boy he was familiar not only with personal poverty but had also noted the appalling distress which overtook England on the close of the Napoleonic wer. He had witnessed how Parliament—a compact body formed by the reactionary landowners, some of them Indian Nawabs, owners of rotten boroughs and pocket boroughs like the land owners of a former day, were having recourse to legislation for keeping up their own prosperity. He also remembered the Manchester riots, Peterloo massacres, Six Acts and all other evils of Lord Eldon's reactionary Government. He had realised how the landowners to keep up their rents artificially made the most absurd Corn-Laws of 1815 and how they had taxed the bread of the poor. As a matter of fact the historian of the period can not but admit with Goldsmith, that

> The robe that wraps his limbs in silken sloth
> Had robbed the neighbouring fields of half their growth,

applied equally well to the state of England at this time. Cobden felt for the suffering masses in the same way as John Howard felt for the prisoner and Ashley felt for the factory man and he felt it his duty to remove the economic

distress of the land. He began to think of abolishing corn laws and flung himself heart and soul into the task. He anticipated many difficulties in the way but we know he had the Napoleonic temper of seeing sunshine before him and moreover the example of Daniel O' Connell the great Irish agitator was an encouragement to him. Daniel O' Connell had brought about the Emancipation of the Catholics in 1829. This girded up the loins of Richard Cobden who turned his attention to the removal of the Corn-Laws.

It is necessary to pause and say something about corn-laws and the circumstances relating to them. Cornlaws like the Navigation Act were a series of rules for keeping out foreign competition. Prohibitive duties were levied on the importation of corn and the price of homecorn was artificially kept up and the landlords grew fat over princely rents. These laws were based on an entirely false economic doctrine, known as The Mercantile Theory, which indentified wealth with specie. But Adam Smith by the publication of his famous book known as the 'Wealth of Nations' exploded the theory and a steady opinion was growing demanding the removal of the cornLaws. The French Revolution which heralded the dawn of a new era for man at first favoured this, but as it ended in tragedy a severe reaction began in England and politicians like Burke arose and stopped all talk of Reform or progress. The first part of the 19th century which saw this reaction was one of the gloomiest periods of distress in England. But after 1820 things began to look up. Through the public utterances of Cobbett and other mob-orators the public mind began to be influenced in favour of progress and even in the administration of Canning a considerable progress was made by the reform of tariff. The continued growth of agitation had also resulted in the sliding-scale of duties which mitigated to some extent the rigours of the Corn-Laws, but the Corn-Laws existed nevertheless. It was at this point that Cobden took up the question of Corn-Laws.

By this time the political views of the great statesman were made known to the nation. He had declared himself a liberal for we know that after his election-campaign of Stockport he declared that to push his own material fortunes was not to be the aim of his life. Besides, his views on the factory question leave no doubt of the fact that he was a Liberal.

Cobden was not the first person to take up the question of Corn-Laws. It was in the year 1836 that an Association called the Anti-Corn-Law Association had been formed in London by Parliamentary Radicals like Grote, Molesworth, Joseph Hume, and Mr. Roebuck. Though the gifts of reasoning in these men were the most wonderful yet their Association was not so important as the Association formed by seven men in a

hotel in Manchester, the very next year. This body among others was joined by Cobden who later on became the very soul of it.

The story of this Association which later on became known as the Anti-Corn-Law League is a story of wonderful organisation and marvellous campaigning. The prime leaders of the League determined to begin and continue an agitation for the repeal of Corn-Laws. Cobden chalked out the practical lines on which the League was to proceed He proposed that all the members should invest a part of their income and led the way by subscribing to the fund first of all. He proposed to work by founding smaller branches of the League all over the country distributing tracts and leaflets and by holding open air meetings. He got an eminent colleague in a member of Parliament, namely, Mr. Villiers. At this time he left his business to take care of itself and thereby showed a bright example to the country. It would not be possible to follow all the details of these campaigns but I must notice through what difficulties the League had to make its way. When the League began its work the reactionary landlords thought that an invasion on property was bring made. I shall quote here what Lord Morley has said in the description of the work of this League. Lord Morley says :—"Though there were many districts where nobody interfered with them there were many others where neither law nor equity gave them protection. At Arundel the Mayor refused the use of the town-hall on the ground that the meeting would make the labourers diiscontented and the landlord refused the use of his large room on the ground that if he granted it he would lose his customers. A landowning farmer went further and offered a bushel of wheat to anybody who would throw the lecturer into the river. At Petersfield a paltry little-borough in Hampshire almost in sight of Cobden's birth-place either through spite or the timidity of political bondage went so far that when the lecturer returned after his harangue in the market-place to the Dolphin, Boar or Lion, where he had taken his tea and ordered his bed the landlord and the landlady peremptorily desired him to leave their house."

It was not merely the landowners in a body that were agitating against the Cobdenite party but also the press began to show its active hostility to the League. While Free Trade speeches were being delivered in Cambridge there was a riot and this was highly applauded by the newspapers of the place. Again we know the Morning Post which Lord Morley calls the Journal of London idleness attacked the workers with bitter fury and angry zeal. The opposition to the Free Trade movement in its beginning need not surprise you at all. Movements which are for the public good have always to be prepared for abuse, opposition and persecution. History of

movements in the past will always bring you face to face with this. The League continued its work and by persuasive lectures succeeded in creating a public opinion in favour of Free Trade. It would be just quite interesting to note that with the growth of this movement a regular literature grew up denouncing the Corn-Laws The poet of the movement was Ebenzer Elliot who began to write the Corn-Law-rhymes. The following is a specimen of the rhymes :—

"Child, is thy father dead?
Father is gone;
Why did they tax his bread?
God's will be done!
Mother has sold her bed,
Better to die than wed,
Where shall she lay her head?
Home we have none."

A perusal of these poems will show how keen the distress of the ordinary people was and Cobden sympathised fully with this distress. Cobden continued his arduous work as a public leader without belonging to the ranks of Parliament. But later on he became a member of Parliament himself for Stockport· He did not call himself either a Whig or Tory but prided in callling himself a Freetrader. From his position in Parliament he continued to agitate with double vigour. But while Cobden entered Parliament the country was passing through a trying time. Bad harvests and a financial crisis which ushered in a period of severe depression of trade combined to produce incalculable distress in the country. As the result of these bad times we are told that in Manchester 116 mills and many other works were stopped; 2000 families were reduced to such want as to have pawned even their beds and 12000 families were receiving poor relief. In Bolton out of 50 mills 30 were idle. In Nottingham 10580 were receiving poor relief and so on. From these statistics it is easy to see that there was universal distress in the country and the distress simply stirred up the activity of Cobden. In the distressing autumn of the year 1841 Cobden enlisted the sympathy of John Bright whose personal zeal and oratory paoved a tower of strength to the cause. It was in a very peculiar way that Cobden won over Bright. Bright had lost his wife and while he was mourning her death Cobden called to see him. Before leaving Cobden said, "There are thousands of houses in England at this time where wives, mothers, and children are dying of hunger. Now when the first paroxsym of your grief is past, I would advise you to come with me and we will never rest till the Corn-Law is repealed." This speech fired Bright's imagination and Bright henceforward became the righthand man of Cobden. At this time the Prime Minister of England was Sir Robert Peel who was a man of conservative tendencies in the beginning of life. But the noticeable feature in Peel was that he was always open to conviction and the successful agitation

of Cobden made Peel recognise that the country was bent on Freetrade and someday England would have to remove the wall of protection. Cobden had not a little difficulty in convincing Peel of the advantages of Freetrade, for we know that Peel made even personal attacks on Cobden, but Cobden proceeded not by any personal considerations, but by principles and well-reasoned arguments and the clever handling of the facts and figures very soon enabled him to convince Sir Robert Peel of the fair advantages of Freetrade. Sir Robert Peel like a wise politician was making innovations preparatory to the introduction of Free Trade into England His budgets of 1842 and 1845 in which he cut down the duties on many articles will supply the best proof of what I have said above. The prospect for the Freetraders therefore seemed very bright. A section of the British public advised the adoption of a fixed duty but Cobden and his followers were for total repeal. While the Anticorn-law-league were agitating there happened a momentous event in the history of Ireland. This was the outbreak of famine in Ireland owing to the failure of the potato crops. Bright hailed with delight the appearance of the famine. "Famine" he said later on "against which we had been warring joined us at last and with famine in the land the Government had to order the opening of the Irish ports. Peel by this time a freetrader proposed the repeal of Corn-Laws but his Cabinet refused to support him and so he resigned. Lord John Russell who too by this time had been converted into the Cobdenite creed failed to form an adminstration. So Peel came back and determined to carry through his Repeal measure. Though he was the leader of the Tories this time he looked for support to the Whigs and with their support he repealed the Corn-Laws. For this the Tories, specially the Protectionist Tories called Peel a traitor. Disraeli even described him as having "caught the Whigs bathing and run away with their clothes" No doubt Peel suffered for this for we know that very soon he was forced to resign. But he had done his work. A few days after Peel's resignation when Cobden made a speech about Peel he represented the situation very accurately when he said "If Peel has lost office he has gained the country laying it under a deep obligation. Though Peel as the Prime Minister repealed the Corn-Laws yet the real credit should be given to Cobden. Peel himself acknowledged this at the time of introducing his bill. Peel said "The name which ought to be and which will be associated with the success of these measures is the name of a man who, acting I believe from pure and disinterested motives has advocated their cause with untiring energy and by appeals to reason expressed by an eloquence the more to be admired because it was unaffected and unadorned—the name of

Richard Cobden" Thus at last the Corn-Laws were abolished and this constituted the crowning triumph of his life. Looked at from the private and business point of view the whole movement cost him dear. It reduced him to poverty but the mission of Cobden was fulfilled. Here I would pause and quote the lines of Tennyson with regard to Wellington. Tennyson has said

"Not once or twice, in our rough island story,
The path of duty was the way to glory;
He that walks it only thirsting
For the right and learns to deaden
Love of self before his journey closes
He shall find the stubborn thistle bursting
Into glossy purples which outredden
All voluptuous garden-roses."

These lines originally applied to Wellington may with equal force be applied Cobden. Cobden sunk his personal self and achieved the national good. The best evidence of prosperity of the country under Freetrade can be obtained from the fact that now-a-days a labourer with easier work and shorter hours gets about 65%; a factory operative 75% and a skilled mechanic 90% more of necessaries than he did before Freetrade was introduced and for all this Cobden was responsible.

After the repeal of the Corn-Laws Cobden spent sometime touring over the continent preaching his ideas on Free-Trade. Everywhere he gathered supporters about him and his ideas worked well. In his absence there took place a general election and Cobden was returned member for Stockport and for Westriding in Yorkshire. He chose the seat for West Riding and began to agitate for a policy of peace. At this time England under her aggressive Minister Palmerston was fast being carried away by jingoism. But Cobden resisted that spirit and hence he became a sturdy opponent of Palmerston, so much so that when Lord Palmerston offered him a seat in his cabinet he refused the honour without any hesitation. He would have nothing to do with Palmerston. Another important event of his life which I have to note before I close is his negotiating of a commercial treaty between England and France in 1860. By this treaty Cobden not only brought about an economic gain to both the countries, but also lived to bring about a good feeling between the nations. It has been truly said that Cobden was an "International man." The truth of this remark we can best realise if we look at this commercial treaty which he negotiated. Even while he was young he was advocating International commerce and intercourse. He was of opinion like many other Freetraders that international commerce brings about a solidarity of feeling among nations and not only is a commercial advantage to both the parties but goes a great way in minimising political difficulties and troubles.

Now though the principles of Cobden were laudable yet one can not help remarking that Cobden was taking a much too rosy a view of things. He believed a national economic concern to be the solution of political troubles. But apart from national economic questions there are other considerations which matter a great deal and decide and determine national quarrels and troubles. But Cobden like Norman Angell believed in the possibility of the disappearance of all international quarrels. This, he argued, was possible if there was satisfactory International trade. This was, I think, going too far. Cobden like Norman Angell forgot that there are moments when the evil genius of a particular nation becomes rampant and lets slip the dogs of war. This is bound to happen so long as human nature is what it is and wars will never end whatever optimists may say. But we must praise Cobden for the excellent ideal has won for him the title of "International man."

Now I shall examine Cobden as a public leader and bring my paper to a close. We have already seen the one sterling virtue of his life. This lay in the spirit of self-sacrifice. In the next place we have to point out that Cobden was a patient and well-tempered public leader. He was I believe the only one public leader in England who never abused other people in his speeches. He always warred with principles and not with men. Although more than once in his life he was subjected to personal attacks he never degraded himself by attacking others. In this respect even the great Irish man O' Connell cannot stand a comparison with him.

The next great thing was that he was essentially a practical man. He never indulged in idle platitudes and imaginary theories but always with facts and figures. Thus like our own Gokhale he was eminently successful as a practical statesman. He was no doubt an orator but his oratory was based on solid facts and not merely on airy nothings and heated rhetoric.

In conclusion I shall repeat that the ennobling feature of his life was his spirit of selfsacrifice and that he was eminently a practical man so much so that I am inclined to add to the list of Carlyle's heroes and regard him as a hero-as a man of action.

NIRMAL KUMAR GUPTA.

# ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৫ম খণ্ড । ঢাকা—শ্রাবণ, ১৩২২ সাল। ৪র্থ সংখ্যা।

## হিন্দু জড়-বিজ্ঞানের কয়েকটী নিদর্শন।

হিন্দুর চিন্তা চিরদিনই অন্তর্জগতের বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত। বহির্জগতের দিকে হিন্দুর কোন দিনই লক্ষ্য ছিল না। এই জন্যই হিন্দুমনোবিজ্ঞানে যেরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন, জড়বিজ্ঞানে সেরূপ কিছুই করিতে পারেন নাই। ইহাই হিন্দু জাতিসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সাধারণ ধারণা এবং ইহা হইতেই আচার্য্য মোক্ষমূলর হিন্দুদিগকে দার্শনিকের জাতি ( A nation of philosophers ) এই বিশেষ গৌরবাখ্যা প্রদান করিয়া, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের গৌরবকে খর্ব্ব করিয়াছেন। কিন্তু যেই হিন্দুগণ মনোরাজ্যের অশেষ রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহারা যে জড়জগতের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ অন্তর্জগতের সন্ধানে যে মানসিক শক্তির বিনিয়োগ করিতে হয়, বহির্জগতের সন্ধানেও সেই মানসিক শক্তিরই বিনিয়োগ করিতে হয়। অতএব যে মনীষা দ্বারা মনোবিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার হয়, তাহা দ্বারাই যে জড়বিজ্ঞানের সত্যও আবিষ্কার হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। তাহাতেই দর্শন হইতেই যে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইবে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ভারতীয় দর্শনে আমরা তাহার স্পষ্ট প্রমাণই প্রাপ্ত হই। এইজন্যই কণাদকৃত বৈশেষিক দর্শনে আমরা জড়বিজ্ঞানের পরমাণুবাদের উৎপত্তি দেখিতে পাই। যে বৈশেষিক দর্শনে আমরা জড়-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বরূপ পরমাণুবাদ প্রাপ্তহই, তাহাতে যে আরও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান থাকিবে, তাহা আমরা বিশেষরূপেই আশা করিতে পারি। প্রথমে আমরা সেই কয়েকটী বৈজ্ঞানিক জড়ের সন্ধান প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মহা-মনীষী নিউটন গাছ হইতে পৃথিবীতে অ্যাপেল ( Apple ) পতন দেখিয়া মধ্যা-কর্ষণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন; হিন্দুদার্শনিক আকাশ

হইতে ভূমিতে বৃষ্টিবিন্দুর পতন দেখিয়া এইরূপে তাহার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন :—

"অপাং সংযোগনভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্।" ৩

বৈশেষিক দর্শন ( বঙ্গবাসীর মুদ্রণ ) পঞ্চমাধ্যায় ২য় আহ্নিক।

বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বাষ্পরাশি হইতে পৃথগ্‌ভূত হইলেই বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে পতিত হয়। এই পতন বৃষ্টিবিন্দুরূপে পরিণত ঘনীভূত বাষ্পের 'গুরুত্ব' বা ভার বশতঃই হইয়া থাকে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম Law of gravitaton নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা গুরুত্বগুণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। গুরুত্ব কথাটি gravitataon কথাটীর কেবল একার্থক তাহা নহে, পরন্তু ইহার সহিত একই প্রকৃতি মূলক (Cognate) বৃক্ষ হইতে ফলপতন দেখিয়া যেমন নিউটন পতন কারণ Law of gravitaton বা মধ্যাকর্ষণ নিয়মে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কণাদমুনিও তদ্রূপ পতন কারণ যে গুরুত্ব তাহা তদীয় দর্শনের উপরি উদ্ধৃত সূত্রে সন্নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাপেরদ্বারা প্রসারণ ও তাপাভাব বা শৈত্যের দ্বারা ঘনীভূত ভাব হওয়ার যে সাধারণ নিয়ম পাওয়া যায়, তাহাই বৈশেষিক দর্শনের নিম্নোদ্ধৃত সূত্রে প্রকাশিত হইয়াছে :—

"অপাং সংঘাতোবিলয়নঞ্চ তেজঃসংযোগাৎ॥" ৮

৫ম অধ্যায় ২য় আহ্নিক।

জলের সঙ্ঘাত অর্থাৎ জমাট ও বিলয় অর্থাৎ দ্রবীভাব তেজঃ সংযোগ মূলক"।

এস্থলে তেজের সহিত ঘনীভূত ভাবও দ্রবভাবের সম্পর্কের কথাদ্বারা, তেজেরই মাত্রা ভেদেরদ্বারা যে উক্ত ব্যাপারদ্বয় সংঘটিত হয়, তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহা হইতে জল জমিয়া বরফ হওয়া ও বরফ গলিয়া জল হওয়ার কারণ যে হিন্দুগণ বিশেষরূপেই অবধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণই পাওয়া যায়।

মেঘে বিদ্যুদুৎপাদন ও বজ্রধ্বনি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মেঘ হইতে মেঘান্তরে তড়িৎসঞ্চালনকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এতৎ সম্বন্ধে বৈশেষিকদর্শনের মত এইরূপে সূত্রকারে প্রকটিত হইয়াছে :—

"অপাং সংযোগাদ্বিভাগাচ্চ স্তনয়িত্নোঃ॥" ১১

পঞ্চমাধ্যায়—২য় আহ্নিক।

"জলের অর্থাৎ সঙ্ঘাত প্রাপ্ত জল ও দ্রবীভূত জলের মেঘের সহিত যে সংযোগবিভাগ তাহা বজ্রনির্ঘোষের হেতু।" বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

মেঘসকলের পরস্পর সংঙ্ঘর্ষ বা ঘাতপ্রতিঘাতে বিদ্যুদুৎপত্তি ও বজ্রধ্বনি হয় ইহাই উদ্ধৃত সূত্রের মর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বোক্তরূপ মেঘসঙ্ঘর্ষ হইতে যে বজ্রধ্বনির উদ্ভব হয় তৎসম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সূত্র প্রণীত হইয়াছে :—

তত্রবিস্ফূর্জ্জথুর্লিঙ্গম্॥" ৯

বৈশেষিক দর্শন ৫ম অধ্যায় ২য় আহ্নিক।

"বজ্রনির্ঘোষ সেই তেজঃ-সংযোগের অনুমাপক।"

তেজঃ ও আলো পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে Heat ও Light নামে একই তত্ত্বরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তেজের প্রকাশ ভাবই আলোরূপে পরিস্ফুট হয়। বৈশেষিক দর্শনে তেজঃ সম্বন্ধে এইরূপ সূত্র পাওয়া যায় :—

"উষ্ণস্পর্শ তেজসস্তু স্যাদ্রূপং শুক্লভাস্বরম্।
নৈমিত্তিকং দ্রবত্বন্তু নিত্যত্বাদিচ পূর্ব্ববৎ॥" ৪১

ভাষাপরিচ্ছেদ।

ইহা হইতে তেজঃ উষ্ণস্পর্শ ইহা শুভ্রদীপ্তিরূপে প্রকাশপায় ও ইহা দ্রবপ্রকৃতিক তেজঃসম্বন্ধে এই সমস্ত তত্ত্বই জানিতে পারা যাইতেছে।

এতদতিরিক্ত তেজের বেগগুণসম্বন্ধেও অন্যত্র উল্লেখ পাওয়াযায়

"স্পর্শান্তষ্টৌ রূপবেগৌ
দ্রবত্বং তেজসোগুণাঃ॥" ৩০ ভাষাপরিচ্ছেদ।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞানেও আমরা আলোর বেগ বা গতি সম্বন্ধে সবিশেষ নির্দ্দেশ দেখিতে পাই।

পাশ্চাত্য আলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে অভিনব মত প্রচলিত দেখাযায়, অনুসন্ধান করিলে তাহারও আভাস

আমরা আমাদের শাস্ত্রাদিতে পাইতেপারি। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের মতে তেজেরদ্বারা ইথার বা আকাশে তরঙ্গ উৎপাদন হইতেই আলোর সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই প্রকারে আলোককে আকাশতরঙ্গেরই প্রকার ভেদ বলা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে "ঊর্ম্মি" পর্য্যায়ে যে সমস্ত শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'তরঙ্গঃ', 'প্রকাশঃ', 'বেগঃ' এই কয়টী শব্দ আমরা প্রাপ্ত হই। বিশেষ প্রণিধান সহকারে এই কয়টী শব্দের সম্বন্ধ বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারাযায় যে বেগের দ্বারাই প্রথম তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া পরে প্রকাশের কারণ হয়। উক্ত অভিধানেই "বীচি" শব্দের যে "কিরণার্থ" পাওয়া যায় তাহাতেও কিরণ যে তরঙ্গরূপ তাহাই যেন স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশকরিয়া দেয়।

আলোকের "কিরণ" ও "রশ্মি" নামের দ্বারা ইহা যে রেখার ন্যায় বিকীরিত হয় তাহাও বুঝা যায়। এই প্রকারে আলোর বিস্তার সম্বন্ধে "বিকীরণ" ও "তরঙ্গ" এই উভয় প্রণালীই হিন্দুদিগের পরিজ্ঞাত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাহইতে আমরা এই উভয়প্রকার প্রক্রিয়ারই কথা জানিতে পারিব :—

But with regard to the propagation of light, and the mode in which it makes itself mainfest to our senses, there are two hypotheses—the hypothesis of emission, and the hypothesis of undilation. The hypothesis of emission supposes that light consist of a highly attenuated fluid, the particles of which are not effected by gravity, but are endowd with a great self-repulsive force, and are actually projected from luminous substances in straight lines with inconceivable velicity. In the hypothesis of undulation, on the contrary, the whole universe, including the interstitial spaces of all matter, is conceived to be filled with a highly elastic rare medium, which possesses the property of enertia, but not gravitation to which the name of other has been given. This medium is not light but light is produced in it by the excitubin, on the part of luminous bodies, of an undulalery motion analigious to the waves of water. "Beeton's Dictionary of Universal Information.

বৈশেষিক দর্শনের সূত্রে আমরা তেজকে যেরূপ দ্রবত্ব ও বেগযুক্ত দেখিতে পাইয়াছি, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের উপরি উদ্ধৃত বর্ণনায়ও আমরা তাহাই দেখিতে পাই।

এতৎ প্রসঙ্গে বর্ণসম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ মন্তব্য করা কর্ত্তব্য বোধকরি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে সূর্য্যকিরণই বর্ণের মূলাধার। কারণ এই সূর্য্যকিরণের বিশ্লেষণ দ্বারাই তাহাতে সপ্তবর্ণের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের অভিধানে সূর্য্যের একনাম "সপ্তাশ্ব" পাওয়া যায়। সপ্তবর্ণযুক্ত কিরণকে সূর্য্যের অশ্বরূপে কল্পনা করাই সম্ভবতঃ তাহাকে এই "সপ্তাশ্ব" নাম প্রদত্ত-হইয়াছে। নবগ্রহস্তোত্রে গ্রহদিগের বিভিন্নবর্ণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে সুপ্রাচীন কালেই সপ্তবর্ণের সম্পূর্ণ জ্ঞানই যে হিন্দুদিগের ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণই প্রাপ্তহওয়া যায়।

তেজের ন্যায় বায়ুরও গুণাদি নিরূপণ বৈশেষিক দর্শনে দেখিতে পাওয়াযায়। এতৎ সম্বন্ধে ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে :—

"স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগাখ্যঃ
সংস্কারো মরুতোগুণাঃ ॥"

টীকায় এই সমস্তগুণ এইরূপে বিবৃত হইয়াছে :— "স্পর্শসংখ্যা পরিমাণ পৃথক্ত্ব সংযোগ বিভাগ পরত্বাপরত্বাখ্যষ্টৌ বেগাখ্যসংস্কারশ্চেতি বায়োর্গুণাইত্যর্থঃ--ইতি দীনকরী।

এস্থলে বায়ুর 'সংখ্যা' 'পরিমাণ' ও 'বেগ' এইকয়টী গুণ বিশেষরূপে লক্ষণীয়। বায়ুর বেগধর্ম্ম হইতে ইহা সর্ব্বদাই গতিশীল ইহার "সদাগতি" নাম তাহাতেই হইয়াছে। বায়ু নানাপ্রকারের বলিয়াই সংখ্যাদ্বারা

ইহার গণনাহইয়া থাকে। ইহার "পরিমাণের" নির্দ্দেশ-দ্বারা গুরুত্বগুণ বুঝাইতেছে বলিয়াই আমরা মনেকরি! বায়ুর গুরুত্বগুণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নবাবিষ্কার বলিয়াই সকলের সংস্কার। এখানে তাহার আভাস দেখিয়া ভারতীয় জ্ঞানেই যে এইতত্ত্ব প্রথম স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহারই প্রমাণ আমরা প্রাপ্তহইতেছি।

বায়ুস্তরের ঘনত্বও বিরলত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায় আমাদের নরকের বিশেষ বিশেষ নামে তাহারই নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। নরকের এক নাম যেমন আমরা 'তনুবাত' প্রাপ্তহই, তেমনই অপরনাম তদ্বিপরীত 'ঘনবাত' প্রাপ্তহই। আমাদের শব্দশাস্ত্রে ইহাদের যেরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের বক্তব্যের সম্পূর্ণ সমর্থনই পাওয়া-যায়। আমরা বিশ্বকোষ হইতে নিম্নে দুইটীরই ব্যুৎ-পত্তি প্রদান করিতেছি—"তনুক্ষীণঃ বাতঃ যত্র বহুব্রীহি।"

"ঘনোনিবিড়োবাতোঽত্র।"

ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুর যে বৃত্তান্ত পুরাণাদিতে দেখাযায় তাহা বায়ুস্তরের রূপকবলিয়াই বোধহয়। 'মিত' 'সম্মিত', 'সুমিত', 'সভর' প্রভৃতি নামগুলি ভিন্ন ভিন্ন বায়ুস্তরের ঘনত্বেরই জ্ঞাপক বলিয়া বোধহয়। 'সভর' নামটী যেমনই নিরন্তরের জ্ঞাপক, তেমনই বায়ুর ভারের ও জ্ঞাপক বলিয়াই অনুমিতহয়। কারণ 'ভর' ও 'ভার' শব্দ কেবল একই প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন তাহানহে প্রত্যুত একার্থেরও বাচক। 'দুর্ভর' শব্দে তাহার স্পষ্ট দৃষ্টান্তই পাওয়াযায়। অভিধানে ভারবাচী 'গুরু' শব্দের অর্থ ও দুর্ভর শব্দের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে যথা—"গুরুস্ত্ত গীস্পতৌ শ্রেষ্ঠে গুরুঃ পিতরি দুর্ভরে।" সুতরাং বায়ুর 'সভর' নামটী আমরা বিশেষ ভারযুক্ত অর্থেই গ্রহণ করিতে পারি।

বায়ুর প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে যে বৈদিকবিবরণ পাওয়াযায় তাহা এই "তস্মাদ্বা এতস্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী ইত্যাদি।"*

পাশ্চাত্যবিজ্ঞান বায়ুতে যে অম্লজান (oxygen) বাষ্পের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা দাহগুণ সম্পন্ন বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বৈদিক বায়ুজাত অগ্নি আমাদের নিকট দাহকারী এই অম্লজান (oxygen) বাষ্পবলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

বায়ুতে যেমন অম্লজানরূপ উত্তপ্ত বাষ্পআছে, তেমনই উদ্‌জান (Hydrogen) রূপ জলীয় বাষ্পও আছে। অম্লজানরূপ বাষ্পের সহিত উদ্‌জানবাষ্পের সংযোগেই জলের উৎপত্তিহইয়া থাকে। ইহাহইতে বৈদিক বর্ণনায় অগ্নিহইতে জল সৃষ্টির যে কথা আছে, তাহাতে অম্লজানের সহিত উদ্‌জানের যোগে জলোৎ-পত্তির তত্ত্বই নিহিত আছে বলিয়া বুঝিতে পারা-যাইতেছে।

চুম্বককর্ত্তৃক লৌহের আকর্ষণ এবং বৃক্ষের মূলহইতে রসের ঊর্দ্ধাভিগমন প্রভৃতি বিশেষ প্রাকৃতিকব্যাপার যে ভারতীয় দার্শনিকদিগের পর্য্যবেক্ষণের বিষয়ীভূত হইয়াছিল, বৈশেষিক দর্শনের নিম্নোদ্ধৃত সূত্র দুইটীতে তাহার প্রমাণ পাওয়াযায়—

"মণিগমনং সূচ্যভিসর্পণমদৃষ্টকারকম্॥" ১৫

পঞ্চমাধ্যায়ে ১ম আহ্নিকম্।

"বৃক্ষাভিসর্পণমদৃষ্টকারিতম্॥"৭

পঞ্চমাধ্যায়ে ২য় আহ্নিকম্।

এস্থলে কারণকে "অদৃষ্ট" নামে অভিহিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের গূঢ়কারণ অলক্ষিত বলিয়াই 'অদৃষ্ট' এই আখ্যায় ইহাকে বিশেষিত করা হইয়াছে। প্রাচীন টীকাকার শ্রীধর 'অদৃষ্টের' যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতেও ইহার পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই পাওয়া যায়; যথা "প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামনুপলভ্যমানকারণম্"† যে কারণ প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা লাভ করা যায়না তাহাই 'অদৃষ্ট'। ইহাতে হিন্দুর দর্শনবিজ্ঞান যে কেবল কল্পনা-রই ফল নহে, পরন্তু পর্য্যবেক্ষণও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই আমরা জানিতে পারিতেছি। হিন্দুদার্শনিক যে উল্লিখিত প্রাকৃতিক রহস্যের কোন কাল্পনিক কারণ

* 'আর্য্যপ্রতিভা' কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত।

† Quoted in the Physical Sciences of the Hindu by Dr. Brajendranath Seal Ph. D.

নির্দ্দেশ না করিয়া সরলভাবে ইহাকে অলক্ষিত অজ্ঞাত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যথার্থ বৈজ্ঞানিকের সত্যপ্রিয়তারই সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্তহওয়া যাইতেছে।

উপরিউক্ত প্রথমসূত্রের 'মণিগমনের' ব্যাখ্যায় টীকাকার শঙ্করমিশ্র লিখিয়াছেন "তৃণকাণ্ড মণ্যাকৃষ্টানাং তৃণানাং গমনে।"* ইহা হইতে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের Ambe'r বা তৃণমণির সহিত তৃণের বৈদ্যুতিক আকর্ষণ যে হিন্দুদার্শনিকের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই বুঝিতে পারাযায়। উক্ত সূত্রের 'সূচ্যভিসর্পণের' ব্যাখ্যায় টীকাকার শঙ্করমিশ্র লিখিয়াছেন "সূচীনাং লৌহশলাকানাং অয়স্কান্তাভিমুখগমনম্। সূচীত্যুপলক্ষণং অয়স্কান্তাকৃষ্ট লৌহমাত্রমভিপ্রেতম্॥"* এই ব্যাখ্যা হইতে লৌহশলকা চুম্বকের (অয়স্কান্তের) দ্বারা আকৃষ্টহয় তাহাও জানিতে পারিতেছি। সূত্রে 'সূচীর' উল্লেখদ্বারা কণাদের সময়ই যে দিগ্দর্শন যন্ত্রের প্রচলন ছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি, কারণ এই 'সূচী' দিগ্দর্শন যন্ত্রের কাঁটা ব্যতীত আর অন্যকিছু বলিয়াই বোধ হয়না।

শব্দের উৎপত্তি কিরূপে হয় ও তাহা কিপ্রকারে বিস্তার লাভকরে, তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এখনও কোনসিদ্ধান্ত অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নাই। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের মতে বায়ু বা আর কোন স্থিতিস্থাপক গুণযুক্ত পদার্থে আঘাত হইতেই শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং এই শব্দ তরঙ্গরূপে ব্যক্তহয়। তাহাতেই ইহাকে 'শব্দতরঙ্গ' বলা হইয়াথাকে।† পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের এই আধুনিক সিদ্ধান্ত স্মরণাতীতকালেই ভারতীয় বৈশেষিক দর্শনে প্রতিপাদিত হইয়াছিল যথা—

সর্ব্বঃশব্দো নভোবৃত্তিঃ শ্রোত্রোৎপন্নস্তুগৃহ্যতে। ১৬৫
বীচিতরঙ্গ ন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা।
কদম্বগোলকন্যায়াদুৎপত্তিঃ কস্যচিন্মতে॥"১৬৬

ভাষাপরিচ্ছেদ।

"সমস্তশব্দই আকাশের গুণ, কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া ইহাশ্রুতহয়। সলিল তরঙ্গেরন্যায় ইহার উৎপত্তিকীর্ত্তিত হইয়াথাকে। কাহারও মতে গোলকদম্বপুষ্পের ন্যায় ইহার উৎপত্তি হয়। অভিঘাতের দ্বারা যে শব্দ উৎপন্নহয় তৎসম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শনের সূত্র এই "অভিঘাতো নোদনঞ্চ শব্দহেতুরিহাদিমঃ॥" ভাষাপরিচ্ছেদ। 'কর্ম্মজ সংযোগ দুইপ্রকার অভিঘাত ও নোদন। ইহাদের মধ্যে প্রথমটী শব্দের করণ।'

পাশ্চাত্যবিজ্ঞান যে স্থলে বায়ু বা অপরস্থিতিস্থাপক পদার্থে শব্দের উৎপত্তি নির্দ্দেশকরে তৎস্থলে ভারতীয় দর্শন আকাশেই মাত্র নির্দ্দেশ করিতেছে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে কেবল তরঙ্গাকারেই শব্দের ব্যাপ্তি নিরূপিত হইয়াছে, ভারতীয় দর্শনে তদতিরিক্ত কদম্বপুষ্পের কেশরের ন্যায়ও একবারেই সর্ব্বদিকে শব্দের ব্যাপ্তি নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় দর্শনমত যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতের অপেক্ষা কোনঅংশে অপ্রশস্ত নহে, তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞান ইথার্ নামক এক আশ্চর্য্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া প্রকৃতিরাজ্যের বহু জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতেছে। ইহার প্রকৃত স্বরূপ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে :—

"The whole universe, includihg the interstitial space of all matter, conceived to be filled with a highly elastic rare medium, which possesses the property inertia, but not gravitation, to which the name of ether has given." Beeton's Dictinary of Universal Information.

ইহার অনুবাদ এই—"সমস্ত বিশ্বও সমস্ত বস্তুর মধ্য-

* Quoted in "The Physical Sciences of the Hindues by Dr. Brojendra nath Seel Ph D.

† Sorundis produced by causing the air or any other elastic body to assume a vitratary motion.

We have seen that sound is prcduced by a certain vitratary force being transmitted through air, produced what is turmed a wave of srund." Beeton's Dictionnay of Universai Information.

গত ব্যবধান—অতীব স্থিতিস্থাপক সূক্ষ্ম মধ্যবর্ত্তী পদার্থ-দ্বয়ে পরিব্যাপ্ত বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ইহাতে নিশ্চলতা গুণ আছে কিন্তু গুরুত্ব নাই। ইহাকেই "ইথার" নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

আমাদের যোগশাস্ত্রে আকাশের স্বরূপ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত ইথারের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনায় তুলনা করিলে অতি কম বৈষম্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে। এখানে আমরা সেই বর্ণনাটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"সর্ব্বতোগতিরব্যূহো বিষ্টম্ভশ্চেতি চ ত্রয়ঃ। আকাশ-ধর্ম্মা ব্যাখ্যাতাঃ পূর্ব্বধর্ম্ম বিলক্ষণাঃ ॥"*

"সর্ব্বব্যাপিত্ব, নিরবয়বত্ব অত্যন্তগূঢ়ত্ব ও নিশ্চলত্ব এই কয়টীই আকাশের বিশিষ্ট ধর্ম্ম।"

এই ব্যোমতত্ত্বই জড়জগতের সর্ব্বপ্রধানতত্ত্ব। এই জন্যই ইহা ব্রহ্মতত্ত্বের পরেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—"ব্রহ্মব্যোম্নোর্নভেদোঽস্তি—চৈতন্যংব্রহ্মণোঽধিকম্। "ব্রহ্ম ও ব্যোমের ভেদ নাই—ব্রহ্মের চৈতন্যমাত্রই অধিক।"

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেখানে সম্প্রতি মাত্র ব্যোমতত্ত্বকে জড়জগতের প্রধানতত্ত্বরূপে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—সেখানে হিন্দুগণ যে বহু পূর্ব্বেই ইহাকে প্রধান জড়তত্ত্বরূপে প্রতিপাদিত করিয়াছে—তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম।

হিন্দুগণ কেবল যে ব্যোমের তত্ত্বরূপই প্রতিপাদন করিয়াছিলেন তাহা নহে—পরন্তু ইহাকে সাধনার বিষয় করিয়া, সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতঃ আপনাদের বহু অলৌকিক অতীন্দ্রিয় শক্তির পরিচয়ই দিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় ব্যোমতত্ত্বের এই সাধনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্প্রতি মাত্র বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে—আমরা আশা করি যে ইহার সিদ্ধিতত্ত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দ্বারাই সুপ্রমাণিত হইবে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

* "আর্য্যপ্রতিভা"তে কালীবর বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত

# অদৃষ্টের পরিহাস।

(১)

বি, এ পরীক্ষা দিয়াও কিছুকালের জন্য কলিকাতায়ই রহিয়া গেলাম। বাবা বাড়ী যাওয়ার জন্য ঘন ঘন চিঠি দিলেও, নানা কারণে যাইতে পারিলাম না। মেস্ বন্ধ হইলে বিনয়কে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইব, এই মতলব ছিল। বিনয় আমার প্রতিবেশী।

কাজ কর্ম্ম নাই, মেসের জানালা খুলিয়া সংবাদ পত্র পড়ি, আর বিছানায় গড়াগড়ি দিয়া দিন কাটাই। কখন বা "শুনেছি তার বরণ কালো

তারে না দেখা ভালো—

বলিয়া চেঁচাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠের ছাত্রগণ পড়াশুনার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিই। বিকাল বেলায় গোলদীঘিরধারে, গড়ের মাঠে বা গঙ্গার কিনারায় বেড়াইতে যাই। সন্ধ্যার পর ছাদের উপর হার্ম্মোনিয়ম লইয়া বেতালা সুরে, আমার রাসভ-নিন্দিত কণ্ঠে যে সকল গানের মহলা দিতাম,—পাড়াগাঁয়, তেমন করিয়া প্রতিবেশীকে অত্যাচার করিলে, আমার নির্ব্বাসন দণ্ডের উপর আপীল চলিত না।

(২)

সে দিন গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছিলাম। একখানি মূল্যবান ওয়েলার গাড়ী আমার পাশ দিয়া সবেগে চলিয়া গেল! দূর হইতে আমি 'কাজলী' রঙ্গের ঘোড়াদুটীর দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়াছিলাম, কিন্তু যখন গাড়ী খানি আমাকে অতিক্রম করিল—তখন পলকে দেখিলাম, গাড়ীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী তন্বঙ্গী ষোড়শী উপবিষ্টা। বিদ্যুতের একটা ঝাঁকনিতে আমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

তার পর সে দিন কি হইল, হলপ করিয়া সত্য বলিতে পারিব না; কারণ আমি সম্ভবতঃ আমার মধ্যে ছিলাম না। কখন যে মেসে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করতঃ শয়ন করিয়াছিলাম—ভগবানই জানেন। চিন্তাশক্তিটা জমাট হইয়া গিয়াছিল, আপাদ মস্তক আমার আয়ত্ত ছিল কি না সন্দেহ।

সেইদিন আমার এই মৌনভাব, এই নির্জ্জনে অবস্থান প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া মেসের অনেকেই বিস্মিত হইল। কারণ তাহারা আমার এভাব এই প্রথমবার দর্শন করিল।

শেষরাত্রে উঠিয়াই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত করিলাম। হায়, তখনও রাত্রি প্রভাত হইল না—ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখি—প্রায় একটী ঘণ্টা এখনও বাকী। ঘড়ীটা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছিল। অবশেষে যখন বেশ বুঝিলাম, আমার হুকুম মত রাত্রি প্রভাত হইবে না—তখন ঢেঁকী অবতারের মত সটান লম্বা হইয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলাম।

হঠাৎ ধড়ফর করিয়া উঠিয়া দেখি, সূর্য্যদেব আকাশে উঠিয়া পড়িয়াছেন। সোণালী কিরণে আমার কোঠাখানি যেন হাস্যময় হইয়া গিয়াছে!

বড় বিলম্ব হইয়া গেল—হায় কাল নিদ্রা তুই আমার চক্ষে এই অসময় আসিলি কেন? আমি শয়ন না করিয়া যদি বসিয়া থাকিতাম—কোনওই দুঃখের কারণ হইত না।

অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে বেশভূষা করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলাম এবং পূর্ব্ব দিনের "দর্শন" স্থানে যাইয়া হাজির হইলাম।

(৩)

আজ পাঁচটী দিনে আমার চেহারা মেসের ছাত্রগণের লক্ষ্য করিবার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ঊষাগমের সময় হইতে বেলা বারটা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ণ দুইটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত (প্রায়ই তাড়াতাড়ি এবং তজ্জনিত ভুল বশতঃ ছাতা লইতে পারিতাম না) রৌদ্র উপভোগ করিয়া আমি কি জানি কেমন হইয়া গেলাম। গোপাল বাবু ত স্পষ্টই বলিলেন,—কিরে রাখাল সহরময় দালালী করে ঘুরিস্ নাকি? গোপাল বাবু এম, এ, পড়েন—আমাদের সকলের সম্মানের পাত্র। তাহাকে আমরা বড় ভাইয়ের মত দেখিতাম। তাই, তাঁহার কথার কোনও উত্তর দিলাম না। কিন্তু তিনি বলিলেন—তুই হয় বাড়ী যা—নতুবা—মেসে পড়িয়া ঘুমাগে—ইস্ কি ভয়ঙ্কর রৌদ্র! এর মধ্যে তুই উদ্ভ্রান্ত ঘুরিস্!

আহারান্তে গোপাল বাবু আমার কোঠায় আসিয়া বসিলেন এবং গল্প জুড়িয়া দিলেন। ক্রমে মেসের অনেক ছাত্রই আসিয়া গল্প শুনিতে বসিল। সে দিন রবিবার—তাদের কলেজ ছিল না। আমি নজরবন্দী হইয়া, ক্রমেই অধীর হইতে লাগিলাম। ঘড়িতে মিনিটের কাঁটাটা আজ অত্যন্ত অসঙ্গত রকম স্লো চলিতে ছিল। ঠিক ১১টায় আমাদের খাওয়া হইল—তারপর দীর্ঘ এক যুগের মত সময় চলিয়া গেল—এতক্ষণে কি না বাজিল দেড়টা! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সূর্য্যও তখন যে স্থানে ছিলেন—তাহাতে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির ৫টা বাজিবার সন্দেহ হইতে পারিত না!

গোপাল বাবুর গল্প শুনিয়া সকলেই এক একবার হে হো করিয়া হাসিয়া উঠে, কখন বা কেহ হাততালি দেয়, কেহবা কখন আপ্‌শোষ করে—তখন আমিও গোলে হরিবোল দেই। কারণ গোপাল বাবু অত্যন্ত পরিষ্কার বাঙ্গালায় গল্প বলা সত্ত্বেও, তাঁহার সে দিনের ভাষাটা আমার নিকট হিব্রু অপেক্ষাও দুর্ব্বোধ্য ছিল। আমি তাঁহার কোনও কথাই শুনি নাই, বলিলেই ঠিক হয়।

অবশেষে গোপাল বাবু উঠিলেন। তখন ঘড়িতে বেলা ৫টা। কিন্তু হতভাগা ছেলেগুলা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—না আর একটা গল্প বলুন, আর একটা—আর একটা—আমরা আজ বেড়াব না।

যদি সত্যযুগের মত ব্রাহ্মণের চক্ষুদিয়া আগুন বাহির হইত, তবে আমি এই মুহূর্ত্তে সবগুলি ছাত্রকে ভস্ম করিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইতাম। মনে মনে তাহাদিগকে যেসকল অভিসম্পাত করিতেছিলাম—তাহা যে তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল না, এই দুঃখে দেয়ালে মাথা কুঁড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল।

কিন্তু গোপাল বাবু সদয় হইয়া কহিলেন—না—এখন আর নয়—সন্ধ্যার পর। চল রাখাল, আজ গড়ের মাঠে বেড়াতে যাব।

আমি বলিলাম—না আমাকে আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে ষ্টেসনে যাইতে হইবে, বিশেষ প্রয়োজন।

* * * *

সেদিন সেই গাড়ীতে সেই মূর্ত্তি দেখিলাম।

(৪)

কর্ত্তব্য স্থির করিয়াই পথে দাঁড়াইলাম। ঐ ঐ সেই গাড়ী আসিতেছে। আমি সাইকেলটা ঠিক ধরিয়া রাখিলাম। যেই মুহূর্ত্তে গাড়ী আমার সম্মুখদিয়া চলিয়া গেল, আমি সাইকেলে লাফদিয়া উঠিয়া বোঁ বোঁ করিয়া তাহার পেছনে ছুটাইয়া দিলাম।

গাড়ী খানি একটী প্রকাণ্ড বাড়ীর আঙ্গিনায় যাইয়া দাঁড়াইল। আমি সদর রাস্তায় সাইকেল হইতে অবতীর্ণ হইলাম। লোহার শিক দেওয়া রেলিং এর ফাঁকদিয়া দেখিলাম, তরুণী গাড়ী হইতে নামিয়া মরাল গমনে সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় উঠিল। একটা ফিরিওয়ালা তখন হাঁকিয়া যাইতেছিল। আমি আমার অবস্থানটাকে ভদ্রতার রীতি-বিরুদ্ধ মনে করিয়া যেন সেই ফিরিওয়ালার নিকটেই বড় সঙ্কুচিত হইলাম। সে আমার দিকে একবার চাহিয়া আপন পথে চলিয়া গেল। আমি মেসে ফিরিয়া আসিলাম।

* * * *

আজ প্রায় পনর দিন ধরিয়া আমি বিনোদপুরের রায় লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরী বাহাদুরের ম্যানেজারের ভৃত্য। লক্ষ্মীকান্ত দরিদ্রের ছেলে ছিলেন। সংসারের যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আইসেন, এবং ব্যবসায় দ্বারা এখন বিপুল ধনের অধীশ্বর হইয়াছেন। তাঁহার বাড়ীখানি কলিকাতার মত সহরেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁহার গাড়ী ঘোড়া সহরের অনেকেরই পরিচিত।

লক্ষ্মীকান্ত ব্রাহ্মধরণের লোক হইলেও ছেলে মেয়ের সম্বন্ধ হিন্দুসমাজেই করিতেন। তাঁহার বড় ছেলে অপূর্ব্বকুমার হাইকোর্টের উকীল—সে আমাদের দেশেই বিবাহ করিয়াছিল, লক্ষ্মীকান্তের একটী মেয়েকে—মায়ের খাতিরে গৌরীদান করা হয়। তৃতীয় কন্যা কলেজে লেখা পড়া শিখিতেছে। দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী বনবালা বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "উষার" সম্পাদিকা। ইনিই তিনি।

(৫)

ম্যানেজার কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বয়সে প্রৌঢ়, অতি সৎলোক। ইংরেজী লেখাপড়া ভাল জানেন। লক্ষ্মী বাবুর নিকট আত্মীয়।

তিনি অন্দরে বাহিরে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারিতেন। তবে নিজে পৃথক বাড়ীতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে থাকিতেন। কারণ ইনি অতি-নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন।

ম্যানেজার বাবুর কাজগুলি আমি এমন দক্ষতার সহিত, এমন পরিপাটীরূপে করিতাম, যে তাহাতে বাড়ীর সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বয়ং কর্ত্রীঠাকুরাণী আমাকে নিজের ছেলের মত দেখিতেন। বাড়ীর ছেলে মেয়েরাও শ্যাম দা শ্যাম দা করিয়া আমাকে আকুল করিয়া তুলিত।

একদিন অপরাহ্নে ম্যানেজার বাবু আমাকে ডাকিয়া কহিলেন—শ্যামাকান্ত, তোমাকে ত আর আমি রাখ্‌তে পারলাম না। কি করি বাপু—কর্ত্তা আমাকে যেভাবে ধরিয়াছেন। তোমাকে রায় বাহাদুরের বাড়ীতেই থাকিতে হইবে। মাইনে এখানে ছিল ৪৲ চার টাকা—সেখানে পাঁচ টাকাই ঠিক করিয়াছি। যাও বাপু—এই ভদ্রলোকটীর সঙ্গেই যাও। মধ্যে মধ্যে এসো। আহা ছেলেটীর কি স্বভাব!

আমি মাথা নোয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কি আপনি আমায় রাখ্‌বেন না।

আরে বাপু, তোমাকে না রাখ্‌তে চায় কে? আজ আমি কর্ত্তার সঙ্গে বসে নানাকথা বল্‌ছিলাম। প্রসঙ্গে তোমার কথা বলে ফেল্লাম। অম্‌নি বনবালা ধরে বস্‌ল—'কাকা বাবু, চাকরটী আমি চাই। আমার পশ্চিমা নূতন চাকরটা কি কাঁই মাই করে—ভাল লাগে না। আর বেটা বড্ড নোংড়া। এ চাকরটী আজই চাই—এখনি!' সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তারও হুকুম।

আনন্দে আমার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। কর্ত্তাকে, মা ঠাকুরুণকে প্রণাম করিয়া শুভযাত্রা করিলাম।

(৬)

আমার কাজের মধ্যে বনবালার কাগজপত্র ঠিক-ঠাককরা, তাহার কোঠাখানি ঝাড়ু দেওয়া, কাপড় চোপড় গুছাইয়া রাখা। কোনো দিন বা মাসিকপত্রের গাঁটুরী কক্ষে লইয়া কোচ্‌বাক্সে বসিয়া আপিসে

যাওয়া দু একটী গ্রাহকের নাম ঠিকানা বাঙ্গালায় লিখা—সুতরাং প্রায় সর্ব্বদাই আমি তাহাকে দেখিতাম। ক্রমে তাহাকে বুঝিলাম। সে আর আমি দুইজন—ইহা ভাবিতেও পারিতাম না।

বনবালা দিনের বেলায় অধিকাংশ সময়ই লিখিত। আমি অদূরে দাঁড়াইয়া তাহার সৌন্দর্য্যসুধা আকণ্ঠ পান করিতাম।

আমি বহির্ব্বাটীতে একখানি কুঠরী পাইয়াছিলাম। সেখানে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতাম। আমার সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্তই ছিল। আমার কুঠরীতে অন্যের প্রবেশাধিকার ছিলনা। আর দিনের বেলায় প্রায় সর্ব্বদাই দরজায় তালা লাগানো থাকিত।

একদিন আমার দুইটী কবিতা "ঊষা"র সম্পাদকের নামে ডাকে পাঠাইয়া দিলাম।

বনবালা একদিন ছোট বোন তরুবালাকে বলিল—দেখত তরু! এমাসের ঊষায় যে একটী কবিতা বাহির হইয়াছে—বাঃ—কি সুন্দর কবিতা।—বেশ কবিতাটী কিন্তু। প্রথমেই দিয়েছি। আমি নিকটেই ছিলাম।

তরুর হা'তে "ঊষা" দেখিলাম—কবিতার নীচের নাম শ্রীরাখালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

দেখিলাম কবিতার দুই একটী শব্দ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। বনবালা বলিল—কিরে তরু কবিতাটী কেমন—খুব ভাল—নয়?

তারপর বনবালা একটা ফাইল টানিয়া রাখালচন্দ্রের আর একটী কবিতা তরুকে শুনাইয়া পড়িতে লাগিল—কবিতাটির নাম "আঁধারে আলোক।" কবিতাটী পড়িয়া সে কহিল—লোকটার কবিতা একদিন সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ আদর লাভকরিবে। বেশ কবিতাটী। আসছে মাসের ঊষায় কবির ছবি দেওয়ার চেষ্টা করব।

আমি পরদিন ডাকে আরও পাঁচটী কবিতা ঊষা সম্পাদিকার নামে পাঠাইয়া দিলাম।

( ৭ )

আজ বি, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। বনবালা আরাম কেদারায় হেলিয়া পড়িয়া Daily Bengalee তে বি, এর ফল দেখিতেছিল। আমি লেমনেডের বোতল হাতে লইয়া পেছনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিলাম অনার্স ক্লাসে আমার নামটী। চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল। অজ্ঞাতসারে লেমনেডের বোতলটা হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। বনবালা চমকিয়া উঠিয়া কহিল কিরে—এ কল্লি কি?

আজ্ঞে—"অন্যায় করে ফেলেছি! হঠাৎ চক্ষে কি একটা পোকা পড়্ছিল।" আর কোনো দিন কেনো অপরাধ করিনাই—সুতরাং বনবালা আমায় ক্ষমা করিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহিরে গিয়াছিলাম—আসিয়া দেখি, বনবালা বারান্দায় বসিয়া আমার নব-প্রেরিত কবিতাগুলি পাঠ করিতেছে। তরু নিকটে আর একখানি সোফায় অর্দ্ধ শায়িতা ছিল। বনবালাই তাহাকে রাখাল বাবুর মধুর কবিতা শুনাইতে শুনাইতে বলিতে লাগিল, তরু, রাখাল বাবুর কবিতাগুলি দেশে এক নবযুগ আনয়ন করিবে। আমি তাঁহার ফটো চাহিয়াছিলাম—কৈ পাঠান নাই ত। বাঃ—হাতের লেখাগুলি কি সুন্দর—দেখ্ দেখ্।

তরু একটু হাসিয়া কহিল—তোমার 'নির্ম্মাল্যের' কবিতাগুলি আমি বেশী পছন্দ করি—কিন্তু

দূর্—আমার সবগুলি কবিতার মূল্য দিয়া যদি রাখাল বাবুর একটা লাইন পাইতাম, তবে আমি তাহাই যথেষ্ট মনে করিতে পারিতাম। কি ভাব—কি কবিত্ব! পড়ে দেখ্ না—

( ৮ )

পরদিন বনবালা ঠিক দশটায় আপিসে গিয়াছে। রাখাল বাবুকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একখানা ফটো পাঠানের জন্য সম্পাদিকার কার্য্যাধ্যক্ষ যোগেশ বাবু দুইখানা চিঠি লিখিয়াছেন। অতঃপর আপিসে একবার সাক্ষাৎ চাহিয়া চিঠি দিয়াছেন। সে দিন রাখাল বাবুরবেশে ঊষা আপিসে যোগেশ বাবুর সঙ্গে সকালে দেখা করিয়াছিলাম। এক খানি ফটো এবং কয়েকটী কবিতা দিয়া আসিয়াছি।

আমি আহারাদি করিয়া বনবালার সবগুলি কাজ

গুছাইয়া ফেলিলাম। তারপর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া বনবালার কোচে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সে আঙ্গিনায় প্রায় কেহই আসিত না। হঠাৎ বনবালার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম সে দ্বারে দাঁড়াইয়া আমাকে ভৎর্সনা করিতেছে। চাকরের এতটা বেআদবী তাহার অসহ্য হইয়াছিল।

আমি একপার্শ্বে সরিয়া গেলাম—সে ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, জানিস্ শ্যামা, তোকে বেত মারা উচিত।

আমি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলাম—বলিলাম, বনবালা! তুমি আমায় এমন করিয়া গালাগালি দিয়ো না। জানো আমি তোমার জন্য—সুধু তোমার জন্য—কি ছিলাম, কি হইয়াছি।

আমার সম্ভাষণ ও বক্তৃতা শুনিয়া তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। ধমক্ দিয়া বলিল—থাম্ হারামজাদ্! কুকুর। এখখুনি তোর বিচার করাচ্ছি—দাঁড়া। সে বাহিরে যাইতে চাহিল, আমি সবেগে দরজায় দাঁড়াইয়া কহিলাম—বনবালা, জানো আমি কে? আমিই তোমার কবি 'রাখালচন্দ্র', জানো—কুলীনের ছেলে হয়ে,—বি, এ, পাশ করে—যা কখনো কেউ করেনি—কোনো উপন্যাসের নায়কেও না—তাই করেছি;—কেবল তোমার জন্য। তোমার মনে নাই কি এবার বি, এর ফল যে দিন বাহির হইয়াছিল—আমার হাতের লেমনেডের বোতলটা পড়িয়া গিয়াছিল। বনবালা! এতখানিপ্রেম বুকে লইয়া আমি ধনীর ছেলে—কুলীনের ছেলে—শিক্ষিত ছেলে—তোমার দুয়ারে ভিখারী। মর্ম্মে মর্ম্মে মরে আছি—তবু আমি তোমায় দেখে সুখী—বনবালা!

বনবালা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরেই সে কহিল, যাও তুমি—যাও আমার সম্মুখে আর এসো না। শয়তান—মিথ্যাবাদী। রাখাল বাবুর প্রেতাত্মা তুই!

"বনবালা আমিই রাখাল না—তোমার ধ্যানে তৎপর। আমিই ত প্রতি কবিতায় তোমার স্তুতি গান করিয়াছি। তুমি যা ঈশ্বরে প্রেম মনে করেছ সে কবিতাগুলি তোমারি উদ্দেশে লিখেছি। আজ ম্যানেজারের নিকট রাখাল বাবুর যে নূতন কবিতা পাইয়াছ, তাহার সঙ্গের ফটোখানি খুলে দেখ না। তবেই বুঝ্‌বে।"

তাহার কৌতুহল হইয়াছিল।' তাড়াতাড়ি কবিতার ফাইলটা টানিয়া ফটোখানা দেখিল, হাতের লেখাগুলি মিলাইল। তারপর দাঁড়াইয়া আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনিল। অবশেষে কহিল—"যান্ রাখাল বাবু, এখানে থাকা আর আপনার সাজে না। আমি বাস্তবিকই আপনার কবিতা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।"

( ৯ )

বনবালার কথামত আমি বিলাত যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে সে প্রায় হাজার টাকা নগদ দিল। তার মা বাপ ভাই, সকলেই আমার শুভ কামনা করিয়া বিদায় করিলেন। আমি বুকভরা আশা লইয়া সাগর পথে যাত্রা করিলাম। জাহাজে সারাদিন বসিয়া যে কবিতা লিখিতাম— পথে তাহা ডাকে দিয়া তৃপ্তি লাভ করিতাম।

ভারতীয় প্রত্যেক মেইলে বনবালার প্রেমপূর্ণ চিঠিগুলি আমার সুদূর বিলাত প্রবাসকে সরস ও উৎসাহ পূর্ণ করিয়া তুলিত। প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে তাহার উন্মেষোন্মুখ প্রেম সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পাড় হইতে আমাদের যেন একটা অপূর্ব্ব মিলন ঘটাইত। সে স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিতে চাহিত না।

ছয়মাস পর বনবালার পত্রে জানিলাম, তাহার শরীর তেমন ভাল নয়। সে স্থান পরিবর্ত্তন জন্য কোথাও যাইবে। সুতরাং তাহার চিঠি লিখিবার সম্ভাবনা বড়ই অল্প। ডাক্তার তাহাকে লিখাপড়া করিতে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিয়াছেন। তক্ত 'উষা' সম্পাদন করিবে এ কথাও লিখা ছিল।

বনবালার এই পত্রখানি পাইয়া, আমি বড়ই দমিয়া গেলাম। বনবালা—যদিই সে না বাঁচে, তবে আমারও বাঁচা হইবে না।

প্রায় দুইবৎসর পর বারিষ্ট্যার হইয়া আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। সেদিন বনবালার সঙ্গে দেখা করিতে যাই নাই। বৃহস্পতির বারবেলা, শুভকার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবার ভয়ে—বিলাত প্রত্যাগত হইয়াও কুসংস্কারটাকে আঁকড়াইয়া ধরিলাম। পরদিন শুক্রবার প্রভাতে অত্যন্ত সাদাসিধা রকমের দেশী পোষাকে যাত্রা করিলাম। হয়ত বনবালা আমার সাহেবী পোষাকের প্রত্যাশা করিতেছে, সে আমাকে এ বেশে দেখিয়া বিস্মিত হইবে। ইত্যাদি ভাবের উৎস মাথায় লইয়া আমি একখানি গাড়ীতে উঠিলাম।

লক্ষীবাবুর বাড়ীর কোনায় আমার গাড়ী মোচড় ফিরিবার কালে দেখিলাম,—একটী সুসজ্জিত নবীন যুবকের হাত ধরিয়া—চশ্‌মা পরিহিতা বনবালা তাহার নিজের গাড়ীতে উঠিল। তারপর গাড়ী খানি গড়ের মাঠের দিকে ছুটিয়া গেল। আমার মাথাটা বন্ বন্ করিতে ছিল, গাড়ী হইতে নামিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে বৈঠক খানায় প্রবেশ করিয়া, একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। সেখানে কেহই ছিলনা। একটী ঝি উকিদিয়া আমায় দেখিয়া গেল—পর মুহূর্ত্তেই পর্দ্দা ঠেলিয়া তরু মুখ বাড়াইয়া কহিল—ওমা, রাখাল বাবু যে—কখন এলেন! এদিকে আসুন। আমি দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম—তবে বাড়ী প্রবেশ মুখে যাহাদিগকে দেখিয়াছি—তারা বা অন্য কেহ হবে। মানুষেরমত কি আর মানুষ থাকে না?

তরু একখানি চেয়ার টানিয়া আমাকে বসাইল। তার পর কহিল—একদম্ দেশী বাবু যে, আমরা যে—সাহেব দেখিবার আশা রাখিতাম।

বনবালার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার ওষ্ঠাধর উত্তত আগ্রহে কাঁপিতেছিল। কিন্তু সাহস হইলনা—কি জানি কোন্ অপ্রিয় উত্তর পাইয়া বসি। কিন্তু তরুবালা আমার প্রশ্নের পূর্ব্বেই বলিয়া ফেলিল—'তা আপনি যাওয়ার প্রায় আটমাস পর দিদির বিয়ে হয়ে গেছে।"--আমি দুইহাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিলাম। পায়ের নীচে পৃথিবী লাঠিমের মত ঘুরিতেছিল তরু তাহা লক্ষ্য করিয়াও কহিতে লাগিল, -আমাদের উষা প্রেসের প্রিণ্টার বেণীমাধবের সঙ্গেই বিবাহ হইয়াছে। বেশ জামাইটী—নৈকষ্য কুলীনের ছেলে। স্বভাবটী ও উত্তম। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। দেখতেও যেন কার্ত্তিক।"

তাহার কথাগুলি আমার বুক ভেদ করিয়া বাহির হইতেছিল। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলাম। তরু ডাকিল—কিন্তু ততক্ষণ আমি গাড়ীতে আসিয়া গাড়োয়ানকে কহিলাম --জোরসে হাঁকাও --বাসামে যানে হোগা!

সে দিন বিলাতে জুলিয়াস্‌সিজারের অভিনয় দেখিয়াছিলাম—ঠিক সেই দৃশ্যটা যেন হুবহু আমার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত।

আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতেছিলাম—যেন আমার অবস্থা লক্ষ্যকরিয়া বনবালা আমার নিকট আসিয়া কহিতেছে—My Brutus;

You have some sick offence within your mind,<br>
Which, by the right and virtue of my place,<br>
I ought to know of … … … By all your<br>
vows of love and that great vow<br>
Which did incorporate and make us one,<br>
That you unfold to me, yourself, your half.

গাড়োয়ান গাড়ী থামাইয়া আমাকে নামিতে বলিলে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত বাসায় প্রবেশ করিলাম। আগে বুঝিতাম বনবালা না হইলে আমার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু আজ বুঝিলাম—

ভাঙ্গাচরা হোক্—যাহোক্ তা হোক্<br>
আমারি হৃদয় আমারি থাক্।<br>
"রাজার নন্দিনী প্যারি! যা কর তা শোভাপায়।"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

# মেঘ-দূত।

## ( নাট্য-কাব্য )

কবি।

নবমেঘ।

মেঘবালাগণ।

কবি।

( ঊর্দ্ধে সঞ্চরমান নবমেঘের প্রতি )

এস এস আজি নবনীল বাসে,
বিথারি' সজল ছায়া,
এস নীলাকাশে মৌন বিকাশে
রচি' গম্ভীর মায়া;
ওগো নবঘন বন্ধু আমার!
কত দেশ ভ্রমি' আসিলে আবার?
কহ সুদূরের কহ সমাচার—
ছন্দ-চপল বাণী;
আমার গোপন অন্তর-তারে
মেঘ মল্লার তোল বারে বারে,
ভাসি' আনমনে নয়ন-আসারে
ধন্য আপনা মানি।

চাতকের আজি মিটুক পিপাসা,
কেতকীর অভিলাষ,
বিকাশো নীপের মর্ম্মের ভাষা,
তমালের হাহাশ্বাস;
গৈরিকবাসা ধরণীর গায়ে
তৃণরোমাঞ্চ তোল গো জাগায়ে,
ভূমিচম্পকে দাওগো ফুটায়ে
নবযৌবন তা'র;
ওগো যাদুকর অতিথি সুদূর!
চিত্ত আমার কর ভরপূর,
নব নব গানে বাজুক মধুর
মর্ম্মহরষ তার।

নবমেঘ।

চিরদিন আসি আর যাই,
করি কত ছলা ছায়ায় মায়ায়,
অর্থ কি তা'র নাই?
হায় কবি, হায় আঁখি দুটি মেলি'
কি হেরিছ অনিবার?
যে বারতা কহি বরষ বরষ
কিছু কি বোঝনি তা'র?

কবি।

বুঝিতে চাহিনা কিছু আর,
দেখি দেখি আঁখি ভরি' যে সাজে সেজেছ মরি!
দেখি শুধু দেখি অনিবার।
আমার শ্রবণ মাঝে তোমার যে গান বাজে
জানিনাগো কি যে ভাষা তার,
শুনি শুধু নিশিদিন বাজিছে বিরামহীন
ঝর ঝর রাগিণী তোমার।
হে বন্ধু! কতনা ছন্দে অযুত বরণে গন্ধে
বসুন্ধরা পুলক-আকুল,
তটিনীর কলস্বনে বাতাসের গুঞ্জরণে
জাগিছে কি হরষ বিপুল!
চাঁদের জোছনা-হাসি, বিকচ কুসুম রাশি,
তরুণীর অরুণ বয়ান,
ফেনিল সাগরজল, সুনীল গগণতল,
করুণায় সজল নয়ান,
শিশুর অস্ফুট ভাষ, নির্ঝরের কলহাস,
বিহগের কাকলী মধুর,
কাননের মরমর, বাদলের ঝরঝর,
মেঘরব গভীর সুদূর,—
আমি এ সবার পানে চেয়ে থাকি আনমনে,
শুনি যত নব নব গান,
জানিনা নিখিল মাঝে কি কথা গোপনে বাজে
তা'র লাগি' কাঁদেনা পরাণ।
যে মাধুরী দরশনে, যে অমিয়া পরশনে,
সঙ্গীতে যে আনন্দ অপার,
শুধু মিছা ভাবনায় ডুবাতে চাহিনা তায়,
বুঝিতে চাহিনা কিছু আর।

### নবমেঘ।

ওগো কবি! কিসের লাগিয়া
বীণা তব লুটিছে ধূলায়?
কা'র সুরে বাঁধিবে গো গান?
কি রাগিণী শোনাবে সবায়

### কবি।

আমি যবে গাহি গান,
শাখায় শাখায় জাগে মরমর,
বিহগেরা ধরে তান;
কল কল গাহে নদীজল,
গুন গুন অলি গাহে,
বহে শন্ শন্ মলয় পবন,
মাধবী শিহরে যাহে;
মধুর রাগিণী ওঠে রণরণি'
নূপুর-মুখর পায়,
এ নিখিল জুড়ে বাজি' শতসুরে
গান সে হারায়ে যায়।

### নবমেঘ।

হে মোর অভাগা কবি!
ভিখারীর মত শূন্য আঁচল,—
হারায়ে ফেলিছ সবি।
ক্ষণিকের লাগি' রচ শতগান,
পলেকের মাঝে লভে অবসান,
বৃথা নিশিদিন সলিল-রেখায়
আঁকিছ শতেক ছবি।

তোমারি লাগিয়া হায়,
শতেক যুগের লুপ্ত কাহিনী
গুপ্ত রহিয়া যায়;
হের কবি, হের অন্তরে তব
একি উৎসব জাগে অভিনব!
চিরজীবনের আলোকোজ্জ্বল
রঙীন আভা ভায়!

### কবি।

আমি যে বুঝিনা সখা! কি যেন আমার নাই,
কত কথা জাগে প্রাণে বোঝাতে না পারি তাই।
অজানার দূত ওগো! বারতা কি আছে তা'র?
আছে কি কাহিনী কোনো আজি নববরষার?

### নবমেঘ।

হায় কবি! ভুলেছকি তা'রে?
আছে সে যে তব পথ চাহি';
অতীতেরে ফেলেছ হারায়ে?
কিছু আজ স্মরণ কি নাহি?
আজো তা'র শিথিল কুন্তল,
স্রস্ত ছুটি বাহুর বলয়,
তোমা লাগি, পিয়াস তাহার
শ্রান্তিহীন অতুল অক্ষয়;
হের এই সুনীল পাতায়
কাজলেতে আঁকা লিপি তা'র,
বুঝিবে কি পরাণের ভাষা?
চিনিবে কি আখর তাহার?
(লিপি প্রদর্শন)

### কবি।

(চকিতে দাঁড়াইয়া বীণাঝঙ্কার সহ)

কোন্ গগণে ভবন তব? কোন্ নীলিমার অন্তরে?
কোন্ মেঘেতে আলোক তোমার দ্যুলোকছাপি' সন্তরে?
কোন্ কাননে কুঞ্জবনে উঠ্ছে সদা মুঞ্জরি'?
কোন্ কুসুমে গন্ধ চুমে ভৃঙ্গ! বেড়াও গুঞ্জরি'?
নীলসাগরে বক্ষ জুড়ে উথ্‌লে ওঠে কা'র হাসি?
মেঘ-তরীতে উত্তরীতে কোন্ অলকায় যাও ভাসি'?
কোন্ হিয়াটি উঠ্ছে ফুটি' সবুজ মাখা অঞ্চলে?
জ্যোৎস্না-রাতে কোন্ পাখাতে রৌপ্য-নিঝর চঞ্চলে?
পুষ্পদলে প্রাণ উথলে কোন্ নয়নের ইঙ্গিতে?
বিশ্ববীণায় সুর খেলে যায় কোন্ সে গোপন সঙ্গীতে?
গন্ধে সুরে নিখিল জুড়ে আনন্দ কোন সন্দেশে?
ক্লান্ত হিয়া অন্বেষিয়া, বন্ধু আছ কোন্ দেশে?
(সহসা শূন্যে রাজহংস পৃষ্ঠে মেঘবালাগণের আবির্ভাব)

মেঘবালাগণ।

ধন্য তোমারে কবি!
স্পন্দিত যাহে নিখিলের প্রাণ,
বিম্বিত তারি ছবি;
যাহার চিত্তে আলোকে ছায়ায়
চিরসুন্দর বিকশে লীলায়,
সত্যের তমসাবৃত পথে
চিরভাস্বর রবি!
ধন্য তোমারে কবি।

জয় কবি তব জয়!
যুগ যুগ যা'র বীণাঝঙ্কার
ভুবনে জাগিয়া রয়।
সুখে দুঃখে যা'র ক্লান্তিবিহীন
সঙ্গীত প্রাণে জাগে নিশিদিন,
বিশ্বের বাণী বাজে যা'র গানে
বিশ্বভুবনময়।
জয় কবি তব জয়!

(কবিকে তুলিয়া লইয়া সকলে আকাশে মিলাইয়া গেল; কবির আসনতলে কতকগুলি স্বর্ণকমল ফুটিয়া রহিল)।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ বি, এ।

---

# জড় ও পরমাণু।

প্রায় সর্ব্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে সর্ব্বপ্রথমে মানবগণ জগৎ দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া জাগতিক সমস্ত ব্যাপার কোন অমানুষিক শক্তির বিকাশমাত্র, ইহাই ধারণা করেন। আমাদের ভারতভূমিতেও এইরূপ দেখিতে পাই বৈদিকযুগে আর্য্যেরা জাগতিক সমস্ত দৃষ্টপদার্থগুলিকে বিভিন্ন দেবতাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। অতঃপর দার্শনিকযুগের প্রারম্ভে উঁহাদের মতের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তখন তাঁহারা গভীর চিন্তা দ্বারা জগৎ কি, জগতের অস্তিত্ব কোথায়, জগতের সহিত মানবের প্রকৃত সম্বন্ধ কি ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসায় নিযুক্ত হন। ক্রমশঃ জ্ঞানের উন্মেষণে তাঁহারা নানারূপ দ্রব্যের মধ্যে একত্ব অনুভব করিতে থাকেন। জগৎ ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিভাত হইলেও তাহার মূলে এক, সেই একেরই পরিণামে জগতে বহুত্ব সাধিত হইয়া থাকে। সর্ব্ব পদার্থেরই মূলে প্রকৃতি পুরুষ বর্ত্তমান। মূল প্রকৃতি পুরুষ হইতে কি প্রকারে স্থূলজগতের পরিণাম হইল তাহা বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে তাঁহাদের মতে আমরা দেখিতে পাই যে স্থূলজগৎ পঞ্চভূতাত্মক, এই পঞ্চমহাভূত তদপেক্ষা সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র হইতে গঠিত, পঞ্চতন্মাত্র আবার তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থ হইতে উৎপন্ন, এইরূপে শেষে মূলপ্রকৃতি পুরুষই সমস্ত পদার্থের আদি কারণ, অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টির বহির্ভূত পদার্থ হইতে স্থূল পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহা তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করেন।

হিন্দুদার্শনিকদের মধ্যে আবার কতকগুলি পরমাণুবাদী দার্শনিক ছিলেন। ইঁহাদের মতে পরমাণুই সমস্ত পদার্থের আদি কারণ। জাগতিক সমস্ত পদার্থ শ্রেণীবিভক্ত করিলে গুণ ও কর্ম্মবিশিষ্ট নয়টী দ্রব্যে পর্য্যবসিত হয়। পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন এই নয়টী দ্রব্য। উল্লিখিত দ্রব্যের তালিকা হইতে দেখা যায় যে আমরা জড় পদার্থ বলিলে যাহা বুঝি তাঁহারা শুধু সেইগুলিকেই দ্রব্য সংজ্ঞায় নিবদ্ধ করেন নাই। নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্রব্যগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া যে গুলিকে আমরা জড় পদার্থ বলি (যথা পৃথিবী, অপ্ ইত্যাদি) সেই গুলিকে তাঁহারা অনিত্য নাম দিয়াছেন, এই দ্রব্যগুলি সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় এবং ইহাদের উৎপত্তি বিনাশ দেখা যায়। কিন্তু সকল দ্রব্যেরই অনু নিত্য, উহা দেখা যায় না এবং উহার ধ্বংস নাই। এই পরমাণুগুলি অবিভাজ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়। বিভিন্নজাতীয় পরমাণু সংযোগেই জাগতিক সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি। এই পরমাণুগুলির নিজ নিজ জাতীয় বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম থাকায় যে পদার্থ এই পরমাণুদ্বারা গঠিত তাহাতে পরমাণুগুলির গুণ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে।

উল্লিখিত হিন্দুদার্শনিকদের মতগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহাদের জড়পদার্থ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ধারণা ছিল বলিয়া বোধ হয়।

১ম, সমস্ত পদার্থ পাঞ্চভৌতিক পরমাণু দ্বারা গঠিত।

২য়, পরমাণু অবিনাশী।

৩য়, পরমাণুর সহিত গুণ সর্ব্বদা সম্বদ্ধ, পরমাণু দ্বারা গঠিত পদার্থে পরমাণুর গুণ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। পাঞ্চভৌতিক পদার্থ বলিলে তাঁহারা পদার্থের গুণ মাত্রই লক্ষ্য করিতেন।

৪র্থ, পাঞ্চভৌতিক পদার্থ এক মূল প্রকৃতি হইতে ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই এক হইতে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি এবং একেই লয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যেমন মনে করেন যে পরমাণুগুলির গুরুত্ব (weight) মাত্র সর্ব্বদা এক থাকে কিন্তু তাহাদের সংযোগের পর অন্যান্য অনেক গুণ হইয়া যায়, দার্শনিকেরা সেরূপ মনে করিতেন না। তাঁহাদের মতে পরমাণুর সহিত পদার্থের গুণ সর্ব্বদা সম্বদ্ধ, তাঁহারা পদার্থের গুণ দৃষ্টেই কোন কোন পরমাণু দ্বারা পদার্থটী গঠিত তাহা অনুমান করিতেন, যেমন কোন তরল পদার্থ দেখিলে তাঁহারা বলিবেন যে পদার্থটী জলীয় পরমাণু দ্বারা গঠিত। দার্শনিকদের নিকট যাহা অনুমানের বিষয় বৈজ্ঞানিকদের নিকট তাহা রাসায়নিক পরীক্ষার বিষয়। সুতরাং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দার্শনিকেরা মানসিক চিন্তাবলে কতকগুলি বিষয় অনুমান করেন, বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষাদ্বারা যতটা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন তাহা হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। সত্য অনুসন্ধানের পন্থা কাহাদের উৎকৃষ্টতর ইহা বিচার করা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে বৈজ্ঞানিকেরা যে উপায়ে (Inductive method) অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং জড় পদার্থ সম্বন্ধে বাহিরের জ্ঞান ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। অবশ্য দার্শনিকেরা নিন্দা করিতে পারেন যে বৈজ্ঞানিকেরা বাহির লইয়াই ব্যস্ত, তাঁহারা বাহিরের খোসাই ছাড়াইতেছেন কিন্তু ভিতরের শাঁসের আস্বাদ কখন পাইবেন না। উপসংহারে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব যে অধুনা বৈজ্ঞানিকেরা শুধু খোসা লইয়াই সন্তুষ্ট হইতেছেন না তাঁহারা ক্রমশঃ শাঁসের দিকেও অগ্রসর হইতেছেন। আশা করা যায় বৈজ্ঞানিকেরাও কিয়ৎকাল মধ্যেই জড়পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ব্যাখ্যায় সমর্থ হইতে পারেন।

বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি কণাদ পরমাণুবাদী ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন মহর্ষি কণাদ খৃষ্টের জন্মের দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এ বিষয়ে বিশেষ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদের নিকট হইতে গ্রীক দার্শনিকেরা জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; উভয় দেশেই প্রায় একরূপ চিন্তাস্রোত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

খৃষ্টের জন্মের ষষ্ঠশতাব্দী পূর্ব্বে মিলেটস্ নগরে এক দার্শনিক মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। থেলস্ (Thales) এনেক্সিমেণ্ডর (Anaximander), এনেক্সিমিনিস (Anaximenes) ইহার প্রবর্ত্তক। ইঁহাদের মতে জড়জগৎ এক হইতে উৎপন্ন এবং একেই লয়। জড়ে সজীব পদার্থের ন্যায় এক শক্তি অন্তর্নিহিত আছে, এই শক্তি প্রভাবেই জড়ে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এই মতে আমরা হিন্দুদের আত্মাপ্রকৃতি ও পুরুষই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, ইহা কিয়ৎপরিমাণে দেখিতে পাই। কিন্তু থেলস্ (Thales) এর মতে এক জল হইতেই সর্ব্ব পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এনেক্সিমিনস এর মতে বায়ুই সমস্ত পদার্থের মূলে অবস্থিত।

খৃষ্টের জন্মের ৪৯০ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা এম্পিডক্লিস্ (Empidocles) জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার মতে পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি এই চারিটী পদার্থ হইতে সমস্ত দ্রব্যের উৎপত্তি। সৃষ্টির আদিতে এই চারিটী পদার্থই বর্ত্তমান ছিল। ইহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলে যে সমস্ত অংশ পাওয়া যায়, সেই অংশের মিশ্রণেই সমস্ত পদার্থের

উৎপত্তি। কিন্তু তিনি এই সমস্ত খণ্ডগুলিতে হিংসা দ্বেষ আরোপিত করিয়া এই দুই ভাব দ্বারাই খণ্ডগুলি একত্র সম্বদ্ধ হয় কিম্বা উহাদের বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে, ইহা অনুমান করেন। এই সময় হইতে আমরা দেখিতে পাই যে এক মৌলিক পদার্থ হইতে সমস্ত জাগতিক পদার্থের উৎপত্তি, এই মত গ্রীক দার্শনিক সমাজ হইতে কিয়ৎকালের জন্য বিতাড়িত হয়।

খৃষ্টের জন্মের পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে এনেক্সোগরস্ (Anaxogoras) জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার মতে জাগতিক অনেক পদার্থই মৌলিক বলিয়া গৃহীত হয়। এই পদার্থগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া যে সূক্ষ্ম খণ্ড পাওয়া যায় তাহাতে পদার্থের গুণ বর্ত্তমান থাকে। এই সকল সূক্ষ্ম খণ্ডগুলিকে তিনি 'হোমিওমেরি' (Homœomeriæ) আখ্যা দিয়াছিলেন। উক্ত সূক্ষ্ম অংশগুলি অনাদি, অসংখ্য অপরিবর্ত্তনশীল এবং বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট। ইহাদিগের সংযোগেই পদার্থের উৎপত্তি এবং বিয়োগেই বিনাশ হয়। উক্ত খণ্ডগুলিকে অসংখ্য বিভক্ত করা যায়, উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া শেষ করা যায় না এবং অংশগুলির মধ্যে শূন্য স্থান (void) নাই।

অতঃপর কতকগুলি পরমাণুবাদী দার্শনিক আবির্ভূত হন। ইঁহাদের মধ্যে লিউছিপস্ (Leucippus) ডেমক্রিটস্ (Democritus) এবং এপিকিউরীস্ (Epicurus) এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মতে পরমাণুদ্বারাই সমস্ত পদার্থ গঠিত, উহা এত ক্ষুদ্র যে দৃষ্টির বহির্ভূত, ইহা অবিনাশী, অবিভাজ্য ও অপরিবর্ত্তনশীল, পরমাণু সকল এক মৌলিক পদার্থ হইতে উৎপন্ন কিন্তু তাহাদের আকার ও পরিমাণ ভেদে বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। পদার্থের মধ্যে যে ভেদ দৃষ্ট হয়, পরমাণুগুলি বিভিন্নভাবে সন্নিবেশিত ও বিভিন্ন আকারগত বলিয়াই ঘটিয়া থাকে! পরমাণু সকল স্পন্দনশীল এবং উহাদের মধ্যে শূন্যস্থান আছে

অতঃপর খৃষ্টের জন্মের ৪২৭ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা প্লেটো জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার মতে দৃষ্ট পদার্থ কিছুই নহে উহা মানসিক ভাব মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি জড়পদার্থ বিচার করিয়া ইহা নির্দ্ধারণ করেন যে জগতে চারিটী মৌলিক পদার্থ বর্ত্তমান আছে, যথা পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু ও জল। পদার্থ সকল অবিভাজ্য অণুদ্বারা গঠিত, অণুগুলির মধ্যে আকৃতি-ভেদ আছে। একটী পদার্থকে অন্য পদার্থে পরিবর্ত্তন করা যায় এবং অণুগুলির মধ্যে শূন্য স্থান নাই।

ইহার পরে প্লেটোর শিষ্য আরিষ্টটল্ (Aristotle) আবির্ভূত হইয়া তাঁহার গুরুর মত কিয়ৎ পরিমাণে খণ্ডন করেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে বলেন যে দৃশ্য পদার্থ হইতেই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। মানসিক গবেষণা দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া দৃষ্ট পদার্থগুলি তৎসহ মিলাইবার চেষ্টা করা সত্যানুসন্ধানের প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। কিন্তু শেষে দেখা যায় আরিষ্টটল্ নিজেই তাঁহার মতানুযায়ী কার্য্য করেন নাই। ইঁহার মতেও চারিটী মৌলিক পদার্থ (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ) হইতে জাগতিক অন্যান্য পদার্থের উৎপত্তি। কিন্তু ইনিও হিন্দুদার্শনিকদের ন্যায় পদার্থ বলিলে পদার্থের গুণই বুঝিতেন। এক মৌলিক পদার্থ হইতে জাগতিক অন্যান্য পদার্থের উৎপত্তি হইলেও মৌলিক পদার্থটী উক্ত চারিটী পদার্থের গুণ বহন করে মাত্র। কোন দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরের উৎপাদন সম্ভবপর, কারণ উক্ত দ্রব্য হইতে কতকগুলি গুণ নিষ্কাষণ করিয়া দ্রব্যান্তরে নিয়োজিত করিতে পারিলেই নূতন দ্রব্যটীর উৎপত্তি হয়। এই আরিষ্টটলের মত অনেক দিবস পর্য্যন্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজে আদৃত হইয়াছিল।

উক্ত দার্শনিকদের মত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে গ্রীক দার্শনিকেরাও হিন্দুদিগের ন্যায় মানসিক চিন্তাবলেই জগৎ চিনিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যদি তাঁহারা মানসিক চিন্তায় যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার সহিত জগতের ঘটনাবলী মিলাইবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে হয়ত আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক তথ্য পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

অতঃপর আরবদেশীয়েরা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে স্পেন পর্য্যন্ত জয় করিয়া উক্ত গ্রীক দার্শনিকদের মত পশ্চিম ইউরোপে প্রচার করেন। আরবীয়েরা গ্রীক দার্শনিকদের মতাদি ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই।

তাঁহারা উক্ত দার্শনিকদের মতগুলি কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া রসায়ন শাস্ত্রে অনেক নূতন তথ্য-দান করিয়াছেন। অতঃপর রসায়নবিৎ পাণ্ডিতগণ এলকেমিষ্ট (alchmist) নাম প্রাপ্ত হন। এই এলকেমিষ্টদের মধ্যে অনেক আরবদেশীয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবীয় বৈজ্ঞানিক মহাত্মা গেবর (Geber) জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি সমস্ত এলকেমিষ্টদের গুরু স্থানীয়। গেবর আরিষ্টটলের মতাদি পরীক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা অনেক দিবস পর্য্যন্ত এলকেমিষ্ট সমাজে আদৃত হইয়াছিল। এলকেমিষ্টেরা যদিও পদার্থগুলি রাসায়নিক ক্রিয়াযোগে পরীক্ষা করিতেন তাহা হইলেও তাঁহাদের মত সকল এই গ্রীক দার্শনিকদের মত হইতে উৎপন্ন হওয়ায় উভয় মতের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইঁহাদের মতেও এক মৌলিক পদার্থ সমস্ত পদার্থের মূলে অবস্থিত। সকল পদার্থেরই ভিতরে এক, শুধু বাহিরের আবরণ ভেদেই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব। যদি বাহিরের আবরণ ছিন্ন করা যায় তাহা হইলে জাগতিক সমস্ত পদার্থ একেতেই পরিণত হয়। পদার্থগুলি তিনটী স্তরে গঠিত— ভিতরের স্তরে পদার্থের সাধারণ বীজ (universal essince) দ্বিতীয় স্তরে সাধারণ বীজের আবরণ— পদার্থের সাধারণ গুণ (principle) এবং তৃতীয় স্তরে পদার্থের বিশেষ গুণ (specific property)। ইহা হইতেই তাঁহারা এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভবপর মনে করিয়া ফিলজফারষ্টোন নামক একটী দ্রব্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় নিয়োজিত হন। তাঁহারা মনে করিতেন এই ফিলজফারষ্টোন বা পরশমণির সংস্পর্শে সমস্ত ধাতু স্বর্ণেতে পরিণত হইবে, এমন কি ইহার সাহায্যে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল পারদ ও গন্ধকের মিশ্রণেই সমস্ত ধাতুর উৎপত্তি। সমস্ত ধাতুর দ্বিতীয় স্তরে এই পারদ ও গন্ধক বর্ত্তমান; উক্ত দুই দ্রব্যের পরিমাণের উপর ধাতুর ভিন্নতা নির্ভর করে। ক্রমশঃ তাঁহারা দ্বিতীয় স্তরের পদার্থের সহিত পদার্থের গুণের গোলমাল করেন। অবশেষে এই দ্বিতীয় স্তরের বস্তুটী মহাত্মা ষ্টালের (Stahl) হস্তে ফ্লজিষ্টনে (Phlogeston) পরিণত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ষ্টাল জর্ম্মণদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার মতে সমস্ত পদার্থ ফ্লজিষ্টন এবং বিভিন্ন জাতীয় পার্থিব দ্রব্য (calx) সংযোগে গঠিত। ফ্লজিষ্টনের জন্যই পদার্থ দাহ্যগুণ প্রাপ্ত হয়। কোন ধাতু অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে ফ্লজিষ্টন বিতাড়িত হয় এবং এক প্রকার পার্থিব দ্রব্য ভস্মাবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই দ্রব্যটীর (calx) সহিত ফ্লজিষ্টনের সংযোগ করিতে পারিলে পুনরায় উক্ত ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সকল এলকেমিষ্টদের মত চিন্তা করিয়া দেখিলেও আমরা পাইতেছি যেমন প্রাচীনকালে সমস্ত জাগতিক পদার্থকে অল্প সংখ্যক শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার চেষ্টা ছিল ইঁহারাও সেইরূপে সমস্ত পদার্থকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় নিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইঁহারা মৌলিক পদার্থগুলিকে অনেক সময়ে পদার্থের গুণের সহিত গোলমাল করিয়াছেন। যেমন গন্ধক বলিলে ইঁহারা প্রায় গন্ধকের দাহ্যগুণ মাত্রই লক্ষ্য করিতেন।

এই এলকেমিষ্টদের সময়ে কয়েকজন বিখ্যাত দার্শনিক প্রাদুর্ভূত হইয়া আরিষ্টটলের মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। ইহাদিগের মধ্যে ভনহেলমণ্ট (Von Helmont) ও বেকনের (Bacon) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হেলমণ্টের মতে আরিষ্টটলের চারিটী পদার্থের সকলগুলি মৌলিক হইতে পারে না; অগ্নি জড়পদার্থ নহে এবং পৃথিবীও মৌলিক পদার্থ হইতে পারে না। আরিষ্টটল্ দৃষ্ট পদার্থের অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত করিতেন, বেকন বলেন দৃষ্ট পদার্থগুলি পুংখানুপুংখরূপে অনুসন্ধান করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে এবং সেই সিদ্ধান্ত অন্যান্য ঘটনাবলীর সহিত পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। মহাত্মা বেকন পরমাণুবাদী ছিলেন। তিনি ডিমক্রিটসের মত অনেকটা গ্রহণ করেন, কিন্তু বেকনের মতে এক মৌলিক পদার্থ হইতে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে এবং অণুগুলির মধ্যে শূন্য স্থান নাই।

অতঃপর খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স নিবাসী ডেকার্টে

(Descartes) একটী দার্শনিক মত প্রবর্ত্তন করেন। তিনি মহাত্মা বেকনের পদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই। তিনি সর্ব্ব প্রথমে কতকগুলি বিষয় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধারণা করেন এবং তদ্বারা দৃষ্ট ঘটনাবলী ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হন। ইনি পদার্থগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শুধু অণু পর্য্যন্তই যাওয়া যায় ইহা স্বীকার করেন না। জড় জগতে শূন্য অসম্ভব। জগতের উৎপত্তি এক মৌলিক পদার্থ হইতে হইয়াছে, পদার্থের মধ্যে যে প্রভেদ দৃষ্ট হয় তাহা পদার্থের আভ্যন্তরিক আবর্ত্তনের ( Vortx ) উপর নির্ভর করে। সমস্ত জগৎ জড় পদার্থে পরিপূর্ণ, প্রথমে মূল পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট গতিশীল খণ্ডে বিভক্ত হয়, ভিন্ন ভিন্ন অংশের ঘর্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া খণ্ডগুলি সূক্ষ্ম হইয়া যায়; এই সূক্ষ্ম খণ্ডগুলি পূর্ব্বোক্ত খণ্ড সমূহের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, আর কতকগুলি অংশ একেবারেই গতিশীল নহে; মূল পদার্থ এই তিন প্রকার পদার্থে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে ইটালী দেশীয় গ্যাসেণ্ডি (Gassendi) নামে এক বৈজ্ঞানিক গ্রীক দার্শনিকদের পরমাণুবাদ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। ইহার কিছুকাল পরে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্ব্বিৎ নিউটন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ডেকার্টের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ইনি সৌরজগতের গতি পরীক্ষা করিতে গিয়া উপলব্ধি করেন যে গ্রহগুলির মধ্যে কোন প্রকার পদার্থ থাকিতে পারে না কারণ তাহা হইলে গ্রহের গতিতে কিছু বাধা হইত। তাহার পর তিনি বলেন যে সৌরজগত ও জড়জগতের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। সৌরজগতের গ্রহগুলির মধ্যে যেমন শূন্য স্থান আছে, জড় পদার্থের মধ্যেও সেইরূপ বর্ত্তমান থাকিবে। যদি জড় পদার্থের মধ্যে শূন্য স্থান থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই পদার্থে অণু আছে। গ্রহগুলি যেরূপ নিজেদের আকর্ষণে এক কেন্দ্রে ঘুরিতে থাকে, অণুগুলির মধ্যেও সেইরূপ আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণের জন্যই এক অণু আর একটী অণুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পদার্থ উৎপাদিত করে। এইরূপে মহাত্মা নিউটন দেখাইতে চেষ্টা পান যে এ জগতে অতি বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহের সহিত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণুগুলির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে।

শুভ মুহূর্ত্তে নিউটনের এই বাণী উত্থাপিত হইয়াছিল অতঃপর সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পরমাণুর প্রতি ধাবিত হয়। গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলণ্ড দেশীয় বৈজ্ঞানিক ডাল্টন (Dalton) দার্শনিকদের পরমাণুবাদ বৈজ্ঞানিকদের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করেন। এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুর গুণ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, ডাল্টনই সর্ব্ব প্রথমে অণুগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব (relative weight) অবধারণে সমর্থ হন। তিনি অণুগুলির রাসায়নিক সংযোগের এক নিয়ম আবিষ্কার করেন এবং পরীক্ষাদ্বারা দেখান যে প্রত্যেক জাতীয় অণুর গুরুত্ব বিভিন্ন, কিন্তু এক জাতীয় অণুর মধ্যে কোন ভেদ নাই। অণুগুলি অবিনাশী, ইহাদের সংযোগে পদার্থের উৎপত্তি এবং বিয়োগে দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হয়। অবশ্য দেখিতে গেলে ডাল্টনের মতের মধ্যে বিশেষ কিছু নূতন নাই কিন্তু ইহাই তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব যে তিনি অণুগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব অবধারণ করা সম্ভব ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং অনেক পদার্থের অণুর গুরুত্ব অবধারণ করিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাতে অনেক ভুল দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে তিনি সাহসের সহিত বলিয়াছিলেন যে অণুর পরিমাণ সম্ভব ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

মহাত্মা ডাল্টনের এই বাণী শুনিবামাত্র বৈজ্ঞানিক জগতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সমস্ত দেশের বৈজ্ঞানিক একযোগে ইহার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং সমস্ত পদার্থের অণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণে নিযুক্ত হইলেন। সর্ব্বশেষে সুইডেনবাসীয় রসায়নবিৎ মহাত্মা বার্জেলিয়াস্ (Bargelius) সুদক্ষতার সহিত অনেক পদার্থের অণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করিলেন। বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করিলেন পৃথিবীর, জল ও বায়ু ইহারা মৌলিক পদার্থ নহে, অগ্নি একটী পৃথক পদার্থ নহে, উহা পদার্থের অবস্থা বিশেষ। সুতরাং পূর্ব্বে যে সকল বস্তু মৌলিক বলিয়া পরিগণিত হইত, সে গুলি

আর মৌলিক রহিল না তৎপরিবর্ত্তে অনেকগুলি (পঞ্চাশটীরও অধিক) দ্রব্য মৌলিক সংজ্ঞা লাভ করিল; এই দ্রব্যগুলিকে রসায়ন ক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করিয়া আর বিভিন্ন জাতীয় অণু প্রাপ্ত হওয়া গেল না। ইহার পরে বৈজ্ঞানিকেরা দেখিলেন যে অণুগুলি শুধু পাশাপাশি সজ্জিত আছে, এই বলিলেই যথেষ্ট হয় না, কারণ কতকগুলি পদার্থ একজাতীয় অণুদ্বারা গঠিত হইলেও উহাদের গুণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সময় হইতে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি অণুগুলি কি প্রকারে সজ্জিত, তাহার উপর নিপতিত হয়। ইহার পর তাঁহারা সাব্যস্ত করেন যে যদি পদার্থগুলি একজাতীয় পরমাণুদ্বারা অথচ বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উক্ত পদার্থ সমূহে অণুগুলি বিভিন্নভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। এ সমস্ত বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে আমরা দেখিতে পাই যে এই সময় হইতে বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমশঃ পদার্থের ভিতরে অণুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

জগতের মূলে বহুবিধ মৌলিক পদার্থ বর্ত্তমান আছে, বৈজ্ঞানিকগণ এই মতের পোষকতা করিলেও তাহারা জগতের আদিতে এতটা জটিলতা—ইহা একটুকু সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জগৎ এক মৌলিক পদার্থ হইতে উৎপন্ন ইহা প্রমাণ করিতে বৃথা প্রয়াস ও পাইয়াছেন। গত কয়েক বৎসর হইল ফ্রান্স নিবাসিনী মাদামকুরি (Madame Curie) রেডিয়ম (Redium) নামক ধাতু আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে অণুরও ধ্বংস আছে; রেডিয়ম ধাতুর অণু ধ্বংস হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অণুতে পরিণত হয় এবং এই অণুর সংযোগে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদিত হয়; কাহারও কাহারও মতে অণুগুলির ধ্বংসে শেষে ইলেক্ট্রন (Electron) নামক যে অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু উৎপন্ন হয় তাহাকে আর পদার্থ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। উহা বৈদ্যুতিকশক্তি মাত্র, মূলে এই শক্তিই বর্ত্তমান, জড় পদার্থগুলি এই শক্তির বিকাশ মাত্র।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে দার্শনিকেরা ও বৈজ্ঞানিকেরা প্রায় একই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতেছেন। হিন্দুদার্শনিকেরা যে প্রকৃতিতে সত্ব, রজ-তম গুণময়ী শক্তি আরোপিত করিয়া জগতের বীজ নিরীক্ষণ করিতেন, হিন্দু পৌরাণিকেরা যে প্রকৃতিতে মহামায়ার রূপ নিরীক্ষণ করিতেন, বৈজ্ঞানিকেরাও বোধ হয় এখন সেই প্রকৃতিকেই এক বৈদ্যুতিক শক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছেন। বৈজ্ঞানিকেরা পূর্ব্বে যাহা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিতেন অদূর ভবিষ্যতে তাহাও হয়ত সম্ভবপর হইবে। মূলে যদি এক শক্তি নিহিত থাকে তাহা হইলে এই শক্তির সাহায্যেই এক মৌলিক পদার্থ হইতে অন্য মৌলিক পদার্থ উৎপাদন করা অসম্ভব মনে হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে হিন্দুরা জগতের নানা-বিধ পদার্থের মধ্যে একত্ব অনুভব করিয়াছেন। গ্রীক-দের মধ্যে কেহ অনুমান করিতেন জগৎ এবং মৌলিক পদার্থ হইতে গঠিত, আবার কেহ ভাবিতেন বহু সংখ্যক মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণেই জগতের উৎপত্তি। কিন্তু ইঁহারা সকলেই পদার্থের জড়ত্বের সহিত গুণের সংমিশ্রণ করিয়াছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা সমস্ত জাগতিক পদার্থ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মৌলিক পদার্থের পরমাণু দ্বারা গঠিত, ইহা প্রমাণ করেন। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নতির সহিত পদার্থ বিশ্লেষণ করিবার সুবিধা হওয়ায় তাঁহারা মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে থাকেন। কিন্তু রেডিয়ম আবিষ্কারের পর হইতে তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা পাইতেছেন যে নানাবিধ পদার্থও এক বৈদ্যুতিক শক্তির পরিণাম মাত্র। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরাও জগতে বহুত্বের মধ্যে আবার সেই একত্বই দেখিতে পাইতেছেন।

শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ অধিকারী।

# কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও তদীয় কাব্য, অন্নদামঙ্গল।

( বর্দ্ধমানে আহূত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত ; )

"একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥"
(ভারতচন্দ্র)

আলোচ্য কাব্যের একাংশের নায়ক রমণী রত্ন-লাভের জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়া বর্দ্ধমান আসিয়াছিলেন। প্রবন্ধ লেখক ও এই মহা সম্মিলনে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হইতে জ্ঞানময় উপদেশ রত্ন লাভ করিবার জন্য সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া লক্ষ্মী সরস্বতীর লীলানিকেতন এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরীতে সমুপস্থিত। উভয়েরই উদ্দেশ্য বিদ্যালাভ, তবে একটী শরীরিণী ও অপরটী অশরীরিণী বিদ্যা।

সকলেরই জীবনে দুইটা দিক্ আছে :—বহির্দ্দিক ও অন্তর্দ্দিক। বহির্দ্দিক্ জীবনের কার্য্যাবলীতে প্রকাশ পায়। অন্তর্দ্দিক্ লোকের সহিত আলাপে, বক্তৃতায় ও লেখায় প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেরই অন্তর্দ্দিক্ দেখা যায় না, কারণ তাহাদের মুখের সহিত মনের প্রায়শই মিল নাই। কবি যথার্থই বলিয়াছেন :—

"খুঁজিলাম ত্রিভুবন, না পেলাম হেন জন
মনোমুখ একরূপ যার।" ( সদ্ভাব শতক )

অনেক লোক দেখা যায় যাঁহাদের পাণ্ডিত্য অগাধ, যাঁহারা অসীম বিনয়ী বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত, যাঁহারা নিজের গ্রন্থে ও বক্তৃতায় বাগ্জাল বিস্তার করিয়া লোকদিগকে অনেক ভক্তির কথা, ধর্ম্মের কথা, নীতির কথা শুনাইয়াছেন, যাঁহারা গ্রন্থ লিখিতে যাইয়া অক্ষরে অক্ষরে সুধাবর্ষণ করিয়াছেন, অন্তর্দ্দিক্ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে তাঁহাদের চরিত্র নিতান্ত কলুষিত। আবার একশ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাহাদের চরিত্র নির্ম্মল, যাঁহারা স্পষ্টবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ, যাঁহারা নিজের লেখায় ও বক্তৃতায় সংসারের কলুষিত চরিত্র, মনের কলুষিত ভাব উদ্ঘাটিত করিয়া জন সাধারণকে সৎপথে চালিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, যাঁহারা রুচিদুষ্টতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সমাজ-দ্বারা সম্পূর্ণরূপে চালিত হইয়া, অকপটভাবে সমুদয় কথা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। আমাদের কবি এই দুই দলের কোন্ দলভুক্ত তাহা তদীয় জীবনের ঘটনাবলী ও তৎপ্রণীত কাব্য হইতে প্রদর্শন করিব।

কবিভারতচন্দ্র ১৭১২ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জিলায় ভূরসুট পরগণার অন্তর্গত পেঁড়ো-বসন্তপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তখনও ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্যের পত্তন হয় নাই, ইংরেজেরা বণিক্ মাত্র ছিলেন ; কিন্তু তখন মোগল সম্রাটের হস্ত হইতে শাসনদণ্ড স্খলিত হইয়া আসিতেছিল। মুসলমানের গৌরব সূর্য্য বঙ্গের আকাশে প্রায় অস্তগত, দেশে ভয়ানক দস্যুভীতি, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারের স্রোতে দেশ প্লাবিত হইয়াছিল ; লজ্জাশীলা রমণীগণের সম্ভ্রম পদে পদে নষ্ট হইতেছিল, কামিনী কাঞ্চনের লোভে সমাজ পর্য্যুদস্ত, ইহার উপর বর্গির উৎপাতে দেশ সন্ত্রস্ত। কবির শেষ জীবনে ইংরেজরাজ্যের প্রথম প্রস্তুন হয়, পলাসীর অস্ত্রের ঝন্ঝনা, কামানের গভীরগর্জ্জন কবির কর্ণে প্রবেশ করে। শাসনদণ্ডের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ঐ বিপ্লব কবির জীবনে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা এই প্রবন্ধে ধীরে ধীরে প্রদর্শিত হইবে।

সমুদয় প্রামাণিক গ্রন্থেই কবির জন্মস্থানটী বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বলিয়া লিখা হইয়াছে, কিন্তু রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন তদীয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক সমালোচন গ্রন্থে গ্রামটীকে হুগলী জেলার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুস্তক খানার বহুধিক সংস্করণ হইয়াগিয়াছে, তথাপি ভ্রমটী এপর্য্যন্ত সংশোধিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ, তিনি ভরদ্বাজ গোত্রে মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার "রায়" উপাধিটী কুলগত ও বৈভব সূচক এবং "গুণাকর" উপাধিটী ব্যক্তিগত ও পাণ্ডিত্য জ্ঞাপক।

তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় "রাজা" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। আমাদের কবি রাজপুত্র। বর্দ্ধমান

সময়েও বঙ্গে এক মহারাজ লেখনী হস্তে লইয়া সুধা-ধবলিত রাজপ্রাসাদের কুসুম-কোমল-শয্যা হইতে শ্যামল বঙ্গুর-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি এক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। লক্ষ্মী-সরস্বতীর এই সুখসম্মিলন দেশে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষা আনয়ন করিতেছে। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ নিজ মুখের একটী কথায় রাজ্য হারাইয়াছিলেন। কেহ মুখের কথায় রাজ্য পায়, আর কেহ মুখের কথায় রাজ্য হারায়। মুখের কথা যে এত বল রাখে, এত শক্তি রাখে, তাহা না বুঝিয়াই প্রাচীন আর্য্য ঋষি শ্রীরামচন্দ্রকে পিতৃসত্য-উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে লোকায়তিক উপদেশ দান করিয়াছিলেন।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নবাব আলিবর্দ্দীর সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং নবাব সরকারে বার্ষিক তিনলক্ষ টাকা কর দিতেন।

কথিত আছে যে ভূমিসংক্রান্ত বিবাদে তিনি তদানীন্তন বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের জননী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করেন। কথা মহারাণীর কর্ণগোচর হইল, তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে নরেন্দ্রনারায়ণের রাজধানী ধ্বংস না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিবেন না। মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র তখন নাবালক ছিলেন। মহারাণীর আদেশে সেনাপতি আমলচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র সসৈন্যে যাইয়া সেই রাত্রিতেই নরেন্দ্র রায়ের গড়বন্দি রাজধানী ধ্বংস করিয়া ফেলেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, অসামান্য বৈভব লুপ্ত হইল; ধন-রত্নাদি লুণ্ঠিত হইয়া বর্দ্ধমানের কোষাগারে নীত হইল। নরেন্দ্র রায় দীনদশায় নীত হইয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ভারতচন্দ্র পলায়নপূর্ব্বক মণ্ডল ঘাট পরগণার অন্তর্গত "নওয়াপাড়া" নামক গ্রামে মাতুলালয়ে গমন করেন এবং সেখানে থাকিয়া নিকটবর্ত্তী তাজপুর গ্রামে যাইয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশবর্ষ মাত্র হইলেও তিনি স্বীয় ধীশক্তি বলে বিষয়গুটী সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। সংস্কৃত অভিধানে তাঁহার কিরূপ অধিকার জন্মিয়াছিল তাহা অন্নদা মঙ্গলের প্রতিপত্রে বিশেষতঃ বিদ্যা'স্বরূপ-বর্ণনা ও শ্মশানে কালিকার স্তুতি প্রভৃতি পাঠে সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অনন্তর ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ের নিকটবর্ত্তী শারদাগ্রাম নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে তাঁহার কৌলীন্য মর্য্যাদার কিঞ্চিৎ হানি হয়। তিনি পিতার চতুর্থ বা সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। এই বিবাহের জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরগণ কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া অভিমানে গৃহত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার জীবনে উন্নতির সূচনা দেখা যাইতে থাকে। তিনি হুগলী জেলায় বাঁশবেড়িয়াগ্রামের সন্নিহিত দেবানন্দপুরের কায়স্থ কুলোদ্ভব মুন্সীবাবুদের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে শ্রীযুত রামচন্দ্র মুন্সীর যত্নে ও স্বীয় অধ্যবসায়গুণে পারস্যভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। এইখানেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ ও কবি-শক্তির স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। এই সময়ে তাঁহার বয়স ১৫ বৎসরে অধিক হয় নাই। এই মুন্সীবাড়ীতে অবস্থান কালেই তিনি প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা হইত। পুরোহিত পূজায় বসিয়াছেন; বাড়ীর কর্ত্তা ভারতচন্দ্রকে সত্য-নারায়ণের পুঁথি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভারতচন্দ্র পুঁথি আনিবার জন্য বাসায় যাইয়া সত্য-পীরের কথা রচনা করিতে বসিলেন এবং অতি অল্প সময়ে ত্রিপদীছন্দে রচনা সমাপ্ত করিয়া সভায় আগমন করিলেন এবং সমবেত শ্রোতৃবর্গকে নবরচিত পুঁথি শুনাইয়া মুগ্ধ করিলেন। আর একদিন ঐরূপ সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে তিনি চৌপদীছন্দে সত্যপীরের কথা রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতা গুলিতে বঙ্গ ভাষার সহিত পারস্য ভাষার আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ ও মুসলমান সমাজের সান্নিধ্যহেতু হিন্দুর লৌকিক ধর্ম্মে মুসলমানীভাবের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

কবি মুন্সীবাবুদের বাড়ীতে ৫ বৎসর অবস্থান করেন। এখানে তিনি হিন্দি, পারস্য, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। অনন্তর তিনি ২০ বৎসর বয়সে নিজভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভ্রাতাদের সহিত

মিলিত হন। ভ্রাতারা দেখিলেন যে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। কবির জনক রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় এই সময়ে বৰ্দ্ধমানাধিপতির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ জমি ইজারা লইয়া পীর গ্রামে বাস করিতেছিলেন। ভারতচন্দ্র জনকের আদেশে ও ভ্রাতৃগণের অনুরোধে স্বকীয় সম্পত্তির মোক্তার স্বরূপ বৰ্দ্ধমানে বাস করিতে থাকেন, কিন্তু কিয়ৎকাল গেলে পর ভ্রাতারা নির্দ্দিষ্টকালে রাজস্ব প্রেরণ না করাতে রাজ কর্ম্মচারিগণ ইজারা খাস করিলেন। ইহাতে ভারতচন্দ্র রাজ কর্ম্মচারীদের কার্য্যে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াও কোন ফললাভ করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু তাঁহাদের চক্রান্তে পড়িয়া কারারুদ্ধ হন। রাজস্ব আদায়ের জন্য সম্পত্তির প্রতিভূস্বরূপে অবস্থিত ভারতচন্দ্রকে কেবল কারারুদ্ধ করিলেই কর্ম্মচারীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত কিন্তু দুর্ভাগ্য পীড়িত কবির কপালে উভয়ই হইল সম্পত্তিও গেল কারাবরোধও ঘটিল।

বৰ্দ্ধমানরাজ সরকার হইতে কবি কিম্বা তাঁহার জনক ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার আশা করিতে পারেন না। তিনি বৰ্দ্ধমান ত্যাগকরিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যে কবির প্রতিভা দেখিয়া বঙ্গবাসী চমৎকৃত হইয়াছিল, বৰ্দ্ধমানে, কবির জন্মস্থানে, সেই প্রতিভা বিকাশের অবসর ঘটিয়া উঠিল না। তিনি কারাধ্যক্ষের সাহায্যে রাত্রিকালে পলায়ন পূর্ব্বক একেবারে কটকনগরীতে উপস্থিত হইলেন। বৰ্দ্ধমানবাসী তাঁহাকে জানিল না চিনিল না। যে কবি বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াগিয়াছেন, বৰ্দ্ধমানে সে কবির মাথা রাখিবার স্থান হইল না। ইহা বৰ্দ্ধমানবাসীর বড় অগৌরবের কথা। বৰ্দ্ধমানে বঙ্গজননীর এত কৃতিসন্তান থাকিতে কি এই অপবাদ স্খালনের কোন উপায় অবলম্বিত হইবে না? কবির উপযুক্ত স্মারক চিহ্ন সংস্থাপন করিয়া বৰ্দ্ধমান বাসী কি এই কলঙ্ক অপনোদের চেষ্টা করিবেন না? কবি প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। উড়িষ্যা তখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন ছিল। মহারাষ্ট্র সুবেদার শিবভট্টের অনুগ্রহে কবি পুরুষোত্তমে বিনাব্যয়ে আহার ও বাসের সুবন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। সাংসারিকদিগের জন্য একটা নীতি বাক্য প্রচলিত আছে—"সারল্যং সরলে কুর্য্যাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।" এই নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক কবি বৰ্দ্ধমানের রাজ কর্ম্মচারীদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। কবির এই পলায়ন সাংসারিকের হিসাবে সঙ্গত হইলেও ধর্ম্ম নীতির দিক্‌দিয়া দেখিলে ইহাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

দুই সহস্রেরও অধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক শিষ্যদিগ কর্তৃক সনির্ব্বন্ধ অনুরুদ্ধ হইয়াও কারাগার হইতে পলায়ন করেন নাই। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে বোধ হয় দেশের লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি একটু ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। যে সময়ে জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ, দুর্লভরাম, উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ প্রভৃতি বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায়, শঠতায়, প্রবঞ্চনায় ও নৃশংসতায় দেশের লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি বিগড়াইয়া গিয়াছিল, সে সময়ে অত সূক্ষ্ম নীতিজ্ঞানের কথা কেই বা বলে কেই বা শোনে। কবি পুরুষোত্তমে শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত মঠে বাস করিতে লাগিলেন। যিনি বৌদ্ধ প্লাবিত ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ স্থাপন করিয়া জগতে খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর মঠে থাকিয়া কবির ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পুরীতে বৈষ্ণবদিগের সাহচর্য্যেও বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক উদাসীন বেশ ধারণ করিলেন। জীবন স্রোতের জ্ঞানতরঙ্গে পড়িয়া তিনি হাবুডুবু খাইতেছিলেন। তিনি শান্তি লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। ঝঞ্ঝা কবে প্রশমিত হইবে, কবে আবার জীবনে মধুর স্রোত প্রবাহিত হইয়া হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করিবে, কবি দিনযামিনী তাহাই ভাবিতেছিলেন। কবি যেন ভাবিতেছিলেন:—

"অমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় রে
মানবজীবন?
অমনি চাঁদনি তলে, অমনি নীলাভ জলে
অমনি মধুর স্রোতে সঙ্গীত মতন,
বহিয়া না যায় কেন মানবজীবন?

এ ভাবে কবিকে সুদীর্ঘকাল থাকিতে হয় নাই। তিনি বৃন্দাবন যাইবার মানসে কয়েকজন বৈষ্ণবের সহিত পুরুষোত্তম হইতে পদব্রজে খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে তাঁহার শ্যালীপতির বাস, ইনি ভারতচন্দ্রকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া আর্য্যগার্হস্থ্য ধর্ম্মের সার উপদেশ দিয়া পুনরায় গৃহধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তিত করেন এবং ইঁহারই সহিত কবি শারদাগ্রামে শ্বশুর বাড়ীতে গমন করেন। এখানে পত্নীর সহিত বিবাহের পর এই প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এ পর্য্যন্ত কবি বিবাহিত জীবনে কোন সুখই পান নাই। অর্থোপার্জ্জন না করাতে তিনি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, এ জন্য অর্থোপার্জ্জনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ভার্য্যাকে স্বগৃহ গমনে নিষেধ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন সংসারে অর্থ ব্যতীত একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না। বিখ্যাত বৌদ্ধ কবি লোকদিগকে সংসারে বীতস্পৃহ করিবার জন্য বলিয়াছেন, "বিবাহকালে যজ্ঞীয়-ধূমে বর কন্যার চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং তাহা হইতে বারি নিঃসৃত হইয়া গণ্ডদেশ প্লাবিত করে, ইহাতে এই বুঝা যায় যে সংসারে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে অনেক কান্না কাঁদিতে হইবে, তাহাদের নেত্র জলে ভূমি অভিষিক্ত হইবে।" বৌদ্ধ কবির কথা আমাদের কবির জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। আমাদের কবির ন্যায় অবিমৃষ্যকারিতার সহিত অসময়ে বিবাহ করিয়া বোধ হয় অনেককে কাঁদিতে হয়। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, "Marry in haste repecit at leisure." শ্বশুর বাড়ী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কবি ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় গমন করেন এবং সেখানে ফরাসী গবর্ণমেন্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনী পালধি-বংশীয় শ্রোত্রিয় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দেখিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরিচিত করিয়া দেন এবং মহারাজকে কবির প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। মহারাজ সম্মত হইলেন এবং কবির বেতন মাসিক ৪০৲ টাকা হারে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কবি অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এতদিনে তিনি উহার বিকাশের উপযুক্ত অবসর পাইলেন। একটা প্রচলিত কথা আছে "কবির জীবদ্দশায় তাঁহার প্রকৃত গুণের বিচার হয় না।" পৃথিবীর অনেক কবির পক্ষে এ কথাটা খাটিলেও আমাদের কবির প্রতি ইহা প্রযোজ্য নহে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি কবির গুণগরিমায় মুগ্ধ হইয়া কবিত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে "গুণাকর" উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং পরিবার প্রতি-পালনার্থ তাঁহাকে প্রচুর বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি কবির বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ১০০৲ টাকা এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী মূলাযোড় ও আনরপুর গ্রামে ১২১ বিঘা ভূমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তররূপে দান করেন। মূলাযোড় গ্রাম বর্দ্ধমানের তদানীন্তন মহারাণী স্বীয় কর্ম্ম-চারী রামদেব নাগের নামে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে পত্তনি লইয়াছিলেন। পত্তনিদারের অত্যাচার বর্ণন করিয়া ভারতচন্দ্র *নাগাষ্টক্* নামে অষ্টশ্লোকময়ী কবিতা লিখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। মহারাজ এই শ্লোকগুলি পাইয়া পত্তনিদারের অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন। কবির জনক নরেন্দ্র-নারায়ণ শেষ বয়সে যোগ্য পুত্রের গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করেন। এখানেই তাঁহার দেহপাত হয় এবং ভারতচন্দ্র পরলোকগত পিতার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া যথাশক্তি সম্পন্ন করেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কবি অন্নদামঙ্গল রচনা করেন এবং তাঁহার আদেশে এই কাব্যের সহিত বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ পালা সংযোজিত হয়। পালাদ্বয় সহ সমগ্র অন্নদামঙ্গল বাদ্য-যন্ত্র সহকারে নীলমণি সমদ্দার নামক জনৈক গায়ককর্ত্তৃক মহারাজ সমক্ষে গীত হইত। মহারাজ ইহা শুনিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। ১৬৭৪ শকে বা ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়। কবি নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় রচনায় সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"

অন্নদামঙ্গল রচনার ৮ বৎসর পরে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে অতিরিক্ত মানসিক শ্রমহেতু বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া কবি মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কবি চলিয়া গিয়াছেন, নশ্বর জগতে কে না যায়। থাকে কেবল কীর্ত্তি। তিনি অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়া বঙ্গে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই কাব্য কবিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, ততদিন বঙ্গবাসী এই কাব্যামৃত রসাস্বাদে অতুল আনন্দ অনুভব করিবে।

এখন আমি ভারতচন্দ্রের কাব্য ও কবি শক্তির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব এবং প্রসঙ্গক্রমে আধুনিক কবি ও কাব্য সম্বন্ধেও কয়েকটী কথা বলিব। আমি বহু কথা বলিবনা, যেহেতু কবি আলোচ্য গ্রন্থে আমাদিগকে বলিয়াছেনঃ—

গ্রন্থ-সমালোচনা

"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর"।

অতএব আমি সংক্ষেপে এই গ্রন্থের দোষগুণ গুলি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি।

অন্নদামঙ্গল তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে দক্ষযজ্ঞ শিব বিবাহ, অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য অন্নপূর্ণারপুরীনির্ম্মাণ, ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণ, বসুন্ধরে অন্নদার শাপ, হরিহরের বৃত্তান্ত, নলকুবেরের শাপ, ভবানন্দের জন্মবিবরণ প্রভৃতি নানাবিষয় বর্ণিত আছে; দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দর ঘটিত ব্যাপার বর্ণিত আছে এবং তৃতীয় ভাগে মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোহর বিজয়, ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা, ভবানন্দের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের যে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তদনুসারে বিচার করিতে গেলে যদিও অন্নদামঙ্গল সম্পূর্ণ রূপে মহাকাব্য নামের উপযুক্ত না হউক, তথাপি ইহার অনেক স্থলে যে মহাকাব্যের লক্ষণ বর্ত্তমান আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের খণ্ড কাব্য গুলিতে প্রারব্ধ হইয়া মহাকাব্যের উচ্চশৃঙ্গে উন্নীত হইয়াছিল। এই মহাকাব্যের যুগে আমরা কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের নাম দেখিতে পাই। নানাঅবস্থান্তরের পর বঙ্গসাহিত্য বর্ত্তমান সময়ে আবার খণ্ড কাব্যযুগে অবতরণ করিয়াছে। চট্টলের মহাকবির তিরোধনের পর আর আমরা মহাকাব্যের গুরু গম্ভীর উপদেশ শুনিতে পাইতেছিনা। যে যায় তার স্থানে আর কেহ আইসে না। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। দীর্ঘ কাল হইল বঙ্গের "অকাল কোকিল, মরুতল তরু" আমাদের কবি কুঞ্জধাম আঁধার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্থান পূর্ণ হইল না। তারপর তেরশত সনের বসন্তকালের সেই সায়াহ্ন "এক পায় দুই পায়" চলিয়া যাইতেছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গজননীর প্রিয় সন্তান, প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র চলিয়া গেলেন; তাহার স্থলে আর কেহ আসিল না। হেমচন্দ্র ভৈরব "সিঙ্গা" বাজাইয়া, নিদ্রিত ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্থল পূর্ণ করিতে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে 'দ্বিজেন্দ্রলাল' বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিও অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছেন। আর কি তাঁহার স্থান পূর্ণ হইবে? এখন জাতীয় সাহিত্যের অধঃপতন সূচনা করিয়া খণ্ডকাব্যের যুগ চলিতেছে। এই যুগের নেতা আমাদের স্বনামখ্যাত রবীন্দ্রনাথ। ইনি সংপ্রতি Nobel prize লাভ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র সমস্ত-সম্ভাবিত কবি। তিনি অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন। তিনি বাল্যে রাজপরিবারে লালিত, কৈশোরে ও যৌবনে পরান্নপুষ্ট, ঝঞ্জাতাড়িত পত্রের ন্যায় ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত, এবং প্রৌঢ়ে রাজপুরীর কোলাহল মধ্যে অবস্থিত হইয়া রাজানুগ্রহে বর্দ্ধিত। দেশের দুর্ভাগ্য যে তিনি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারেন নাই। প্রকৃতি পাঠে বা নিসর্গসন্দর্শনে তাঁহার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। এজন্য তিনি বাহ্যপ্রকৃতি বর্ণনে তত দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। যিনি

"সিন্ধুমেখলা, ভূধরস্তনী
রম্যানগরী চট্টলা"-তে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, যাঁহার দেহ পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর জলে ও কর্ণফুলীর তরঙ্গ-

ভঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, যাঁহার মন শৈলবিহারী বিহঙ্গগণের কলনাদে নৃত্য করিত, আমরা সেই মহাকবির রচনায় যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার চমৎকারিত্ব আশা করিতে পারি, যে কবি বাল্যে রাজপ্রাসাদের বিলাসিতায় লালিত পালিত, যৌবনে দরিদ্রতার নিষ্পেষণে নিপীড়িত এবং শেষ জীবনে রাজপুরীর কোলাহল মধ্যে বর্দ্ধিত ও রাজানুগ্রহে পুষ্ট, তাঁহার নিকট হইতে তেমন আশা করিতে পারি না।

গ্রন্থারম্ভে বহু দেবদেবীর বন্দনা আছে। এই স্তোত্রগুলিতে কবির গভীর দার্শনিক ও পৌরাণিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে কবির ধর্ম্মভাব পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভারতচন্দ্র সংযতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার ভাষা অনেক স্থলে, বিশেষতঃ বিদ্যাসুন্দরে, রুচিদুষ্ট হইয়াছে। ভাষা রুচিমার্জ্জিত না হইলেও গ্রন্থখানা লোক-প্রিয় হইয়াছে। এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী নর নারীর সংখ্যা খুব অল্প যাঁহারা অন্নদামঙ্গল পড়েন নাই। এখানেই ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব।

অনেকে কাব্যখানিকে অশ্লীল বলেন কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যে রচনা ইন্দ্রিয়াদির উত্তেজনার জন্য ব্যবহৃত হয় অথবা যাহা কবির বা লেখকের মনের কুভাব প্রকাশ করে তাহাই অশ্লীল রচনা; উহা সভ্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। কিন্তু যে রচনার উদ্দেশ্য সমাজে প্রবিষ্ট পাপকে উন্মূলিত বা ধিকৃত করা, অথবা প্রচলিত সামাজিক রীতি সরলভাবে ব্যক্ত করা, তাহার ভাষা রুচি ও সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। মহাভারতে ভগবান্ ব্যাস স্বীয় জন্ম বিবরণ এবং পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম বিবরণ যে সরল ও স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কি অশ্লীল বলা সঙ্গত? ভারতচন্দ্রের ভাষা স্থানে স্থানে অমার্জ্জনীয়রূপে রুচিদুষ্ট হইলেও উহাকে অশ্লীল বলা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই অপবাদ হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন। রুচিদুষ্ট কবিতা বাদ দিলে মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলী পড়া বন্ধ করিতে হয়। একটা প্রচলিত কথা আছে:—"লোম বাছিতে কম্বল উজার।" ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও রুচিদুষ্ট কবিতার অভাব নাই। স্বয়ং সেক্‌স্‌পীয়র তদীয় "Venus and Adenis" নামক কাব্যে সুরুচির শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। Boccacio's De Cameron প্রভৃতির নাম আর নাই বা উল্লেখ করিলাম। রুচিবিচার করাও একটু কঠিন। লোক বিভিন্ন রুচি সম্পন্ন। "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।" আমরা এখন যাহাকে রুচিদুষ্ট বলি, হয়ত ভারতচন্দ্রের সময়ে তাহাই সুরুচি ছিল; তাহা না হইলে বিদ্বন্মণ্ডলী পরিবৃত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরের এত আদর হইবে কেন? ফরাসীগণ অতি প্রীতির সহিত (with keen relish) শম্বুক ও মণ্ডূক আহার করিয়া থাকেন; সভ্য বাঙ্গালী উহা দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন। পক্ষান্তরে বাঙ্গালীর প্রিয় রসগোল্লা বা অমৃতি বোধ হয় ৫৲ টাকা বক্‌সিস দিয়াও একজন বিলাতী সাহেবকে খাওয়ান যায় না।

অলঙ্কার ও রস কাব্যের প্রধান অঙ্গ। অলঙ্কারশাস্ত্রে যতগুলি অলঙ্কার ও রসের উল্লেখ আছে, অনুসন্ধান করিলে প্রায় সমুদয় গুলির দৃষ্টান্তই অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যাইতে পারে। দোষপরিচ্ছেদের উদাহরণের জন্যও বোধ হয় অন্য গ্রন্থ আশ্রয় না করিলে চলে। যত বড় কবি, তাঁর তত বড় দোষ। আমাদের এত বড় মাইকেলও দোষে গুণে কবি। অন্নদামঙ্গলে শব্দের পারিপাট্য, পদের লালিত্য এবং শব্দের মোহিনীচ্ছটা অপূর্ব্ব। এই মোহিনীচ্ছটাতে বঙ্গের নরনারী আকৃষ্ট। এইখানেই ভারতচন্দ্রের বিশেষত্ব। ভারতচন্দ্রের কবিতা দেশময় যে মধুরভাব সঞ্চারিত করিয়াছে, সেই ভাবে বাঙ্গালী মুগ্ধ। এই গ্রন্থের ছন্দোনৈপুণ্য, শব্দ মাধুর্য্য ও সুললিত পদ বিন্যাসে পাঠক বিস্মিত ও মুগ্ধ।

ভারতচন্দ্র মার্জ্জিত বাঙ্গলা রচনার স্রষ্টা (Fath of Bengali Diction)। ইঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবি বঙ্গে খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের আর একটী বিশেষত্ব এই যে তাঁহার বহু কবিতা বঙ্গীয় নরনারীর কণ্ঠে নিত্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ততার

দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই প্রচলিত কবিতাগুলি উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

গ্রন্থারম্ভে দেব দেবীগণের স্তুতির পরেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা। সুতরাং একপ্রকার বলা যাইতে পারে যে আশ্রয় দাতার স্তুতিতেই এই কাব্যের আরম্ভ। যাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে, যাঁহার অনুগ্রহে তিনি সাহিত্য জগতে পরিচিত হইয়াছেন,—বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার প্রশংসাবাদে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া কবি যুক্তিযুক্ত কাজই করিয়াছেন। তবে সভাবর্ণন করিতে যাইয়া কবি ইহাকে স্থানে স্থানে অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন। বর্ণনার অতিরঞ্জন সংস্কৃত কবিদিগের চিরাভ্যস্ত। কাদম্বরী, হর্ষ চরিত ও নৈষধের পাঠক ইহা অবগত আছেন। কবি এবিষয়ে সংস্কৃত কবিগণের পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। উপকারকের উপকার স্বীকারে অথবা তাহার গুণবর্ণনায় মনুষ্যত্বই প্রকাশ পায়। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র ইহাকে তোষামোদি বলিয়াছেন। সমালোচনা পক্ষপাত বিহীন হওয়া উচিত। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে এই গ্রন্থের সমালোচনা করিতে যাইয়া রায় সাহেব অনেক স্থলে একদেশ দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

মধুর পদবিন্যাস ও শব্দের মোহিনীচ্ছটা ব্যতীত অন্নদামঙ্গলের আর একটী বিশেষত্ব এই যে ইহা বুঝিবার জন্য পাঠককে মাথার ঘাম পায় ফেলিতে হয় না। কবি স্পষ্ট ভাষায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। অধুনা অনেক কবি অস্পষ্ট কবিতা রচনা করিয়া বাহাদুরি লইয়া থাকেন। এখন দেখিতেছি যাঁহার কবিতা যত অস্পষ্ট তিনি তত বড় কবি। কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে জনৈক অস্পষ্ট কবির রচনা প্রাচীন মিশরের চিত্রলেখার ( Hieroglyphic ) সহিত তুলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সভ্য জগতের চেষ্টায় সেই সাঙ্কেতিক লিখনের রহস্যোদ্ভেদ হইয়াছে এবং উহা জগতের জ্ঞান সম্পদ বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। কিন্তু আমাদের অস্পষ্ট কবিদিগের রচনার অস্পষ্ট ভাব কোনদিন জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে কি না সন্দেহ।

রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন অন্নদামঙ্গলে ভাব দেখিতে পান না, ভাবের অভাবই দেখিতে পান। তদীয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক সমালোচন গ্রন্থে তিনি জয়নারায়ণের "হরিলীলা" সমালোচনা করিতে যাইয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলেন "মিষ্টশব্দপ্রয়োগপটু কবি জয়নারায়ণের কাব্যের একটী বৃহৎ দোষ আছে—উহা সেই যুগের দোষ। এ অভিযোগ হইতে ভারতচন্দ্রেরও অব্যাহতি নাই। এই সব কাব্য কেবলই শব্দের কাব্য, ভাবের অভাবে শব্দের লালিত্য অনেক সময়ে নিষ্ফল হইয়া পড়ে।" ইহার কয়েক পত্র আগে নবদ্বীপের অবস্থান্তর বর্ণন করিতে যাইয়া রায় সাহেব বলিতেছেন "ভারতচন্দ্রের কবিতা দেশময় যে মধুরভাব বিকীরণ করিতে লাগিল" ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করি, ভাবহীন কবিতায় আবার মধুরভাব বিকীরণ করে কিরূপে? রায় সাহেবের কোন্ কথা সত্য? রায়সাহেব ভারতচন্দ্রের কাব্যে করুণরসের দুর্গতি প্রদর্শন করিতে যাইয়া লিখিতেছেন— "ভারতচন্দ্রের রতি সামান্য গণিকার ন্যায় কৃত্রিমসুরে পতিবিয়োগে বিলাপ করিতেছেন:—"আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি, হায় হায় গোসাঞি গোসাঞি।" আমরা গ্রন্থের ঠিক ঐ স্থল হইতেই রতিকৃত বিলাপের আর একটী কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"অরে নিদারুণ প্রাণ কোন্ পথে পতি যান
আগে যারে পথ দেখাইয়া।
চরণ-রাজীবরাজে মনঃ শিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহরে বহিয়া।"

এটী কি রতির মর্ম্মভেদী উক্তি নহে? এখনও কি রায়সাহেব "করুণরসের বিদ্রূপ" দেখিতে পান? এখানেও কি তিনি ভাব দেখিতে পান না? রায়সাহেবের সমালোচনা কি একদেশদর্শিতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক নহে?

কেহ কেহ বলেন যে, ভারতচন্দ্র রতিবিলাপ বর্ণন করিতে যাইয়া মহাকবি কালিদাসের অনুকরণ করিয়াছেন। উদ্ধৃত কবিতায় আমার মনে হয় যে বর্ণনার স্বাভাবিকতায় ভারতচন্দ্র কুমারসম্ভবের মহাকবিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। প্রতিভাধারা নূতনত্ব ফলাইতে

পারিলে অনুকরণ দোষাবহ হয় না। মাইকেল মধুসূদনের উপরও এরূপ অনুচিত আক্রমণ হইয়াছে, দেখিয়াছি। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কবিকঙ্কণের একটী কবিতা অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"বদন মণ্ডল, চাঁদ নিরমল, ঈষদ্ গোপের রেখা।" আমার মনে হয়, ইহা অপহরণ নহে, ইহা বহু অধ্যয়নের ফল। বহু অধ্যয়নের ফলে নিজের লেখায় অপরের রচনা অবিকলভাবে আসিয়া পড়ে।

কেহ কেহ বিদ্যাসুন্দর ঘটিত বৃত্তান্তটী রূপকের হাওয়ায় উড়াইয়া দিতে চাহেন। আমাদের এত বড় দেশীয় ইতিহাস রামায়ণটাকেই যখন কোন কোন পণ্ডিত রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন এই সামান্য ঘটনাটা উড়িয়া যাইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? রূপকের পক্ষপাতীদিগের একটী যুক্তি এই যে, সুন্দরের সুরঙ্গ বহু অনুসন্ধানেও এখনও পাওয়া যাইতেছে না। যে সুরঙ্গ রাজবাড়ীর অন্দরমহল পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহা আবিষ্কৃত হইবার পরক্ষণেই যদি বন্ধ হইয়া না থাকে, তবে বর্দ্ধমানরাজের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত কাজ হইয়াছিল বলিতে হইবে। এই অপবাদ মূলক সুরঙ্গটাকে বর্দ্ধমানরাজ কেন ইটপাথরে বাঁধাইয়া রাখিবেন, তাহাত বুঝা যায় না।

রূপকবাদীদিগের আর এক যুক্তি এই যে, বর্দ্ধমান রাজসরকার দ্বারা উৎপীড়িত কবি অত্যাচারের প্রতিশোধ কামনায় বিদ্যাসুন্দর ঘটিত ব্যাপার কল্পনা করিয়া উক্ত রাজপরিবারের উপর কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছেন। এরূপ অনুমানে কবির উপর নীচতা আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রতি এই অবিচার করিবার আমাদের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। যাহা হউক যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে কবি নীচাশয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক বর্দ্ধমান রাজপরিবারের উপর অপবাদ আনয়নের জন্য একটা ঘটনা কল্পনা করিয়া গ্রন্থস্থ করিয়াছেন, তথাপি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কেন এ ব্যাপারে অনুমোদন করিবেন, তাহারও কোন বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় না।

যে কৃষ্ণচন্দ্র একটু শিষ্টাচার লঙ্ঘনের ভয়ে বর্দ্ধমানের তদানীন্তন মহারাণীকে মূলাযোড় গ্রাম পত্তনি দিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে কি নিজ সভাসদ্ দ্বারা সেই বর্দ্ধমান রাজপরিবারের একটা মিথ্যা অপবাদ ঘোষণা করা সম্ভব? আর একটা কথা। বিদ্যাসুন্দরের গল্পটী ভারতচন্দ্রের কপোলকল্পিত নহে। তিনি ইহা কবি রামপ্রসাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাকবি বররুচি কৃত বিদ্যাসুন্দরের ঘটনাস্থল উজ্জয়িনী, বর্দ্ধমান নহে; রামপ্রসাদই বীরসিংহকে বর্দ্ধমানের রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভারতচন্দ্রের প্রতি বর্দ্ধমান রাজপরিবারের উপর অপবাদের আরোপ কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

বিদ্যাসুন্দর ঘটিত ব্যাপারটী প্রকৃত কি কপোল কল্পিত ইহা নির্ণয় করা কঠিন। যদি প্রকৃতই হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে রাজা বীরসিংহ বয়স্কা কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় গৃহে রাখিয়া সামাজিক অপরাধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। বিষয়টী গুপ্ত থাকে নাই, উহা জনসাধারণের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের মানবচরিত্রপরিজ্ঞান ক্ষমতা প্রশংসার্হ। ঈশ্বরী পাটনী অন্নদার নিকট বর চাহিতেছে—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" পাটনী সাম্রাজ্য চায় নাই, লক্ষপতি হইতে চায় নাই; তাহার ন্যায় সামান্য লোকের পক্ষে যাহা চাওয়া সম্ভব সে তাহাই চাহিয়াছে। ইংরেজী কথায় কবির সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—He understands as it is.

এখন কবির রচনায় অলঙ্কার নৈপুণ্যের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। রায়সাহেব বলিতেছেন, "অলঙ্কার শাস্ত্র তাঁহার (কবির) মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল।" আমি বলি অলঙ্কার প্রয়োগের নৈপুণ্যের জন্যই ভারতচন্দ্রের এত নাম, এত মান, এত খ্যাতি। যমক ত অনেকেই লিখিয়াছেন, কিন্তু "আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি। অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।" এরূপ সুন্দর সরল রচনায় যমক বোধ হয় আর কেহ লিখিতে পারিবেন না। সরল রচনার আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি:—

"সতাজন গুন জামাতার গুণ বয়সে বাপের বড়।
কোনগুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥"

এখানে যেমন রচনা সরল হইতেও সরল, আবার ইহাতে ব্যঞ্জনবৃত্তিতে রচনার চমৎকারিত্বের আতিশয্যও ( highest art ) প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিদ্যার রূপ বর্ণনায়—

"বিনানিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥"

প্রভৃতি কবিতার রচনা নৈপুণ্যে অতিশয়োক্তি চাপা পড়িয়াছে, এখানেই কবির কৃতিত্ব। স্বচ্ছিদ্রান্বেষণে বিমুখ সমালোচকেরা ইহাকে oriental exaggeration বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। ইংরেজীতে একটী কথা আছে—The triumph of art is to conceal itself.

আপনারা জানেন, শব্দের তিনটী শক্তি আছে—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। এই তিনটী শক্তি দ্বারা ক্রমে শব্দের বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ জন্মে। ব্যঙ্গ্যার্থ বলিতে শব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ ব্যতীত অপর একটী নিগূঢ় অর্থ ( অর্থাৎ তাৎপর্য্য বা ভাবার্থ ) বুঝায়। যেখানে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের অধিক চমৎকারিত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা উত্তম কাব্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অন্নদা পাটনীর নিকট স্বীয় পরিচয় দিতে যাইয়া বলিতেছেন—

"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥"

ইত্যাদি শ্লেষালঙ্কারের প্রয়োগনৈপুণ্যে উপরি উক্ত কবিতাগুলি উত্তম কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আর একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাসুন্দর রচনার পরেই ভারতচন্দ্রের কবিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তাঁহার "মানসিংহে" শব্দের মিল ভিন্ন আর কিছুই নাই। কথাটা যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। "মানসিংহ" রোগ-ক্লিষ্ট কবির শেষ বয়সের রচনা। বহু প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় কবির যৌবন ও পরিণত বয়সের রচনা স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত করা যাইতে পারে। অন্নদামঙ্গলের প্রথম দুইখণ্ডে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইলেও "মানসিংহ" পালা যে কবিত্বহীন একথা বলা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। "মানসিংহে"ও স্থানে স্থানে কবিশক্তি ও রচনা-চাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে, অথচ ইহাতে রুচিদুষ্ট কবিতার একান্ত অভাব। "মানসিংহে" কাব্যরসের উন্মুক্ত প্রবাহ ও তরঙ্গভঙ্গ না থাকিলেও ইহার বহুস্থানের কবিতা উপভোগের সামগ্রী।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কা করিয়া সামান্য সামান্য বিষয়গুলির আলোচনায় বিরত হইলাম।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# মায়ের কাছে চৈতন্যের বিদায়

প্রার্থনা।

( মনোহর সাঁই )।

১

জননি, আমায়
জন্মের মত দেও বিদায়,
আমি হরি ব'লে, যাব চ'লে
হরি আমায় নেয় যথায়।

২

তনু মনঃ প্রাণ আমার শ্রীহরিচরণে
সমর্পণ করিয়াছি শ্রীহরি মননে,
আমি হরি নামের কাঙ্গাল হয়ে
ভ্রমিব মা এ ধরায়।

হরি প্রেম যদি আমি লভিগো জননি,
সে অমূল্য নিধি তোমায় দিব গো অমনি,
আমার এই দিনে আর, মা গো আমার,
দিবার কিছু নাই তোমায়।

৪

জন্মঋণ শোধিবারে নাহি গো শকতি,
কাতর প্রাণে এই কারণে করি মা মিনতি,
তোমার কৃপায় যেন, আমার প্রাণ
হরির প্রেমে মিশে যায়।

৫

পদতলে র'ল তোমার বধূ অবোধিনী,
দে'খো মা, ও কেঁদে যেন হয় না উন্মাদিনী,
তোমার বুকের আগুণ দ্বিগুণ হ'লো
পোড়ার উপর এই পোড়ায়।

৬

নিমাই ব'লে যদি কভু ডাক আমারে,
দেখিবে নিমাই তোমার প্রাণের মাঝারে,
আমি যেখানে সেখানে থাকি
বান্ধা রব তোমার পায়।

৺ কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর।

# তীর্থভ্রমণ

## হৃষীকেশ।

হরিদ্বার হইতে ১৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে হৃষীকেশ। সম্পূর্ণ পথই পদব্রজে গমন করা যায়। ইচ্ছা করিলে ঘোড়ার গাড়ীরও সাহায্য নেওয়া যাইতে পারে, তন্নিমিত্ত প্রশস্ত রাজপথ পড়িয়া আছে। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ যাইতে হইলে রেলপথে গমনাগমন করিবারও সুবিধা আছে। হরদোয়ার ষ্টেশন হইতে ১১ মাইল দূরবর্ত্তী 'হৃষীকেশ রোড্' নামক ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তথা হইতে চারিক্রোশ হাটিয়া গেলেই হৃষীকেশ। এতদিন পর্য্যন্ত রাস্তাটী কাঁচাই ছিল, বর্ত্তমানে পাকা করিবার আয়োজন চলিতেছে। 'হৃষীকেশ রোড্' অতিক্রম করিয়া হৃষীকেশের পথে কিয়দ্দূর চলিলেই সত্যনারায়ণ। স্থানটী বেশ সুন্দর। কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া তত্রত্য নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে স্থানটী স্বর্গীয় পবিত্রতায় অনুলিপ্ত বলিয়া মনে হয়। এস্থানে ধর্ম্মশালা আছে; যাত্রীদের অবস্থানের পক্ষে উহা বেশ শান্তিদায়ক। মন্দিরাভ্যন্তরে লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্ত্তি অতি সুন্দর। ততোঽধিক সুন্দর সমাগত ভক্তবৃন্দের ভাবোন্মাদনা।

সত্যনারায়ণ অতিক্রম করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে রাস্তার উভয় পার্শ্বে সমতল প্রান্তর ভূমি পরিদৃষ্ট হয়। ঐ সকল ভূমিতে শস্য রোপিত হয় না। অধিকাংশ স্থানই পতিত। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য পাদপ এবং স্থানে স্থানে অসংখ্য বদরী বৃক্ষ লক্ষীভূত হয়। পথিমধ্যে একটী পার্ব্বত্য নদী পার না হইয়া যাতায়াতের অন্য কোনও সুবিধা পাওয়া যায় না। নদীর উপর সেতু আছে। জল অল্প হইলেও ইহার স্রোত অত্যন্ত প্রবল। খুব সম্ভব ইহা শেষে গঙ্গার সঙ্গেই মিলিত হইয়াছে।

হৃষীকেশ হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থ স্থান। শব্দগত অর্থের মীমাংসা করিতে গেলে হৃষীকেশ শব্দে ইন্দ্রিয়ের রাজা বুঝায়। অমরকোষ অভিধানে আমরা বিষ্ণুর পর্য্যায়ে হৃষীকেশের নাম পাঠ করিয়াছি।

'দামোদরো হৃষীকেশঃ কেশবোমাধবঃ স্বভূঃ'।

ভক্তদের মুখে শুনিতে পাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই নাকি হৃষীকেশ' তিনিই ইন্দ্রিয়ের রাজা। পৃথিবীতে কেবল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাই তিনি হৃষীকেশ। তাই তাঁহার গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে গাহিয়াছেন—

"এবং শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতোঽবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যুপরুদ্ধ সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথা রসাশ্রয়াঃ॥"

(বঙ্গার্থ)—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৌমুদী-বিধৌত

শারদীয় রজনীতে গোপীগণ পরিবৃত হইয়া নিজের মধ্যে নিজ ইন্দ্রিয় বৃত্তি রুদ্ধ করতঃ কাল কাটাইয়াছেন।

"উদ্দাম ভাব পিশুনামল বল্গুহাস
ব্রীড়াবলোক নিহতো মদনোঽপি যাসাং।
সংমুহ্য চাপমজহাৎ প্রমদোত্তমাস্তা
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ॥"

(বঙ্গার্থ)—যে রমণীগণের উন্মাদনাপূর্ণ হাবভাবে এবং কুটিল কটাক্ষে স্বয়ং মদন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাদৃশ বরাঙ্গনাগণও ভাবভঙ্গীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়নিচয় বিকল করিতে পারে নাই। হৃষীকেশ শব্দের পৌরাণিক ব্যাখ্যার আমাদের প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি হৃষীকেশ স্থানটী সম্বন্ধে কেদার খণ্ডে যাহা যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

"হৃষীকেশেষু যঃ কশ্চিদ্ ব্রহ্মতীর্থেষু পুণ্যদ।
দৃষ্ট্বা শ্রীশরণং দেবং যাতি বৈ ভক্তিতৎপরঃ।
মুক্তিভাগী ভবেৎ সদ্যো নরনাথ ন সংশয়ঃ।
একরাত্রমপি স্থিত্বা নারায়ণ ময়ো ভবেৎ॥
যমুনা বা মহাভাগা পুণ্যতোয়া সরিদ্বরা।
তৎসঙ্গমে মহাতীর্থং প্রয়াগাৎ কোটি সংখ্যকম্
ধন্যানাং জন্ম নরানাং তত্র ভারত-খণ্ডকে॥"

হৃষীকেশ স্থানটী অতীব সুন্দর ও শান্তিপ্রদ, দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। হৃষীকেশ স্থানের সঙ্গমেও বোধ হয় ইন্দ্রিয়ের দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়। একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মনঃপ্রাণ বিমোহিত হয় বলিয়াই চিত্ত হইতে বিষয় বাসনা পরিহৃত হয়, সংসারে আর আসক্তি থাকে না।

নিকটেই একটা বড় বাজার। রাস্তা ঘাট গুলি প্রশস্ত ও বাঁধান। বাজার অতিক্রম করিয়া গেলেই ভাগীরথীর ভৈরবী মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হয়। কি ভীষণ শব্দ! কি ভীষণ বেগ! যেন দনুজদলনী রণোন্মত্তা রণচণ্ডী অভিনব আকারে হুহুঙ্কারে জগৎ কম্পিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা। নৈসর্গিক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পতিতপাবনী জননী ভীম রবে প্রধাবিতা। ভাবাবেশে মাকে ডাকিলাম,—'মা! তোমার এই সংহার-মূর্ত্তি কেন মা! তুমি পতিতোদ্ধারের জন্য ভূতলে অবতীর্ণা, কিন্তু তোমার এই সংহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া যে তাদৃশ ধারণা তিরোহিত হয়! গিরিরাজের গভীর গুহায় আবদ্ধ ছিলে বলিয়াই কি তোমার এত প্রচণ্ড কোপ! অথবা উভয় পার্শ্বের উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী তোমার গমন ও বিস্তৃতির পথে বাধা প্রদান করিতেছে বলিয়াই আজ তুমি সৃষ্টি ভাসাইতে উদ্যতা।' বস্তুতঃ গঙ্গার তত্রত্য স্রোত ও বেগ সন্দর্শনে মনে ভয়েরই সঞ্চার হয়। পর্ব্বত হইতে কোটি কোটি প্রস্তর খণ্ড এই খর-স্রোতে পড়িয়া পরস্পর সংঘর্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া শতাধিক মাইল চলিয়া আসিতেছে। এস্থানে ভাগীরথি-গর্ভ শুধু প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। মাটি বা বালুকা নাই বলিলেও চলে। জল এমন শীতল যে একবার মাত্র অবগাহন করিলে জননীক্রোড়স্থিত শিশুর ন্যায় জননীর বক্ষ ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না।

হৃষীকেশে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করেন এবং এস্থানে অনেক দেবমন্দির আছে। ঋষিকুণ্ডে স্নান করিয়া যাত্রিগণ পার্শ্বস্থ মন্দিরাভ্যন্তরে রাম জানকীর সুন্দর মূর্ত্তি সন্দর্শনে কৃতার্থ হয়। গঙ্গাতীরেই ঋষিকুণ্ড। ইহার জল কাল; বিশেষত্ব এই যে, সর্ব্বদাই এই জল নাত্যুষ্ণ ও নাতিশীতল। পাণ্ডাদের অভিমত ও ধারণা এই যে,এই ঋষিকুণ্ডের জলে যমুনার অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এস্থানে দুইটী বিমল-সলিলা নির্ঝরিণীর জল গিয়া সুরধুনীর পবিত্র সলিলে মিশিয়াছে। এস্থানে ভরতজীর সুবৃহৎ মন্দির এবং ভদ্রাকালী ও শিবের মন্দির উল্লেখ যোগ্য। বৃহৎ রাজপ্রাসাদ সদৃশ এস্থানে কয়েকটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা আছে। আমরা মহাত্মা বাবা কালীকমলীওয়ালা বাহাদুরের ধর্ম্মশালাতে আশ্রয় নিয়াছিলাম। বহুদূর বিস্তৃত বাড়ী; কোন কোন অংশে ত্রিতল প্রাসাদ। বন্দোবস্তও বেশ, নিম্নতলে অসংখ্য স্বতন্ত্র পাকশালা রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বাসস্থানের ঘর। দ্বিতলের উপরে পাক করিবার সুন্দর সুবিধা আছে। আমরা সকলেই দ্বিতলের কক্ষ ভাড়া করিয়াছিলাম। পাকস্থান ও বাসস্থান সেখানেই ছিল। ভৃত্যকে আদেশ করিবামাত্র সে প্রাঙ্গনস্থিত প্রকাণ্ড ইন্দারা হইতে উঠাইয়া পাকের জন্য কয়েক কলসী জল আনিয়া

দিল। অচিরকাল মধ্যে পাককার্য্য সম্পন্ন হইলে আমরা তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম। তীর্থের মাহাত্ম্যেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, খাদ্যসামগ্রী অমৃতময় বলিয়া বোধ হইল। যাত্রিগণ এস্থানে পাকের জন্য পিতলের হাড়ি, হাতা, থালা, সকলই ধর্ম্মশালাধ্যক্ষের নিকট পাইয়া থাকেন। অধিকাংশ যাত্রীর সঙ্গেই কম্বল আছে। যাহাদের সঙ্গে কম্বল বা অন্য কোনও সম্বল নাই, তাহাদিগকে ধর্ম্মশালা হইতেই জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে লেপ বা তোষক প্রদত্ত হইয়া থাকে। শয্যার নীচে পাতিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের পক্ষে খেজুরপাতার তৈয়ারী চাটাইর বন্দোবস্ত আছে। নিকটেই বাজার, বাজার হইতে চাল, ডাল, ঘৃত, আলু প্রভৃতি খরিদ করিয়া যাত্রীরা মনের আনন্দে পাক করিতেছে, গান গাহিতেছে, কেহবা ভোজন করিতে বসিয়াছে। সাধু সন্ন্যাসিগণ ধর্ম্মশালা হইতে বিনা ব্যয়েই রুটি প্রভৃতি আহার্য্য পাইয়া থাকেন। অন্যান্য আহার্য্য যাত্রিদের নিজ ব্যয়ে ক্রীত হইয়া থাকে। এত বড় একটা ধর্ম্মশালার কার্য্য কলাপের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া মনে বেশ আনন্দ অনুভব হয়। হাজারে হাজারে লোক আসিতেছে যাইতেছে। কেহ নীচে স্থান নিয়াছে, কেহবা সকলের অগ্রে দ্বিতল ত্রিতলের কক্ষ অধিকার করিয়া আছে। কেহবা স্থানাভাবে দ্বিতলের বারান্দায় এবং নীচের চত্বরে স্থান নিয়াছে। কোন কোন স্থানে যাত্রিগণ দল বাঁধিয়া নিজ নিজ আহার্য্য প্রস্তুতের বন্দোবস্ত করিতেছে। কেহ বাজারে যাইতেছে, কেহ জল তুলিতেছে। শিশুগণ জননীর ক্ষণিক অমনোযোগিতায় অস্থির হইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। মনে হয় যেন এক বিরাট যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে। এত লোকের মন যোগাইয়া সকলের সুবিধার দিকে সমভাবে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মচারিগণ যে এতাদৃশ সুশৃঙ্খলার সহিত কাজ চালাইতেছেন তাহা বস্তুতই প্রশংসার বিষয়। ব্যাপার দেখিলে মনোমধ্যে যেন স্বতঃই ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে।

ধন্য সেই মহাপুরুষগণ, যাঁহারা এই সকল অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। যতদিন জগতে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন হিন্দু তীর্থের নামশ্রবণে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল কীর্ত্তি লুপ্ত হইবার নয়। বদরিকাশ্রমের যাত্রিগণ এ স্থান হইতে বিনামূল্যে উদরাময়ের ঔষধ পাইয়া থাকে। আমরা যাইবার কালে তত্রত্য জনৈক ভৃত্যকে দুইটী পয়সা বক্‌সিস্ দিয়াছিলাম। ইহাতে তাহাকে ভারি খুসী দেখিতে পাইলাম।

সকলের অনুরাগ আকৃষ্ট হইবে আশা করিয়া এস্থলে একটী বৃত্তান্তের অবতারণা করিতেছি। চৈত্র মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে প্রপীড়িত হইয়া আমরা ঠিক দ্বিপ্রহরের পর ধর্ম্মশালাতে উপস্থিত হই। ক্ষণকাল নিম্নতলে বিশ্রাম করিয়া বাসস্থানের বন্দোবস্তের নিমিত্ত সঙ্গিগণকে সে স্থানে রাখিয়া আমি বরাবর ত্রিতলে উঠিলাম। সেখানকার এক ক্ষুদ্র কক্ষে জনৈক মাড়োয়ারী সপরিবারে বাস করিতেছেন। অন্য কাহাকেও কাছে দেখিতে না পাইয়া তাহাকেই আমাদের বাসস্থানের কিরূপ বন্দোবস্ত হইতে পারে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার ভাষায় আমি নিজে যেমন অভিজ্ঞ, তিনিও বোধ হয় আমার ভাষায় ঠিক সেইরূপ। আমার প্রশ্নের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গিনী একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের নির্দ্দেশ ক্রমে আমাকে নীচের দিকে যাইতে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিলেন। আমাদের তখনও স্নান হয় নাই। ভীষণ রৌদ্র মাথায় করিয়া দীর্ঘ আট মাইল রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছি। শরীর ছটফট করিতেছে, ক্ষুধায় সকলেই অস্থির হইয়াছি। মনে হইতেছে কতক্ষণে গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া শরীর জুড়াইব। আর কিছু বলিতে গেলাম না। সেই মুহূর্ত্তেই নীচে নামিবার সিঁড়িতে আসিলাম, ভদ্রলোকটী আমায় ডাক দিয়া ফিরাইলেন, পকেট হইতে একটী দু'য়ানি বাহির করিয়া আমাকে দিতে চাহিলেন। অনুমানে বুঝিতে পারিলাম যে উহাদ্বারা কিছু কিনিয়া খাই, এই ভাব প্রকাশে তিনি আমাকে উহা দান করিতেছেন। আমি উহা গ্রহণ করিতে অনভিমত প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে উল্লিখিত বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী সঙ্গীয় মাড়োয়ারীকে নিজ ভাষায় বলিল, "বাবুজী বোধ হয় পায়খানা কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।" আমি কথাটী স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম;

এবং অস্ফুট হাস্যে নীচে নামিবার পথ ধরিলাম। আবার সেই ভদ্রলোকটী আমাকে ডাকিলেন, আবার আমি ফিরিলাম। তিনি এবারও আমাকে দু'য়ানিটী দেওয়ার জন্য ব্যগ্র হইলেন। আমার তাৎকালিক আকৃতি দেখিয়া তাঁহার বোধ হয় সম্পূর্ণ ধারণা হইয়াছিল যে আমি ক্ষুধায় কাতর, এবং এই সময় আহার্য্য ভিন্ন আমার আর কিছু প্রার্থনীয় নাই। আমি পুনঃ পুনঃ হাব ভাব ও ভঙ্গীদ্বারা অনভিমত প্রকাশ করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। অদূরবর্ত্তী কোনও কক্ষে হিসাব পত্র জমাখরচ প্রভৃতির কাগজাত লইয়া কয়েকজন কর্ম্মচারী উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সেরেস্তায় যাইয়া তাহাদের নিকট আমাদের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিলাম। তাহাদের তত্ত্বাবধানে আমাদের বাসস্থান ও পাকস্থান দ্বিতলেই নির্দ্দিষ্ট হইল।

সঙ্গীদের নিকট মাড়োয়ারী-বিভ্রাট জ্ঞাপন করিতে বিলম্ব হইল না। ভাষার অনভিজ্ঞতাই এই বিষম বিভ্রাটের কারণ। মাড়োয়ারী তাঁহার মাতৃভাষা ভিন্ন কিছু জানে না, আমিও তাহার ভাষায় দক্ষ ছিলাম না। কিন্তু ধন্যবাদ তাঁহার মহত্বকে। আমাকে সম্পূর্ণ বাবুর সাজে সজ্জিত দেখিয়াও, মূল্যবান কোটের উপর ঘড়ী চেন্ ঝুলান দেখিয়াও, যে দুই আনার পয়সা দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার মহদন্তঃকরণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে কয়জন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ক্ষুধা নিবারণ করিতে অগ্রসর হয়? কয়জন বাঙ্গালী এমন আছেন, যিনি পকেটে পয়সা থাকা সত্বেও সমাগত একজন ক্ষুধিত পিপাসিত ব্রাহ্মণকে বা দরিদ্রকে একটী পয়সার অতিরিক্ত প্রদান করেন? এইখানেই অন্তঃকরণের পরিচয়, এইখানেই উচ্চ ও নীচের পার্থক্য।

## লছ্মন্ ঝোলা।

আমরা শিশুকাল হইতেই লছমন্ ঝোলার নাম শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু উহা যে একটা কি পদার্থ বা কি বিষয়, তাহা কখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। যদি আজ লছমন্ ঝোলার দর্শনার্থী হইয়া এস্থানে না আসিতাম, তবে আজ পর্য্যন্ত উহা বুঝিবার জন্য যত্ন করিতাম কিনা সন্দেহ।

লছমন্ ঝোলা ভাগীরথীর উপর একটী সেতু। যে স্থানে এই সেতুটী গঙ্গার উপর বিলম্বিত, বর্ত্তমানে সেই স্থানটীও লছমন্ ঝোলা নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। লছমন্ ঝোলা হরিদ্বার হইতে ১৭ মাইল ও হৃষীকেশ হইতে ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। উভয় পার্শ্বে অভ্রভেদী পাহাড়, আর মধ্যস্থল দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা অতিক্রম করিয়া গেলেই বদরিকাশ্রমের পথ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই ঝোলা রজ্জু বিনির্ম্মিত ছিল। সেই সময় এই ঝোলার সাহায্যে গঙ্গার পরপারে যাইতে অনেক যাত্রীর প্রাণনাশ হইত, কাজেই তখন বদরিকাশ্রমের পথ ধরিতে যাত্রিদিগকে সমধিক বেগ স্বীকার করিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ে মহাত্মা বাবা কালীকমলীওয়ালা বাহাদুর ঐ স্থানে বহু অর্থব্যয়ে একটী লৌহসেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তীর্থকামীদের স্বর্গগমনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন এবং নিজেও অলক্ষিতে অক্ষয় স্বর্গলাভের পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। চন্দ্রবংশীয় নরপতি মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে এই পথ বাহিয়াই 'মহাপ্রস্থানে' যাত্রা করিয়াছিলেন। পাণ্ডুতনয়গণ হৃষীকেশ হইতে বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক সেস্থানে কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়া অভীষ্ট পথে অগ্রসর হন। পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির নিজ পুণ্যবলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন। রজ্জুবিনির্ম্মিত সেতুটী পূর্ব্বে কিরূপ ছিল এবং বর্ত্তমানেই বা কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এস্থানে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিলে পাঠকদের বিরক্তি জনক হইবে না বলিয়া আশা করি।

পূর্ব্বে ভাগীরথীতীরস্থিত পর্ব্বতগাত্রে একটী শক্ত পোতা ছিল। ঐ খুঁটি পর্ব্বতের উপরিদেশে ৩।৪ হাত পরিমাণ পুঁতিয়া উহার মূলদেশে মোটা একটা দড়ির এক প্রান্ত বাঁধিয়া অপর প্রান্ত বরাবর অন্য পারের আর একটি খুঁটির গোড়ায় টানিয়া বাঁধা হইত। আবার প্রথম খুঁটি হইতে অল্প ব্যবধানে আর একটী খুঁটি ঐভাবে পুঁতিয়া এবং অপর একটী মোটা দড়ির একপ্রান্ত পূর্ব্ব বর্ণিত দড়িটীর মত অপরতীরস্থ অন্য একটী খুঁটির মূলদেশে বাঁধিয়া দেওয়া হইত।

তখন সেই নদীর উপরে সমান্তরাল ভাবে লম্বমান রজ্জু দুইটীতে বাঁশের মইতে যেমন কোয়া বা পাঁটী লাগান থাকে ঠিক সেইরূপ পাঁটী এক এক পা ব্যবধানে বাঁধিয়া দেওয়া হইত। এক পাঁটি হইতে অন্য পাটীর ব্যবধান-টুকুতে ফাঁক থাকিয়া যাইত। মোটামুটি বলিতে গেলে তখনকার ঝোলা নদীর এপার ও অপর পারে পাতিত একটি দড়ির মুখ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। বর্ণিত খুঁটি চতুষ্টয়ের কয়েক হাত উচ্চে আরও দুইটি দড়ি পূর্ব্বের মত বাঁধা থাকিত, যাত্রিগণ ঐ দড়ি ধরিয়া শরীরের ভার ও কেন্দ্র ঠিক রাখিয়া চলিত। অনেক সময় যাত্রিগণ সেতুর উপর দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই উহা দুলিতে আরম্ভ করিত। অনভ্যস্ত যাত্রিগণ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই ঝোলার দোলনে দুলিতে থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পদচ্যুতি ঘটিত, তখন প্রাণভয়ে অনেকেই ধৃতরজ্জুর সাহায্যে গঙ্গার উপর ঝুলিতে থাকিত। নিম্নে খরস্রোতা জাহ্নবী, পদদ্বয় নিরাশ্রয়, প্রাণে গভীর আতঙ্ক, শরীর আড়ষ্ট, হাত পা অবশ, অনেকের শিথিল হস্ত রজ্জু হইতে নিমেষে স্খলিত হইয়া যাইত; সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার প্রবল স্রোতে পতন ও চির নির্ব্বাণ প্রাপ্ত। তৎকালে এই দড়ির ঝোলা পার হইতে বহু যাত্রীর জীবন নাশ হইয়াছে। ঝোলার মধ্যস্থল পর্য্যন্ত গমন করিয়া অনেকেই মাথা ঠিক রাখিতে পারেন নাই। নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে মাথা ঘুড়িয়া গিয়াছে। সেই দড়ির ঝোলাও আবার প্রথমাবস্থায় এতাদৃশ পরিপাটিরূপে বাঁধা ছিল না। ইহা পার্ব্বত্য লতার ঝোলার উন্নত সংস্করণ। ভগবান শঙ্করাচার্য্য দড়ির ঝোলা নির্ম্মাণের পূর্ব্বে লতার ঝোলা পার হইয়াই বদরিকাশ্রম গিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা লৌহ সেতুতে পরিণত হইয়াছে। যাত্রীদিগেরও প্রাণনাশের আতঙ্ক তিরোহিত হইয়াছে। সেতুটি ৩।৪ হাত প্রশস্ত, উপরে লোহার শিকল দোদুল্যমান, ২০।২৫ হাত নিম্নে ভাগী-রথী। পূর্ব্বে সেই সেতু আরও উচ্চে ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

লছমন্ ঝোলা দেখিবার জন্য আমরা কয়েক জন অপরাহ্নকালে হৃষীকেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। কি যেন একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। আনন্দ সাগরে মগ্ন থাকিয়া আমরা পার্ব্বত্য পথ পর্য্যটন-জনিত কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশও অনুভব করিতে পারি নাই। হরিদ্বার স্বর্গের দ্বার, আর ইহাই ব্রহ্মলোকের পথ। প্রকৃতির লীলাভূমি এই পথ বাহিয়া আমারা গঙ্গার বাম কূল দিয়া পার্ব্বত্য পথে চলিতে লাগিলাম। এখানে নগরের জন কোলাহল নাই, নানাদেশীয় লোকের জনতা নাই। প্রকৃতি এখানে গিরি নদী বন উপবন পরিশোভিতা। কোথাও স্বচ্ছ সলিলা নির্ঝরিণী তরতর বেগে প্রধাবিতা, কোথাও বা লতা পুষ্প পরিবেষ্টিত তরুনিচয় বনরাজি উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজমান। বিহঙ্গকুলের মধুর নিনাদ বহন করিয়া গঙ্গাশীকর-সিক্ত মন্দপবন দিকে দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। বন্য পশুগণ নির্ভয় চিত্তে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছে। সকলেরই যেন সৃষ্টিকর্ত্তার পবিত্র সৃষ্টি ঘোষণা করিয়া আনন্দিত। এস্থানে নগরের ইংরেজী বাদ্য শ্রবণে কর্ণ বধির হয়না, প্রত্যুত গঙ্গার অব্যক্ত কল কল নিনাদে শ্রুতিতে অমৃতধারা বর্ষিত হয়। অমৃত ধারা পানে শ্রুতি যুগলের তৃপ্তি নাই, পানের সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি। সে নিনাদ যতই শুনি ততই শুনিতে ইচ্ছা হয়; তীর্থের মাহাত্ম্য যতই ভাবি, ততই মনঃপ্রাণ ভগবৎ প্রেমে মজিয়া যায়। এক একবার মনে হয়, ভগবানের এই বিশালরাজ্যে আমি কে? গঙ্গাগর্ভের একটী ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডও যে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ। গঙ্গাতীরের পশু পাখীগণও যে আমার মত মনুষ্য অপেক্ষা অনেক পুণ্যবান। মরুভূমির ক্ষুদ্র বালুকা কণা হইতেও ছোট আমি, বিশাল জলধরের এক বিন্দু জল হইতেও ছোট আমি, সংসারে কিসের অহংকার করি? মানের না জ্ঞানের? কিসের মান, কিসের জ্ঞান! অগাধশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিতাগ্রণীর বিদ্যাবত্তা, রাজাধিরাজের প্রভুত্ব এস্থানে এক নিমিষে টুটিয়া যায়। ধর্ম্মরাজ্যে প্রভুত্ব কাহার? একমাত্র জগৎ-প্রভু ভিন্ন সংসারে প্রভুত্ব করিবার আর কেহই নাই। তিনিই সব, সবেই তিনি।

ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। আনন্দে বিভোর

হইয়া পথকষ্ট ভুলিয়া গিয়াছি। নিম্নে পূতসলিলা গঙ্গা, উপরে অন্তহীন সুনীল নভোমণ্ডল, মধ্যস্থলে উন্নত-শৃঙ্গ পর্ব্বত নিচয় সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। তীর হইতে পর্ব্বতের মূলদেশ পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে যে সকল স্থান বনজঙ্গল শূন্য পরিদৃষ্ট হয় সেই সমস্ত স্থানে মুনি ঋষিদের শত শত পর্ণকুটির। গঙ্গার উভয় তীরের সমস্ত রাস্তা ব্যাপিয়া অগণ্য পর্ণকুটির নয়ন পথে পতিত হয়। মহাতপা ঋষিগণ স্ব স্ব কুটিরে বাস করিয়া সেই দুর্লভ অমূল্য নিধির চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের মনে আর পার্থিব নিধির চিন্তা নাই। কামিনীকাঞ্চনের কামনা বিরহিত হইয়া তাঁহারা সেই অকাম কামনীয় পুরুষকে লাভ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। দূর হইতে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির সমধিক সুন্দর দেখায়। জীর্ণ পর্ণকুটির ব্যতীত জীর্ণকায় তাপসদের অন্য কিছু সম্বল নাই। কেহ কেহ কুটিরের অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত গহ্বরে উপবেশন করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় রত, কেহ বা কানন-পরিবেষ্টিত লতাগুল্ম সমাচ্ছন্ন প্রদেশে যোগাসনে সমুপবিষ্ট; আবার কেহ গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে পতিত প্রকাণ্ড উপল খণ্ডে উপবেশন করিয়া মুদিত নয়নে ধ্যানে নিমগ্ন। কোন কোন সন্ন্যাসীকে পত্রনির্ম্মিত কুটিরের পরিবর্ত্তে প্রস্তর বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে দেখিলাম। শিষ্যসেবক চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছে, সন্ন্যাসী ঠাকুর ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। কোথাও নির্জ্জনতার ব্যাঘাত অনুভব করিতে পারিলাম না। সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত। বস্তুতঃ তপস্যার নিমিত্ত এতাদৃশ নির্জ্জন ও পবিত্র স্থানই প্রশস্ত। আমরা পার্ব্বত্য কানন পথে সাধুসেবিত আশ্রম সকল অতিক্রম করিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই আমাদের মনও যেন এক আনন্দ রাজ্যের দিকে ছুটিয়া চলিল। কখনও অনুমান হয় গঙ্গা বুঝি সম্মুখস্থ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে, কিন্তু নিকটে গিয়া দেখি উহা কিছুই নহে। পর্ব্বত বহুদূরে এবং গঙ্গা ইহার পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিতা মাত্র। কোথাও বায়ুপ্রবাহে বনজকুসুমের সুবাস চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। বিলাতী এসেন্সও ইহার নিকট পরাভূত। কোথাও ময়ূর ময়ূরী বৃক্ষ শাখায় পুচ্ছ বিলম্বিত করিয়া আকালিক কেকারব করিতেছে, কোথাও বা বন্যকুক্কুটের দল ছুটিয়া বেড়াইতেছে। আবার কোথাও নির্ভীক বন্য হরিণগণ 'গ্রীবাভঙ্গাভিরাম' হইয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিয়াছে। একস্থানে বানরযুথ কুকুর দলের সঙ্গে মিশিয়া একত্র খাদ্যান্বেষণে ব্যস্ত। মনে হইল হিংসা যেন এই স্থান হইতে দূরে পালাইয়াছে। বানর ও কুকুরের মিশামিশি এই আমি প্রথম দেখিলাম। দেখিয়া ভাবিলাম এই স্থান কি সুন্দর ও কি পবিত্র। এখানে গ্রাম্য দলাদলি নাই, সীমানা নিয়া তর্কবিতর্ক নাই, ফৌজদারীর লাঠালাঠি নাই, শত্রুতাজনিত বাক্‌বিতণ্ডা নাই, মামলা মোকদ্দমার জন্য জজ হাকিম ম্যাজিষ্ট্রেট নাই। আছে শুধু স্বর্গীয় পবিত্রতা ও বিমল শান্তি। এ স্থানের পাখীগুলিও স্বর্গীয় সুরেই গান গাহিয়া থাকে। ক্ষণে ক্ষণে যখন দলে দলে পাখী গাহিয়া উঠে, প্রকৃতই তখন উহাদের গানে ভগবৎ প্রেমরসের সঞ্চার হয়। যে গান শ্রবণ করিলে আর কখনও লক্ষ্ণৌর বাই বা মদন মাষ্টারের কথা মনে আসে না।

পর্ব্বতগাত্রে আরোহণ করিতে করিতে কখনও দেখি গঙ্গা অনেক নীচে পড়িয়া আছে, আবার যখন অবরোহণ করিতে থাকি তখন দেখি আমরা ঠিক গঙ্গা সৈকতে উপস্থিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রায় দুইঘণ্টা পর আমরা আসিয়া লছমন্ ঝোলায় উপস্থিত হইলাম। এস্থানে একটী ধর্ম্মশালা ও দুই একটী মিঠাইর দোকান আছে। সেতুর নিকট সুন্দর একখানা মন্দিরে লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তি। নিম্নে ধ্রুবঘাটে যাত্রীরা স্নান করিয়া থাকে। এস্থল হইতে বদরিকাশ্রম সোজা রাস্তায় ১৬৬ মাইল। ঝোলা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া আমরা কৃতার্থ মনে করিলাম। যাঁহার কৃপায় এই বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যথাসময়ে সে স্থান হইতে বাসাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ ভাগবতশাস্ত্রী।

## "সারনাথ দর্শনে"

খনিত্র আঘাতে ভাঙ্গি মৃৎপিণ্ড কবিল,
হাসিতে হাসিতে যবে বৃদ্ধ প্রত্নতত্ব,
দেখাইলা বিস্মিত জগতে সিদ্ধার্থের
সিংহাসন, বৌদ্ধকীর্ত্তি লুপ্ত সারনাথ,—
পুরাকীর্ত্তি রক্ষয়িত্রী-ধাত্রীর ভবনে
দেখিলাম সুরক্ষিত বুদ্ধাস্থিপঞ্জর :
অশোকের সিংহস্তম্ভ কল্পিত মর্ম্মরে,
প্রস্তরের কোলে সুপ্ত প্রশান্ত বিগ্রহ
লক্ষ লক্ষ বোধিসত্ব, যুগ অবতার,
করুণার পারাবার পাষাণে উছলে।
শিখাইতে আত্মতত্ব বিস্মৃত মানবে,
মাতা পিতা পুত্র পত্নী রাজ্যধন ত্যজি ;
বড়ভাগ্য জগতের ! লইলা সন্ন্যাস।
মার-দর্পচূর্ণকারী বজ্রাসনে বীর
ধ্যানমগ্ন জগতের কল্যাণ চিন্তায়,
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত দীপ্ত আত্ম-প্রতিভায়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

## নাদ-বিন্দু

এস ভদ্র ! আর্দ্র ! অভিরাম !
এস আমার নীলাব্জ-নীল
কাজলকালঠাম !
এস প্রাণারাম !
তুমি যে ভাই বনের কানাই
মনের কথা তাইসে জানাই
ওহে ঘনশ্যাম !
এস আকুলকরা নাম !

এস,
নব ছন্দ—মন্দ্র মন্দ !
আনন্দ ! আরাম !
ঝারি ভরি' শান্তিবারি
ঢালো অবিরাম !
ম্লান মৃতে কর মন্ত্রপূত
হে আষাঢ় !—বরষার দূত !
রামগিরি কেঁদে হলো সারা,
শুষ্কপ্রাণে ঢালো ত্বরা
পুষ্করের ধারা—
সঞ্জীবনী পারা !
ভাণ্ড ভরি নিয়ে এসো সুধা
পূর্ণ কর নীলাম্বর !
ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুধা !
তৃণবীথি শীর্ণ অতি
জীর্ণ বনস্পতি,
"সুধা" বলে—দাবানলে
দাও যজ্ঞাহুতি !

সখা,
দাও দেখা--ভুখা বসুন্ধরা,
বাগে বাগে জাগে আজি
যযাতির জরা ;
কূলে কূলে তরুমূলে
অমৃতের ঝরা
ঢেলে দাও ত্বরা।
ওগো কেলেসোণা !
ধন ধান্যে ধন্য কর বোনা,
ফলে ফুলে ভরে দাও
কাননের কোণা !
ওগো গোকুলের প্রিয় !
তোমার স্নেহ-পরশ দিয়ে সব
সবুজ করে দিও,

অই,
আগমনী বাজে—ঝি-ঝি-ঝি-ঝি,
কলতানে—জলগানে

মর্ত্ত্যে এস নামি'
ওহে আর্ত্তত্রাণ!
আনন্দবিন্দু—নব সমাচার
নিয়ে এস
হে বন্ধু আমার;
পুণ্যরসে পূর্ণ কর প্রাণ।

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

## শান্তির গীতি

যে দিন মোদের গরিমা পূরিত ধন্য নৃপতি বীর,
ঘোষেছিল ওগো! ভীষণ যুদ্ধ পুণ্য বৃটন বীর;
লক্ষ লক্ষ সৈন্য চলিল যে দিন দর্পে অরির মাঝে,
বক্ষে ধরিয়া অটল শপথ সজ্জিত বীর-সাজে;
সেই দিন আজি এসেছে ফিরিয়া চমকি সর্ব্ব চিত্ত,
যে দিনের কথা হৃদয়ে জাগিছে রাত্রি দিবস নিত্য।
একটী বর্ষ অতীত যদিও হল না যুদ্ধ শেষ,
এ ভেবে তোমরা হৃদয়ে রেখ না একটু দুঃখ লেশ।
বিজয়-মাল্যে ভূষিত কণ্ঠ হইবে মোদের রাজ,
সূর্য্য যাঁহার অস্ত যায় না কখনও রাজ্য-মাঝ।
মিত্র যাঁহার ইটালি-ফ্রান্স রুষিয়া বিপুল-শক্তি,
অর্দ্ধ ধরণী যাঁহারে করে গো হৃদয়ের সাথে ভক্তি।
রক্ত-তটিনী অনেক বয়েছে ধরণীর গেছে কান্তি,
এবার আসিবে জগতে শীঘ্র ইপ্সিত মধু শান্তি।

শ্রীচারুভূষণ দেব।

## মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

**প্রবাসী**, আষাঢ়, ১৩২২ ;—মুখপত্রে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত "বন্দিনী" নামক চিত্র। বংশদণ্ডোত্থিত তাঁবুর নিম্নে অবগুণ্ঠনাবৃতা একটী স্ত্রীলোক উপবিষ্টা, সম্মুখে একটি লণ্ঠন ঝুলিতেছে। চতুর্দ্দিকে যে কি, তাহা ঠিক বোধগম্য হইল না,—উহা ধূম্রকুণ্ডলীও হইতে পারে, পর্ব্বতশিখরাবলীও হইতে পারে, নৃত্যশীল ভূতপ্রেতও হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক কবিতাবলী এবং বঙ্গীয় শিল্পীগণের চিত্রাবলীর বিশেষত্ব এই যে, যেটি যত অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য, সেটি ততই উচ্চ দরের। কবিতার যদি অর্থই বোঝা গেল, এবং ছবিতে যদি কোন স্পষ্ট ভাবই পরিস্ফুট হইল, তবে ত তাহা সংবাদপত্র মহলে কলিকা পাইবার উপযুক্তই নহে। এই শ্রেণীর ছবিগুলি যদি অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া ক্রমশঃ নিরাকার হইয়া যায়, তবে পাঠকবর্গ অনেকটা সোয়াস্তি বোধ করিবেন, সন্দেহ নাই। ছবিখানা কি বন্দিনীর ভৌতিক দেহের, না তাহার ছায়ামূর্ত্তি, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

"বিবিধ প্রসঙ্গে" প্রতিমাসেই দেশের ও সমাজের কল্যাণকর বহু সারগর্ভ আলোচনার অবতারণা হইয়া থাকে। এ সমস্ত বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। দেশে শিক্ষাবিস্তার প্রসঙ্গে প্রবাসী-সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"দেশের সমুদয় বালক বালিকা-দিগকে শিক্ষা দেওয়া অন্যান্য দেশের গভর্ণমেণ্টের ন্যায় আমাদের দেশেও গভর্ণমেণ্টেরই কাজ।" দেশের শিক্ষার ভার অন্যান্য দেশবাসিগণ গভর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এ সংবাদ তিনি কোথায় পাইলেন? অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হার্ভার্ড প্রমুখ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোনটাই গভর্ণমেণ্টের সৃষ্ট কিংবা তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত নহে। অন্যান্য দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ বলা যাইতে পারে। যতদিন আমাদের নিজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা আমাদের জাতীয় আদর্শানুযায়ী না হইবে ততদিন আমাদের ছেলেমেয়েরা মাতৃস্তন্যবঞ্চিত, ধাত্রীপালিত শিশুর ন্যায় দুর্ব্বল থাকিবে।

"স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কি করা উচিত", তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, বহু বৎসরাবধি গভর্ণমেণ্ট প্রজাসাধারণের নিকট হইতে পাব্লিক্ ওয়ার্ক্স্, সেস্ ও রোড্সেস্ বাবদ কোটি কোটি টাকা আদায় করিয়া তাহা "আইনের অনভি-

প্রেতরূপে" ব্যয় করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট সুদসমেত সেই টাকা ফেরত চাহিয়া তদ্দ্বারা সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় নিজেই আবার এই অসমসাহসিকতা বুঝিতে পারিয়া পরক্ষণেই লিখিয়াছেন, "পরামর্শ দিলেই বা রাষ্ট্রীয় শক্তিহীন জনসাধারণের পরামর্শ কে গ্রহণ করিবে ?" আমরা যে উল্লিখিত অর্থ ফেরত চাহি না, তাহা বলিতেছি না। প্রবাসী সম্পাদক সুদসমেত চাহিয়াছেন, আমরা গভর্ণমেণ্টকে সুদ 'রেহাই' দিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত আছি। আমরা বলি, এই অসম্ভব আবদার ছাড়িয়া দিয়া আরও এক 'খাট' নামিয়া সুর বাঁধুন,-- তাহা হইলে হয়ত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। "বিজিত ও বিজেতা" শীর্ষক আলোচনার উপসংহারটুকু ভারতীয় বিভিন্ন জাতির একতা সাধন করিয়া একটা মহাজাতি গঠনে সাহায্য করিবে, সন্দেহ নাই। এমন একটা গভীর আত্মসম্মানের ভাব ইহাতে আছে যে, তাহা পাঠে প্রকৃতই হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। "হিন্দুদের কাছে মুসলমানেরা কি শিখিয়াছিলেন", তাহা আমরা বলিব না। মুসলমানেরা যদি হিন্দুদিগকে শ্রদ্ধা করিতে চান,ত, তাঁহারা ইহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবেন। * * * ভারতবাসী সকল সম্প্রদায় পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে না পারিলে কাহারও মঙ্গল নাই। যিনি অপরকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন না, তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধোগতি হইবে। * * * কোন সম্প্রদায়ই অপর সম্প্রদায়ের উন্নতিতে সম্পূর্ণ বাধা দিতে পারিবেন না; এবং অপরকে বাদ দিয়াও কাহারও সম্পূর্ণ উন্নতি হইবে না। যখন উভয়েরই সামাজিক অবস্থা সমান তখন কাহার পূর্ব্বপুরুষ কখন হাতী চড়িয়া বেড়াইতেন, তাহার আলোচনায় কোন লাভ নাই।" "সমালোচনায় সাদা ও ও কালো" শীর্ষক প্রসঙ্গে প্রবাসী-সম্পাদক যেন নিজের ব্যক্তিগত প্রশ্ন লইয়া কাহারও কাহারও প্রতি প্রচ্ছন্নভাবে শর নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"অনেক স্থলে, প্রকাশ্যভাবে বা গোপনে, ইহা বিবেচিত হয় যে, লেখক বা সম্পাদক কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী বা কোন্ দলের ? অমুক ব্যক্তি আমাদের সম্প্রদায়ের লোক নয়, অতএব তাহার কাগজে লিখিও না, বা তাহার বহি অপাঠ্য, এরূপ কথা সভায় বৈঠকে শোনা গিয়াছে।" সম্পাদক মহাশয় যখন হাটের মাঝেই হাঁড়ি ভাঙ্গিলেন, তখন দু'একটা কথা বলিলে বোধ হয় নিতান্ত অন্যায় হইবে না। ধর্ম্মবিশেষ-ভুক্ত কতিপয় সম্পাদকই কি এই সঙ্কীর্ণ ভাবের জন্মদাতা নহেন ? পরের ছিদ্রান্বেষণের পূর্ব্বে নিজেদের ত্রুটি সংশোধন করা কি ভাল নয় ? সাহিত্যরথীদের কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য লেখকবর্গের প্রবন্ধ নির্ব্বাচন কালে সম্পাদকগণও যে সম্প্রদায় ও দেশগত গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারেন, এমন বিশ্বাস অধিকাংশ লেখকেরই নাই। প্রবাসী-সম্পাদকও যে তাহা অনুভব করিতেছেন, আলোচ্য প্রসঙ্গের অবতারণাই তাহার প্রমাণ। এইরূপ অপ্রীতিকর ভাব-সৃষ্টির মূল কি, নিরপেক্ষভাবে তিনি তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি ?

বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় "ইতিহাসের ক্রম" শীর্ষক প্রবন্ধে ইতিহাসের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সুপাঠ্য হইলেও ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের কিছু অভাব বোধ করিলাম। শ্রীমতী শান্তা চট্টোপাধ্যায়ের গোলকধাঁধার চিত্রগুলি ছোট ছেলে মেয়েদের বেশ কৌতুহল উদ্দীপন করিবে। ভূরিভোজনের পর চাট্নীও চাই। শ্রীযুক্ত আমানত উল্লা আহম্মদের "উত্তর বঙ্গে পীর-কাহিনী" সুললিত প্রবন্ধ। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের ইস্লাম ধর্ম্মের প্রচার এই পীরগণ কর্ত্তৃকই সাধিত হয়। বঙ্গের মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাসে ইঁহাদের স্থান অতি উচ্চে, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, অস্মদ্দেশীয় ঐতিহাসিকবর্গের দৃষ্টি এদিকে বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। আলোচ্য প্রবন্ধে বিষয় নির্ব্বাচন শক্তি ও সংগ্রহ-কুশলতা পরিস্ফুট হইয়াছে, এবং ভাষাও মার্জ্জিত; কিন্তু, পীরগণের বিবরণসমূহ অতি সংক্ষিপ্ত। আশা করি, লেখক ইঁহাদের সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রবন্ধান্তর্গত খাজা খেজেরের প্রতিমূর্ত্তিখানা প্রাচীন মোগল চিত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে; ইহা অতি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য জিনিষ। শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী লিখিত "আয়ুর্ব্বেদের

ইতিহাস" প্রবন্ধে কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনের প্রত্যক্ষ শারীরের উপোদ্ঘাত ভাগ হইতে কবিরাজি বিদ্যার কিঞ্চিৎ ইতিহাস সংকলন করা হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের নিকট কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য হইলেও ইহা আয়ুর্বেদজ্ঞগণের উপভোগ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এইরূপ সংকলন পাঠকবর্গের হৃদয়ে মূল গ্রন্থ পাঠে উৎসাহ বৃদ্ধি করে। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "অবিচার" প্রবাসীর তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত একটি ছোট গল্প। গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে মামুলী প্রেমকাহিনী নাই, হেঁয়ালী নাই, এবং ইহা অনুচিতরূপে দীর্ঘ নহে। লেখক অল্প কথায় বেশ একটি স্নেহের জীবন্ত চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; পাঠে মর্ম্মবীণায় একটি গভীর করুণ সুর বাজিয়া উঠে, এবং শোকতপ্ত বৃদ্ধ হরিহরের জন্য মনটা সমবেদনায় আপ্লুত হয়। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর "শ্রীবিক্রমপুর ও তাহার উপকণ্ঠ" আশানুরূপ নূতন তথ্য প্রদান করে নাই, প্রবন্ধের অধিকাংশ উপকরণই পুরাতন। তিনি পদে পদে বিচার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই প্রমাণাভাবে আমাদের নিকট ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। তিনি "বজ্রপ্রমাণের" সহায়তায় রামপালের নানা অংশে বিভিন্ন রাজবংশের রাজধানী আবিষ্কার করিবার যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও তাঁহার অনুমান-প্রসূত। ইহার সমর্থনার্থ কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে তিনি পারেন নাই। বিক্রমপুর লইয়া এই টানাটানির দিনে আরও ভাল মাজর চাই। ভট্টশালী মহাশয়ের বিক্রমপুর সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। মাতৃভূমির রক্ষার্থ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের "অজন্তা গুহার চিত্রাবলী" অতি চিত্তাকর্ষক। প্রবাসী এই চিত্রাবলী ছাপিবার বন্দোবস্ত করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। "হারামণি"তে প্রতিমাসে অখ্যাত প্রাচীন কবিগণের উৎকৃষ্ট সঙ্গীতাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রতিমাসে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র "প্রতিভা" এই সংগ্রহকার্য্য বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করিয়াছেন। প্রবাসীও ইহা প্রবর্ত্তন করিয়া অনেক লুপ্তপ্রায় রত্ন উদ্ধারের উপায় করিয়াছেন। এবারে প্রকাশিত গান দুইটীও অতি গভীর ভাবব্যঞ্জক ও মর্ম্মস্পর্শী। "পুরাবৃত্ত আলোচনা"তে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ "ধীমান ও বীতপাল" নামক প্রথম প্রস্তাবে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির বিজ্ঞানানুমোদিত ইতিহাস রচনা প্রণালীর ব্যতিক্রম প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল কুমার যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ পত্রস্থ করিয়াছেন। "বৌদ্ধধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল" নামক দ্বিতীয় প্রস্তাবে "নারায়ণ" পত্রিকাতে প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত "বৌদ্ধধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে কতিপয় বিষয়ের প্রতিবাদ পত্রস্থ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যব্যঞ্জক। মনীষীবর্গের এইরূপ আলোচনা দ্বারা প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারিত হউক, ইহাই সকলের অভিপ্রেত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্তের "বাজারদর ও বর্ত্তমান সমস্যা" একটি সুচিন্তিত আলোচনা। এ সমস্যা যদিও ঘরে ঘরে, তথাপি ইহার সমাধানের জন্য আমাদের দেশের অতি অল্প মনীষীই মস্তিষ্ক চালনা করেন। এইরূপ আলোচনা দ্বারা দেশের জনসঙ্ঘের কল্যাণ হইবে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৪ সনের নোবেল বৃত্তি ভোগী ফরাসী কবি মিস্ত্রালের চারিটী কবিতা বাঙ্গালা কবিতায় ভাষান্তরিত করিয়াছেন। এইরূপ অনুবাদ দ্বারা তিনি মিস্ত্রালের গৌরব, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কবিত্বের খ্যাতি, উভয়ই ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। কবিতায় ভাবের অভিব্যক্তি, ভাষার শ্রী, ছন্দের লালিত্য, কিছুই নাই। অনুবাদে মূলের ভাব রক্ষা করা শক্তিমত্তার পরিচায়ক। মিস্ত্রালের মূল কবিতা ফ্রান্সের অন্তর্গত প্রভেন্সের প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত, সুতরাং, আমাদের পক্ষে অনধিগম্য। সত্যেন্দ্র বাবুও বোধ হয় ইউরোপীয় ভাষায় উহার কোন অনুবাদ অবলম্বনে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, সুতরাং "সাত নকলে আসল খাস্তা" হইয়াছে। আধুনিক কবিগণ বেওয়ারিস বঙ্গভাষার মালিক, তাঁহারা যাহা লেখেন, তাহাই আর্ষপ্রয়োগ; তাহার উপর কথা চলে না। ভাষার নমুনাস্বরূপ কয়েকটি অভিনব শব্দ উদ্ধৃত করা গেল। যথা:—'নিশ্চুপেরি বাণী', 'বোমো চাঁদির থান', 'ভাব-কদম্বের মিলন', 'রাইয়ৎ-রাজের রাজ্যে', 'কাউ-বনায়

না আর',

　　'তোমার পরশ-মধু মনের মিত:!
　　কি যে বলিব কি তা'?
　　বুঝি নিধি-সবিতা!

কবিতার উপরোদ্ধৃত কথাগুলির কোন অর্থ পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন কি? এই অর্থহীন হেঁয়ালিগুলি আর কতকাল কবিতারূপে পরিচিত হইয়া বঙ্গের সারস্বত মন্দির আবর্জ্জনাপূর্ণ করিবে? কবি মহলে সত্যেন্দ্র বাবুর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি। যথেচ্ছরূপে অপভাষার প্রচলন করিয়া মাতৃভাষা কলঙ্কিত করিবার জন্য তিনি কি ধিক্কৃত হইবার উপযুক্ত নহেন? "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ", তাই, সত্যেন্দ্রনাথ আজ 'নিশ্চুপেরি বাণী" লিখিয়াও "কবিযশঃ প্রার্থী"!!

গৃহস্থ, আষাঢ়, ১৩২২:—গৃহস্থের আলোচনা ভাগ ইহার বিশেষত্ব। বাঙ্গালা মাসিকে এইরূপ আলোচনার প্রবর্ত্তন গৃহস্থই প্রথম করিয়াছেন। এখন প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকা এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে। আলোচ্য সংখ্যার আলোচনা সমূহের বিষয়গুলি সুনির্ব্বাচিত, এবং উহার প্রাণপ্রদ, ওজস্বী, অথচ প্রাঞ্জল লিখনভঙ্গী লেখকের প্রভূত শক্তিমত্তার পরিচায়ক। এই শ্রেণীর রচনা একটা প্রকৃত জাতীয় জীবন গঠনের সহায়তা করে। আমাদের অধঃপতিত জাতিকে বিবিধ উপায়ে ঊর্দ্ধগামী করিবার একটা প্রাণপণ চেষ্টা যেন এই আলোচনাগুলিতে পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে। সাহিত্যসেবী, অথবা স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রতিমাসে গৃহস্থের আলোচনা সমূহ অবশ্য পাঠ্য।

"আমেরিকায় স্পেন ও পর্ত্তুগাল" সম্ভবতঃ আমেরিকা প্রবাসী জনৈক "হিন্দু ছাত্র" কর্ত্তৃক লিখিত। ইহাতে "ল্যাটিন আমেরিকা" নামক প্রদেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ, এবং আমেরিকার Hispanic Society'র প্রবর্ত্তক হাণ্টিংটন্ সাহেব এবং অধ্যাপক শেপার্ডের সহিত লেখকের নানাবিষয়ক আলোচনা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে। যদিও এইরূপ পল্লবগ্রাহী আলোচনায় বিশেষ কোন জ্ঞানলাভের আশা নাই, তথাপি অল্লাধিক পরিমাণে পৃথিবীর সব রকম কথাই জানা ভাল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত সরকার লিখিত "রুশ বেদনার বাণীমূর্ত্তি" রুশ লেখক ডষ্টয়েব্স্কির গ্রন্থসমূহের একটি সমালোচনামূলক সন্দর্ভ। বৈদেশিক গ্রন্থাদির আলোচনা বঙ্গভাষায় যত হয়, ততই মঙ্গল। শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন দাসের "জাপানের নারীত্ব" প্রবন্ধটি প্রশংসনীয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইউরোপীয়গণ যেরূপ নিজ রুচি অনুসারে ভারতীয় রীতিনীতির সহানুভূতিহীন সমালোচনা করেন, আলোচ্য প্রবন্ধও অনেকটা সেই শ্রেণীর বলিয়াই মনে হয়। প্রত্যেক জাতিরই আচার ব্যবহার রীতিনীতির একটা বিশেষত্ব আছে, এবং থাকা স্বাভাবিক। একটা জাতিকে বুঝিতে হইলে তাহার নিজের চক্ষে তাহাকে দেখিতে হইবে, বৈদেশিক চক্ষু দিয়া দেখিলে তাহার সহস্র ত্রুটি প্রতিভাত হইবে। শ্রীযুক্ত বলরাম কবিরত্ন অলঙ্কবেদান্তের "আমার-আমিত্ব" নামক প্রবন্ধ আমিত্ব সম্বন্ধীয় কতগুলি মানসিক ভাবের বিশ্লেষণ। দর্শন প্লাবিত ভারতে এরূপ শ্রেণীর প্রবন্ধ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হইবে না। ইহাতে বিশেষ কোন পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় নাই। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদারের "রাণী জয়মণি" নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা বিশ্বনাথের প্রথমা মহিষীর এবং তাঁহার পিতৃবংশের পরিচয় সম্বন্ধে দু'একটি কথা। বিশ্বনাথের পরিণয় সম্বন্ধে লেখক যে আখ্যায়িকাটি বিবৃত করিয়াছেন, তাহার মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে, তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যাহা হউক, প্রবন্ধটিতে নাটোরের ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ উপকরণ পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসুর "ইষ্টপূজা" বৈষ্ণব ধর্ম্মমূলক ইষ্ট নিষ্ঠা সম্বন্ধীয় কতিপয় বিক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাস। ভক্তগণ ইহা পাঠে কতদূর আনন্দ লাভ করিবেন, বলিতে পারি না, কিন্তু, সাহিত্যিক হিসাবে ইহা সম্পূর্ণ বিশেষত্বহীন। সেই মামুলী একঘেয়ে কথা। শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "মহম্মদ" কার্লাইল রচিত Hero-Worship অবলম্বনে বিরচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের বঙ্গানুবাদ না ছাপিলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না।

গুণগ্রাহী।

VOL. 5. Nos. 5 & 6.

AUG. & SEPT., 1915.

# THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.

AND

SATYENDRANATH BHADRA, M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . Rs. 5-6-0

Single Copy . . . . 0-8-0

**EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN**

But impartial verdict comes from the public and the Press

**USE**

# ORIENTAL SOAPS.

FOR

**They are the best for economy and complexion**

## THE ORIANTAL SOAP FACTORY,

*GOABAGAN, CALCUTTA.*

*Tel : "Kowstove," Calcutta.*

**By Special Appointment**

## To H. E. Lord Carmichael of Skirling Governor Of Bengal.

# S. A. MAJID & Co.

## Certificated Opticians

*12 Patuatuli, Dacca.*

**OPTO Eye. METRY—to Measure.**

**A Peculiar Nationalist and Practical Unionist.**

**Prescriber of needful Tonics for the chronical Idleness of India**

**Specialist in attractive Designs, as to touch Human Feelings, to raise any National Subscription successfully.**

**Professor for 10 years, in Eye-sight Testing and Spectacles Art.**

Our methods of examination and tests of the EYES for the adaptation o lenses for the correction of defects of vision and relief of eyestrain and it accompanying symptoms, are based upon accurate measurements of the refraction and the associated functions of the eyes. Glasses fitted under this system ar invariably found satisfactory and curative. The latest and most approve apparatus for accurate sight testing are used in our dark room. Examination b appointment preferred.

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca,
and
Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca

# Ed ds T

**The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.**

*Sole Agents* :—**B. K. PAUL & CO.,** *7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.*

## Cytogen — AN IDEAL DIGESTIVE TONIC WINE

*Invaluable in* CONVALESCENCE *from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c., Extremely Useful in Anaemia, Nervous Debility, Loss of Appetite, Indigestion, Acidity &c.,*

**INDISPENSABLE AFTER PARTURITION**

Price Rs. 1-8-0 Per Bottle.

**B.K.Paul & CO.,**

...UTTA.


The Resea Laborato Sa Bhu on Sarker

B So S ee

## অধ্যাপক শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ এম, এ প্রণীত।

| | | |
|---|---|---|
| ১। | ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা ... ... ... ... | ॥৹ |
| (2) | Sanskrit learning in Bengal ... ... ... | ॥০ |
| (3) | Pramáns of Hindu Logic . ... ... ... | ।০ |

আসাম, গৌহাটী গ্রন্থকারের বাসায় প্রাপ্তব্য।

---

## বহুচিত্রে শোভিত।

## প্রাইজ দেওয়ার নূতন পুস্তক।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

### ১। মহরম।

সকলজাতির নিকট সমান আদরের সেই মহরমের কাহিনী সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ।৴০ আনা। ৪ খানা ছবি।

### ২। প্রহ্লাদ।

হরিভক্ত প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত সরল ভাষায় লিখিত। মূল্য ।৴০ আনা।

পপুলার লাইব্রেরী—ঢাকা।

---

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

## শক্তি ঔষধালয়

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট, ঢাকা।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন রোড্ (হাওরা পুলের নিকট)
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১নং আপার সার্কুলার রোড্ (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—
৭১।১ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—৭২ দশাশ্বমেধ ঘাট।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

| | | |
|---|---|---|
| বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের। | দাদ্‌মার—৵০ কৌটা। | বহরের ননী—॥০ শিশি। |
| | (এক দিনে দদ্রু নিশ্চয় আরোগ্য)। | (নালীঘা, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মহৌষধ)। |
| অমৃতপ্রাশ ঘৃত—১০৲ সের। | দশন সংস্কারচূর্ণ—৵০ কৌটা। | |
| | (সর্ব্ববিধ দন্তরোগের মহৌষধ)। | |
| ছাগলাদ্য ঘৃত—১০৲ সের। | | অমৃতারিষ্ট—॥০ আনা শিশি। |
| মেধাস্মৃতি বর্দ্ধক ও ছাত্রগণের সহায়। | খারচাদি মলম—৵০ কৌটা। | (ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত ও |
| ব্রাহ্মীঘৃত—৬৲ সের) | (খুজলী পাঁচড়ার মহৌষধ)। | সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ) |

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শাস্ত্র বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ,
হিন্দুকেমিষ্ট এবং রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্‌মাষ্টার

**দি নিউ ফরমুলা কোম্পানী** কোন প্রশংসা পত্র না ছাপাইয়া মফঃস্বল হইতে এত দম্ভ করিয়া পেটেন্ট ঔষধে অবিশ্বাসী রোগীকে আহ্বান করিতেছে কেন, একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশ্বাস করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন ?

**আমাদের আলছারিণে** পারদাদি দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে আদালতে দণ্ডনীয় হইব। ইহা শিশু ও বৃদ্ধের পক্ষে ঈশ্বর-প্রেরিত। আলছারিণ নালী ঘা, ভগন্দর, ফোড়া, বাগী, কারবাঙ্কল ও উপদংশের ব্রহ্মাস্ত্র। দূষিত, ক্ষত ও বিস্ফোটকের তীব্র জ্বালা সদ্যসদ্যই নিবারণ করিয়া থাকে—ইহা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নহে।

**আলছারিণে ক্ষত ধুইতে হয় না, ব্যাণ্ডেজ করিতে হয় না, অস্ত্র ও প্রুবের ছায়াও মাড়াইতে হয় না।**

এমন নির্দ্দোষ ও মূল্যবান ঔষধের মূল্যও এজেন্টগণের অনুরোধে গৃহস্থের সুবিধার জন্য পূর্ব্ব হইতে অনেক কম করা হইল। শিশি ৸৵০ : ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। বিনামূল্যে আলছারিণের বিবরণ পত্র পাঠান হয়।

**আমাদের এণ্টাসিডি—সোডা ও এসিড বর্জ্জিত, সেবনে সুস্বাদু** যাঁর ২।১ দিন অন্তর কাল কঠিন মলত্যাগ করেন, যাঁহার বাল্যকাল হইতে লিভারের দোষ আছে, আহারের পর পেটে বেদনা ধরে, যিনি দারুণ অম্লশূলে যন্ত্রণা পাইতেছেন, অম্লে যাহার বুক জ্বলিয়া খাক হইতেছে ; তিনি একবার কিছু দণ্ড দিলেন মনে করিয়াও আমাদের এণ্টাসিডি ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। মূল্য বড় শিশি ১৷০, বিনামূল্যে বিবরণ পত্র পাঠাই।

**ভদ্রলোক ও স্কুলের** ছাত্রদিগের উপযোগী সুগন্ধি, জ্বালা নাই, পারা নাই, দাগ লাগে না, যে কোন দাদ ২ দিনে সারে। **দদ্রুলীন** মূল্য শিশি ।৵০।

**আমাদের বাতঘ্নী**—পেটেন্টের চরম উৎকর্ষ, যাবতীয় বাত, গাউট, রিউম্যাটিজিম্, গণোরিয়া ও উপদংশ-জনিত বাত ৩ দিনে নরম না পড়িলে মূল্য ফেরত দিব। শিশি ১৷০।

দি নিউ ফরমুলা কোম্পানী।

কান্দী পোঃ—মুর্শিদাবাদ।

---

ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব গণিতাধ্যাপক

**শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম. এ. মহাশয়ের**

প্রতিষ্ঠিত

**"ধনন্তরি ঔষধালয়"।**

গারুড়গাঁ, পোঃ আঃ হাসাইল, জিঃ ঢাকা।

ব্যবস্থাপক কবিরাজ { শ্রীচন্দ্রভূষণ সেন কবিরঞ্জন। শ্রীইন্দ্রভূষণ দাশ গুপ্ত ভিষগরত্ন।

এই ঔষধালয়ে সর্ব্ববিধ তৈল, ঘৃত, বটিকা, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি অকৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত ও সুলভে বিক্রয় হয়। মফস্বলের রোগীদিগকে মনোযোগের সহিত ব্যবস্থা করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে অতি যত্নের সহিত ঔষধ পাঠান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। চিঠি পত্রাদি আমার নামে পাঠাইবেন।

গারুড়গাঁ, পোঃ হাসাইল, ঢাকা। } কবিরাজ—শ্রীচন্দ্রভূষণ সেন কবিরঞ্জন।

# DHARMA SAMAVAYA LIMITED.

## A CENTRAL CO-OPERATIVE ORGANISATION FOR PROMOTING UNION FOR CREDIT, THRIFT, TRADE, INDUSTRY, AGRICULTURE, INSURANCE, SANITATION AND EDUCATION.

**Registered under the Indian Company's Act, in June, 1910**

Dividends on Shares, paid for the last three years, have been 25 per cent per annum. Dividends will be distributed quarterly for future years beginning with July, 1914.

The Memorandum of Association of the Samavaya provides for one hal of the net profits of each year being devoted to promotion of Religion Co-operation, and Economic Development of the Natural Resources.

Business transacted:—Builders, Engineers, Architects and Contractors-protectors of Cattle; Suppliers of pure and wholesome Dairy Produce; Purchase Sale and Efficient Management of Land; Establishment and Administration of Schools and Sanitariums; Housing on the Hire-purchase System; Land, Improvement on Co-operative Principles; Intensive Cultivation, Town-planning and Tenant-Co-partnership, on the Garden-City and Suburb methods.

**SPECIAL NOTICE.**

Shares of DHARMA SAMAVAYA LIMITED, subscribed and paid for but between 16th April, 1914, and 31st May, 1914, will earn one-fourth of the Dividend, to be declared for our current financial year, ending 30th June, 1914. The list of Share-holders will remain closed, for the said year, during the month of June, 1914, and no sale or transfer of Shares will be transacted therein as for that year. Shares taken in June, 1914, will be sold at par value and earn full dividends from our next financial year, beginning with 1st July, 1914.

*Particulars supplied on application.*

SAMAVAYA MANSIONS,
CORPORATION PLACE, CALCUTTA.
*17th April, 1914.*

**A. C. UKIL,**
***Organiser.***

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra. Nyabazar, Dacca.

All busines communications and all complaints regarding non-delivery of he Magazine should be addressed to—

*The Manager,* "DACCA REVIEW,"
*5, Nyabazar Road, Dacca.*

*N.B.*—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among others we may mention the names of:—

His Honour Sir Charles Steuart Bayle S. I.
The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I.
The Hon'ble Nawab Syed Shamshul Huda, M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A. D.L

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S
„ Mr. H. Sharp, C.I.E., M.A.
„ Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. Donald, I. C. S.
„ Mr. W. W. Hornell, M.A.
„ Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
„ Mr. L. J. Kershaw, C.I.E., I.C.S.
„ F. C. French Esq., I.C.S.
„ W. A. Seaton Esq., I. C. S.
„ R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
„ Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq., I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
G. A. Evans Esq., M.A., M. Sc., I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
Rev. Harold Bridges, B. D.
J. R. Blackwood, Esq., I.C.S.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London.)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A
„ Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B.A.
Professor R B. Ramsbotham M.A., (Oxon.)
„ J. C. Kydd, M.A.
„ W. Douglas, M.A., B. Phil. B.D.
„ T. T. Williams M.A., B.Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
„ G. H. Langley, M.A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.Sc.
„ Debendra Prasad Ghose.
„ Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Shushung.
The „ Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.

Mr. Justice Digambar Chatterjee
Sir Gooroodas Banerjee, Kt., M.A., D.L.
The Hon'ble . Devaprasad Sarvadhicari M. A.
L. L. D. C. I. E.
Mr N. Bonham-Carter, I.C.S.
Mr J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
Mr Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
„ Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
Nawab K. Mahomed Yousuff.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esqr., I.C.S.
B. C Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Sarat Chandra Das, C. I. E.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandrs Singh
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
„ Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
„ Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L.
„ Radha Kamal Mukerji, M.A.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra.
„ Jaladhar Sen.
„ Jagadananda Roy
„ Benoy Kumar Sircar.
„ Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq, M. A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College.

# CONTENTS.


| | | |
|---|---|---|
| Volcanoes ... ... | G. A. Evans, M.A., M.Sc., I.C.S. ... | 157 |
| A Forgotten Republic in Ancient In | Ramesh Chandra Mazumdar, M.A., P.R.S., Professor, Calcutta University ... | 164 |
| The Cavendish Laboratory and Sir Thomson, F. R. S. ... | | 168 |
| Some Local Industries Dependent on Aquatic Animals ... .. | T. Southwell, Dy. Director of Fisheries, Bengal ... | 176 |
| The Dacca Museum in the Nimtali Kothi or the Nawab Baree ... | Khan Bahadur Syed Aulad Hasan, M.R.A.S. | 190 |
| 'Neutral' ... ... ... | Ella Wheeler Wilcox ... ... | 192 |
| Sir Rabindra Nath Tagore an appreciation. ... | Rai Lalit Mohan Chatterjee Bahadur, M. A. Principal, Jagannath College, Dacca ... | 192 |
| Gupta Brindaban in Mymensingh ... | Aboni Chandra Chatterjee, B.A., M.R.A.S. Deputy Magistrate, Jessore. ... | 201 |


# সূচী।


| বিষয় | লেখকগণের নাম | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|
| ১। আগমনী (কবিতা) ... ... | শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী ... ... ... | ১৬৯ |
| ২। অগ্নি ... ... ... | অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ ... | ১৭০ |
| ৩। পাষাণ যোগী (কবিতা) ... ... | শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ... ... | ১৭৬ |
| ৪। উত্তরাপথ ভ্রমণ .. ... ... | শ্রীযুক্ত "ভবঘুরে" ... ... ... | ১৭৭ |
| ৫। শরতে অহল্যা (কবিতা) ... ... | শ্রীযুক্ত চারুভূষণ দেব ... ... ... | ১৮৪ |
| ৬। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং সেবাব্রত ... ... | শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন মজুমদার ... ... ... | ১৮৪ |
| ৭। বধীরের কাহিনী (কবিতা) ... ... | শ্রীযুক্ত বিভাবতী সেন গুপ্তা ... ... | ১৮৭ |
| ৮। ব্রহ্মচারী (গল্প ... ... | শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ... | ১৮৭ |
| ৯। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ... | অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, টি, ... ... | ১৯৪ |
| ১০। শারদোৎসব (কবিতা) ... ... | শ্রীযুক্ত শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ ... ... | ২০১ |
| ১১। বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত লিপি ... ... | ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি, আই, ই ... | ২০২ |
| ১২। দুর্গোৎসব তত্ত্ব ... ... ... | স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই,ই ... | ২০২ |
| ১৩। মর্ম্মর-স্বপ্ন ... ... ... ... | শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম্, এ ... | ২০৫ |
| ১৪। জলজ উদ্ভিদ (The Victoria Regia Lily) | শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী ... | ২০৯ |
| ১৫। এবর্ষে ৺ দুর্গাপূজার বিসর্জ্জন ব্যবস্থা .. | শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর বাচস্পতি স্মৃতি মীমাংসা ব্যাকরণতীর্থ | ২১২ |
| ১৬। ঐ ... ... | শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম্, এ ... ... (ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব গণিতাধ্যাপক) | ২১২ |
| ১৭। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ... ... | ... ... | ২১৫ |

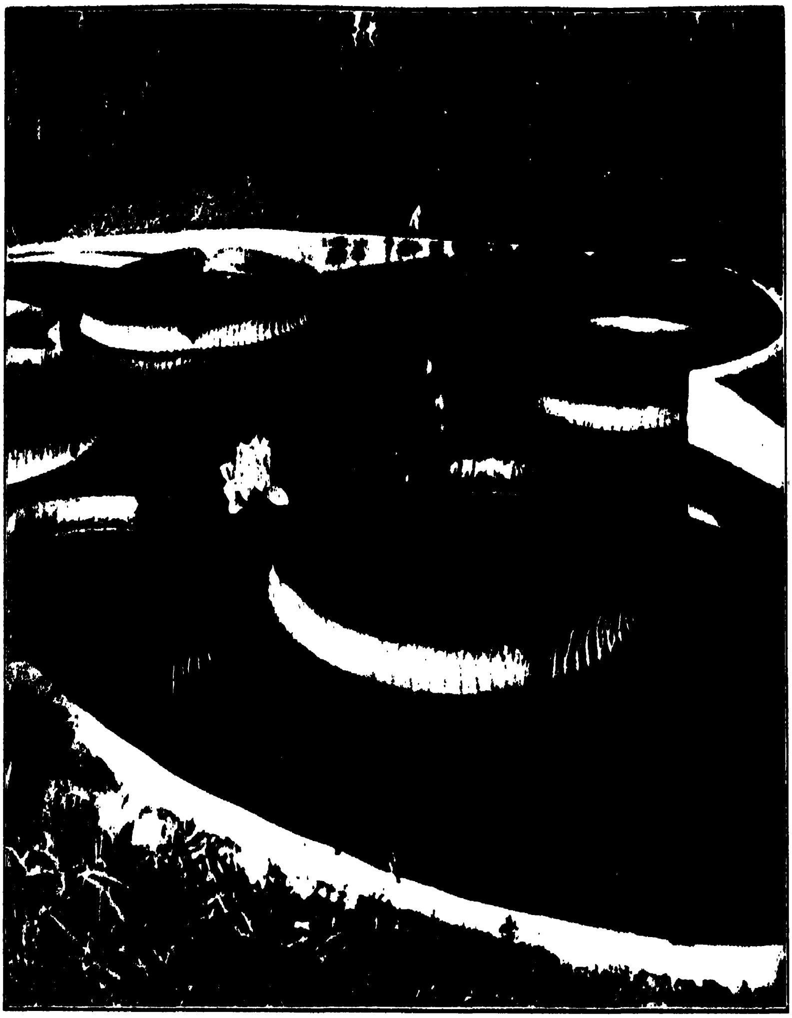

**The Victoria Regia Lily in its native haunts.**

Sreenath Press, Dacca

# THE DACCA REVIEW.

VOL. V. AUGUST, 1915. No.

## VOLCANOES.

My object is not to give a learned lecture on volcanoes but rather to give a simple account of interest to the average educated man. It is impossible to draw any line between volcanic action and other earth movements. In fact the fall of a drop of rain ultimately causes weakness in the earth's crust and hence volcanoes.

Now I have no intention of making my talk one of volcanoes only. A better title would have been earth movements and volcanoes. How did our earth come into existence? I cannot solve the problem , I will consider the earth on its way. If I was discussing the journey from Dacca to Narainganj you would not expect me to discuss the construction of the line and the manufacture of the locomotives. As far as we can guess now this solar system was a nebula once *i. e.* a great mass of moving stones some like a grain in size, some as big as a mountain. They were not wandering about aimlessly like murgis on the Dacca streets; they were all moving on a definite track round a given centre. You all know that if you hammer a piece of iron it becomes hot. Try the experiment. When one stone hit another it became hot, very often so hot that the stone became a white-hot gas. Imagine this great mass of hot stones and white-hot gas spinning like a top. As the mass cooled, as it would in time, it took up a double spiralshape. I must ask you to believe this, as the mathematical proof is exceedingly complex. Again you must believe me when I say that the stones on these lines will naturally run together into little lumps. Now this little lump is our earth. Our earth gradually cooled down passing through stages illustrated by our planets. Glowing hot, then red hot surrounded by clouds of stream, then cool with an atmosphere. As it cooled you can imagine a crust forming in places as the crust forms on the great lavalake of Mauna Lau in Hawaii. These patches would form, then dissolve,

then reform until by degrees the earth was covered with a solid crust. It was ages and ages before the crust was cool enough to support life. This crust must have cracked again and again pouring forth vast floods of molten rock before it settled down to comparative rest. The inside of the earth is exceedingly hot, moreover the pressure of the rock and earth over it is enormous. The result of this weight is that although the inside of the earth is far hotter than the electric arc light it is wonderfully stiff and rigid. You know that the earth has a radius of 4000 miles, this mass of hot matter with a crust is more rigid than if the crust was 500 miles thick of the best steel. The inside of our earth is not liquid. It is metal, rocks and everything changed to gas by the vast heat and crushed by the enormous pressure until it is stiffer than the hardest steel. This introduces us to the first kind of eruption and certainly the grandest example of the forces of nature ever conceived. This great globe is not uniform in strength. It is weak in places. These weak spots are likely sources of volcanic action. You all know the Deccan. It stretches from the Vindya Hills in the North, to Mysore in the South, from the Bombay coast in the West to Bihar in the East. Somewhere in the centre or towards the Western Ghauts many many millions of years ago the ground split into a huge crack, up through the crack welled millions and millions of maunds of molten rock. India then did not exist, the Himalayas, the Hindu Kush, the valleys of the Ganges and the Indus were at the bottom of a great sea of which the Mediterranean is the last shrivelled remnant.

India of that time stretched all over the present site of the Laccadive and Maldive Isles to Africa on one side and to Australia on the other. From this vast crack, lava poured over a country covered with forests and grassy uplands. When this terrible eruption or series of eruptions, for we have evidence that there must have been intervals of thousands of years between them, had finished there was a vast level plain of lava many thousands of square miles in area. The thickness varied. Near the Bombay coast it is 8000 feet thick. It extended far towards Arabia. There are other examples of this type of eruption. The Snake River Plateau in America is exactly the same. In 1783 there was a dreadful eruption in Iceland. We find there was a combination of simple cracks with cracks crowned with cones here and there. In the south of the islands the cracks ran from South-West to North-East, in the north they ran from North to South. One simple crack was 20 miles long and the lava from it covered a piece of country about 9 miles wide by 30 miles in length. The other great cracks with cones poured out two streams, of lengths 40 to 50 miles respectively, and width 15 and 7 miles. A brief account of the eruption may be interesting.

Preceding the eruption there had been many earthquakes and finally on the 11th. of June 1783 a vast stream of lava flowed from the north of the island. It flowed in the river Skapta, a stream 200 feet wide flowing into a deep valley about 600 feet deep. This was filled in a few hours. The lava poured down the river channel and entirely filled an ancient lake of great depth. On the 18th. June the fissures poured out an exceptionally liquid lava which flowed over the country faster than a horse could gallop. This poured over the plains, burnt out the rivers, poured over a famous waterfall (Stapofoss) blotting them out of existence and caused great loss of life. The result was to bring the hills and valleys of parts of Iceland to one level. Before telling you more I must ask you to look at the map. You will see there are lines of weakness on the crust of the earth. Follow this one. Trace the Andes of America north. In Chili 19 volcanoes; in Peru one. Near Quito Cayamba, Cotopaxi, Pichincha, Antisana, L'Altar, Tunguragua. Cotopaxi is 18858 feet high. In Jan. 1803 an eruption melted all the snow and ice on it causing a frightful flood of water and mud. In Mexico we have, West and East, Tuxtla, Orizaba, Popocatepetl, Jorullo and Colima.

North of this we have no volcanoes but the whole ground is very liable to earthquakes. Earthquakes and volcanoes are always present along lines of weakness on the earth's crust. Every volcanic eruption is accompanied and preceded by earthquakes.

In 1812 there was a great earthquake in the Mississippi valley which completely changed the face of the country. In Canada in 1663 there were many severe earthquakes. We have now reached the tip of north America and I now turn West, in this Area (Aleutian Isles through Japan) volcanic activity is tremendous. The land is often frightfully convulsed. This band of volcanic land extends through Japan, the Phillipine Islands, the Moluccas, then west through Java, Sumatra, and up through the Himalayas. I need not remind you of the great Assam earthquake of 1897 and that at Simla. I have gone rather too quickly. Let us now turn to the Aleutian islands. About here in 1814 a new island 3000 feet high and 4 miles round came out of the sea. In 1795 Langadorf mentions another rocky island appearing. However, as is common with volcanic rocks, they were very soft and crumbled away rapidly. In the southern extremity of Kamchatka there are 7 active volcanoes. The Kurile Islands contain 9 volcanoes, some active. In Jesso there are active volcanoes, Nipon (Mid Japan) has may volcanoes. Between Japan and the Phillipines there is Sulphur Island. Luzon the northern of the Phillipines has three active volcanoes. In 1754 there was a serious eruption here.

You will please note the band strikes

this line of Islands here in the Sunda Straits at Krakatoa. In 1883 there occurred the most frightful volcanic explosion ever known to history. The explanation of Krakatoa will be clear in a minute. Down here in Polynesia are ample proofs of volcanic action. Here and there are actual volcanic rents. In New Ireland, New Hebrides, New Guinea, Borneo there are volcanoes and volcanic rocks. In Java there are 38 large volcanic mountains some in a continual state of eruption. In Sumatra the volcanoes run in this direction towards a little island, Barren island in the Bay of Bengal. I have pointed out that we continue our investigations by by following the line of earthquakes. Syria and Palestine have suffered terribly from earthquakes. Tyre and Sidon were devastated, and the Dead Sea shows many signs of volcanic action. When we reach the Caspian our chain improves. You will have heard of Baku with its great fields of petroleum. There are mud volcanoes here some 250 feet high i. e. little volcanoes' spouting hot mud instead of red-hot rock. The mountains of the Caucasus abound in hot springs.

In 1814 a new island was raised here in the Sea of Azov. In the Greek Archipelago Santorin Island is an active volcano spouting steam. Macedonia has always been subject to earthquakes. Italy is well known for its earthquakes. There is Vesuvius here, Etna in Sicily. There are the hot springs and destructive earthquakes of Calabria. In fact all round the Lipari Isles there are numerous earthquakes. North-west Africa and Southern Spain are often afflicted with terrible convulsions. In 1755 Lisbon was shaken to the ground with the loss of 60000 lives. This line passes west through the Azores to the West-Indian Islands. Thus you understand if you consider the earth I have traced two lines cutting in the Sunda Straits and in the gulf Mexico. There is the volcanic ring of Mexico, South America, and Martinique and St. Vincent, at the Sunda Straits is Krakatoa. I have already told you about the great eruptions from cracks. I will now deal with other kinds of volcanic action. We are lucky in knowing about the births of two existing volcanoes. Here in Italy is a famous spot, the Phlaegrean fields. In the year 1538 a new mountain was formed, its name Monte Nuovo means this. For two years there had been many earthquakes in this neighbourhood. On the 27th and 28th of September the shocks became very violent. On the night of the 28th September the shocks became very violent. On the night of the 29th about two hours after sunset a crack appeared between the little town of Tripergola and the hot springs close to it. The crack grew rapidly and approached the town. The noise was tremendous; flames, mud, stones and hot ashes issued from the crack and in a short time the town was covered. In a night and day

a mountain 440 feet high and more than 1½ miles round was formed. This mountain has been very peaceful ever since. I now draw your attention to Mexico. I do not remember when Cortes conquered Mexico but I should say it was between 400 and 450 years ago, somewhere about 1450 to 1500 A. D. From that time up to 1759 the plain of Malpais was a fertile, level plateau some 2000 to 3000 feet above the sea level. It was composed of volcanic rocks. There were two streams on it the Centemba and San Pedro and the main crops were indigo and sugarcane. In June 1759 hollow sounds of an alarming nature were heard and earthquakes succeeded each other for two months until in September flames issued from the ground and pieces of burning rock were hurled high into the air. Six volcanic cones were formed on the line of a great crack running from NN-E to SS-W. These cones rapidly increased in size until the largest, Jurullo, was 1600 feet above the plain.

Streams of lava and red-hot rock were emitted up to February 1760. Humboldt, a famous traveller, visited the place 40 years later. He found that the land round the volcanoes was all humped and covered with thousands of little cones giving off steam and sulphur. This hump boomed liked a drum when horses went over it. Some people held that the ground under the hump was hollow and spent a lot of trouble explaining the hollow. As a matter of fact it was caused by smaller and smaller lava flows passing one over the other. It booms because there are loose layers of rock mixed with the lava leaving some hollow places. Jurullo has not erupted since 1760. Just off Morocco we have the island of Teneriffe and Lancerote. Between 1730 and 1736 there was as extraordinary outburst of volcanic activity. On Lancerote there were three fair sized towns St. Catalina, Chinanfaya, and Yaira. On the first of September, 1730, the earth suddenly split open at a place about six miles from Yaira. In one night a large hill of volcanic material was built up. A few days later another crack opened. Lava poured out and covered Chinanfaya and some small villages. To begin with the lava was like water, then the later flows were thick like *gur*. On the 7th of September a great rock came up through the lava with a tremendous noise. The stream changed its course and poured over St. Catalina. On the 11th of September more lava came and poured into the sea for 8 days without stopping. Vast quantities of dead fish floated on the water. Shortly after, three new volcanoes formed on the site of the old town of St. Catalina and poured out poisonous gases and ash. On the 28th of October all the cattle died owing to the gases. For the next five years Lancerote was an island of terror. Without warning new volcanoes formed or collapsed, lava poured here and there. Smoke and flames issued

from the sea with loud noises. Nearly all the inhabitants left the island. In August, 1824, there was a fresh eruption and a new volcano was formed. I have mentioned how flames and smoke came out of the sea near Lancerote. This brings us to the phenomenon of submarine volcanoes. There are many instances, but I will only consider one example *i.e.* Graham Island near Sicily. On June 28, 1831 Sir Pulteney Malcolm when passing over the spot in his ship felt a shock as if he had struck a sandbank. About July 10, John Corro the captain of a Sicilian vessel saw a column of water about 60 feet high and about 800 yards round spouting out of the sea. This rapidly changed to steam. On the 18th of July a small island some 12 feet high was formed. It was pouring out vapour and rocky matter. It reached its greatest size by the 4th of August when it was 200 feet high and 3 miles round. It rapidly washed away. By 1833 only a dangerous reef remained. This reef is very interesting. In the centre it is a round plug of black lava 100 cubits in diameter surrounded by volcanic ash and rock. This marks the vent.

I have now dealt pretty fully with new volcanoes. I will deal with other kinds. There is the intermittent kind. I will take a well known example *i.e.* Vesuvius. Many of you will have read Lord Lytton's Last Days of Pompeii. There you have a vivid and excellent account of the eruption in 79 A. D. Before this there was no record of any eruption. Probably most of the Romans had not the least idea that it was a volcano although Strabo recognised it as one Pliny did not. It was a cone-shaped mountain with a basin-shaped hollow containing a small lake and fertile grazing land. This famous eruption was preceded by earthquakes lasting for 13 years. In this eruption no lava came, only dust and ashes and floods of water which mixed with dust forming mud streams. Herculaneum was overwhelmed by mud to a large extent. Pompeii was simply buried in dust. Between 79 A D. and 1036 A. D. there were six eruptions but no lava flowed. In 1036, 1049 and 1138 lava poured from Vesuvius. The old cone as shaped by the old eruption of 39 A. D. was not changed considerably up to 1822 In October of that year a series of explosions lasting 20 days blew the whole of the top of the mountain away leaving a vast hollow nearly ¾ of a mile in diameter.

There are plenty of examples of volcanic explosions. Papandayange in Java blew away 4000 feet of its top in 1772. Bandai San in Japan was quiet for more than a 1000 years. In 1888 it suddenlyblew away its top and one side.

You will remember I referred to Krakatoa in the Sunda Straits. We know Krakatoa had behaved itself for about 200 years. In 1883 it suddenly blew up. Before 1883 the island was an old volcanic ring. In fact it was the torn fragment of an old volcano which

had blown to pieces with terrible force possibly many thousands of years ago. We are fairly certain that formerly Krakatoa was a great volcano about 25 miles round at sea level and height about 10000 feet. First of all there was the great explosion leaving the wreck. After this there were petty eruptions round the centre.

In 1680 there were a gentle eruption; in 1878 earthquakes commenced and gradually became more violent up to August 26, 1883. On that day loud explosions were heard at first every ten minutes. The explosions came quicker and quicker until there was a continuous roar. Probably at that time sea water had got at the hot molten lava and had cooled it. It was like an engine with the safety valve screwed down and fires blazing. Then in 4 vast explosions the whole volcano practically blew away leaving in some places a hollow a 1000ft. deep. The shock set up a wave. Near the volcano in the deep ocean the wave was merely a few feet high. A vessel close by was not seriously affected. But as the wave approached Java and Sumatra and the water shallowed it roared ashore 150 ft. high. The loss of life was terrible, over 30,000 I believe, all due to the sea wave. The wave was felt even on the Bengal coast. The dust of the explosion travelled all round the world causing gorgeous sun-sets so far off as England.

In sharp contrast to these very energetic gentlemen we find Stromboli here which erupts gently and peacefully all the time and the great lava cones of Mauno Loa and Mauna Kea in Hawaii here. These lava cones are about 14000 feet high sloping away very gently and gradually. They pour out a very liquid lava very gently and quietly.

I will finish off with an account of a very recent eruption, that of the West Indies in 1902. This eruption was remarkable for the great loss of life and widespread destruction caused. There were two separate and distinct series of eruptions at the same time in the islands of St. Vincent and Martinique. However in both cases the events were extraordinarily alike. I shall therefore only consider the eruption of Soufriere in the British Island of St. Vincent. Soufriere is in the northern part of the island, it is 4000 feet high and is about 8 miles in diameter at the base. The summit is occupied by a large crater about a mile in diameter. Before the eruption this contained a lake smelling strongly of sulphur. There were the usual warning earthquakes; then on May 6th the lake boiled and overflowed. Next day the eruption became more violent and a very remarkable thing happened. A great black cloud appeared at the edge of the crater, hung for a short time and then poured down the mountain side. It was composed of hot gases and white hot dust. Wherever it went every plant, every animal and every human being

died. Such a cloud pouring down a valley from the volcano of Mount Pelee killing every person in Martinique in a moment. Thirty thousand persons died; only one man, a convict locked in the condemned cell, escaped. Of the vessels in the port only one-the Roddam escaped, through the desperate courage of its captain. The future fate of the Roddam is strange. In the Russo-Jap war it tried blockade running to Vladivostock. Japanese cruisers chased it north. It was caught in the ice and was last seen deserted drifting north towards the Arctic Seas.

I might say much more about volcanoes, how they seem to die but there is no time for such a full discussion. Suffice to say hotsprings and the existence of carbonic acid gas mark the last stages. I trust I have not wearied you by too long a paper but the subject is a vast one and it is difficult to disentangle it from other allied phenomenon.

G. A. EVANS.

## A FORGOTTEN REPUBLIC IN ANCIENT INDIA.

One of the most interesting discoveries regarding the political history of ancient India is that of the existence of a number of powerful republican states. The fact is specially remarkable because it was unsuspected, as the perusal of the existing Sanskrit Literature naturally gave rise to the notion that monarchy was the only form of Political Government known in ancient India. The Buddhist literature in the Pali language has preserved an account, however short, of some of the republican states that were in existence at the time when Gautama Buddha was born. The Archaeological discoveries of the last century have furnished us with accounts of some others. It is the object of the present paper to deal with one of these republican states, *viz* that of the Yandheyas.

### I. SOURCES OF HISTORY.

1. *Tradition*—Panini mentions the Yandheyas as one of the warlike tribes of the Punjab. The Yandheyas are also mentioned in Brahma-Puran and Harivamsa where they are said to be descended from Nriga (or Trina), the son of Usinara. Varahamihira also mentions the Yandheyas on several occasions in his Brihat Samhita.

2. *Inscriptions*—Yandheyas are mentioned in the famous Girnar Inscription of Rudradaman of the year 150 A. D. We are told that they grew very proud in consequence of their having inflicted a defeat upon all the Kshatriyas of India, and that it was with great difficulty that Rudradaman could bring them under his control, after giving them a crushing defeat, (E. I. VIII),

The next reference to the Yaudheyas occurs in the Allahabad Pillar Inscription of Samudra Gupta (about 350 A. D.) They are mentioned as one of the tribes that 'gave all kinds of taxes, obeyed orders, and performed obeisance' to the great Gupta Emperor. (C. II. P. 14). It is quite clear from the context, in the Inscription that the Yaudheyas State did not form part of the territories directly administered by the Guptas but was something like a frontier kingdom owning allegiance and paying taxes to them.

There is again an inscription of the Yaudheyas themselves *viz* the Bijaygadh stone Inscription (Fleet's No. 58 CII). This most interesting inscription is unfortunately mutilated to such an extent as to leave nothing of historical importance except the fact that it emanated from the Yaudheya tribe, and that the chief officer of the tribe, Maharaja, and Maha-Senapati were elected by them. The great importance of the inscription however lies in the fact that it helps us to ascertain the locality of the Yaudheya tribe, for in this respect an inscribed stone which is less liable to be removed to a great distance, is more reliable than coins.

As regards the time of the Record the following remarks of Dr. Fleet about the age of the letters in the inscription may be quoted. "The characters must be considered as belonging to the Northern class of Alphabets, and the so-called Indo-Scythian form of 'ma' stamps them at once as of decidedly early date. But they are of such peculiarly ornate type, that having no inscription of known date with which to compare them, it is not possible at present to suggest any definite period for them." The stone bearing the inscription was found built into the inside of a fortwall at Bijaygadh about 2 miles to the South West of Byana, the Chief town of the Byana Tahsil or Sub-division of the Bharatpur State in Rajputana.

3. *Clay seals*--Mr. Carr Stephen discovered some clay seals or votive tablets in and near the village of Sonait near Ludhiana, mostly in mounds cut up by rain water or excavations made by the villagers. Hoernle has described these seals in Proc. A. S. B. 1884. One very large seal bears the figures of a humped bull moving to the right and above it a description in three lines *viz* "Yodheyanam Jayamanta Dharanany" or "(the votive tablet) of the Yaudheyas who knew how to devise victory." These seals Hoernle refers with much probability to the 3rd Century A. D.

4. *Coins*—Then there are the coins of the Yaudheyas; it is not necessary here to give an account of the various types of these coins, with a minute description of their style and fabric. These may be consulted in the following works.

1. Prinsep's essays Edited by Thomas
   Plate IV, figs. 11-12.
   " XIX, " 5, 6, 9, 22.
   " XXI, " 16-17.

2. Cunningham's Archæological Survey Report Vol. XIV. Pp. 139-145, Pl. XXXI.
3. Cunningham's coins of Ancient India Pp. 75-79 Pl. VI.
4. Rapson's Indian coins P. 14-15 (Pl. III, 13-15).
5. V. Smith—Catalogue of coins in the Indian Museum P. 180-183, Pl. XXI figs. 13-20.

It is generally admitted that the coins of the Yaudheyas fall into three groups, representing three chronological periods in their history. The first group according to Cunningham dates from about the 1st C. B. C. ; Rapson agrees with him and refers it to about 100 B. C. The Second group is admitted by all to be copied from or at least influenced by the Kushana coins—their date therefore depends on that of the Kushanas, which is not yet settled with precision. Both Cunningham and Rapson refer the coins of group III to a somewhat later date but V. Smith places them earlier and assigns them to the 2nd Century A. D.

Some coins have "*Devi*" and others 'Tri' at the end of the legend. This has been generally taken to refer to the second and third class of the Yaudheya tribe (Cunningham-Coins of Ancient India P. 78. Buhler origin of the Brahmi Alphabet P. 46. V Smith J. R. A. S. 1897. P. 888).

I have given above a sketch of the various sources of information from which a history of the Yaudheyas can be constructed. This is not a fit place for the discussion of all the problems relating to the Yaudheyas but I shall merely attempt to give a short account of them with reference for the following points.

1. The antiquity of the Yaudheyas.
2. The form of political government under which they lived.
3. A general idea of their prowess.
4. The sphere of influence or the locality under the sway of the Yaudheyas.

It has been already stated that Panini mentions the Yaudhayas. It is not an unfair presumption therefore to trace the Yaudheyas back to the 7th or 8th Century B. C. the date assumed for Panini by Goldstucker and Bhandarkar whose pronouncement in this respect seems to be more weighty than those of Maxmuller and Weber. It is of course quite possible that some illustrations of the rules of Panini were added subsequent to his time, but the mention of the Yaudheyas in other Puranas and the certain proof of their existence as a great political power in the first Century B. C. seem to corroborate the evidence of Panini's grammar. Their existence as a political factor in the 4th C. A. D. is proved by the Allahabad Pillar Inscriptions and it is further carried down to the 6th century A. D. by the reference in Brihat Samhita. It is clear therefore, that the Yaudheya republic lasted, certainly for 700 years and most probably for 1200 years.

## 2 Form of Government.

That the Yaudheyas were governed on republican principles appears quite clearly from their coins. These bear the legend not of a king but of the tribe. Of the numerous coins of the Yaudheyas that have come to light, not a single bears the name of a king. They bear either the name of the tribe or that of its tutelary deity. To those acquainted with the nature of ancient Indian Coinage, this one evidence is quite enough, and indeed scholars are unanimous on the point. But the fact has been placed beyond all doubt by the discovery of the Bijaygadh inscription where reference is made to the Maharaj Mahasenapati " who has *been made leader* of the Yaudheya tribe ". The word Raja, and Maharaja need not cause any surprise for they were used in ancient times not only to denote kings, but also high officials. Rhys Davids has quoted instances from the Buddhist Literature where 'Raja' denotes the chief official in the ancient republics, who were elected from time to time for a number of years, as the chief executive officer in a republic and the President of the assembled tribesmen in the Santhagar or Mote-hall. As Rhys Davids remarks, these 'Rajas' were similar to the Archons of Greece and Consuls of Rome. * The Vijaygadh inscription speaks of the Maharaja Mahasenapati who has been made leader of the tribe, or in other words elected as such by the people and this is of course the most essential characteristic of a republic. The persistent use of such expressions as " Triumph of the Yaudheyas." " Triumph of the Yaudheya tribe " (Yaudheya gananamjaya). " The Yaudheyas who know how to devise victory " &c. seem to show that the Yaudheyas possessed in a full measure the sentiment of nationality that in the 19th Century transformed the king of France into the king of the French and the king of Belgium into the king of the Belgians.

We do not possess sufficient materials for constructing a detailed history of the Yaudh yas. But there are occasional references which seem to show that the Yaudheyas at one time came to be a very powerful race. Their own boast that they possessed the secret charm of winning victories (Ludhiana clayseal Yaudheyanam Jayamanta Dharanam) seems to be corroborated by the admission of Rudradaman that they were loth to submit even to the conqueror of Anupa, Anarta, Surashtra, Sindhu, and Sanvisa and that it was with difficulty that they were brought under control. The Girnar inscription further tells us that the Yaudheyas grew proud in consequence of their having defeated all the Kshatriya princes—a no mean admission from an enemy. We should also remember that even the great conqueror Samudragupta could not annex their dominions. All this certainly testifies to the great power of the tribe, and this is again corroborrated by the

extent of territories that they held under sway, to which subject I shall now turn.

An idea of the extent of Yaudheya territories may be formed from the find spot of their coins. Captain Cantley found them in Behart near Shaharanpur. (P. E. IV.) Cunningham collected many Specimens from Depalpur, Satgarah, Ajudhan, Kahror and Multan on the West, and Bhatner, Abhor, Sirsa, Hansi, Panipath and Sonpath, on the East. (Cun. Anc. Geogr. P. 245). Four of the copper coins were obtained in the Kangra district (C. A. D. P 79) and a great many at a place called Jogadheri in the Eastern Punjab (V. Cat. P. 165). Cunningham says (C A. I. P. 76),

"The coins of Yaudheyas are found in the Eastern Punjab and all over the country between the Sutlej and the Jamuna. Two large finds have been made at Sonpath between Delhi and Karnal. We must also remember that Yaudheya inscriptions have been discovered at Bijaygadh." It follows therefore that the Yaudheya territory, at least at its greatest extent, may be roughly defined as being bounded on the West by a line from Bhawalpur along the Sutlej and the Beas up to Kangra, on the North-East by a straight line drawn from Kangra to Saharanpur, on the East by a line drawn from Saharanpur *via* Panipath and Sonpath to Bharatpur and on the South by a line drawn from Bhawalpur *via* Suratgarh, Bhatner, Sirsa to Bharatpur. The area of this vast extent is about 72,000 square miles, *i. e.* about three times the whole of ancient Greece. It will be rash to accept that throughout their political existence the Yaudheyas occupied this vast territory, but it would be as rash to deny that this at least represents the greatest extent of their dominions.

RAMESH CHANDRA MAJUMDAR.

## THE CAVENDISH LABORATORY AND SIR J. J. THOMSON, F. R. S.

BY ALEXANDER WOOD, B.A. (Cantab.), D. Sc. (Glas.)

There is a strange fascination about a Research Laboratory. An element of romance surrounds the attempt to pry into Nature's secrets and discover the principles upon which she works. It is impossible to pass through the rooms with their weird collections of mysterious-looking apparatus, each with its eager manipulator, without having one's curiosity and interest aroused. This feeling is intensified if the rooms are associated with the work of men whose names are known and honoured all over the scientific world. The Cavendish Laboratory, at Cambridge, is no exception to this general rule. There are other laboratories better built and better equipped, but there are none

whose associations and traditions appeal to us more strongly. Not that it is an ancient institution. By comparison with the ancient colleges which surround it, it is painfully modern, and yet, in its short existence, it has acquired traditions of which all who are connected with it are proud. We must mot entirely lose sight of the ordinary teaching work of the laboratory—that is an important side of its activities—but its fame as an institution has been built up mainly by ths professors and students who have carried on original work within its walls. Year by year and month by month the pages of the *Philosophical Transactions of the Royal Society* and the *Philosophical Magazine* bear eloquent testimony at once to the quality and quantity of the contributions of the Cavendish to our knowledge of Physical Science, and if we take into account not only the work done there, but also the work inspired there but carried on elsewhere, we shall be in a position to appreciate the place which the Cavendish occupies in the scientific world,

The laboratory was given to the University and equipped by the seventh Duke of Devonshire, grandfather of the present Duke, and it comes to us as a surprise that it is only thirty years since it was completed. It seems incredible that we are separated by so short an interval from a time when students had no opportunity of engaging in original research ahd could not even take a course in practical experimental physics. The laboratory was named after the Hon. Henry Cavendish, an ancestor of the donor. He died in 1810, not too late to belong to a time when it was still possible for one man to traverse the whole field of Physics and Chemistry and do lasting work in every part of the field. He was a pioneer in the chemistry of the the atmosphere and of the water, while in Physics he was far ahead of his time. Undoubtedly his most important work was contained in his electrical researches. These were not published until long after his death, when his papers were given to Maxwell to edit. The experiment with which his name is principally associated and which appeals most strongly to the popular imagination is the "Cavendish" experiment. In this experiment he used the torsion of a wire to measure the attraction between two metal spheres, and applied his result to "weigh the earth," *i. e.*, to a determination of its mean density and mass. For these quantities he obtained values which agree well with those obtained by later experimenters. He was an eccentric genius and lived in a house on Claphan Common. He had a magnificent library some little distance from his house, and this his friends were allowed to use without any restriction, but he himself never took out a book without making out a careful receipt for it. He led a very lonely life, and had a horror of publicity and public functions. He died at the ripe age of 80, and is supposed

to have spoken fewer words in his lifetime than any other man of the same age—the trappist monks not excepted.

When it became known that Sir William Thomson—as he then was—had refused to become a candidate for the newly endowed chair of experimental Physics in Cambridge, the thoughts of those interested turned at once to Clerk Maxwell, and he received many urgent letters pressing the claims of the work upon him and begging him to become a candidate. This he had first refused to do, being unwilling to leave the quiet of the country house to which he had retired. Finally, however, he consented; there was no other candidate, and he was appointed unanimously.

During the tenure of his Professorship, Maxwell's time was largely occupied with the work of supervising the construction and equipment of the laboratory. Every plan was minutely discussed, every piece of apparatus carefully thought out down to the smallest details, and he would accept nothing until he had convinced himself that it was the best possible. Even when this work was completed he had very little time for independent research, owing to the extreme conscientiousness with which he discharged the duty of editing Cavendish's papers—a duty entrusted to him by the Duke of Devonshire. This entailed a great deal of experimental work and was not completed until 1879, within a few months of his death. The contributions of Maxwell to Physics are too well known to require more than a brief mention. His name will always be associated principally with the development of the electromagnetic theory of light. This was the subject upon which he lectured chiefly, his work combining in a wonderful way the mathematical and experimental methods of attack. Like Faraday, he had a mind which loved to search out mechanical analogies to phenomena in other branches of physics, and several of the mechanical models constructed by him are preserved in the laboratory. The subject of colour vision had a strong attraction for him, and by means of ingenious colour-mixing devices he obtained equations showing in what proportions the three primary colours must be mixed in order to produce any given shade. One of these devices—the colour top consisted of a top which could be rapidly rotated and over which discs painted with the three primary colours were placed. These were so arranged as to give three coloured sectors whose areas could be altered at will. Two smaller discs, one painted with the colour to be matched and the other painted black, were placed over the other and the top rapidly rotated. The colours blended so as to give a continuous impression, and the areas of the sectors were altered until the outer ring matched the inner one. On one occasion he had been spinning one of his tops in his rooms at Trinity College for the entertainment of some of his friends, and when the party broke up

the top was left spinning on the hearth. Next morning Maxwell, seeing one of his friends coming across the court, jumped out of bed, re-started the top, and retired once more between the sheets, thus earning for the top a reputation which was the talk of his friends for some time afterwards. A fourth piece of apparatus has an interesting history also, although unconnected with the Cavendish. It is one of the very earliest thermometers, in which temperature was measured by the expansion of a liquid in a glass envelope, and was probably constructed by Rinieri, a pupil of Galileo, in Florence, in the 17th century. By means of this and similar thermometers a large number of observations on climate, etc., were made by themembers of the Academy del Cimento, but all the thermometers were subsequently lost, and, as they had been graduated on an arbitrary temperature scale, the observations could not be interpreted. Fortunately, many years after, several of his thermometers were found, and this one was presented to the Cavendish Laboratory.

Upon Maxwell's death, in 1870, Lord Rayleigh was elected to the vacant Professorship, and while he held it the Cavendish School of Physics increased its reputation both on account of his own work and of the work done under his supervision. His is a versatile genius, and among the various subjects which he has attacked from time to time there are many which have an interest wider than the scientific one—the discovery of the rarer constituents of the atmosphere, his researches on acoustics and those bearing on music; these and many others attract us, but we must not on that account under-rate the more prosaic work which he carried out during his stay at the Cavendish. This consisted principally of a re-determination of electrical units—a research attaining such accuracy and finish as to have become classic.

In 1884 Lord Rayleigh left Cambridge to become Professor of Physics at the Royal Institution in London, and the electors to the Cavendish Professorship were left with the uncommonly hard task of choosing a successor to Clerk Maxwell and Lord Rayleigh. The chances of success must have seemed small, and yet we know now that by a happy inspiration they made a wise choice and selected a man who was able not only to maintain the high traditions, but even to add greatly to them. The new Professor, moreover, when elected had only distinguished himself in Mathematics, and in Experimental Physics he was practically untried. Now, of Professor Thomson's work even "the man in the street" knows something—if only that, among other things, he has "split the atom." Maxwell had maintained that researches on gases were the most likely to lead to definite information as to the constitution of matter, and the work of his

successor has abundantly verified this prediction. By a masterly series of researches on the mechanism of the conduction of electricity through gases, he has shown that the process consists of a kind of electrolysis in which oppositely charged particles move in opposite directions, giving up their charges to the two electrodes. The carriers of the positive electricity have approximately the same mass as the atoms, while the mass of the carriers of the negative electricity is about one thousand times smaller.

These minute negatively-charged particles have since been found to be of almost universal occurrence, and, indeed, to be, in all probability, the raw material of which all the atoms are built up. The positively-charged particles, on the other hand, appear to be atoms which have lost one or more of these "electrons." The atom on this view consists of a number of these electrons held together and electrically neutralised by a positive charge. In any gas under ordinary circumstances two opposite processes are continually going on. Atoms are parting with electrons or "ionising," as it is called, while at the same time the positive and negative ions thus formed collide from time to time and recombine. The result of these opposite processes is that a balance is soon reached between them, after which the number of free ions in each unit volume of the gas remains constant. Thus a gas is always a conductor of electricity, although its conductivity is so small that special methods are necessary to verify the fact.

Professor Thomson has shown, too, that the pencil of rays coming from the cathode during the passage of an electric discharge in an exhausted tube consists of a stream of these small electrons. This conclusion was contested for some time—especially in Germany —but it has now been shown to be a true account of the phenomenon. For, in spite of the minute size of these electrons Professor Thomson was able to determine their mass, the magnitude of the electric charge which they carry, and the speed with which they move.

That so much information has been obtained about these small electrons—far more than we have acquired about the comparatively large atom—is due to the fact that they carry an electric charge. Thus, when moving in the space between two oppositely charged metal plates, they are acted upon by a constant force which deflects them from their straight path in much the the same way as a stone is deflected from its original direction when thrown in the air. The amount of this deflection for the electron can be calculated in terms of its charge, its mass, and its velocity, and if we can measure it we obtain a relation connecting these three quantities. Early experiments were unsuccessful, but Professor Thomson pointed out the defect in the arrangements, and successfully measured the

deflection. This he did by observation on the stream of cathode particles in the discharge tube placed between two parallel metal plates. The position of the point where a narrow stream of these particles impinged on the end of the tube was indicated by a small green phosphorescent patch on the glass, and when the metal plates were charged, this patch moved through a distance which could be easily measured. A stream of charged particles behave exactly like an electric current, and so can be deflected not only by charged plates, but also by a magnet. This magnetic deflection was also measured by Professor Thomson, and so a second relation connecting the charge, the mass, and the velocity of the electrons was obtained. From these two relations both the velocity and the ratio of the charge to the mass could be determined. The velocity was found to be about $3 \times 10^9$ centimetres per second—about one-tenth of the velocity of light—while the ratio of the charge to the mass was found to be about 1,700 times the corresponding ratio for the hydrogen atom in electrolysis. This was an extremely interesting result, indicating, as it did, that the electron either had a mass very much smaller than that of the hydrogen atom, or carried a charge very much larger. Professor Thomson decided between these two alternatives by determining independently the charge carried by an electron. In this case the electrons used were those produced in air and other gases by radium or Rontgen rays, their identity with the cathode particles being beyond doubt. The method was based on two previous discoveries, a theoretical one due to Sir George Stokes who showed that from observations on the velocity with which a cloud settles the size of the drops can be calculated, and an experimental one by Mr. C. T. R. Wilson that the electrons could act as nuclei for the formation of a cloud. Some dust-free air, saturated with water vapour, was caused to expand suddenly. This expansion cooled the air, and that portion of the water vapour which it was no longer able to hold condensed on the electrons to form a cloud. The cloud settled sufficiently slowly for fairly accurate measurements of its velocity to be made. This gave the size of the drops, and, therefore, the quantity of water contained in each drop, and, dividing this into the total quantity of water deposited—calculated from the amount of the expansion—Professor Thomson obtained the number of drops and, therefore, the number of electrons in each cubic centimetre of the gas. Observations on the electric current between two plates in the gas, made under the same conditions as when the cloud was formed, gave the total electric charge carried by the electrons in a given time. But the number of electrons was known, and this, with other data previously determined, gave the charge carried by each

electron. It proved to be the same as that carried by the hydrogen atom in electrolysis, thus suggesting an atomic structure for electricity with this charge as the atom. On this view all monovalentions in electrolysis carry two atoms, and so on. It was at first supposed that the whole mass of the atoms was due to the corpuscles contained, the hydrogen atom probably containing about 1,700, and the atoms of other elements more in proportion to their atomic weights ; but Professor Thomson has since shown that the number of corpuscles in an atom—or, at any rate, the number whose presence is indicated by phenomena of conduction of electricity and heat, and by certain optical phenomena—is probably not very different from the number expressing the atomic weight of the element. Thus, the positive charge on the atom seems to play a more important part in determining the mass of the atom than was at first suspected.

Professor Thomson also showed that if a charged particle were in motion it had an apparent mass, due to its charge. The reasoning by which this result is reached is beyond the scope of the present article, but a mechanical analogy may make the matter clearer. Suppose a massless sphere to be moved through a fluid, it would be found to behave exactly as if it has mass, *i. e*, it would require a finite force to give it a finite acceleration. This is due to the fact that the sphere carries a certain definite mass of fluid with it. In the same way we may imagine the electron with its system of tubes of force radiating out from it to grip and carry with it some of the ether, through which it is moving. An interesting deduction from this is that the apparent mass of an electron ought to vary with its velocity, being nearly constant for small velocities, but increasing rapidly as the velocity approaches that of light. When this inference was first drawn it was impossible to obtain electrons moving with a velocity great enough to make possible any test of its validity. The discovery of radium solved the difficulty, however as the $\beta$ rays were shown to consist of a stream of these electrons, some of them moving with a velocity nearly as great as that of light. These electrons were found to have a mass apparently greater than that of the slower ones. Professor Thomson calculated the mass which ought to correspond to the different velocities on the assumption that the mass of the electrons was entirely of the electrical nature, and the observed values agree with these calculated ones to an accuracy quite surprising. Thus, there is considerable evidence for the view that mass is electrical in its origin, and in this case the mass of a body is not concentrated in the body itself, but is distributed all through the universe. This conception constitutes a most important advance in our view of the constitution of matter, amounting as it does, to an identification of mass

with electric charge. Recently, Professor Thomson's work has been mainly directed towards the elucidation of the nature and properties of positive electricity—a problem which has proved much more difficult than the corresponding one for negative electricity. Among his more important published works may be mentioned "Applications of Dynamics to Physics and Chemistry," "Recent Researches in Electricity and Magnetism," "Conduction of Electricity Through Gas," "Corpuscular Theory of Matter," and the series of Text-books of Physics, which he has brought out in collaboration with Professor Poynting.

But we should do an injustice to the memory of the students who have worked in the laboratory, as well as to the Professors who have guided them, if we failed to acknowledge the part they have played in making the Cavendish what it is. During the earlier years they were few in number, but later on, when Cambridge offered facilities to graduates of other universities to come as advanced students, the numbers rapidly increased, until now there are about thirty men engaged in original work. The temptation to name some of these is a strong one, but the full list of their names is almost infinite now, and it is essential that this article should be finite. They form a descending scale of such small gradations that even if we could be quite certain of naming the greatest of them there would be no obvious place to stop until we had completed the list. They came to the Cavendish from all quarters, absorbed its spirit and its traditions, and went forth again to Professorships and other scientific posts all over the world. Some of them were Professors of standing before they came, but few have gone away without acknowledging their indebtedness to the institution and its head. Science possesses few personalities more striking and attractive than that of Professor Thomson. His enthusiasm is infectious, and his unbounded energy impresses all who come into personal contact with him. He lectures to his advanced class, making scientific history as he goes; he lectures to his elementary class on Properties of Matter, giving them a liberal education; he does the thinking for his own researches, experimental and theoretical, and is always ready to do some for the twenty or thirty men whose work he supervises; yet in spite of it all he has more time for other interests than most men. How he does it is a mystery. When he sleeps, or, indeed, whether he ever does sleep, his students cannot say, but the fact remains that in recent fiction, in the drama, in sport, and in politics, he is abreast of the times and ready to be entertaining or entertained on one or all of these topics. The personal relations between Professor and students have always been of the warmest nature. Tea in the Professor's room—a daily function for the research students—is made the

opportunity for free intercourse, and any suggestion of stiffness or formality is banished. When the Professor received the Nobel Prize, nowhere was the rejoicing more keen than among his own students, and if the enthusiasm over his recent knighthood is less warm, it is only because it is felt to be a hardly adequate recognition of the man and his achievements.

Of the buildings themselves little need be said. The original central portion, built in Maxwell's time, is still in use. As the study of physics became more general the demand for space became urgent, and the need was met by the erection of a large demonstration room—and an additional lecture-room. Even this accommodation was rapidly outgrown, and both research and the ordinary teaching work were hampered until the new wing, largely due to the munificence of the former Cavendish Professor, and present Chancellor of the University, Lord Rayleigh, was opened by him in the summer of 1908. The provision for the work of the laboratory is now once more adequate, and it is undoubtedly entering upon a new era of success under the man whose 24 years' association with it has done so much to make it famous.

"THE KNOWLEDGE."

## SOME LOCAL INDUSTRIES DEPENDENT ON AQUATIC ANIMALS.*

We are to consider tonight, necessarily very briefly, some local industries dependent on aquatic animals.

Fish, of course, are aquatic animals, but, in the short space of time at our disposal it will be impossible for us to include even a short description of the Fisheries of this province.

The industry, however, is a large and important one, giving employment to a considerable body of men, even though it may leave unsatisfied the legitimate wants of thousands of others.

We propose, therefore, confining our attention to three of the lesser known industries.

We will first deal with the Turtle Fisheries.

### Situation of the fisheries :—

Unlike fish, mud-turtles occur plentifully in practically all the waterways of Bengal. They are also abundant in many of the larger tanks.

Turtlefishing is a common industry throughout Eastern Bengal but the principal fisheries and markets are situated in the Districts of Barisal, Khulna and Faridpur.

* Lecture given at the Indian Museum at 9-30 P. M. on 3rd September, 1915.

Turtles are also fished from the Beels in the District of Dacca and Murshidabad.

In Bihar they are obtained from the Ganges by the Santals, who are the great patrons of turtle consumption.

**Extent of the industry** :—

At the present time we have no means of estimating with any degree of accuracy the extent or value of the industry, but our observations have led us to the conclusion that the total number of turtles fished per annum in this Province is not less (and probably very much more) than 70 or 80 thousand, and that the market value of these turtles is not far short of one lakh of rupees.

**Methods of fishing** :—

Fishing is confined to the cold weather. There are various methods of fishing.

**Drag nets** :—

Large drag nets are frequently used. In this case the men fish in parties, each party consisting of from 10 to 16 men. The nets are from 30 to 40 feet deep. The mesh is usually 8 or 9 inches. The fishermen shoot their nets from two widely separated boats, and at each haul it is not unusual to obtain a catch of 20 or 30 turtles.

**Fixed nets** :—

Fixed nets with pockets are also employed. In this case the turtles wander into the net and finally into the pocket. They are thus entangled and captured.

**Weighted ropes** :—

Another method of fishing is to drag with weighted ropes. A long rope is weighted by tying bricks along it at more or less regular intervals. It is then dragged along the bed of the river, either from both banks, or by means of boats. When turtles come in contact with either one of the bricks or with the rope, they retract their head and legs, and are carried along the bottom of the river with the rope. When the fishermen feel that dragging has become difficult, they bring the two ends of the rope together to one side of the river and haul the catch to the bank.

**Harpoons** :—

Harpoons are also employed. The harpoon used in turtle-fishing consisting of two parts. First there is a tapering bamboo, usually eleven feet long, having a diameter of 1½ inches at one end, and a diameter of ¼ inch at the other end. The bamboos are cut so that there is a node near each extremity which serves to prevent the bamboo from splitting. The node at the thicker end of the bamboo is usually situated 2 inches from the extremity. Between the node and this extremity there is a hollow cavity into which the second part of the mechanism fits. This consists of a solid piece of steel, and it is inserted

into the cavity of the bamboo like a cork into a bottle. This solid piece of steel bears a barbed, trident-shaped, steel spear. A piece of very strong twine connects the arrow-heads to the handle of the bamboo. This string or rope is about 60 feet long and is coiled round the bamboo when the harpoon is ready for use. Great skill is required in using this instrument. When the fisherman discovers a turtle at a distance, he slings his harpoon into the air in a direction such that, on descending, it is calculated to strike the animal on the carapace. The points of the spear being made of steel, easily penetrate the flesh. The turtle when hurt in this manner, descends to the bottom, but the handle being now detached from 'the arrow head, floats up, and the fishermen are thus able not only to locate the position cf the wounded turtle, but are also able to drag it up to the surface by means of the stout twine before described.

## Catches by hand :—

In the Beels of Eastern Bengal a more primitive method of fishing obtains. During the rains, and for some time subsequent, these beels are connected with the main river or rivers, by a series of narrow, shallow, tortuous channels. As the rains recede, the turtles follow these channels in order to reach the main rivers. The turtle fishermen select a place along the course of such a channel, where there is a sudden bend. A small excavation is made in order that the water may have a fall of about one foot. The turtles migrate to the rivers during the night, and, on account of the narrowness of the channel at the site selected, they are obliged to travel in single file. The method of fishing is as follows.—A fisherman stands in the water close to the "fall." His hands are out-stretched in such a manner that any turtle moving downstream falls into his hands. When caught, the fisherman immediately makes over his catch to a second fisherman, who is waiting near by. After a time he is relieved by other fishermen. The catches are placed in the hold of a boat which is kept in readiness. The success of this method depends on everything being done quietly, so as not to frighten other turtles in the rear. It is said that by this method as many as 600 turtles have been caught in one night.

## Trench digging :—

Perhaps the most peculiar method of fishing for turtles is that practised at certain places in the Khulna and Barisal Districts. Only one species of turtle, viz., *Trionyx gangeticus* (Khalu kachin), which is a very gross feeder, is caught by this method. We have ourselves seen this species feeding on the highly putrid carcass of a buffalo. The fact that certain turtles are fond of eating human corpses, left partly burnt in the Hindu cremation grounds, is well known

amongst the fishermen, who actually utilise this fact in capturing them. The method is as follows.—A man is covered from head to foot with a white sheet, and is placed at a short distance from the water. A trench is dug between the man supposed dead man and the water. The party of fishermen then cry out (Bola hari hari Bal) —a phrase usual when the dead body of a Hindu is brought for cremation. At this cry the turtles come out of water, and in their attempt to get at the supposed dead body, fall into the trench and are taken by the fishermen.

**Species fished** :—

Nine or ten species of turtles are widely distributed throughout Eastern Bengal.

They fall into two groups.

In the first the carapace or shell is hard and convex, the eggs are usually oval. In the West Indies the members of this group are known as Terrapins. The fishermen in Eastern Bengal call them Kattuas. In the second group, the shell or carapace is soft and flattened, and the eggs are round. These are the true mud-turtles and are known as Kachhaps amongst the fishermen of Eastern Bengal. The Santhals also recognise two groups, one of which they call Lepra and the other Hurun. There are four species oi marketable mud-turtles and six species of tortoises.

**Mud-turtles** :—

The largest and most common mud-turtle is *Chitra-indica*, known as Chhim in Eastern Bengal. It frequently measures 4 or 5 feet along the carapace and is said sometimes to attain a a weight of 7 maunds (or 5 cwts). The animal appears to feed on fish and snails. People who eat this species state that it is coarse and tastes bad.

Another important mud-turtle is *Trionyx gangeticus* known as Khalua kachin in Eastern Bengal, and Kattha or Palaiya in Bihar. It grows to a length of 4 feet and frequently weighs 3 maunds. Fishermen state that this species is particularly fond of decaying human flesh. It is said to linger in the vicinity of the various cremation ghats along the banks of the rivers from Khulna to Barisal.

We have already seen that one method of catching this species, adopted by certain fishermen, depends on the fondness of the animal for decaying carcasses.

The same observation has been made in the Punjab with reference to the feeding habits of this species. The flesh is eaten by many of the Hindus of Barisal, and it is said to be good and tasty.

The two other species of mud turtles, known as Gangachhap (*Trionyx hurun*), and Malia, (*Emyda granosa*) are comparatively unimportant. They are small in size and respectable in their habits.

Of the five species of the tortoises or Terrapins, only two attain to any dignity and importance. The Kali

kattua (*Hardelli thurgii*) grows to a weight of about half a maund and measures about 2 feet long by 14 inches broad. Certain markings near the mouth of this species are regarded by the fishermen as footmarks of the God Sri Krishna.

The other species, known as Salgam kattua (*Kachuga lineata*), also weighs about half a maund when full grown, and measures about 3 feet by 20 inches. Fishermen are frequently epicures, and I am assured that this species is inferior in flavour to that of Kali kattua.

The smaller tortoises call for no remark except that the fishermen say that, when young, these tortoises have a head which is like that of a bird and the meat is like that of a tender chicken.

**Transport :—**

Until recently, the importation of turtles to Calcutta was of an extensive nature. Usually, the turtles were stored in Calcutta in small ponds, their fore and hind feet being sewed together, and a hole, to which a string is attached, bored in the cartilaginous part of the disk. They live for months in this condition. Large numbers of turtles can frequently be seen turned on their backs, and secured, along the banks of the river Padma at Goalundo. In consequence of the cruel manner in which the transport of turtles was effected, all the railways have now ceased to carry turtles over their lines. This fact has somewhat crippled the industry, and, unfortunately up to the present, no satisfactory method of conveying turtles cheaply, and without cruelty, has been devised.

It will be evident that large quantities of turtles are consumed in Calcutta. The Chinese are said to be fond of the flesh of certain species. Amongst Indians, the Santhals are the great patrons of turtle consumption. Two or three kinds of tortoises are regarded as clean food for Hindus.

Certain Mahomedans eat turtles and others do not. The Shafi school teaches that all animals living in rivers may be eaten. This includes mud-turtles. The adherents of the Hanifi school, however do not, as a rule, eat turtles, although turtles are not definitely forbidden in the same sense as the pig.

Turtle flesh is available in many Calcutta markets such as Calcutta Natun Bazar, Kiddepore, and Sandhya Bazar in Ramkrishtopur, and at Entally. The price is about 10 annas per seer.

I have never heard of any Europeans eating mud-turtles. To acquire the taste for mud-turtles would, I imagine, necessitate a strong and robust constitution, great persistence and character, degenerate olfactory organs, and a hunger which devoured the soul. Many Europeans have, however, heard of turtle soup. This is prepared from a marine species which feeds principally on weeds and shell fish.

One species—*Chelone mydas*, occurs in the Bay of Bengal, and off the coast

of Ceylon. During protracted periods at sea I have frequently eaten the flesh of this animal which is excellent in every way. The soup made from it is the real thing. The eggs are palatable when curried. The is some difficulty however in killing the animal. The flesh twitches and quivers for nearly a day after the animal is dead. I remember on one occasisn killing one of these turtles by severing the head from the body. On picking up the head carelessly some hours after, the jaw closed on one of my fingers and split it open. The jaws are immensely powerful and I have known this turtle to crush chank shells, which I could only break with difficulty with a sledge hammer.

**Pearl Mussels** :—

Another local industry which we shall now describe is that of button making.

Buttons are made from the shells of fresh-water pearl-mussels.

The principal centre of this industry which is entirely of a domestic nature is in the Dacca District, although buttons are manufactured on a smaller scale in other places, such as Calcutta and Berhampur Court.

In the Champaran District of Bihar a button factory was established in the year 1905.

The fishery for pearl mussels is a very ancient one in this Province. Up to a few years ago the shells were all burnt and made into lime, the pearls of course being used by the women folk for personal adornment. Amongst the wealthier classes the smaller pearls were and still are powdered and used as *chuna* along with betel nut, and tobacco.

**History of button-making in Bengal** :—

Although these fisheries have been in existence for such a long time, the utilisation of the shell for making pearl-buttons is of quite recent origin, and is due in large measure to the initiative of a certain Babu Shyama Charan. This gentleman is still alive, and when asked to tell his story, stated that he started life as a professional clown in a *jatra* or theatrical party On one occasion the party performed at Comilla. Here he found some very large shells. He purchased a number for 6 pies (d). He knew that shirt-buttons were manufactured elsewhere from shells, and he thought that the shells he obtained at Comilla could be used for the purpose. Having no other instrument, he used an ordinary *dao* to cut the shells into small roughly circular pieces. The irregular edges were ground off with a muller (stone roller). An ordinary nickel or copper coin was employed for marking out circular pieces of the shell. The holes were made by means of a needle made fast into a wooden handle. The shells being clean and almost white in colour, required no polishing. He kept the buttons he had made and prepared more from time to time. One day the jatra

party went to perform at the palace of the Raja of Jaydebpur. When the Raja saw the buttons, he purchased them for Rs. 1-4. Thus by working in his leisure hours, and with raw materials which only cost 6 pies, Babu Shyma Charan found that he could earn Rs. 1-4. in a short time. He then started work in earnest and accordingly gave up his profession as a clown for which he only earned Rs. 10 per mensem. This happened 35 years ago He was henceforth able to earn a good living by manufacturing buttons. At the height of the *Swadeshi* movement, his income from the sale of the buttons was very considerable. At that time he was working at Dacca, at which place other men, with more capital than he had, joined him and started a "factory." A large number of men from Barpara and other villages in the district of Dacca also came and worked in the factory and thus learned the work. These workmen eventually spread all over Bengal, and as all castes are allowed to engage in button-making, the practice soon became widespread.

### History of Button making in Tirhoot :—

The Tirhoot Button Factory originated in a somewhat similar manner. The present Superintendent states that on the *Dasahra* day in the year 1905 when they were going to bathe in the Gandak river they found a few thick mother-of-pearls lying here and there. The brilliancy of these pearls naturally attracted their attention and they took them home with a view to see if they could be cut and shaped into buttons which they knew were made of the same material. As soon as they reached home, they broke them into pieces with a piece of stone, and having rubbed them on a grinding stone, made them round, but finding difficulty in boring them, the help of a blacksmith was at once sought and with his aid the difficulty was soon overcome. They prepared some 64 buttons that morning and utilised them in their clothes. though they were in an unfinished condition. As a result of this incident a company was formed, and machinery was imported.

### Extent of Industry in E. B. :—

In Eastern Bengal about 1500 to 2000 persons are employed in actually manufacturing buttons. We have been unable to ascertain the actual numbers of buttons manufactured per annum, or their value, but that the industry is an extensive one is indicated by the fact that the value of the pearls obtained from the mussels fished, averages about 30,000/- per annum. It is estimated that during each week, not less than 1,000 men bring buttons for sale to the principal markets of Eastern Bengal and that each man realises from Rs. 2/- to 3/-. On this basis it would appear that the sale of buttons from the villages in the Dacca District alone

represents about one lakh of rupees per annum.

Button making is carried on principally by the women folk. The instruments used are of the simplest kind and comprise a pair of cutting pliers, an ordinary file, a grindstone in a wooden trough fitted with a handle, a small box which serves as a table, and a few hand drills. The buttons are cleaned in kerosine oil and polished with nitric acid.

## In Behar :—

As we have already seen, there is a modern button factory at Tirhut. About 40 men are employed in the factory. Of these 25 men have been specially trained and are permanently retained. The remaining 15 are engaged collecting shell, preparing copper attachments for links and buttons, repairing machinery, and fixing the studs and buttons to cardboard, ready for the market. Occasionally the factory is obliged to close, on account of the scarcity of shells. About 60,000 buttons are prepared per month, but during the current year an endeavour is being made to produce 3,500 buttons daily. Experiments are also being made by them to obtain shell from Bombay. The cost, however, considerably increases the price of the finished articles. As an experiment, buttons are also being made from the carapace of mud-turtles.

Buttons made in this Presidency and in Bihar are available in the Calcutta markets. The buttons in general are slightly inferior to those imported from Japan, England and Austria, because the local shells are not so massive as those available elsewhere. In addition to buttons, various kinds of ornaments, nose-pendants and watch-chains are manufactured from shells in the suburbs of Dacca town.

## Shells used :—

The shells principally used in the manufactures of buttons and ornaments in Bengal and Bihar belong to two genera, viz., *Parryasia and Lamellidens* (family Unionidae). The various species of the genus *Lamellidens* have shells which usually are not very massive. Members of the genus *Parreysia* have shells more rounded in appearance and more massive than is the case in the genus *Lamellidens.*

## Methods of fishing :—

The method of obtaining the shells is simple. In shallow water the fishermen merely stand in the water, and submerging their heads, pick up the shells. In deeper water the area to be fished is marked by a smooth upright bamboo which is firmly fixed in the mud. The fisherman has a bag round his waist and slides down the bamboo to the bottom.

The people who actually fish mussels in Eastern Bengal, and whose forefathers were similarly engaged in years gone by,

are a certain class of wandering Muhammedans who appear to have no home except on their boats. When not engaged in fishing for mussels, *i. e*, from June to January, it is amusing to note that they all engage in selling—articles of stationery.

**Expansion of the industry** :—

Our enquiries into the manufacture of buttons have made it clear that the local industry reached its zenith during the height of the *Swadeshi* movement and that since then, it has steadily but persistently declined. The cause has undoubtedly been scarcity of shell. So far as mussels are concerned (and the same is true of fish), the resources of nature are evidently not inexhaustible. The expansion of the industry in future years will undoubtedly depend on a sufficient supply of suitable shell being available. The difficulties in bringing about this very desirable result will be obvious if we consider for a few moments the breeding habits of the adult mussels, and the life history of the young.

The various species of fresh-water mussels in Bengal are included in the family Unionidæ, all the members of which carry their young in their gills during a part of the embryonic development. The female mussels lay eggs which pass into the superbranchial chambers when they are fertilized by the milt from the male which is washed in by currents.

The superbranchial chamber referred to, acts as a marsupium and various modifications take place in the different genera of Unionidae. In some cases, the outer gill of the parent mussel is utilised for storing the larvæ which are known as Glochidia. In other cases the larvæ only occur in portions of the outer gill' whilst in still other cases all the four gills are utilised as brood chambers. In some genera, the Glochidia or larvæ are discharged into the water immediately they are developed, whilst in other genera they remain in the marsupium for months.

Two types of Glochidia are known amongst the *Unionidæ*. One kind possesses stout hooks on the ventral margin of the valves; the other is entirely devoid of hooks, but is glutinous.

The Glochidia, when liberated from the marsupium of the mussel, attach themselves to certain fishes. If the Glochidium is of the hooked type, it attaches to the outside of the fish and is usually found on the margin of the fins, etc. When the larvæ do not possess hooks, they are usually found in clusters amongst the gill filaments of the fish. If the larvæ fail to attach themselves to a fish, they die. In Bengal, we do not know as yet whether the larvæ possess hooks or not. Neither do we know to which species of fish they attach. We have, however, found Glochidia on the fins of *Ophiocephalus marulius*, (Sâl). But it will be obvious that with such

a close connection between fish available at any particular place is likely to directly affect the supply of mussels.

It will further be clear that no improvement in the mussel fisheries will be possible until the details of the life-histories.of the various species of fresh water mussels in Bengal have been thoroughly investigated. When once this work has been done, it should be possible to undertake the cultivation of mussels on a scale sufficiently large to meet the demands of local button manufacturers

We have already called attention to the fact that besides providing the raw material for lime, buttons, and ornaments, mussels also produce pearls. The manner in which pearls are produced, and the nature of their origin are matters which have not been extensively investigated up to the present. Working with the English marine mussel which also produces pearls, Dr. Jameson has shewn that pearls are formed round the larvæ of parasitic Trematodes (or flukes). The life-history of the parasite is, however, a little uncertain. It seems probable that the younger stages occur in the cockle (cardium edule), and that the adult worm lives in the Scoter Duck. The most important pearl-fisheries belong to the Government of Ceylon and are situated off the north-west coast of that Island. The so-called pearl-oyster is, in reality, more nearly allied to the mussel family. The pearls produced are the finest obtainable. The earliest beliefs regarding the origin of pearls are as interesting as they are poetic·

The pearl oysters were supposed to come to the surface of the water at daybreak in order to take the fresh morning air. As the oysters opened their valves, drops of dew fell upon them, and these recrystallised into pearls. Other writers believed that pearls were the tears of Nereids. Later writers however born in a more practical age, despised the poetical explanations and referred the formation of pearls to irritant foreign bodies such as grains of sand, abortive ova and the like. Only within very recent years has the nature of pearl-formation been investigated in a scientific manner. I trust I may be pardoned for summarising the work which has been done on pearl formation in the Ceylon Pearl Oyster, because the formation will help us to a better understanding of what probably takes place in the Bengal mussels.

Pearls may be divided into two classes. First seed pearls. These are always small and irregularly shaped. They invariably occur in the muscles of the animal and appear to be caused by the sheer or chafing of muscles working in different planes. The second class are known as orient or cyst pearls. It has long been known that, in the tissues of the Ceylon Pearl-Oyster numbers of minute rounded larval parasites occurred. These have been determined as young Cestodes or Tapeworms.

The presence of these parasites led to the suggestion that in all probability they were in some way connected with pearl formation. Investigations which have been conducted on this question during the last ten years practically proves that such is the case. It appears that, when for some unexplained reason, one of these parasites dies in the flesh of the oyster, local irritation is set up. As a result, certain of those cells which are normallv concerned in secreting the pearly inside of the shell, wander in and surround the dead parasite. The pearl is layed round in laid like the layers of an onion. The oyster may contain a large number of parasites but it will be noted that, apparently, pearls are only formed round dead parasitic larvae. A pearl is therefore in reality a sarcophagus.

The Ceylon oyster lives for about 6 or 7 years. It is obvious that if a a pearl formation commences to form when the oyster is young it will have attained a considerable size before the oyster is old. Conversely if pearl formation commences late, the pearls even from an old oyster, may only be small.

It will be evident, I think, that if all the larvae parasites in the oyster could be killed when the oyster was young, the pearl yield would not only be increased enormously, but the pearls obtained would be of large size. Unfortunately, even where the life history of the parasite is fairly well known it has been found impossible to utilse the information for the purpose of directly increasing the pearl yield. In Japan and other countries marketable pearls are obtained at the present time by artificially introducing foreign objects into the oyster. These become covered with nacre, and in due course find their way to the market.

Turning now to the Bengal fresh-water pearl-mussel we may note that at present we have no information as to whether the Bengal mussels are prolific pearl-bearers or not. Moreover. the pearl-inducing parasite has never yet been sought for. It is therefore unlikely that any improvement in the pearl yield will be possible until we have studied, in great detail, the habits of the mussel, and determined the factors which favour pearl production. It is certain, however, that a general improvement of the mussel fisheries will have the effect of increasing the number, and improving the quality of, the pearls produced.

Our time however is nearly exhausted, and in conclusion, I must attempt to summarise, as briefly as possible, the outstanding features of another local industry which, from every point of view, should be of absorbing interest to the educated people of this Province. I refer to the Chank-bangla industry, concerning which a most excellent accouut has recently been written by Mr. James Hornell, F. L. S., of tbe Madras fisheries Department (Bulletin

No. 7 Fishery Department, Madras, 1914, Rs. 2/-). The art of manufacturing bangles and other ornaments from the conch shell is a very ancient craft which at one time was almost universally practised throughout India. At the present day it is restricted almost entirely to Bengal, the principal centres being Dacca, Pabna, Dinajpur, Rungpur, Chittagong, Jessore, Khulna, Mymensingh, and Bankura. The shells are obtained from the sea, and the principal chank fisheries are situated off the Tinnevelly, Ramnad and Ceylon coasts. Conch shells are also available in quantity near Kathiawar, and off the Carnatic Travancore coasts. Up to the present, no chank shells have been recorded in the Bay of Bengal north of the Godavery river, but at the same time it must be remembered that they have not been carefully looked for off the coasts of Bengal and Orisssa.

### Imports.

It thus happens that all the chank shells used in this Province are imported from Ceylon and Southern India. In the year 1910, shell to the value of Rs. 2,38,877, representing about 2 laks of shells, were imported into Calcutta.

The bangles and other ornaments manufactured from these shells were worth over 15 lahhs of rupees *i. e.* about 1,00,000 £.

From Calcutta, the shells are distributed to the bangle-making centres previously noticed.

### Description of method of cutting chanks.

In Dacca the industry falls into two categories; first there are workmen who simply prepare sections of the shell. These sections may either be wrought into the finished product in Dacca itself, or else exported to other places in Bengal, where the trade is limited entirely to the ornamentation of sections already cut. The work is done in the house. In order to cut sections, a portion of the lip of the shell is first cut off. Then the columella (or central portion of the shell) is removed in order to save unnecessary sawing. After this process the shell is ready for carving into suitable raw pieces. Hornell, who has carefully studied the actual manufacturing processes states that the sawyer, sits on the earthen floor tightly wedged between two short stakes of unequal length driven into the ground, Against the longer, measuring some 15 inches above the ground the worker's back is supported, while against the shorter, which is only 4 to 5 inches high, his toes are pressed. The space between the two stakes measures no more than 18 inches, hence the workman, although he sits with his knees widely apart is very tightly jammed between the rests. This is found essential as it is necessary that his limbs should be rigid during his work, since his feet have to function as a vice during the sawing of the sections, the shell to be cut being placed between

the right heel and the toes of the left foot.

After the columella and the lip of the shell are removed, a disc of hard wood is placed over the mouth aperture of the shell to provide a firm purchase for the foot pressed against this side of the shell. The worker is now ready to begin sawing the shell into sections. For this purpose he is provided with a heavy hand-saw of great apparent clumsiness. The iron blade is of a deep crescentic form ending in an attenuate horn at each end. It is made of a stout forged iron plate, 2 mm. thick except for a distance of one inch from the cutting edge where it is worked down to a thickness of 0. 6 mm. A saw of this description costs Rs. 12/-, each workman providing his own. After sharpening, a new saw is adorned on each side of the blade with a number of red spots as auspicious marks.

In beginning work, the shell is placed somewbat obliquely between the feet, the apex directed to the right, and away from the worker, who places his left hand on one twine-covered tang of the saw and the other on the horn of the blade at the opposite extremity. Balancing the saw carefully in his hands, and at right angles to his body he applies the edge to the shell and begins a vigorous to and for movement of the saw from side to side, the course of the hands being through a short arc of a circle at each swing. Several times he pauses momentarily to adjust the shell anew as the work progresses. On an average it takes 4½ minutes to saw once through a shell. The number of working sections given by a single shell is determined according to the shape and size of the shell, and the thickness of the sections desired. For the narrow churi bangles as many as ten sections may be obtained from a good-sized shell, but for the broad bala bangle three are a good average. If five sections are cut from a shell, the shell has to be sawn through six times, so we must count five minutes as the minimum time required to cut off a working section. To this must be added the time occupied in re-sharpening the saw, a frequent requirement, owing to the great hardness of the shell.

In Dacca, a skilled cutter is paid at the rate of Rs. 10/- to Rs. 12/ per 100 shells sawn up, but for this remuneration he has to prepare the shells for cutting, a slow and tedious operation, and has to provide his own tools. One hundred working sections per day is the limit of production per man working upon shells previously prepared ready for sawing. In practice it is usually considerably less owing to various delays, normal as well as unforeseen—the repeated sharpening required by the saw, a badly prepared shell, a cut heel due to a slip of the saw, and often enough, a touch of fever. Shell cutting calls for the possession of a highly trained eye, perfect steadiness of hand and arm, and an *ironlike capacity*

to sit for long periods in a position of great discomfort. Unless in a perfect condition of bodily fitness such work is an impossibility. During apprenticeship few men can endure the strain sufficiently long to accustom their body to the habit of the strained position, the constant and monotonous attention required by the saw and the extreme fatigue of the occupation. As a consequence, the sawing of working sections is limited to a few centres and a good cutter is a valuable asset to his employer.

Hitherto the Dacca and other shell cutters have employed no machine saws. They believe that no machinery is capable of cutting the shells without damage, basing their belief on the results of an experiment with some form of machine-saw, tried some years ago. The cutters allege that the impact of the saw upon the shell caused innumerable small fractures which rendered bracelets made from the sections thus cut, fragile and liable to break much more readily than when the sections were cut by means of the hand-saw".

After the sections are cut, the inner and outer surfaces are made smooth, patterns are carved, and the bangles polished. In Bengal it is the custom amongst Hindu brides to wear two red coloured bangles ; at the wedding ceremony the chank is blown and blessings are showered on the happy couple in the following words :—

Ganga Jale Samudrer Shanke
Bar Kone chira shukhe thake.
Ganga ka pani Samunder ka Sank
Bor Konna ko jag-jag Anand

Accordingly there exists a considerable trade in lacquered bangles. The lac used, is common shellac ; this is coloured red by mixing with a suitable quantity of "Hingol" cinnabar.

It is impossible for me to convey to you any adequate idea of the part played by the conch shell in the social and religious life of the people of this Province. Although this subject is hardly within the scope of this lecture, I cannot pass it by unnoticed.

Specimens of chank shells are to be found in every temple and they are used as an instrument of invocation to invite the attention of the Gods to the ceremonies performed. It is also used in domestic worship amongst the Brahmins and by most Hindus of this and other Provinces. By removing the apex of the shell, it can be converted into a kind of trumpet, and as such is utilised as a call to religious ceremonies.

The native plantation owners in Southern India, and even in Ceylon, summon their coolies to work by a call on the chank shell.

In Bengal, Risley states that "the Ramavat sect of Vaishnavas pay particular attention to the call of the chank. By them, all forms of worship, except the unceasing repetition of the name Rama or Hari are deemed useless, but in every akhara or monastery of the

sect, an idol is tended at regular hours to the sound of chank shells and gongs, while offerings of flowers and fruit are presented by the laity."

Left handed or sinistral chanks are especially valuable and frequently sell at Rs 75 each.

In other parts of India chank shells from an integral part of the mendicant's paraphernalia; they are in evidence at the dedication of houses and temples, at the initiation of the harvest, and at marriage and death ceremonies. In southern India they are believed to ward off the "evil eye," and it is common to see bullocks with a chank tied on their foreheads. Similarly in Madras city, Hornell states that cow buffalos, when in milk, have a shell hung by a chain or cord round the neck, to prevent her from being "overlooked" and her milk thereby being dried up prematurely. It is of great interest to observe that chank shells are ordinarily used in Southern India as feeding spouts when wearing infants.

Up to about 50 years ago chank shells were used as currency amongst the hill tribes of Assam.

In medicine, the chank finds an extensive use throughout India. Water which has been in contact with a chank cures blotches, pimples and warts. A chank amulet is regarded as an adequate protection against rickets. Chank powder is good for asthma, coughs, dyspepsia, jaundice, consumption and ominous "shooting pains in the side."

Risley states that the Dacca workers frequently find remnants of animals in the apex of the shells they receive. These are extracted and sold to native physicians as a medicine for enlargement of the spleen.

T. SOUTHWELL.

## THE DACCA MUSEUM IN THE NIMTALI KOTHI OR THE NAWAB BAREE.

In 1765 the East India Company acquired the Dewani of Bengal from the Emperor Shah Alam. That very year Lieutenant Swinton, still remembered here as Sooltin Sahib, on behalf of the Company, came to Dacca and took over charge of the Dewani from the then Naib Nazim (Naib = Lieutenant and Nazim = Governor) Nawab Jasarat Khan. Khan.

To each Province or Subah the Mughal Government appointed two heads of administration, the Nazim and the Dewan. The Nazim was the Viceroy of the Province; he was the executive and Military head of the Province and administered Crlminal Justice. Under the Nazim there was a chain of subordinate officials called Naib Nazims, Sarlashkars, Faujdars, Kotwals, Thanadars &c,. Under the Dewan, on the Judicial side were Kazi-ul-Kuzzat, Kazis,

Muftis, Miradals, Sadri Sudurs and Sadrs; and on the revenue side were Naib Dewan, Amils, Shiqudars,' Karkuns, Kanungos, and Patwaris.

In 1717 Murshid Kuli Khan, the then Dewan of Bengal and the founder of Murshidabad was appointed to perform the dual functions of Nazim and Dewan. Henceforth he and his successors and their Naibs did both the Foujdari and Dewani.

Nawab Jasarat Khan on making over charge of the Dewani to Lieutenant Swinton vacated the palace in the fort and went to live at the Bara Katra, till the Nimtali Kothi, which was to be the future home of himself and his successors, could be got ready for him.

At Nimtali the Naib Nazim had an extensive garden. Here buildings were hastily built to accommodate him and his family, and here he and his five successors lived in semi-gubernatorial style till 1843 when the last Naib Nazim, Ghaziuddin Haider, known as the "Pagla Nawab" dying childless, the East India Company's Government took possession of the buildings. They were sold by auction the following year and were mostly pulled down by the purchasers. The only buildings left standing were the *Baradari*, an oblong building with three open doorways on each side and the western gateway. These had been purchased by Maulvi Muinuddin, better known as Maulvi *Panir* because of his doing business in cheese. He subsequently sold the former to the late Babu Gopikishan Sen, and the latter with the adjoining lands to some Brahmo gentlemen who named the quarter "Bidhan Palli."

Towards the close of the last century Gopi Babu having removed to Wari, sold the *Baradari* to the late Babu Ruplal Das from whom it was subsequently acquired by Government. At the same time the gateway and the adjoining lands were acquired from the Brahmo gentlemen owning them.

In 1912 the Education Department wanted to pull down the *Baradari* and the gateway. The writer of this note is grateful to Mr. Nathan that on his representation that gentleman spared them and agreed to use them for the University Museum.

To the personal interest taken in the buildings by His Excellency Lord Carmichael, we are indebted for their early repairs and their being made over to the Dacca Museum Committee.

SYED AULAD HASAN.

## 'NEUTRAL.'

BY ELLA WHEELER WILCOX

That pale word, "Neutral," sits becomingly
On lips of weaklings. But the men whose brains
Find fuel in their blood, the men whose minds
Hold sympathetic converse with their hearts,
Such men are never neutral. That word stands
Unsexed and impotent in Realms of speech.
When mighty problems face a startled world
No virile man is neutral. Right or wrong,
His thoughts go forth, assertive, unafraid
To stand by his convictions, and to do
Their part in shaping issues to an end.
Silence may guard the door of useless words,
At dictate of Discretion ; but to stand
Without opinions in a world which needs
Constructive thinking, is a coward's part.

## SIR RABINDRA NATH TAGORE.

AN APPRECIATION.

I shall not soon forget my first acquaintance with Rabindranath Tagore at the Hermitage at Bolpur. We were a band of pilgrims going to visit the Santiniketan, the retreat where for many years the poet's father, Maharshi Debendranath Tagore spent days and nights in prayers and holy meditations and where still the aroma of a saintly life hangs over tree aud flower. The Maharshi greatly cherished this sacred Hermitage associated with his illumination and was much pleased to see people resorting to it to find what all the world seeks—peace. Before starting on our journey we went to receive the blessing of the venerable patriarch He spoke to us of his own earlier days of seeking and of the eternity which he soon hoped to enter. So we left him. The poet himself was then living at Bolepur. When we reached the place he received us with a hospitable smile.

* A paper read before a meeting at the Regent's Park Hall, Dacca.

That first impression of him comes vividly back to me— tall, fair, his head haloed round with bright clustering locks, clad in spotless white but with severe simplicity. The light of a smile came and went over his lips which could not conceal the touch of pride and reserve which only melted away into a mystic tenderness when he spoke on some favourite topic and his voice fell on our ears like a strain of sweetest melody. In those younger days he was my ideal of a poet. And even now, when I think of it, he was just what one would fancy a lyric poet to be. He who would write great poetry, says Milton, should himself be a true poem. Rabindranath gave me the idea of an exquisite golden harp throbbing and pulsating with the least touch of emotion. All sights and sounds, every object of sense appealed to him and seemed to start tremors on the sensitive chords. Like the fabled Aeolian harp the very winds seemed to play with invisible fingers on its strings.

But it is one thing to feel the charm of a poet's personality and of his work ; it is another thing to estimate the value of his writings. It is difficult, it is not right, to do this in the case of a living poet and especially of one whose fount of inspiration is still running. We stand too near him. We are too much under his spell. In order to see him truly it is necessary to look at him from a position of detachment. It is necessary to wait till the perspective of time has corrected all errors of judgment. When we are considering a great poet of our own race and country, a poet of such charm, a poet whom we have seen and known, personal predilections cannot but sway us.

Two things, however, have helped us much in the understanding of Rabindranath's work. The first is his recognition in Europe. His election to the Nobel prize has opened our eyes to his greatness among world-poets. Foreigners are not in the same position as we are for estimating the value of his work. They have not been dazzled by his personality. They do not see him through the magnifying mist of happy memories. They are not biased by personal likes and dislikes. They are among us but not of us. They see him from the vantage ground of their own country's poetry and from a position of detachment. It is not easy for them to give him the poetic laurel in preference to their own poets. Therefore the poet's recognition in Europe has been a revelation to us all. It is a case of ourselves as others see us. And truly such appreciation is good for the poet and good for the poet's countrymen. It is good for Europe also that recognised him. Generous appreciation like the quality of mercy is twice blessed. 'It blesseth him that gives and him that takes." Yet it is very little of Rabindranaths' work that Europe has seen—and that little only in translation. The translation, no

doubt is unique and the translation in itself is interpretation also. But the English rendering has missed the rhythm, the assonance, the lilt of the original. Nor can it reproduce the far-off echoes of the poetry of Kalidas or Jayadev or Vidyapati which haunt the chambers of memory as we read the poet's work. Nor has the poet translated what might be called his most characteristic work. Sitll the gain of such world-recognition is great.

Another thing has helped us. It is the charming autobiography that the poet has recently published. It presents a vivid picture of the poet's boyhood and early youth. We see him in his surroundings. In the literature of the world it is doubtful if there be another autobiography of a poet like this. It is full of the most delightful self-criticism—of genial laughter turned by the poet upon himself. In it the poet takes us into his confidence, tells us how a particular poem was created or how a happy line came or how the morning light or the scented evening darkness, or the enchantments of the moon-lit river entered into the writing of a poem. The reminiscences of boyhood are very fascinating. Let us take a page almost at random. "When we were boys", says he, "there was very little luxury about us. We were left in charge of servants. In order to simplify their duties they stopped our going about altogether. But, hard restriction as that might be, their neglect of us was itself a great freedom and that freedom our minds enjoyed. The tyranny of being fed and dressed and looked after did not cramp us from every side. There was no luxury in our meals. Our stock of clothes was scanty. Never, on any account, did we wear stockings before we had turned ten. In winter one cotton jacket over another was enough. We did not curse our fate for that. Only when the tailor Nayamat Khalifa omitted to sew the the pockets on to our coats we felt hurt—for there never was born a boy even in a humble household who had not some property, movable or immovable, to put into his pocket. I had a pair of slippers but not under my feet. At every step as I went along I threw them forward. We had a servant called Syam. He would select a spot in the room and he drew a circle round me with chalk. Then he lifted his warning finger and told me gravely that there was danger in crossing the line. And so he left me; I had read what had happened to Sita for going out of her fixed bounds; so I could not scorn the warning sceptically.

Just beneath the windows there was a tank with masonry steps. To the east of this, close to the wall was a great banyan tree; to the south a row of cocoanut palms. A prisoner in the magic circle, I spent the whole day looking at the tank through the open blinds—as if poring over a picture. I saw the neighbours coming one by one for their bath. I knew when each one was due. I knew also the particular way of

each man's bathing. One would stop his ears with his fingers and take a succession of dips; another would not dip his head at all but pour water on it with his towel; a third, to avoid the impurities on the surface would just put away the waters with both hands and then take a sudden dip; another would stand on the steps and take the waters with a loud and sudden plunge and surrender himself. When all went away the shade of the great banian tree took possession of my mind. Round the trunk many shafts had descended creating a dark complexity. There, in the witchery of that gloom, in that dim corner of the universe it seemed as if all natural laws had been suspended, as if a bit of fairy land had by chance remained imprisoned, overlooked by God, there in the heart of the garish daylight."

We have here that sense of mystery, that renascence of wonder which are the essence of romantic poetry and which we find again in so many poems of Rabindranath. It almost recalls Wordsworth's famous poem about the Yew trees.

Take this humorous description of his earliest poetic efforts:

"I was not more than seven or eight years old at the time. My nephew Jyotiprakash was a good bit older. He had then gone into English books and used to repeat Hamlet's solioquy with great enthusiasm. I cannot say why he took it into his head to make a child like me write poetry. One day he took me to his room and said "you must write poetry" and explained to me the construction of the simple *payar* line of fourteen letters. Hitherto I had seen poetry in printed books only—without a blotch, without any sign of effort or of human weakness. I dared not dream that such a thing could be produced by any effort of mine. One day a thief had been caught in our house. In much fear but with irrepressible curiosity I went to see the captive. But found he was just like other men; so that when the porter was beating him I felt pity. A similar disillusion was my first experience in writing poetry. When I found that by fitting together a number of words with my own hands I had made verse that mystery that hedged the glory of poetic creation was dispelled. Now, as a grown up man I see that it is hard for poetry also to have to bear the lash; often I feel pity but it is impossible to save her from the blows. The palms itch. Even a thief's back was never so belaboured with so many sticks of so many men.

The awe once gone, there was no holding me back. I had procured from one of our men a book of blue paper With my own hands I drew in it uneven lines in pencil and in big boyish script started writing poetry.

As a young deer when the horns are just coming out, goes goring with his head everywhere—so I went about in the restlessness of first poetic eruption. Particularly my elder brother feeling

proud of my efforts made life unbearable in his enthusiasm for collecting audience. My Poetic Works had not bulked large yet. All my writings could go easily into my pockets. I was writer, printer, publisher. Only in advertising my elder brother helped me".

In this autobiography we see the home influences which shaped his thought and fostered his poetic spirit. it was a great joint home with a great concourse of people. It was in many ways a most remarkable home. There was wealth and the ease, freedom from care, refinement and leisure which the life of a wealthy landholder brings. Education, study, culture—all were there but not to be used as a means of earning bread. They were not even obligatory for mixing with the society to which they belonged, for that society did not claim or demand culture. Culture in the case of this family was the natural flowing of gifted souls. It was a necessity of their nature. It gave the Tagore family a rare distinction and placed it apart from others of the same class. Many of the members of the family, both ladies and gentlemen, were poets, and some of them cultivated their faculty. Literary gift was a common possession. Many a monthly Magazine, under different names was started by them and kept up for longer or shorter periods and presented a convenient arena for many a youthful literary free-lance, or a seed-plot for budding poetic genius. Poetry, fiction, rhapsodies, comic sketches, philosophy, phrenology, rigmarole, charades, art, criticism, translations from foreign literature—all these came thick and fast from teeming brains. Nor was there any one to cry halt—for the magazine was owned and edited and financed by them. Youthful exuberance found free scope. Many of the Tagores were gifted with pure and beautiful voices, aud music vocal and instumentnl was cultivated almost all the hours of the day. Noted Indian musicians were invited to give exhibitions of their art and patronised and the airs were noted down to be forthwith wedded to noble words and became a joy for ever. When a true history of Indian music comes to be written the services rendered by this gifted family will surely fill a most important chapter. While on the one hand the science and technique of music were studied, on the other hand the moral and spiritual aspect of the great Indian airs and tunes, their fitness for expressing the various emotions, their appeals to the heart were grasped and rendered with wonderful charm and success. Rabindra Nath's voice was the most divine of all. Those who heard his singing when he was young can never forget it. So tireless was his voice, so rich, so easy and spontaneous, so great in its range, so free from mannerisms, so coloured with feeling—few have heard the like of it. He sometimes sang in public drawing great crowds. It was a unique experience to

see a great poet, singing his own songs in his divine voice to a worshipping audience, rendering their spirit with the truest feeling—and with wonderful power.

In trying to understand the environment in the midst of which the Poet grew up we must not forget the influence of the head of the family, the venerable Maharshi Debendra Nath Tagore, surrounded by an atmosphere of awe and mystery, seldom seen in public, often living away from Calcutta in hiddenness with God in the Himalayas. The Maharshi took Rabindra Nath with him once to the Hills. There the boy poet wandered at will amidst the solemn silence and wild grandeur of Nature and returned home to find his father rapt in holy contemplation. He saw him in the early dawn going out with slow steps to spread his carpet outside and sit in prayer. Afterwards when the poet had grown older he made him sit down by him and sing his newest hymns. It was not for nothing that Rabindranath fell under the influence of such a father.

The glamour of wealth, the spell of personal beauty and distinction, the ineffable charm of refinement and culture, the odour of sanctity of a consecrated life—all this made Rabindranath's home a most remarkable one.

Of all the members of this family Rabindranath was preeminently dowered with poetic genius.

I do not know how I can give you my impression, generally and briefly, of Rabindranath as a poet.

In the first place we must remember that he is a lyric poet—one of the foremost lyric poets of the world to-day. He has given expression adequately and with perfect melody to the various feelings that arise in the deep heart of the poet as sights and sounds and manifold experience of life strike its chords. Now it is love, now death, now awe-struck reverence before the throne of the Infinite. It is now the triumph of hope, now the wail of disappointment and again it is the strange fulness of the heart that comes when the rains drop their mystic veil around the poet—or it is the wistful yearning that visits the soul as the poet sits wrapped by the autumn moonlight. As the Greeks said long ago, poetry is of three kinds—Drama, Epic, Lyric. In the Drama the Poet is hidden behind his work. He cuts out so much of human life as he sees it around him and places it before you. In Epic Poetry the Poet appears, but only as narrator. His own feelings do not come in—He is merged in his. "The Epic is in the past tense." But in Lyric poetry the poet's personality is the chief thing. His soul is the harp on which the outer world plays its harmonies. Like Tennyson Rabindranath was an artist before the was a poet. He had, as we have seen, begun to write poetry at a very early age before he had arrived at any

adequate view of life—at what Matthew Arnold calls "criticism of life." In those early days he was drunk with the melody of words, he toyed with fine phrases which conjured up fleeting visions of loveliness. His poems were wisps of melody. They did not mean much or, if they did, no one would think of their meaning. But the lilt of the rhythm, the alliteration, the delicate phrasing captured the mind. But they knew not of the meaning of life. This was, however, a defect which was soon out-grown and ever since his thought has become deeper and deeper. His lyric poems and songs fall into the following classes:—(1) Hymns and religious lyrics, (2) Lyrics of Nature (3) Love lyrics, dealing with various moods of love (4) Dramatic monologues (5) Patriotic lyrics (6) Lyrics for children. It is by his religious poems that the Poet has become known in Europe. Their mystic vein, their sweet symbolism, familiar in the East from time immemorial have appealed freshly to the Western mind. Many of these poems have been beautifully rendered by the poet himself into English prose and are available to all readers. His hymns may be heard in our temples and are chanted in our daily prayers. They are now regarded as a great spiritual asset of our nation.

Rabindranath's nature-lyrics all smack of the soil. Bengal is not "stern and wild" Caledonia but it proved "meet nurse for a poetic child." Its great rivers swelling proudly in the rains, dotted with boats, the boatmen singing rude snatches about some common sorrow, loss or gain, about the changeful moods of the beloved one or about the loves of Krishna and Radha, a story as old as the world, yet ever new and fresh which remains as the eternal symbol of the self-forgetful abandon of love— the rapture of the mild moonlit nights, the mystic rise of the southern breeze; the midday hush when noon lies heavy on leaf and flower—all these have exercised a powerful fascination on the poet's mind—a fascination as great as that exercised by the Lake country on Wordsworth. Rabindra Nath did not develop any theory about the immanent spirit of Nature but his feeling for Nature is not less real and strong. In some of his poems we have that "natural magic", that intimate sense of Nature's life which we find in Keats's *Ode to Autumn.* Take for instance this beautiful poem on *Evening* which I have ventured to translate into English prose.

"Desist, speak low my heart, bow thy head. The day is gone. Evening comes—the hour of quiet. Across the darkness in the temple of the universe, countless lamps have been lit for the holy vespers Listen! the solemn silence of infinite space is as the blowing of the conch-shell and the tolling of the bell in divine worship. Lower thou thy loud tone unto the soft subdued notes of evensong. Cease thy complaining—no

more of the endless and vain regrets of desire. Behold, hushed are the heavens, the darkening worlds are still; a solemn stillness and awe are on land and water. Evening stands silent with eyes lowered, holding back the tears that rise to fill the sky." Here the very atmosphere of evening, its subduing touch, one might almost say its character and spirit are delicately rendered. I may also mention the beautiful poem called *Prakash* Revelation of Nature in which he says how nature was living her life never suspecting that the Poet's eyes and ears were open. "It had been going on for thousands of years" said he,—"yet no one spoke. The bee visited the *madhabi* bower, the creeper clung round the tree, the *chakori* soared up to the moonlit sky, the lightning disported herself in the cloud, the river flowed down in eager quest of the sea, the lotus oped her eyes as soon as the sun's gaze fell on her; with the advent of the rainy season the thirsty bird sang out. But how did the secret of these affinities in Nature become known? It was the Poet who had secretly seen and heard everything and not content with his discovery had proclaimed it to the whole world." Hearing this" says the poet, "the sun went down filling the sky with the blush of shame. Hearing this the moon stood still hidden behind the woods, the lotus in the lake shut her eyes and the southern breeze whispered to her as he passed, that every thing had become known. The creeper shivered and waved her tendrils fearing what more the tell-tale might not repeat. Among the jasmine clusters the bee said "Look how the mute one unseals his lips when he can babble the secrets of others." Alas, says the poet, since then Nature has become more cautious in keeping her secrets. Rabindranath's Love-lyrics are remarkable for their sweet gracefulness and melody. He has pictured the various moods of love. In the *Hriday Jamuna* he speaks of his love as a full-flowing river to which he invites his beloved. Out of the fulness of his love he can minister unto all her moods; four moods are there pictured: craving, wistful musing, joy of union, self-effacement. He begins thus—If you will fill your pitcher, come, O come, to the fountain of my heart. The wild waters will lap weeping round the sweetness of thy feet. The cloudy day has deepened and has shaken out her dark tresses on both banks of the river. Hark, I know that sound, the tinkling of anklets. Who art thou coming alone with slow steps? If though wilt fill thy pitcher, come, O come to the fountain of my heart.

If you wish to sit in self-forgetful ness on the banks letting your pitcher float, come. Here the grass is green, the sky is freshly blue, the woods are fair with opening flowers. Sit here and your thoughts with travel far out of your dark eyes and your careless scarf will trail in the dust. Looking at the

blooming bowers fond memories will be awakened—if you sit in self forgetfulness on the banks, letting your pitcher float" and so he goes on.

In other poems the various moods of love are studied and most charmingly rendered.

Take this poem—almost Browning—like in its intensity and dramatic-quality. "*Her* view of it."

"What need of words: let be, let it be. Can you not understand why I weep? Words will not make it clear. Look, here I wipe my eyes. They are tears merely, not reproach.

Did I beg for your glance, for your words or smiles or for the drawing near or for the caressing touch of my hair? Why bring on summer nights the dreamy langour of your eyes if when the sweet season is over—with tired, pale eyes you have to seek an excuse for going? Do you remember that day when love was young—the bright autumn sky, the white film of clouds, the sunshine sweet with cooling breezes? Looking at me your eyes thrilled with the soul within, a bitter sweet intoxication was in your glance. No: you know it not: I know.

Can you recall how in the midst of many men when you saw me you were drawn to my side whether you knew it or not. One day when life was in spring you loved. Can I now take your pity—a sweet word or two? Thinkest thou, Beloved, that it is enough if thou give me smiles though love be not there? Can you not see why the fears burst from my broken heart? Words will not make it clear. Here, I wipe my eyes. They are tears only, not reproaches."

There is a vigorous touch in his poem which recalls to my mind Browning's dramatic monologues.

I have not left myself time to speak of Rabindranath's patriotic poems or children's poems, or other aspects of his poetic art. Nor indeed, in any sense, have I tried to present his poetic work adequately. I have only glanced at one or two phases of it.

I cannot, however. leave off without dwelling for a moment on the last phase of the poet's thought. It is his self-consecration. It is this which has given unity to all his poetic work and has thrown on it the light of a new meaning. His delight is in letting his Creator realise Himself, as it were, through him. This finds most beautiful expression in one of his poems which I give in the poet's own translation.

"What divine drink wouldst thou have, my God, from the overflowing cup of my life?

My Poet, is it thy delight to see thy creation through my eyes and to stand at the portals of my ears silently to listen to thine own eternal harmony?

The world is weaving words in my mind and thy joy is adding music to them. Thou givest thyself to me in love and then feelest thine own entire sweetness in me."

To help in this self-realisation of the Lord, truly and deeply to surrender yourself to Him, to "lie like a flute on His lips" so that He may fill your life with His music and with His holy breath, is the essence of worship—is the true self-consecration. There are infinite depths in such self-consecration.

LALIT MOHAN CHATTERJEE.

## GUPTA BRINDABAN IN MYMENSINGH.

A belt of jungly hilly tract runs through the District of Mymensingh separating Tangail from the Sadar Subdivision. It is known as the Madhupur Gur and it extends far into the Dacca District right up to Joydebpur where it is called Bhawal Gur. Tigers, leopards, bears, wild boars, monkeys, peacocks, deer abound in this tract even now, although a considerable portion has been cleared and men have erected homesteads there. About 60 years ago, wild elephants used to roam in the Jungles. In the Mymensingh portion of the tract, there are two District Board roads running right through it, viz, one near Madhupur, another near Dhalapara. The trees generally found in the tract are called Gazaria, an inferior kind of Sal. There are elevated mounds of earth which here and there look like small hillocks and it is only one place that I have seen which possesses a stony surface. There are various traditions about the old settlers of this tract and the dense Jungles are said to have been the capital of princes, in remote ages. Traditions are based on the existence of numerous tanks and the finding of small pieces of iron which look like the relics of ironsmith's shops. Towards the north there is a sacred tank called Baratirtha (12 holy places). It is said water was brought from 12 holy places and poured into the tank. Here men flock in large numbers and bathe on the Purnima day in Baisakh. Towards the south not very far from the Dacca border stands the sacred place called Gupta Brindaban. Here the god Srikrishna is said to have dwelt incognito. A big mela takes place here about a week before the bathing day in the Brahmaputra river ( *i.e.* eighth day of the moon in Chaitra), when people come from remote places to worship the idol Srikrishna which is kept here. The natural scenery of Gupta Brindaban is enchanting. The whole place—about 1/16 square mile is a garden of Taru, Tamal, Haritaki, Jayfal, and other trees and the sun's rays can not pierce their thick foliage. The ground below is free from nettles and pilgrims walk about in ease in the shade of the trees. Of all the various kinds of trees, the most enchanting are some very big Taru trees. These resemble the Simul to a certain extent but are free

from nettles. It is said that while there is only one Taru tree in Brindaban proper, there are lots of these trees in Gupta Brindaban from which people argue that the latter is holier than the former. Srikrishna is said to have specially liked the Taru tree. Here and there the roots and branches of Taru trees are pointed out to pilgrims as the embodiment of the god Srikrishna, his brother Balaram, his consort Radhika and the demons he slew, the boats in which he rowed over the sacred Jamuna. A hollow place in the ground is pointed out as the Keshi Ghat—where the god Srikrishna slew demons and like Brindaban proper the Gupta Brindaban has got its Jamuna Pulin i.e. the sacred spot on the bank of the Jamuna where the god Srikrishna used to make himself merry on starry nights with the fair damsels (milkmaids) of Brindaban. Just in the centre of the place stands a hut with the image in Srikrishna in it. In front of this hut, pilgrims sing religious songs and dance frantically to the accompaniment of the beating of Kartal under a big Taru tree intertwined with a Tamal tree and it is said drops of water fall down from the trees at the time on the heads of the dancers and singers. There are two trees standing side by side in a corner which are worshipped by pilgrims as the embodiment of Jagai and Madhai—the brothers who were originally drunkards and ruffians but later on turned Sadhus under the teaching of the apostle Chaitanya. The leaves of these trees bear a peculiar mark as if of writing with ink and I have preserved one leaf with care.

ABANI CHANDRA CHATTERJEA.

# ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৫ম খণ্ড। } ঢাকা—ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২২ সাল। } ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

## আগমনী

( ১ )

শরৎ এসেছে আজি, মরকত সাজে সাজি,
ধরণী ঘিরে,
এসো তুমি দয়াময়ি! জগৎ-জননী অয়ি!
এসো গো ফিরে!
গগন জলদ-হীন,
সবুজে সুনীলে লীন,
পুলকিত নিশিদিন,
হাসিছে ধীরে।
খেলায় লহরী খেলা
আকাশে বলাকা মেলা
ফুটিছে শেফালী বেলা
শিশির নীরে।
এসো তুমি প্রেমময়ি, জগৎ জননী অয়ি!
এসো গো ফিরে!

( ২ )

মধুপ ঝঙ্কারে ফুলে,
পঞ্চমে কোকিলা বোলে,
তোমারি বন্দনা তোলে,
ললিত ধীরে।
পুলক পরশে সবে,
তব আগমন রবে;
দুখের পশরা রবে
মানব শিরে?
এসো গো মা শান্তিময়ি, কনক-বরণী অয়ি!
এসো গো ফিরে।

( ৩ )

শরতের পুণ্য শ্বাসে
মঙ্গল আশীষ আসে,
হাসির লহরী ভাসে,
হৃদয় তীরে।
নন্দিত বন্দনা গানে,
ভাগীরথী ধারা আনে,
আর কিরে বাধা মানে,
হিমাদ্রি শিরে?
এসো মা করুণাময়ি, অন্তরবাসিনী অয়ি
এসো মা ফিরে।

শ্রীকুন্দমালা দেবী।

# অগ্নি।

প্রাচীন আর্য্যজাতিদিগের মধ্যে অগ্নি একজন প্রধান দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইত। ঋগ্বেদে তাহার এইরূপ নিদর্শন দেখিতে পাই।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।

ঋগ্বেদ, ১।১।১

অর্থঃ—যজ্ঞের পুরোহিত, দেবতা ও ঋত্বিক্ অগ্নিকে স্তুতি করি।

ইরাণের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তায় অগ্নিকে প্রধান দেবতাদিগের মধ্যে একজন ও অতর্ নামে অভিহিত হইতে দেখি। (১) আবেস্তা গ্রন্থে পবিত্র অগ্নিরক্ষাকারী পুরোহিত সেই জন্য অথ্রবন্ নামে প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদে অথর্বা শব্দ পাওয়া যায়। অথর্বা নামে ঋষি যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে প্রথম তুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—

যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমো বিধারয়দ্দেবা.........

ঋগ্বেদ ১০।৯২।১০

Atar is called "the most helpful of tne Amesh spentas,"......His proper titles are "son of Ahura-Mazda" and "most great Yazatas." p. 78.

Media (story of the Nations series).

অগ্নিকে ঋগ্বেদে প্রথম পুরোহিত আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতং। ১০।১২২।৪

অর্থঃ—(অগ্নি) যজ্ঞের ধ্বজা বা চিহ্ন (ও) প্রথম পুরোহিত।

অগ্নিই অঙ্গিরা ঋষিদিগের আদি ঋষি (১) এবং অথর্ববেদ অথর্বাঙ্গিরস ঋষিদিগের নিকট প্রকাশিত। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে অগ্নির এক নাম অথর্ব ছিল। অথর্বন শব্দই যে পারসিক ভাষায় অথ্রবন্ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় অথ্রজেনি (২) শব্দে এক প্রকার লতাকে বুঝাইত। এই লতাজাত কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদিত হইত। অথ্রজেনির অর্থ অগ্নিজনক। যে কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদিত হইত ঋগ্বেদে তাহাকে অরণি বলিত।

যাৎ সখ্যাদরণীং নাভিমেমি। ১০।১২৪।২

অর্থঃ—ধীর সখা হইতে অরণি নাভি (উৎপত্তি স্থান) প্রাপ্ত হইলাম।

অথ্রজেনি হইতে কি অরণি শব্দ উদ্ভূত? যাহা হউক অতর্ বা অথর্ব্ শব্দ যে অগ্নির একটী প্রাচীন আর্য্য নাম ইহাদ্বারা বেশ বুঝা যায়।

গ্রীক ভাষায় অগ্নিকে Pyro (পাইরো) ও Pur (পুর্) বলা হয়। সম্ভবতঃ ইংরাজী Fire, জর্ম্মাণ fener এবং প্রাচীন এংগ্লো স্যাক্সন fyr শব্দ গ্রীক Pyro হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদে অগ্নিকে যজ্ঞের পুরোহিত বলা হইয়াছে অগ্নিকে পুরোদেশে স্থাপন করিয়া যজ্ঞ হইত বলিয়াই উঁহার নাম পুরোহিত বা পুরোহিত। গ্রীক Pur বা Pyro শব্দ যে বৈদিক পুরস্ শব্দের অর্থেই অগ্নিতে প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

(১) ঋগ্বেদ—১।৩১।১

(2) There is a Greek word which points farther than the Indo-Eranian period. That word is Athrageni, the name of a plant, a creeper, the wood of which was used in very ancient times to bring forth fire by friction.

Media (story of the Nations series) p. 42.

অগ্নি নাম, বৈদিক, ল্যাটিন, লিথুয়ানিয়ান্ ও স্লাভো-নিয়ান্ ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

ল্যাটিন—Ignis ( ইগ্নিস্ )

লিথুয়ানিয়ান্—Ugnis ( উগ্নিস্ )

স্লাভোনিয়ান্—Ognj ( ওগ্নস্ )

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে এই সকল জাতির মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা বর্ত্তমান ছিল।

ঋগ্বেদে, সৃষ্টির আদিতে জল, পরে তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই। যথা—

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।

ঋগ্বেদ। ১০। ১২৯। ৩

অর্থঃ—অগ্রে ( সৃষ্টির পূর্ব্বে ) অন্ধকার, অন্ধকার দ্বারা আবৃত ছিল। চিহ্নবর্জ্জিত জল সকল ব্যাপিয়াছিল।

আপোহ যদ্‌বৃহতী বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।

ঋগ্বেদ। ১০। ১২১। ৭

অর্থঃ—গর্ভধারণকারিণী যে বৃহৎ জলরাশি অগ্নি উৎপন্ন করিয়া সমগ্র ব্যাপিয়াছিলেন।

অগ্নি দিব্যলোকের জ্যোতিঃ, বিশ্বভুবন নির্ম্মাণ করেন এবং সর্ব্বস্থলে বিদ্যমান, এইরূপ বর্ণনাও ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা—বিয়ো রজাংস্য মিমীত সুক্রতুর্বৈশ্বানরো বিদিবো রোচনা কবিঃ।

পরি যো বিশ্বা ভুবনানি পপ্রথে দব্ধোগোপা অমৃতস্য রক্ষিতা॥

ঋগ্বেদ; ৬। ৭। ৭

অর্থঃ—শোভন যজ্ঞকারী বৈশ্বানর ( অগ্নি ) দিব্যলোকের জ্যোতিঃ ও কবি ( দ্রষ্টা ); তিনি জ্যোতিঃ সমূহ ( নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ) নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তিনি সমস্ত ভুবন ( ভূত সকল ) বিস্তার করিয়াছেন; ( তিনি ) সমুদ্র ও অমৃতের রক্ষক।

গর্ভোযোঅপাং গর্ভোবনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চরথাম্।

অদ্রৌচিদস্মা অন্তর্দুরোণে বিশাং ন বিশ্বো অমৃতঃ স্বাধী॥

ঋগ্বেদ, ১। ৭০। ২

জলের গর্ভ ( বাড়বাগ্নিরূপে ), বনের গর্ভ ( দাবাগ্নিরূপে ), স্থাবরের গর্ভ ( কাষ্ঠাদিরূপে ), চরণযুক্তদিগের ( জঙ্গমদিগের ) গর্ভ ( জঠরাগ্নিরূপে ), পর্ব্বতের মধ্যেও এই দুর্দ্ধর্ষা গৃহমধ্যে স্থিত অমরণধর্ম্মী ( অগ্নি ), রাজা যেরূপ প্রজার, সেইরূপ ( আমাদের ) শোভন কর্ম্ম যুক্ত হও।

অথর্ব্ববেদেও দেখিতে পাই অগ্নি ও সূর্য্য জল হইতে উৎপন্ন।

যথা—হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকা যাসুজাতঃ সবিতা যাস্বগ্নিঃ।

যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণা স্তা ন আপঃ শংস্যোনাভবন্তু॥ ১। ৩৩। ১

অর্থঃ—শোভনবর্ণা, শুভ্রা, পবিত্রকারিণী ( আপ সকল ); যাহা হইতে সবিতা ও অগ্নি জন্মিয়াছে, যাহারা অগ্নিকে গর্ভরূপে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শোভন বর্ণা আপ্ সকল আমাদের সুখকারিণী হউন।

ঋগ্বেদে অগ্নি নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে দেখিতে পাই। অগ্নি পরমব্যোমে আছেন, সূর্য্যরূপে জন্মিয়াছেন, (১) আকাশে বিদ্যুৎরূপে জন্ম গ্রহণ করেন (২), জলের মধ্যে অবস্থান করেন (৩), ওষধি মধ্যে প্রবিষ্ট আছেন (৪), মেঘলোকে বৃষ্টি বর্ষিতে বাস করেন (৫), এবং সুখের পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সমুদয় জলমজীবে অন্তর্হিত (৬)।

বরুণ আদিত্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রাজা ছিলেন, এইরূপ বর্ণনা ঋগ্বেদে দেখা যায়। আপ্ সকল তাঁহারই স্ত্রী। অতএব অগ্নির পিতা বরুণ এবং মাতা আপ্।

জেন্দাবেস্তায় বরুণই অহুর মজ্‌দ ( অসুর মহৎ ) নামে খ্যাত। অহুরমজ্‌দ স্বায়ম্ভু ও সৃষ্টিকর্ত্তারূপে এবং জল সকল অহুরাণী বা অহুর মজ্‌দের স্ত্রীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যুৎরূপী অগ্নি অহুর মজ্‌দের পুত্র (১) এখানেও দেখা যায় জল হইতে অগ্নি পুত্ররূপে উৎপন্ন।

(১) ১০। ৪। ৭; (২) ১০। ৪৫। ১; (৩) ১০। ৪৫। ৩। (৪) ১০। ৫১। ৩; (৫) ১০। ৪৫। ৩; (৬) ৬। ৯। ৫

(1) Atar, fire (originally the celstial fire—lightning), is invaribly spoken of and addressed as "son of Ahura-Mazda," alone of all the Yozatas or "divine beings," while the sacred waters are invoked in a hymn as follows :--

অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন আর্য্যদিগের ধারণা এই ছিল অগ্নি জল হইতে উৎপন্ন। ভারতবর্ষে উপনিষদের যুগে এই মতের একটু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। উপনিষদদিগের মধ্যে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমরা ছান্দোগ্য হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি যে অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন এই মত প্রচারিত হইয়াছে।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত, তত্তেজ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি, তদপোঽসৃজত; তস্মাৎ যত্র কচ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষ স্তেজস এব তদ্ অধ্যাপো জায়ন্তে॥ তা আপ ঐক্ষত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি; তা অন্নমসৃজন্ত তস্মাৎ যত্র কচ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবতি অদ্ভ্য এব তদ্ অধ্যন্নাদ্যং জায়তে॥

ছান্দোগ্য, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২য় খণ্ড।

অর্থঃ—হে সৌম্য! আদিতে এক, অদ্বিতীয় সত্তা ছিলেন; তাহা বহু প্রজা হইতে মনন করিয়াছিলেন; তাহাতে তেজ সৃষ্ট হয়। সেই তেজ বহু প্রজা করিতে মনন করিয়াছিলেন; তাহাতে জল সৃষ্ট হয়। সেই জন্য যখন কোন পুরুষ গ্রীষ্মার্ত্ত হয় তখন তাহার ঘর্ম্ম নির্গত হয়, তেজ হইতেই সেই জল উৎপন্ন হয়। ঐ জল সকল যখন মনন করিল আমরা বহু প্রজায় বিভক্ত হইব; তাহারা অন্নসৃষ্টি করিল; সেই জন্য যেখানে বৃষ্টি পতিত হয়, সেইখানেই প্রচুর অন্ন উৎপন্ন হয়; জল হইতেই সেই অন্ন উৎপন্ন হয়।

অপর এক স্থলে আছে :—

তেজএব তৎপূর্ব্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে। ১ ছান্দোগ্য

তেজরূপে প্রথম দেখা দিয়া পরে জল সৃজন করে।

অপর এক স্থলে আমরা দেখিতে পাই, মনের সংকল্প দ্বারা পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আপ্ ও তেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (১)

ঐতরেয় উপনিষদে আমরা পঞ্চ মহাভূত শব্দ ও তাহাদের নাম প্রাপ্ত হই। যথা—

ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিংষীত্যেতানি ... ...। তৃতীয় অধ্যায়, ৩।

ছান্দোগ্য উপনিষদে যদিও মহাভূত শব্দ প্রাপ্ত হইনা, তবে আকাশ যে সকল ভূত হইতে শ্রেষ্ঠ ও পরম আশ্রয় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্॥ ১ম প্রপাঠক, ৯ম খণ্ড, ১।

অর্থঃ—এই লোকের আশ্রয় কি? (প্রবাহণ) বলিলেন, আকাশ; (যেহেতু) এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, আকাশেই লয় হয়, আকাশ এই সমুদয় (ভূত) হইতে শ্রেষ্ঠ, আকাশই পরম আশ্রয়।

একস্থলে আকাশ অগ্নি, জল এবং অন্ন অপর স্থলে দ্যাবাপৃথিবীং বায়ু, আকাশ, অপ্ ও তেজ এই সকল নাম ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ত্তমান। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আমরা আকাশ প্রভৃতির বিকাশ ক্রম এইরূপ দেখিতে পাই।

"সেই ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন। বায়ু হইতে অগ্নি বা তেজ উৎপন্ন হইয়াছে। অগ্নি হইতে অপ্ সকল (জল) উদ্ভূত। অপ্ সকল হইতে ক্ষিতি বা পৃথিবী উদ্ভূত। পৃথিবী হইতে ওষধী, ওষধী হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুরুষ। (১)

---

"We worship this earth which bears us together with thy wives, O Ahura-Mazda! "O ye waters! we worship you, you that are showed down, and you that stand in pools and vats, ye female Ahuras—(Ahuranis of Ahura) that serve us in helpful ways, well-forded, and full-flowing.

Media (story of the Nations series) p. 62.

(১) সংকল্পো বাব মনসোভূয়ান্ যদা বৈ সংকল্পয়তেঽথমনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামুনাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি॥ ১। তানি হ বা এতানি সংকল্পৈকায়নানি সংকল্পাত্মকানি সংকল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমক্লৃপতাং দ্যাবা পৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশং চ সমকল্পন্তাপশ্চ তেজশ্চ। ২, ৭ম অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড।

(১) তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিব্যা। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যো ঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ১ম অনুবাক।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক তৈত্তিরীয় উপনিষদ প্রাচীনতায় ছান্দোগ্যের পরেই।

একণে মনুসংহিতায় যেরূপ সৃষ্টি বিকাশ বর্ণিত আছে তাহা উদ্ধার করা যাইতেছে।

"সৃষ্টি কামনা দ্বারা প্রেরিত হইয়া মন সৃষ্টি করেন। তাহা (মন) হইতে আকাশ জন্মে, তাহার শব্দগুণ জানিবে। সৃষ্ট আকাশ হইতে সর্ব্বগন্ধবহ, শুচি ও বলবান্ বায়ু উৎপন্ন হয়। ইহার স্পর্শগুণ জানিও। সৃষ্টবায়ু হইতে অপর দ্রব্য প্রকাশক, তমোনাশক, ভাস্বর জ্যোতিঃ উৎপন্ন হয়। ইহার গুণকে রূপ বলে। সৃষ্ট জ্যোতিঃ হইতে অপ্ বা জল; ইহার গুণকে রস বলে। এবং জল হইতে গন্ধগুণ সম্পন্ন ভূমি হয়। এই সকল সৃষ্টির আদিতে হয়। (১)

রামায়ণে ও আমরা পঞ্চ মহাভূতের নাম প্রাপ্ত হই। কিন্তু উহাদের উৎপত্তি ক্রম প্রদর্শিত হয় নাই।

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চরাঘব।
স্বভাবে সৌম্য তিষ্ঠন্তি শাশ্বতং মার্গমাশ্রিতাঃ ॥২৩

রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ২২ অধ্যায়।

হে সৌম্য রাঘব! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আপ (জল) ও জ্যোতিঃ (অগ্নি) অবিনশ্বর পথ অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ প্রকৃতিতে অবস্থান করে।

ভারতের আয়ুর্ব্বেদ যুগেও দেখিতে পাই এই পঞ্চ মহাভূত স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা প্রথম চরক হইতে উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করিতেছি।

পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রব্যানি খং বায়ুর্জ্যোতিরাপোভূরিতি।

চরক, সূত্র স্থান; ৮।৪

পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাঃ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাঃ।

ঐ ঐ

তত্রানুমানগম্যানাং পঞ্চমহাভূতবিকারসমুদায়াত্মকানামপি সতামিন্দ্রিয়াণাং তেজশ্চক্ষুষি খং শ্রোত্রে ঘ্রাণে ক্ষিতিরাপোরসনে স্পর্শনেঽনিলো বিশেষেণোপদিশ্যতে।

ঐ ৮।৬

অর্থ:—পঞ্চইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্রব্য, যথা—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি।

পঞ্চইন্দ্রিয় গ্রাহ্যগুণ যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

ইন্দ্রিয় সকল অনুমান গম্য; ইহারা সমস্ত পঞ্চ মহাভূতের বিকার জাত। তবে ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে চক্ষুতে তেজ, শ্রোত্রে আকাশ, ঘ্রাণে ক্ষিতি, রসনে জল, স্পর্শনে বায়ু বিশেষরূপে অধিষ্ঠান করে।

সুশ্রুতেও আমরা পঞ্চ মহাভূতের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

পৃথিব্যপ্তেজো বায়্বাকাশানাং সমুদয়াদ্ দ্রব্যাভিনির্বৃত্তি কৃৎকর্ষস্তভিব্যঞ্জকো ভবতীদং পার্থিব। ৪১।৪
আকাশ পবন দহন তোয় ভূমিষু যথা সঙ্খ্যমেকোত্তর পরিবৃদ্ধাঃ শব্দস্পর্শ রূপ রস গন্ধাঃ। ৪২।১

সুশ্রুত, সূত্রস্থান।

অর্থ:—পৃথিবী, অপ্ (জল), তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চের সমবায়ে দ্রব্যের উৎপত্তি হয়।

আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ভূমি যথা সংখ্যা উত্তরোত্তর এক একটী বৃদ্ধি অনুসারে শব্দ, রূপ, রস, ও গন্ধ গুণ যথাক্রমে অবস্থিতি করে। যথা—

আকাশে শব্দগুণ
বায়ুতে শব্দ+স্পর্শ গুণ
তেজে শব্দ+স্পর্শ+রূপ গুণ ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রথম তৈত্তিরীয় উপনিষদেই পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তিক্রম কতক সুস্পষ্ট হইয়াছে। তবে ছান্দোগ্য উপনিষদে বায়ু ও পৃথিবীর ভিন্ন অপরগুলির নাম ও উৎপত্তিক্রম পরবর্ত্তী তৈত্তেরীয়ের সমান রূপ। এই পঞ্চ মহাভূত মতবাদ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৈদিক যুগে জল হইতে অগ্নির উৎপত্তি মতবাদ

(১) মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।
আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দ গুণং বিদুঃ ॥৭৫
আকাশাত্তু বিকুর্ব্বাণাৎ সর্ব্বগন্ধ বহঃ শুচিঃ।
বলবান্ জায়তে বায়ুঃ সবৈ স্পর্শ গুণোমতঃ ॥৭৬
বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাদ্ বিরোচিষ্ণু তমোনুদং।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে ভাস্বৎ তদ্রূপ গুণ মুচ্যতে ॥৭৭
জ্যোতিষশ্চ বিকুর্ব্বাণাদাপো রস গুণাঃ স্মৃতাঃ।
অদ্ভ্যো গন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাদিতঃ ॥৭৮
মনুসংহিতা ১ম অধ্যায়।

পরযুগে উল্টাইয়া অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দেখা গেল।

গ্রীক দিগের মধ্যে জগৎ উৎপত্তির যে সকল মতবাদ দেখিতে পাই তাহা আমরা এক্ষণে আলোচনা করিব। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে থেলিস জল হইতে, অনিখিমিনিস বায়ু হইতে, এবং হিরাক্লিটাস্ অগ্নি হইতে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে মনে করিতেন। (১) খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীতে এপোদোক্লিস বায়ু, বারি, ক্ষিতি ও অগ্নিকে জড় পদার্থ সকলের মূল উপাদান বলিয়া অনুমান করিতেন। (১) তাঁহার মতে কিন্তু আসল মূল পদার্থ একটী। তাহারই বিভিন্ন গুণ আমরা ত্বক দ্বারা অনুভব করিয়া চারিটী রূপে জ্ঞাত হই। উষ্ণতা, শীতলতা, শুষ্কতা ও আর্দ্রতা এই চারিটী গুণ সেই মূল পদার্থের বিভিন্ন অংশে দুইটী দুইটী করিয়া বর্ত্তমান। যথা—উষ্ণ ও আর্দ্র, আর্দ্র ও শীতল, শীতল ও শুষ্ক, এবং শুষ্ক ও উষ্ণ। উষ্ণ ও আর্দ্র গুণ বায়ুরূপে এবং আর্দ্র ও শীতলগুণ বারিরূপে, শীতল ও শুষ্কগুণ ক্ষিতি রূপে এবং শুষ্ক ও উষ্ণগুণ অগ্নিরূপে আমাদে অনুভূত হয়। দেখা যাইতেছে যে গ্রীকদার্শনিক একটী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণগ্রাম দ্বারা জড় পদার্থের বিশ্লেষণে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় ঋষি পঞ্চেন্দ্রিয় সাহায্যে সেই চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন স্মরণ করিতে হইবে।

এরিষ্টটল্ (খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দী) এই চারিটী মূল উপাদান দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সকলি ঠিক বুঝান যায় না বলিয়া ঔসিয়া (Ousia) নাম দিয়া আর এক জড় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই পদার্থ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে মনে করিতেন। এক্ষণে ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে এই মূল উপাদানবাদ এম্পিডক্লিস্ ও এরিষ্টটল্ অপর কোন স্থান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনুমান করেন যে সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারত হইতেই ইহা গ্রীসে গিয়াছিল। (১) আমরা দেখাইয়াছি যে প্রাচীন ছান্দোগ্য উপনিষদেও "আকাশ" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল ভূতের আশ্রয় ও উৎপত্তি স্থান বলিয়া বর্ণিত। আরিষ্টটল্ যে এই "আকাশ"কেই "ঔসিয়া" নামে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। যদি কেহ মনে করেন, কিরূপে গ্রীকগণ খৃষ্টের ৪র্থ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে হয় যে দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শাহ ভারত আক্রমণকালে শুধু দেশ জয় করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের আদর্শ নয়নগোচর করিয়া কৃতার্থ হয়েন এবং ভারতের বিজ্ঞান ও শাস্ত্র নিজ গুরু এরিষ্টটলের জন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাকে উপঢৌকন প্রদান করেন।

প্লেটো (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী)। তাঁহার টাইমিউস্ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন জল জমিয়া প্রস্তর ও মৃত্তিকা এবং উহাই সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া মরুৎ ও বায়ুরূপে পরিণত হইতে প্রত্যক্ষ করা যায়। বায়ু উত্তপ্ত হইয়া অগ্নিতে এবং অগ্নি শীতল ও নির্ব্বাপিত হইলে পুনরায় বায়ুতে পরিণত হইতে দেখি। বায়ু ঘনীভূত হইয়া কুজ্ঝটিকা, পরে জলে পরিণত হয়। অবশেষে জল হইতে প্রস্তর ও মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। (১) অতএব

(1) Views like that of Thales (in the 6th century B. C.) that water is the ground material, or those of Anaximanes and Heracliters (in the same century) who ascribed to air and fire respectively the same role have had no influence upon the development of chemical knowledge.

Meyer's History of Chemistry pp. 7-8.

(1) The four so called "elements"—air, water, earth, and fire—were regarded by that intellectually great philosopher, Empedocles of Agrigent (about 440 B. C.) as the basis of the world.

Mayer's History of Chemistry. p. 8.

(1) There seeems to be a high degree of probability in the assumption that Empedocles and Aristotle did not themselves deduce their theory of the elements, but derived it from other sources. thus the oldest writings of India teach that the world consists of the four elements mentioned above, together with ether which last is most likely related to Aristotles Ousia.

Mayer's History of Chemistry p. 9.

(1) We believe from observation that water becomes stone and earth by condensation and wind and air by subdivision, ignited air becomes fire, but

প্লেটোর মতে অগ্নিই মূল পদার্থ এবং ইহাই শীতল হইয়া ক্রমশঃ বায়ু, জল ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়।

প্রাচীনকালে লোকের মনে অগ্নি সম্বন্ধে যেরূপ ভাবের উদয় এবং তাহার সহিত জগতের যাবতীয় বস্তুর যেরূপ সম্বন্ধ কল্পিত হইত তাহা আমরা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিলাম। এক্ষণে আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে অগ্নি সম্বন্ধে কল্পনার কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ল্যাটিন-জেবারের গ্রন্থ রসবিদ্‌-গণের নিকট অতিশয় প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত। সেই গ্রন্থে দেখা যায় অগ্নি লবণাদির মত দ্রব্য বিশেষ। কোন রাসনিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে অগ্নি আবশ্যক হইলে, মনে করা হইত অগ্নিকণা সমূহ দ্রব্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

(১) ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাচার্য্য জোসেফ ব্ল্যাক্ আবিষ্কার করেন যে বরফ যখন উত্তাপ যোগে জলে পরিণত হয়, তখন তাহার তাপ (Temperature) বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু বরফজাত জলে উত্তাপ প্রদান করিবামাত্র উহার তাপ বৃদ্ধি পায়। এই পরীক্ষাদ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে জলে অনেক পরিমাণ উত্তাপ গুপ্ত (latent) অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। (২) দেখা যায় খুটিং পাথর উত্তাপ যোগে চুণের পাথরে পরিণত হয়। পরে এই দগ্ধ প্রস্তর মৃদু যবক্ষার (Potassium carbonate) দ্রবের সহিত মিশ্রিত করিলে তীক্ষ্ণ ক্ষার (caustic Potash) উৎপন্ন করে। ব্ল্যাকের সমসাময়িক রাসায়নিকগণ মনে করিতেন তীক্ষ্ণক্ষারে অগ্নির ভাগ অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান। খুটিং পাথর দগ্ধকালে এই আগ্নের অংশ তাহাতে সঞ্চিত হয়। এই আগ্নের অংশই যবক্ষারে প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণ ক্ষার উৎপন্ন করে (১)। উপরি উদ্ধৃত ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যাইতেছে যে এইকালে অপরাপর জড় দ্রব্যের মত অগ্নি সূক্ষ্ম২ কণাদ্বারা গঠিত বলিয়া কল্পিত হইত। অগ্নিকণা জড় পদার্থে প্রবিষ্ট হইলে সাধারণতঃ উহার তাপ বৃদ্ধি করে; কিন্তু কোন২ স্থলে উহা দ্রব্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ তাহার তাপ বৃদ্ধি করিতে পারে না; যেমন বরফ উত্তাপ যোগে জলে পরিণত হয়, কিন্তু উহার তাপের ইতর বিশেষ হয় না। এই নিমিত্ত প্রথম প্রকার অগ্নিকে Sansible heat এবং দ্বিতীয় প্রকারের অগ্নিকে Latent heat বলা হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কাউণ্ট রুম ফোর্ড নামে এক বৈজ্ঞানিক অগ্নিকে পরমাণুদিগের গতি বা কম্পন বলিয়া প্রথম ব্যাখ্যা করেন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে তিনি মিউনিক নগরে কামান প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কামান প্রস্তুত করিতে হইলে নিরেট লৌহস্তম্ভ মধ্যে ত্রিপুণ ঘুরাইয়া ছিদ্র করিতে হয়। এইরূপ ছিদ্র করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে লৌহস্তম্ভ বড়ই উত্তপ্ত হইয়া পড়িতেছে। শীতল করিবার জন্য ছিদ্রে জল দিলে দেখা গেল উহা এত উত্তপ্ত হইয়াছে যে জল ফুটিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে এই প্রচুর পরিমাণ উত্তাপ গুপ্তভাবে লৌহস্তম্ভে বিদ্যমান ছিল। তিনি তখন ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে উত্তাপ বা অগ্নি জড়পদার্থ নহে। সূক্ষ্মকণা সকলের কম্পনে উত্তাপ উৎপন্ন হয়। তাঁহার এই মত প্রায় ৫০ পঞ্চাশ বৎসর বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট উপেক্ষিত হইহইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্লাস্‌গো

this, when condensed and extinguished again takes the form of air, and the latter is then transformed into mist, which dissolves into. From this lastly, are produced rocks and earth. Plato's Foimeans.

(1) The carbonates of these (alkaliss) were before Black's time regarded as simple substances and it was further assumed that when lime-stone was burnt fire-stiff was taken up, and that this went over into Potashes or soda when these were causticised by means of lime.

Mayer's History of Chemistry p. 127.

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক র‍্যান্‌কিন্‌, হিলব্রন নগরের রবার্ট মেয়ার, কোপেনহেগেন নগরের কলডিং, ইংলণ্ডের জুল, এবং জার্ম্মানির বিজ্ঞানাচার্য্য হেলম্‌হোল্‌ডজ্‌ যখন নানা পরীক্ষা দ্বারা এই সত্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিলেন তখন বৈজ্ঞানিক জগতে আর কেহ এ মতের বিরোধী রহিল না।

বর্ত্তমানকালে বৈজ্ঞানিকগণ জড় পদার্থের সূক্ষ্ম২ পরমাণুর কম্পনকে অগ্নি বলিয়া কল্পনা করেন। যে যত উত্তপ্ত তাহার পরমাণুগুলি ততই অধিক কম্পনশীল। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে আমরা উত্তপ্ত বস্তু হইতে দূরে থাকিয়াও কিরূপে উহার উত্তাপ লাভ করি? পূর্ব্বে কল্পিত হইত উত্তপ্ত বস্তু হইতে অগ্নিকণা বেগে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইয়া উত্তাপ প্রদান করে। এক্ষণে কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে ইথার বা আকাশ নামে এক বস্তু সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে। জড়পদার্থের পরমাণুগুলির কম্পন ঐ ইথার বা আকাশকে কম্পিত করিয়া তাহাতে তরঙ্গ উৎপাদন করে। যখন এই তরঙ্গমালা আমাদের ত্বকের উপর আসিয়া পতিত হয়, তখন আমরা উত্তাপ অনুভব করি। যদ্যপি অপর জড়পদার্থের উপর নিপতিত হয়, তবে তাহার পরমাণুগুলিকেও কম্পিত করে এবং তাহতেই উহা উত্তপ্ত হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমানযুগের এই তরঙ্গবাদে আকাশ নামক এক পদার্থের অনুমান আবশ্যক হইয়াছে। আকাশ পদার্থের প্রকৃতি এখনও ভালরূপ জানা যায় নাই। তবে তাহার কম্পনোত্থিত বীচিমালা আমাদের ত্বগেন্দ্রিয়ে তাপ এবং দর্শনেন্দ্রিয়ে জ্যোতির জ্ঞান উৎপন্ন করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

---

# পাষাণ-যোগী

মাথায় দিব্বি বরফ ঠেসে যেন পক্ষাঘাতের রোগী,
বাষ্পের লেপটি মুড়ি দিয়ে যোগ কর্‌ছ কি পাষাণ-যোগী?
তিন কাল গিয়ে এক কাল আছে, কি ফল ফল্‌বে বুড়ো
গাছে?

তোমার জপ তপ স্বর্গ ছেড়ে যাইছে রসাতল,
বিশ্বসুধা আজকে যেমন ক্ষুধার হলাহল।

এক সূচ্যগ্র ভূমির জন্য ভায়ে ভায়ে আড়াআড়ি,
রুটির টুকরা নিয়ে হচ্ছে মায়ে ছায়ে কাড়াকাড়ি!
বইছে ধরায় রক্ত-গঙ্গা তুমি ওগো কাঞ্চনজঙ্ঘা,
দেখ্‌ছ চেয়ে সৃজন যাচ্ছে প্রলয় পথে ধেয়ে,
তুমি আছ আপন ধ্যানে আকাশ পানে চেয়ে।

বড় আজকে চেপে মার্‌ছে চরণতলে ছোটর প্রাণ,
ক্ষুদ্র ভাবে—বৃহত্তের তাঁক কর্‌ব কিসে খান্‌ খান্‌।
বিপদ চতুষ্পদের প্রায় জাতির মাংস ছিঁড়ে খায়
রক্তমাখা খাণ্ডা হাতে নাচে অট্ট হাসে,
নরকের ক্লেদ মনে প্রাণে ভরা শ্মশান বাসে।

যক্ষ্মারোগীর ফাঁকরা বুকে বাঁচার আশা যেমন প্রবল,
চক্ষু বুজে ধ্বংস মুখে যাচ্ছে হতভাগার দল,
এ দুর্দ্দিনে না-ই ছিল ভাত হত না তার অপঘাত
এ দুর্ভিক্ষ-সমস্যার হত তাতেই সমাধান,
থাকত যদি আত্মার খাদ্য, প্রাণের অনুপান।

স্বার্থপর, বাঁধ্‌লে তুমি লোকালয়ের প্রান্তে বাসা,
ছেড়ে দিলে জীবের সঙ্গ, ভুলে গেছ জীবের ভাষা।
হাসিকান্না তোমার দ্বারে মিছে ঘোরে বারে বারে
খোলে না ওই পাষাণ-বাঁধ, দোলে না ও হৃদয়,
রুক্ষ সাধু, তোমার মুক্তি কভু হবার নয়।

ফিরে এস, ফিরে এস, হে বিরাগী, লোকালয়ে,
দশের বোঝা সবার সাথে যাও না তুমি মাথায় ল'য়ে।

উড়াও তোমার শান্তি-নিশান সত্যের জয় ধ্বনুক্ বিষাণ,
সমাধিটি ভাঙ্গ', জাগ দিয়ে অঙ্গ নাড়া,
তোমার তাড়ায় বিশ্ব জুড়ে পড়ুক নূতন সাড়া।

নূতন সৃষ্টির মত সে দিন মানব হবে ভোলানাথ,
কোলাকুলি পরস্পরে শত্রু মিত্র এক সাথ।
সবল যাবে গর্ব্বে লয়ে দুর্ব্বলেরে মাথায় ব'য়ে,
আস্‌বে সে দিন মহাপ্রলয় শুভ যুগান্তর,
তোমার চূড়ায় রাখ্‌বেন চরণ সে দিন বিশ্বেশ্বর॥

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

# উত্তরাপথ ভ্রমণ

বহুদিন যাবৎ দেবতা ও সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণের প্রিয়তম লীলানিকেতন, প্রকৃতির অনুপম মাধুরী বেষ্টিত, উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ করিবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। বাল্যকালে যখন পৌরাণিক উপাখ্যানে ও পরিব্রাজকদিগের অপূর্ব্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে সুদূর হিমালয়ের আশ্চর্য্য কাহিনী সকল পাঠ করিতাম, বাস্তবিকই মনে হইত, যদি এ সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলাম, তবে জীবন বৃথা। সময় ও সুযোগের অভাবে হৃদয়ের সে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বহুকাল হৃদয়েই পোষণ করিতে হইয়াছে। কতবার মনে করিয়াছি— এবার নিশ্চয়ই যাইব, কিন্তু চারিদিক্ হইতে শত বাধাবিঘ্ন আসিয়া সব গোল করিয়া দিয়াছে। ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে পূজার ছুটীতে একবার তীর্থ ভ্রমণে বাহির হই। সেবার গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছ্‌মনঝোলা প্রভৃতি তীর্থস্থান ও দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি প্রাচীন নগরী সমূহ পর্য্যটন করিয়াই ফিরিতে হইয়াছিল। সেবার যখন হরিদ্বার, হৃষীকেশ ও লছ্‌মনঝোলায় পার্ব্বত্য গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা ও হিমালয় পাদস্থিত বনভূমির উদাস গম্ভীর সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়াছি, তখনই মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম, একবার কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম দর্শন করিতেই হইবে। আমার সে সঙ্কল্প এবার পূর্ণ হইয়াছে—আমার বহুদিনের আশা এবার মিটিয়াছে। কিন্তু মিটিলই বা কৈ? এখন মনে হয়, আবার সে সকল স্থান দর্শন করিব, আবার প্রকৃতির সেই মোহন ছবি, হিমাদ্রির সেই তুহিন-মণ্ডিত ধবল শৃঙ্গাবলীর অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি পান করিয়া আত্মহারা হইব

এবার গ্রীষ্মকালে কেদার-বদরি যাইব, মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলাম। সঙ্গীরও অভাব হইল না। চারি বন্ধু জুটিলাম, আড়ম্বরের ত্রুটী নাই; চারিজনের যে কোন দুইজন একত্র হইলেই কেদার-বদরির কথা—আমাদের পোষাক কিরূপ হইবে, আমরা কত মাইল করিয়া চলিব, কি কি জিনিষ সঙ্গে যাইবে, কিরূপ জুতা তৈয়ার করাইতে হইবে, এই প্রকার নানাবিষয়ের আলোচনায় আমাদের বসিবার ঘর সর্ব্বদাই মুখরিত থাকিত।

অতঃপর আমাদের এই সংকল্পের কথা ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী শুদ্ধানন্দকে জানাইলাম। তিনি আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিলেন ও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদিগকে জানাইলেন। দেখিতে দেখিতে ছুটী আসিয়া পড়িল। বন্ধুবর বী—বাবু বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য রওনা হইয়া একেবারে হরিদ্বার কুম্ভ মেলায় উপস্থিত। আমরা তাহার চিঠি পাইয়া অবাক্, তিনি লিখিয়াছেন "আমার বদরি যাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র লইয়া তোমরা রওনা হইও, এবং হরিদ্বারে আমার সহিত মিলিত হইও।" আমাদের ভাগ্যে কুম্ভমেলা দর্শন ঘটিয়া উঠিবে না, কারণ তখনও ছুটী হইতে কিছু বিলম্ব ছিল।

অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষিত দিবস আসিয়া পড়িল। ১৩২১সনের ১৯শে চৈত্র অবশিষ্ট তিনি বন্ধু, যথেষ্ট কম্বল, গরম জামা, Sweater, মোজা, জুতা, টুপী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া রওনা হইলাম। অসংখ্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, আজ সত্য সত্যই, বাল্যের সেই সুখস্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিতে, ঢাকা নগরী

পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইলাম। নানাপ্রকার চিন্তায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সেই চিন্তাস্রোতের বিরাম নাই, তিন জনেরই মুখ গম্ভীর, অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। যাহারা কখনও এইরূপে বহুকালের অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

কলিকাতায় মাত্র চারিদিন অবস্থান করিয়া ৩রা বৈশাখ শুক্রবার রাত্রি দশটায় গয়া রওনা হইলাম। লোকের ভিড়ে Mail কিংবা Express Train এ স্থান হইল না; অগত্যা Passenger Train ধরিতে হইল। এ গাড়ীতে বেশী লোক ছিল না, কাজেই বেশ আরামে ঘুমাইয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গিলে জানালার ধারে আসিয়া বসিলাম। রাণীগঞ্জ ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। রাস্তার দুই ধারেই কয়লার খনি। এঞ্জিনের সাহায্যে Lift দ্বারা কুলিগণ ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে ও কয়লা উপরে তুলিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে সকল অতিক্রম করিয়া গাড়ী, কখনও বা কর্ষিত ভূমি সকলের মধ্য দিয়া, কখনও বা অনুর্ব্বর প্রস্তর সঙ্কুল পার্ব্বত্যভূমি অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। বেলা বারটায় গাড়ী Kodarma পৌঁছিল। দুইপার্শ্বে অভ্রের খনি, ক্ষুদ্র অভ্রখণ্ড সকলের উপর মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া, যেন সহস্র হীরকখণ্ডের জ্যোতিঃ বিকাশ করিতেছিল। সে সকল অতিক্রম করিয়া গাড়ী ক্রমান্বয়ে তিনটী টানেলের ভিতর দিয়া চলিল। উঃ! কি ভীষণ অন্ধকার সেই সুরঙ্গের ভিতর, মনে হয় যেন দম্ বন্ধ হইয়া যাইবে। আরও দুই তিনটী ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া, ফল্গুর উপর সুবৃহৎ লৌহসেতু পার হইয়া গাড়ী গয়া ষ্টেসনে পৌঁছিল। ষ্টেসনের বাহিরে আসা মাত্র প্রায় ৪০ | ৫০ জন পাণ্ডা নানাপ্রকার প্রশ্নে আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। আমি পূর্ব্বে একবার গয়া আসিয়াছিলাম, সেই সময়েই পূর্ব্বপুরুষদিগের পিণ্ডাদি প্রদান করা হইয়াছিল, সে কথা বলায় কাজেই পাণ্ডাগণ নিরস্ত হইল। একখানা গাড়ী করিয়া গয়া পোষ্ট আফিসে স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয়তম শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় আসিলাম। তিনি সেখানকার পোষ্ট্ মাষ্টার। শরৎ বাবু, সহযাত্রী নীরদ বাবুর পিতার বন্ধু। তিনি সাদরে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে স্নানাহার শরীরের অবসাদ বিদূরিত হইল। বৈকালে একখানা একা করিয়া ব্রহ্মযোনি পাহাড় দেখিতে রওনা হইলাম। গয়ার পশ্চিম সীমান্তে যে একটী অনতিবৃহৎ শৈলশ্রেণী বিদ্যমান, ব্রহ্মযোনি তাহাদেরই অন্যতম। পাহাড় হইতে কিছুদূরে গাড়ী দাঁড়াইল, গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া, একটী ক্ষুদ্র ময়দান অতিক্রম করতঃ আমরা পর্ব্বতের পাদদেশে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহদায়তন সোপান শ্রেণী পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিয়া গিয়াছে। আমরা সানন্দে সেই সিঁড়ি বাহিয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। অনেকদূর আরোহণ করিলে সিড়ির উপরে নির্ম্মিত একটী চাঁদনীতে পৌঁছিলাম। তাহার দেওয়ালে প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁদুর মাখান মহাবীরের মূর্ত্তি। ক্রমাগত উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম, ৪৫৩ খানা সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের শিখরে পৌঁছিলাম। তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমের পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চাতে লুকাইয়া আছেন, শীতল বাতাস হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সে মধুর সমীরণ স্পর্শে আমাদের গাড়ীতে ভ্রমণ-জনিত অবসাদ এককালে বিদূরিত হইয়া, প্রাণে নূতন উদ্যমের সঞ্চার হইল।

পাহাড়ের ঠিক শিখরে একটী ক্ষুদ্র মন্দির, চতুর্দ্দিকে অগণিত প্রস্তরখণ্ড সমূহ যুগ যুগান্তর ধরিয়া দণ্ডায়মান। প্রস্তরের অন্তরালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সমূহ জন্মিয়াছে। আমরা জুতা খুলিয়া হস্তীপৃষ্ঠ সদৃশ একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করতঃ প্রকৃতির সেই মোহনবেশ দর্শন করিতে লাগিলাম। আহা, কি প্রাণারাম সে দৃশ্য! নীচে গয়া সহরটী যেন একটী সুন্দর স্বপ্নরাজ্যের ছবির মত মনে হইতেছিল। দুই দিকে দিগন্তবিস্তৃত পর্ব্বত শ্রেণী মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান। আমরা মুগ্ধনেত্রে পার্ব্বত্য প্রদেশের সেই অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিতেছিলাম। উচ্ছবাতাস প্রস্তর সমূহের ফাঁকে প্রবেশ করিয়া এক প্রকার উদাস গম্ভীর শব্দের সৃজন করিতে-

ছিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতমালা ক্রমে সন্ধ্যার আঁধারে লীন হইতেছিল। তখন আমরা পর্ব্বতশিখর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, পুনরায় মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। মন্দিরের পশ্চিমদিকে প্রস্তরের অন্তরালে যোনি চিহ্নের ন্যায় একটী চিহ্ন আছে, সেই জন্যই পাহাড়টীকে ব্রহ্মযোনি বলা হয়।

বাসায় প্রত্যাগত হইতে রাত্রি প্রায় আটটা বাজিল। রাত্রিতে আহারান্তে নিদ্রিত হইলাম। সঙ্গী যজ্ঞেশ্বরের পিতৃ-পিণ্ড প্রদান করিতে হইবে, কাজেই পরদিন প্রত্যুষে সে পাণ্ডার সঙ্গে পিণ্ডদান করিতে চলিয়া গেল। আমরাও কিছুক্ষণ পরে ফল্গুতে স্নান করিতে বাহির হইলাম। ফল্গুতে একটুকুও জল নাই, কেবলই বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। সেই বালুকারাশি পার হইয়া আমরা একটী পর্ব্বতের নিকটে পৌঁছিলাম। পর্ব্বতে উঠিবার একটী রাস্তা আছে। কিন্তু আমাদের একটু adventure করা চাই। কাজেই রাস্তা ছাড়িয়া আমরা প্রস্তর বাহিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। কিছুদূর উঠিতেই আমাদের সাড়া পাইয়া একটী খরগোস সভয়ে পলায়ন করিল। পলায়মান শশককে দেখিয়া আমাদের বড়ই আনন্দ হইল।

পর্ব্বতের শিখরে একটী ছোট মন্দির; তাহাতে সিন্দুর মাখান একটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত। পাহাড়টী যদিও বেশী উচ্চ নহে, তথাপি স্থানটী আমাদের নিকট বড়ই মনোরম বলিয়া মনে হইল। পর্ব্বতের উপর হইতে ফল্গুর পারস্থিত গয়ার দৃশ্য বড়ই সুন্দর। পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া ফল্গুর বালুকারাশির ভিতর খোদিত একটী কুণ্ডের নিকট আসিলাম। কিছুটা খুঁড়িলেই ফল্গুতে জল বাহির হয়। পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগের স্নানের সুবিধার জন্য এই ফল্গুটী খুঁড়িয়া রাখিয়াছে, অসংখ্য যাত্রী প্রতিদিন এই কুণ্ডে স্নান তর্পণাদি করায় তথায় ভীষণ দুর্গন্ধ হইয়াছিল। সেই জলে অতি কষ্টে স্নান করিয়া বিষ্ণু-মন্দিরে আসিলাম। কৃষ্ণপ্রস্তরে অঙ্কিত ভগবানের সেই অপূর্ব্ব পদচিহ্ন স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম। নিকটেই অক্ষয়বট। তাহার নীচেও পিণ্ডদান করিতে হয়। এই অক্ষয়বটের নীচে কোন ফল ত্যাগ করিবার প্রথা আছে।

অতঃপর বাসায় ফিরিয়া আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে একখানা গাড়ী করিয়া বুদ্ধগয়ায় রওনা হইলাম। বুদ্ধগয়া গয়া হইতে প্রায় ৭ মাইল দক্ষিণে। তখন বেলা একটা বাজিয়াছিল, চারিদিকে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। সহর ছাড়িয়া আম্র, তাল প্রভৃতি বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যদিয়া পথের ধূলা উড়াইয়া আমাদের গাড়ী চলিতের লাগিল। প্রায় আড়াইটার সময় বুদ্ধগয়া পৌঁছিলাম। মন্দির হইতে কিছুদূরে গাড়ী দাঁড়াইল, কিছুটা পথ হাঁটিয়া সুবৃহৎ মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইলাম। বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত সেই অপূর্ব্ব মন্দিরের গঠন অনেকটা পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের ন্যায়। ভিতরে একখানা প্রকোষ্ঠে ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রস্তরময় বিরাট ধ্যানমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বিগ্রহের উপরে সোণালি রং করা। মন্দিরের পূজারী হিন্দু—ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধগণ এখানে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন মাত্র। মন্দিরের উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। উপরেও আর কয়েকটী প্রস্তরের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অনেক ভগ্ন স্তম্ভ, ভগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি ও সমাধির ন্যায় বাঁধান অনেকগুলি স্থান আছে। মন্দিরের ঠিক পশ্চাৎ-ভাগেই মহাবোধিদ্রুম। সে স্থানের লোকেরা বলে—যে বর্ত্তমান বটবৃক্ষ প্রাচীন বোধিদ্রুমের শাখা হইতেই জন্মিয়াছে। বৃক্ষের নিম্নে একটী প্রস্তরে বাঁধান বেদি। এই স্থানেই নাকি ভগবান্ বুদ্ধ তপস্যা করিয়া অদ্বৈত নির্ব্বাণরূপ নূতন ধর্ম্মের অপূর্ব্ব অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ সেই বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়া-মণ্ডিত বেদিটীর উপর উপবিষ্ট হইয়া নানাকথা ভাবিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, এই সেই স্থান, যেখানে জীবদুঃখাসহিষ্ণু ভগবান্ বুদ্ধ "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্" এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপস্যাদ্বারা জগতে নূতন ধর্ম্মমার্গের অবতারণা করিয়াছিলেন। মন্দিরের অদূরেই বৌদ্ধ পরিব্রাজকদিগের বাসের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বাঙ্গলা। মন্দিরের দক্ষিণে

একটী বৃহৎ সরোবর, পদ্মপত্র দ্বারা প্রায় সমাচ্ছাদিত। তীরে বৃহৎ চাঁদনী সমন্বিত বাঁধা ঘাট।

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইলাম। মন্দিরের পূজক পঞ্চপাণ্ডব দর্শন করিতে আমাদিগকে আহ্বান করিল। বৌদ্ধমন্দিরে পঞ্চপাণ্ডব কোথা হইতে আসিল, ভাবিয়া একটু কৌতুহল হইল। পাণ্ডা আমাদিগকে নিকটস্থ মন্দিরে লইয়া গেল ও পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করাইল। আমাদের যেন মনে হইল এ সমুদয়ই বৌদ্ধমূর্ত্তি। অলঙ্কারাদি ও কাপড়চোপড় পড়াইয়া অর্থাগমের সুবিধার জন্য পূজকেরা তাঁহাদিগকে পঞ্চপাণ্ডব বলিয়া দাঁড় করাইয়াছে। এবার পাণ্ডা আমাদিগকে ভীমসেনের গদা দর্শন করাইল। গদা দর্শন করিয়া আমরা বাস্তবিকই হাস্যসংবরণ করিতে পারিলাম না। মূর্খ পূজকের উপর রাগও হইল। সে গদা আর কিছুই নহে, শিলালিপি বিশিষ্ট একটী ভগ্ন প্রস্তর স্তম্ভ। তাহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের জন্য তাহাকে কিছু বক্‌সিস্ দিয়া, বাহিরে আসিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত চিত্রশালা (museum) দর্শন করিলাম। তথায় নানা স্থানে প্রাপ্ত বৌদ্ধ স্থপতির ভগ্নাবশেষ সমূহ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই সমুদয় দর্শন করিয়া পুনরায় গাড়ীতে আসিলাম। একদল অর্দ্ধনগ্ন কৃষ্ণকায় বালক ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের গাড়ীর পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিল এবং ২।১টী পয়সা দিলে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিল।

গয়া পঁহুছিতে ৪টা বাজিয়া গেল। অনেক বেলা ছিল কাজেই পথে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সাধনাস্থল 'আকাশ-গঙ্গা' পাহাড় দেখিয়া লইলাম। বাসায় ফিরিতে প্রায় ৭টা বাজিল, তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া শরৎ বাবুর নিকট বিদায় লইয়া ৺ কাশী রওনা হইলাম। প্রায় ৮॥০ টায় Kalka Express এ চাপিয়া রাত্রি দেড়টায় মোগলসরাইতে গাড়ী বদলি করিয়া রাত্রি ২ টায় ৺কাশী পঁহুছিলাম। ৺কাশীতে চারিদিন মাত্র ছিলাম, এই কয়দিনে, কাশীর দ্রষ্টব্য সমূহ দেখিয়া লইলাম, একদিন একা করিয়া ৺কাশীর অদূরবর্ত্তী সারনাথের বৌদ্ধস্তূপ দর্শন করিয়া আসিলাম। ৺ কাশীর গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে ভ্রমণ করা বড়ই আনন্দদায়ক। একদিন অপরাহ্নে একখানা নৌকা করিয়া গঙ্গাতে বেড়াইলাম। গঙ্গাবক্ষ হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ৺ কাশীর দৃশ্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। তীরে অসংখ্য প্রস্তর নির্ম্মিত বাঁধান ঘাট, ঘাটের উপর দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত উন্নত হর্ম্ম্যাবলী, গঙ্গার নির্ম্মল জলে তাহাদের ঈষৎ কম্পিত প্রতিবিম্বগুলি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল; আবার পরপারে বালুকাচ্ছাদিত বিজন বেলাভূমি ধূ ধূ করিতেছে। আহা কি সে শোভা! কি সে অদ্ভুত গরিমা গঙ্গাসলিল স্নাত মৃদুল হিল্লোল আমাদের শরীর পুলকিত করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, আর আমরা আনন্দে গাহিতে গাহিতে দাঁড় ফেলিতেছিলাম।

সন্ধ্যায় তীরে আসিয়া বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিলাম,পূজকগণ সুন্দর দীপমালা হস্তে গম্ভীর স্তবগান করিতেছে "ভজ শিব ওঁকার হর হর হর মহাদেও" সমগ্র ভক্তমণ্ডলী ভক্তি গদ্‌গদ্ চিত্তে সেই স্তব শ্রবণ করিতেছে, বাস্তবিক বিশ্বপতি বিশ্বনাথের আরতির সেই গম্ভীর স্তবমালা শ্রবণ করিলে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হয়। প্রাণ যেন স্বভাবতঃই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

১০ই বৈশাখ বেলা ১০।২৪ মিনিটে পাঞ্জাব মেইলে ৺ কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্বার রওনা হইলাম, গাড়ীতে একজন গুজরাটী Professor এর সঙ্গে ইংরেজীতে বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। আমাদের বর্ত্তমান ভ্রমণের সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া তিনি কতই আনন্দিত হইয় বলিলেন "I see, you are adventurous young men" পরে নিজের দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "you must be unmarried, you see we married men can not have the pleasure of such adventures, as for myself my wife is always dargging me behind." আমি তাহার দুঃখে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বুঝিলাম তাহার সঙ্গে মেয়েদের গাড়ীতে তাহার স্ত্রীও আছেন, তাঁহার ২ বৎসরের টুকটুকে ছোট্ট পুতুলের মত তার মেয়েটী আমাদিগকে বড়ই

আনন্দ দান করিতেছিল। ভদ্রলোকটী বড়ই অমায়িক ও সদালাপী, তাঁহার সঙ্গে আলাপে বড়ই আনন্দ হইল। কথায় কথায় তিনি Dacca university'র কথা তুলিলেন। এইরূপ নানা কথাবার্ত্তায় বেশ সময় কাটিল, রাত্রি ২ টায় আমরা লাক্‌সার জংসনে নামিয়া পড়িলাম। লাক্‌সারে গাড়ী বদলি করিয়া রাত্রি ৩া০ টায় হরিদ্বার পঁহুছিলাম। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু waiting room এ কাটিল, সকালে একখানা এক্কা করিয়া কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলাম। কনখল হরিদ্বার হইতে অনুমান ২ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী কল্যাণানন্দ আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এখানে আসিয়া কিন্তু আমরা বীরেন বাবুকে দেখিতে পাইলাম না, তাঁহার সঙ্গে আমাদের এখানেই মিলিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাবে ও অসংখ্য লোকের জনতায় তিনি বদরি যাত্রার সঙ্কল্প একরূপ পরিত্যাগ করিয়া Meerut চলিয়া গিয়াছিলেন। অগত্যা Meerut এ তাহাকে একখানা টেলিগ্রাফ করা হইল, কিন্তু কোনও জবাব পাওয়া গেল না। কনখলের অনেকেই আমাদিগকেও বদরি যাত্রার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু আমরা নিতান্তই একগুঁয়ে, নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আমাদের সঙ্কল্প যেন দৃঢ়তর হইতেছিল।

কনখল স্থানটী বড়ই সুন্দর। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে গঙ্গার দুইটী ধারা, মাঝে মাঝে সুন্দর বনভূমির দ্বারা পরিবেষ্টিত সে স্থানটীকে বাস্তবিকই একটী তপোবন বলিয়া মনে হয়, কনখল উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত। হরিদ্বার ও কনখল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত সমগ্র তীর্থ স্থানগুলিই পুরাণে উত্তরখণ্ড নামে অবিহিত হইয়াছে, এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে। পূর্ব্বে আর একবার এখানে আসিয়াছিলাম, কাজেই রাস্তা ঘাট একটু একটু জানা ছিল। সকালে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া স্থানটী ঘুরিয়া দেখিতে বাহির হইলাম, পথে একটী দোকানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লইলাম। কনখলে মাছির কি ভয়ানক অত্যাচার! রাস্তায় চলিবার সময়ও অসংখ্য মাছি শরীরে বসিয়া জ্বালাতন করিয়া তুলে। ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষরাজার বাটীতে আসিলাম, এই স্থানেই শিবনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। একটী ছোট কুণ্ড আজও দক্ষের যজ্ঞকুণ্ড বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কুণ্ডের নিকটেই দক্ষেশ্বর শিবের মন্দির। সমুদয় দর্শন করিয়া রাণীঘাটে স্নান করিতে চলিলাম। সেখানে গঙ্গার দুইটী শাখা মিলিত হইয়াছে, অগণিত উপলখণ্ডের উপর দিয়া গঙ্গার তুহিন নিঃস্যন্দিনী শীতল স্বচ্ছ জলধারা অবিরাম কলতানে নামিয়া আসিতেছে। পরপারে দিগন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী সেই স্থানের গরিমা আরও বৃদ্ধি করিতেছিল। জলে অসংখ্য 'মহাসউল' মাছ নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছে, তাহারা নিঃসঙ্কোচে দর্শকদিগের হস্ত হইতে খাদ্য গ্রহণ করে।

আজ মাত্র কয়েকদিন হইল কুম্ভমেলা ভাঙ্গিয়াছে। এখনও অনেক সাধু সন্ন্যাসী গঙ্গার উন্মুক্ত তীরে আসন স্থাপন করিয়া বাস করিতেছেন। আনন্দে অবগাহন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগত হইলাম। কিছুক্ষণ পরেই প্রসাদের ডাক পড়িল, সকলে মিলিয়া প্রসাদ লইতে চলিলাম। কিন্তু মাছির যন্ত্রণায় কেমন ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। ভাতের উপর এত মাছি আসিয়া বসিয়াছে সে ভাত প্রায় আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। এক হস্তে মাছি তাড়াইয়া কোন প্রকারে কয়েক গ্রাস খাওয়া গেল, মধ্যাহ্নে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বৈকালে হরিদ্বার বেড়াইতে গেলাম। মেলা উপলক্ষে প্রভূত লোক সমাগম হওয়ায় হরিদ্বার স্থানটী বড়ই অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল, তার উপর মাছির অত্যাচারে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। বরাবর ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে আসিলাম। সেখানেও অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী তখনও বাস করিতেছিলেন, কোথাও বা কোন সাধু রামায়ণ পাঠ করিতেছেন, আর অগণিত নরনারী ভক্তি গদ্‌গদ্ চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছে। স্থানটীর সর্ব্বত্রই যেন একটা সজীব ধর্ম্মপ্রাণতার ভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল। মেলার সময় গঙ্গার পরপারেও অনেক লোক বাস করিত, গভর্ণমেণ্ট গঙ্গায়

উপর অনেকগুলি অস্থায়ী সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেগুলি এখন তুলিয়া লওয়া হইতেছে, পরপারে পর্ব্বত-পরিবৃত বনভূমি বহুলোকের সমাগমে ও সাধুদিগের প্রজ্জ্বলিত ধুনির উত্তাপে মলিন হইয়া গিয়াছিল। ব্রহ্ম-কুণ্ডের নিকটস্থ সেতুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া গঙ্গার অনুপম শোভা সন্দর্শন করিয়া নয়নযুগল তৃপ্ত করিতে লাগিলাম। সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বাজারে আসিয়া ৩ খানা Hill stick ক্রয় করিলাম, সেগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ হস্ত, খুব মজবুত, বাঁশের দ্বারা সেগুলি নির্ম্মিত; নীচে প্রায় ৩ ইঞ্চি পরিমিত তীক্ষ্ণ লোহার ফলা লাগান। সকল বদরি যাত্রি-কেই এইরূপ একখানা লাঠি সঙ্গে লইতে হয়, নতুবা বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে চলিতে বড়ই অসুবিধা হয়।

পায়ের পটি, মোমবাতি, দেশলাই, লণ্ঠন প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে কনখল ও হরিদ্বারের মধ্যবর্ত্তী লৌহ সেতুর নিকটে গঙ্গার শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত সৈকতে উপবেশন করিয়া স্বভাবের শোভা দর্শন করিতে লাগিলাম। অবিশ্রান্ত কলতানে গঙ্গা সাগরের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, সে কলতানের সহিত কণ্ঠ মিশাইয়া সুগায়ক নীরদ বাবু ২।৩টী গান গাহিলেন। ক্রমে দশমীর চন্দ্র আকাশে হাসিতে লাগিল, দুইপার্শ্বস্থিত সুন্দর বনভূমি বিমল জোছনায় বিধৌত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। খর-স্রোতা পার্ব্বত্য গঙ্গার তরঙ্গায়িত বক্ষে চন্দ্রের অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। স্বভাবের সেই নিরুপম সৌন্দর্য্যসুধা আনন্দে পান করিতে লাগিলাম।

আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে প্রায় ৮টা বাজিল, রাত্রিতে প্রসাদ পাইয়া সুখে নিদ্রা গেলাম, পরদিন সকালবেলা রেলে চাপিয়া হৃষীকেশ রওনা হইলাম।

হরিদ্বার ছাড়িয়াই ক্রমান্বয়ে দুইটী টানেল অতিক্রম করিয়া সুন্দর পার্ব্বত্য বনভূমির ভিতর দিয়া গাড়ী চলিল। হরিদ্বার হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত, ঠিক উত্তরে—সীমাবিহীন, দিগন্ত বিস্তৃত হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডা-য়মান। এই স্থানের ভিতর দিয়াই, হরপার্ব্বতীর বিহারভূমি শুভ্রতুহিনমণ্ডিত হিমালয়ের বক্ষে প্রবেশ করিতে হয়, বলিয়াই এই স্থানটীকে "হরদ্বার" (Hardwar) বলা হয়, 'হরিদ্বার' নামটী তাহারই বাঙ্গলা অপভ্রংশ।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই গাড়ী সুন্দর বনভূমির মধ্যে অবস্থিত হৃষীকেশ রোড্ নামক ষ্টেসনে পঁহুছিল। সেখান হইতে একখানা এক্কা করিয়া হৃষী-কেশ রওনা হইলাম। এক্কা সুন্দর উপত্যকার ভিতর দিয়া বাঁধান রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। কখনও অল্প সলিলা গঙ্গার জলের উপর দিয়া, কখনও বা সুন্দর সেতুর উপর দিয়া গঙ্গা পার হইয়া এক্কা চলিতেছিল, দুই দিকে সুন্দর বনভূমি নানাপ্রকার পক্ষীকূজনে মুখরিত। পথিমধ্যে নিবিড় অরণ্য পরিবেষ্টিত সুন্দর সত্যনারায়ণের মন্দির দর্শন করিলাম, মন্দিরের পার্শ্ব-দিয়া একটী ছোট ঝরণা কুলু কুলু রবে চলিয়াছে। চতুর্দ্দিকে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর বাস, বাবা কম্বলী ওয়ালার সদাব্রত হইতে ইঁহারা আহার্য্য পাইয়া থাকেন ও নির্ব্বিঘ্নে তপস্যায় কালাতিপাত করেন। এইস্থান হইতে হৃষীকেশ পঁহুছিতে প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টা লাগিল। বাবা কম্বলীওয়ালার তত্রত্য ধরমশালার একটী প্রকোষ্ঠে আমাদের স্থান হইল, জিনিষ পত্র চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া গঙ্গায় স্নান করিতে চলিলাম। এখানেও গঙ্গাতীরে অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী সর্ব্বদা তপস্যায় কালাতি-পাত করেন। কম্বলীওয়ালা ও অন্যান্য দাতাগণের অর্থে ইঁহাদের বৃত্তির সংস্থান হয়। গঙ্গার তীরে সারি সারি অনেক খড়ের কুটীর বর্ত্তমান। সে গুলিকে সে স্থানে 'কুপা' বলে, সাধুদিগের বাসস্থানের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ লোকগণ এই সকল প্রস্তুত করিয়া দেন, সাধুদিগের কেহ কেহ এই সকল কুপাতে বাস করেন, আবার অনেক সাধু নিকটস্থ পর্ব্বতের বিজন গুহায় বাস করিয়া পরমার্থ চিন্তায় কালাতিপাত করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই হৃষীকেশ দর্শন করিলে পুরাকালের তপোবনের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। এ যেন সাধুর রাজ্য। সংসারের কোলাহল যেন এই স্বর্গীয়

তপোবনের শান্তিভঙ্গ করিতে সাহসী হয় না। স্থানটীর আব্‌হাওয়ায় যেন একটা পবিত্রতা, একটা আধ্যাত্মিকতা ও অনাবিল শান্তির ভাব জড়িত রহিয়াছে। স্থানটী প্রায় চতুর্দ্দিকেই উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। পূর্ব্বদিকে পূত সলিলা জাহ্নবী তপোবনের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া প্রবহমানা। সুশীতল গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া বাসায় আসিলাম।

বৈকালে পুনরায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। আহা, অপরাহ্নে গঙ্গাতীরের কি অনুপমশোভা। সূর্য্যদেব গঙ্গার পরপারস্থিত উন্নত পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তরালে গমন করিয়াছেন. পূর্ব্বদিকে পর্ব্বত শৃঙ্গে অস্তাচলগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু ঝিকি মিকি করিতেছিল. ঝির্ ঝির্ করিয়া, গঙ্গার জলকণা সম্পৃক্ত শীতল বাতাস শরীরে পুলক সঞ্চার করিয়া বহিয়া যাইতে ছিল। জল প্রপাতের গম্ভীর তান হৃদয়ে ঔদাস্যের সঞ্চার করিয়া তুলিল।

দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাধুগণ একে একে আসিয়া গঙ্গাতীরে সুশীতল শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। আমরাও একস্থানে উপবিষ্ট হইয়া সেই স্বর্গীয় শোভা দর্শন করিতে লাগিলাম। সাধুদিগের কেহ বা শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান স্তিমিত নেত্রে, জড় জগতের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, বুঝিবা কোন্ আনন্দময় অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। আমার মনে হইতেছিল, এ যেন স্বর্গ রাজ্যে আসিয়াছি, এখানে যেন পৃথিবীর কোলাহল প্রবেশ করিতে পারে না, এখানে শোক নাই, দুঃখ নাই, তাপ নাই, এখানে যেন পূর্ণানন্দের রাজত্ব। সাধুদিগের কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে ওঁকার প্রভৃতি উচ্চারণ করিতেছিলেন. তাঁহাদের কণ্ঠনিঃসৃত সেই পবিত্র ধ্বনি পরপারস্থিত পর্ব্বত গাত্রে প্রতিহত হইয়া অদ্ভুত প্রতিধ্বনি প্রেরণ করিতেছিল। আমার মনে হইতেছিল, পর্ব্বত মধ্য হইতে আগত এ যেন কোন্ দেবতার কণ্ঠস্বর। ক্রমে আকাশে নির্ম্মল চন্দ্রালোক হাসিতে লাগিল। কি এক ভাবে মাতোয়ারা হইয়াই যেন নীরদ বাবু গুরু নানক রচিত সেই বিরাট আরতির গান গাহিতে লাগিলেনঃ—

"গগনথাল রবি চন্দ্র দীপক জলে
তারকা মণ্ডল চমকে মতিরে" ইত্যাদি—

সঙ্গীত শ্রবণে একজন সাধু আসিয়া আমাদের নিকটে উপবেশন করিলেন। নীরদবাবু তাঁহার অনুরোধে আরও ২।১ টী গান গাহিলেন। অতঃপর সাধু নিজেই গান ধরিলেন। সাধুর গানের পদ আমার মনে নাই, কিন্তু তাঁর গানের একটী ভাঙ্গা চরণ "গিরিধারী বনোয়ারী"—তাঁহার ঢল ঢল মুখখানি আজও হৃদয়ে স্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে। সাধুর সঙ্গে অনেক আলাপ হইল, বাসায় ফিরিতে বেশ রাত্রি হইল।

প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া গঙ্গার তীরে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। আমাদের জিনিষপত্র লইয়া যাইবার জন্য একজন কুলি ঠিক হইল। এই সব কুলি দিগকে 'কাণ্ডিওয়ালা' কহে, তাহারা পৃষ্ঠে একপ্রকার ঝুড়ি বাঁধিয়া তাহার ভিতরে একমণ দেড়মণ মাল, এমনকি একজন মনুষ্য পর্য্যন্ত লইয়া কঠোর পার্ব্বত্য পথে অনায়াসে চলিয়া থাকে। যাহারা পদব্রজে গমন করিতে অক্ষম তাহাদিগকে বহন করিবার জন্য 'ঝাম-পান' ও 'ডাণ্ডি' নামক আরও দুই প্রকার যান এখানে পাওয়া যায়। বাহকগণ অনেকেই গাড়োয়াল রাজের প্রজা। রাজার নিয়োজিত একজন কর্ম্মচারী কাণ্ডিওয়ালা ও যাত্রীর নাম ধাম লিখিয়া রাখিয়া, যাত্রিকে ও কুলিকে ২খানা পৃথক রসিদ প্রদান করেন। কাণ্ডি-ওয়ালার সহিত ৩০৲ টাকায় চুক্তি হইয়াছিল, সে আমাদের সমস্ত জিনিষ লইয়া কেদার ও বদরি হইয়া মেইল চটীরা পর্য্যন্ত যাইবে। ধরমশালার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আলাপ হইল। তিনিও আমাদিগকে বদরি যাইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন। একজন বৃদ্ধ সাধু একটু রং চড়াইয়া বলিল "বাবুজী ১২০০০ লোক পূর্ব্বেই বদরি রওনা হইয়াছে কাজেই চটীতে স্থান পাইবে না, জিনিষপত্র অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইবে এবং মহামারীতে শতকরা ৭০ জনই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" আমরা সাধুর কথায় কর্ণপাতই করিলাম না। সগর্ব্বে বলি-লাম "আমরা বাঙ্গালী, এই সব অমূলক ভয় রাখি না।

যাহাই হউকনা কেন আমরা যাইবই"। ডাক্তার বাবু কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ ও "কেদার বদরি পথপ্রদর্শিকা" নামক একখানা ক্ষুদ্র হিন্দি পুস্তিকা আমাদিগকে প্রদান করিলেন। ১৩ই বৈশাখ বেলা ৪॥০ টায় বদরি-নারায়ণের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া আমরা তিন বন্ধু হৃষীকেশ পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে বাহির হইলাম।

'ভবঘুরে'

## শরতে অভয়া।

যেদিন ;—রক্তপ্লাবিত সমর ক্ষেত্রে এসেছিলে মাতা তুমি,
ধন্য করিতে স্নিগ্ধ শ্যামল রম্য ভারত ভূমি।
এসেছিলে মাতা রক্ষা করিতে ভক্ত রামের মান,
অর্চ্চনা যেই করেছিল তব, তুচ্ছ করিয়া প্রাণ।
সে দিন হইতে বিশ্বপালিনি! লক্ষ ভারত ভক্ত,
অর্চ্চে অকালে তোমারে জননি! অর্পি হৃদয় রক্ত।

আজিও শরতে বাজিছে গর্ব্বে তোমার বিজয় ডঙ্কা,
সে রব ধ্বনিছে বঙ্গ ভবনে, ঘুচাতে সকল শঙ্কা।
আজি,—হিন্দুর হৃদয়ে কত আশা জাগে হর্ষ-আকুল-অঙ্গ,

ওগো!—পুলক বন্যা প্লাবিয়া ফেলেছে চিরশোভাময়ী বঙ্গ।
আজি ;—কুসুম কুঞ্জে তারকা পুঞ্জে নবীন পুলক জাগে,
মাতা!—শুভ্র শেফালি নীরবে ঝরিয়া তোমারি চরণ মাগে।
আজি ;—ভেসে আসে ঐ স্নিগ্ধ পবনে তোমারি নূপুর তান,
শুনি ;—পাপিয়া গাহিছে কণ্ঠ ভরিয়া তোমার মহিমা গান।
আজি ;—কুসুম পুঞ্জে ভ্রমিতেছে অলি, গাহি গুন্ গুন্ রবে,
'সফল হইবি মাতৃ চরণে অর্পি জীবন সবে।'

বিশ্ব ভরিয়া সকলে আজিকে বন্দনা গীতি গায়,
মাতা!—নির্ধন ধনী সকলি আজিকে তোমার চরণ চায়।
যদি ;—ভক্ত-কুটীরে বরষান্তরে উপনীতা মাতা তুমি,
দুঃখ দৈন্য দূর করে দাও,—রাতুল চরণে নমি।

শ্রীচারুভূষণ দেব।

## বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং সেবা মাহাত্ম্য।

"এতাবজ্জন্ম সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥"ভাগবত।

দেহসম্পর্ক-বিয়োগসাধন, সর্ব্বত্যাগভূষণ সন্ন্যাস যখন ভারতের বরেণ্য আশ্রম, যখন অতীন্দ্রিয় সত্যান্বেষী, ভোগবিলাস বিমুখ, তপস্যাশীল ব্রাহ্মণ ভারত সমাজের গণ্যমান্য নায়ক, পূজার্হ আদর্শ, তখন আত্মজ্ঞানই যে ভারতের বিধাতৃদত্ত সম্বল একথা আর যুক্তিপ্রমাণ যোগে বুঝিতে হয় না। এ ভিক্ষাজীবী, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণের এত উচ্চাসন কেন? ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র অগস্ত্য প্রমুখ ঋষিবৃন্দের আদেশবাক্য সেকালের রাজাধিরাজ সম্রাটেরও শিরোধার্য্য কেন? কোন্ বলে রাজর্ষি জনকের সভায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এত প্রাধান্য ও আধিপত্য? কেন মুনিঋষিগণের অপ্রীতিভয়ে প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গ সতত কম্পমান? কেন এরূপ ভিখারীর সেবার্থে ভূপতি সর্ব্বস্বদানে দণ্ডায়মান? ভারতের অতীত ইতিহাস,—পুরাণ, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত এ সকল ঘটনার মাহাত্ম্যবর্ণন মুখে কি রহস্য শিক্ষা দিতেছে?—"জ্ঞানাৎ পরতরং নহি।" সুতরাং ভারতের জ্ঞান আছে, জ্ঞানার্জ্জন মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ, ভোগ-সাধন নহে। পাশ্চাত্য সভ্যতার মনোমোহন চাকচিক্য সেই আধ্যাত্মিক আদর্শকে ম্লান করিয়া তুলিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আবিল তরঙ্গাঘাতে সে আদর্শ-কোহিনুর যেন চুরমার হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু বিশ্ব-বিধাতার নির্দ্দেশে ভারতের সেই সনাতন আদর্শের এখন জীবন আছে,—এশিয়া, মিশর, গ্রীস, রোমের ন্যায় অতীতের অতল তলে ডুবিয়া যায় নাই। এখনও জগতের চিন্তাশীল মনীষিবর্গ সে আদর্শের মহিমা ঘোষণা করিয়া থাকেন। ভিখারী ভারতের অঞ্চলের ধন সেই আদর্শরত্ন স্বীয় সুবর্ণ কিরণজালে সমস্ত পৃথিবীর সুধীবৃন্দের চিন্তাস্রোত শান্তি ও মৈত্রীর শুভ্র পথে টানিয়া আনিতেছে। ভারত জগতের জ্ঞান গুরু, ইহা বিধাতার লিখন, কেন খণ্ডন হইবে? যতদিন ঋষিজীবনের বীর্য্যবান স্পন্দন উপনিষৎ, বেদান্ত বর্ত্তমান,

যতদিন ভারতের মরণ নাই, ততদিন ভারতের জ্ঞান গরিমার জয় জগতে অক্ষুণ্ণ। জগতের সভ্যতাভাণ্ডারে এই ধর্ম্মধন বিতরণের জন্যই ভারতের অস্তিত্ব।

দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতের ধর্ম্ম-প্রতিভা একবার পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল, বৌদ্ধযুগের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণার ফল ধরিয়াই দেখা যায়, বৈদিক সভ্যতার সময় অন্যূন আরও তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। এই পাঁচ হাজার বৎসরের সঙ্কলিত জগতের ইতিবৃত্ত কি বলিতেছে? কত দেশ, কত জাতি ঐশ্বর্য্যের উচ্চ শিখরে উঠিল, কতকদিন প্রভুত্ব করিল, পঙ্গপালের ন্যায় লুপ্ত হইল। কিন্তু, জরাজীর্ণ ভারত এখনও জীবিত রহিয়াছে। এত যুদ্ধ বিপ্লব, অনশন, মহামারী, বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করিয়াও যে ভারত বাঁচিয়া আছে, ইহা কি অতিশয় আশ্চর্য্য নহে? কেন হইল এমন ভিন্ন পরিণাম? কেবল সভ্যতার আদর্শের বিশেষত্ব নিবন্ধন। অপরাপর দেশের জাতীয় জীবনের আদর্শ ঐহিক উন্নতির দিকে—বাহ্যিক সুখ সমৃদ্ধি ভোগ প্রবৃত্তি, ভারতের জাতীয় জীবনের আদর্শ পারমার্থিক পথে—নিবৃত্তিমূলক আধ্যাত্মিক উন্নতি।

"সর্ব্ব পরিগ্রহ ভোগ ত্যাগঃ।
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥"

এ জাতীয় জীবন বহির্জগতের দিকে বেশী না তাকাইয়া কেবল অন্তরের অন্তস্তরে মহান্ ভূমার অন্বেষণে ছুটিয়া ছুটিয়া অনন্তের পাদমূলে বিশ্রাম লাভ করিতে চায়। স্থূল কথা, আর আর জাতির জীবন উপরে উপরে ভাসা—শরীর এবং ইন্দ্রিয়ে; আর এ জাতির জীবন মজ্জারও ভিতরে—অজর অমর আত্মায়। "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈবামৃতম্"। অন্যান্য জাতি সসীম ক্ষুদ্রের উপাসক, আর এ জাতি অসীম অনন্তের উপাসক। তাই, পুষ্প ও পত্রের ন্যায় দুদিনে স্খলিত ও ধ্বংস মুখে পতিত হইবার নহে। এখন জগতের সভ্যতা এই উন্নত আদর্শ গ্রহণে উন্মুখ। বৌদ্ধযুগের দ্বিসহস্র বর্ষ পর আবার ভারতের জ্ঞানরূপী ঋষির তপোবন, তপস্বীর নিভৃত গিরিকন্দর ভঙ্গ করিয়া বিকীর্ণ হইবে, পৃথিবী দিব্য প্রাচ্য আলোকে উদ্ভাসিত হইবে, তাহারই লক্ষণ সূচিত হইতেছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর মৌলিক কবির কবিতাপ্রবন্ধে, দার্শনিকের চিন্তা প্রণালীতে, এবং বৈজ্ঞানিকের নব নব আবিষ্কারে এই সত্য সুপ্রমাণিত।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতার সনাতন আদর্শ—ঋষিত্ব, জীবন্মুক্ত অবস্থা। ভারতে জাতীয় জীবনের নিয়ামক ভাব "আত্মনঃ মোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ"। সুতরাং প্রাচীন ভারতের আদর্শ মানব, ঋষি—আত্মধ্যাননিমগ্ন, আগমশীল ও সেবাপরায়ণ। ঋষিই সমাজের শিক্ষক, নিয়ন্তা এবং ধর্ম্মগুরু। ব্রহ্মধ্যানী ঋষি মায়ামোহময়ী অবিদ্যান্ধকারের পারে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন; তিনি স্বতঃই ভূমার ভাবে ভাবিত, কোনও বাসনার আস্ফালন তাঁহার প্রকৃতিতে নাই,—তিনি নিবৃত্তির শান্তিময়ী মূর্ত্তি। তাঁহার দিব্য দৃষ্টি দেশ কাল নিমিত্তের ক্ষুদ্র খণ্ডিত গণ্ডী ভেদ করিয়াছে; তাঁহার জ্ঞানপথ উন্মুক্ত। তিনি সত্যস্বরূপকে লাভ করিয়াছেন "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"। এজন্য তাঁহার বিধি নিষেধ সমাজের প্রামাণ্য। তাঁহার অনুশাসনে ব্যক্তিগত পুরুষার্থ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ সাধিত হইতেছে। সেই সাধনোপায় স্মৃতিসংহিতা-প্রতিপাদ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি এখন আমরা একটু আলোচনা করিয়া দেখিব। মোটের উপর দেখা যায় প্রাচীন আর্য্যসমাজ একটী ধর্ম্মপরিষৎ। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার সাধনায় আর্য্যজীবনের আরম্ভ, আর ধর্ম্মফল তাহার পরিসমাপ্তি; অধর্ম্মাচরণে দুঃখ, দুর্গতি, বন্ধন, ভয় ও মৃত্যু; আর ধর্ম্ম সেবায় শক্তি, বীর্য্য, মুক্তি, অভয়, আনন্দ, অমরত্ব। অধর্ম্মে নরজীবনের অধোগতি—পশুত্বেরও নীচে; ধর্ম্মে মানবের ঊর্দ্ধগতি—দেবত্বেরও উপরে। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, মানবের এই ত্রিবিধ ভাবে এ সকল সনাতন তত্ত্ব আয়ত্ত ও অনুশীলনের আয়তন, বা ধর্ম্মবললাভের ব্যায়ামশালা হইতেছে আর্য্যসমাজ, আর তৎশিক্ষা প্রণালীর নাম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। তাই, চতুশ্চতুষ্টয় ভাব সংমিশ্রণে প্রাচীন আর্য্যসমাজ সংগঠিত হইয়াছিল:—(১) চতুর্ব্বেদ—সাম, ঋক্, যজু, অথর্ব্ব।

(২) চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। (৩) চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, ভিক্ষু। (৪) চতুর্ব্বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। "শতায়ুর্বৈপুরুষঃ" আবার মানুষের জীবন পরিমাণ সাধারণতঃ শতবৎসর গণনা করিয়া তাহাও চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পৌগণ্ড, যুবা, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ। প্রথম বয়সে ব্রহ্মচারী, দ্বিতীয় বয়সে গৃহী, তৃতীয় বয়সে বানপ্রস্থী "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ।" তৎপর চতুর্থ বয়সে ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী হইবে,—এই ছিল পূর্ব্বতন বিধান। অতএব ক্রমোন্নতির স্বাভাবিক গতি পর্য্যালোচনায় বর্ণাশ্রম নিয়মিত হইয়াছিল। মানবজীবনের বহিরঙ্গ বা ব্যবহারিক প্রয়োজন এবং অন্তরঙ্গ বা আধ্যাত্মিক উন্নতি—এতদুভয়ের অনুকূল উপায় চিন্তা করিয়া মানবের অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে যেন এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যান্ত্রিত করা হইয়াছে। যেমন দুর্ব্বল, অন্ধব্যক্তি ধাপের পর ধাপ ধরিয়া অনায়াসেই পর্ব্বতের উচ্চশিখরস্থিত দেবমন্দির দ্বারেও পৌঁছিয়া যায়, তেমন ভাবে সকলেই অনায়াসে মোক্ষলাভ করুক, ইহাই ছিল বিধানকর্ত্তার উদ্দেশ্য। মস্তিষ্কের বিকাশ এবং হৃদয়ের প্রসার—এই দুইয়ের পূর্ণতা সাধনেই মনুষ্যত্ব, এই তাঁহার বিচার।

এখনও আমরা দেখিতে পাই, আদর্শ মানব—অন্তর্দর্শী ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিই সমাজের বা মণ্ডলীর শীর্ষস্থানে বসিয়া আছেন। তাঁহার নামেই আমাদের গোত্রপরিচয়, তদধিকৃত বেদশাখাই আমাদের কুলধর্ম্মের বেদ; এবং তাঁহার প্রতিভাবান্ প্রধান প্রধান শিষ্যগণই আমাদের কুলমন্ত্রোক্ত "প্রবর"। ঋষি সর্ব্বার্থ সিদ্ধিসম্পন্ন। তিনি সর্ব্ববিদ্যার পারগামী; তাঁহা হইতেই সমাজ, ষড়ঙ্গবেদ, উপনিষৎ—আত্মজ্ঞান উন্মেষকারিণী পরাবিদ্যা, এবং আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতির্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ প্রভৃতি ব্যবহারিক প্রয়োজনসাধিকা অপরাবিদ্যা—পাইয়াছে। তিনি সমাজের কল্যাণ কামনায় বেদসম্মত যে সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাই আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র। তাঁহার অনুশাসনানুসারে সমগ্র সমাজের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয় কিনা, প্রাচীনকালে স্বধর্ম্মাবলম্বী রাজগণ তাহা অনুসন্ধান করিতেন এবং ত্রুটিস্থলে দণ্ড প্রয়োগে সংশোধন করিয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ অধ্যাত্মনিরত,—যজন, যাজন, অধ্যাপনাদি পারমার্থিক ব্যাপারে তাঁহার অধিকার; প্রতিগ্রহ তাঁহার জীবিকাবৃত্তি। ক্ষত্রিয় মনস্বী এবং মহাবল সম্পন্ন—রাজ্যশাসন, বহিঃশত্রুদমনাদি তাঁহার কার্য্য; রাজস্বসংগ্রহ তাঁহার জীবিকা। বৈশ্য মহাউদ্যমশীল, দেশবিদেশ ভ্রমণপটু,—বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালনাদি দ্বারা অর্থাগমে তাঁহার জীবিকা। শূদ্র জড়বুদ্ধি, তামস প্রকৃতি, সুতরাং কায়িক পরিশ্রমে ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা তাহার জীবিকাবৃত্তি। বুঝা গেল, প্রকৃতিগত গুণ এবং কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য বিচারে বর্ণবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। সত্বগুণ প্রধান যাঁহারা, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের কর্ম্ম অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং বহিরিন্দ্রিয় সংযমাদি। সত্বরজপ্রধান ক্ষত্রিয়—কর্ম্ম শৌর্য্য, যুদ্ধবিগ্রহাদি। রজস্তমপ্রধান বৈশ্য—কর্ম্ম কৃষি বাণিজ্যাদি। আর তমঃ-প্রধান শূদ্র, তাহাদের কর্ম্ম দ্বিজ শুশ্রূষা। ফলে, যাহার যেমন প্রকৃতি গত শক্তি ও অধিকার, সে তদ্দ্বারা সমগ্র সমাজের সেবায় নিযুক্ত; কিন্তু সকলেরই ব্যক্তিগত চরম লক্ষ্য এক—মোক্ষলাভ। ব্রাহ্মণ মস্তিষ্ক চালনে, ক্ষত্রিয় বাহুবলে, বৈশ্য ধনাগমে এবং শূদ্র কায়িক পরিশ্রমে সমাজের অত্যাবশ্যকীয় অভাবগুলি পরস্পর পূরণ করিতেছেন; সুতরাং সকলের সমবেত শক্তিতে সমাজযন্ত্র সুশৃঙ্খল করিয়াছে। কাযেই, ব্রাহ্মণ মস্তক, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু, এবং শূদ্র পদ—এই হইল সমাজদেহের অবয়ব নির্ব্বাচন। আধ্যাত্মিক আদর্শ, সহানুভূতি সূত্রিত আদান প্রদান এবং প্রেমানুরঞ্জিত সেবা এই তিনটী মৌলিক ভাব—ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীকে সমাজবন্ধনে সুশৃঙ্খলিত রাখিয়া যেন প্রাচীন আর্য্য সমাজকে সভ্যতার তুঙ্গ শৃঙ্গে উত্তোলন করিয়াছিল।

পূজা, হোম, জপ, তপঃ, ভগবৎ কীর্ত্তনাদি যেমন, নিঃস্বার্থ সেবাও তেমন—সৎকর্ম্ম। যাঁহারা জগৎপূজ্য আর্য্যঋষিদিগের সুসন্তান হইবেন, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, সেবামন্ত্রে দীক্ষিত হউন। দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—সমাজে ত্রিবিধ সেবারই প্রয়োজন রহিয়াছে; আর সেবাই আত্মোন্নতির চিরন্তন উপায়। অর্থবল, দেহবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল—যাহার যে শক্তি আছে, তদ্দ্বারা সমাজের সেবা করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত।

যাহার অগ্নির প্রয়োজন তাহাকে কাষ্ঠের আদর না করিলে কখনও চলেনা। তেমন, যিনি পরমানন্দ স্বরূপ ভগবান লাভ করিতে চান, তাহার সেবাদি কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায় আনন্দময় ব্রহ্ম সর্ব্বভূতেই বিরাজমান। আমরা সকলেই স্ব স্ব পুষ্টি এবং তুষ্টি আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি—কেবল স্বার্থ সাধনেই ব্যস্ত। পরম স্বার্থ কি, তাহা শাস্ত্র দৃষ্টিতে বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহাই বৈদিক ধর্ম্মের রহস্য। পরমহংস-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবৎ বলিতেছেন :—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ।
একান্ত ভক্তি র্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণং॥
আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ।
যেতু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ॥
তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনোবচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥"

শ্রীহরপ্রসন্ন মজুমদার।

# বধিরের কাহিনী।

হতভাগ্য এ জগতে আমি শব্দহীন,
তোমরা বিশ্বের মাঝে কোলাহল ভরা,
নীরব আমার বিশ্ব জাগে রাতিদিন,
মধুর সঙ্গীতময় তোমাদেরি ধরা।
তোদের প্রাণের ভাষা অবনী ভিতরে
আনন্দিত স্নেহ স্বরে পায় প্রতিদান।
প্রতিদান নাহি সুধু অভাগোর তরে,
কেহ নাহি করে তার উত্তর প্রদান।
তোদের শ্রবণ পথে কাকলী কূজন,
ঢেলে দেয় সুধাসিক্ত সঙ্গীত মধুর।
এই আকুলতা ভরা উন্মত্ত শ্রবণ
ভুলিলে ডুবিয়া যায় আনন্দিত সুর।
সোহাগে বীণার বাণী উচ্ছ্বসি অমৃতে
তোদের প্রাণের সনে মৃদু কথা কয়,
আসেনি সে কোন দিন আমারি এ পথে,
হয়নি আমারি সনে তার পরিচয়।
হাসির আনন্দোচ্ছ্বাস ভেসে এই খানে
আসে নাই নিয়ে কোন আনন্দ বারতা,
আনন্দের কোলাহল পশেনি' এ প্রাণে
দেখি নাই কভু তার রূপ মধুরতা।
তোমরা ঐশ্বর্য্যবান্ এ নিতান্ত দীন,
বুঝিবে না এ মরমে কত ঢাকা আছে।
নিতান্ত অভাগা প্রাণ নীরব মলিন,
তোমাদের হর্ষ ভরা কোলাহল মাঝে।
অবনী তোদের, নহে অভাগার তরে
আনন্দের মাঝে এই নিরানন্দ প্রাণ।
কেন এই মলিনতা সৌন্দর্য্যের ঘরে,
কেন এই নীরবতা বিধির বিধান?

শ্রীবিভাবতী সেন গুপ্তা।

# ব্রহ্মচারী

( ১ )

প্রশান্তকুমার এম, এ পরীক্ষা দিয়া বিমলার পাণিগ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিল। বংশ-মর্য্যাদায় খাটো হইলেও বিমলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের দাবে, প্রশান্ত আপন কাব্যগন্ধ সোণালি হলকরা প্রাণটাকে নিতান্ত দীনভিক্ষুকের মত খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। নিভৃত পল্লীর কোণায় পাতা ঢাকা আধ ফুটন্ত গোলাপের উপর বর্ষার শেষ বারিবিন্দু সূর্য্যকিরণে যেমন সুষমার একটা নূতন দৃশ্যপট উন্মুক্ত করিয়া দেয়,—আর দশদিকের শ্যামা প্রকৃতি সেই সৌন্দর্য্যের গৌরব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করে,—প্রশান্ত ও বিমলাকে দেখিয়া তাহারই তুলনা করিতেছিল। তাহার কাব্যগন্ধ প্রাণ ইস্তক চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির কবিতা হইতে লাগায়েত কবি গোবিন্দ দাসের প্রেম ও ফুল পর্য্যন্ত

একটা সবুজ মখমলের মাঠের মত আপন চোখের সম্মুখে নৃত্য করিতে দেখিল।

প্রশান্ত যখন শুনিল, বৃদ্ধ পিতা আপন বংশমর্য্যাদা ভুলিয়া ছেলের বিবাহ দিবেন না; তখন তাহার তরফ হইতে ঘোষণা করা করা হইল—সম্প্রতি সে চিরকুমার সভায় নাম লেখাইবে এবং পিতার অভাবে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, হিমালয়ের শৃঙ্গে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতঃ পিতৃগণের জলপিণ্ডের আশা নির্ম্মূল করিয়া দিবে।

সুতরাং বৃদ্ধ রায় মহাশয় পুত্রের মন রক্ষার্থ বিমলাকেই পুত্রবধূ মনোনীত করিলেন।

( ২ )

বিবাহের বরযাত্র সম্প্রদায়ে কলিকাতার ছাত্রবন্ধুগণের অনেকেই আসিলেন। রায় মহাশয় মহাসমারোহে কর্ণীয়ার প্যাণ্টক বহরের মত তরণী শ্রেণী সাজাইয়া, প্রচুর বাদ্যভাণ্ডসহ পুত্রের বিবাহে শুভযাত্রা করিলেন। বিমলার পিত্রালয়ও প্রায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে—অনেক দূর।

বিবাহের পরদিনই সতীর্থগণ লক্ষ্য করিলেন, প্রশান্ত একটু বেশীমাত্রায় শান্ত হইলেও, তাহার উদাস দৃষ্টি, বিমর্ষ ভাব এবং মেজাজের অস্থিরতা অত্যন্ত স্পষ্টই হইয়া পড়িয়াছে। কলেজের ছাত্রগণ বহু গবেষণায়ও ইহার মৌলিক তথ্য নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

নৌকায় উঠিয়া প্রশান্ত শাল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। সতীর্থ হেমনাথ, জগদীশ, নকুলেশ্বর অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার একটী কথা বাহির করিতে পারিল না। জলধর ডাক্তার কহিলেন—বিবাহের পর এই অগ্নিমান্দ্য দূর করিতে বাইওকেমিক চিকিৎসায় সত্ত্ব ফললাভ হইতে পারে। কি বল জগদীশ!

নকুল আচার্য্য—একটু মুরুব্বিয়ানা রকমে গোঁফজোড়া পাকাইতে পাকাইতে বলিল—ইহা কোন শিলালিপিও নয়, তাম্রশাসনও নয়, কিম্বা প্রাচীন কীটদষ্ট গ্রন্থ বা ইষ্টকও নয়, যে জগদীশের হাতে এসব বিষয়ের মীমাংসার ভার দেওয়া চলে।

হেম কহিল—অধ্যাপক বসু ভিন্ন এ 'জড়ের সাড়া'—আর কেহ পাইবে, বোধ হয় না। প্রশান্ত যেমন পাষাণের মত নিশ্চল—তাহাতে রাখাল বাবু এলেও এ 'পাষাণের' কথা বাহির করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

জগদীশ ক্রমে চটিতেছিল। সে দগ্ধ সিগারেটের ভস্মটা হেমের জামায় নিক্ষেপ করতঃ চশমা জোড়া নাকে দিয়া—নৌকার উপরে যাইয়া বসিল এবং অত্যন্ত সহজভাবে গান ধরিয়া দিল—

"চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নমো বামনরূপধারী"

তখন আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে চন্দ্রদেব সুধাবৃষ্টি করিয়া দেখা দিয়াছিলেন।

হেমনাথ লক্ষ্য করিল—প্রশান্ত একটা মোটা রকম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শুইল।

হেম কহিল—নকুল! আমার বোধ হয় এ অবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে পালসেটিলার লক্ষণ।

হেমনাথের তীব্র বিদ্রূপবাণেও প্রশান্ত শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত সটান পড়িয়া থাকিল। নকুল তাহার চাদরখানি দিয়া শালমণ্ডিত প্রশান্তের আপাদ মস্তক ঢাকিয়া রাখিল।

এমন সময় রাসবিহারী শাখামৃগের মত নৌকায় নৌকায় ঘুরিয়া, এখানে আসিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ সরোষে কহিল—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ"

রে প্রশান্ত! অতএব তুমি অচিরে উঠ। কারণ ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ;"

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমে নদীর জলে হাসির ফোয়ারা ঢালিয়া দিয়া সুধাংশু আকাশের কতক খানি উপরে উঠিয়া পড়িল। জগদীশ অক্লান্তভাবে গাইতেছিল—

"স্মরিয়ে সে মুখশশী পরাণ কাঁদিছে সই"।

( ৩ )

অর্থাৎ প্রশান্তের প্রেমে ষাঁড়াষাঁড়ি বাণ ডাকিয়াছিল। বিবাহের পরদিন সকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত

যখন মেয়েমহলের চতুরঙ্গবল-কর্ত্তৃক সে আক্রান্ত হইল—তখন সুরধুনী তাহার চক্ষে পড়িয়া গেল। প্রশান্ত দেখিল সুরধুনীর ঈষদ্ভিন্ন যৌবনশ্রী-মণ্ডিত অদৃষ্টপূর্ব্ব কমনীয় রূপরাশির সম্মুখে বিমলাকে দাঁড় করানই চলে না। প্রখর সূর্য্যালোকে ক্ষুদ্র দীপের আলোর মত সুরধুনীর নিকট বিমলা নিষ্প্রভ! ইস্—কি সৌন্দর্য্য!

সবুজ রঙের সিল্কের কামিজ—তাতে গোলাপী মিহি লেস্—পরণে জমকালো পীতবর্ণের পার্শীসাড়ী—তাতে গোলাপ ফুলকাটা গাঢ়-কৃষ্ণ ফিতার পাড়। কপালে টিপ. আপাদচুম্বিত একরাশি চুল পৃষ্ঠদেশে ছড়ান—মাথায় লাল—চৌড়া ফিতা। বাহুতে অনন্ত—হাতে দুগাছি ঢাকাই শাঁখা আর দুইগাছি সরু সোনার চুড়ী। আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নযুগলে মন্মথের তীব্র শর-সংযোজিত। সুতরাং প্রশান্ত মেয়েদের বিবিধ বাক্যবাণ উপেক্ষা করিয়াও মনে মনে কাব্য আওড়াইল। এই সে দিন, সে মিনার্ভায় দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির অভিনয় দেখিয়াছে। তাহার মনে পড়িল—এই সুন্দরী "নির্ম্মেঘ উষার চেয়ে নির্ম্মল, বীণার ঝঙ্কারের চেয়ে সঙ্গীতময়, শিশির-স্নাত আধ-ফুটন্ত কমলের চেয়ে সুন্দর" তারপরে ভাবিতে লাগিল "সুন্দরি! আকাশ যদি একটা রঙ্গমঞ্চ হোত, প্রত্যেক নক্ষত্র যদি এক একটি পবিত্র চরিত্র হোত, জ্যোৎস্না যদি একটা অনাবিল সঙ্গীত হোত—ত সে মহানাটকের নায়িকা হতে তুমি—"

প্রশান্ত চশমা জোড়ার অন্তরালে চক্ষু দুটীকে অপলকে সুরধুনীর মুখের উপর স্থাপন করিল। হঠাৎ সুরধুনী তাহা লক্ষ্য করিল। তাহার আকর্ণ মুখমণ্ডল লাল হইয়া, সেই সৌন্দর্য্যের উপর একটু রসান দিয়া দিল। প্রশান্ত রাক্ষসের মত বিপুল আগ্রহে সেই রূপ সুধা পান করিতে লাগিল।

সুরধুনী একবার এদিক সেদিক ঘুরিল—আর বার বার চাহিয়া দেখিল, কম্পাসের কাঁটার মত চক্ষু দুটী তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে।

মেয়েরা জামাই বাবুর অমনোযোগ লক্ষ্য করিয়াছিল। কারণ প্রশান্ত তাহাদের সঙ্গে যে সকল উত্তর করিতেছিল, তাহাতে বিস্মিত হইবার যথেষ্ট কারণই ছিল। মোট কথা, তাহার উত্তরগুলি প্রায়—যেন মাছের ঝোল খাইতে, ভুলে দুধের বাটীতেই চুমুক দেওয়ার মতন হইতেছিল।

যামিনী অনেকক্ষণের পর প্রশান্তকে বমালসহ গ্রেফ্তার করিয়া ফেলিল। আঠারো আনা সেয়ানা বলিয়া গ্রামে যামিনীর খ্যাতি ছিল। কারণ সে কিছুদিন সহরের বালিকা বিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়াইয়াছে—বোর্ডিংএ ভাত খাইয়াছে, গোরা, চোখেরবালি প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পড়িয়াছিল। সুতরাং তাহার বিদ্যা খুবই বাড়িয়াছিল!

সে অতঃপর অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রশান্তের কাণে কাণে জানাইল—সুরধুনী তাহাদেরই পাল্টী—ঘর বিবাহ হয় নাই—রূপের চেয়ে গুণও অনেক বেশী—এরপর একটা নিছক মিথ্যাকথা বলিল, যে সুরধুনীও প্রশান্তকে দেখিয়া মজিয়াছে। সুতরাং প্রশান্তকুমারের দস্তুর মত বিরহ হইল এবং অবস্থা ক্রমে সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল।

( ৪ )

সুরধুনীর পিতা চিকিৎসার্থ কলিকাতায় গিয়াছিলেন। প্রশান্ত তাহা জানিয়া—তাঁহার বাসার অদূরে আপনি এক বাসা ভাড়া করিয়া লইল। সে দিন রাত্রি কেবল সুরধুনীর রূপসাগরের কল্পনায় ডুবিয়া থাকিত। সে একখানি কাগজে সোণালী হরফে লিখাইল—

"বিরাজিত নিসর্গের কোলে
আমার সে প্রাণের দেবতা
জলে স্থলে অনন্ত-নিখিলে
নয়নে নয়নে কহে কথা।"

তারপর ফ্রেমে আটিয়া আপন বিছানার পার্শ্বে টাঙ্গাইয়া রাখিল। আহারে অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ ও যথেষ্ট ছিল।

এদিকে বেচারী বিমলার দুঃখের অবধি নাই। প্রশান্তের রূঢ় উপেক্ষা তাহার "হৃদয়ে শেল দেই গেল।" ঘরে শাশুড়ী ছিলেন, ননদ সুমতি বিমলাকে বোনের মত ভালবাসিতেন। কিন্তু তাহাতে বিমলার সুখ ছিল না—ননদের উপদেশে স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্ত তার যত্নের ত্রুটী ছিল না। এরপর যখন একদিন সুরধুনী-বিরহ-তাপ-তপ্তবিশীর্ণ মুখ প্রশান্তকুমার পদপ্রান্তে

পাণ্ডিত্য দুঃখিনী বিমলাকে ইতর জনোচিত ভাষায় যা ইচ্ছা বলিয়া চলিয়া গেল—বিমলা আর সামলাইতে পারিল না। ভূমিতে পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—

"বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা"

( ৫ )

অদৃষ্টের ফের—প্রশান্তের দু চোখেরবালি বিমলা না খাইয়া না খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মরিয়া গেল।

অতঃপর প্রশান্ত—রজকালয় হইতে সদ্যপ্রাপ্ত কাপড়গুলি গেরিমাটী দিয়া রঙ্ করিয়া, প্রকাশ্যভাবে চির ব্রহ্মচর্য্য ঘোষণা করিল। ক্রমেই তাহার মাথার চুলগুলি দীর্ঘ ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং মুখ কমলের সহিত যে 'রজার্সের ক্ষুরের' প্রত্যহ সম্মিলন হইত, সে বেচারী সহসা নর্দ্দামায় নিক্ষিপ্ত হইল। সুতরাং বিবাহ বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে যেমন সদ্য চাঁচাছোলা জায়গাগুলিতে সবেগে ঘাস অঙ্কুরিত হয়—প্রশান্তের নিত্য-ক্ষৌরিত গণ্ডে লোমরাজীও সেইরূপ মহা আনন্দে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিলাম ২৭শে বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতে প্রশান্ত চিরদিনের জন্য হিমালয় যাত্রা করিবে। বৈশাখ মাসেই সুরধুনীর বিবাহ—এরূপ একটা উড়ো সংবাদ প্রশান্তের কর্ণে পৌঁছিয়াছিল।

( ৬ )

পূজার সময়—সুরধুনীর বাপ কলিকাতায়ই ছিলেন। সুতরাং প্রশান্তও আপনার সন্ন্যাসের সুসাবিধা ঠিকঠাক করিবার জন্য কলিকাতায়ই রহিয়া গেল।

সে সাহস করিয়া সুরধুনীর সঙ্গে দেখা করিতে যায় নাই। কি বলিয়াই বা যায়? কেবল কল্পনার গোলাপী আবছায়ায় সে সুরধুনীর মূর্ত্তিখানি মনোমন্দিরে স্থাপন করিয়া একলব্যের মত নানা শর-সন্ধান করিতেছিল।

সে দিন উষাগমের সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যগ্রহণ—অনতি দূরে গঙ্গার ঘাটে অগণিত হিন্দু নর নারী স্নান করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী বেশধারী প্রশান্ত আপনার কমণ্ডলুটী লইয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া দেখিল, একখানি ঢাকাই কাপড় পরিয়া সুরধুনী স্নান করিয়া উঠিতেছে। তাহার দেহে যৌবনে বসন্ত পূর্ণ প্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সিক্ত বসনের আবরণে সুরধুনী সৌন্দর্য্যবৃষ্টি করিতেছিল—তার উপর প্রভাত সূর্য্যের সোণালী কিরণ পড়িয়া যেন তাহাকে স্বপ্নরাজ্যের এক পরীর মত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রশান্ত দেখিল এক বৎসরে সুরধুনীর রূপসাগরে যে কমনীয়তা বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার দ্বিতীয় ব্যক্তির কল্পনার স্থান তাহার হৃদয়ে ছিল না।

ততক্ষণ সুরধুনী ও তাহার সাথী ও সঙ্গিনীরা ধীর মন্থর গমনে চলিয়া যাইতেছিল। প্রশান্ত দেখিল সুরধুনীর সুদীর্ঘ সিক্ত কেশরাশি প্রভাতারুণের উপর একখানি পাতলা কাল মেঘের মত সৌন্দর্য্য ঢাকিতে বৃথা প্রয়াস পাইতেছে। তারপর যখন তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল—প্রশান্ত চাহিয়া দেখিল,—তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া কে যেন একখানি শকট চালাইয়া গিয়াছে—তার নির্ম্মমতায় হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া চুরমার—তাহার উপর দিয়া উষ্ণ রক্তের প্রবল তরঙ্গ চলিয়াছে।

গঙ্গাস্নানের কথা ভুলিয়া প্রশান্ত মেস্‌মেরিজ্‌ম্ করা মানুষের মত উদাস ভাবে বাসায় ফিরিয়া চলিল। সুরধুনীদের বাসা তাহার জানা ছিল—কতবার কতদিন সে ঐ পথে সময়ে অসময়ে ব্যর্থ হাঁটাহাঁটি করিয়াছে। আজিও নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সে সেই পথে যাইতেছিল। দেখিল উপরের বারান্দার চিকের আড়াল হইতে যেন হাসির বিদ্রূপ মাখানো দুইটী চক্ষু তাহার দিকে চাহিয়া আছে।—চক্ষু দুটী অপরিচিত। রক্তাক্ত ক্ষত হৃদয়ে লবণের ছিটা পড়িল।

তারপর প্রশান্ত বাসায় আসিয়া কি করিল—ইতিহাসে তাহা লেখে না। তবে এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, ঠাকুর সেদিন রাত্রিতে পাক করিতে গিয়া দেখে, দুপুরের ভাত তখনও ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে। বাবুর কবাট ভিতর দিকে বন্ধ।

( ৭ )

এর দুই তিনদিন পর একটা নতুন ঘটনা ঘটিল। একটী মধ্যবয়সী ঝি আসিয়া প্রশান্তের নিকট বলিল, বাবু! আমি যোগেশ বাবুর বাড়ীর মানুষ—তাঁর মেয়ে

সুরধুনীর অসুখ। ডাক্তার বলেছেন দু এক খানা ভাল বই পড়্তে। আপনি নাকি ওঁদের দেশের মানুষ, জানাশুনাও নাকি আছে—যদি দয়া করে দু এক খানা বই—

তাড়িত প্রবাহে প্রশান্তের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—কি বই চাই ?

"আচ্ছা—আমি চট্ করে জেনে আস্‌ছি।"

ঝি চলিয়া গেল—প্রশান্তকুমার দেখিল তাহার সম্মুখে ঊষার আলোকে ভাগীরথীর জল বেলাভূমে খেলা করিতেছে—আর সেইখানে দাঁড়াইয়া সদ্য-স্নাতা সুরধুনী স্বর্গচ্যুত পারিজাতের মালা হাতে লইয়া,তাহাকে আহ্বান করিতেছে ;—যেমন করিয়া ষোলকলায় পূর্ণ শশধর সবুজের ঝালর দেওয়া তরুরাজীর অন্তরালে থাকিয়া চকোরকে ইঙ্গিত করে।

ঝি একটুকরা কাগজ হাতে লইয়া আসিল। তাহাতে কোণাকোণি ভাবে লেখা "রাজস্থান।" তাহার কালীটা এখনও শুকায় নাই। প্রশান্ত ঝি কি একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া, পিছনের দরজায় বাহির হইয়া পড়িল এবং এক দৌড়ে নিকটবর্ত্তী লাইব্রেরী হইতে বইখানা কিনিয়া আনিল। তারপর আপনার শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া বইএর পাতাগুলি একটু মুসড়িয়া দিল, যেন সদ্য-ক্রীত না বুঝায়। দুইটী নাম পেন্সিলে লিখিল। আর শেষ সাদা পৃষ্ঠায় লিখিল "এই অতৃপ্ত বাসনা বুকে লইয়াই কি আমি এই সংসার হইতে বিদায় হইব—জগদীশ !"

এক অজ্ঞাতকুলশীলা ঝির হাতেএকটা কথার উপর নির্ভর করিয়া বহি দেওয়া না দেওয়ার বিচার করিবার মত একটা প্রশ্নই তখন প্রশান্তের মাথায় জায়গা পাইল না।

( ৮ )

ক্রমে এ বই সে বই—সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদের খাটো চিঠি ক্রমশঃ চিঠির পৃষ্ঠা আর সাদা থাকিত না—শেষ আর চিঠির কাগজের চারি পৃষ্ঠায় আঁটে না—কোণায় কাণায় পর্য্যন্ত নোট। দিনে দুইবার চিঠি। শেষটা দেখা গেল যে পীরিতের ঝিড়িকে—উভয়ের পৃথক থাকা অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে—হায় প্রতীকারের উপায় ছিল না।

এদিকে ঝি বেচারী আর পারে না। প্রত্যেক চিঠি আদান প্রদানের সময়, প্রশান্ত লক্ষ্য করিত ঝির চোখে মুখে একটা কুটীল হাসি অত্যন্ত গোপন ভাবে নৃত্য করিতেছে। কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করিত না।

এমন সময় প্রশান্তের চাকর রামটহল কি জানি কেন চলিয়া গেল। তাহার জায়গায় কানাই নামে এক ছোকরা আসিয়া জুটিল। ছেলেটা খুব বুদ্ধিমান—আর চটপটে। দেখিতেও বেশ ফিটফাট। বাড়ীও তার প্রশান্তদের দেশেই—তবে জানা শুনা পূর্ব্বে ছিল না। এই ছেলে অতঃপর ঝির পরিশ্রমের কতক অংশ গ্রহণ করিল। সুরধুনীদের বাড়ীতে সে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিল।

প্রশান্ত আগে লিখিত "আপনি"—শেষটা—"তুমি"তে পরিণত হইয়াছে। আর প্রত্যেক পত্র কেবল রূপের প্রশংসা, গুণের স্তুতিবাদ, পত্রের ভাষার তারিপ ইত্যাদিতেই ভারাক্রান্ত থাকিত।

অতঃপর সুরধুনী জানাইল "আমার বিবাহ বড় নিকট, আপনার পত্র সম্প্রতি বন্ধ করিবেন। আর আপনি এখন যতখানি ঊর্দ্ধে আপনার হৃদয়কে তুলিয়াছেন—আমরা তাহা ধারণাই করিতে পারিনা। প্রাংশু-লভ্য ফলে আমাদের মত বামনের হাত বাড়ান চলেনা—

"আমি ক্ষুদ্র মীন ভাসি সলিল উপর
কি সাধ্য বুঝিব সিন্ধু রহস্য অপার।"

আপনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। ব্রহ্মচার্য্য ভিন্ন এদেশের উন্নতি হবেনা। আর আপনাদের মত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ত্যাগের আদর্শ না দেখাইলে চলিবে কেন ?……দুঃখ এই যে আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া আমার অদৃষ্ট ঘটিল না। আপনি বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন—নতুবা—"
এইখানে প্রশান্তের হৃদয়ে একটা লাফদিয়া কত গিরি নদী ছাড়াইয়া এক অজ্ঞাত রাজ্যের সুষমায় স্নান করিয়া আসিল। তারপর পড়িল— না, থাক্, আমাদের মত

মানুষের ভাগ্যে তেমন ফল ফলে না। হায়! আপনি কেন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিলেন?' ইত্যাদি—

সুতরাং প্রশান্ত এক তোলা অহিফেন নামক পদার্থ ক্রয় করিয়া আনিয়া টিনের কৌটাটী সমেত বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল। কানাই'র সতর্ক দৃষ্টি তাহা এড়াইতে পারিল না। সেদিন প্রশান্তের বালিশে জলের চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল।

আজ সুরধুনীর বিবাহ। ঝিটা একবার আসিয়াছিল, অনর্থক। কিন্তু সে জানাইয়া গেল, দুইদিন ধরিয়া কি জানি কেন দিদিমণি বড় কেমন হইয়া পড়িয়াছে। কেবল নির্জ্জনে বসিয়া কি ভাবে। তারপর সে চলিয়া গেল।

কানাই সন্ধ্যার সময় টেবিলে আলো জালিয়া দিয়া প্রশান্তকে পাখা করিতেছিল। প্রশান্ত দুইটী কবিতা লিখিয়াছিল—তাহা পুনঃ পুনঃ পড়িতে লাগিল। একটীর নাম "বিসর্জ্জন" আর একটী "ত্যাগে সুখ"।

এমন সময় সম্মুখের রাস্তাদিয়া বাগু বাজাইয়া, আলো জালাইয়া সুরধুনীর বর গেল। কানাই বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিল—কৃষ্ণ পাণ্ডাতে বর চাপিয়াছে।

কোঠায় আসিয়া দেখিল প্রশান্তকুমার টেবিলে মাথা রাখিয়া উপুড় হইয়া বসিয়া আছে। এক পার্শ্বে টিনের কৌটাটি খোলা— তাহাতে একদলা কাল পদার্থ বর্ত্তমান। কানাই ঈষৎ হাসিল।

পার্শ্বের বাড়ীতে একটী কলেজের ছেলে চির পরিচিত কণ্ঠে গাহিতেছিল—

"জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তোমা বিনে কিছু চাইন,
ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি—
কেন এ চাতুরী ছলনা।
চিরসাথী কেন রহ দূরে,
জীবন আধার কেন যাও সরে,
তুমি পূর্ণজ্যোতিঃ আমি এ আঁধারে কেন বল না।
ডাকি প্রেমময় আকুল পিয়াসে,
তৃষিত হৃদয়ে বস নাথ এসে
এসো এসো নাথ হৃদয় মাঝত,
নহিলে পিয়াসা মেটেনা।

সুরলহরী আজ প্রশান্তের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। প্রত্যেকটী কথার মধ্যে যেন কত আবেগ, কত অতীতের কাহিনী, কত প্রাণের কথা, কত সুখ দুঃখ।

একটা রাজসংস্করণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রশান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় মিলিত নারীকণ্ঠের হুলুধ্বনি উত্তপ্ত শেলের মত তাহার হৃদয়ের কেন্দ্র ভেদ করিয়া দিয়া গেল। আজ দুইদিন প্রশান্তের নিরম্বু উপবাস,—এতক্ষণ শরীরের উপর মনের আধিপত্য স্থাপন করিয়া সে দেহটাকে খাড়া রাখিতে পারিয়াছিল—এই আঘাতে সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

( ১০ )

কানাইকে বিদায় দিয়া প্রশান্ত হালে রং করা কোঁচান গৈরিক বসন খানি সুন্দর করিয়া পরিল। গৈরিক পঞ্জাবীটা গায়ে আঁটিয়া সুদীর্ঘ কেশপাশ পৃষ্ঠ-দেশে ছড়াইয়া দিল। বুকের উপর লম্বমান দাঁড়িটা একটু আঁচড়াইয়া লইল। তারপর নূতন এবং রজত-মণ্ডিত শাণিত ত্রিশূলটা হাতে লইল। গলায় বাহুতে রুদ্রাক্ষ মালা পড়িল। সে ভাবিল মরিবই যখন—এমন ভাবে মরিব—যেন আমার ব্রহ্মচারীত্বে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ না করে।

বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে একবার আপনার চেহারাটা দেখিল। পাশের বাড়ীর ছেলেটী তখন গাহিতে ছিল—

"এমন চাঁদের আলো—
মরি যদি সেও ভালো—
সে মরণ স্বরগ সমান।"

প্রশান্তও চাহিয়া দেখিল—জানালা দিয়া ত্রয়োদশীর চন্দ্র-কিরণ অগ্নি-বৃষ্টি করিয়া তাহার কোঠাখানিকে বেজায় গরম করিয়া তুলিয়াছে। সে অস্ফুটস্বরে কহিল—

"মরণ রে! তুঁহ মম শ্যাম সমান"

তার পর প্রশান্ত টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল এবং যোড়হাতে ভগবানে আত্ম-নিবেদন করিতে লাগিল। অহিফেন তখনো টেবিলের উপর পড়িয়াছিল।

সহসা হেমনাথ দরজা খুলিয়া ঝড়ের মত সেই

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। তাহার গায়ে একটীমাত্র গেঞ্জি—তাহার মুখ চোখের অবস্থা বড় ভয়ানক। বিস্মিত প্রশান্তকে কোনো কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া, হেম তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "প্রশান্ত—ভাই, একজন ব্রাহ্মণের জাতিকুল যায়—তুমি রক্ষাকর! বর এসেছিল—টাকার তর্কে তারা চলে যায়—প্রশান্ত—তুমি চল—

প্রশান্ত বিস্মিত হইয়া কহিল, একি হেম! তুই কোথেকে?—আর আমার উপর এ জুলুম কেন? আমি ব্রহ্মচর্য্য নিয়েছি—বিয়ে কর্ব্ব না—স্থির—

হেম আকুল কণ্ঠে কহিল—তোর পায় পড়ি ভাই।—তাদের জাতমান রাখ—আমার শ্যালিকাটীকে তুমি গ্রহণ কর—নতুবা জাহান্নামে যায়—তুমি যা চাও—সব পাবে—

না—না—হেম ওসব হবে টবে না। অন্য পন্থা কর—এসময় সুরধুনীর মুখখানি ঐ চাঁদের কিরণের মধ্যে আলুগো'ছ কে যেন এক পলক দেখাইয়া লইল।

লগ্ন যায় যায়—চল—শীগ্গীর—ভাই—টাকা চাও—তাও দিব—

না—ও হ'তে পারে না—আমি—ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মচারীই থাক্‌ব—

হেমনাথ ধাঁ করিয়া টেবিলের উপর হইতে আফিংএর দলাটা লইয়া মুখে দিয়া কহিল—"প্রশান্ত—আমি আত্মহত্যা কর্চ্ছি—যদি ব্রহ্মহত্যার ভয় থাকে—চল।"

তারপর প্রশান্তকে টানিয়া লইয়া হেম সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া পড়িল—ত্রিশূলটা ঝন্ ঝন্ করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

( ১১ )

"সুর! তোমার চিঠিগুলি পড়্‌লে বেশ মনে হয় তুমি একজন রীতিমত সাহিত্যিক।"

চিঠি!—নাঃ—আমি ত তোমায় চিঠি লিখিনি—কখ্খনো না।

তবে এ সব চিঠি লিখ্‌ত কে?

দিদি আর তার স্বামী হেম বাবুর এ সকল ষড়যন্ত্র। সেই যখন আমার দিদিকে বলেছিল যে আমি তোমার অনুরাগিনী—তখন তারা দুজনে কি জানি কি পরামর্শ করে ফেলেছিল।

হেম যে এখানে আর সে যে তোমার দিদির জামাই—তা—ত কোনো দিন জান্‌তাম না।

সহসা হেমনাথ আসিয়া কহিল—"কি হে ব্রহ্মচারী—এখন দেখি যে বৈঠকখানার দিকে মোটেই পা চলে না!"

যা—পাজী—বর্ব্বর।

নিশ্চয়ই এ সকল উপহার আমার প্রাপ্য—কারণ—আমার ত অপরাধ অনেক বেশী—তোমায় সুরধুনী দিয়েছি।

আচ্ছা রে হেম—ঐ আফিংএর গুলিটা তুই কি কর্‌লি?

তুমি একটা গণ্ডমূর্খ। ওটা কি আফিং ছিল না কি? তবে আর রামটহলকে বদল করে কানাইকে তোমার চাকর দিলাম কেন? ওটা কবিরাজী মোদক—বিরহের প্রবল আক্রমণে তোমার চক্ষুকর্ণের জ্ঞানও ছিল না—কালিদাস স্বয়ং বলে গেছেন—

"কামার্ত্তাহি প্রকৃতিকৃপণা চেতনাচেতনেষু।"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

# ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা।

## (মাননীয় এচ্, সার্প, সি, আই, ই মহোদয়ের ভারতীয় পঞ্চ বার্ষিকী শিক্ষা বিবরণী হইতে সঙ্কলিত। )

### প্রাথমিক শিক্ষা কাহাকে কহে?

মাতৃভাষার সাহায্যে যে সকল বিষয়ে বাল্যে জ্ঞান লাভ করিলে নিজ নিজ অবস্থানুসারে সংসারক্ষেত্রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধা হয় সেই শিক্ষার নামই প্রাথমিক শিক্ষা। কেহ কেহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই স্কুল ছাড়িয়া দেয়। কেহ কেহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। আবার কোন কোন প্রদেশে উচ্চ বিদ্যালয়েও নিম্নশ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা লইয়া বালকেরা উচ্চ বিদ্যালয়েও প্রবেশ লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মদেশে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিভাগ আছে। কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা ভিন্ন গৃহে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়গুলিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় বলে। আবার এই সকল বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়ান হইয়া থাকে। মান্দ্রাজেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়ান হয়। কিন্তু যাহাদের ইচ্ছা, মাত্র তাহারাই ইংরেজী পড়িয়া থাকে।

### প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীবিভাগ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্ব্বনিম্নে দুটি শিশুশ্রেণী থাকে। আর তারপর দুই বৎসর কি তিন বৎসর পড়িয়াই পাঠ সমাপ্ত হয়। কোন কোন প্রদেশে এইরূপ পাঠশালাকে নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা বলে। যদি আরও দুই বৎসর পড়িবার বন্দোবস্ত থাকে তবে সেই পাঠশালাকে উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা বলে। যদি আরও দুই বৎসর পড়িবার বন্দোবস্ত থাকে তবে সেই স্কুলকে মধ্যবাঙ্গালা স্কুল কহে। মান্দ্রাজে ও বোম্বাই প্রদেশে কোন বিদ্যালয়কেই মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয় বলে না। আমাদের দেশে যেগুলি মধ্যবাঙ্গালা স্কুল, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে সেগুলি প্রাথমিক স্কুল।

পরিচালন—প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনের ভার প্রায় সর্ব্বত্রই স্থানীয় সমিতি বা স্থানীয় ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ন্যস্ত আছে। জেলাবোর্ড বা স্থানীয় বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন ও ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকে। বঙ্গ ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, ব্রহ্মপ্রদেশ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কোন কোন স্থান এবং যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, ও মধ্যপ্রদেশে জেলা বোর্ডই প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর কিঞ্চিৎ সাহায্য দান করিয়া থাকেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে শিক্ষার ভার স্থানীয় সমিতির হস্তে ন্যস্ত হইল কেন? ইহার দুইটি কারণ আছে—(১) কোন কোন প্রদেশে প্রথম প্রথম বিদ্যাচর্চ্চার আগ্রহাতিশয্যে এত স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল যে, জেলা বোর্ড বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তখন সমস্ত স্কুল পরিচালন বা ইহাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং স্থানীয় বোর্ড বা গবর্ণমেণ্ট সেই সকল বিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গকে অর্থ-সাহায্য করিতে থাকেন। (২) যে প্রদেশে বিদ্যাচর্চ্চার অনুরাগের অল্পতা বশতঃ স্থানীয় লোকেরা বিদ্যালয় স্থাপন করে নাই সে প্রদেশে জেলা বোর্ড বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। যেখানে যেখানে স্থানীয় স্কুলের উন্নতির সম্ভাবনা দৃষ্ট হইত সেখানেই জেলা বোর্ড উপযুক্তরূপ অর্থ সাহায্য করিত। সিন্ধুদেশে 'মোল্লা' স্কুল নামে এক জাতীয় প্রাথমিক স্কুল ছিল, সেগুলি জেলা বোর্ডের সাহায্য পাইয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে অনেক স্থলে প্রাচীন পাঠশালা ছিল না। অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কয়েকটি ছাত্র সংগ্রহ করিয়া একটি স্কুল স্থাপন করিতেন। এইরূপে অনেক বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। ইত্যাদি কারণে বঙ্গদেশের অনেক স্থলে দুই জাতীয় স্কুলের সৃষ্টি হইয়াছে। এক জাতীয় স্কুল ব্যক্তিবিশেষের জীবিকার উপায়। ইহাদের অবস্থা শোচনীয়। বোর্ড স্কুলের গৃহাদি স্কুলের সম্পত্তি, এবং

শিক্ষকগণের বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট। কতগুলি স্কুলে আবার এই দুই পদ্ধতির সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়

ব্রহ্মদেশে জেলা বোর্ড নাই। সে প্রদেশে 'সেস্' স্কুল নামে এক প্রকার স্কুল আছে। এবং প্রাচীন "কুজি কিয়াংয়ের" শ্রীবৃদ্ধির জন্য কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টা করেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের সমগ্র প্রাথমিক স্কুলের তিন চতুর্থাংশ বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট বা জেলা বোর্ডের পরিচালনাধীন ছিল না। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কিঞ্চিদূর্দ্ধ দুই তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ের ভার জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত ছিল

গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়—

এই জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা সমগ্র ভারতে ৫০৫টি। যে প্রদেশে জেলা বোর্ড নাই, যে প্রদেশ অনুন্নত, প্রায় সে সকল স্থানেই গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫০৫টি বিদ্যালয়ও গবর্ণমেণ্টের সম্যক পরিচালনাধীন ছিল না। বঙ্গদেশে এইরূপ ৯৭টি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৫০৫টি বিদ্যালয় হইয়াছে। বর্ত্তমানে বোর্ড স্কুলের সংখ্যা ২৬,১১৫ তন্মধ্যে কয়েকটি মিউনিসিপালিটির পরিচালনাধীন। ১৯০৭ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মান্দ্রাজে ১০০০, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১,৪০০, এবং পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামে ১,৫০০ নূতন বোর্ড স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে মাত্র ১১২টি ও ব্রহ্মদেশে ৬টি বোর্ড স্কুল আছে। দেশীয় রাজ্যের পরিচালনাধীনে ২৮৮৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সাহায্য কৃত স্কুলের সংখ্যা ৬৫,৬৫০। তন্মধ্যে বঙ্গদেশ, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে ৩৯,০০০ এবং মান্দ্রাজে ১৫,০০০, অসাহায্যকৃত স্কুলের সংখ্যা বঙ্গদেশে ৮০০০, মান্দ্রাজে ৪০০০ এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ২০০০, বঙ্গদেশে ও ব্রহ্মদেশে লোকেরা জনসাধারণের স্থাপিত বিদ্যালয়েই প্রাথমিক শিক্ষা সর্ব্বাধিক প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ববঙ্গেও বোর্ডস্কুল স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে এই রূপ অবস্থাই ছিল। ১৯০৭-১৯১২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম বোর্ডস্কুল স্থাপিত হয়। আসামে বোর্ড স্কুল পূর্ব্বেই ছিল। মান্দ্রাজেও যথেষ্ট বোর্ড স্কুল আছে। তথাপি চার-পঞ্চমাংশ বিদ্যালয় অদ্যাপি জনসাধারণের পরিচালনাধীন। অন্যান্য প্রদেশে সাহায্য ও অসাহায্যকৃত স্কুলের সংখ্যা অপেক্ষা বোর্ড-স্কুলের সংখ্যা অনেক বেশী।

বোর্ডস্কুল—বিগত পনর বৎসরে বোর্ডস্কুলের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ই জনসাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষে জনসাধারণের জন্য যত প্রকার বিদ্যালয় আছে তাহাদের সংখ্যা মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক চতুর্থাংশের কিঞ্চিৎ অধিক, কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যার তুলনায় এই সকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যত ছাত্র অধ্যয়ন করে তন্মধ্যে বোর্ড স্কুলে পড়ে শতকরা ৩০ জন, সাহায্য কৃত স্কুলে শতকরা ৩৮ জন এবং অসাহায্যকৃত স্কুলে শতকরা ২৬ জন অধ্যয়ন করিয়া থাকে। আর বে-সরকারি বিদ্যালয় অপেক্ষা বোর্ডস্কুলেই ছাত্রগণ অধিক দিন অধ্যয়ন করে। বোর্ড-স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা যে এত বেশী ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বোর্ড স্কুলের পরিচালনের বার্ষিক ব্যয় পড়ে ৩২০৲ টাকা; সাহায্যকৃত স্কুলের বার্ষিক ব্যয় পড়ে ১১৬৲টাকা, এবং সম্পূর্ণ বে-সরকারি বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিচালনের ব্যয় মাত্র ৫৬৲টাকা। সুতরাং বোর্ড-স্কুলগুলি যে সুপরিচালিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং ইহাতে ছাত্রগণের শিক্ষার বন্দোবস্তও অন্যান্য বিদ্যালয় হইতে অনেক ভাল। আবার বে-সরকারি বিদ্যালয় অপেক্ষা বোর্ডস্কুলের ছাত্রবেতনের হার অনেক কম। বোর্ডস্কুলের প্রতি ছাত্রের দেয় বার্ষিক বেতনের হার পড়ে ।৶৪ পাই, সাহায্যকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র বেতনের হার পড়ে বার্ষিক ১/৩ পাই, এবং অসাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে দেয় বেতনের হার পড়ে বার্ষিক ১৶৮পাই। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই বেতনের হার আরও বেশী ছিল।

যুক্ত প্রদেশের শিক্ষা বিষয়ক বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১৯০৭-১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই প্রদেশে বোর্ড স্কুলের সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অসাহায্যকৃত স্কুলের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। এই বিবরণ পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হওয় যায় যে, উৎকৃষ্ট প্রাথমিক বিদ্যার যে স্থলে সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের অভাব, সে স্থলে প্রসার করে বোর্ড স্কুলই সম্পূর্ণ উপযোগী। বে-সরকারি স্কুলের সংখ্যা এত কম যে ইহাদিগকে শিক্ষা বিষয়ে বাদ দিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হওয়ার পর সেই প্রদেশে প্রতি বৎসর নানা জেলায় এত লোক বিদ্যালয়ের জন্ম স্থান ও এককালীন অর্থসাহায্য প্রদান করিতে উৎসুক হইতেছে যে, বোর্ড বৎসর বৎসর এতগুলি বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে; এবং লোকে যতই উৎকৃষ্ট শিক্ষা পদ্ধতির উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে ততই বোর্ড স্কুলের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে। বিভিন্ন বিভাগে বোর্ড ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যার হার দেখিলেই এই বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগে সাহায্যকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা গড়ে যথাক্রমে ৩৮, ৩৭ ও ৪৩ জন, কিন্তু এই সকল বিভাগে বোর্ড স্কুলের ছাত্রের সংখ্যা গড়ে যথাক্রমে ৫৩, ৪৬ ও ৬৪ জন। ফলতঃ, ইতিমধ্যেই বোর্ড স্কুলগৃহে যাহাতে আরও অধিক ছাত্রের স্থান হইতে পারে তজ্জন্য এই সকল বিদ্যালয়-গৃহ বড় করার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে যে সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতেও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সাধারণতঃ সাহায্যকৃত বিদ্যালয় অপেক্ষা বোর্ড স্কুলই প্রাথমিক বিদ্যা প্রসারের সম্যক অনুকূল ও উপযোগী। তবে যে যে স্থানে বোর্ড স্কুল স্থাপিত হইতে পারে না সেই সেই স্থলে সাহায্যকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করাই অভিপ্রেত; কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টায় স্থাপিত বে-সরকারি বিদ্যালয়ের প্রসার যাহাতে না হইতে পারে তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

বে-সরকারি বিদ্যালয়—সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলিতে স্থানীয় পরিচালনের সম্পূর্ণ অভাব, আর এই সকল বিদ্যালয় মাত্র সময় সময় ছাত্রগণের পিতামাতার নিকট উপহার স্বরূপ যৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে ব্যক্তি-বিশেষের দান বা নিয়ম মত চাঁদার ব্যবস্থা নাই। মান্দ্রাজে মাত্র শতকরা ২২টি বিদ্যালয় খ্রীষ্টান মিশনারিগণের পরিচালনাধীন। যুক্তপ্রদেশে অতি সামান্য স্থানীয় সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। বাস্তবিক সাহায্যকৃত স্কুলগুলি ছাত্র-বেতন ব্যতীত স্থানীয় লোকের নিকট আর কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয় না। শিক্ষক মহাশয়ই এই সকল স্কুলের শাসনকর্ত্তা। বে-সরকারি স্কুলগুলি পরে সাহায্য কৃত স্কুলে পরিণত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ এবং বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য প্রদেশে সাহায্য-কৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা এত কম যে নেথান সাহেব বলিয়াছেন এই সকল প্রদেশে সরকারের পরিচালন-ভুক্ত করিবার উপযোগী কোনও স্থানীয় প্রাচীন বিদ্যালয় ছিল না। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাহায্যকৃত স্কুলের সংখ্যার হ্রাস হইতেছিল, কিন্তু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের পর বঙ্গদেশে আবার ইহাদের আধিক্য দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে প্রতীতি হয় যে, বঙ্গদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এমনকি বঙ্গদেশে ব্যক্তি-বিশেষের স্থাপিত সম্পূর্ণ বে-সরকারি বিদ্যালয়েরও অভাব নাই।

বোর্ডের ক্ষমতা—প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে বোর্ডের অধীন। গবর্ণমেন্টের অধীন পরিদর্শক কর্ম্মচারীগণ এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। সুতরাং পরোক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয় গবর্ণমেন্টের অধীন। বোর্ডের একটি শিক্ষার সমিতি আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শাসন পদ্ধতি এই সমিতির অধীন। ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর এই সমিতির একজন প্রধান সদস্য।

বোর্ড স্কুল বোর্ডের সম্পত্তি। শিক্ষকগণ বোর্ডের অধীন কর্ম্মচারী। বোর্ড স্কুলের শিক্ষকগণের নিয়োগ, স্থান-পরিবর্ত্তন ও পদচ্যুতি প্রভৃতি বোর্ডই করিয়া থাকে। এই সকল ব্যাপারে সরকারি শিক্ষাবিভাগের পরোক্ষ কর্তৃত্ব আছে মাত্র।

সাহায্যকৃত স্কুলগুলি বোর্ড হইতে অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই সকল স্কুলকে সরকারের কতগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। কোন কোন স্থানে বোর্ড স্কুলের শিক্ষক পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

স্কুল কমিটি—কোন কোন প্রদেশে বোর্ড ও সাহায্যকৃত স্কুলের তত্ত্বাবধানের জন্য কমিটি গঠনের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সেই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, এবং আশাপ্রদ ফলও প্রদান করে নাই। বোর্ড স্কুলের শিক্ষকগণের বেতন ছাত্রবেতনের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং বিদ্যালয়ের হিতজনক কার্য্যে ছাত্রবেতনের ব্যয়, শিক্ষকের কার্য্যের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি বিষয়ই এই সকল কমিটির বিবেচনাধীন। অনেক স্থলে এই জন্য স্কুলের মঙ্গলের দিকে এই সকল কমিটির দৃষ্টি পড়িয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে সমস্ত প্রাথমিক বোর্ড স্কুলেই এক একটি কমিটি আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই সকল কমিটি বিশেষ কোন কার্য্য করে নাই, পরন্তু অনেক স্থলে অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। এই সকল কমিটির সভ্যেরা কদাচিৎ মিলিত হইয়া বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট কোনও বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে বরং তাহারা বিদ্যালয় পরিচালনে নানা বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন এবং শিক্ষকগণকে গ্রাম্য দলাদলিতে পক্ষভুক্ত করিয়া লন।

অর্থ সাহায্য—গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থানুসারে বোর্ডগুলি উহাদের অধীন জেলা সমূহে তাহাদের সাধ্যানুসারে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সাধন করিয়া থাকে। মান্দ্রাজের অধীন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডগুলি উহাদের আয়ের শতকরা ১৫৲ টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশে বোর্ডের আয়ের এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই ব্যয়ের হার ভিন্ন ভিন্ন।

গবর্ণমেণ্ট সাহায্য—সমগ্র ভারতে ডিষ্ট্রীক্ট ও স্থানীয় বোর্ডের আয়ের পরিমাণ ৫,১৩,২৩,৭৩০৲টাকা। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই সকল বোর্ড ৯১,৪৬,৯৪৪৲ টাকা বা উহাদের আয়ের শতকরা ১৭.৮৲ টাকা খরচ করিয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যয়-ভার বহনের জন্য অনেক সময় গবর্ণমেণ্ট বোর্ডের হস্তে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। কারণ, অনেক স্থলেই বোর্ডের আয়ের স্থিরতা নাই।

মিউনিসিপাল স্কুল—সমগ্র ভারতে মিউনিসিপালিটির আয়ের পরিমাণ ৭,৪৯,৩৮,৪১৲ টাকা। এই সকল মিউনিসিপালিটি স্কুল ও কলেজের পরিচালনের জন্য ৩০,৮৮,২৮৩৲ টাকা বা উহাদের আয়ের শতকরা ৪.১৲ টাকা খরচ করে। মিউনিসিপালিটির অধীন স্থানে যে সকল বে-সরকারি বিদ্যালয় আছে তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। শিক্ষকগণ শিক্ষাদান প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এবং তাঁহাদের বয়স এত বেশী যে, তাঁহাদিগকে ট্রেনিং কলেজেও প্রেরণ করা যায় না। স্কুলগৃহের জন্য অনেক টাকা ভাড়া দিতে হয় এবং এইরূপ গৃহ প্রায়ই স্কুলের কার্য্যের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী, সুতরাং ছাত্রগণের স্থান সঙ্কুলানও হয় না।

বোম্বাই নগরে সমগ্র নগরের প্রাথমিক শিক্ষার ভার বোম্বাই মিউনিসিপালিটির হস্তে ন্যস্ত আছে।

১৯১১—১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপালিটি উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য ৭,৬৯৪৲ টাকা, বিশেষ বিদ্যালয়ের জন্য ১১,৭৫৬৲ টাকা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মাত্র ১২,৩১৫৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে। কলিকাতা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর। এই নগরের মিউনিসিপালিটি যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করে ইহা সকলেরই অভিপ্রেত।

১৯০৭—১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি—১৯০২—১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯০৭—১৯১২ খৃষ্টাব্দে কিন্তু বৃদ্ধির হার পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের বৃদ্ধির হারের তুলনায় কিঞ্চিৎ কম। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ২৪.৬ জন ছাত্র বাড়িয়াছে, এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে শতকরা ৩০.৫ জন ছাত্র বাড়িয়াছে।

সমগ্র ভারতে প্রতি ৫.৩টি গ্রাম বা সহরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে মান্দ্রাজে প্রতি ২.২টি গ্রাম বা সহরে একটি এবং মধ্য প্রদেশে প্রতি ১৪.২টি গ্রাম বা সহরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। বঙ্গদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বেশী হইলেও প্রতি ৪.৪টি গ্রাম বা সহরে গড়ে একটি বিদ্যা-

লয় দেখিতে পাওয়া যায়। বর্গমাইল ধরিয়া বিচার করিলে সমগ্র ভারতে ১০.২ বর্গমাইলে এক একটি স্কুল আছে। বঙ্গদেশে ৩.৪ বর্গমাইলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে যথাক্রমে ৫.৯ ও ৬.১ বর্গমাইল পড়ে এক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ ও কুর্গ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি ১১ বা ২০ বর্গমাইলে এক একটি বিদ্যালয় আছে। আর প্রায় সকল প্রদেশেই প্রতি ২৮ বর্গমাইলে এক একটি বিদ্যালয় আছে। ফলতঃ তিনটি বিষয়ের বিচার না করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে। এই তিনটি বিষয় এই—

(১) লোক সংখ্যার ঘনতা।

(২) বিদ্যালয়ের আকার ( ছোট-বড় )।

(৩) বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থান-বিভাগের সমতা। (uniformity of distribution)

প্রতি বর্গমাইলে ভারতের লোক সংখ্যা ৫২ হইতে ৪৪০ জন। এক একটি স্কুলে ছাত্রসংখ্যাও বিভিন্ন প্রদেশে ৩১ হইতে ৭৫ জন। যে প্রদেশে উচ্চ শ্রেণীর লোক বেশী সেই প্রদেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক বেশী। আবার ভারতের বহুস্থান জঙ্গল ও বনাকীর্ণ। হয়ত এই সকল স্থানে অতি অল্প সংখ্যক গ্রাম এবং এই সকল গ্রামে মুষ্টিমেয় আদিম অধিবাসীর বাস। এই সকল গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে এই সকল বিদ্যালয়ে যে ছাত্র অধ্যয়ন করিবে তাহাদের সংখ্যাও নগণ্য হইবে।

সমগ্র ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারে এইরূপ বয়সের শতকরা মাত্র ২১.৫ জন ছাত্র প্রকৃত পক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। আর যে সকল ছাত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে পাঠ করিতে পারে, এইরূপ বয়সের শতকরা ২৩.৮ জন ছাত্র মাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

বোম্বাই, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম, মান্দ্রাজ ও ব্রহ্মদেশেই অধিক সংখ্যক ছাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় বা তৎশ্রেণীর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। ব্রহ্মদেশে গবর্ণমেণ্টের অননুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দেখিয়াই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের বিচার করা সঙ্গত। বোম্বাই প্রদেশে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিভাগ নাই।

## শ্রেণী-বিভাগানুসারে বিদ্যালয়ের সংখ্যা—

সমগ্র ভারতে খাঁটি গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৫০৫টি, বোর্ড স্কুল ২৬,১১৫টি, দেশীয় রাজ্যে ২,৮০৯টি, সাহায্যকৃত ৬৫,৬৫০টি এবং অসাহায্যকৃত ১৫,৫৩০টি। ইহাদের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ২৫,৭৭৩; ১,৫৬৪, ৩০৬; ১৭৬,৭৭০; ২,৩৫২, ২৪৩; ৪০৩,৫৫৬ ও ৪,৫২২, ৬৪৮ জন।

## জাতি অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা—

ইয়োরোপীয়, ১,৭৮৬; ভারতীয় খৃষ্টান, ১১৪,০৬৯, ব্রাহ্মণ ৪৭১, ৪২০; ব্রাহ্মণেতর জাতি ২,৭২১,৪০৩, মুসলমান, ৯২৪,১১৩; বৌদ্ধ, ১৪৬,৭৭০; পার্শি ৪,৩১৬; অন্যান্য ১৩৮,১৭১ জন।

উচ্চ প্রাথমিক বিভাগে ছাত্র সংখ্যা ৫৮১,১৬৩ জন এবং নিম্ন প্রাথমিক বিভাগে ২, ৮৯৪, ৮০৭ জন।

## ব্যয়ভার—

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার মোট ১, ৭৯, ৬২, ৪৫৩৲ টাকা। তন্মধ্যে ১,১৭,৯১,৭৮৮৲ টাকা সরকার হইতে, ৪০,৮৭,৯৫১৲ টাকা ছাত্র বেতন হইতে এবং অন্যান্য উপায়ে ২০,৮২,৭১৪৲ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বৃত্তির জন্য সরকার হইতে এতদতিরিক্ত ১,১৯,৯০২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। সরকার শব্দে খাঁটি গবর্ণমেণ্ট ও বোর্ড বুঝিতে হইবে। বঙ্গদেশে ছাত্রের বেতন অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী আদায় হয়। মান্দ্রাজে বে-সরকারি সাহায্যের হার অনেক বেশী, আবার মধ্য প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট অনেক টাকা প্রদান করিয়া থাকেন।

## প্রতি স্কুল ও প্রতি ছাত্রের ব্যয় পরিমাণ—

বালকদিগের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক

ব্যয় পড়ে ১৬২৲ টাকা, বোম্বাই প্রদেশে প্রত্যেক স্কুলের ব্যয় ৪৩১৲, কিন্তু বঙ্গদেশে মাত্র ৮৩৲ টাকা। প্রতি ছাত্রের শিক্ষার বার্ষিক ব্যয় পড়ে ৪২৲ টাকা। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এই ব্যয়ের পরিমাণ ৭.৬৲ টাকা এবং বঙ্গদেশে ২.৯৲ টাকা।

### শিক্ষা সৌকর্য্যের উন্নতি—

১৯০৭-১৯১২ খৃষ্টাব্দে অনেক স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং শিক্ষকগণের শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে সর্ব্বত্র সমভাবে স্কুল স্থাপিত হইতে পারে, শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি হইতে পারে, গ্রেড অনুসারে শিক্ষকগণের বেতন বাড়িতে পারে, শিক্ষকেরা পেন্সন বা তদনুরূপ অন্য কোন ও 'ফাণ্ড' হইতে বৃদ্ধকালে সাহায্য পাইতে পারেন এবং শিক্ষকগণের শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার সমধিক বন্দোবস্ত হইতে পারে, এ সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সর্ব্বোপরি ভারত গবর্ণমেণ্ট অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাথমিক শিক্ষার বিবিধ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের সমস্ত প্রদেশের জন্য বাৎসরিক ৩৫.৪০ লক্ষ টাকা 'ইম্পিরিয়েল গ্র্যাণ্ট' নামে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯০৭-১৯১২ খৃষ্টাব্দে নানা প্রকারে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট ১, ৫৯, ৬৭০০০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

### প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র

প্রাথমিক বিস্তালয়ে সাধারণতঃ গ্রাম্য কৃষক, স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রভৃতির ছেলেরা অধ্যয়ন করে। যে সকল শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের বেতন প্রদান করিতে পারে তাহাদের ছেলেরাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় দরিদ্র উচ্চ শ্রেণীর লোকের ছেলেরাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

### স্কুল গৃহ

প্রাথমিক শিক্ষা গৃহে, ভাড়া করা গৃহের বারান্দায় বা বৃক্ষতলে প্রদত্ত হয়। অনেকের মতে এই শিক্ষা লোকের গৃহের বারান্দায় বা বৃক্ষতলে দেওয়াই উচিত। বারান্দারই হউক আর ভাড়া করা গৃহেই হউক এই উভয় স্থানই কিন্তু শিক্ষার পক্ষে অনুপযুক্ত। ভাড়া করা ঘরে প্রায়ই আলো বা বাতাসের বন্দোবস্ত থাকে না। বৃক্ষতলে শিক্ষা দেওয়া ভাল, কিন্তু যখন উত্তপ্ত ধূলি-রাশি উত্তপ্ত বাতাসে উড়িতে থাকে বা বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়িতে থাকে তখন বৃক্ষতল শিক্ষার অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। বৃক্ষতলে শিক্ষা দেওয়ার আর একটা বাধা আছে। কোন সময়েই বৃক্ষতলে ছবি, 'চার্ট, ব্ল্যাকবোর্ড এবং শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য আবশ্যক উপকরণ ব্যবহৃত হইতে পারে না। সুতরাং একটা মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। যে গৃহ অল্পব্যয়ে নির্ম্মিত হইতে পারে অথচ যাহাতে বহুসংখ্যক ছাত্রের স্থান সঙ্কুলন হয়, আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা থাকে, স্বাস্থ্যের হানি না ঘটে, প্রফুল্লচিত্তে ছেলেরা লেখাপড়া করিতে পারে, এরূপ গৃহেই ছাত্রগণের শিক্ষা দেওয়া উচিত; কিন্তু অর্থের অভাবে অনেক স্থানেই এরূপ গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না। সাধারণতঃ ৫০০৲ টাকা হইলেই এরূপ গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে, এবং এইরূপ গৃহে ৫০ কি ৬০ জন ছাত্রের স্থান হয়। অনেক স্থলে বড় খারাপ ভাবে এই সকল গৃহ নির্ম্মিত হয় এবং অল্প দিনেই ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে। যদি গ্রামবাসিগণের হস্তে গৃহ নির্ম্মাণের ভার দেওয়া যায় তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে গৃহ-সংস্কারের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। তবে গ্রামিকের উপর সংস্কারের ভার দিতে পারিলে সেই অসুবিধাও দূর হইতে পারে। বিভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় অবস্থা প্রভৃতির উপর বিদ্যালয় গৃহের প্রকারভেদ নির্ভর করে।

### শিক্ষক।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক যে গ্রামে বিদ্যালয় আছে সেই গ্রামের বা নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী। যে বিদ্যালয়ে যে শ্রেণীর ছাত্র অধ্যয়ন করে শিক্ষকও সেই শ্রেণীর লোক হইলেই ভাল হয়। শিক্ষকের বিদ্যানুসারে তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতি ভাল মন্দ হইয়া থাকে। যে শিক্ষক স্বীয় কার্য্য ভালবাসেন, যাহাকে গ্রামিকেরা ভালবাসে, যিনি শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে নিপুণ, তিনি তাঁহার

স্কুল খুব ভাল চালাইতে পারেন, বিদ্যালয়ে শাসন ভাল থাকে এবং নূতন পদ্ধতির সঙ্গে পুরাতন গুরুর পদ্ধতি মিশ্রিত করিয়া তিনি ছাত্রবর্গের প্রিয় হইয়া উঠেন। ভারতে সহস্র সহস্র অতি উৎকৃষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সেই সকল বিদ্যালয়ে খুব ভাল শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থলেই শিক্ষক বাধ্য হইয়া শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। শিক্ষা কার্য্যে তাঁহার আদৌ অনুরাগ নাই, বা শিক্ষাকার্য্যের জন্য তাহার উপযুক্ত শিক্ষা বা বিদ্যা নাই। সুতরাং খারাপ বিদ্যালয়গুলি ভাল করিতে হইলে ভাল বেতন, শিক্ষকগণের নূতন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থা, উপযুক্ত তত্ত্বাবধান প্রভৃতি বিষয়ের ব্যবস্থা হওয়া চাই। তাহা হইলেই অনেকে তাহাদের ছেলেদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে উৎসুক হইবে এবং তাহা হইলে ভবিষ্যতে প্রকৃত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

### স্কুল বসার সময়।

কোন কোন প্রদেশে তিন ঘণ্টা ও কোন কোন প্রদেশে পাঁচ ঘণ্টা করিয়া স্কুল বসে। ঋতু এবং দেশভেদে স্কুল বসার সময়ের তারতম্য হইয়া থাকে। আহারাদি সমাপন করিয়া বালকেরা প্রায় বেলা এগারটার সময় স্কুলে আসে। গ্রীষ্ম ঋতুতে অনেক প্রদেশে বালকেরা সকালেই স্কুলে আসে, মধ্যাহ্নে ভোজনের জন্য বাড়ী যায়, আবার অপরাহ্নে বিদ্যালয়ে আসে। কেহ কেহ অপরাহ্নে আর আসে না। মধ্য প্রদেশে বালকেরা প্রায় সকল ঋতুতেই সকালে বিদ্যালয়ে আসিয়া থাকে।

রবিবারে ও পর্ব্বদিনে স্কুল বন্ধ থাকে। অনেক প্রদেশে শস্য বপন ও কর্ত্তনের সময় স্কুল বসে না। গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রায় ৩ সপ্তাহ স্কুল বন্ধ থাকে।

### প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী ও শিক্ষাপদ্ধতি।

কোন কোন বিদ্যালয়ে চারিটি এবং কোন কোন বিদ্যালয়ে ছয়টি শ্রেণী থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহের কুঠরী থাকে না। কোন কোন ছাত্র বারান্দায় বসে। আসবাবের মধ্যে শিক্ষক মহাশয়ের বসিবার একটি আসন, একটী ব্ল্যাকবোর্ড, কয়েকটি বেঞ্চ ও কয়েকখানি ছবি থাকে। ছবির মধ্যে সম্রাট ও সম্রাট পত্নীর ছবিই প্রধান। কোন কোন বিদ্যালয়ে নানাবিধ বীজ, তুলা, রেশম ও নানাপ্রকার মৃত্তিকা সংগৃহীত থাকে। কোন কোন বিদ্যালয়ে বেঞ্চ থাকে, কিন্তু অনেকের মতে প্রাইমেরী বিদ্যালয়ের জন্য বেঞ্চ তৈয়ার করিয়া অর্থ নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ এই সকল বেঞ্চের উচ্চতার তারতম্য করা হয় না। অনেক বালকেই বেঞ্চে বসিয়া মাটি ত পা রাখিতে পারে না। তাহাদের পা শূন্যে ঝুলিয়া থাকে। মাটিতে মাদুরের উপর বসিতেই বালকেরা ভালবাসে। বেঞ্চের জন্য অর্থ নষ্ট না করিয়া পাঠদানের সৌকর্য্যে উপকরণাদি ক্রয় করিলে সমধিক উপকার হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ একজন শিক্ষক থাকেন। একজন 'মনিটার' ( সর্দার ছাত্র ) শিক্ষাকার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করে। কোন কোন সময়ে শিক্ষক মহাশয় দুইটি শ্রেণী এক সঙ্গে পড়াইয়া থাকেন, এবং অন্য শ্রেণীতে লেখার কাজ দেন, 'মনিটার' এই সকল শ্রেণীর তত্ত্বাবধান করে। ছোট ছোট বালকেরা মাটিতে বাঁশের সাহায্যে অক্ষর গঠন করিয়া থাকে, কবিতা বা গল্প মুখস্থ বলে, এবং গুণের নামতা সুর করিয়া পড়িয়া থাকে। উপরের শ্রেণীর ছাত্রেরা মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠ করে। হস্তলিপি, চিঠা, জমাবন্দী, জমাখরচ প্রভৃতি লিখিবার জন্য অনেক বিদ্যালয়ে এই জাতীয় আদর্শ কাগজ পত্র থাকে।

### শাসন।

গ্রাম্য পাঠশালায় শাসন রক্ষা অনায়াসসাধ্য। পাঠ্য পুস্তকে নীতিবিষয়ক পাঠ সন্নিবেশিত থাকে। বালকেরা নিয়মিত রূপে 'ড্রিল' করে, এবং দেশী ক্রীড়ায় যোগ দেয়। দেশী 'কসরত' নামক ড্রিল বা ব্যায়াম প্রথমতঃ মধ্য প্রদেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ক্রমে এই ড্রিল অন্যান্য অনেক প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছে। এই ড্রিল প্রাচীন পলোয়ানদিগের ব্যায়ামের অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল ড্রিল এইরূপ ভাবে ক্রমনিবদ্ধ যে বালকেরা যথাক্রমে সহজ ব্যায়াম হইতে কঠিন ব্যায়ামে অভ্যস্ত হয়।

## শিক্ষা।

যে সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হয় সে সময় পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণ স্কুলেই বালকগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন কোন বালক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উচ্চপ্রাথমিক ও কেহ বা পরে মধ্যবাঙ্গালার পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করে। তাহাদেরও এক এক শ্রেণীর শিক্ষার পর এক একটি পরীক্ষা গৃহীত হয়। মান্দ্রাজে পরীক্ষার প্রথা নাই। যাহারা চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া প্রথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তের নিদর্শন স্বরূপ একখণ্ড সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়।

অন্যান্য প্রদেশে যে সময়ে মধ্যশিক্ষার শিক্ষাকাল সমাপ্ত হয় বোম্বাই প্রদেশে তখন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ১৭ বৎসরের কম বয়সের বালক এই পরীক্ষা দিতে পারিত না, এখন বয়সের পরিমাণ কমাইয়া ১৫ করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার শেষে সার্টিফিকেটের জন্য কোন পরীক্ষা গৃহীত হয় না। কিন্তু শ্রেণীপরিবর্ত্তনের জন্য পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে নিম্নপ্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শিক্ষকগণ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণ সেই সকল পরীক্ষার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। এই পরীক্ষা সহস্র সহস্র স্কুলে এক সময়ে গৃহীত হইয়া থাকে, সুতরাং পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণ সুচারুরূপে তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না, এবং শিক্ষকগণ সার্টিফিকেট প্রদান কার্য্যে বিচার শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন বলিয়া বোধ হয় না। আসামে পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণই নিম্নপ্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া থাকেন। যুক্তপ্রদেশে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষার প্রথা নাই। উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষা আছে এবং মধ্যশিক্ষার শেষে একটি পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। পঞ্জাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণের অধীনে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মদেশে তিন বিভাগের শিক্ষার শেষে তিনটি পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে।

( ক্রমশঃ )

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

## শারদোৎসব।

(১)

ছিন্ন করিয়া　　সজল মেঘের
　কাল আবরণ খানি
সৌরভ পূত　　নন্দন হতে
　এসেছে শারদ রাণী।
　গুঞ্জরি আজি উঠেছে ভৃঙ্গ,
　মঞ্জরী পড়া তরুর অঙ্গ,
ভগ্ন দেউলে　　আবার আজিকে
　বেজেছে কাঁসর শঙ্খ ;
আলোকে পুলকে　　উঠেছে কাঁপিয়া
　বেদনা বিধুর বঙ্গ।

(২)

সাগরে জানাতে　　এ শুভ বারতা
　যেতেছে তটিনী বহিয়া,
ছুটিছে সমীর　　তটিনীর মধু
　পরশন টুকু লইয়া ;
　রূপের লহর খেলিছে আকাশে,
　পীযুষের ধারা ঝরিছে বাতাসে,
বঙ্গের গৃহে　　হাসি রাশি ছুটে
　আশায় ভরেছে প্রাণ,
তপ্ত হৃদয়ে　　বহিছে আজিকে
　শান্তি নদীর বান।

(৩)

কৈলাসে রাখি　　বিদায়ের ছায়া
　জননী আসিছে আজি,
নিখিল বিশ্ব　　অর্ঘ্য রচিছে
　ভরিয়া কানন সাজি ;

আকুল করিয়া পিয়াসী পরাণ
পাপিয়া গাহিছে বন্দনা গান,
তাঁহারি চরণে লুটায়ে পড়িতে
ফুটেছে শেফালি রাশি,
তাপিত ধরণী শীতল করিতে
জননী আসিছে হাসি।

(৪)

বরষের এই সুমধুর ক্ষণে
দূরে কেহ রো'স্ নারে,
দীনের ভবনে জননী আসিছে
বরণ ক'রে নে তাঁরে ;
যার যাহা আছে আন বহি আন,
আয় তোরা মা'র দুঃখী সন্তান,
অমন রাতুল চরণ দু'খানি
সাজাও কুসুম ভারে,
এস গো ছুটিয়ে পড় গো লুটিয়ে
মায়ের চরণ ধারে।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

# বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত লিপি।

[ স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি, আই, ই, মহোদয়ের নিকট লিখিত। ]

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার পত্রগুলির যে উত্তর দিতে পারি না, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে তাহার উত্তর অদেয়। আপনি যাহা লেখেন তাহা এত মধুর, যে উত্তর যাহাই দিই না কেন তাহা কর্কশ হইবে। আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া, আর অমৃত পান করিয়া ধন্বন্তরিকে মূল্য দেওয়া সমান বলিয়া বোধ হয়। আপনার পত্রের উত্তর না দেওয়াই ভাল—কোকিলকে Thanks দিয়া কি হইবে ? আপনার নববর্ষ প্রভৃতি দিবসের সম্ভাষণ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ খাটে। আপনি নিজে পীড়িত ; চক্ষের যন্ত্রণায় লিখিতে অসমর্থ, তথাপি আমাদের মঙ্গল আন্তরিক কামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আপনার তুল্য মনুষ্য অতি দুর্লভ। আপনাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনি অচিরাৎ সুস্থ হইয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে থাকুন।

স্যার আশ্‌লি ইডেনের স্বদেশ গমন উপলক্ষে কলিকাতায় হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলে, গোবর জল ছড়া দাও। কেহ বলে, "অরে নিদারুণ প্রাণ! কোন পথে···যান, আগে যা রে পথ দেখাইয়া" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের লাভের মধ্যে দুই একটা সমারোহ দেখিতে যাইব।

আমার দৌহিত্রটি এপর্য্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দিক্‌পালগণ পূর্ব্বমত দিক্‌পালন করিতেছেন—চন্দ্রের মধ্যে মধ্যে পূর্ণোদয় হয়, মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা। এখন কালী প্রসন্ন হইলেই আনন্দমঠ বজায় হয়। ইতি তাং ৪ বৈশাখ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

# দুর্গোৎসব তত্ত্ব। *

## দুইটি ভাব—দুইটি রস।

### ( সকাম ও নিষ্কাম সাধনা )।

মহালয়ার মহা মোহময় অন্ধকার!—মেঘের গর্জ্জন, মুষলধারায় বৃষ্টি, মুহুর্মুহুঃ বজ্রের লোক-ভয়ঙ্কর কড় মড় শব্দ। যে সমীর সময় বিশেষে মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইয়া কম-বিকসিত কুসুম-কলিকার আনন্দাশ্রু স্বরূপ শিশির-বিন্দুটি লইয়া খেলা করে, এবং অট্টালিকার সুচারুচিত্রিত গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া বিলাসিনীর অলকদামে বিলসিত রহে, আজি সে একাই এক কোটি বৃত্রাসুরের

* এই প্রবন্ধটি স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহোদয়ের একটি অসম্পূর্ণ রচনা। মৃত মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ইহা অসম্পূর্ণ আকারেই পত্রস্থ করা হইল।

সঃ সঃ।

আসুর বল প্রয়োগ করিয়া হুহুঃ শব্দে গর্জ্জিতেছে, —গাছ পালা উপাড়িয়া ফেলিতেছে, ঘর দুয়ার উড়াইয়া নিতেছে, এবং নদী ও সমুদ্রের বক্ষে পর্ব্বতের মত তরঙ্গ তুলিয়া জলে স্থলে এক করিয়া লইতেছে। ইহা কি? ভাবিবার পথ পাই না। ভাবিয়াও এ বিশ্ব-রহস্যের অন্ত পাই না। জগতের এ সকল শক্তি কোথা হইতে আসে? কোথায় চলিয়া যায়? জড়বিজ্ঞান জীবকে জগদ্‌গুরুর ন্যায় উপদেশ করিতেছে যে—কিবা ঝড়, কিবা বৃষ্টি, কিবা নাশ, কিবা সৃষ্টি, সমস্তই জগন্নিহিত অন্ধশক্তির উন্মাদ লীলা, তুমি সেই শক্তির তত্ত্ব বুঝিতে যত্নপর হও। উহার কাছে ভালমন্দ ভেদ নাই, সাধু অসাধু বিচার নাই,—তুমি উহাকে স্মরণ করিয়া অবনত হও।

ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত এবং চিন্তায় যার পর নাই অবসন্ন হইয়া পড়িয়া রহিলাম। ভাবিলাম, যদি অন্ধ শক্তির অন্ধ খেলাই জগতের অনন্ত লীলা, তাহা হইলে জীব কাহার কাছে দাঁড়াইবে? দুঃখে কাহার শরণ চাহিবে? সুখেই বা কাহার কাছে মাথা নোয়াইবে? এমন সময় কাণে যেন শুনিলাম—কে কহিল জানি না, কিন্তু কাণে যেন ভক্তি-বিজ্ঞানের শ্রুতিমধুর কণ্ঠধ্বনি স্পষ্টই শুনিলাম যে, যিনি এই বিশ্বসংসারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শক্তি লইয়া অনন্ত কাল হইতে অনন্ত কাল এইরূপ লীলা করিতেছেন, তিনিই সকল শক্তির মূল শক্তি, তিনি মূঢ় ও মতিহীনের চক্ষে কখনও কখনও অন্ধতমসা বিবশার ন্যায় পরিলক্ষিত হইলেও আলোকই তাঁহার তনু। তাঁহার নাম অনাদ্যা যোগমায়া। তিনিই জীবের দুঃখদুর্গতিহারিণী দুর্গা। তাঁহাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা কর। যদি হৃদয়ে শীতল হইতে চাও, তাঁহাকে মা বলিয়া ডাক। †

তুমি অশক্ত দুর্ব্বল, সেই মহাশক্তিরূপিণী মায়াময়ী মায়ের কাছে শক্তি প্রার্থনা কর। তুমি অন্নক্লিষ্ট ভিখারী, মাতা অন্নপূর্ণার কাছে অন্নপানীয় ভিক্ষা চাও। তুমি জল ও বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃত শক্তিনিচয়ের জগৎ-ত্রাসিনী ভৈরব-লীলা দেখিয়া হৃদয়ে ভয় পাইয়াছ, মাকে ক্ষণকাল অভয়া বলিয়া ডাকিতে থাক। তুমি অসুর রাক্ষস সদৃশ শত্রুচয়ের ঈর্ষ্যাজনিত পাপাচারে প্রপীড়িত হইয়াছ, অথবা জীবনের দুঃখ দুর্গতিতে রথ-চক্র-নিষ্পেষিত জীবের ন্যায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছ, এ সময়ে মাকে একবার উচ্চৈঃস্বরে দুর্গা বলিয়া ডাক। ইহাই সকাম উপাসনা এবং ইহাই তোমার উপাসনার আরম্ভ। যে সেদিন মায়ের স্তন্যপান করিয়া পুষ্টি লাভ করিয়াছে এবং চিত্তের পরিতুষ্টির জন্য বনলতার ফুল ও পাতা আহরণ করিয়াছে, সকাম সাধনাই তাহার প্রকৃষ্ট পথ। তুমি শিশু,—মায়ের কাছে কামনা জানাইতে ভয় পাইবে কেন? তোমার যে বিষয়ে যে কোন কামনা থাকে তাহা লইয়াই মায়ের কাছে উপস্থিত হও, এবং যিনি এই অনন্তবিশ্বপ্রসবিনী ভুবন-মোহিনী মা, তাঁহাকে কিরূপ ভক্তি ও কিরূপ ভালবাসার ভজিতে হইবে তাহা শিশুর প্রাণে, শিশুর জ্ঞানে, শিশুর ধ্যানে এবং শিশুর অনতিবিকশিত শক্তির পরিমাণে, এইভাবে ও এইরূপে শিক্ষা করিতে আরম্ভ কর।

কথাগুলি হৃদয়ে পশিল। হৃদয় স্তম্ভিত হইল। স্তম্ভিত হৃদয় অতীত ঐতিহাসিক কথার আশ্রয় লইয়া কালের স্রোতে উজান চলিল। তখন দেখিলাম, সাগরপরিবেষ্টিত স্বর্ণ-লঙ্কার দ্বারদেশে জীবের দুঃখহারী ধনুর্দ্ধারী রাম, এবং তাঁহার সম্মুখে আরাধনার অমল পদ্মাসনে অনন্তশক্তিরূপিণী অনাদিকাল-বিলাসিনী দুঃখ-হরণ দনুজ-নাশিনী দুর্গার আনন্দ-বিগ্রহ। শ্রীরামচন্দ্র বলাপহৃতা ভারতলক্ষ্মীর পুনরুদ্ধারের জন্য স্তুতিপাঠ করিতেছেন—

"নমস্তে সর্ব্বাণী, ঈশানী ইন্দ্রাণী,
ঈশ্বরী ঈশ্বর জায়া।
অপর্ণা অভয়া, অন্নপূর্ণা জয়া,
মহেশ্বরী মহামায়া॥

দেবী দিগম্বরী, দুর্গে দুর্গ অরি,
কালিকে করাল বেশী।

† ক্রমশঃ।

শিবে শবারূঢ়া, চণ্ডী চন্দ্রচূড়া,
ঘোররূপা এলোকেশী॥
সর্ব্ব সুশোভিনী, ত্রৈলোক্য মোহিনী,
নমস্তে লোলরসনা।
দিক্ বিবসনা, সর্ব্বাশ্ব বাসনা,
বিশা বিকট দশনা॥
সারদা বরদা, শুভদা সুখদা,
অন্নদা মোক্ষদা শ্যামা।
মৃগেশ বাহিনী, মহেশ ঘরণী,
সুরেশ নন্দিনী বামা।
কামাখ্যা রুদ্রাণী, হারা হররাণী,
মহারমা কাত্যায়নী॥
শমন ত্রাসিনী, অরিষ্ট নাশিনী,
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী॥
হের মা পার্ব্বতী আমি দীন অতি
আপদে পড়েছি বড়।
সর্ব্বদা চঞ্চল, পদ্মপত্রে জল,
ভয়ে ভীত জড় সড়॥
বিপদে আমার না হয় তোমার
বিড়ম্বনা করা আর।
অকিঞ্চনে দয়া করগো অভয়া,
দুঃখার্ণবে কর পার।"

শ্রীরামচন্দ্রের সেই পুরাতন উৎসবই আজি ভারতের গৃহে গৃহে দুর্গোৎসব। বোধ হয়, পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালেই কোনরূপ জাতীয় উৎসব এমন আনন্দের উৎসবরূপে পরিণত হয় নাই। কেন না, যিনি উৎসবের আরাধ্যা, তিনি আনন্দময়ী মা, এবং যাহারা উৎসবে ব্যাপৃত, তাহারা কপিলের ন্যায় জ্ঞানী, কুবের-তুল্য ধনী অথবা রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইলেও, আজি মাতৃস্নেহের ভিখারী—শিশু। যে কাঙ্গাল, সে কাঙ্গালের ভাবে মায়ের জন্ত বিল্বদল আর নয়নজলমাত্র আহরণ করিয়া মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে; যাহার গৃহ ঐশ্বর্য্যের অক্ষয় ভাণ্ডার, সেও আজি মায়ের শ্রীপাদপদ্মে শতসহস্র লোকের প্রাণ শীতল করিয়া ঐ কাঙ্গালের কাছে কাঙ্গালের মত যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইতেছে।

বস্তুতঃ, ভারতের এই দুর্গোৎসবই ধর্ম্ম—অর্থ—কাম—মোক্ষ রূপ চতুর্ব্বর্গ ফলের কল্পপাদপ, ভক্তি ও শক্তির সুখ-সম্মিলন-ক্রীড়াভূমি, জীবের সহিত জীবের ধর্ম্মসম্মত ভ্রাতৃপ্রেমের স্পৃহনীয় প্রস্রবণ, এবং ভগবতীর পদারবিন্দ লাভের পুষ্প-পত্রাচ্ছাদিত পবিত্র সোপান। মা অনন্ত বিশ্বরাজ্যের রাজরাজেশ্বরী, তথাপি তিনি ভিখারীর মা। মা দশটি ভুজে খড়্গ, খেটক, বজ্রাদি দশপ্রহরণধারিণী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, মত্তসিংহবাহিনী, ভয়ঙ্করী। তথাপি তিনি বরাভয়করা, করুণ-স্নিগ্ধ-স্বরা, অভয়া। মা প্রলয়-লীলা-বিলাসিনী, ত্রিকাল-গ্রাসিনী, মুণ্ডমালিনী। কিন্তু তথাপি তিনি শতচন্দ্রসমুজ্জ্বলা, স্মেরাননা, সুন্দরী। যাহারা এই বিশ্বসংসাররূপ মহাসমুদ্রের মন্থনজনিত গরল-রাশির মধ্যে অমৃতের জন্য লালায়িত, মায়ের চরণ-পদ্মই তাহাদিগের আশ্রয়-স্থান। আজি জগদারাধ্যা জগজ্জননীকে আমার প্রাণারাধ্যা মা বলিয়া পূজা করিব, ইহার পর আর সৌভাগ্য-সম্পদ কি?

কিন্তু মায়ের এ আনন্দ-কোলাহলময় অপূর্ব্ব উৎসবে আর একটি অতি গূঢ়ভাব ও অতি গভীর রস নিহিত রহিয়াছে। যখন উপাসকের হৃদয় সে ভাবে উচ্ছ্বসিত ও সে রসে পরিপ্লাবিত হয়, তখন নয়নে আপনা হইতেই অজস্র ধারা বহে, তখন পাষাণের কঠিন প্রাণও নবনীতের ন্যায় দ্রবীভূত হইয়া মায়ের দিকে প্রধাবিত হয়। মা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-রূপিণী অচিন্ত্য শক্তি হইয়াও ভারতের এ দুর্গোৎসবে, দীন দুঃখী কাঙ্গালের ঘরেও, মেনকার তপস্যার মেয়ে। যাহারা একচক্ষে তাঁহাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিয়া তাঁহার নিকট হৃদয়ের অভিলষিত সুখসম্পদ ভিক্ষা চাহিতেছে, তাহারাই আবার আর এক চক্ষে তাঁহাকে সুখ-পালন-যোগ্য সন্তানের মত নিরীক্ষণ করিয়া বাৎসল্যে গলিতেছে, এবং নিষ্কাম স্নেহের নির্ম্মল আনন্দে তাঁহাকে ফুল, ফল ও তীর্থজল প্রভৃতি অনন্ত বস্তু—

৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

# মর্ম্মর-স্বপ্ন।

সে আজ দু'বছরের কথা। শারদ পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-সাগরে গা ঢালিয়া এক অপরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও তাহার স্মৃতি আলো-ছায়ায় মিশিয়া তেমনি সজীব রহিয়াছে, একটি ক্ষুদ্র রেখাও ম্লান হইয়া যায় নাই।

বন্ধুর সহিত প্রয়াগ হইতে যখন যাত্রা করিলাম, তখন অনেকটা রাত ছিল। অতীত পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন নগরী তখনও নিদ্রার ক্রোড়ে এলাইয়া ছিল। রাজপথের আলোগুলি কুয়াসার আস্মানী পর্দার আড়ালে মিটি মিটি করিয়া জলিতেছিল। শেষ রাত্রির শীতল হাওয়ায় কাঁপিতে কাঁপিতে একাযোগে ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলাম। অসম্ভব যাত্রীর ভিড়। কোন প্রকারে দু'খানা আগ্রার টিকেট কিনিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিতেই পূর্ব্বাকাশে ভোরের আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখনও আকাশে মুঠা মুঠা তারা ছড়ানো রহিয়াছে। কুয়াসা ও অন্ধকার মেশামিশি করিয়া দূরস্থিত পাহাড় ও গাছপালাগুলি ঢাকিয়াছিল। গাড়ীর দু'ধারে শিশির-ভিজা বনের গাছগুলি মৃদুবায়ুহিল্লোলে অল্প অল্প দুলিতেছিল। ঘুম ও জাগরণের সন্ধিক্ষণে একটা মৌন সম্ভ্রম বহিয়া বেপথু অন্তরে পথ চলিতেছিলাম।

মনে হইতেছিল যেন তীর্থে চলিয়াছি। সেই কালজয়ী প্রেমের গৌরবময় পুণ্যপীঠ, যাহার ধূলিকণিকায় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিকের পদচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে, যাহার বক্ষে একখানি পেলব কল্পনা মৃত্যুহীন আকারে রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমি প্রেমের সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থের যাত্রী, একথা মনে করিয়া অন্তর যেন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

পথের কথায় বেশী কথা কেনাইব না, কারণ আমি ভ্রমণকাহিনী বলিতেছি না, অতীতের একটি মধুর স্বপ্ন বর্ণনা করিতেছি মাত্র। পথ চলিতে চলিতে শুধু মনে হইতেছিল যেন ইতিহাসের এক একখানি চিরবিশ্রুত পৃষ্ঠা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। ভারত ভ্রমণ ইতিহাস পাঠেরই নামান্তর মাত্র।

টুণ্ড্লা জংসনে যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছিল। গাড়ী বদল করিয়া আগ্রার ছোট গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। সহযাত্রীগণের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি এই দুইটি বাঙ্গালীর উপর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। জনৈক সৌম্যমূর্ত্তি শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাজ দেখ্‌নেকো আয়া হ্যায়?' উত্তর করিলাম,—'হাঁ সাহেব।' সুদূর বিদেশাগত দুইটি যুবকের প্রতি স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার গল্প শুনিতে শুনিতে আমাদের পথ কাটিতে লাগিল। শাজাহান পাদ্‌শার মৃত্যুকাহিনী বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল।—

'সেদিনো এমনি সময়ে আজিকারই মত সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন। প্রাসাদদুর্গের কক্ষবাহিরে সাজাহান স্বর্ণপালঙ্কে শায়িত। তাঁহার মুখমণ্ডলে মৃত্যুর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। রোরুদ্যমানা জাহানারা শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা। মরণাহত সম্রাটের নিষ্পলক দৃষ্টি যমুনার পরপারে মর্ম্মরস্তূপের প্রতি নিবদ্ধ। সারা জীবনের পুঞ্জীভূত অশ্রুরাশি সেখানে জমাট হইয়া পড়িয়া আছে। মিলনোৎসুক বিরহী তাঁহার শেষ কয়টি দীর্ঘনিঃশ্বাসে যেন তিল তিল করিয়া সমগ্র প্রাণখানি মর্ম্মরসমাধির উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিতেছিলেন। আওরঙ্গজেব নতমস্তকে দণ্ডায়মান। অত্যাচারী দাম্ভিক পুত্রের নিকট স্নেহপ্রবণ মুমূর্ষু পিতার শেষ ভিক্ষা কি?—যেন তাঁহার মাটির দেহ তাঁহার প্রিয়তমার সমাধির পার্শ্বেই রক্ষিত হয়, যেন তাঁহার শেষ বিশ্রাম ঐ শুভ্র শোকসৌধের অভ্যন্তরে, ঐ অশ্রু ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঞ্চিত উপহার,—চাহিয়া দেখ মুসাফীর!—ঐ সেই বাস্তব-স্বপ্ন!'

চমকিয়া উঠিলাম। ছুটিয়া জানালার ধারে যাইয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিলাম,—কোথায় সেই বিশ্ববিখ্যাত তাজ? সহযাত্রী বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি দূরস্থিত একটি শ্বেত মস্‌জিদাকার সৌধের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন। এই কি তাজমহল, যাহা দেখিবার নিমিত্ত

সুদূর বাংলাদেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি ?—নীরবে আসিয়া উপবেশন করিলাম। বৃদ্ধ আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, বলিলেন,—'আজ রাত্রিকালে তাজ দেখিও, তখন আর আফ্‌শোস থাকিবে না'।

ক্রমে আগ্রার সন্নিহিত হইলাম। অদূরে যমুনা! এই সেই নদী যাহার সহিত ভারতের কথা, কাহিনী ও ইতিহাসের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সেই 'যুগ যুগবাহী প্রবাহ' যাহা একদিন বাঁশীর সুরে উজান বহিয়াছিল, যাহার কল্লোল-সঙ্গীতে আজও বুঝি বৃন্দাবন-গাথা ঝঙ্কৃত হইতেছে—

'যা'র, বিশাল তটে রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্ত মণি!'

কিন্তু কবির সেই 'তটশালিনী সুন্দর যমুনা' যেন আজ রাধাশ্যামবিরহেই শীর্ণকায়া। দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল,—

'যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনা
প্রবাহিনী!'

প্রায় ৪৷৷০ টার সময় আগ্রায় পৌঁছিলাম। আগ্রা কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় নাগ মহাশয়ের বাসায় আমাদের প্রিয়দর্শন অজিত বাবুকে পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। সুতরাং 'টোঙ্গা'-যোগে তদুদ্দেশেই যাওয়া গেল। অজিত বাবু আমাদের জন্য একটি ভাল হোটেলে স্থান করিয়া দিবেন ইহাই আমাদের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু বাসায় পৌঁছিতেই অধ্যাপক মহাশয়ের আদেশে তাঁহার বাসাতেই 'আস্তানা' পাতিতে হইল। আমাদের পূর্ব্বেই আমাদের পরিচিত ২।৩ টি ভদ্রলোক অধ্যাপক মহাশয়ের আতিথ্য লাভ করিয়াছিলেন।

সেদিন লক্ষ্মীপূর্ণিমা। পূর্ণিমায় তাজ দেখিব বহুদিনের সাধ ছিল, তাহাতে আবার শারদপূর্ণিমার স্বর্ণসুযোগ ঘটিয়া গিয়াছে। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। আমাদের আর স্নানাহারের সময় ছিল না। তখনই গাড়ী ডাকা হইল, আমরা পাঁচজন জুটিলাম। চারিজন পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ,—একজন ব্যারিষ্টার, একজন ডাক্তার, বন্ধুবর ওস্তাদসিয়ার, অজিত বাবু ক্রীড়াকুশল ও সুধী, আর আমি—কিছুই নই!

গাড়ী প্রশস্ত রাজপথ বাহিয়া, একটি সুবিস্তীর্ণ পার্কের মধ্য দিয়া পরে দুর্গের ধারে ধারে চলিতে লাগিল। বিশাল, বিস্ময়কর সেই বিরাট প্রাসাদ-দুর্গ, মোগল সভ্যতা ও অতুল সৌন্দর্য্যস্পৃহার কালজয়ী নিদর্শন।

যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, অদম্য কৌতূহল আর বাধা মানিতেছিল না। কেবলি মনে হইতেছিল,—

'ফুরালো কি পথ ?'
এসেছি পুরীর কাছে কি ?

যমুনা পার হইয়া পরপারে অসংখ্য অতীত স্মৃতি-চিহ্নের মধ্য দিয়া অবশেষে তাজের প্রবেশ দ্বারে উপনীত হইলাম।

এই কি সেই ক্ষুদ্র মস্‌জিদ্, ট্রেণ হইতে যাহা দেখিয়া হতাশ হইয়াছিলাম ? সেই আকাশচুম্বী রক্ত প্রস্তরের বিরাট প্রবেশদ্বারে ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম।

গেট পার হইতেই তাজের বিশাল ধবল মূর্ত্তি চক্ষে পড়িল। উচ্ছ্বসিত কৌতূহল ও আবেগ বক্ষে চাপিয়া ভক্তের মত নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

ভারতের লুপ্ত শিল্পের বিস্ময়কর সৃষ্টি, জগতের শ্রেষ্ঠ সমাধি-সৌধ, প্রেমের মরণজয়ী স্মৃতিমন্দির, প্রেমিক সম্রাট্ শাজাহানের প্রণয়ের অলৌকিক অবদান, বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল আজ আমার চক্ষের সমক্ষে গগনস্পর্শী গম্বুজ ও মিনারসহ দণ্ডায়মান। সম্মুখে প্রশস্ত প্রস্তরময় পথ, দু'ধারে বিস্তীর্ণ উদ্যান ও উৎসশ্রেণী। সেই পথ বাহিয়া ধীরে ধীরে সুদূরাগত তীর্থযাত্রীর মত মৌন সম্ভ্রম ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া তাজের সন্নিহিত হইতে লাগিলাম। নীচে জুতা রাখিয়া উপরে প্রশস্ত চত্বরের উপর উঠিয়া গেলাম।

প্রেমের অমৃতলোকবাসী, মরণহীন মৃত্যুর অধিকারী রাজদম্পতির সম্মানার্থ আমরা প্রথমেই সমাধি দেখিতে মনস্থ করিলাম। ভত্র সোপানশ্রেণী দিয়া গাইড্ আমাদিগকে নিম্নতলে লইয়া গেল, অতি সন্তর্পণে মৃদুপাদবিক্ষেপে আমরা সমাধির সমীপস্থ হইলাম।

শুভ্র বেদী দুইটি পাশাপাশি নির্ম্মিত, উভয়ের উপর অজস্র বেলা ও শিউলী ফুল ছড়ানো রহিয়াছে।

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যশালী সম্রাট-দম্পতির সমাধিবেদিকার সম্মুখে আমাদের মস্তক ধীরে ধীরে অবনত হইয়া আসিল। প্রেমের সেই পীঠস্থানে দাঁড়াইয়া মনে হইতেছিল যেন মরণের পরপারে অনন্ত মিলনের চিরন্তন রাজ্যে আসিয়াছি। এখানে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের নিখিল বৈচিত্র্য যেন প্রেমের এক সর্ব্বব্যাপী শুভ্রতায় হারাইয়া গিয়াছে। শাজাহান ও মমতাজের অতুলনীয় ভালবাসা যেন চারিদিকের শুভ্রতায়, বেলা ও শিউলীর মৃদু সুগন্ধে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল।

হঠাৎ আমাদিগকে চমকিত করিয়া গাইড্ ধীর গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল,—'আল্লাহো আকবর।' সেই গম্ভীর স্বরতরঙ্গ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া উচ্চ গম্বুজে মর্ম্মরজালের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলিয়া বেড়াইল। মনে হইল যেন ভক্তের এই ঐকান্তিক স্তুতিবাদ ভগবানের সিংহাসনতলে মূর্চ্ছনায় বাজিয়া বাজিয়া নিঃশেষে হারাইয়া গেল।

একটা বিপুল উচ্ছ্বাস বহন করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। তখন শারদপূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারায় তাজস্নান করিয়া উঠিয়াছে। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া চত্বরের উপর বসিয়া পড়িলাম।

মর্ম্মর-স্বপ্ন!—হাঁ স্বপ্নই বটে, না—এ ইন্দ্রজাল? কে বলিবে ইহা মানুষের শ্রমনির্ম্মিত, মানুষের কল্পনায় পরিকল্পিত? মনে হয় যেন ইহা অনাদি কালের, অনন্ত যুগের, অনশ্বর, পরিবর্ত্তনহীন। যেন ইহা বিশ্বপ্রকৃতিরই অঙ্গ। ধরিত্রীর গোপন মর্ম্মতলে যে মহা প্রেম আকর্ষণ প্রত্যেক অণুপরমাণুকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, মনে হয় যেন এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে তাহাই শুভ্র সুন্দর রূপ ধরিয়া জগতের সমক্ষে বাহির হইয়া আসিয়াছে। অথবা সৌন্দর্য্যের উপাসক সম্রাট শাজাহানের কল্পনারাজ্যের পরীরা পাখা মেলিয়া তারার দেশে ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহারই একজন অলক্ষিতে ধরণীর বাহুবন্ধনে ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারায় বিশ্ব প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। নিম্নে যমুনার অবিশ্রান্ত কল্লোলগীতি; বিরহী শাজাহানের দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত উতলা বায়ুপ্রবাহ হা হা করিয়া বেড়াইতেছিল।

সম্মুখে শুভ্রতার একখানি মায়াচিত্র প্রসারিত। মাঝে মাঝে স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। বাস্তবিক যেন স্বপ্ন ও জাগরণ, কল্পনা ও বাস্তবের গণ্ডীরেখা ইন্দ্রধনুর বর্ণসম্পাতের মত একে অন্যে মিলাইয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন তাজমহল প্রস্তরে নির্ম্মিত হয় নাই; প্রিয়তমার বিরহবিধুর শাজাহানের অশ্রুরাশি সহানুভূতিবিহীনা ধরণীর শীতল বক্ষে নিপতিত হইয়া তুষারস্তূপে এ সমাধিমন্দির গড়িয়া তুলিয়াছে।

সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর এই অপরূপ মর্ম্মরমূর্ত্তির সম্মুখে ভাষার প্রয়াস নিরর্থক হইয়া যায়। তাজমহল যেন একটি অপূর্ব্ব কবিতা। তাহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টি অপরাজেয়। এই চিত্তহারী সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যুগযুগান্তের বিরহ-বেদনার মৌন হাহাকার যেন অনন্তকালের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে। অতীতের সে কোন্ বিস্মৃত দিবসে আষাঢ়ের নবমেঘ দেখিয়া বিরহব্যথায় কবিচিত্ত কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তাহার অশ্রুসজল কাহিনী কবিতার ছত্রে ছত্রে চিরদিনের নিমিত্ত লিখিত রহিয়াছে। শাজাহানের এই মর্ম্মর-কবিতা—ইহাও একখানি বিরহবিধুর চিত্তের অশ্রুসিক্ত ইতিহাস। যমুনার জ্যোৎস্নাধবল তটরেখার প্রান্তে ঐ সেই প্রাসাদ-দুর্গ যাহার কারাকক্ষের বাতায়নে দুইটি সজল দৃষ্টি প্রতিনিয়ত এই শ্বেত-গম্বুজের দিকে নিবদ্ধ থাকিত। আজ আর ঐ প্রাসাদদুর্গের আলোকমালা যমুনার নীলজলে উদ্ভাসিত হয় না, আজ এই রূপালী নিশায় তাহার প্রমোদকোলাহল তাজের নিস্তরঙ্গ নীরবতাকে আর চঞ্চল করিয়া তোলে না। প্রাসাদ-দুর্গ আজ শ্মশান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিরহী সম্রাটের দীর্ঘনিঃশ্বাস আজও বায়ুপ্রবাহে তাজের অলিন্দে ও মর্ম্মরজালে হাহাকার জাগাইয়া তুলিতেছে।

সৌন্দর্য্যের পূজারী কবি শাজাহান! জানি না কোন্ সে রঙীন সন্ধ্যায়, কোন্ সে নিথর মাধবী নিশায় তোমার কবিচিত্তে তাদের পরিকল্পনা ভাসিয়া উঠিয়াছিল। অতীত প্রেম স্মৃতির আবেশ-হিল্লোলে গা ঢালিয়া দিয়া তন্দ্রার হিন্দোলায় জানিনা সেদিন কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে! বুঝি সেদিন অস্পষ্ট ছায়ালোকে সুদূর দিক্‌চক্রবালে একটি যুথভ্রষ্ট রাজহংস তোমার আবেশ-বিহ্বল অন্তরে শুভ্রতার ছায়া ফেলিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। তাহাই বুঝি শুভ্র মর্ম্মরের অপরূপ কল্পনায় দিনে দিনে রূপ ধরিয়া উঠিয়াছিল।

রাত্রি গভীর। শরতের মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছিল, সে হাসি মর্ম্মরময়ী রূপসীর অঙ্গে অঙ্গে এলাইয়া ঘুমাইয়া পড়িতেছিল। বিশ্ব নীরব, কেবল হেনা ও কামিনীর গন্ধমদির মাতাল বায়ুপ্রবাহ মৃদু গুঞ্জন জাগাইয়া বহিয়া যাইতেছিল। নিম্নে যমুনার নীলধারায় অতীতের লুপ্তকাহিনী কল্লোলিত হইতেছিল। আকাশ চঞ্চল, বাতাস চঞ্চল, মর্ম্মরের স্নিগ্ধ স্পর্শেও যেন নিখিল চাঞ্চল্য তরঙ্গায়িত।

জ্যোৎস্নাময়ী নিশুতি নিশায় ঘুমনগরীর রাজকন্যা জাগিয়া উঠিয়াছে। কণ্ঠে তা'র মণিমালা, পরিধানে তা'র শুভ্রবাস, অঙ্গে তা'র পূর্ণ যৌবন। অবিকম্পিত অতল সাগর—তাহাতে একটি মাত্র অনিন্দ্যসুন্দর শুক্তি—তাহারই মর্ম্মকোষে মুক্তারূপে তাহার জন্ম হইয়াছিল। আজ সে স্থিরযৌবনা বিশ্ববিমোহিনী সুন্দরী, জরামৃত্যু নবীনতার চির আবর্ত্তনের মাঝখানে ধীর, স্থির, অচঞ্চল, অম্লান শুভ্রতায় মহিমান্বিতা।

বাতাস বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সহসা অদূরে একটা চিরবিরহী বিহঙ্গের মর্ম্মভেদী কাতরতা নীরবতা বিচ্ছিন্ন করিয়া জাগিয়া উঠিল। তাদের অঙ্গে অঙ্গে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল,—মনে হইল যেন সেই স্থাণু মর্ম্মরগাত্রের সুশীতল স্পর্শে ঘুমন্ত প্রেমিকের বক্ষস্পন্দন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে! সেই নিখিল জাগরণ চাঞ্চল্যের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মৃত্যুঞ্জয়ী নিভৃত প্রেমের অবমাননা করিতে আর সাহস হইল না।

—ফিরিয়া আসিলাম, ঘুমাইয়া কি জাগিয়া সে কথা আজ আর মনে নাই। কিন্তু যে স্বপ্নের স্মৃতি বুকে লইয়া ফিরিয়াছি তাহা আজও তেমনি মধুর, তেমনি উজ্জ্বল!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

# জলজ উদ্ভিদ।

অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি পৃথিবীর স্থল-ভাগ যেমন নানাবিধ বিচিত্র তরু লতা গুল্ম ইত্যাদিতে পরিশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন, জল-ভাগও তেমনি নানাবিধ মনোহর জলজ পুষ্পে অতীব রমণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। প্রভাতের তরুণ অরুণ কিরণ চুম্বনে যখন দলে দলে কমল প্রস্ফুটিত হয় ও মধুকরগুঞ্জনে সমগ্র পদ্মবন মুখরিত হইতে থাকে এবং প্রভাতী সমীর অমল কমল-গন্ধে মাত হইয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়, তখন কাহার না প্রাণ তাহাতে মুগ্ধ হয়? আবার যখন চন্দ্রকিরণ-পাতে সরসী বক্ষে রজতের রেখা খেলে, দিনান্তে কুমুদ যখন কৌমুদী স্পর্শে ধীরে ধীরে দলে দলে প্রস্ফুটিত হয়, জ্যোৎস্না-সুধাপানে বিভোর হইয়া মৃদু সমীরণে ঈষৎ দুলিতে দুলিতে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অগাধ প্রেম নীরব ইঙ্গিতে সুদূর নক্ষত্রলোকে প্রেরণ করিতে থাকে, সে দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন, তিনি কখনও ভুলিতে পারিয়াছেন কি?

সভ্যজগতে যত প্রকার উদ্যান রচনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রাকৃতিক উদ্যান (Landscape gardening) রচনা প্রণালীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই প্রাকৃতিক উদ্যান রচনায় কৃত্রিম হ্রদ, তড়াগ, প্রস্রবণ, নির্ঝর ও জলপ্রণালী ইত্যাদি নানাবিধ জলের দৃশ্য একটি অপরিহার্য্য অঙ্গবিশেষ বলিয়া এখন গণ্য হয়। নানাবিধ জলজ পুষ্পে এই সকল জল দৃশ্য আরও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে এবং সমগ্র উদ্যানের স্বাভাবিক শোভা শত গুণে বর্দ্ধিত করে। এই কারণে এবং জলজ পুষ্পের মধুর সৌরভ ও মনোহর বর্ণবৈচিত্র্যে সভ্য জগতে আজকাল জলজ ফুলের আদর অত্যধিকরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। ফলতঃ এখন প্রাকৃতিক উদ্যান মাত্রেই জলজ পুষ্প শোভিত নানাবিধ জল-দৃশ্য ব্যতিরেকে নিতান্ত অঙ্গহীন বলিয়া বিবেচিত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার বহুস্থানে এখন জলজ ফুলের প্রদর্শনী হইয়া থাকে এবং এই সকল মনোহর পুষ্পের উৎকর্ষ সাধন কল্পে তথায় প্রদর্শনকারীদিগকে নানারূপে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হয়। আমাদের দেশে জলজ পুষ্প বলিয়া কেন, কোন ফুলের জন্যই দেশবাসীর তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। আমরা প্রকৃতি-রোপিত, প্রকৃতি-পোষিত স্বাভাবিক জল-উদ্যান বা বিল-উদ্যানেই জলজ পুষ্প দেখিয়া তৃপ্ত হইয়া থাকি। আমাদের অনেকের মনে ধারণা যে সাধারণতঃ আমাদের জলে যে দুই তিন প্রকার পদ্ম ও কুমুদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্ব্যতিরেকে আর উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন জলজ পুষ্প নাই। কিন্তু তাহা নহে। পৃথিবীতে বহু প্রকারের মনোহর জলজ পুষ্প আছে। আমি ক্রমশঃ সংক্ষেপে পাঠক পাঠিকাদিগকে তাহাদিগের পরিচয় দিতেছি।—

( ১ )

## ভিক্টোরিয়া রিজিয়া

জলজ পুষ্পের উল্লেখ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে সমগ্র জলজ পুষ্পের রাণী "ভিক্টোরিয়া রিজিয়া" নাম উল্লেখ করিতে হয়। জলজ ফুল বলিয়া কথা কি, সমগ্র উদ্ভিদ জগতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর মনোহর ও মহিমান্বিত অন্য কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার Lindley এই জলজ পুষ্পরাণীকে আমাদের স্বর্গগতা সাম্রাজ্ঞী Queen Victoriaর নামানুসারে Victoria Regia নামকরণ করিয়া জগতে ইহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও গৌরব ঘোষণা করেন।

ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার পাতার সঙ্গে আমাদের দেশের জলজ মাখনা পাতার কতকটা সাদৃশ্য আছে। ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার পাতা গোলাকার। পাতার ব্যাস চারি ফুট হইতে ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পত্রের প্রান্তদেশের তিন চারি ইঞ্চি পরিমাণ ঠিক খাড়াভাবে (at right angles) ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া থাকে। পত্রবৃন্ত জলমগ্ন থাকে, উহা কোন সময়ও আমাদের দেশীয় পদ্মপত্রের ন্যায় জলের উপর উঠিয়া থাকে না। শুধু পাতাগুলি অতি সুবৃহৎ বেতী থালার ন্যায় জলের উপর ভাসমান থাকে। পত্রের উপরিভাগ

সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ মলিন ফিকে ভায়লেট বর্ণ। ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার পাতার উপরিভাগে পত্রের কেন্দ্রস্থান হইতে বহু সূক্ষ্ম শিরা পত্রের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। নিম্নভাগেও মধ্য হইতে প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত স্থূল সবল খণ্ডিত শিরারেখা পত্র অঙ্গে ছোটবড় অনেক চৌকা গঠন করিয়া বিস্তৃত থাকে। এই সকল শিরা সুদৃঢ় কণ্টকময়। পত্রবৃন্তও অত্যন্ত কণ্টক পূর্ণ। এই সকল পত্র সুবর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পাইলে এত দৃঢ় ও পুরু হয় যে তদুপরি ১০।১২ বৎসরের বালক বালিকা অনায়াসে দাঁড়াইতে পারে তাহাতে পত্র জলমগ্ন হয় না। ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার পত্রের অঙ্গে দৃষ্টিঅগোচর অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র সমূহ (pores) বর্ত্তমান আছে। বৃষ্টির জল পড়িলে এই সকল পথ দিয়া জল চুঁয়াইয়া নীচে পড়িয়া যায়। ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার পত্রের প্রান্তদেশ বেলী-থালার ন্যায় উঁচু সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কাজেই পত্র অঙ্গে ছিদ্র (pores) না থাকিলে নিশ্চয়ই জল পড়িলে বেলী-থালায় যেমন জল সঞ্চিত হয় ইহাতেও সেইরূপ জল সঞ্চিত থাকিত। উপর হইতে জল পড়িলে জল নিঃসারিত হইবার পথ নাই, অথচ বৃষ্টি হইলেও পত্রের উপর জল সঞ্চিত হইতে দেখিনা, এবং পত্র অঙ্গে কোন ছিদ্রও দৃষ্টিগোচর হয় না, এই অবস্থার প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতুহল হইয়াছিল। অনুসন্ধানের পর বুঝিতে পারিলাম যে পত্র অঙ্গে pores অথবা সূক্ষ্ম ছিদ্র বিদ্যমান আছে এবং তদ্দ্বারাই জল নীচে পড়িয়া যায়। ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার ফুল অতি মনোহর। ফুলের ব্যাস ৮ ইঞ্চি হইতে ১৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। কোরক অবস্থায় ইহা সবুজ বর্ণের পুরু পুষ্পাবরক পাপ্‌ড়ি দ্বারা আবৃত থাকে। এই অবস্থায় পুষ্পকোরক ও পুষ্প বৃন্তের সম্মিলন আমাদের দেশের মাখনা ফলের ন্যায় দৃষ্ট হয়। সন্ধ্যার সময় ইহা প্রস্ফুটিত হয়, তখন ফুলের বর্ণ মাখনের ন্যায় শ্বেত বর্ণের থাকে। সমস্ত রাত্রি এই-ভাবে থাকিয়া পরদিন বেলা নয়টার পর হইতে বেলা ৩। টা পর্য্যন্ত ইহা অর্দ্ধ মুদিত অবস্থায় থাকে। তৎপর ইহা আবার পূর্ব্ববিকশিত হইতে থাকে। তখন আর ইহার মাখনের ন্যায় শ্বেত বর্ণ থাকেনা। শ্বেতাভ গোলাপী বর্ণ ধারণ করে। এইভাবে প্রায় অর্দ্ধরাত্রি গত হইবার পরে পুনরায় চিরতরে মুদিত হইতে থাকে এবং পরদিন ইহার বীজের পক্কতা সাধন নিমিত্তই বোধ হয় জল মধ্যে নিজকে মগ্ন করিয়া দেয়। পুষ্প বৃন্ত তখন সোজা না থাকিয়া একটু বক্র হইয়া যায়। এই পুষ্পের পাপ্‌ড়ি আমাদের পদ্মের পাপ্‌ড়ির ন্যায় মসৃণ নহে, একটু খস্‌খসে; কতকটা জাপানি ক্রেপ কাপড়ের ন্যায়। ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার গন্ধ অতি মনোহর। পুষ্প মুকুলের মুখ একটু খুলিলেই ইহার মন মাতান মধুর সৌরভ বহুদূর পর্য্যন্ত আমোদিত করিতে থাকে। ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার গাছ খুব সতেজে বর্দ্ধিত হইতে পারিলে প্রতি দুই দিন অন্তর ইহার ফুল পাওয়া যায়। ইহার মতন এমন নিয়মমত অবি-চলিত ভাবে ফুল দিতে আমি অন্য কোন জলজ উদ্ভিদকে দেখি নাই। আমি আমার বাগান হইতে প্রায়ই ইহার ফুল কাটিয়া আনিয়া আমার শুইবার ঘরে রাখিয়া দেই, ফুলের সুগন্ধে সমগ্র ঘর সারারাত্রি আমোদিত থাকে।

ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার গাছ বীজ হইতে জন্মাইতে হয়। ইহার বীজ অনেকটা আমাদের দেশের মাখনা বীজের ন্যায়। বীজের একপ্রান্তে খুব ধারাল ছুরি দ্বারা বীজের কঠিন আবরণ একটু ফেলিয়া সূক্ষ্ম একটু ছিদ্র করিয়া দিলে খুব অল্প সময়েই বীজ অঙ্কুরিত হয়। নতুবা অনেক সময় হয়ত এক বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইলেও চারা উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও রোপিত বীজের অযত্ন করিতে হয় না কারণ দীর্ঘকাল পরেও ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছে। একবার গাছ জন্মাইতে পারিলে বীজের জন্য আর বিদেশে অর্ডার দিতে হয় না। তখন এক গাছ হইতেই বহু সংখ্যক বীজ পাওয়া যায়। আমার একটী গাছ হইতেই আমি বহুসংখ্যক বীজ সংগ্রহ করিয়াছি। বীজ, বীজকোষের উপরের আবরণ, সকলই আমাদের দেশের জলজ মাখনা ফলের অনুরূপ। বড় গামলার বা চাড়ীর অর্দ্ধভাগ হইতে

কিছু বেশী একটু সারসংযুক্ত পরিষ্কার কোমল মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া জলপূর্ণ করতঃ তন্মধ্যে বীজ রোপণ করিতে হয়। পাঁচ ছয় মাস মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। আমি যে প্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা করিলে আরও শীঘ্র বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্‌গম হয়। প্রথমেই ইহার পাতা পূর্ণ বিকশিত গাছের পাতার ন্যায় বেলী-থালার আকার ধারণ করে না। গাছ বড় হইলে তবে ঐরূপ হয়। বীজ হইতে উৎপন্ন ছোট চারা দেখিয়া কেহ হতাশ না হন সেজন্যই এই কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম। ছোট চারার পাতা অনেকটা দেশীয় জল শাপ্‌লা পাতার ন্যায়; তবে পত্রবৃন্তে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঁটা থাকে। ভিক্টোরিয়া রিজিয়া গাছের পাতা এত বড় ও গাছ এত বর্দ্ধিষ্ণু যে অন্ততঃ ৩০ ফিট ব্যাস ও দশ ফিট গভীর চৌবাচ্চা ব্যতীত ইহার একটী গাছকে সুন্দররূপে পালন করা যায় না। চৌবাচ্চার সাড়ে চারি ফিট খুব সার সংযুক্ত মাটি দ্বারা পূর্ণ করিয়া বাকী ভাগ জলপূর্ণ করিতে হয়। ইহার আবার অনেক শত্রু। প্রথম অবস্থায় ভিক্টোরিয়া রিজিয়া গাছের মূল, পত্র, বৃন্ত ও পত্র অতি কোমল থাকে, এবং উহা স্বাদে মিষ্ট বলিয়া মৎস্য, কচ্ছপ, শম্বুক, ভেক প্রভৃতি উহা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেইজন্য পুষ্করিণীতে ইহার চারা রোপন একেবারেই নিরাপদ নহে এবং চৌবাচ্চায় রোপন করিলেও প্রথমে উহা সর্ব্বপ্রকার জলজন্তুশূন্য করিয়া লইতে হয়। আমার প্রথম ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার চারা এইরূপে চৌবাচ্চাস্থিত ক্ষুদ্র লাল মাছ দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছিল। বড় বড় মৎস্য এই গাছ খাইয়া ফেলে ইহা আমি জানিতাম। কিন্তু শোভার্থ ক্ষুদ্র লাল মাছ এই গাছ ভক্ষণ করে ইহা আমার বিশ্বাস ছিল না। তবে যখন সুবর্দ্ধিত হইয়া সুদৃঢ় কণ্টকজালে আবৃত থাকে তখন বোধ হয় ইহার কোন শত্রু তেমন কোন বিশেষ অপকার করিতে পারে না। আমার বাগানে ভিক্টোরিয়া প্রভৃত ফুল দিতেছে। পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যাহার ইচ্ছা হয়, দয়া করিয়া ঢাকা উয়ারীতে আমার "ইডেন হাউস্" উদ্যানে আসিলেই এই জগতবিখ্যাত জলজ ফুলরাণীকে দেখিয়া নয়ন মন তৃপ্ত করিতে পারেন।

ভিক্টোরিয়া রিজিয়া সর্ব্বপ্রথম ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বলিভিয়াতে হেইঙ্ক Haenke কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তৎপরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে Bompland করিয়েন্টিস্ এবং আরজেনটিনার নিকটে ইহা দেখেন এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে Poeppig এমাজন্ (Amazon) নদীতে ইহা দেখিতে পান এবং তিনি ইহার নাম দেন Euryale Amazonica. আমাদের দেশীয় মাখনার নাম Eureyale Ferox ... দেখিয়াই তিনি উহার ঐ নাম দিয়াছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে Schomburk বৃটিস গায়েনার বারবিস্ নদীতে ইহা দেখিতে পান এবং তিনি ইহা বিলাতে ডাক্তার Lindley র নিকট পাঠাইয়া দেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে Lindley ইহাকে ভিক্টোরিয়া রিজিয়া নামে অভিহিত করেন।

ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার আরও দুইটী জাতি আছে। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য অতি কম। অপর দুইটী জাতির একটীর নাম ভিক্টোরিয়া ট্রিকারী অপরটীর নাম ভিক্টোরিয়া রেণ্ডি। কেহ২ ভিক্টোরিয়া রিজিয়াকে নীলপদ্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক অথবা কাণা পুত্রের পদ্মলোচন কিম্বা কাফ্রির গৌরাঙ্গ নামের ন্যায় নিতান্ত গায়ের জোরে নামকরণ বলিয়া বোধ হয়। কারণ ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার কোন জাতির ফুলের মধ্যেই নীলবর্ণের ছিটা ফোঁটাও দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবীতে যে যে স্থানে জলজ উদ্ভিদের বিখ্যাত নার্সারী আছে তাহার প্রায় সকল স্থানেই আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে তাঁহারা নীল পদ্মের কোন সন্ধান বলিতে পারেন না। নীল পদ্মের অস্তিত্ব পূর্ব্বকালে থাকিলেও এখন আর তাহার অস্তিত্ব কেহ অবগত নহে। আমাদের দেশে যেমন মাখনা বীজ অনেকে খায় তেমন ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার বীজ দ্বারাও এমাজন্ নদীর তীরবর্ত্তী অধিবাসীরা রুটী প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করে। ভিক্টোরিয়ার বীজ সংগ্রহ করিবা মাত্র উহা জলপূর্ণ বোতলে খুব ভাল করিয়া ছিপি রাখিতে হয়। জল হইতে উঠাইয়া রাখিলে

বীজের উৎপাদিকা শক্তি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে আমি যাহা উল্লেখ করিলাম তাহা সকলই আমার স্বচক্ষে দেখা। এবং পাঠকবর্গও ইচ্ছা করিলে নিজে আমার বাগানে আসিয়া আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন। ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার পত্র ও পুষ্প উভয়ই এমন মনোহর যে দেখিবামাত্র জগদীশ্বরের অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি-মহিমা স্মরণ করিয়া মন ভক্তি ও আনন্দরসে আপ্লুত হইতে থাকে

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

# এ বর্ষে ৺ দুর্গা পূজার বিসর্জ্জন ব্যবস্থা।

দশমী মুহূর্ত্ত কম থাকিলে, সেদিন অপরাজিতা পূজা বা বিসর্জ্জনাদি কৃত্য শাস্ত্রসম্মত ও পূর্ব্বাচার প্রচলিত নহে। এবার ১লা কার্ত্তিক দশমী মুহূর্ত্তকালেরও ৪। ৬ পলাঁ কম থাকায় পঞ্জিকা বিশেষে ৩০শে আশ্বিন বিসর্জ্জনাদি কৃত্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু অস্মদ্দেশে (ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গস্থিত স্থান সমূহে) ১লা কার্ত্তিক দশমী মুহূর্ত্তকাল ব্যাপিনী হওয়ায় ঐ দিনেই বিসর্জ্জনাদিকৃত্য অবশ্য কর্ত্তব্য। কলিকাতা হইতে যতই পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই পূর্ব্ব সময়ে সূর্য্যোদয় হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং মুহূর্ত্তকাল ব্যাপিনী দশমী হইলে সেইদিনেই বিসর্জ্জনাদি কৃত্য অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। এ ক্ষেত্রে কলিকাতার প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির লিখিত মতানুসারে ৩০শে আশ্বিন বিসর্জ্জনাদিকৃত্য দ্বারা যাহাতে আমাদের এ অঞ্চলের লোকের ধর্ম্ম কর্ম্মের লোপ ও প্রত্যবায় না ঘটে, এই জন্যই আমার এই বিষয়ের অবতারণা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লিখিতেছি, কলিকাতা হইতে ঢাকা-ময়মনসিংহ প্রদেশে আট মিনিট পূর্ব্বে সূর্য্যোদয় হওয়ায় সূর্য্যোদয় সময়ের তারতম্য অনুসারে এ অঞ্চলে (ঢাকা ময়মনসিংহ ও তৎসমসূত্র উত্তর দক্ষিণ স্থিত স্থান সমূহে) ১লা কার্ত্তিক দশমী মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ষোল পল বেশী সময় থাকিবে। এইরূপ কোন কোন স্থানে মুহূর্ত্ত অপেক্ষা বেশী ষোল পলের ন্যূনাধিক দশমী নিশ্চিত থাকিবে। সহৃদয় সুধীবৃন্দ ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন বিবেচনায় এবং প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় ইত্যধিক দৃষ্টান্ত দিতে বিরত হইলাম। অবশ্য করি অস্মদ্দেশে (ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গ স্থিত স্থান সমূহে) ১লা কার্ত্তিক দশমী মুহূর্ত্তকাল ব্যাপিনী থাকা সত্বেও সেই দিবস পরিত্যাগ করিয়া ভ্রম ক্রমে প্রচলিত পঞ্জিকার লিখিত মতে ৩০শে আশ্বিন বিসর্জ্জনাদি কৃত্য দ্বারা যাহাতে ক্রিয়ালোপ ও প্রত্যবায় না হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই অবহিত হইবেন। অলমতি বিস্তরেণেতি।

শ্রীদুর্গাসুন্দর বাচস্পতি, স্মৃতি-মীমাংসা-ব্যাকরণতীর্থ।

শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর বাচস্পতি, স্মৃতি-মীমাংসা-ব্যাকরণ তীর্থ মহাশয়ের সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নাই কিন্তু পরম্পরায় জানি তিনি এক জন ধর্ম্মপরায়ণ সুপণ্ডিত লোক। তাঁহার লিখিত "এবর্ষে ৺ দুর্গাপূজার বিসর্জ্জন ব্যবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি আরও প্রগাঢ় হইল। তিনি সাধারণের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্যস্ত এবং দোষ পরিত্যাগ করিয়া যুক্তিমূলক শাস্ত্রের অনুসরণ দেখিয়া তাঁহার শ্রীচরণে শত শত প্রণাম জানাইতেছি। তাঁহার উদার ভাবে সাহসী হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে কয়েকটা কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম।

বাচস্পতি মহাশয় বলিয়াছেন, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি দেশ কলিকাতার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, সুতরাং কলিকাতাতে সূর্য্যোদয় হওয়ার পূর্ব্বেই ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে। ইহা জ্যোতিঃশাস্ত্রের কথা এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের যোগ্য। ইহাকে দেশান্তর সংস্কার বলে। দেশান্তর সংস্কার দুই প্রকার, এক পূর্ব্ব পশ্চিম, অপর উত্তর দক্ষিণ। মহামতি ভাস্করাচার্য্য বলেন :—

"দেশান্তরং প্রাগপরং তথাক্ষজ /
যাম্যোত্তরং তচ্চর সংজ্ঞকং" ॥

বাচস্পতি মহাশয় গুপ্তপ্রেসাদি পঞ্জিকোক্ত তিথি কলিকাতার জন্য গণিত মনে করিয়া ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতির জন্য ৮ মিনিট যোগ করার উপদেশ দিয়াছেন। উহা যে কলিকাতার জন্য গণিত তাহার প্রমাণ কি? উহা রাঘবানন্দ কি রামচন্দ্রের সারণী অনুসারে গণিত। উহাতে যে দেশান্তর ধরিয়া গণনা করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে ঢাকারও পূর্ব্ববর্ত্তী মুন্সিগঞ্জ কি তৎসন্নিহিত রামপাল প্রভৃতির সমসূত্রে কোন স্থানের দেশান্তর ধরিয়া উহা গণিত। সাধারণতঃ বঙ্গদেশের দেশান্তর ২০০ যোজন ধরা হইয়া থাকে, কিন্তু কলিকাতার দেশান্তর কখনও ২০০ যোজন হইতে পারে না। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য তাঁহার জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিয়াছেন :—

"তৎকালেতু নবদ্বীপে দিগ্‌বাহুল শরাঙ্গুলাঃ।
তচ্ছোধনাদ্ ভবত্যত্র সত্রিংশচ্ছত যোজনং॥"

অবন্তী বা উজ্জয়িনী ভারতবর্ষের মধ্য রেখা ( Prime Meridian ) তথা হইতে নবদ্বীপ ১৩০ যোজন পূর্ব্ব দিকে হইলে কলিকাতা যে ২০০ যোজন হইতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। বরং উহা অনেক পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত কোন স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। সারণী গৃহীত দেশান্তর ঢাকার ও পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্থানের জন্য হইলে ঢাকা ময়মনসিংহে মুহূর্ত্ত রক্ষার জন্য কিছু যোগ করা সঙ্গত হইবে না, বরং কলিকাতার জন্য কিছু বিয়োগ করিলে ভাল হয়।

সারণী গ্রন্থে দিবারাত্রির মান ৬০ দণ্ড বা ২৪ ঘণ্টা ধরা হয়। সুতরাং উহা দিবারাত্রির মধ্যম মান বা গড় ( Mean )। সর্ব্বদা দিবারাত্রির মান যে ২৪ ঘণ্টা হয় না তাহা গুপ্তপ্রেসাদি পঞ্জিকার প্রদত্ত প্রতিদিনের সূর্য্যোদয় দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কারণ এক উদয় হইতে পরবর্ত্তী উদয় যদি ঠিক ২৪ ঘণ্টা হয় তবে সূর্য্যোদয় প্রত্যহই এক সময়ে হওয়া আবশ্যক। এই জন্যই ঐ সকল পঞ্জিকাতে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কালকে দিনমান বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কালকে রাত্রিমান না ধরিয়া ৬০ দণ্ড হইতে দিনমান বিয়োগ করিয়া যাহা হয় তাহাই রাত্রিমান বলা হইয়া থাকে। সুতরাং পঞ্জিকাতে যে তিথি মান লেখা থাকে তাহা প্রকৃত সূক্ষ্ম সূর্য্যোদয় হইতে মনে না করিয়া মধ্য সূর্য্যোদয় অর্থাৎ প্রাতঃ ৬ ঘটিকা হইতে মনে করা উচিত।

প্রকৃত সূক্ষ্ম সূর্য্যোদয় হইতে তিথিমান বিশুদ্ধ করিতে দেশান্তর, চর, উদয়ান্তর ও রশ্মিবক্রতা ( refraction ), এই চারিটি সংস্কার দেওয়া আবশ্যক। তন্মধ্যে দেশান্তর সংস্কার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের জন্য সর্ব্বদা একরকম থাকে বলিয়া সারণীকারগণ কোন প্রসিদ্ধ স্থানের দেশান্তর ধরিয়া সারণী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। উল্লিখিত সারণী প্রস্তুত হওয়ার সময়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধি দূরের কথা, সম্ভবতঃ তখন উহার অস্তিত্বও ছিল না। সুতরাং রাঘবানন্দের কি রামচন্দ্রের সারণী যে কলিকাতার জন্য প্রস্তুত নহে, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত।

পঞ্জিকাতে যে তিথি মান দেওয়া থাকে তাহা বিশুদ্ধ কিনা দেখা সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধ গণনা অতি অল্প লোকেই বুঝেন, সাধারণের জন্য মধ্যে মধ্যে ২।৪ দিনের তিথির অন্তকাল ধরিয়া প্রকৃত পরিদর্শন দ্বারা উহা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

বর্ত্তমান বর্ষে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাতে ১৭ আশ্বিন সোমবার প্রাতে দশমী নাই, অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যের অন্তর ৩০০ অংশ হইতে অধিক, ৩০ আশ্বিন রবিবার ও ১ কার্ত্তিক সোমবার প্রাতে ক্রমে নবমী ও দশমী অর্থাৎ

চন্দ্র সূর্য্যের অন্তর ক্রমে ১০৮ অংশ ও ১২০ অংশ অপেক্ষা ন্যূন, এবং ২৯ কার্ত্তিক সোমবার নবমী রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত, সুতরাং সন্ধ্যার সময় চন্দ্র সূর্য্যের অন্তর ১০৮ অংশ অপেক্ষা ন্যূন। কলিকাতায় মান মন্দিরে প্রকৃত পরিদর্শন দ্বারা প্রথমোক্ত তিন দিন সকালে এবং শেষ দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে চন্দ্র স্পষ্ট অবধারণ পূর্ব্বক গণনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। ইহাতেই বুঝা যাইবে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার তিথি মান ঠিক আছে কি না। এক ডেক ভাত ফুটিয়াছে কিনা ২।৪ টা ভাত পরীক্ষা করিয়াই বুঝিতে হয়। গণনার বিশুদ্ধি বেধ (observation) দ্বারা পরীক্ষিত হওয়াই জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিশেষত্ব, এবং তজ্জন্যই বলা হইয়া থাকে :—

"বিফলান্যন্য শাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলং।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ॥"

জ্যোতিষ বেদের চক্ষু স্বরূপ, সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রণীত জ্যোতিস্তত্ত্বের অতি স্থূল বিষয়গুলি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন না করিয়া ধর্ম্ম কার্য্যের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন। মিতাক্ষরা বলিয়াছেন :—

"তিথ্যুৎপত্তিং ন জানন্তি গ্রহাণাং নৈব সাধনং।
পরবাক্যেন বর্ত্তন্তে তে বৈ নক্ষত্র সূচকাঃ॥
নক্ষত্র সূচকোদ্দিষ্টমুপহাসং করোতি যঃ।
স ব্রজত্যন্ধতামিস্রং সার্দ্ধং মূক বিরঞ্চিনা॥"

শ্রীরাজকুমার সেন।

# মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা।

**নারায়ণ**, শ্রাবণ, ১৩২২।—"বঙ্কিমবাবুর পিতৃ-প্রসঙ্গে" মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃদেব যাদবচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি শোনা কথার অবতারণা করিয়াছেন। সেগুলির বিশেষ কোন নূতনত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ সন্ন্যাসীর কৃপায় যাদবচন্দ্রের জীবনলাভ প্রভৃতি ঘটনা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু, তর্করত্ন মহাশয় ধান ভানিতে, শিবের গীত গাহিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত কতকগুলি অন্যায় কটাক্ষপাত করিয়াছেন। "তাঁহার প্রিয়শিষ্য ও তাঁহার পত্রিকা লেখক", "গ্রীক ও হিন্দু" রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় অহঙ্কারী পুরুষ নাকি দৃষ্ট হইত না। যেহেতু শিষ্য প্রফুল্লচন্দ্র অহঙ্কারী ছিলেন, অতএব তদীয় সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রও নিশ্চয়ই অহঙ্কারী ছিলেন, পণ্ডিত মহাশয় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যুক্তি মন্দ নয়! উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ফেলিবার এইরূপ রীতি সুধীসমাজে কখনই আদৃত হইবে না। "সুবিধা পাইলেই, কোনরূপ প্রসঙ্গ পাইলেই, বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপরে একহাত চালাইতেন", প্রভৃতি উক্তিতে তর্করত্ন মহাশয় বঙ্কিম-বিদ্বেষের যে বিষ উদ্গীরণ করিয়াছেন, তাহা এ যুগে বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। প্রকৃত পণ্ডিতগণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র কখনও "একচোট বসাইয়াছেন", একথা সাহিত্যক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অভিনব আবিষ্কার। কিন্তু যাহারা পণ্ডিত না হইয়াও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সেই সকল নিরক্ষর, অথচ চং-দুরস্ত, পেশাদার তথাকথিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর, শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, সকলেই আন্তরিক বীতশ্রদ্ধ। এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ সমাজের গ্লানি, এবং শ্লেষ ও বিদ্রূপের পাত্র। সমাজ শরীরের এই গোপন ক্ষতসমূহ বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় মনস্বী বৈদ্যের শলকাঘাতে আরোগ্যের পথে আসিয়াছে। অতঃপর, মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্র পুনঃ পুনঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন, এইরূপ দোষারোপ করিয়াছেন। ইহাও যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। অবস্থা বিশেষে কাহারও মতের তীব্র প্রতিবাদ করিলে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয় না। শ্রদ্ধাভাজনের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের মস্তক চিরদিনই অবনত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, তর্করত্ন মহাশয় প্রথিত-যশা, দেশমান্য সাহিত্যসম্রাটের মর্য্যাদা যেরূপভাবে রক্ষা করিয়াছেন, কে তাহার বিচার করিবে? স্থানান্তরে, লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী পশুপতি আচার্য্যকে "মৃণালিনী" নাটকে বীভৎস ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অভিযুক্ত হইয়াছেন। "মৃণালিনী" ঐতিহাসিক নাটক নহে, উহার মূল আখ্যায়িকাতে ইতিহাসের ছায়াসম্পাতও দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ, লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী পশুপতি আচার্য্যকেই যে "মৃণালিনী" নাটকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাই বা তর্করত্ন মহাশয়কে কে বলিল? বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কল্পিত নায়ককে যে বর্ণে ইচ্ছা চিত্রিত করিতে পারেন, তাহাতে ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তর্করত্ন মহাশয়ের বিরাগের অন্যতম কারণ এই যে, তিনি স্থানে অস্থানে অনুরাগের সৃষ্টি ও প্রশান্ত ভারত ভূমিতে আত্মহত্যা ও হত্যাকাণ্ডের অভিনয়ে অশান্তির বীজ বপন করিয়াছেন।" উপন্যাসকার না হইয়া যদি বঙ্কিমচন্দ্র বৈয়াকরণ কিংবা দার্শনিক হইতেন, তাহাহইলে হয়ত তর্করত্ন মহাশয় সন্তুষ্ট হইতেন। উপন্যাসে ঘটনাবৈচিত্র্য চাই, মানবের মনোবৃত্তি নিচয় এবং সুকৃতি দুষ্কৃতি সমূহ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হওয়া চাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যদি অসম্ভব ঘটনাবলীর এবং অশান্তি উৎপাদক বিষয়সমূহের সমাবেশ থাকিত, তবে বঙ্গের ঘরে ঘরে আজ তাহা আদৃত হইত না। মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয় এইরূপ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিশদ ভাবে বিবৃত করিলে তাঁহার মনোগত প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিবার সুযোগ ঘটে।

শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল "মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরমা" নাম প্রবন্ধে মাইকেল অঙ্কিত দুইটি আদর্শ চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন। পাশা-পাশিভাবে এই দুই সতী-চরিত্র বিচার করাতে উভয়ের

মাধুর্য্য ও উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কবির উপমা সার্থক :–

"আহা মরি, সুবর্ণ দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ!"

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার তুলনায় বঙ্গভাষাতে সমালোচনামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ নাই বলিলেও চলে। এতদ্বিষয়ে সান্যাল মহাশয়ের চেষ্টা প্রশংসনীয়। তদীয় প্রবন্ধের ভাষা ও রচনাকৌশল মনোজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় "গতি ও স্থিতি" নামক প্রবন্ধে ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার আদর্শকে গতি (Progress) এবং ভারতের শেষযুগের সভ্যতার আদর্শকে স্থিতি (Conservation) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। গতি নবীনতার পরিচায়ক, স্থিতি প্রৌঢ়তার পরিচায়ক। হিন্দু, বৌদ্ধ, গ্রীক, রোমক, মিশরীয়, মুসলমান, সকলেরই একদিন নবীনতাও ছিল, গতিও ছিল, কিন্তু সবাই দর্পদম্ভ করিয়া শেষ করিয়াছেন। এখন ইউরোপ নবীনতার তেজে গতিশীল। বর্ত্তমান যুদ্ধে হয়ত যুবক ইউরোপ প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাহার আদর্শ পরিবর্ত্তন করিয়া স্থিতিশীল হইয়া উঠিবে। খৃষ্টান ইউরোপ আর পঞ্চাশ বৎসর পর স্বীয় সভ্যতার জন্য এমন দর্প করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। ইহাই আলোচ্য প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখক প্রবন্ধে চিন্তাশীলতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তদীয় "বৌদ্ধধর্ম্ম" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে এবার "মহাযান কোথা হইতে আসিল?" এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় জ্ঞাতব্য তথ্যাবলীর যে সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ করিয়া দিয়াছেন, অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের তদবলম্বনে গবেষণার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের বহুবর্ষব্যাপী গবেষণা ও গভীর জ্ঞানের রেখাসম্পাত থাকিলেও এই প্রবন্ধনিচয়ে আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। সাধারণের পাঠযোগ্য করিতে যাইয়া তিনি প্রবন্ধগুলির গৌরব হানি করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞের উপভোগ্য, তথ্যবহুল বিস্তৃত আলোচনা থাকিলে এই প্রবন্ধাবলী জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য হইত। পরে তদবলম্বনে অল্পাধিকারীগণের উপভোগ্য বহু গ্রন্থ রচিত হইতে পারিত। শাস্ত্রী মহাশয়ের বিপুল শক্তি এই লঘুকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অপব্যয়িত হইয়াছে মাত্র। তাঁহার শক্তির প্রকৃত পরিচয় এই প্রবন্ধাবলিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের "হাসির দাম" প্রভৃতি কতিপয় নবপ্রকাশিত গল্প লেখকের রুচিবিকারের পরিচায়ক। পূর্ব্বাপরসম্পর্কবিহীন, বিচ্ছিন্ন ও অসমাপ্ত বাক্যাবলী এবং দুর্ব্বোধ্য ঘন ঘন ... ... চিহ্নসমূহ এক অপূর্ব্ব হেঁয়ালী সৃষ্টি করিয়াছে। "একটা নূতন কিছু করিয়া" মৌলিকতা দেখাইবার এবং আখ্যায়িকায় অশ্লীলতার অবতারণা করিয়া সৎসাহস প্রদর্শন করিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা লেখকের মনে বড়ই বলবতী বলিয়া বোধ হইতেছে। এই নবীন লেখকের রচনাতে মধ্যে মধ্যে শক্তির বিদ্যুৎস্ফুরণ যে নাই, একথা বলা যায় না; গল্পটীতে, বিকৃত হইলেও, 'আর্টের' জ্ঞানের পরিচয়ও কিঞ্চিৎ বিদ্যমান আছে। কিন্তু, সত্যেন্দ্র বাবু পঙ্কিল পথ দিয়া বাণীমন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার নবপ্রকাশিত গল্পগুলিকে মানব মনের উচ্চ বৃত্তিসমূহের স্ফুরণ থাকিলেও বেশ্যালয় সম্পর্কিত হওয়াতে পিতা পুত্রে, ভ্রাতা ভগ্নীতে, স্বামী স্ত্রীতে একত্র পাঠের অযোগ্য। আশা করি, ভবিষ্যতে সত্যেন্দ্র বাবু বিকৃত রুচি পরিহার করিয়া শক্তির সদ্ব্যবহার করিবেন; এবং নারায়ণের মন্দিরও অপবিত্র সংস্পর্শ হইতে শুচি হইবে।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের "শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে বর্ত্তমান সংখ্যায় "ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণজিজ্ঞাসা" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি এই প্রবন্ধে যথেষ্ট সার সংগ্রহ করিতে পারিবেন। আলোচ্য প্রবন্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং সুলিখিত, এবং লেখকের ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচায়ক।

গুণগ্রাহী

VOL. 5. Nos. 7 & 8.

OCT. & NOV., 1915.

# THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,

AND

SATYENDRANATH BHADRA, M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . Rs. 5-6-0

Single Copy . . . . 0-8-0

**EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN**

But impartial verdict comes from the public and the Press

**USE**

# ORIENTAL SOAPS..

FOR

**They are the best for economy and complexion**

## THE ORIENTAL SOAP FACTORY,

***GOABAGAN, CALCUTTA.***

***Tel: "Kowpstove," Calcutta.***

---

**By Special Appointment**

## To H. E. Lord Carmichael of Skirling Governor Of Bengal.

# S. A. MAJID & Co.

## Certificated Opticians

*12 Patuatuli, Dacca.*

**OPTO—Eye. METRY—to Measure.**

## A Peculiar Nationalist and Practical Unionist.

**Prescriber of needful Tonics for the chronical Idleness of India**

**Specialist in attractive Designs, as to touch Human Feelings, to raise any National Subscription successfully.**

Professor for 10 years. in Eye-sight Testing and Spectacles Art.

Our methods of examination and tests of the EYES for the adaptation o lenses for the correction of defects of vision and relief of eyestrain and it accompanying symptoms, are based upon accurate measurements of the refracti and the associated functions of the eyes. Glasses fitted under this system are invariably found satisfactory and curative. The latest and most approved apparatus for accurate sight testing are used in our dark room. Examination by appointment preferred.

---

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca,

and

Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca

# Edwards Tonic

**The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.**

*Sole Agents*:—**B. K. PAUL & CO.,** *7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.*

B. K. PAUL & CO'S,

## Gold Sarsaparilla

A SURE AND SAFE AGENT FOR PURIFYING BLOOD. A MARVELLOUS REMEDY FOR ALL SYPHILLITIC AND MERCURIAL DISORDERS.

*PRICE-EACH PHIAL Rs. 2/8,*

BUTTO KRISTO PAUL & Co.,
CHEMISTS & DRUGGISTS,
CALCUTTA.

## Cytogen

AN IDEAL DIGESTIVE TONIC WINE
Invaluable in CONVALESCENCE from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c.,
Extremely Useful in Anaemia, Nervous Debility, Loss of Appetite, Indigestion, Acidity &c.,
INDISPENSABLE AFTER PARTURITION
Price Rs. 1-8-0 Per Bottle.

B. K. Paul & Co.,
CALCUTTA.

Branch Sovabazar Street.

Head office:—7 & 12 Bonfield's Lane Calcutta The Research Laboratory:—18 Sashi Bhuson Sarker's Lane

## অধ্যাপক শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ এম, এ প্রণীত

১। ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা ... ... ... ...
(2) Sanskrit learning in Bengal ... ... ...
(3) Pramâns of Hindu Logic ... ... ... ।০

আসাম, গৌহাটী গ্রন্থকারের বাসায় প্রাপ্তব্য।

### বহুচিত্রে শোভিত।

### প্রাইজ দেওয়ার নূতন পুস্তক।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

**১। মহরম।**

সকলজাতির নিকট সমান আদরের সেই মহরমের কাহিনী সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে
মূল্য ।৵০ আনা। ৪ খানা ছবি।

**২। প্রহ্লাদ।**

হরিভক্ত প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত সরল ভাষায় লিখিত। মূল্য ।৵০ আনা।

পপুলার লাইব্রেরী—ঢাকা।

---

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

# শক্তি ঔষধালয়

ঢাকা

চক্রবর্ত্তী বি, এ, হিন্দু কেমিষ্ট ও ফিজিসিয়ান

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট, ঢাকা।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন্ রোড্ (হাওরা পুলের নিকট)
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১নং আপার সার্কুলার রোড্ (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—
৭১।১ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—১২ দশাশ্বমেধ ঘাট।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের

অমৃতপ্রাশ ঘৃত—১০৲ সের।

ছাগলাদ্য ঘৃত—১০৲ সের।

মেধাস্মৃতি বর্দ্ধক ও ছাত্রগণের সহায়।
ব্রাহ্মীঘৃত—৮৲ সের)

দাদ্‌মার—৵০ কৌটা।
(এক দিনে দদ্রু নিশ্চয় আরোগ্য)।

দশন সংস্কারচূর্ণ—৵০ কৌটা।
(সর্ব্ববিধ দন্তরোগের মহৌষধ)।

মারচাদি মলম—৵০ কৌটা।
(খুজলী পাঁচড়ার মহৌষধ)।

বহরের ননী—॥০ শিশি।
(নালীঘা, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মহৌষধ)।

অমৃতারিষ্ট—॥০ আনা শিশি।
(ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত ও সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ)

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শাস্ত্র বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ,
হিন্দুকেমিষ্ট এবং রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার

# অক্সফোর্ড প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকাবলী।

আলেন্ কোয়াটারমেন—সুপ্রসিদ্ধ লেখক সার্ রাইডার হাগার্ড প্রণীত

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১০ ফর্ম্মা। মূল্য ৸৹ আনা।

শ্রীজলধর সেন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ—

প্রেমিক সন্ন্যাসী—( The Cloister and Hearth নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ )

সুন্দর ছাপা ও কাগজ। মূল্য ৷৹ আনা।

লেমিজেরাবল্—( প্রায় ৫০ ফর্ম্মা, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী )।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত এবং

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

( যন্ত্রস্থ )

ইউরোপীয় মহাসমর সংক্রান্ত পুস্তকাবলী—

ইউরোপের মহাসমর—( ১৫ ফর্ম্মা ডবল ক্রাউন ) ইহাতে মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত সকল বিষয়ই লিখিত আছে। টেলিগ্রাম, পত্রাদি গতিবিধি এবং অন্যান্য সমুদয় ব্রিটিশ white, বেলজীয়ম, গ্রে-বুক প্রভৃতি সরকারী নথি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। মূল্য ৸৴৹ আনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

রণভেরী—(Sir Arthur Conan Doyle) এর পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৴৹ আনা মাত্র।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অন্যান্য পুস্তক শীঘ্রই বাহির হইবে।

Oxford University Press.
London New york Melbourne Cape town.
Bombay Hornly Road. Madras Sankarram Chetty.
Agents for Vernacular Publications—
Das Gupta &c. 54/8 College Street, Calcutta.
City Library Patuatoly, Dacca.

# DHARMA SAMAVAYA LIMITED.

## A CENTRAL CO-OPERATIVE ORGANISATION FOR PROMOTING UNION FOR CREDIT, THRIFT, TRADE, INDUSTRY, AGRICULTURE, INSURANCE, SANITATION AND EDUCATION.

**Registered under the Indian Company's Act, in June, 1910**

Dividends on Shares, paid for the last three years, have been 25 per cent per annum. Dividends will be distributed quarterly for future years beginning with July, 1914.

The Memorandum of Association of the Samavaya provides for one hal of the net profits of each year being devoted to promotion of Religion Co-operation, and Economic Development of the Natural Resources.

Business transacted:—Builders, Engineers, Architects and Contractors-protectors of Cattle; Suppliers of pure and wholesome Dairy Produce; Purchase Sale and Efficient Management of Land; Establishment and Administration of Schools and Sanitariums; Housing on the Hire-purchase System; Land, Improvement on Co-operative Principles; Intensive Cultivation, Town-planning and Tenant-Co-partnership, on the Garden City and Suburb methods.

**SPECIAL NOTICE.**

Shares of DHARMA SAMAVAYA LIMITED, subscribed and paid for but between 16th April, 1914, and 31st May, 1914, will earn one-fourth of the Dividend, to be declared for our current financial year, ending 30th June, 1914. The list of Share-holders will remain closed, for the said year, during the month of June, 1914, and no sale or transfer of Shares will be transacted therein as for that year. Shares taken in June, 1914, will be sold at par value and earn full dividends from our next financial year, beginning with 1st July, 1914.

*Particulars supplied on application.*

SAMAVAYA MANSIONS,
CORPORATION PLACE, CALCUTTA.
*17th April*, 1914.

**A. C. UKIL,**
***Organiser.***

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra. Nyabazar, Dacca.

All busines communications and all complaints regarding non-delivery of he Magazine should be addressed to—

*The Manager*, "DACCA REVIEW,"

*5, Nyabazar Road, Dacca.*

*N.B.*—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among others we may mention the names of :—

His Honour Sir Charles Steuart Bayley K. C. S. I.
The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Shamshul Huda, M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A. D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. H. Sharp, C.I.E., M.A.
" Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. J. Donald, I. C. S.
" Mr. W. W. Hornell, M.A.
" Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
" Mr. L. J. Kershaw, C.I.E., I.C.S.
" F. C. French Esq., I.C.S.
" W. A. Seaton Esq., I. C. S.
" R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
" Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
" Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq., I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
G. A. Evans Esq., M.A., M. Sc., I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
Rev. Harold Bridges, B. D.
J. R. Blackwood, Esq., I.C.S.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London.)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
" Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
" Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
" J. R. Barrow, B.A.
Professor R. B. Ramsbotham M.A. (Oxon.)
" J. C. Kydd, M.A.
" W. Douglas, M.A., B. Phil. B.D.
" T. T. Williams M.A., B.Sc.
" Egerton Smith, M. A.
" G. H. Langley, M.A.
" Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.Sc.
" Debendra Prasad Ghose.
" Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Shushung.
The " Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.

Mr. Justice Digambar Chatterjee
Sir Gooroodas Banerjee, Kt., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L.L.D. C. I. E.
" Mr. N. Bonham-Carter, I.C.S.
" Mr. J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
" Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
" Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
" Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
Nawab K. Mahomed Yousuff.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esqr., I.C.S.
B. C. Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
" Sarat Chandra Das, C. I. E.
" Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
" Sures Chandra Singh
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
" Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
" Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
" Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
" Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L.
" Radha Kamal Mukerji, M.A.
" Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
" Hemendra Prosad Ghose.
" Akshoy Kumar Moitra.
" Jaladhar Sen.
, Jagadananda Roy
" Benoy Kumar Sircar.
, Gouranga Nath Banerjee.
" Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M. A., Bar-at-Law. Principal, Lahore Law College.

# CONTENTS.


| | | |
|---|---|---|
| The Site of the Battle of Delhi, 1803 ... | The Hon'ble Sir Edward Maclagan, K. C. S. I. ... | 203 |
| Colour ... ... ... ... | Dr. E. R. Watson, M. A., D. Sc. (Lond.) | 219 |
| Sikh Relics in Eastern Bengal ... ... | Sirdar Gurbuksh Singh, Supdt. of Telegraphs. ... | 224 |
| Causes of the Present War ... ... | Prof. R. B. Ramsbotham, M.A. (Oxon) | 233 |
| Echoes of the Indian Mutiny at Dacca being the leaves from the Diary of the late Mr. Brennand, Principal of the Dacca College. ... ... | ... | 224 |


# সূচী।


| বিষয় | প্রবন্ধলেখকের নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। বেলজিয়মের রাসায়ণিক শিল্প ... | অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্, এ, পি, আর, এস্ পি, এইচ্, ডি। | ২১৭ |
| ২। সমালোচক (গল্প) ... ... | শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস্- সি, ... | ২২১ |
| ৩। বিজয়া (কবিতা) ... .. | শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী ... ... | ২২৮ |
| ৪। রায় হরিচরণ শর্ম্মা বাহাদুর ... ... | শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি। | ২২৯ |
| ৫। অভাগিনী (কবিতা) ... ... | শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দে ... ... | ২৬৮ |
| ৬। লোক শিক্ষায় পুরাণ শাস্ত্র ... ... | শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ ... | ২৩৮ |
| ৭। উত্তরাপথ ভ্রমণ ... ... ... | 'ভবঘুরে' ... ... ... | ২৪১ |
| ৮। শীতারম্ভে (কবিতা) ... ... | শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ | ২৪৮ |
| ৯। কবে ঐ ... ... | শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ ... ... | ২৪৮ |
| ১০। বৈষ্ণব-পদাবলীর রস-বৈচিত্র্য ... ... | শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্, এ। ... ... | ২৪৯ |

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

# THE DACCA REVIEW.

VOL. V. OCTOBER, 1915. No.

## THE SITE OF THE BATTLE OF DELHI, 1803.*

BY SIR EDWARD MACLAGAN.

### The Question at Issue.

On the 11th September, 1803, was fought the battle which is known in Indian history as the 'Battle of Delhi.' In this engagement the Mahratta troops under the command of M. Louis Bourquien were defeated by General Lake and as a result of the action the city of Delhi and the Moghal Emperor, Shah Alum, passed under the British supremacy.

It is known that the battle was fought in the tract between the Hindan and the Jumna to the south-east of Delhi, but there has been some doubt as to the exact site on which the engagement took place. The site hitherto generally assumed is marked by an obelisk[1] near the village of Patparganj, and this spot is accepted in our present Survey Maps as the site of the engagement: but it has been contended that the battle must have been fought at or near the village of Sadarpur. From the extract from the one inch survey map it will be seen that the two places are between five and six miles apart.

The correctness of the traditional site was impugned in 1881 by Col. Helsham-Jones (then Major, R.E.) in connection with a series of lectures delivered by him at Chatham on the campaigns of Lord Lake:[2] but the question did not attract further notice until the removal of the Capital to Delhi when Colonel Helsham-Jones in March, 1913, invited the attention of

* By kind permission of the Panjab Historical Society.

1. This obelisk is clearly visible through glasses from Humayun's tomb and other places near Delhi.

2. Professional Papers of the Corps of Royal Engineers; Occasional Papers Series, Volume VIII, Paper III.

H. E. the Viceroy to the point. Enquiries were then made through the local staff of the Delhi Province and ultimately the question was handed over to the Panjab Historical Society for investigation. The Society having entrusted the matter to me, I have made what enquiries were possible on the data available, and the result af these enquiries is summarized below.[1]

## The Authorities.

Our original authorities for the account of the battle may be described under three groups, viz, (i) the contemporary despatches and reports of the Commander-in-Cnief and the Governor General, (ii) the official maps and 'route' of Lord Lake's campaign, and (iii) the accounts given in contemporary memoirs and diaries. In addition to these we may have recourse to (iv) secondary authorities and (v) local tradition.

3. Valuable help in the investigation has been received from Mr. J. P. Thompson, I.C.S., Vice-President of the Punjab Historical Society; from Mr. William Foster, C.I.E., Registrar and Superintendent of Records at the India Office; and from Mr. G. F. de Montmorency, Personal Assistant to the Chief Commissioner, Delhi. I have also had to make enquiries on various points from a number of gentlemen, including Mr. J. A. Devenish, Col. F. A. Hayden, Capt. A. H. McCleverty, the Hon. John Fortescue, Mr. W. J. Wood, C.S.I., the Ven. Archdeacon of Calcutta, Mr. J. R. Pearson, C.I.E., and Major S. M. Rice, all of whom have repiied to me with great readiness and courtesy.

### DESPATCHES AND REPORTS.

General Lake, who commanded in the action, sent a series of brief despatches to the Governor General, Lord Wellesley, on the 11th, 12th, 13th and 14th of September, 1803. These despatches were utilized, together with the other material available, in the preparation of a long history of origin and progress of the Mahratta War which was sent by the Governor General to the Court of Directors on 21st December, 1803, under the title of 'Notes relative to the late Transactions in the Mahratta Empire. In addition to these 'notes', the Governor General also sent on the 29th' December, 1803, to the Chairman of the Court of Directors a 'Detailed Narrative of Transactions in the Mahratta Empire.' Both the documents were published in a Parliamentary Paper entitled 'Bengal, also Fort St. George and Bombay, Papers presented to the House of Commons pursuant to their orders of the 7th of May last from the East India Company relative to the Mahratta War 1803. Printed by order of the House of Commons 5th—22nd June 1804.' A short account of the battle of Delhi will be found in the 'Notes' at p. 248 of the above Paper, with a marginal reference to 'Plate V.' This Plate (which gives an important sketch of the field of the action) is to be found at the conclusion of the 'Narrative' (after p. 339) and Lord Lake's despatches appear in the appendices to the 'Notes' (pp. 270 seq.). The 'Notes' were published, with the plates

as a separate book in London in 1804: and they were also published in London without the plates and without date as 'The Marquis of Wellesley's History of of the Mahratta War—Transactions of the Mahratta Empire.' They were also reprinted at the Telegraph Press, Calcutta, in 1805 by 'L. D'Mello.'

(ii) MAPS AND ROUTE.

The next first-rate authority on our subject is the map of the 'Survey of the Route of the British Army under the command of His Excellency General Lake during the Campaign of 1803—4 Surveyed by Lieut. H. C. Smyth, Corps of Engineers.' This Map is in the Map room at the India Office. To all appearances it is an original document. It is on eight sheets on a scale of 1 inch to a mile and reached the East India House probably in 1830. Between the paper and the linen on which it is mounted, can be discerned the words 'Received 1807', which is probably the year in which it was delivered to the Surveyor General in Calcutta. 'The circumstances in which it was sent home, with a number of other original maps, will be learnt', says a note kindly forwarded by the Record department of the India Office, 'from the letter from Capt. J. D. Herbert, Deputy Surveyor General, to the Secretary to the Government of Bengal in the Military Department, 29th January 1830, recorded in the Military Consultations of the same date, Nos. 151—152. In that letter Capt. Herbert wrote that it had been necessary to have a correct copy of each document made before it left his Office.' A copy is accordingly in existence now in the Surveyor General's Department. The original was evidently prepared in 1804 as 'Smith of the Engineers' was met at Agra on September 10, 1804, by Lieut. Pester (see below) who wrote in his diary—'Smith was employed in completing our route for the last campaign, having surveyed the country for that purpose.' A photozincograph reproduction on a smaller scale of that part of the map which shows Lord Lake's route between Arrah, Delhi and Faridabad is appended to Major Helsham-Jones' paper above referred to. The site of each camp is marked by a tent and a flag, and the site of the battle by crossed swords.

Along with this map must be considered a volume in the India Office detailing the route of the army, which is thus described by the Record Department: '"The route of the march of the army under the personal command of His Excellency the Right Hon'ble Lord Lake, etc:" is stated to be "compiled from the documents in the Office of the Quarter Master General." The volume in which it appears is described on the title-page as an "Abstract of General Orders and Regulations in force in the Honourable East India Company's Army on the Bengal Establishment, completed to 1st February 1812, etc. compiled and corrected, by permission

of Government, in the Public Offices at the Presidency, and revised in the Office of the Adjutant-General, Calcutta; printed by R. W. Walker, Telegraph press, Tank Square, 1812." Though not strictly an official publication, it seems to consist entirely of General Orders and Regulations, and the "Route" may be accepted as of official origin, as it claims to be.'

Important evidence is also obtained from a map preserved in the Survey Office of the Government of India which is entitled "Portion of the Eastern Purgunnah of the Dihlee District and portion of Purgunnah Dadree of the Boolundshuhur District, 1828-32." The map (2 inches to the mile) is an original drawing which has never been printed, but it is of great value as showing the state of the tract in 1828-32 and as marking definitely the site of the battle and of three tombs of officers killed at the battle.

(iii) MEMOIRS AND DIARIES.

Of the contemporary memoirs and diaries the most valuable is that of Lieut. Pester of the 1st Battalion, 2nd N. I., who was personally engaged in the battle and wrote a daily diary. The diary was published by Mr. J. A. Devenish in 1913 under the title of 'War and Sport in India, 1802-06', and the battle is described in Chapter XV (pp. 164-180).

The action is briefly referred to in the 'Military Memoirs of James Skinner' (vol I, pp. 275-6), a work compiled by J. B. Fraser from autobiographical records left by Colonel Skinner. It is also described on pp. 135-9 of a 'Mémoire relatif à divers événements qui ont eu lieu au Bengale et dans l'Inde', included in vol. VI of the 'Mèmoirer de Tous' published at Paris (Alphonse Levasseur et Cie.) in 1837 which is said by the editor to have been written by him on the verbal and documentary information furnished him by 'M. Bourquin' (the incompetent Commander opposed to Lake) on his return from India at Hamburg where the editor was Consul. A further description is given in a manuscript Memoir, without date,[1] signed by the same Louis Bourquien, which is in the possession of Mr. J. P. Thompson, C. S. Neither of these records by Bourquien gives any serious assistance towards the solution of the question dealt with in this paper.

There is also a valuable anonymous diary in the India Office Library which was purchased by the authorities in 1899. 'This document,' says the Record Department, 'which is, without doubt, strictly contemporary, covers the period from 15th August to 25th September 1803; it bears no name, but from a

1. From a reference at the end of the memoir to 'the hero who is governing France so gloriously,' the memoir would appear to have been written at any rate before 1815. The language employed in the two memoirs is in many places identical and they are evidently based on the same notes.

"route" which is written by the same hand, at the end of the book, it is evidently the work of an officer who accompanied the detachment under General Ware that joined Lord Lake on 25th August at the Secundra, which is between Etah and Aligarh.'

A further publication, apparently of of a contemporary character, is 'A Sketch of the rise, progress and termination of the Regular Corps formed and commanded by Europeans in the services of the Native Princes of India with details of the Principal Events and Actions of the late Mahratta War, by Lewis Ferdinand Smith, late Major in Dowlat Rao Scindea's service...Calcutta printed by J. Greenway, Hurkara Press,' on page 35 of which a brief account of the battle of Delhi is given.

(IV) SECONDARY AUTHORITIES.

Beyond the above I have found no first-hand authorities for the battle. It is described at some length, however, on pp. 110-123 of the 'Memoir on the War in India' by Major William Thorn, 21st Light Dragoons, which was published in 1818. This book was based largely on the official reports, and it produces the plan published with Lord Wellesley's 'Notes.'

Thorn's account is followed pretty closely by Col. F. A. Hayden in his 'Historical Review of the 76th Hindustan Regiment—now the 2nd Battalion, Duke of Wellington's Regiment', pp. 27-31. This regimental history gives as one of its authorities a manuscrip account of the regiment written by Paymaster Kennedy in 1831, but this manuscript, which I have been permitted by the courtesy of the present Commandant to peruse, contains no information regarding the battle that is not, already in Lord Wellesley's note or in Thorn's Memoir. Accounts of the action are also given in Grant Duff's 'History of the Mahrattas' (1826 Edn, of 1912, iii, 251); in Col. Hugh Pearse's Life and Military Services, of Viscount Lake' (1908, p. 186); in Herbert Compton's 'Military Adventures of Hindustan, 1784-1803' (1892, pp, 310-12); in Stubbs' 'History of the Bengal Artillery' (1877, Vol. I, pp. 214-15); in Fortescue's 'History of the British Army' (1910 etc., Vol. V, p. 53) and in other historical works. The last-quoted work also contains a plan of the battle which differs from the others available in definitely showing a disposition of troops in the immediate neighbourhood of Patparganj, but I have ascertained from Mr. Fortescue that the map followed by him in the preparation of this plan is the sketch forwarded by Lord Wellesley in 1803, and not any independent authority. There is also the account given by Col. Helsham-Jones in a note appended to the series of lectures above referred to: and there are references to the battle in the official gazetteers (N.-W.P. Gazetteer, 1876, Vol. III, Part II, p. 419; District Gazetteer of U.P., 1914, Vol. IV, Meerut, pp. 290-1, Vol. V, Balandshahr, p. 287)

and in Mr. E. A. H. Blunt's 'Christian Tombs and Monuments in the United Provinces' (pp. 13-14).

(v) VERNACULAR AUTHORITIES. AND LOCAL TRADITION.

From such enquiries as I have been able to make, there appears to be nothing in any of the vernacular histories which throws any light on the question of the site of the action; nor is there any strong local tradition.[1] Such tradition as there is will be referred to later on in this paper.

## The Information given by the Authorities

Such being the authorities, I may note shortly the data which they provide for the disposal of the question in dispute.

(i) THE REPORTS AND DESPATCHES.

The outline of the action of September 11th, 1803, as described by Lord Wellesley, is very briefly as follows:—The British forces marching from Aligarh to Delhi were at Sikandrabad on the 9th September and made 'a short march' to the westward on the 10th. On the 11th they made 'a march of 18 miles beyond Soorajepoor,' and reached the ground of encampment 'near the Jehna' [Hindan] 'Nullah (about six miles from Delhi), at eleven o'clock. The Commander-in-Chief proceeding with the Cavalry to reconnoitre found the enemy 'drawn up on rising ground in order of battle.' 'Their position was strong, each flank being covered by a swamp, beyond which was posted the cavalry. Their numerous artillery covered their front which was further protected by a line of intrenchments; their front was the only direction in which the enemy could be attacked.' The infantry were then called up, but in spite of their alacrity 'one hour elapsed before the infantry could join the cavalry which had advanced about two miles in front.' The cavalry then pretended to retreat and the enemy followed them up. The cavalry having opened from the centre, the infantry advanced in line on the enemy and routed them in every direction. The line then broke into columns of companies allowing the cavalry in its turn to pass to the front with the galloper guns and to complete the victory by pursuing the enemy to the bank of the Jumna and driving vast numbers into the middle of the river.' The whole of the enemy's artillery was captured and 'many tumbrils and ammunition carriages were left by them in the Jumna and in the Jehnah Nullah.' 'After the action,' it is stated, 'the army took up fresh ground nearer the river.' 'The battle,' continues Lord Wellesley, 'was fought within view of the minarets of Delhi, and the whole army encamped the next day close to the Jumna opposite to that city.' On

1 Capt. Leopold von Orlich (1843), Prinz Waldemar (1845) and Capt. Humbley (1846) travelled through the site of the battle, but make no reference to it in their accounts of their travels.

the 14th of September 'the Army began to cross the Jumna.'

The despatches of Lord Lake do not give any topographical details, all that we learn from them being that the march of the 11th was one of 'upwards of 18 miles.' The despatch of the evening of the 11th is issued from 'Head Quarters Camp opposite Delhi,' that of the 12th from 'Delhi Ghaut', and that of the 13th from 'Camp near Delhi Ghaut.'

The plan which accompanies Lord Wellesley's report is of considerable importance owing to the fact that it was published immediately after the battle, and having been reproduced by Thorn in his Memoir of 1828 it has formed the basis of all subsequent detailed accounts of the engagement.[1] It gives an excellent idea of the disposition of the forces and it shows the position of the Jumna, the Hindan, the 'old Fort of Delhi' and the several villages and forts on and adjoining the field of battle. But unfortunately it is a mere sketch not drawn to scale, and no names are given for any of the villages or forts. The only indications by which identifications may be attempted are (*a*) that the village at the British left front during the action is stated in the 'Explanations' to be a village with a cornfield surrounded by a high wall and a deep ditch to the right of it, and (*b*) that the village further north opposite the British centre had a well lying to the immediate south of it.

(ii) MAPS AND ROUTES.

The map prepared by Lieut. Smyth, on the other hand, is much more valuable as the names of the villages are marked as well as the site of the action, and the sites of the camps before and after the action on the 11th and the camp on the 12th. Smyth's map is also of value in showing that so far as the area under consideration is concerned the Jumna and Hindan rivers were in much the same situation in 1803 as now. The Hindan river divides below Ghaziabad into two branches, the Hindan proper and the Bhuriya (or Burhia), both of which are shown by name in Smyth's map. The villages of Geja and Bhangel are shown to have lain then, as now, on the immediate west of the Hindan proper.

Now the camp of the 11th before the action as shown in Lieut. Smyth's map is by the modern survey map 1 mile west of the Hindan and 20 miles from Sikandrabad; the site of the action is 2 miles, and that of the camp after the action 3 miles, further to the north. And the distance in a straight line between the camps of 11th and the 12th is 4½ miles, the latter camp being a little more than a mile north-east of

1 The plan is reproduced also in Stubbs' History of the Bengal Artillery and in Sidney Owen's Selections from Lord Wellesley's Despatches. The plan will be found in MS. in the copy of the Note presented by Lord Wellesley to King George III, which is in the British Museum.

Patparganj. Turning to the "Route" of the 8th to the 13th detailed as published in 1812 we find the marches follows :—

| *Dates.* | | *Names of places.* | *Distances.* | | *Remarks.* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1803. | | | Miles. | Furs. | " |
| September | 8 | Koorjah ... ... | 15 | 7 | |
| Do. | 9 | Near Secundra ... | 16 | ... | |
| Do. | 10 | Beyond Secundra ... | 4 | 6 | |
| Do. | 11 | Near the Hindan Nullah | 18 | 3 | ( Engaged and defeated the enemy). |
| Do. | 12 | (No place named) ... | 3 | 4 | |
| Do. | 13 | Putpurgunge ... | 2 | 4 | ( Corssed the Jumna to Delhi where halted until 24th September). |

If we put the camp of the 10th at 2½ miles west of Sikandrabad, this brings the first camp of the 11th to the place shown in Smyth's map. The distance between two camps on the 11th also agrees fairly closely with that map, and although the distance between the camps of the 12th and 13th is put in the route at 2½ miles as against 4½, as indicated by the map, the statement that the camp of the 13th was at Patparganj approximates closely to the information given in the map.

The map of 1828-32 referred to above is in partial conformity with these dates. About a quarter of a mile to the N.E. of the village of Chhalera are written in the map the words 'Battle of Dihlee Sept. 1803,' and this site being only about half a mile to the N.W. of that marked in Smyth's map may be said to be in substantial agreement with that map. In addition to this site the map of 1828-32 shows the two tombs entered in the general map attached to this paper, viz. that N.W. of Chhalera and that to the west of Dalupura. No names are attached and the tombs are simply described as 'Tomb of Officers Killed in Battle of Dihlee.' It also shows a further tomb at the site of the Obelisk near Patparganj and this is marked : 'Tomb of Officers Killed in Battle of Dihlee, called Gunj-Shuheed.' The map also shows that the Ghat known as Patpar Ghat was that lying between Shakarpur Khas and the City.[1]

(iii) CONTEMPORARY MEMOIRS AND DIARIES.

Turning now to the contemporary diaries and memoirs we find a good deal

1 The village of Patparganj appears in Twining's Journal of 8th Dec. 1794 as Bhirputpore (Travels in India, p. 265).

of information given in the diary of Lieut. Pester who appears at the time to have been Quarter Master of the 4th Brigade and of the 2nd Native Infantry. According to his diary the encampment on September 10th was 'about two miles on the Delhi side of Secundra.' Here news was received which led to the anticipation of an action on the morrow or the next day and Lieut. Pester adds 'we drank an extra bottle of claret upon this intelligence.' On the 11th he started at 2 in the morning with the Quarter Master General and 'soon after daybreak' obtained information that the enemy was within 5 miles. Proceeding onwards, he commenced 'at sunrise' to mark out the ground of encampment, and 'at this period,' he says, 'we did not know that the enemy's line was within a mile and a half of us.' He then describes the commencement of the action, and states that 'a village on an eminence was immediately in front of our wing' (that is, the left wing of the army) which was cleared by the Brigade (the 4th Brigade which seems in itself to have constituted the left wing) moving outside and apparently to the west of the village. The troops then closed with the enemy, and Lieut. Pester adds, 'Our troops, after marching 18 miles, and being so long in action were, of course, much worn and fatigued.' The cavalry then advanced. Part of the left wing was left to guard the captured guns and part advanced in support of the cavalry. 'We drove the enemy,' he says, into the Jumna, and hundreds of them were destroyed in endeavouring to cross it. The Flying Artillery was up, and the river appeared boiling by the fire of grape kept up on those of the enemy who had taken to the river.' When this was over they faced about, and returned to the field of battle to collect the wounded. In the meantime the Artillery which had been left in rear had 'advanced to a rising ground.' After halting about two hours and collecting the wounded, Lieut. Pester's Battalion again moved 'towards the Jumna in a more northerly direction.' About 10 o'clock p. m. the Colonel ordered him to march two companies to the General Hospital tents. Having done this and returned he received at 12 o'clock orders from the Head Quarters directing the left wing to halt in the morning to bury the officers who fell in the action. On the margin of the manuscript of the diary for the greater part of this day is written 'Field of Battle, Delhi' and the marginal note on the last few lines of the day's diary is is 'Camp near the Field of Battle after the Action.' On the morning of the 12th, the right wing marched 'and encamped about three miles in front.' The left wing received orders to march at 3 in the afternoon after they had buried as many of the dead as could be found, including Lieut. Hill and Lieut. Preston. The diary for September 12th is dated as before from 'Camp near the Field of Battle after the Action' and as there is no mention of a further march

on the succeeding day the 13th, the diary for which is dated from 'Grand Army, Camp, Banks of the Jumnah,' it seems likely that this latter was the Camp reached on the 12th. On the 14th and 15th the diary is dated from 'Grand Army, Camp near Putper Gunge on the Banks of the Jumnah' which possibly represents the same site.[1] On the 14th 'the third Brigade crossed the Jumnah.'[2] 'The enemy,' says Lieut. Pester, 'in their precipitate retreat, of course, had not time to destroy the platform boats on which they crossed their own troops and artillery, and much time saved was the consequence to us. It proved a most fortunate circumstance to our Army, the enemy crossing the Jumna to engage us. The river was at no part fordable, nor was it likely to be so for some months to come; they had secured every boat, and how we were to have crossed under cannonade they could have opposed to us I know not.' On the 15th the Commander-in-Chief with the 1st Brigade crossed the Jumna. On the 16th Lieut. Pester rode into the fort. The princes of the Royal Family in the fort had, he says, 'witnessed the defeat of the enemy from the walls, and saw us cutting them up on the banks of the river which lies immediately under the fort of Delhi.' On the 18th his own brigade (the 4th) crossed the Jumna, and he entered the fort where he was received by some of the Princes. 'They paid us,' he writes, 'numerous compliments on our recent victory, and pointed out to us the bastion from which they beheld the battle, and witnessed the defeat of the enemy.' On the 20th the 1st Battalion, 2nd N. I. (Pester's regiment) crossed the river, the 2nd Battalion beng left on the far side until the Hospital crossed on the 23rd. The Chapter concludes with the characteristic confession :—'We passed a very jolly evening, and we were all of us rather high before we broke up.'

The anonymous diary in the India Office referred to above has less details, but is clear in its indications as to the site of the battle. On the 11th., says the diarist, the the Army 'made a very long march, and crossed a nullah at the end of it called Jinna (fordable).' The position of the enemy is then described as being a very strong one. 'Their flanks were protected by villages in which were guns also, and along their line were several more villages, all defended with guns.' At 1 o' clock the line advanced and defeated the enemy after which the cavalry immediately dashed forward and pursued the fugitives 'who fled in all directions.' 'They were followed by the cavalry to the banks of the Jumna into which they threw themselves and were most either killed or

1 The chapter of the diary as published is headed 'Battle of Delhi (Putper Gunge),' but this does not occur in the original. On the other hand the original manuscript dates the diaries for the 16th and 18th from Patparganj.

2 The 1st and 3rd Brigades appear to have formed the right wing, and the 4th Brigade the left wing.

drowned.' 'The place of our first encampment,' he adds, 'was moved two coss further on and our tents pitched at a place called Sadarpour.'

The notice of the battle in Skinner's Memoir is unfortunately very brief, but like the anonymous diarist above quoted Col. Skinner gives a clear indication of the site of the action. The Mahratta force he says 'came up with Lord Lake on the 9th. of September at Suddur ka Serai, and so badly off for information were the British troops that the sepoys were cooking their dinner on the banks of the Hindan river, when they perceived a large body of Bourquien's cavalry coming up. These were beaten on the 10th,[1] but the plan and circumstances of the battle of Dehlee are so well known that I need not describe it. About 2,000 men made good their retreat to Tupple and crossed the Jumna, carrying off four pieces of cannon, the rest were all cut up by the British Cavalay.'

In Lord Wellesley's map part of the enemy are shown as escaping from the battlefield by passing in a southerly direction to the left of the British troops in a line which would lead to the town of Tappal in the Aligarh district, and it is these to which Skinner refers. To this movement of the right wing of his army Bourquien, in the memoirs above alluded to, ascribes the defeat of the Mahratta forces, and in his account of of the action he gives a pathetic descripton of his futile endeavours to bring his right wing to support his left. He gives no very detailed indication of the topography of the battle but he clearly shows that the action was fought in the immediate proximity of a 'petite riviere,' that is to say of the Hindan. He was under the impression that the British forces had at first encamped on the south of the Hindan and that his preliminary pursuit of the cavalry had extended up to that river, but although mistaken on these points he may certainly be accepted as a witness of the fact that the battle took place near the Hindan and not in the neighbourhood of Patparganj.

From Major Lewis Ferdinand Smith we have no indications of the site of the battle beyond the statements that Bourquien on the 9th. September, had moved two brigades 'down to Putperghaut and began to cross the Jumna' and that the British army was met with after it had undergone 'a fatiguing march of eighteen miles.'

### (IV) SECONDARY AUTHORITIES.

The battle was a fine example of drill and courage and there are some excellent accounts of it among the secondary authorities quoted above. But there is little or nothing in any of the authorites (other than Col. Helsham-Jones) to show that they had consulted any source of original information other than Lord

---

1 Skinner is, of course, mistaken in these dates. He was not at the battle himself.

Wellesley's note and the plan accompanying it. It is however stated in Col. Hayden's Regimental History of the 76th. Regiment that the second camp on the 11th September was 3 miles from the first, a fact not stated by Lord Wellesley. Col. Pearse says that the morning camp of the 11th. was about a mile beyond the Hindan, and Stubbs states that when the British force arrived at their ground 'the enemy was seen in front near the village of Patparganj between the river Jumna and its confluent, the Hindan. The Meerut Gazetteers of 1876 and 1904 have, as noted below, assumed the correctness of the Patparganj site, while the Bulandshahr Gazetteer of 1904 states that Sarai Sadr was the site of the battle.

(V) LOCAL TRADITION.

Local tradition is not very definite and somewhat conflicting. Some of the villagers are aware that a fight occurred between the English and the French, the latter being variously represented as under Louis Sahib (Bourquien) or under Piru Sahib (Perron). A mark is shown inside the southern gate of Sarai Sadr which is said to be that of a cannon ball, but it is apparently the accepted view that the battle of 1803 was fought north of Chhalera and not at Sarai Sadar. From one old man at Chhalera it was ascertained that the battle was to the north of Chhalera where the solitary European grave lies, aad there is an old brick-kiln immediately to the east of Chhalera on which the English are said to have placed a gun during the battle. So far therefore at it goes we may say that local tradition supports the site shown in the Survey map of 1828-32.

## Conclusion.

It will be seen from the above summary that there is really very little to be said in favour of the northern or Patparganj site. The two chief indications of a site in the direction of Patparganj are (*a*) Lord Wellesley's statement that the army on the 11th. marched '18 miles beyond Soorajpoor', and encamped 'about six miles from Delhi', and (*b*) the statements made by Lord Wellesley and Lieut. Pester that the battle was fought 'within view of the minarets of Delhi' and was witnessed from a bastion in the Delhi Fort. Surajpur is about 31 miles from Khurja and therefore (if we follow the 'Route of 1812) some 10½ miles beyond the camp of the 10th so that a march on the 11th of 18 miles beyond Surajpur would mean a total march of 28 to 29 miles, and this would land the army not merely at Patparganj but some

1 The distances are approximately as follows, viz :—Khurja to Sikandrabad, 17½ miles ; Sikandrabad to Surajpur, 13½ milse ; Surajpur to the Hindan, 5¾ ; the Hindan to Sarai Sadr, 2½ ; Sarai Sadr to Sadarpnr, ¾ ; Sadarpur to Chhalera, ½ ; Chhalera to Patparganj, 5 ; Patparganj to the river, 3 ; the river to Delhi, 1.

3 or 4 miles beyond it.[1] What has doubtless happened is that a comma has been omitted after the words '18 miles' and that the sentence merely means that the march was one of 18 miles and that it went beyond Surajpur. Then again the fact that the battle could be seen from Delhi, though doubtless more easily understood when dealing with Patparganj which is only 4 miles from the fort than with Sadarput which is about 10 miles distant, is not inconsistent with the assumption that the battle was fought in the neighbourhood of Sadarpur. Where the view is not obstructed by trees or buildings, the Jama Masjid is quite visible from the ground near Chhalera even at times of the year less clear than the rainy season, and it is quite possible that smoke of the guns at Chhalera would be seen from Delhi, while the flight of the troops past Patparganj and over the ghat must have been clearly visible. Lord Wellesley's remark that the camp before the battle was six miles from Delhi must be treated as a mistake, and it is easy to understand how he and other contemporary writers must have been subjected by considerations of sentiment to the temptation of assigning the battle to a site as near to the Imperial City as possible.

The evidence in favour of a site near Sadarpur or Chhalera is indeed indisputable. Even the Governor General's account of the engagement makes it clear that the battle was fought some two miles from the morning camp and that the morning camp was on the Hindan. Smyth's map prepared under official orders during the ensuing cold weather makes the site of the battle near Sadarpur and shows the position of the camps on the 11th and 12th in a manner inconsistent with the suggested site at Patparganj. The 'Route' published in 1812 confirms the sites assigned by Smyth to the camps and the Survey Map of 1828-32 places the site of the battle near Chhalera in the immediate neighbourhood of Sadarpur. Lieut. Pester's narrative corroborates the length of the march (18 miles) to the morning camp of the 11th, the distance (1½ miles) from that camp to the enemy, the northerly move to the evening camp, and the move on to the neighbourhood of Patparganj on the 12th. The anonymous diary at the India Office makes it clear that the morning camp immediately adjoined the Hindan and adds that after the engagement it was moved on two kos to (and this can fairly be taken to mean 'to the neighbourhood of') Sadarpur. Skinner again assigns the action to the village of Sarai, Sadr immediately south of Sadarpur. Bourquien attests that the battle was near the Hindan, and such local tradition as exists connects the fight with the neighbourhood of Sarai Sadr and Chhalera, and not with Patparganj. There can therefore be no doubt whatever that that the actual engagement took place near Sadarpur and Chhalera, and not further north.

This being so, the identification of the villages marked in Lord Wellesley's plan is no longer a matter of primary importance. But it may be allowable to suggest that the village with the square enclosure to the left front of the original British line is either Sarai Sadr or Sadarpur; that the villages immediately north of this are Chhalera and Agahpur (the latter still has an old and large well adjoining it); and that the large village to the north-east is Baraula. The 'Mud Forts' have disappeared and are unknown even to tradition, but the fort on the Hindan may probably be identified with the village of Bhangel. If these suggestions are accepted the northern part of the plan has evidently been very much 'foreshortened' and there is some mistake in the relative positions of the 'Ghat' and the 'Old Fort of Delhi' (by which presumably is meant Purana Killa, which forms a very prominent object in the landscape from the east side of the Jumna). The plan would appear to indicate that the British Infantry were drawn up first in a position immediately south of Sarai Sadr or Sadarpur. These villages lie on rising ground (scarcely high enough to merit its description in Lieut. Pester's words as an 'eminence,' but still sufficiently marked to merit notice) and one or other of these was doubtless the village which was cleared by the left wing.[1] The low ground on either side towards the Jumna and the Hindan would doubtless in September have been correctly described as 'swamp.' The enemy would then have been engaged to the south of Chhalera and Agahpur and the Britsh Infantry after the action would have stood partly to the west of Chhalera and partly to the east between that village and Agahpur, while the Cavalry pursued the enemy towards the river and towards Patparganj. This precise reconstruction of the battle can only be regarded however as tentative, and all we can say definitely is that the enemy was engaged by the British troops near Chhalera and Sadarpur.

The impression that the battle was fought near Patparganj is probably due partly to the fact that the troops encamped near that village for some days after the engagement and partly to the existence near Patparganj of the monument erected in memory of men who fell in the battle. Although I have consulted the records available in the United Provinces Secretariat (those in the Executive Engineer's office at Meerut are said to have been destroyed) I have been unable to ascertain when this monument was erected or what inscription it originally bore. The fact that the inscription

1. Col. Helsham-Junes in his paper suggests that the village with the square enclosure shown in Lord Wellesley's plan was Sarai Sadar, which is built in and round an old square masonry sarai, and this may be so, but from the 'explanation' the enclosure would appear to have been merely a field with a wall round it and not necessarily of a permanent character.

on the monument is not included in the comprehensive 'Bengal Obituary' published in 1848 raises a presumption, but only a presumption, that the monument had not then been erected or if erected did not bear any inscription. Col. Helsham-Jones, writing in 1881 on information acquired dnring his residence at Okhla in 1869-72, speaks of the monument as then in existence and says that it had 'an inscription to the effect that it marks the field of battle', but we have no copy of this inscription now extant. The Meerut Gazetteer of 1876 in describing Patparganj says: 'About three quarters of a mile from the village site is the spot, marked out by a surrounding ditch, where in 1803 the battle of Delhi was won by Lord Lake against the Mahrattas, commanded by Bourquien, a French adventurer. There is a monument on the spot to the memory of Colonel' (sc. Cornet) 'Sanguine and others who fell.' This information is repeated in the Meerut Gazetteer of 1904, but no further authority is given to connect the monument with the site of the battle. The monument was repaired and the present inscription inserted in 1898 under the following circumstances. In the course of the year 1897 a list of Christian Tombs and Monuments was sent for record to Mr. Radice, the Collector of Meerut, and he pointed out that this monument was omitted. His report at the same time showed that the monument was in considerable disrepair and that the inscription had for a long time past been missing. The Archaeological Surveyor, Dr. Fuhrer, was consulted, and he supplied from Major Thorn's book a list of the officers killed at the battle, and suggested the adoption of the following inscription :—

"Sacred to the memory of the undermentioned gallant officers :—

Major Middleton, 3rd. Regiment, Native Cavalry ;

Capt. McGregor, Persian Interpreter:

Lieut. Hill, 2nd Battalion, 12th. Native Infantry.

Lieut. Preston, 2nd Battalion, 15th Native Infantry ;

Cornet Sanguine, 27th. Dragroons ;

Quarter Master Richardson, 27th Dragoons ;

"and of the brave soldiers who fell in the exemplary exertion of deliberate valour and disciplined spirit at the battle of Delhi, fought on the 11th September 1803, by the Grand Army under the command of His Excellency General Gerard Lake and a Division of Monsieur Perron's troops under the command of Monsieur Louis Bourquien.

"The names of these brave men will be commemorated with the glorious events of the day on which they fell, and will be honoured and revered, while the fame of that signal victory shall endure."

After further enquiry from Dr. Fuhrer regarding the source of his information, it was decided by the Officiating Lieutenant Governor Sir J. D. LaTouche in May 1898 that the inscription should take its present form, and the repairs

were completed in the following year. The inscription now runs :—

'Sacred to the memory of the under-mentioned gallant officers.

Major Middleton 3rd Regiment Native Cavalry.

Capt. McGregor Persian Interpreter.

Lieut. Hill 2nd Battalion 12th Native Infantry.

Lieut. Preston 2nd Battalion 15th Native Infantry.

Cornet Sanguine 27th Dragoons,

Quarter Master Richardson 27th Dragoons.

The following extract from the orders of the Government of India refers to the action in which they fell.

'The Governor General in Council sincerely laments the loss of Major Middleton, Captain McGregor, Lieutenant Hill, Lieutenant Preston, Cornet Sanguine, Quarter Master Richardson and of the brave soldiers who fell in the exemplary exertion of deliberate valour and disciplined spirit at the battle of of Delhi. The names of these brave men will be commemorated with the glorious events of the day on which they fell and will be honored and revered, while the fame of that signal victory shall endure.'

This monument was repaired and the tablet which had disappeared was replaced by order of the Lieutenant-Governor, of the North-Western Provinces, 1898. The battle was fought on the 11th September 1803."[1]

It will be seen that the monument was, so far as we can judge, originally erected in memory of 'Cornet Sanguine and others' and the present inscription, though it reproduces the 'names of all the officers who died on the occasion of battle, does not explicitly state that the battle was fought on the site of the monument. As a matter of fact there are two tombs apart from the monument which doubtless represent, as stated by the Survey Map of 1828--32, the resting places of officers killed in the battle. These tombs are plastered brick structures some 6 feet by 4, and rising to a height of 5 or 6 feet above a rectangular base, some 11 feet long by 4 feet wide. They have sloping plastered roofs and their long dimension is orientated at nearly E. and W., with a tendency to N.-E. and S.-W. They are at present in great disrepair but they have both been recently notified as Protected Monuments at the instance of Messrs. Pearson and Humphries, the Collectors

---

1 As pointed out by Mr. Blunt on pp. 13-14 of the list of 'Christian Tombs and Monuments in the United Provinces,' Lt. Preston belonged to the 15th not 13th N. I. : the other inaccuracies to which he draws attention do not however find a place in the inscription on the monument. The Government orders quoted are on p. 273 of the Bengal papers. They go on to say that a monument would be erected at Fort William to the memory of the officers and men (European and Native) who had fallen during the campaign but the Ven. Archdeacon Firminger, from whom I have made enquiries. informs me that he has, been unable to trace any such monument in Calcutta. Sanguine and Middleton died of sunstroke, the rest were killed.

of Meerut and Bulandshahr respectively. The tomb to the north near the obelisk is apparently not mentioned except in the map of 1828--32, but it must represent the burial place of some officer who died in, or whose body was conveyed to, the camp of the 12th September. The tomb to the south near Chhalera is referred to in the Bulandshahr Gazetteer of 1904 and from its position it is not unlikely that it covers the grave of the two officers—Lieuts. Hill and Preston—who were buried by Lieut. Pester on the morning of the 12th September. The battalions to which these officers belonged, viz. the 2nd Battalion of the 12th Regiment and the 2nd Battalion of the 25th Regiment, were on the left of the right wing during the action and would thus be engaged not far from the site of the tomb. Six officers in all lost their lives, and it may well be that the monument in the form of an obelisk near Patparganj covers the bodies of these (including Cornet Sanguine) and the name given to the site in the Survey Map of 1828-32, viz. 'Gunj-Shuheed' or 'Martyrs' enclosure,' encourages the supposition that the spot may have been utilized for the burial not of officers only but also of men. The spot must have been selected however owing to its being in convenient proximity to the camp of September 12, and not as representing the site of the engagement.

The conclusion of the investigation therefore is that Col. Helsham-Jones is perfectly correct in his contention that the battle was not fought at Patparganj. There can be no doubt that the place at which the two forces first became engaged was in the immediate neighbourhood of Sadarpur and Chhalera, some 5 or 6 miles to the south of Patparganj; and there seems to be no reason why we should not accept the position shown in Smyth's map between Sadarpur and Agahpur as representing the site of the engagement. If it were ever proposed to erect a monument to commemorate the battle, an excellent position for such a monument would be at the top of the mound which is situated a few hundred yards east of Chhalera, and which commands a fine view of the surrounding area.

## COLOUR.

It is not necessary for me to explain what is meant by colour. By the sense of sight we can to a large extent tell the shape of various objects and also their colour. If I say that the sky is blue, the grass is green and blood is red, you will all agree with me and understaud what I mean. Also if I say that I have here a piece of red cloth you will all have a very good idea of what the cloth is like even without looking at it.

It should be remembered however that the names for colours are conventional. I believe that Homer talks about purple horses. Now we have never seen purple horses and it is not probable that purple horses existed in Ancient Greece either. In fact by means of painted Greek vases it has been proved that these purple horses were quite an ordinary colour. We find the same thing at the present day. The ordinary Indian servant talks about red horses and red dogs, whilst to us brown would seem a more suitable adjective to describe the colour of those animals. I have found students who called green blue or blue green indiscriminately, and in the Welsh language the same adjective in used to describel the colour of the sky and the colour of grass. These cases, however, are al due to careless observation or nomenclature. Once the nomenclature has been well established practically every one will agree about the colour of various objects.

There is a limited class of people who are colour-blind and cannot distinguish between red and green. Dalton, the famous chemist who put the atomic theory on a sound modern basis, was colour-blind and it is recorded how, the day after he received the honorary Doctor's degree at Oxford, he was seen taking a stroll in his scarlet robes having mistaken them for a much more sombre cloak in which he was accustomed to walk abroad.

## Colour changed by altering the illuminant.

But although the colours of things seem definite enough and practically every one will agree that one object is white, another blue, another red and so on, yet there is an elusiveness about colour and on occasion colourless things may become coloured and coloured things may change their colour.

It is perhaps a truism to point out that every thing becomes black in the dark. Without light nothing has any colour. It is also well-known to artists that pigments look different in different lights. If you paint a landscape by lamp-light the trees are likely to look blue next morning when you examine your picture in daylight.

*Experiment 1.* A picture was exhibited in sodium-light and appeared black and white. The ordinay electric light was then turned on when the picture was seen to be brightly coloured with all the colours of the rainbow.

## Colour can be obtained from objects which are generally colourless.

It is also in the experience of everyone that some natural objects which are generally colourless or white may on occasion become coloured e. g. the setting sun, rainbows, halos round the sun &c are all produced by sunlight, water drops and dust particles. Probably everyone has noticed at some time or other the brilliant colours which can be obtained when the sun shines on a

cut-glass stopper or on a bottle or decanter. In this way we obtain what is called a *spectrum*.

*Experiment 2.* A spectrum was thrown on the screen. The spectrum was obtained by reflecting a strong beam of light from an arc-lamp at a surface ruled with very fine parallel lines a *diffraction* grating. It will be noticed that the colours are arranged in this spectrum in the same order as in the rainbow which is a natural spectrum obtained by reflection of light from rain-drops.

Probably all of you have also noticed the beautiful play of colours which is sometimes obtained when a little oil is poured on to water, although neither the oil nor the water is coloured. Again beautiful colours are seen on the surface of soap-bubbles.

*Experiment 3.* A strong beam of light from an arc lamp was thrown on to a soap-bubble and the light reflected from the back surface of the bubble was allowed to fall on a white screen which exhibited a changing pattern in beautiful shades of red, green and purple.

Beautiful colours can be obtained from colourless crystals when they are put in a beam of light which has become what is called *polarised* by reflection at a certain angle from glass plates. In order to bring out the colour, the light must pass through another similar arrangement, called the analyser, after it has passed through the crystal. In this way beautiful coloured patterns are obtained and the geometric designs make a very fascinating study. But at present I only want to show you that colours can be produced in this way.

*Experiment 4.* A strong beam of light from an arc-lamp was passed through a polariser and analyser and thrown on to a screen, forming a white disc of light. Slices of quartz and mica were then interposed between the polariser and analyser when beautiful coloured patterns appeared on the screen, when a substance which will not burn, such as iron or platinum or lime is heated it gradually becomes self-luminous and gives out light. When it is very hot the light given out is white, but at lower temperatures it is red, orange or yellow.

*Experiment 5,*—A platinum crucible was heated by a blow-pipe flame and became first red-hot, then the colour changed through orange and yellow until eventually the crucible was white-hot.

*Coloured objects are those which absorb some particular colour from white light.*

All these phenomena of objects of changing colour and colourless objects becoming coloured can all be explained by one verv simple theory *viz*, that what we call white light is really a mixture of different colours *viz*, red, orange, yellow, green, violet and blue. The colours of rainbows, soap-bubbles etc., are due to a separation of the different constituents of white light which takes place when the light is reflected or refracted under certain conditions.

What we may call ordinary coloured objects, *i,e*, objects which are coloured under all ordinary conditions owe their colour to the fact that they eliminate one or more of the coloured constituents of the white light which is transmitted or reflected by them, This can be seen very clearly by examining the spectrum of the light which has been passed through coloured solutions.

*Experiment 6.*—A spectrum was thrown on the screen by the same arrangement as before. Solutions of malachite green, alizarin in potash and permanganate of potash were in turn placed in a cell with parallel glass sides in the beam of light from the arc-lamp. In the first case the spectrum was crossed by a black band in the red part, in the second case by two bands in the orange and in the third case by at least three bands in the green.

These black bands across the spectrum indicate that certain coloured lights are now missing. So that, in a way, coloured objects are less coloured than colourless ones. The light transmitted or reflected from colourless objects contains all the colours of the rain-bow whilst in coloured substances some particular kinds of light are missing. The light which is eliminated is not destroyed—light is a form of energy and energy cannot be destroyed. In some cases it can be shown that the particular kind of light which is missing from the transmitted light is found in the reflected light. You are probably all acquainted with the peculiar bronzy-green appearnce seen when a drop of red-ink is allowed to dry up. The green rays are absent from the red light transmitted by red ink. They are reflected from the surface, A similar phenomenon is shown by many dyes.

*Experiment 7,*—A beam of light from an arc lamp was thrown obliquely on a glass plate on which an alcoholic solution of mythyl violet had been allowed to dry. The light which passed through the plate was violet and that which was reflected was yellowish-green.

*Relation between colour and chemical constitution,*

There is a very intimate connection between the chemical constitution and the colour of substances; this enables us to produce with certainty pigments and dyestuffs of any desired shade.

Some elements have a very great tendency to show colour and nearly all their compounds are coloured. Such an element is *chromium*; its name was given to it on account of this tendency. Practically all the colours of the rainbow are shown in its various salts.

*Experiment 8.* Solutions of bichromate of potash, chromate of potash, chromium sulphate and chromic peroxide in ether were in turn placed in a cell with parallel glass sides in a beam of light from an arc lamp. The light became coloured orange-red, yellow, green and blue in succession.

There are other elements which show very little colour *e.g.* nearly all the

compounds of sodium, lithium, magnesium, calcium, strontium and barium are white. Nevertheless even these elements when tried by fire give out colour.

*Experiment 9.* A large colourless Bunsen flame was coloured crimson, red and green in succession by introducing into it platinum wires carrying salts of lithium, strontium, calcium and barium.

These colours given out by substances when tried by fire can be very well seen in what are called *flame-arcs.* The core is drilled out of the ordinary carbon rods used for the arc-lamp and various salts are fused into these cavities. When these medicated rods are used in the arc-lamp and the carbons are widely separated from one another the light given out shows a very beautiful spectrum consisting of comparatively few but very bright and sharp bands—the bands are so narrow that they are generally called lines. These sharp lines in the spectra of coloured flames are in very sharp contrast to the much broader black bands which have indefinite edges in the spectra of coloured solutions.

*Experiment 10.* Flame-arcs were shown with carbon poles medicated with sodium, lithium, strontium and iron.

The colouring matters contained in animals and plants are almost invariably carbon compounds, compounds containing only carbon hydrogen, oxygen and sometimes nitrogen. Now thousands of compounds are known which contain these elements but are colourless, so that the colour of the natural colouring matters of animals and plants must be due to some special arrangement of the atoms in the molecule. Chemists have found out the nature of this special arrangement which causes colour and have been able to synthesise many of the natural colouring matters *e.g.* indigo and alizarin are now obtained from coaltar. More than this, chemists have been able to make many new dyestuffs by keeping in the molecule that arrangement which causes colour and varying the other parts of the molecule. Generally speaking, by modifying the structure of molecules the colour can be altered. Sometimes quite simple modifications cause great changes of colour.

*Experiment 11.*—A colourless alcoholic solution of phenol phthalein and Michler's hydrol was treated with a drop of dilute potash when it became pink. A drop of dilute hydrochloric acid made it again colourless whilst another drop of acid turned it blue.

An aqueous solution of methyl violet was turned first blue, then green and finally yellow by the gradual addition of hydrocholoric acid.

However, such colouring matters which so readily change their colour on the addition of a drop of acid or alkali are not very suitable as dyes for clothing which should be able to stand the acid of perspiration or the alkali of mud without changing colour. Many dyes meeting these requirements are known. Yet even these can be altered in tint

by more profound chemical manipulation. For example the samples of cloth exhibited which show every shade of colour from scarlet to blue and brown are all dyed with derivatives of alizarine, the colouring matter of madder, which dyes cloth scarlet, and all these derivatives have the same excellent fastness to washing, alkali, acid etc. as the original alizarin. The other samples of cloth exhibited are dyed with derivatives of quercetin which have been discovered in this laboratory and of which we are rather proud. The original quercetin is a natural dyestuff which dyes yellow to brown shades whilst the derivatives are crimson, violet blue and bluish-green.

In conclusion I wish to thank Prof. Meek for the great trouble he has taken over the experiments to illustrate this lecture, which have been so successful in his hands: and I must also thank you all for listening to me so patiently in a very hot, moist and trying atmosphere.

E. R. WATSON.

## SIKH RELICS IN EASTERN BENGAL.

So far removed is Eastern Bengal from the centre of activity of Sikhism that it may at first sound rather strange to mention it in connection with that religion. And yet, there was a time when Sikhism was quietly and steadily making a headway here. There flourished quite a net-work of prosperous Sikh Sangats and Monasteries all over the Province from Rajmahal in the West to Sylhet in the East and from Dhubri in the North to Fatikcherri and Banskhali in the South; there was hardly a place of importance during the days of Moghal viceroyalty where some Sikh temple did not exist or some Sikh ascetic had not established himself and gathered a number of followers around him. The movement had even spread to some islands like Sandvip, as early as Shah Jehan's time. Eastern Bengal was the "treasure house" of the Moghlia Kingdom and a centre of great political importance. Immigration from Northern India had gone on from the earliest times, till in the time of Shaista Khan, the great Viceroy of Bengal, the province could very well he classed as the Hindustani-speaking part of the country. The Imperial armies were stationed in every nook and corner and these armies had been recruited in Northern India. Hindus formed not an inconsiderable part of them. Even in the higher official circles the Hindu element was fairly strong. Further "the Mohammadan conquerors in Eastern Bengal interfered but little with the worship and religious beliefs of the Hindus whose temples everywhere remained unmolested in colse proximity to the mosques of

the Faithful. Religions persecution on any extended scale is one of the evils which Eastern Bengal has escaped through all the vicissitudes of its long and chequered history." Lying on the fringes of the Empire and remaining for ages the hunting-ground of turbulent neighbours, the Assamese, the Arakanese and later on the Portuguese of Sondip, the imperial hold on it was always very weak and it was the policy of the Delhi Government to encourage immigration on a large scale of a foreign element into these parts and to carry on the Government in a more liberal and broad-minded spirit than it was necessary in Northern India where Mohammadan Government had been firmly established. It was under these circumstances that a large number of Sikh temples sprang up here and there for the spiritual solace of the Nanakpanthi immigrants from Bihar and Hindustan and received help and encouragement from Government officials along with the Bairagi Sangats and Mohammadan shrines. Sikhism was then in its vigour and it would have been a wonder indeed if it had remained unrepresented. These *Sangats* were not only the places of worship but as usual served the useful purpose of wayside inns where food and shelter was given free to the indigent wayfarer. All these *Sangats* were well organised, the organization being a a copy of the government system of the time. Thus Dacca was the *Huzur Sangat* or the provincial head Sangat with a number of others under it, and in turn was controlled by the pontifical throne at Anandpur in Guru Gobind Sing's time and later, was attached to the archbishopric of Patna. These Sangats were run by bishops, or masands as they were called, the word *masand* being a corruption of *masand-i-ali i.e.*, meaning the Viceroy. The monasteries established directly by Sadhus or those in their charge were independent of this organisation and were controlled by their own heads at Rajmahal and Malda or in the Punjab.

The influence of these Sangats was not confined to the immigrants; it spread wider and affected the local people, particularly the low class Hindus. This influence would however appear to have been very superficial, a superimposition on earlier creeds so that it vanished directly the source of influence was removed, leaving hardly a trace behind. When Guru Singh Bahadur visited Dacca, such was the enthusiasm and devotion shown by the local Sikhs that he called Dacca "the home of Sikhism", a name by which Guru Gobind Singh more than once remembers it in his *hukmnamas* (or firmans) of which I shall have to speak later on. The Sikhs in Dacca besides being very devoted must have been rich too. When in his younger days Guru Gobind Singh wanted a palanquin to enable him to travel from Patna to the Punjab, it was to Bulaki the *masand* at Dacca that a requisition for it was sent.

Bulaki complied and sent a golden palanquin. A few years later when preparing for his life-mission and organising the Sikhs on a military basis, requisitions for first-class war elephants for men and munitions as well as for the costly Dacca fabrics followed, for the Guru's was now a royal Darbar where all these things were wanted. We have documentary evidence to prove that these requisitions were all complied with. So that Dacca "the home of Sikhism" at that time was not content to look on from a distance at what was going on in the Punjab but did actually take part in the work of uplift.

The contact of Eastern Bengal with Sikhism begins very early indeed in the pre-Moghal days. The sixteenth century was yet in its infancy, when Guru Nanak the founder of the faith visited Dacca in the time of Hussein Shah' the Good, for it was only a short time after his return from this trip to the Eastern parts that he was taken prisoner by Babar's men at the sack of Saidpur in 1524 A. D. Dacca, of course, did not exist then as such, Sonargaon was the capital of the Province; and what is called Dacca now, was only the seat of a thanadar. The site of Dacca and its suburbs was covered overby a large number of insignificant villages whose names mostly survive in those of the quarters of the town up till now. In all there existed fifty-two bazars and fifty-three streets and the town from this circumstauce acquired the somewhat unwieldy name of "*Bairno bazar aur tepangali*" The wide stretch of high ground that lay in the neighbourhood and its accessibility from the river offered facilities which were wanting elsewhere in this water-logged country; hence the thick conglomeration of small villages on a small area. One of these 52 bazars, known as Bengalla is said to have been the most important and its fame as a centre of trade was well known throughout the neighbouring districts. Another important and adjoining bazar famous for its temple of the goddess Dhakeshwari was called Dhaka.† From the importance of these two bazars, particularly the former, their names were accepted by the travellers in place of the more cumbrous one given above. The collection of villages was therefore known outside as Bengalla or Dhaka Bengalla. It was a trading centre of some importance, which attracted the trading classes from far and wide long before it became the capital under Islam Khan. But it was a fame of a different kind which attracted Guru Nanak. He had left his home and travelled on foot with a single companion through Hindustan and Bihar to Kamrup, visiting all the sacred places Hindu and Mohammadan, *en route*. From Kamrup he turned his

† This account of Dacca has been compiled from the Gazetteers and Mr. Bradley-Birts' Book.

steps south and was on his way to the temples of Kali and Jagannath Puri. The temple of Dhakeshwari, one of the most famous places of pilgrimage in olden times lay on the way and was not simply to be passed by. Guru Nanak therefore broke his journey here and landed at the northernmost ghat at Rayer Bazar. The place was probably inhabited by poor people of the potter class as at present; for it is among these people that the tradition of the Great Teacher's visit survives and a sort of devotion still lingers, though the memories have long since grown vague and dim. A well commemorates this visit to the present day. Out in the waste near Jafarabad, half hidden in bramble growth a well and a heap or two of debris are the only visible signs of the Sikh monastery that once flourished there. To judge from the signs the temple originally consisted of a well and a small square building with arched doorway and a vaulted roof, to which were added later a tank and a *baradari* on the edge of this tank. The well is known as Guru Nanak's well and there is a local tradition that Guru Nanak drank from the well. The Sikh story, a little rationalised is that he dug a hole for drinking water with his pointed stick. However that may be, the place became sacred in the eyes of the Sikhs and Sikh ascetics soon followed to establish a monastery there. So that after the two mosques (that of Binat Bibi and another) built about 1458 A. D. in the days when Nasiruddin Mohammad Shah was king of Bengal, this well would appear to be the most ancient relic near Dacca. Miraculous properties have been attributed to the water of the well ever since the visit of the Guru and people from the villages in the neighbourhood gather together here once a year in the month of Chaitra for a picnic now, but perhaps continuing in howsoever changed a form, an annual fair and yagya held in connection with the Sangat. All fish and meat is avoided on the occasion, I hear. But the reverence for the Guru or the belief in the curative powers of the water in the well had not been sufficient for the proper care of the well, which, till recently was in a very dilapidated condition and would soon have closed up. Fortunately a few companies of the 22nd Sikhs were stationed here for a short time; the district authorities were approached and the well repaired by the District Board partly helped by public subscription.

The next centre of interest in order of time is the Sikh temple of Shujatpur near the race-course, and is the best known locally. This sangat or monastery is contemporary with the rise of Dacca into importance. In 1607 Islam Khan was appointed the Viceroy of Bengal and in 1608, he transferred the seat of Government from Rajmahal to Dacca for several reasons, among which was a change in the course of the river at Rajmahal, which change had resulted

in a great decline in the trade and importance of that place. With the shifting of the Government a large population moved on to the new capital, and along with them as a matter of course their spiritual guides. It is said, that the sixth Guru (in Jehangir's time) sent a very zealous missionary and a holy Sikh *Almast* by name to Jehangirabad, as Dacca was then officially known and it was this Almast who established this monastery. Third in succession to Almast was Nathi Sahib, after whose name the Sangat is known among the Sikhs. A stone inscription in the well of the temple tells us so, and reads as given below :—

> In the name of the True God, the Creator, and of Guru Nanak, (Attached to) the Guru Gaddi at Nanakmata of Almastraj. Babu Natha Sahib's Sangat at Shujatpur. Mahaut Premdas. Well repaired in 1890 (Vikramaditya corresponding to the Bengali) current year Shak 1240.

Another stone, with an inscription of a much earlier date has fallen into the deep water of the well and is lost.

During the half century that followed, the viceroyalty of Bengal was as a rule in strong and able hands. The successive Viceroys followed the policy of Islamkhan and took full advantage of the strategical position of Dacca. The power of the mutinious Afghans was broken for ever; the Moghul empire was extended to Chittagong, whose Raja Manikrai took refuge with the Nazim at Dacca against the Magh king of Arakan; and a boundary had been settled with the turbulent Assamese and peace secured on that frontier for a quarter of century. Moghal influence was extended to Koch Bihar and Kamrup as also to Shusung in the Garo hills. Nor was the period barren so far as the spread of Sikhism went. Sikhs and Sikh temples had multiplied over the land so that by 1666 when Guru Tegh Bahadur visited Dacca, prosperous Sangats flourished at Sylhet, Chittagong, Sondip and Lashkar, besides the one in Sutrapur or Songattola quarter of Dacca. *Masands* had been sent out and they had done their work in earnest.

After Guru Nanak, none of his successors had left the Punjab. The Sikhs and their temples had greatly increased in the whole of Northern India. It was now time that the Guru went round once to give the thousands of his Sikhs the pleasure and consolation of his presence. The importunities of the poor devotees who could not travel all the way to the Punjab for a pilgrimage became so great and pronounced that the ninth Guru Tegh Bahadur the father of Guru Gobind Singh, at last decided to accede to their wishes. The opposition that his succession to the gaddi had met and the consequent jealousy and enmity also prompted him to leave the Punjab for some time. The news sent a thrill of joy through the devoted hearts and

such was the enthusiasm evoked that preparation began to be made to receive the Holy personage, long before he started on his mission in 1765. At Patna, a short halt was made, during the course of which, to the Guru's own wishes to see the Sikhs of Bengal was added the earnest prayer of a Rajput commander ordered to proceed with an expedition against Chittagong.† The Guru left his family at Patna and accompanied the Raja to Dacca. He hadnot been there long, when news of the birth of Gobind Singh reached him.

On his arrival at Dacca, the Guru found his way to the Sangat in the town; Masand Bulaki, now informed all the Sikhs of the Guru's arrival. They came in crowds to do him honour and receive his instruction and benedictions. Such was the enthusiasm displayed that the Guru declared that Dhaka was "the store house of his faith"; when the Guru was about to depart, Masand Bulaki's mother had a picture of the Guru painted. This picture together with some pieces of the *Chowki*, she had got prepared for the Guru to sit on are still preserved in the Sangat. This picture, even if not contemporary, is certainly very old.

But these are not the only things to interest us there. A few years ago, there could he had a big collection of letters etc. of antiquarian interest. They have unfortunately been mostly lost. But what has been left behind is neither inconsiderable nor unimportant. From the point of view of Sikh history I may say that quite a little treasure trove has been found here. For herein are preserved, half a dozen old letters, some of which are in the handwriting of Guru Tegh Bahadur and Guru Gobind Singh; a copy of Granth Sahib made in Sambat 1732 A.D. *i.e.* to say the third earliest and the first complete copy known; * a beautifully illuminated copy in bold type and made about Nawab Serajuddoula's time, and some other books differing considerably from printed editions of them that are available now. The books also contain some important historical data.

The letters are not merely interesting but of historical importance to the Sikhs, for they not only furnish a valuable

† It is related in some Sikh Books that it was an expedition against Assam, but that could not be correct. Mr. Macauliffe has tried to reconcile the Sikh accounts with contemporary history, but has not succeeded. The expedition against Assam under Raja Ram Singh which he refers to, was sent two years after this event. The expedition against Chittagong was carried on in the winter of 1665-66 A. D. which corresponds very well with the date of birth of Guru Gobind Singh *i. e.* the 7th. of Paush Sambot 1723 Vikrama. The only Rajput of note with this expedition was Raja Subal Singh Sesodia, a commander of 1500

* The illuminated copy was made for Lala Nandlal, brother or cousin of Dewan Mohan Singh, who is described later on in connection with Songats in Chittagong district.

corroboration of certain events already known and bear out certain traditions, but supply new facts. That they are genuine is clear on the face of them; they carry their own proof. No body who has seen them and glanced at the contents can entertain the least doubt as to their genuineness. Four of them are in duplicate, that is, there is on each an original letter in one handwriting and then an amplified version of the same by a different hand and written in an easier plain script. The variations of the two recensions in each case are characteristic and obvious. A mere perusal will make it at once clear that the original letter in each case is by the Guru himself and that the second version by his secretary or scribe, who does not merely copy out the letters again, but naturally introduces such phrases as "this is the order of the Guru" or "by the order of the Guru" etc. and otherwise completes the letter by post scripting, dating, and addresing it. Why this duplication was found necessary will be made clear when we examine the script in which the original letters are written. Evidently people at Dacca were unable to read it and the letters had therefore to be rewritten in block-book Gurmukhi. The difference between the two scripts is not merely the result of flourishes, but is of a more fundamental or basic character. Gurmukhi, as it is, has very well preserved the old forms of letters, the majority of which we find in use in the 12th and 13th centuries A.D. But the script of these letters carries us a step closer still to the fountain head. We may in fact say that these letters are written in a script which was the original of Gurmukhi.

Three of these duplicate letters are in one handwriting and are distinguished by a peculiar mark which consists of a minute circle followed by a tiny cross and occupies the same place in all the three letters. What the mystery of this "circle and the cross" in this case is, I leave to the Theosophists to find out. The Sikhs will probably be satisfied if told that the marks stand for *chakra* and arrow; perhaps a secret sign of recognition used by the Guru. In any case the letters stand marked out as originating from one source, as in fact the handwriting clearly shows. One of these letters is dated and the contents of all the three leave no doubt as to what period of struggle they are to be ascribed to. Two of them are written on superior fashionable notepaper of the time, perhaps the Mansinghi paper of Sialkote manufactnre. It is decorated in gold and silver and is about double the size of large octavo note paper. The writing is in a pretty practised hand and so fine that a metallic nib was most probably used. Guru Gobind Singh loved to use steel in every possible place; he had even given God, the name of Sarh-loh or All-steel. Who knows, but that Adorer of Sarh-loh had a steel nib fixed to a bamboo holder, thus forming an arrow for writing, which

tradition places in his hand. It requires a good deal of patience and some skill to read the original letters. In fact it would have been very difficult for me to read them, but for the key that each letter carries in the amplified version.

But I have not been able to completely decipher the fourth duplicate letter, notwithstanding the key; nor has a friend in the Archæological Department been able to do so for me. This letter is in a different hand-writing and the script used in the key is the same, as in the three original letters discussed above, with only some vowel-marks omitted. In the original version of this letter, vowelmarks are not used at all and headline of most characters is also omitted; the characters also appear to be different.

This letter is evidently the earliest of the lot and to all appearance was written by Guru Tegh Bahadur from Patna to some Sikhs of the Dacca Sangat. In the amplified version it reads as follows :—

**I. "Aumkar, Satguru."**

*This letter* is written to the revered and respected Bhais Bhagmal, Chhahildas, Saddhrimal *and* Nathormal. *The* Shriguruji has ordered *that* one *chira* and one aswari khasgi be sent for his personal use. It should be white, very white. Should be sent early. The Guru will bless you, protect you and fulfil all your desires." The original letter so far as I have been able to decipher reads :—

**"May God protect you."**

Bhais Bhagmal, Chhahildas, Nathormal *and* Saddhrimal! I want one Chira *and* one aswari......Send......Blessed be the congregation."

Mark the changes as also the transposition in of names. The letter asks for two things. *Chira* is of course the head dress of Dacca make, but what *aswari* is I cannot say with any certainty unless it be the palanquin which was sent to the Guru at Patna. If this interpretation he correct, then the lettter was was written about Sambat 1730 or A. D. 1673.

(2) The next letter was written about 18 years afterwards for it is dated Sambat 1748. It acknowledges the receipt of swords, clothes and money through some delegates sent by the Sangat and asks for more clothes, shields and war munitions. It reads as given below; the words within brackets are the additions made by the scribe in the amplified version.

**1. Aumkar Satguru.**

(It is the Guru's order, to) Bhais Hulaschand, Bakhshishchand, Mehrchand, Bulakidas, Sewakdas, Dharmchand, Hashiram, Anuprai, Danirai, Gurbaksh, Lanchand, Bindraban, Gulalchand, Dayaldas, Patiram, Dakhanirai, Hardayal, Jiwarmal, Pritamdas, Sukhdev, Lalmal, Biharilal* and the rest of

* The names are all such as are common among Punjabis settled in U. P. No name ends in 'Sing' as now, for the Khalsa had not yet come into existence.

the congregation at Dacca, the Sangat of Lashkar, and of the neighbourhood; may God protect the whole congregation. Bhai Hulaschand has come to the Presence and has made over all that the congregation entrusted him with. A hundi for Rs. 900/- eight pieces of cloth, and sword blades have been accepted in the name of the Sangat. Blessed be the congregation and may God make them prosperous.

Now it is ordered that the congregation should collectively comply with the following requisition; forty headdresses gold laced at a cost of Rs. 1600/-, thirty shields for Rs. 300/-; two shields for Rs. 100/- and one *mainágájábhág*† Every rupee or mohor that is contributed towards the fund will accrue to the donor's merit hereafter and make him flourish here. Dacca is my home. The Sangat should send what is asked for to the Presence before the Diwali; it is not a matter for delay. God will fulfil all the desires of every one of my Sikhs who contributes towards this purpose. He shall be rid of the fear of Yama. This is my heartfelt desire and it is my order to the congregation to comply with it very early; it should reach my Presence by the Dipawali. Dacca is my home. God will make the business of the congregation prosper.

( Blessed be the congregation. There shall take place the khasmáná* of the Sangat; may all your desires be fulfilled. (Sambat 1748 miti Jyeshtha Shudi 5) and on the reverse the following postscript (Give Rs. 18/- to the two messengers Sukhia and Buddha; as also Rs. 20/ and two suits of clothes to these two messengers by way of reward). Evidently Sukhai and Buddha had arrived earlier with another message and were waiting for an advance on travelling. Guru Gobindsingh was born in Sambat 1723 and so was twenty-five years of age when this letter was written.

*(To be continued.)*

GURBUKSH SINGH.

† The two readings agree, but I do not understand what the word means, unless it stands for war drum.

*The word is used in Sikh literature and even by Guru Nanak in the Granth in connection with Babar's invasion of Khurasan. I do not understand the exact significance.

# CAUSES OF THE PRESENT WAR.*

When I received your kind and flattering invitation to lecture before you, I did not realise that the lecture would be given in the Bar Library and before so many hearers; my friend, Mr. R K. Doss broke it to me gently that this was to be the case, and I feel a great hesitancy in venturing to put my views before so large an audience, and I ask your indulgence on that account.

The remote causes of the war need not detain us long. Some writers have ascribed it to the insufficient and scanty civilisation which the north-eastern shores of the Baltic received; others, full of missionary fervour, have pointed to the unsatisfactory propagation of the Christian faith in the same region, when wholesale conversions were made by fire and axe, and the Teutonic order presented the gospel at the sword's point. I do not personally agree with these researches, nor do I think that history supports them. Whatever we may think of the Germans, we must admit that they have arrived at a very high standard of organised material welfare, which is one of the expressions of civilisation at any rate.

* A lecture in the Bar Library, Dacca, given at the request of the Secretary of the Students' Weekly Service Meeting.

No, gentlemen, I do not wish to trouble you with historical reminiscences, but I must point out 3 important indirect causes of the present struggle: (1) The Thirty years' war which raged through Germany between 1618—1648, left that country more exhausted, ruined, and devastated than any other records of the destructiveness of war testify. Populations, industries, towns disappeared. Prosperous men became beggars, the life and honour of no woman was spared. Germany to this day has never recovered from that fearful visitation: it still forms her conception of vigorous warfare. The horrid image of war to most of us is softened by the chivalrous and gallant spirit of man; the records of England, France, Japan, Rajputana, the Saracens, not to mention others, in matters of war is a record which almost makes war attractive. The German from the earliest days, as Froissart testifies, has ever been dead or blind to the chivalrous side of war: this fact no less a distinguished soldier than Sir Partab Sing noted and commented on a few years since. To the Thirty years' war, then, and its awful effect on the German character, I think the first cause of this great struggle is due; for the German, awed by the theory of frightfulness himself, has sought to awe the world in the same manner, and literally "to wade through slaughter to power": The rapid growth of Prussia, her able rulers, the Great Elector and Frederic the Great, singled her out soon as the focus of a

possible German empire ; in spite of the disastrous collapse before Napoleon, Prussia was the hope of many patriotic Germans; and the seed of the present German empire was laid in the early XIXth century by Gneisenau, Stein, Blücher, Queen Louise, Scharnhorst and others. The German confederation of the Rhine commenced the longing for unity ; the Zolloverein strengthened it—and by the middle of the XIXth century Germany was ready to assume her place as a nation.

We now come to the 2nd indirect cause of the war. The German destinies fell into the hands of perhaps the greatest figure of the 19th century—Otto von Bismarck. His career I need not dwell on : I only wish to call to your recollection his overwhelming ambition : his great and intense Prussian patriotism and his utter unscrupulousness. To him more than to any other man must be ascribed the responsibility of this war.

He founded that school of German diplomats whose word has no value ; whose methods recognise no limit, and whose achievements are those of conspirators rather than diplomats. Leaving aside all questions of morality, Bismarck only recognised the need of the moment : the end justified the means. But you cannot expel righteousness from a nation's life any more than you can from an individual's.

Bismarck had to face two problems :—

(a) How to put Prussia in the place of Austria without permanently incurring Austrian hostility.

(b) How to humiliate France.

The former he achieved in 1866—and by his generosity to the conquered. completely won over the Austrians.

The second he achieved in 1872, when the German empire was proclaimed at Versailles.

Then the diplomatic preparation for each event, treachery and forgery marked the German dealings—and in 1866 there was seen for the first time the efficiency of Germany's espionage system.

The third indirect cause which I wish to place before you is the war against Denmark in 1864 by Prussia and Austria which was engineered by Bismarck over the Schleswig-Holstein question, which resulted in Denmark yielding up Schleswig and Holstein to those powers. Schleswig-Holstein forms a small peninsula at the entrance of the Baltic, which had been in Danish hands since the earliest times : the population is partly Danish, partly German, the German Holstein element provided the excuse for Bismarck.

While a small and poor nation was thus robbed—Great Britain and France played a poor-spirited part. They alone could have saved Denmark and they failed to do so : they stood by and saw her dismembered.

Had England and France then stood by Denmark it is easily conceivable that this war could never been fough because

(i) the entrance to the the Baltic would have been in Danish hands.

(ii) The Kiel canal could not have been built by the Germans.

(iii) Without the Kiel canal the German fleet might as well not exist.

This will lead on to a train of possibilities which I will not inflict upon you. It is sufficient to say that England and France have paid for their mistakes with much blood and money.

We now come to the direct causes of the war. Bismarck was ousted from power by the present German Emperor in 1890; the Emperor from that day to this has been uncontrolled master of Germany: and it is in a study of his character that we find many of the immediate causes of the war. All are agreed that he is a man of indomitable will and exceptional ability; against this must be set a vanity that amounts almost to mania, and a conviction that he is destined to be the Barbarossa of German legend who is to bring the world under the German sceptre. He realised Germany's weakness lay

(i) In the complete absence of of any sea power.

(ii) In a certain lack of energy and independence in the people themselves.

He has supplied both. In twenty-five years he has induced Germany to spend 300,000,000 (450 crores of rupees) on building a navy which is second only to the British fleet: he has also hypnotised his people by the pageant of military pomp and succeeded in placing all Germany under the Prussian drill instructor.

He has broken down the German noble's intolerance of trade and surrounded himself with able and successful financiers and merchants. He only applied one test to a man—was he successful? success covered every sin and lack of success was unpardonable.

Thus he deliberately trained the modern generation of Germans to test everything, not by a moral, but by a material standard. Bismarck aghast, watched his old pupil poisoning the German temperament by the very methods that he had introduced and his last years were clouded with remorseful anxiety and an unconcealed dread of the future.

William II pursued his way content to be regarded as an eccentric impulsive, showy man—when his real character was as remorseless, and calculating as that of his ancestor Frederick the Great.

He built up this vast Navy—he created the most perfect army that the world has seen—perfect in discipline, organisation, and the numbers of this army proved to be over 8,000,000 nearly double what the world suspected. German trade was fostered; each German became a piece of the state machinery; clerks, governesses, maid servants, even these were all alike used by the secret service Everything was ready for "the day" and by 1906 so

confident was the German that he openly toasted *the day*, and "the day" was noisily drunk by excited tourists as well as by jingoistic young soldiers. We shall see how each link was tested from year to year, till in 1914 the great machine was adjudged ready for use.

In this singularly watchful and restrained preparation we notice apparent indiscretions (i) The insult to the Japanese in the picture of Germany defending Europe from the Yellow Peril.

(ii) The telegram to Kruger

(iii) The mailed fist

People said 'it is only the Kaiser'—but the Kaiser knew what he was about. No rush of blood to the head forced intemperate words from his lips—his indiscretions were fruitful.

For the insult to the Japanese he got Kiao-Chao

" " England by the telegram } he got a large addition to his fleet.

as the English Flying squadron revealed Germany's impotence at sea and for all his impetuous references to the army he got a fresh accession against possible Socialistic tendencies: in fact by 1914, Socialism as a controlling force in Germany was not existent.

But nothing is perfect, and this wonderful scheme had one glaring fault. The Emperor forgot Russia.

In the early Eighties Bismarck had foreseen the necessity of the Russian alliance. The Drei Kaiser bund—the three Emperors'-league was to dominate the world, and the predominant partner of the league was to be the German Emperor. On his death-bed in 1887 the Emperor William I urged his grandson and heir never to forget that Russia must be kept the friend of Germany: the plea fell on deaf ears. The ostentatious disregard of Russia in the early years of William II's reign is another feature which indirectly has greatly altered the course of this war. Russia, alarmed by the growing intimacy of Germany and Austria, and strongly resentful of the anti-slav campaign which was being urged upon the Teuton peoples turned his attention west; and found in France the counterpoise to German ambition. In the early nineties an offensive and defensive alliance between Russia and France was signed, and, inspite of German intrigue, that alliance proved to be solid and acceptable to both countries. From that time onwards, I think it may be assumed that Germany prepared definitely for war against France and Russia; a war which she meant to make inevitable: her decision was confirmed by the serious defeat which Russia suffered in the Japanese War, and the consequent weakness due to loss of prestige &c. Between 1904 and 1914, the preparations for war in the light of modern events stand clear. Germany had three definite aims in that decade :—

(1) to keep Russia weak

(2) to embroil France and England.

(3) to lull English suspicions until continental supremacy had been achieved.

The South African War did not increase the German respect for our military administration, and, altho' they had a wholesome fear of the British Navy, they knew that the Navy might protect England, but could not save the continent. Two men in Europe detected this design, and became the unavowed objects of detestation to the Kaiser and his party: One Monsieur Delcasse, the distinguished man in charge of French foreign politics. As early as the Japanese War he realised that France and Russia could not face the central German powers with the necessary conditions for success as the central powers geographically as well as politically stood between France and Russia.

He consequently sought for an increase of strength and determined to find it in England: he had soon an opportunity: the Fashoda incident nearly brought England and France to blows. Delcasse averted the calamity and assisted by Sir H. Kitchener (now Earl Kitchener) settled the situation and paved the way towards the *entente cordiale* [a curious phrase by the way] which in 1914 became an alliance which, please God, will never be dissolved. The other man was H. M. the late King Edward VII. He realised vividly the road in which Germany was striving to force England. He saw through the German design of inducing England to stand aside while France and Russia were being rendered powerless, and he used his unrivalled personal charm of manner to attract the French Nation: he never lost an opportunity of letting them see how much he admired and liked them and his great personality won them over.

Behind the scene he laboured daily to strengthen the *entente*, and the powerful bulwark which held and broke the German onslaught in the West is partly the result of King Edward's and Mr. Delcasse's labour.

Germany met the challenge. Delcasse was foreed to resign, (1906) as Germany cowed France by threats before she was ready: King Edward was too powerful to be openly attacked, so he was made the object of a venomous and slanderous campaign in the German press:

The seizure of Bosnia and Hertzgovina in 1908 humiliated not only Russia but also England and France. By this time England and France were beginning to realise the profits and pleasure of their *entente*: its good results were seen in the improved relations between England and Russia in Persia: at last in 1911, Germany came to the conclusion that diplomacy must say its last word.

In that year she went to the very edge of declaring war against France in the matter of seizing Agadir in Morocco: armies began to mobilise, and Mr. Lloyd George the great peace-loving Minister of England and the idol of the English working classes openly announced in a speech at the Guildhall that in case of Germany's persistence, England would stand by France.

Whatever the peoples of the world may have thought, war was inevitable from that date in the opinion of German Statesmen, and they began to prepare sedulously for war. The conditions were singularly favourable. England was in the midst of an advanced and highly debateable programme of domestic legislation, with the shadow of Civil War in Ireland daily becoming more acute; the Crown Prince's tour in India, preceded by that of Count Wolf-Metternich was a journey to diagnose the feeling of this country towards the Empire—a diagnosis which proved singularly incorrect.

France was agitated by a big scandal in the financial administration of her army, and Russia was still in the throes of reorganisation after the scandals and disasters of the Japanese War.

How did Germany spend the 34 months that elapsed between the Morocco Crisis of 1911 and the murder of the Archduke at Serajevo in 1914.

The Kaiser has so steadily proclaimed that while he was labouring for Peace, the rest of the world was preparing for battle that it is interesting to examine the steps taken by the German central Executive during this time.

(1) As far back as 1908, Germany was spending annually 120 lacs of rupees on a system of espionage.

In the early spring of 1914 the French authorities accidentally discovered the clue to the German espionage in France; they found that 30,000 German spies in France alone were ready at a given signal to destroy bridges and railways and to hamper the French organisations: the great arsenal at Paris was discovered to be wired. The French Government wisely said nothing, but set spies to watch spies: ten days before war was declared France arrested this army of 30,000 spies and removed the the dynamite set by the agents of a so-called peaceful nation from underneath her main arsenal.

Antwerp, Brussells, London and Petrograd have since made the same discoveries—the arsenal near Petrograd was actually blown up in the early part of this year; this compelled the Great Russian retreat, because the Russians had no more supplies left for their artillery and had to depend on France and England. In London, one of the German churches was discovered to be an arsenal for German rifles and ammunition.

(ii) In the early summer of 1914 the Canal at Kiel and the fortifications of Heligoland were completed. The German army mobilisations were on a scale hitherto never approached.

Thus by June 1914, Germany had completed and tested her preparations for war.

(iii) Late in 1913 a series of inflammatory speeches against France were made by the Kaiser and his leading generals on the occasion of the centenary of the war of liberation.

(iv) After the Serajevo murders, newspapers were distributed *freely* throughout

all German towns, inflaming the military spirit of the nation—calling for immediate action against Russia.

(v) The intricate and costly series of railways on the Belgium and Luxemburg frontiers were completed, tested in the spring of 1914—these railways were useless for commerce, they were simply intended for one thing, viz, the transport and transference of millions of men to a given strategic point in the minimum of time.

High German officials were warned early in the summer that war would be inevitable. The Italian ambassador in Turkey has placed it on record that Baron von Wangenheien, the German ambassador, told him on *July 14th* that the Austrian ultimatum would be so worded as to ensure war; now the German and Austrian empires did not make this great effort to fight Serbia. An attack on Serbia meant that Russia must fight, and if Russia fought, France would fight also. They calculated that Ireland would be in a blaze of civil war and that England's hands would be tied until it was too late.

These are the main efforts which the German Emperor made to preserve the peace of Europe; it was reserved for him to add one finishing touch to the picture. In his visit to England in 1912, he stayed as the guest of His Majesty at Buckingham palace, and he invited his chief spy in England to meet him at the palace and discuss matters: this is the limit. The guest arranges under his host's roof the pillage and destruction of his host's property. Yet the German Emperor professed to model himself on such knightly chivalrous monarchs as the Great Barbarossa and Charlemagne.

England, France and Russia however were not quite asleep; and a most careful and intelligent anticipation of coming events is revealed in the despatches sent to France by the French ambassador in Germany. The German Emperor hoodwinked most people, he did not take in M. Paul Cambon and his able staff. French diplomacy again vindicated itself and proved its incontestable superiority in everything except dishonesty and treachery.

In March 1913 the French ambassador and his naval and military advisers sent home the most striking despatch published in the whole of diplomatic correspondence before the rupture of peace, which included a secret report published by the German government on the aims and duties of the national policy, the army and its branches, urging that the the general staff should begin to prepare the German nation for war and give the impression that the war is defensive; this was in March 1913

The French despatch of March 1913 warns France in no uncertain tones that the greatest moment of her existence is drawing nigh. The French ambassador noticed that the Emperor "daily takes pleasure in recalling memories of 1813." In November 1913 the French ambassador again warned France that the

Emperor had ceased to be a supporter of peace and in that month took place the historic conversation between the German Emperor and the King of the Belgians in which the Emperor openly said that war with France was inevitable, and his chief of the staff Count von Moltke who was present said that this time they mean to finish the business, and they urged the Belgian King not to persist in any neutral attitude, should war occur ; remember, this interview took place 8 months before war broke out.

In fact by the close of 1913 Germany was almost as completely ready for war as a nation well can be ; and what remained in the way of preparation was finished in the first half of 1914. So methodical was the preparation and to such an extent was war decided on that in publishers' contracts, certain clauses enabling the contract to be cancelled in case of war, were introduced early in 1914.

The Socialist element in Germany proved to be less powerful than had been anticipated and practically admitted the leadership of the Junker when the first clash of arms was heard. By July 15th the German army had begun to mobilise; by the 1st August, five million armed men were sent to fight, and reserves of another five millions were called into a state of preparation.

Thus facts, which cannot be challenged or contradicted, show that Germany prepared and commenced a war which in her opinion would make her mistress of Europe, and for which preparation had been carefully made since 1890. The moment bring ready, the pretext had to be sought. This was found in the Balkans and here we must go back a little. The result of the Balkan war in 1912 was a great disappointment to Germany ; she had relied on a Turkish army, harassing Russia and threatening Egypt: these hopes were frustrated. The success of Serbia in particular was abhorrent. Alone of the Balkan states, she had a king of Slavonic race, instead of German : She was an ardent Slavonic ally and protége of Russia. The enlargement of Serbia increased Russian prestige in the Balkans and automatically lowered Austria (and therefore) German hopes and interest. Consequently the conspirators —for no other term will accurately describe Germany and Austria—determined to strike at Serbia—knowing that Russia and France were not ready and that England was on the verge of Civil war in Ireland. The heir to the Austrian throne was touring in the Austrian Balkans during July and I must ask you carefully to notice these facts.

(a) The Archduke Francis Ferdinand was extremly unpopular both in Austria and Germany.

(b) No police precautions whatever were taken in Serajevo to protect him.

(c) After the failure of one attempt to assassinate him, those precautions were still not taken.

(d) The motorcar in which he was seated when he was shot, is stated on good authority deliberately to have slowed down when it approached the place where the assassin was posted.

(e) When the Emperor of Austria had made a similar visit in the previous year, the police precautions were so elaborate that practically no one except well known officials came within 200 yards of the Emperor.

(f) Not a single Austrian official at Serajevo was placed under arrest after the murder, nor was any enquiry held to find out why the police precautions were so inadequate.

These are pretty damning incidents. sufficiently strong to compel any unbiassed man to believe that the military cliques in Germany and Austria were permitted to adopt what methods they liked to provoke war provided that the method was decisive.

The Austrian ultimatum to Serbia was described by Sir Edward Grey in his letter to the British ambassador at Vienna in the following words " I have never before seen one State address to another independent state a document of so formidable a character"—The fact is that the Austrian Government had long been planning the destruction of Serbia as a preliminary to the mastery of the Balkans—So when they judged the time was ready they demanded that Serbia should yield all the features which mark an independent state, and should submit to the gross humiliation of publishing the Austrian version of facts, not only in the newspapers. but as a royal order of the day, to the army. Serbia behaved with dignity and courage accepting most of the terms of the ultimatum (to which a time limit of 48 hours only had been given ) offering to submit the rest to arbitration at the Hague but it was apparent that Austria meant war—the Crown Prince of Serbia appealed to Russia, and the Czar promised to stand by and help if trouble come. At this point Austria got frightened and drew back—Sir Edward Grey and the French ambassador in Austria pressed hard that the matter should be submitted to arbitration and that the crisis should be given time to settle itself. Just as Austria seemed likely to assent-Germany sent an ultimatum to Russia on July 31st demanding that Russia should stop the ordinary defensive preparations for war that every country, in moments of national peril makes, and which Germany had completed *ten days before* the murder of the Archduke Francis Ferdinand at Serajevo.

Russia refused : an exchange of telegrams between the two Emperors had already taken place. By Sunday evening at 7-30 Germany declared War on Russia and set his main armies in motion for France.

France loyally stood by her compact, and on August 3rd Germany declared War against France because France

would not break her word and be false to the treaty with Russia.

England was bound by no treaty—her entente with France was close, and France might reasonably expect our help. At the same time the Balkans was not our quarrel and we had not much sympathy with their politics. On August 2nd, Sir Edward Grey announced, that, subject to Parliament's consent the British Fleet would not allow the German Fleet through the Channel: but the situation was dramatically altered. The Germans had found that the only advance into France, *viz*, through the Belfort Gap was impossible: it might be forced in time, but to them speed was essential: consequently they sent an ultimatum to inoffensive peaceful Belgium demanding a way through to France. As we know, Belgium facing destruction with honour on one hand and peace with shameful surrender on the other, to her immortal renown chose death before dishonour—the most heroic act of the war, and one of the very few national acts of virtue recorded of any nation King Albert appealed to the King of England to remember his pledged word—and England replied at once—Germany was allowed eight hours to reply that she had given up the assault through Belgian, and had respected Belgium neutrality: she took no notice and by midnight on August 4th the British Empire was committed to the greatest struggle of its existence.

Here my lecture, so far as the causes leading to the war are concerned ends. But with your permission I must touch on another side before closing. It is impossible to lecture to Indian gentlemen on such a subject without briefly mentioning the noble part that India has played in this vast struggle. It was peculiarly fitting, that India, the home of an ancient and historic civilisation, should send her armed sons to assist the Allies in their dire struggle to protect European civilisation. It has been frequently said that England will never forget this chivalrous help; I trust that Europe will never forget also. We have seen the great princes of India, the Nizam, the Maharajas of Mysore and Gwalior—to mention a few among many-mindful of their high traditions and their fame, placing their swords and their resources at the King's disposal; in particular Nepal and the Punjab have claims on our gratitude. But, gentlemen, while such chivalry stirs the blood, after all is said and done the main brunt of this war is being, and must be borne by Europeans; for it is the fate of Europe that is primarily involved. It is not the place or time to forecast the future, but we are living on the threshold of a new epoch in which we may trust and hope that many of our present troubles and difficulties will disappear or be solved: for most Englishmen, this has meant great loss; loss of something that can never be regained by us again in this life. We have seen the flower of our country

sacrifice itself for our safety, and, above all, for our honour.

> "They live in man's regret and woman's tears
> More sacred than in life, and lovelier far
> For having perished in the front of war."

But those who survive them live henceforth in the shadow of a great sorrow: we have learned how deep is the cost of freedom. But we have also learned the true measure of our friends; England, Russia and France and India, as well as the Colonies, have indeed become blood-brothers.

As to the result of the war there can be no doubt; the enemy even now are hoisting signals of distress and feeling the way towards Peace. But who can discuss peace with the nation that has murdered Belgium and to whose account the vilest horrors of war known to Europe must be laid? There can be no peace except such as we dictate. Whether this settlement will come soon or late is beyond my power to tell you, but that it will come cannot be doubted by those who believe in the goodness and justice of Almighty God.

R. B. Ramsbotham.

# ECHOES OF THE INDIAN MUTINY AT DACCA.

## The Mutiny of 1857.

The most eventful period in the modern History of Dacca, was that of the great Sepoy mutiny, which extended to the Native troops then quartered in the town. The sub-joined account is from the diary of Mr. Brennand Principal of the Dacca College, who was in Dacca at the time, and took notes of all that was going on :—

## Mr. Brennand's account.

"The mutinies began at Barrackpore in March, 1857, by the 34th N. I. Three officers were wounded. The 19th at Berhampore then showed signs of disaffection ; they were ordered to Barrackpore, and both Regiments were disbanded.

In May news arrived of the outbreak at Meerut. At this time the Sepoys stationed at Dacca consisted of two companies of the 73rd N. I. In this month the Missionaries met with some opposition from the Sepoys, whilst preaching in the Bazzar.

At the end of May or beginning of June, two other companies of the 73rd arrived from Jalpigoree as a relief for those that had been in Dacca for some time.

10th June—The troops appear excited on account of the rumour that European troops are to be sent to Dacca.

12th June—A panic spread among the Europeans, in consequence of a report, to the effect that the two companies of the 73rd which had left the station about the beginning of the month, had met with some disbanded men from Barrackpore and had mutinied ; that they had returned to Dacca, and had been joined by the men at the Lal Bagh ; that they were looting the bazar, and setting free the prisoners at the Jail.

A number of Europeans assembled at the house of Mr. Jenkins the Magistrate ; others resolved to defend themselves at the Bank. Some of the ladies went on board boats on the river ; arms were collected ; the whole town was in a state of excitement ; the bund was crowded with Natives in a state of wonder and curiosity

Lieutenants Mc Mahon and Ryhnd, the officers in command of the troops started for the Lal Bagh, where the sepoys were located. On their return, they reported that their men were all quiet and in their quarters ; that the alarm was groundless.

• On the day of the first panic, Jenkins was Magistrate, and Carnac, Collector ; subsequently Carnac was appointed Magistrate and Collector.

At this time Davidson was Commissioner, Abercrombie the Judge, Pearson Additional Judge and Bainbridge, Assistant Magistrate.

On the evening drive, the Natives who were collected in knots along the road seemed surprised to see us, after the report that we had all fled and left them to their fate.

13th June—Everything quiet again, and we are going on with our work as usual.

Between the 19th and 23rd June, the Government sent up a hundred men of the Indian Navy, under Lieutenant Lewis, for the protection of the town. They were located in the house on the opposite side of the road to the Baptist Chapel.

28th June—Two deserters were caught in the naighbourhood by the Police, but were rescued by some of the sepoys. The two companies were paraded, but the burkunda-zes either could not point out the men who had assisted in the rescue or they were afraid to do so. The sepoys complained that they could not go about the town without being interfered with by the Police.

5th July.—The Metcalfes came in from Comillah in fright; they had heard that the sepoys at Chittagong had mutinied, and that they were on their way to Dacca. The report was, however, without foundation.

" Dacca has been comparatively quiet since the arrival of the sailors. Lieutenant Lewis has his tars out frequently in the morning to practise with the guns in the space near the Racquet Court, and in front of the College. He wheels his men about in all directions; sometimes he storms the Collectorate, first at one gate, then at the other, going through all the manoeuvres for loading and firing. The sepoys on guard are very angry; they say *Yih Kia dar Dekhiata?* They do not seem to have much affection for the sailors.

To-day there was something of a panic among the sepoys. Dowell, who is in command of the station, sent up to the Lal Bagh for the screws used in elevating the guns, and the men there supposed that there was some intention of disarming them.

30th July.—A meeting of European and East Indian inhabitants capable of bearing arms was held at the College; nearly 60 people present. It was resolved to form two corps of volunteers,—one of Infantry and the other of Cavalry. Major Smith to command the Infantry, and Lieutenant Hitchins the Cavalry.

1st, 2nd and 3rd August, the three days of the Buckree Eed—The Volunteers all on the alert; patrols out all night on each of the three days. Apprehension that the Mahomedans may cause some disturbance. The 2nd being Sunday, a party of the volunteers stationed at the College to protect the people who were at Church. Great alarm amongst the European and Armenian residents, especially among those with families. The terrible news from the North-West proves the necessity of being prepared for any sudden outbreak.

11th August—Many of the Armenians

are leaving for Calcutta. The Europeans are thinking of fortifying the Mills. The volunteers are on parade for several hours daily, and making good progress in drill. File-firing to-morrow, and target practice shortly. The Natives scarcely understand the commotion among Sahibs, or the object of the 'volunteer ka pultun' who have been keeping up nightly patrols.

14th and 15th August—The festival of the Junmo Ostomee. There was as usual a large crowd of people. The Cavalry Volunteers were mounted on elephants, and well armed and ready for anything that might occur.

The Infantry were also armed, and at the College, but all passed off quietly. Letters from Julpigoree, the Head Quarters of the 73rd. The Officers say they have no hope of being able to keep their men from following the example of the rest of the Bengal Army. They have sent away two of the Ensigns to Darjeeling; but that if their men should rise, they have no expectation of being able to escape, as the country is completely under water and they have no pucka house in which they could take refuge to defend themselves.

It has been decided that if the men at Julpigoree do mutiny, the sepoys here shall be at once disarmed.

There are about 50 men at the Collectorate; and the plan will be to disarm those in the first instance and afterwards to proceed to the Lal Bag to disarm the men there and to bring away the guns now in their charge.

22nd August—The fortification of the Mills is going on; and it will not be long before the place will be ready. There are 200 men at work, digging a ditch from the nullah round the house to the river.

27th August—The fortifications are progressing; and it is supposed that should there be occasion for it, we should be able to make a stand against five or six thousand men. The country around is, however, quiet, but there are many rumours of armed men having been seen at different places coming down the river in boats.

We are informed by the Magistrate that we are to have two companies of Europeans at Dacca, and one troop of Horse Artillery, within a month.

30th August—Yesterday, Sunday, was the great day of the Mohurrum. The Cavalry volunteers were out all the night patrolling; they describe the town as unusually quiet. The people did not assemble in the same numbers as in former years. Only about 50 were present at the Hosseinee Dalan. It is believed that the Musalmans are completely cowed.

14th September—Some alarm here in consequence of a report that the sepoys in Assam are in a state of great excitement, and that they had become very insolent. The Government has sent off a number of sailors in the Horungatta by way of the Sunderbuns; they are expected to arrive here to-morrow, and are intended for Assam.

The 73rd at Julpigoree still quiet. We have hopes that it will prove staunch. Should it not, we shall be involved here; but we shall be quite a match for the sepoys, and they would probably take to flight. They have been much more respectful towards us of late.

27th September—Everything quiet. The apprehensions regarding the spread of the insurrection to Bengal are in some measure allayed.

4th October—To-day has been fixed upon by the Bishop as a day of humiliation. Winchester away at Sylhet. The service was read by Abercrombie, and the sermon by Pearson. In Dacca we are all quiet. The Rajah of Assam was brought in a prisoner the day before yesterday.

12th October—The Cavalry Volunteers gave a ball to the Infantry. The gathering not so great as expected; about 10 ladies present. Of the infantry Volunteers only about 20 attended in uniform. The party was, on the whole, a very a very pleasant one.

19th October—Some of the sepoys here have been recently punished, but the matter has been kept quiet.

November 1st.— Something like a panic occurred on Sunday last, caused by the removal of the sailors to the house near the Church recently occupied by the nuns. The sepoys got ammunition out of the Magazine; and it was thought that an outbreak was imminent. It is reported that they have written to their brethren at Julpigoree, asking whether they should resist if an attempt were made to disarm them. We believe that the disarming could be effected with little danger to ourselves; but it is feared that the effect on the troops at Chittagong, Sylhet and Julpigoree might be disastrous. It is supposed that if we can preserve order in Dacca, the other places will remain quiet. The men are very civil, but with the example of their 'Jat bhais' before us, we cannot put much trust in them.

9th November—The Infantry Volunteers gave a dinner to the station. It came off in the large hall of my house. It was one of the largest parties of gentlemen that has ever been in Dacca.

About 70 were invited, and upwards of fifty sat down to dinner. People thought that my house would not be large enough for the occasion, but everything was very conveniently arranged.

17th November—Everything continues quiet around us and the news from the North-West is more cheering.

26th November—The storm that has been passing over India has just passed over Dacca. happily, without any of the disastrous effects that have attended it in its course elsewhere. We are now rid of our 'staunch' and 'loyal' friends the sepoys. Up to Saturday last we were going on just as usual. There was a party out at cricket in the afternoon. and the volunteers were at their usual exercise with ball cartridge. In the evening we had our usual drive on the course. The dawk, however, brought

bad news from Chittagong; and an express was received with intelligence that the remnant of the 34th, the Regiment disbanded at Barrack-pore at the beginning of the mutiny, had broken out; that they had looted the Treasury, taking with them about three Lakhs of rupees; and that they had also killed several Europeans and escaped. At about 6 O'clock in the evening, it was determined that the sepoys here, the detachment of the 73rd. should be disarmed; their number including the Artillery men under the command of Dowell, was 260. They had possession of two field pieces; and in their lines they held a remarkably strong position. It is reported that they threatened to resist any attempt at disarming them, and they affected to despise our sailors who are generally of small stature. The sailors were about 90 in number, fit for duty. It was therefore necessary that they should use great precautions in dealing with a body of armed men, nearly three times their number.

The volunteers were warned to be ready at 5 O'clock the following morning, Sunday, the 22nd and they were enjoined to assemble quietly, so as to excite no suspicion.

At the time appointed, there were assembled the Commissioner, the Judge and some other Civilians, and from twenty to thirty volunteers. It was still dark, and we waited a short time for the signal. The plan was to begin by disarming the Treasury guard, to place the disarmed men in charge of the volunteers; the sailors would then proceed with their whole force to Lal Bagh; and it was hoped that the men there would have given up their arms without opposition. Everything appeared to go well; the guards at the Treasury were disarmed before the signal was given for the volunteers to advance. There were about 15 fifteen of the Sepoys standing or sitting out-side of their quarters, and the rest of them, making altogether about 39, were supposed to be inside the building. They appeared to be very much dejected, and they reproached their officers for subjecting them to such disgrace, protesting that they would have given up their arms at once to their own officers, had they only been asked to do so.

In the meantime, the sailors, on reaching the Lal Bagh, found the sepoys drawn out, prepared to make a resistance; they had evidently been apprised of our intention to disarm them. The sentry fired his musket and killed one of our men; his example was followed by the others and a volley was fired on the sailors as they advanced through the broken wall near the southern gateway. The guns had been placed in position in front of Beebee Peri's tomb, so as to command the entrance, and they opened fire upon our men with grape. As soon as the sailors had got well into the place, they fired a volley. Lieutenant Lewis then led them up the ramparts to the left, charging the

sepoys, and driving them before them at the point of the bayonet. The Sepoys took shelter in their quarters, but they were driven on from building to building by the sailors. At this time Mr. Mays, a midshipman, at the head of eight men who were under his command, made a gallant charge from the ramparts down upon the sepoy guns; they were soon taken and spiked, and the sepoys began flying in every direction. There was a severe struggle at the end of the rampart: many of the sepoys were driven over the parapet. Mr. Bainbridge had also a a fall over the parapet as he stepped back to avoid the thrust of one of the sepoys. The sailors obtained a complete victory; the sepoys fled and concealed themselves in the jungle, leaving about forty of their number killed. Many of those who escaped were severely wounded. Our loss was one killed on the field, four severely wounded, since dead and some more or less severely wounded. Dr. Green, who accompanied the sailors, was wounded in the thigh. He was kneeling down at the time attending to one of the sailors, who had also been wounded. He is getting on well, but complains of numbness in the lower part of the leg.

"A number of the fugitive sepoys have been brought in. Four of them have been already hung, and several others are to undergo the same punishment."

"On Monday everything was quiet again, and we are going on with our work as if nothing had happened, but many of the Natives left the city through fear."

"29 November.—We have had great apprehensions during the week regarding the residents at Mymensing and Sylhet. It has been ascertained that our fugitive sepoys were on their way towards those places."

"It is fortunate, however, that they are not all proceeding together. The largest party only took the Toke road towards Mymensing, about twenty of their armed men were in front, then followed some of the disarmed-men, and only one woman with her children; then the wounded, who appear to have been numerous, and lastly, another body of about thirty armed men."

"As they approach Mymensing, the Magistrate, with a number of burkundazes, took the field to oppose their passing through the station. They declined the fight, and took the direction to Jamalpore."

"The Chittagong mutineers were on their way to Dacca, and it was supposed that their object was to join the men of the Seventy-third. It was then reported that they were about to cross the Tipperah hills to join the men stationed at Sylhet. It is now currently reported that they are at a place on other side of Commillah; that they have sent a message to the Rajah of

• This Officer was afterwards made V. C. for his dashing behaviour on this occasion.

Tipperah, that if he does not join them they will dethrone him. The European inhabitants of Comillah, and the respectable Native inhabitants, have all got away.

"30th. November.—Three of the Lal Bagh mutineers were hung this morning; these with eight others that have already undergone the same punishment, make eleven in all. We consider that such examples are absolutely necessary in these times. They have produced an excellent effect upon the people, and the bad characters of the town thoroughly understand the lesson that has been read to them. I do not remember the time when the natives were so civil in their behaviour as they are now.

"3rd December.—Two steamers and a flat arrived his morning with 300 of the 54th Queen's Regiment and 100 sailors on board. The soldiers start for the Tipperah district as soon as a sufficient stock of provision can be collected. It is supposed that they will be in time to intereept the men from Chittagong before they can reach Sylhet. The sailors will proceed to Bulwah on their way to Rungpore. It is to be hoped they are not too late.

"The Sylhet dawk is stopped. It is supposed that the Chittagong mutineers are some-where on the Sylhet road.

"9th. December.—The latest reports from Sylhet state that the Chittagong mutineers had not reached that station, that they were somewhere in the territories of the Rajah of Tipperah ; and that they were afraid to venture upon the plains for fear of the *Gora Log*. Their party in all consisted of about 500 including their women and children and the prisoners they had set free from goal at Chittagong. They were in great want of provisions and were stockading themselves, expecting an attack to be made upon them.

18th December.—No tidings for the last few days from Sylhet. The news received was to the effect that the people there were prepared to give the mutineers a warm reception if they should venture upon attacking them. We hope to hear shortly from the troops which left us so lately.

"The Dacca mutineers are supposed to be somewhere in Bhootan.

"14th. January 1858,—The station is now somewhat gay. The steamers with the European troops have returned. The Chittagong mutineers had kept too close to the jungle on their way to Sylhet. The Sylhet Light Infantry came up with them on two occasions, and each time they have beaten them.

"The soldiers and sailors are strolling about the streets in great numbers. There is some uncertainty if they are to remain at Dacca. The general impression is that they are not required here, and that they might be usefully employed elsewhere.

"24th. January.— The European troops have left for Calcutta. Although everything is quiet on this side of the country, the sailors will probably remain for several months longer.

# ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৫ম খণ্ড। ঢাকা—কার্ত্তিক, ১৩২২ ৭ম সংখ্যা


## বেলজিয়মের রাসায়নিক শিল্প।

কিছুদিন পূর্ব্বেও হয়ত অনেকেই বেলজিয়ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন না। কিন্তু ইউরোপে যে মহাসমর চলিতেছে, তৎপ্রসঙ্গে বেলজিয়ম ও তদ্রাজ্যস্থিত লীজ্, নামুর, ব্রুশেলস্, এণ্টোয়ার্প, মন্‌স্, ঘেণ্ট, অষ্টেণ্ড, টুর্নাই, কোর্টরেয়াই, লোভেন প্রভৃতি স্থানের নাম সাধারণ পাঠকের নিকটেও সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বেলজিয়মরাজ্যের অধিকাংশ ভাগই জার্ম্মেনীর করায়ত্ত, এবং বেলজিয়মবাসিগণ স্বদেশ-বিতাড়িত। বেলজিয়ানদের দুঃখ ও দৈন্যে সমগ্র জগৎ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। এমতাবস্থায় বেলজিয়মের শিল্প-গৌরবের বিষয় আলোচনা অসাময়িক হইবে না মনে করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা গেল।

বেলজিয়ম ইউরোপের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, ও উত্তর সাগরের পূর্ব্বোপকূলে অবস্থিত। লীজ্ ও নামুর সুদৃঢ় দুর্গবেষ্টিত নগর; ব্রুশেলস্ বেলজিয়মের রাজধানী; এণ্টোয়ার্প অসংখ্য দুর্গমালা ও পরিখাবেষ্টিত উত্তর সাগরোপকূলস্থিত সমৃদ্ধিশালী বন্দর; ঘেণ্ট অতি সুদৃশ্য নগর—মর্ত্তের অমরাবতী; অষ্টেণ্ড দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দর; টুর্নাই ও কোর্টরেয়াই নামক স্থানদ্বয়ে মুষ্টিমেয় বেলজিয়ান্ সৈন্য যেরূপ অমিততেজে অগণিত জর্ম্মানসেনার পতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত থাকিবে; মন্‌স্ প্রসিদ্ধ রণক্ষেত্র; লোভেন্ বিশ্রুতনামা বিশ্ব-বিদ্যালয়।

অতি ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও বেলজিয়ম শিল্প ও বাণিজ্য-গৌরবে সমগ্র সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয়। লোক সংখ্যার অনুপাতে, প্রত্যেক লোক হিসাবে বেলজিয়াম হইতে যতটা পণ্য উৎপন্ন ও রপ্তানী হইয়া থাকে, পৃথিবীর আর কোন দেশ হইতে সে অনুপাতে রপ্তানী হয় না। একদিকে বেলজিয়ান্‌গণ যেরূপ পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়ী, অপরদিকে তাহারা সকলেই বিলাসিতাশূন্য

এবং আত্মনির্ভরশীল। যুবক, বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই কর্ম্মী এবং কর্ম্মই তাহাদের আনন্দ ও শিল্পই প্রধান জীবিকা। খনিজ ঐশ্বর্য্যের প্রচুরতা, লোক-সংখ্যাধিক্য, ও জনসাধারণের স্বাভাবিক আশ্চর্য্য কার্য্য-তৎপরতা বেলজিয়মের শিল্পোন্নতির প্রধান কারণ।

বেলজিয়মের প্রধান শিল্প সমূহের তালিকা করিলে দেখা যায় যে তৎদেশস্থ বিবিধ ধাতু ও বাষ্পীয় ও অন্যান্য যন্ত্রাদি সংশ্লিষ্ট শিল্প বিশেষ উন্নত। এতদ্ব্যতীত বিলাতী মাটী বা সীমেণ্ট্ (Cement) বহুস্থলে প্রস্তুত হয়। ত্রুশেলস্ নগরে সীমেণ্ট ব্যবসায়ীদের প্রধান আড্ডা এবং উক্ত স্থান হইতেই সীমেণ্ট রপ্তানী প্রভৃতির বন্দোবস্ত হয়। সোডা (Soda) বা ক্ষার প্রস্তুতের কারখানার সংখ্যাও কম নহে। বেলজিয়মে উচ্চ অঙ্গের রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ বিশেষ প্রস্তুত না হইলেও ত্রুশেলস্ নগরে কৃত্রিম রঙ্গ প্রস্তুতের একটী ও ঔষধ প্রস্তুতের একটী কারখানা সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। নিম্নে একটী একটী করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত শিল্প সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

**লৌহশিল্পঃ**—মিউজ (Meuse) নদীতীরে অবস্থিত লীজ নগরের চতুর্দ্দিকে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং লীজের সন্নিকটে কতিপয়সংখ্যক বড়রকমের লৌহকারখানা অবস্থিত। উহাদের অধিকাংশই যৌথপদ্ধতিতে পরি-চালিত এবং উহারা লৌহবর্ম্ম, কড়ি, চলনক্ষমবাষ্পীয় যন্ত্র (Locomotives), নানাপ্রকার বৃহৎযন্ত্র, বন্দুক ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত কারখানা সমূহের মধ্যে 'Societe Anonyme John Cockrill 'The Societe Anonyme St. Leonard', 'The Societe Anonyme La Marihaye', 'The Societe Anonyme La Meuse' প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। লৌহজাত পণ্য প্রস্তুত বিষয়ে ইউরোপের সর্ব্বত্র পরিচিত জর্ম্মাণীর ক্রুপ (Krupp) এবং ফ্রান্সের ক্রেনসট্ (Creusot) কোম্পানীর পরেই (Cockrill) ককরিল কোম্পানীর স্থান। উক্ত কোম্পানীর কারখানা লীজ হইতে৺পাঁচমাইল দূরে সেরাইং (Seraing) নামক স্থানে অবস্থিত এবং উহাতে দৈনিক ১০,০০০ হইতে ১২,০০০ লোক কাজ করিয়া থাকে। সেরাইং (Seraing) নগরের লোকসংখ্যা ৩৫,০০০; এবং উহাদের সকলেই জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ককরীল কোম্পানীর উপর নির্ভর করিয়া থাকে। লৌহসেতু, জাহাজ, বাষ্পীয় শকট এবং এই শ্রেণীর বস্তুই সাধারণতঃ ককরীল কোম্পানীতে প্রস্তুত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লীজ নগরের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে যন্ত্রবিভাগে ককরীল কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত বস্তুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল এবং দর্শকবৃন্দের কৌতূহল ও মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে যে বাষ্পীয় গাড়ি প্রচলিত হয় এবং উহা যে লৌহবর্ম্মের উপরদিয়া গমনাগমন করিয়াছিল তাহার সমস্তই ককরীল কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছিল। ককরীল কোম্পানীর পর সেরাইং ও লীজের মধ্যে অবস্থিত La Marihaye কোম্পানীর নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত কোম্পানী লৌহবর্ম্ম (Rails) প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত। ঘেণ্ট নগরও লৌহব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। ঘেণ্ট নগরস্থ লৌহকারখানা সমূহের মধ্যে 'Carels Freres' এবং 'Phoenix' কোম্পানী সর্ব্বা-পেক্ষা সমৃদ্ধিশালী। বর্ত্তমান সময়ে বেলজিয়মে পূর্ব্বো-ল্লিখিত কারখানা ছাড়া আরও বহু কারখানায় বাষ্পীয় গাড়ি প্রস্তুত হয়; এবং বেলজিয়ম হইতে প্রতিবৎসর বহুকোটিটাকা মূল্যের লৌহজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

**বিলাতীমাটী বা সিমেণ্টশিল্পঃ**—আঠাল মাটীর কাজ বেলজিয়মের একটী উন্নত শিল্প। মোটামোটী তিন প্রকার আঠাল মাটী প্রস্তুত হইয়া থাকে, যথা—স্বাভাবিক আঠালমাটী, লৌহ সংযুক্ত আঠালমাটী (Iron Cement), কৃত্রিম আঠালমাটী বা বিলাতীমাটী (Portland Cement)। টুর্ণাই নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক আঠালমাটী পাওয়া যায়। উহাদিগকে শুষ্ক ও উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইলেই ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে; অবশ্য রাসায়-নিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা উহাদের উপযোগীতা নির্দ্ধারণ করা হয়। বলাবাহুল্য বিলাতীমাটীর তুলনায়

স্বাভাবিক আঠালমাটীর মূল্য অতি অল্প। লৌহসংযুক্ত আঠালমাটী, লৌহকারখানা সমূহের অব্যবহার্য্য ও পরিত্যক্ত ঝামা হইতে প্রস্তুত হয় এবং পাকা রাস্তা, দালানের ছাদ প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিলাতীমাটী, বিশুদ্ধ কর্দ্দম ও খড়ি মাটী সংযোগে প্রস্তুত হয়। বেলজিয়মে বিলাতি মাটীর কারখানার সংখ্যা অল্প নহে। উহাদের তত্ত্বাবধান ও সুচারুপরিচালনার্থে ব্রুসেলস্ নগরে Societe 'Anonyme De Ciment Portland De Belligique' নামে একটী সভা আছে। উক্ত সভা বিলাতীমাটী সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহের উন্নতিকল্পে পন্থা প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং দেশীয় ব্যবসায়ের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে ঐ সভার কোন সম্পর্ক বা দায়িত্ব নাই। বেলজিয়মে বাৎসরিক ৭০০,০০০ টন বা ১৯,০০০০০০ মণ বিলাতী মাটী উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহার ১/৭ অংশ অর্থাৎ ২,৭০০,০০০ মণ মাত্র দেশে ব্যবহৃত হয়; অবশিষ্টাংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি টন ১৮ টাকা। মাশুলের জন্য বেলজিয়ম হইতে বিলাতীমাটী ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়া প্রতিযোগীতা করা অসম্ভব বিধায় বেলজিয়মজাত সীমেণ্ট এপর্য্যন্ত ইংলণ্ডে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই! অবশ্য অন্যান্যদেশে বেলজিয়মে প্রস্তুত সীমেণ্ট ইংলণ্ডে প্রস্তুত সীমেণ্টের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া আসিতেছে।

**কৃত্রিম রেসম শিল্প :**—ইংলণ্ডেই সর্ব্বপ্রথমে কৃত্রিম উপায়ে রেসম প্রস্তুতের চেষ্টা হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের অনুসৃত প্রণালীর জটিলতা প্রভৃতি নিবন্ধন পূর্ব্বোক্ত চেষ্টা সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ পশ্চাৎপদ বা ভগ্নোদ্যম না হইয়া অন্যান্য নানাবিধ প্রণালীতে কৃত্রিম রেসম প্রস্তুতের চেষ্টা করিতে থাকেন, এবং অবশেষে Chardonet নামক জনৈক রসবিৎপণ্ডিত কার্পাসতন্তু হইতে নানা প্রকার রাসায়নিক উপায়ে উহার মসৃণতা বৃদ্ধি ও বাহ্য আকৃতি সুন্দর করিয়া কৃত্রিম রেসম প্রস্তুত করেন। বাহ্য আকৃতিতে রেসমের ন্যায় বলিয়া উহা কৃত্রিম রেসম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে কখনও "সারডনেট্" রেসম নামেও পরিচিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম রেসমের সহিত প্রাকৃতিক রেসমের কোন সম্পর্ক নাই। অল্প কাল মধ্যেই কৃত্রিম রেসমের ব্যবহার অপ্রত্যাশিত ও অকল্পিত ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কৃত্রিম রেসম স্থায়ীত্ব হিসাবে প্রাকৃতিক রেসম হইতে নিকৃষ্ট হইলেও বাহ্যিক চাকচিক্যে ইহা উচ্চস্থানীয়। কৃত্রিম রেসম দ্বারা নানাপ্রকার ফিতা, বেণী প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সম্প্রতি "Cerofirm" প্রণালীতে গ্যাসালোকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিহেতু আলোকাবরণ ("incandescent gas mantles") প্রস্তুতের জন্য কৃত্রিম রেসম ব্যবহৃত হইতেছে। বেলজিয়মে টিউবিজ্ ( Tubize ) নামক স্থানে 'Societe Anonyme La soie artificielle de Tubize' নামক একটী বৃহৎ ও সুপ্রতিষ্ঠিত কৃত্রিম রেসমের কারখানা আছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাঁচ বৎসর মধ্যেই লাভাংশ হইতে মূলধন উঠিয়া গিয়াছে। বেলজিয়মজাত কৃত্রিম রেশম প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

**রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত শিল্প :**— সূক্ষ্ম রাসায়নিক ঔষধাদি প্রস্তুত বিষয়ে বেলজিয়ম জর্ম্মাণীর তুলনায় বহু পশ্চাৎপদ হইলেও ভারতবর্ষের ন্যায় সামান্য বস্তুর জন্যও পরের উপর নির্ভর করেনা। ব্রুশেলসের নিকট Haren Nord নামক স্থানে Destra Wiescher & Co. তে বহুপ্রকার কৃত্রিম রং ও জার্ম্মাণ কারিকরদিগের নিকট হইতে ক্রীত কৃত্রিম রং সমূহের সংমিশ্রণে ইচ্ছানুরূপ নানাবিধ নূতন রং প্রস্তুত হয়। এই যৌথকুঠীর ব্যবসায় অতি বিস্তৃত। ইহারা উত্তর ইংলণ্ডের বহুকারখানায় কৃত্রিম রং সরবরাহ করিয়া থাকে এবং ভারতবর্ষের সঙ্গেও ইহাদের ব্যবসায় সামান্য নহে। উক্ত কার্য্যালয় সূতা রং করিবার একপ্রকার অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্র সাহায্যে সূতা রং করিতে কোন লোকের প্রয়োজন হয় না। 'Laboratories Optima' নামক যৌথ কারখানায়, ইংলণ্ডে Buroughs Wellcome & Co. এবং জর্ম্মাণীতে Messer Bayer & Co. কে যেরূপ

উৎকৃষ্ট ঔষধাদি প্রস্তুত হয়, অনেকটা তদনুরূপ ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কারখানার মূলধন ১,৫০০,০০০, ফ্রাঙ্ক ( ১ ফ্রাঙ্ক=৷৶০ ), সেরাম (Serum), ( Morphia ) মরফিয়া, ষ্ট্রিক্নিন্ ( Strychnine ) ও প্রতিষেধক ঔষধাদি এই কারখানার বিশেষত্ব। ইহারা সাধারণ শৈত্যে কোন বস্তুকে বিষাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য অঙ্গারকাম্ল (Carbon dioxide) সাহায্যে অনুর্ব্বরা করার নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই কারখানা ক্ষতস্থানে লাগাইবার বিষাণু-শূন্য ও বিষাণুর আক্রমণ রোধক বস্ত্র ( Sterilised lints ) প্রস্তুতের জন্য প্রসিদ্ধ। নানাপ্রকার ঔষধের বটি বা চাক্তি ( tablets ) প্রস্তুত সম্বন্ধেও এই কোম্পানী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কোম্পানীর সংলগ্নস্থিত রসশালা সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রাদির দ্বারা সজ্জিত এবং বিভিন্ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্দ্ধারিত আছে। সাধারণতঃ পরিণতবয়স্কা কুমারীরাই এই অংশের অধিকাংশ কাজ করিয়া থাকেন; কারণ পরীক্ষা দ্বারা পরিচালকগণ দেখিয়াছেন যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকগণ অধিকতর সুচারুরূপে এবং সতর্কতার সহিত কাজ করিয়া থাকে।

বয়নশিল্প:—( পশম ):—ভারভিয়ারস্ ( Verviers ) নামক স্থান পশমশিল্পের কেন্দ্র। এই স্থানে বহুসংখ্যক কারখানায় নানাপ্রকার পশমজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। উক্ত কারখানা সমূহের মধ্যে 'Societe Anonyme De La Vesdri' এর নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। এই কারখানার মূলধন ১৫০০০০০ ফ্রাঙ্ক, এবং ইহাতে গড়ে ৭০০ লোক দৈনিক কাজ করিয়া থাকে। এই স্থানে পশম পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া বয়ন ও রঞ্জন পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই সম্পন্ন হয়। ভারভিয়ারসের কারখানাসমূহ ছাড়া অন্যান্য পশমের কারখানার মধ্যে ব্রুসেলসের ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 'Societe Anonyme De Loth' নামক কুঠির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কুঠির একটী বিশেষত্ব এই যে ইহারা নিজেরাই বণিক এবং আমেরিকা, স্পেইন ও ভারতবর্ষে নিজেদের শিল্পসম্ভার রপ্তানী করিয়া থাকে। দ্বিসহস্রাধিক লোক এই কারখানায় দৈনিক কাজ করে। শিক্ষানবিশ বালিকাগণ একটী করিয়া তাঁত পরিচালনা করিয়া থাকে, এবং দুইটী তাঁতের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য একজন স্ত্রীলোক নিয়োজিত আছেন। বেলজিয়মের বয়নশিল্পের বিশেষত্ব এই যে একই কারখানায় বহুপ্রকার কাজ হইয়া থাকে। অন্যান্য দেশে সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হয় এবং কার্য্যবিভাগ নিবন্ধন ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হয়। ঐরূপ কার্য্যবিভাগ না থাকাতেই বয়নশিল্পে বেলজিয়ম ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগীতা করিতে পারিতেছে না।

পূর্ব্বে যে সমস্ত শিল্পের নাম করা হইয়াছে তদ্ব্যতীত কাগজ, শ্বেতসার ( Starch ), কৃত্রিম প্রস্তর, অস্ত্রাধার মৃণ্ময়পাত্র প্রভৃতি প্রস্তুতের বহুকারখানা বর্ত্তমান রহিয়াছে। খেলিবার তাস, নানাপ্রকার খেলনা, চিমনী ও অন্যান্য কাচের দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে বেলজিয়ম হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ, শব্দ বিহীন "Minerva" নামক মটর গাড়ি Antwerp নগরে প্রস্তুত হয়।

বলাবাহুল্য বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য মহাসমরের ফলে বেলজিয়মের সর্ব্বপ্রকার শিল্পই সম্পূর্ণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার

# সমালোচক।

( গল্প )

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীতে এমন এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা নেহাত অশোভন ভাবে একটা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করতঃ অন্যের হাস্যোদ্রেকের কারণ হয়, এবং তাহাতে নিজকে অপমানিত বোধ করিয়া সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে পাল্টা-ভাবে প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করে, এখন তাহা যুক্তি-সঙ্গত হউক আর না হউক। আমাদের কান্তিচন্দ্র এই শ্রেণীর। সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পর সে গল্পলেখকরূপে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইল; কিন্তু পরীক্ষা পাশ করা ও গল্প লেখা যে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের ক্ষমতা তাহা সে এক-বারও চিন্তা করিয়া দেখিল না। ভাবিল—উচ্চশ্রেণীর এম্, এ সে, কলমের জোরে কত নামজাদা প্রবীণ অধ্যা-পককে ঘোল খাওয়াইয়াছে, সে কি আর সামান্য গল্প লিখিতে পারিবে না। অল্পদিনের ভিতর গ্রীক্, ল্যাটিন প্রভৃতি বিজাতীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়া গভীর গবেষণা-পূর্ণ কত essay ( রচনা ) লিখিয়াছে, সে কি না মাতৃ-ভাষায় এক আধটা মনোরম গল্প বা উপন্যাস লিখিতে পারিবে না!—হাঃ হাঃ হাঃ!—তাহার বড়ই হাসি পাইল। —"উপন্যাস লিখা ভারি ত কঠিন। এই ত ধর, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—শৈবলিনী নায়িকা, প্রতাপ নায়ক, মাঝখানে একটা কণ্টক চন্দ্রশেখর। তাই প্রতাপ শৈবলিনীর মিলন ঘটিল না। কাজেই শৈবলিনী উন্মাদিনী হইল, প্রতাপ বেচারা মৃত্যুমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অবশ্য ইহা না লিখিয়া, উভয়ে 'হাইড্রসিয়ানিক এসিড' বা আফিম্ ( তেঁতুলসহ গুলিয়া ) আকণ্ঠ পান করিয়া আত্মহত্যা করিল, লিখিলেও চলিত। ঈঃ! ভারী ত একটা বিষয়! এই সামান্য কথাটা প্রেমের বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই আন্দাজ করিতে পারে। কিন্তু ইহা লিখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের নাম কত! অমন উপ-ন্যাসিক নাকি ভূভারতে আর জন্মায় নাই! বলিহারি যাই দেশরে আমার!" কান্তি মুণাল ভ্রূযুগল ও নাসি-কার অগ্রভাগ কুঞ্চিত করিল। কিয়ৎকাল পরে মাথা নাড়িয়া ভাবিতে লাগিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, দেখিবে যখন আমি আসরে নাবিব। এতদিন Universityতে আটক থাকায় সাহিত্যচর্চ্চার ফুরসুৎ পাই নাই। এখন আর ভাবনা নাই, চিন্তা নাই। দেখিও কলমের মুখে কেমন ভাব ও ভাষার ফোয়ারা ছুটাইব, এবং সেই ধাক্কায় বঙ্কিম টঙ্কিমের নাম কোথায় ভাসিয়া যাইবে! আর ভারতবর্ষময়—শুধু ভারতবর্ষ কেন সমস্ত জগৎময়, আরে ছেঃ, তাই বা কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় গীত হইবে আমার নাম—'কান্তিচন্দ্র, কান্তি বাবু!'—হেঃ হেঃ হেঃ।" উৎসাহিত কান্তিচন্দ্র গুম্ফজোড়া সজোরে মুচ্ড়াইতে লাগিল, হাস্যবিজলীচ্ছটায় মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তদবধি কান্তিচন্দ্র বিরলে বসিয়া, গালে হাতদিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া লিখিত। কিন্তু শুধু লিখিয়াই তৃপ্তি লাভ করা যায় না, আপামর সাধারণের নিকট ও তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হয়,—মানুষ মাত্রেই যশোলিপ্সু। তাই কান্তিচন্দ্র লিখিল, লিখিয়া ডাকটিকিট খরচ করিয়া গল্পগুলি মাসিক পত্রিকার সম্পাদকবর্গের সমীপেষু করিল। কিন্তু প্রায় গল্পগুলিই 'ধন্যবাদ সহকারে' ফেরৎ আসিল, এবং যে দু' একটি গল্প বা বাহির হইল পরমাসে অন্যান্য পত্রিকায় তাহা এমন তীব্র ভাষায় সমালোচিত হইল যে তাহা পড়িয়া কান্তির মনে হইল সমস্ত পৃথিবীর লোকই হিংসুক, এবং পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী।—তাই বঙ্কিমচন্দ্রের এত সমাদর আর তাহার এত অনাদর! হায় জহুরী ছাড়া জহরের মর্ম্ম কেহ বুঝে না। রোষে, দুঃখে, অভিমানে কান্তিচন্দ্র জ্বলিতে লাগিল।

পাঠক হয়ত কান্তিচন্দ্রের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন, কেহ কেহ ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাকের কথাটারও উল্লেখ করিতেছেন।—কিন্তু কান্তিচন্দ্রকে আপনারা যতটা উপহাসাস্পদ মনে করিতেছেন বাস্তবিক সে ততটা নহে। প্রথমতঃ ধরুন, কান্তিচন্দ্র সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। এই বয়সটায়, জীবনের

এই মধুময় বসন্তে,—প্রাণের ভিতর ঠাণ্ডামিঠা ফুর্‌ফুরে হাওয়া, ফুলের গন্ধ গায়ে মাখিয়া, যখন ঝির্‌ ঝির্‌ করিয়া বহিয়া যায়, তখন কেমন একটু গোলাপী নেশায় সকলের মনই মাতাল হইয়া উঠে। কেহ ফুলের দেশের স্বপ্ন দেখে, কেহ মুক্তছাদে পড়িয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশাতে চাঁদের রূপ-সুধা পান করে, কেহ চকোরের উদাসপারা তান শুনিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে, রাশি রাশি প্রাণস্পর্শী উদাস-করা কবিতা ও উপন্যাস লিখিয়া ফেলে। পাঠক, রাগ করিবেন না, আপনাদের ড্রয়ার খুঁজিলে এখনো ঐরূপ দু' চারিটি কবিতা বা উপন্যাস মিলিতে পারে। তবে আপনারা তাহা ছাপান নাই, কান্তি ছাপাইয়াছে,—এই যা। আপনারা বলিতে পারেন—"সে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আড়াআড়ি করিয়া তাহা ছাপাইল কেন? কেন সে খদ্যোৎ হইয়া পূর্ণিমার শশধরের সহিত নিজের তুলনা করিয়াছিল, বামন হইয়া সে কেন পর্ব্বতলঙ্ঘন করিতে চাহিয়াছিল?"—ইত্যাদি। কিন্তু বলিয়াছি ত "মানুষ যশোলিপ্সু"। আপনারা বিজ্ঞভাবে বলিবেন "আমরাও ত মানুষ। কিন্তু আমরা তো এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থান দেই না।" আবার বলি "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ" কান্তিচন্দ্র ভিন্নরুচির লোক। এপর্য্যন্ত লেখাপড়া, খেলা, গীতবাদ্য ইত্যাদিতে কৃতকার্য্য হইয়া তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল—পৃথিবীতে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। সেই বিশ্বাসে বড় গর্ব্বভরে সে সাহিত্য আসরে নামিয়াছিল, কিন্তু তাহার সেই দর্প চূর্ণ হইল। কান্তিচন্দ্র উপন্যাসিক হইবার আশায় চিরকালের জন্য জলাঞ্জলি দিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারে শান্তি না মিলিলে লোকে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়,—কান্তিচন্দ্র উক্ত প্রকারে খ্যাতি অর্জ্জন করিতে অক্ষম হইয়া উপন্যাসিক হইবার আশা ত্যাগ করিল, সমস্ত লেখক ও সম্পাদকের উপর প্রতিশোধ নিবার জন্য সমালোচক হইল। এবং—সকলেই পরোক্ষে বলাবলি করিত—"শ্রীশ বাবু নামজাদা সমালোচক বটেন কিন্তু হৃদয়হীন ডাক্তারের মত। রোগীর স্ফোটকে লেন্‌সেট চালাইয়া গলিত মাংস বেশ বাহির করেন, কিন্তু সবল মাংসও অনেক কাটেন. অতিরিক্ত রক্তপাতে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" তাহারা ইহার কারণ বুঝিতে পারিত না, পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন।

অল্পদিনে শ্রীশবাবু (কান্তিচন্দ্র এবার ছদ্মনাম ধরিয়াছিল) সাহিত্য-ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী সমালোচক বলিয়া সুপরিচিত হইয়া পড়িল। পূর্ব্ব অপমানকারীদের উপর প্রতিশোধ নিবার জন্য সে সমালোচকের আসন গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এভাবে যে এইরূপ খ্যাতিলাভ করিবে তাহা সে কল্পনা করে নাই। কলেজে থাকিতে সংস্কৃত ভাষায় সে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। অপূর্ব্ব মেধাবলে অল্পদিনে বাঙ্গলাভাষাটাও আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। লেখকদের লেখার উপর কলম চালাইয়া সে পদে পদে ভাষা ও ব্যাকরণের ভুল ধরিয়া, টীকা টীপ্পনি করিয়া, কাটিয়া ছিঁড়িয়া প্রবন্ধগৌরব একেবারে নষ্ট করিয়া দিত। হৃদয়হীন ডাক্তারের মত কাটা ছেঁড়া করিত, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে মুখ ফুটিয়া কাহারো কিছু বলিবার যো ছিল না। ভাষা ও ব্যাকরণের উপর তাহার অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল, কাজেই তাহার বিরুদ্ধে কেহ দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইত না। তাহার সমালোচনা-ছুরিকার তীক্ষ্ণ আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধির সিক্ত দেহে অনেক লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া, কান্তিচন্দ্র বিজয় গৌরবে সমালোচকের আসনে বসিয়া, পরম তৃপ্তি লাভ করিল। লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদক বর্গ এখন তাহার করুণ দৃষ্টি লাভের জন্য লালায়িত এই কথাটা ভাবিয়া সে মনে মনে বড়ই গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সে দিন ভোরবেলা কান্তিচন্দ্র নিজের ড্রইং রুমে টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া লিখিতেছিল। উন্মুক্ত গবাক্ষপথে সুরভিত প্রভাত-সমীরণ ঝির্‌ ঝির্‌ করিয়া আসিয়া তাহার কালো কালো কোকড়ান চুলগুলির সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। দূরস্থিত কাননের বিহগ-কাকলী ক্ষীণভাবে কক্ষমধ্যে আসিয়া ভাসিতেছিল। কান্তিচন্দ্র আপন কাজে বিভোর। টেবিলের উপর

রাশি রাশি পুস্তক ও মাসিক পত্রিকা। কান্তি প্রায় সকলগুলিই পড়িয়াছে, এবং নিজের আবশ্যকমত লাল নীল পেন্সিলে নানারূপ দাগাইয়াছে। এইক্ষণ সাদা ফুলস্কেপ কাগজে সমালোচনা লিখিতেছিল। লিখিতে লিখিতে এক একবার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিতেছিল, দন্তে অধর চাপিতেছিল। বলা বাহুল্য কান্তিচন্দ্র পূর্ব্বলাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতেছিল। সে একবার লিখিল, একবার কাটিল,—আবার পরিষ্কার করিয়া লিখিল।

প্রতিমাসেই প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার সম্পাদকবর্গ তাহার নিকট প্রাপ্ত পুস্তিকাগুলি সমালোচনার্থ প্রেরণ করে এবং সে জন্য কান্তিচন্দ্র বিলক্ষণ দক্ষিণা প্রাপ্ত হয়।।

ইতিমধ্যে যে সকল লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে কলমরূপ লাঙ্গলে চষিয়া, যশঃরূপ ফসল উৎপন্ন করিতেছিল তাহাদের ভিতর একটি মহিলার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহিলাটির নাম প্রমীলা দেবী। গল্প, উপন্যাস ও কবিতা লিখিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা এবং প্রতিমাসেই তাঁহার লেখা বুকে ধরিয়া মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি ধন্য হইত। এই লেখিকা অল্পদিনের ভিতর সাহিত্যসমাজে সুপরিচিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন; প্রতিমাসেই সম্পাদকবর্গ তাঁহার লেখা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতেন। যে সকল সম্পাদক পূর্ব্বে কান্তিচন্দ্রের গল্প ফেরত দিয়াছিলেন তাঁহারা শতমুখে এই লেখিকার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কান্তিচন্দ্র রোষে জলিয়া।—"একজন মহিলা, ক্ষীণশক্তি অবলা, হয়ত অশিক্ষিতা, তাহার লেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা ভাল হইবে তাহা অসম্ভব, অসহ্য। আর যে সকল লোক পূর্ব্বে তাঁহার গল্প ফেরত দিয়াছে, তাহার নিন্দা করিয়াছে, এখন তাহারাই মহিলাটীর রচনার প্রশংসা করিতেছে!"—কান্তি জলিয়া উঠিল। "অসম্ভব, ইহা সহ্য করা যায় না। যেরূপেই হউক এই মহিলাকে অপদস্থ করিয়া ভাবকগুলার মুখে চুনকালী দেওয়া চাই।" কান্তিচন্দ্র তাহার তীক্ষ্ণধার সমালোচনা-ছুরিকা মহিলাটীর বিরুদ্ধে উত্তোলন করিল। সামান্য দু' একটা ব্যাকরণের ভুল ধরিয়া ১০।১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ সমালোচনা করিয়া ফেলিল। পরিশিষ্টে লিখিল— "ব্যাকরণ ও ভাষায় দখল না থাকিলে লেখক হইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।" এই তিক্ত সমালোচনা যখন 'তটিনী'তে বাহির হইল তখন সাহিত্য-মহলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পাঠক মণ্ডলী প্রমীলাদেবীর লেখার একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা শ্রীশ বাবুর এরূপ সমালোচনায় বড়ই দুঃখিত হইল, কেহ কেহ বিরক্ত ও রুষ্ট হইল। এমন কি অনেকে "হিংসায় কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া শ্রীশ বাবু এরূপ সমালোচনা করিয়াছেন" ইঙ্গিতে এরূপ কথাও বলিল। কান্তিচন্দ্রের প্রতিশোধবহ্নি নিজকেই গ্রাস করিতে আসিল। প্রমীলা দেবীর খ্যাতি অধিকতর ছড়াইয়া পড়িল, ভক্তের দল আরও বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে কান্তিচন্দ্র বাস্তবিকই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। তাই ভোরবেলা বসিয়া সে প্রমীলাদেবীর উপন্যাস "পতিব্রতার" এক ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা লিখিল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে "তটিনীর" ভাদ্রসংখ্যা এই তীব্র সমালোচনা বক্ষে ধরিয়া বাহির হইল, আবার পাঠক মহলে একটা হুলু স্থূলু পড়িয়া গেল। রাশি রাশি বেনামী পত্র শ্রীশের নামে আসিতে লাগিল, সকল গুলিই শ্লেষপূর্ণ; এইরূপ,— "মহাশয়, আপনি নামকরা প্রধান সমালোচক। কিন্তু তাই বলিয়া কি ক্ষমতার এরূপ অপব্যবহার করিতে হয়? উপন্যাস আর ব্যাকরণ একশ্রেণীর পুস্তক নহে। লেখিকার লেখার সহজ সরল ভঙ্গী, প্রাণস্পর্শী ভাব, কিছুরই প্রশংসা করেন নাই, কেবল ব্যাকরণের ভুল ধরিয়াছেন। লেখিকা বঙ্গমহিলা, বোধ হয় বয়সেও নবীনা, আর আপনার মত উচ্চউপাধিপ্রাপ্তা নহেন। হয়ত তিনি কোনও অধ্যাপকের নিকট আপনার মত ভাষা শিক্ষাও করেন নাই। কাজেই ওরূপ স্বাভাবিক, সুন্দর, প্রাণস্পর্শী উপাখ্যানের অঙ্গে এরূপ নিষ্ঠুরের মত সমালোচনা-ছুরিকা চালনা করা আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। আশা করি ইহার জন্য একটু অনুতপ্ত হইয়াছেন।" দ্বিতীয়টির নমুনা,—"ভাঙ্গা বড় সহজ, গড়াই কঠিন। সমালোচনা করা বড়ই সহজ, বিশেষ হিতাহিত

জ্ঞান বিবর্জ্জিত সমালোচকের পক্ষে। মহাশয় বিরলে বসিয়া একবার উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, সমালোচনা লিখিবার মত অত সহজভাবে উহা কলমে আসে কি না। নানাদিক ভাবিয়া সমালোচনা করিতে হয়, নতুবা লোকে—।" তৃতীয়টির নমুনা,—"মহাশয় আরম্ভ করিয়াছিলেন ভাল কিন্তু শেষটায় মাটী করিলেন। এখন সমালোচনা ছাড়ুন, চাক্‌রী বাক্‌রীর চেষ্টা দেখুন। বোধ হয় কলমটার উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। সাবধান, কোনদিন মানহানির মোকদ্দমায় পড়িয়া যান।" চতুর্থ।—"গর্জ্জনের পর বর্ষণ স্বাভাবিক। মহাশয় পরে কাঁদিবেন কিন্তু।"—ইত্যাদি। চিঠিগুলি পড়িয়া কান্তিচন্দ্র ব্যর্থ রোষে জ্বলিতে লাগিল। সবগুলি চিঠিতেই অপরিচিত হস্তাক্ষর, স্বাক্ষরহীন। কান্তি বুঝিল, সমালোচকের আসনে বসিয়া যে কীর্ত্তিটুকু অর্জ্জন করিয়াছিল আজ তাহা নষ্ট হইল। জগতে স্বেচ্ছাচারিতা খাটে না, হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের অনিষ্ট করিতে গেলে নিজেরই অপদস্থ হইতে হয়। কান্তির আজ একটু অনুতাপ হইল, একটু কষ্টও হইল। সে ড্রয়ার হইতে প্রমীলাদেবীর গল্প ও উপন্যাসগুলি বাহির করিল। কিন্তু আজ তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইল, পরম তৃপ্তি অনুভব করিল। পূর্ব্বকার হিংসা ভুলিয়া গেল। এমন সুন্দর লেখা, প্রাণস্পর্শী ভাব! আজ তাহার এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাব জাগিল। হঠাৎ লেখিকার উপর কেমন শ্রদ্ধা ভালবাসা জাগিয়া উঠিল। লেখা লেখকের হৃদয়-দর্পণ, ভাবগুলি প্রতিবিম্ব। আহা! যাঁহার লেখা এত সুন্দর না জানি তিনি মানুষটি কেমন! এক মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ে এক বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিল। রোষ, দ্বেষ, অপমান ভুলিয়া কান্তি আজ মহিলাটীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। ইচ্ছা হইল স্বকৃত অপরাধের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ছিঃ এমন অন্ধ সে, এতদিন এমন সোণার লেখা পড়িয়া বুঝিতে পারে নাই! আজ তাহার মনে হইল সে কত অপরাধী, এমন অপরাধী বুঝি আর কেহ পৃথিবীতে নাই।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কান্তিচন্দ্র গোপনে গোপনে প্রমীলাদেবীর খোঁজ করিতে লাগিল। মাসিকপত্রিকার সম্পাদকবর্গের নিকট তাঁহার গল্পের সঙ্গে ঠিকানা থাকিতে পারে আশায় সম্পাদকদের বাড়ীতে হাটাহাটি করিল কিন্তু তাঁহারা শ্রীপ্রমীলাদেবী কলিকাতা, ছাড়া আর কোনও ঠিকানা দিতে পারিলেন না। তখন কান্তিচন্দ্র বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িল। গায়ক, বাদক ও লেখক এই তিন শ্রেণীর লোক ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত, (অবশ্য অন্য লোকেরা যে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত নয় এমন কথা আমি বলি না)—পৃথিবীর মানুষ মাত্রেই ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই কান্তিচন্দ্রের সমালোচনা পড়িয়া পাঠকবর্গ এত ক্ষেপিয়াছিল। কান্তিচন্দ্র এখন তাহার কারণ বুঝিল। তাহার একবার মনে হইল "তটিনীতে" পূর্ব্ব সমালোচনার জন্য ক্রটী স্বীকার করিয়া লিখিবে সে অনুতপ্ত হইয়াছে। একবার লেখিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষমা চাহিতে ইচ্ছা করিল। আবার মনে হইল, ছিঃ, তাহা হইলে আরো হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে। লোকে টিটকারী দিবে, নানা লোকে নানা কথা বলিবে। কাজেই তাহাকে ধৈর্য্যাবলম্বন সহকারে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

ইতমধ্যে সহসা বাড়ী হইতে এক টেলীগ্রাম আসিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহার বাবা তার করিয়াছেন—"তোমার বিবাহ সুস্থির হইয়াছে, ১০ই শ্রাবণ বিবাহ। শীঘ্র চলিয়া আইস। বিস্তারিত এখানে আসিয়া শুনিবে।" কান্তির মাথায় একেবারে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিবাহ একেবারে সুস্থির! অজানা অচেনা একটা মেয়ে, হয়ত অশিক্ষিত গ্রাম্য, হয়ত কুৎসিৎ, তারপর সেই পরিবারে চালচলন কেমন কে জানে? আশ্চর্য্য! ইঁহারা একবার একটু মত জিজ্ঞাসা করিলেন না! যাহাকে লইয়া আজীবন ঘর করিতে হইবে সে কাণা কি খোঁড়া, সুন্দরী কি কুৎসিৎ, হাবা কি বুদ্ধিমতী তাহা আমার জানিবার পক্ষে তাঁহারা এতটুকুও আবশ্যকতা বোধ করিলেন না! আমি বুদ্ধিমান, উচ্চশিক্ষিত, আমার আদর্শ কিরূপ তাঁহারা একবারও জিজ্ঞাসা করিলেন না! হায়, যদি পত্নী আমার আদর্শানুরূপ না হয়,—তবে?—জীবনটা মাটী হইবে। তাহাতে কার কি! তাঁহাদের ত টাকা পাইলেই হইল। বাপ

মায়ের ত আজকাল 'ছেলেবেচা' ব্যবসা।" কান্তিচন্দ্র বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল।—"আহা যদি আমার স্ত্রী বিদুষী হইত, যদি প্রমীলাদেবীর মত—" তাহার সমস্তশোণিত মুখে আসিয়া জমিল, একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস জাগিয়া উঠিল। কিন্তু, পরক্ষণে কর গণিয়া দেখিল বিবাহের আর বারদিন মাত্র বাকী। পিতার কথার অবাধ্য হওয়া চলেনা। সে ধৈর্য্য সহকারে বুক বাঁধিয়া ফেলিল। পরদিন পিতার চিঠিও আসিল। কান্তি খুলিয়া পড়িল—"কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার গণেন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতীর সহিত তোমার বিবাহ সুস্থির হইয়াছে। মেয়েটী রূপেগুণে অতুলনীয়া। টাকা পয়সা গণেন্দ্রবাবু যথেষ্ট দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি নিতে স্বীকৃত হই নাই। তুমি আমার একটী মাত্র পুত্র, তোমাকে তোমার শ্বশুরের নিকট বিক্রয় করিতে পারি না। * * * তুমি তোমার আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জাম কিনিয়া অতি সত্বর আসিয়া পড়িবে।"

একটু পূর্ব্বে পিতামাতার উপর ভক্তিশ্রদ্ধা একটু ম্লান হইয়াছিল, চিঠিখানা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধাতে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল, এমন বাপ মায়ের সম্বন্ধেও সে ওরূপ অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিল! আবশ্যকীয় সাজসজ্জা কিনিয়া পরদিন সে বাড়ী ফিরিল, প্রমীলাদেবীর যে যে উপন্যাস ও গল্পের বহি বাজারে বাহির হইয়াছিল সকল গুলি কিনিয়া লইল। নববধূকে এই সকল পুস্তক উপহার দিতে হইবে। আহা! পত্নীকে যদি প্রমীলাদেবীর আদর্শে গড়িয়া লওয়া যায়! অমন অদৃষ্ট কি তাহার হইবে?

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পর দিনগুলি বেশ সুখেই কাটিতে লাগিল। প্রভা রূপেগুণে সর্ব্বাংশে কান্তির আদর্শানুযায়ী হইয়াছিল। গুচ্ছ গুচ্ছ ভ্রমর-কৃষ্ণ অলকদামের মাঝখানে পত্রবেষ্টিত গোলাপের মত সুন্দর চম্পক-সুগৌর মুখখানা, ডাগর ডাগর চক্ষু দুটির স্নিগ্ধ সরল দৃষ্টি, রাঙ্গা রাঙ্গা অধরের পার্শ্বে জোৎস্নাধারার মত হাসি,—দেখিয়া দেখিয়া কান্তি মুগ্ধ হইত। তারপর স্বর্গীয় বীণানিক্কণের মত কোমল স্বরে যখন প্রভা তাহার সহিত সাহিত্যচর্চ্চা করিত, লেখকদের লেখা সম্বন্ধে সুন্দর, সারবান মতামত প্রকাশ করিত, তখন কান্তিচন্দ্র শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের সহিত তাহার পানে চাহিয়া থাকিত। কান্তিচন্দ্র প্রভার সহিত প্রায়ই প্রমীলাদেবীর লেখার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইত। কান্তিচন্দ্র বলিত "প্রমীলাদেবী একজন বিদুষী নারী।" প্রভা বলিত "তা কেন? সে কয়েকটা সামাজিক গল্প লিখিয়াছে বই ত নয়। পাঠকেরা অনেকে কাঁদিতে ভালবাসে তাহার লেখা পড়িয়া কাঁদিতে পারিয়াছে, তাই তাহার এত প্রশংসা করিয়াছে। কিন্তু যদি কোনও দিন দেখি, প্রমীলাদেবীর লেখা পড়িয়া অন্ততঃ একজন পাঠকের হৃদয়েও সমাজের করুণ চিত্রটা অঙ্কিত হইয়াছে, সে নিজকে আদর্শ মানুষ রূপে গঠিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে, চোখের জলের দাগের সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতরকার দাগটাও মুছিয়া যায় নাই,—তবে বুঝিব প্রমীলাদেবী বিদুষী, নচেৎ নয়।"

কান্তি। "আমি তোমার মত সমর্থন করি না। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবাদের দুঃখে অভিভূত হইয়া বিধবাবিবাহ প্রচলন করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এসমাজে তাহা খাটিল কৈ। তবে প্রমীলাদেবীর দোষ কি? এই অধঃপতিত বাঙ্গালী-সমাজের উন্নতি হইতে এখনো ঢের বিলম্ব আছে।"

প্রভা একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল—"বড় যে তার উপর টান দেখা যায়। তাকে দেখেচ কোন দিন?" কান্তি অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"না।"

প্রভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া ধা করিয়া বলিয়া বসিল—"ওঃ পরমা সুন্দরী সে। বিয়ে করবে তাকে?"—কান্তিচন্দ্রের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, সে ভরা গলায় বলিল—"তুমি ভারি দুষ্টু। সবাই যাকে প্রশংসা করে আমিও তাকে করব এতে আর বিচিত্র কি!"

প্রভা। "ওঃ তাই! কিন্তু এক ভদ্রলোক, নামটি তাঁর শ্রীশবাবু, তিনি কিন্তু বড় তিক্ত সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি ত বেশ স্বাধীনচেতা লোক। নিজের যেমন লাগিয়াছে ঠিক তেমি লিখিয়াছেন, সকলের সঙ্গে অন্ধভাবে নাচেন নাই।"—শ্রীশচন্দ্রের মুখের সমস্ত

রক্ত গণ্ডে ও কর্ণমূলে আসিয়া জমিল, সে আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল—"কিন্তু কদিন পরে হয়ত দেখিবে শ্রী শ্রীশবাবুই প্রমীলাদেবীর প্রশংসা করিতেছেন। নিজের ভুল শীঘ্রই বুঝিবেন।"

প্রভা। সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ওরূপ স্বাধীনচেতা লোক সাধারণের সহিত অন্ধভাবে মত প্রকাশ করিবেন না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

কান্তি বলিল—"চাঁদের জ্যোৎস্না দেখিয়া যে মুগ্ধ হয় না সে হয় অন্ধ নতুবা সৌন্দর্য্যজ্ঞান বর্জ্জিত। আমি জানি শ্রীশ উক্ত দুই শ্রেণীর লোকের একটিও নহেন হয়ত সাময়িক উত্তেজনার ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সহসা ওরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন।" হৃদয়ের গুপ্ত কথাটা ব্যক্ত করিয়া কান্তি লজ্জা ও ভয়ে অধীর হইয়া পড়িল, প্রভার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, বুঝিবা বুদ্ধিমতী প্রভা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। প্রভা ঈষৎ হাসিল, তাহার সুন্দর মুখ খানি রাঙ্গা হইয়া গেল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরমাসে "তটিনী" এক কপি হাতে লইয়া কান্তিচন্দ্র হাসিতে হাসিতে প্রভার কাছে আসিল। বলিল—"এই দেখ শ্রীশ বাবু এবার নিজের ত্রুটীর জন্য মার্জ্জনা চাহিয়াছেন। এবার কত প্রশংসা করিয়াছেন, এত প্রশংসা বোধ হয় কেউ করে নাই।" প্রভা আগ্রহসহকারে সমস্তটা পড়িল। স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল—"তোমার মতের সহিত ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। আচ্ছা শ্রীশ বাবু যে এরূপ লিখ্‌বেন তুমি পূর্ব্বে জান্‌লে কি করে?" কান্তির মুখমণ্ডল হঠাৎ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে ঢোক গিলিয়া বলিল—"তা, তা, আমরা এমন আন্দাজ করিতে পারি প্রভার মনে কেমন খট্‌কা বাধিল। বৈকালবেলা কান্তিচন্দ্র পান চিবাইতে চিবাইতে বেড়াইতে বাহির হইলে পর প্রভা নিজের চাবির গোছার সাহায্যে কান্তির তোরঙ্গ খুলিয়া ফেলিল। খুঁজিতে২ বন্ধুবর্গের চিঠির পার্শ্বে একতাড়া চিঠি পাইল। ট্রাঙ্কে তটিনী, প্রবাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাও ছিল। সকল পত্রিকাগুলিতেই শ্রীশবাবুর লেখা আছে। চিঠির তাড়াতে এই সকল মাসিক পত্রের সম্পাদকবর্গের পত্র। উপরে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঠিকানা ৪নং নেবুতলা—যেস্থানে থাকিয়া কান্তিচন্দ্র পূর্ব্বে লেখাপড়া করিত। ট্রাঙ্কের একধারে 'শ্রীশচন্দ্র' নাম স্বাক্ষরিত বৃহৎ পত্র। প্রভা তাহা পড়িল। পত্রখানা তটিনী সম্পাদকের নিকট প্রেরিত পত্রের নকল। ইহাই গত সংখ্যার তটিনীতে বাহির হইয়াছে। ইহা প্রমীলাদেবীর নিকট প্রকারান্তরে ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার জন্যই লিখা হইয়াছে। হস্তাক্ষর কান্তিচন্দ্রের। প্রভা স্বামীর কীর্ত্তি ধরিয়া ফেলিল। স্বামীই যে ছদ্মনামধারী শ্রীশচন্দ্র তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হইল না, পূর্ব্ব হইতেই তাহার এই সন্দেহ জাগিতেছিল। ধীরে ধীরে সে চিঠিগুলি ও স্বামীর পত্রের নকল পড়িল। স্বামী প্রথমে প্রমীলার বিরুদ্ধে এত তীব্র সমালোচনা কেন করিয়াছিলেন তাহাও বুঝিতে বাকী রহিল না। চিঠি ও সমালোচনা পড়িয়া তাহার হাসি আসিতে লাগিল। একা একা কিছুক্ষণ হাসিয়া লইয়া আবার ট্রাঙ্কের দ্রব্যাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিল। কান্তি ফিরিলে তাহাকে নিজের চুরির কথা কিছু জানাইল না। ইহার কিছুদিন পরে "পূর্ণিমা" পত্রিকা আসিল। ইহাতে প্রমীলা দেবীর "দিনেরআলো" নামে একটা বড় গল্প ছিল। প্রভা পড়িয়া স্বামীকে শুনাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে কান্তি ক্রমশঃই অধীর হইয়া পড়িতে লাগিল। ইহা যে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত! আশ্চর্য্য! প্রমীলাদেবী কি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না? তিনি কান্তির গুপ্তকথা জানিলেন কি করিয়া!—কোনও যুবকের ঔপন্যাসিক হইবার আগ্রহ, তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া সমস্ত লেখক ও সম্পাদকের উপর প্রতিশোধ নিবার জন্য সমালোচক হওয়া, কোনও মহিলার যশে হিংসায় জলিয়া তীব্র সমালোচনা করা, পরে নিজের ভুল বুঝিয়া অনুতপ্ত হওয়া, ইত্যাদি ঘটনা লইয়া গল্পটী লিখিত। ইহার প্রতিকথা অক্ষরে অক্ষরে যে তাহার দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর সহিত মিলিয়া যাইতেছে! কান্তি কেদারার উপর অসাড়ের মত পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—একি লাঞ্ছনা, একি বিপর্য্যয়

কাণ্ড! কে এই প্রমীলাদেবী? নিশ্চয়ই ইনি কোনও অলৌকিকশক্তিসম্পন্না বিদুষী। যে কথা হৃদয়ের কন্দরে লুক্কায়িত রহিয়াছে, যাহা পত্নী পর্য্যন্ত জানে না, সেই কথা ঐ অপরিচিতা মহিলা কি করিয়া জানিলেন?—আশ্চর্য্য!

প্রভা পড়িতে পড়িতে একএকবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া তাহার বড়ই কৌতুক বোধ হইতে লাগিল,—বুঝিবা একটু কষ্টও বোধ করিল।

## নবম পরিচ্ছেদ।

কান্তিচন্দ্রের প্রমীলা দেবীর উপর ভক্তিশ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। একদিন সে বলিল "প্রমীলা দেবী অলৌকিক গুণসম্পন্না, বোধহয় স্বর্গভ্রষ্টা দেব-কন্যা।" প্রভা হাসিয়া লুটাপুটি যাইতে লাগিল। অপ্রতিভ কান্তি বলিল—"বিচিত্র কি! একদিনকার ঘটনা, ওঃ সে আশ্চর্য্য! মানুষের ওরূপ ক্ষমতা হইতে পারে না।" প্রভা বলিল "সেই গল্পটা, নয়?" কান্তি চমকিত হইল, তাড়াতাড়ি অন্যকথা পাড়িয়া প্রসঙ্গ ফিরাইয়া ফেলিল।

পূজার সময় সে সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়ী কলিকাতায় আসিল, কিন্তু এবার বড় অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিল। মানুষ নিজের দুর্ব্বলতা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে চাহে না। তাহার মনে হইল যেরূপেই হউক প্রমীলা দেবী তাহার দুর্ব্বলতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন, কাজেই কলিকাতায় ঘটনাচক্রে যদি তাহার সহিত পরিচয় হইয়া যায় তবেই সর্ব্বনাশ। এখন তাহার মনে এই ভয়টা বড়ই জাগিতেছিল। শ্বশুর নামজাদা ডাক্তার, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত এবাড়ীর পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠতা। কে জানে কোন্ দিন সেই প্রমীলা দেবী সশরীরে এবাড়ীতে আবির্ভূতা হইবেন! প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে এই শঙ্কায় সে অধীর হইতে লাগিল; তবে এটুকু আশাছিল—তাহার ছদ্মনাম। ছদ্মনামের আবরণ ভেদ করিয়া আসলটিকে বাহির করা সহজ নহে। কিন্তু, কে জানে প্রমীলা দেবী অলৌকিক ক্ষমতাবলে কি করিয়া বসিবেন। কিন্তু তাহাকে থাকিতে হইল, শ্বশুরবাড়ীর সকলে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলনা। বিজয়াদশমীর পরদিন এ বাড়ীতে বিরাট ভোজের আয়োজন করা হইল। কলিকাতার শিক্ষিত পরিবারের অনেকে এই ভোজে নিমন্ত্রিতা হইলেন। বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, কুৎসিতা ও সুন্দরী, পীতবসনা ও শ্বেতবসনা, নিরাভরণা ও সালঙ্কারা অনেক রমণী আসিলেন, বাড়ীখানা কলকণ্ঠে মুখরিত হইল। কান্তিচন্দ্র বিবাহের পর এই নূতন শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে, সেই কারণেই এই উৎসবের অনুষ্ঠান। নূতন জামাতা বলিয়া অনিচ্ছাসত্বেও কান্তিকে এই রমণীসঙ্কুল অন্দরে স্থান নিতে হইল। শ্যালিকাগণের পরিহাসে বেচারা ব্যতিব্যস্ত হইল। সহসা দূরে ধ্বনিত হইল—"প্রমীলা, এই যে প্রমীলা দেবী।" "কি কবি ঠাকরুণ, "পূর্ণিমাতে" দিব্য গল্পটী লেখেছেন।" "ও! ঐ যে 'দিনের আলো' গল্পটী। সে গল্পটী পড়ে সবাই প্রশংসা কচ্ছে।" "হাঁ এঁর লেখা বড় সুন্দর, পুরুষের মুখে ইনি কালি দিয়াছেন।" কান্তির মুখ শাদা হইয়া গেল, বুক কাঁপিয়া উঠিল। উন্মুক্ত দ্বারপথে পার্শ্বের ঘরে তাকাইয়া দেখিল আগন্তুক যুবতীরা কাহাকে ঘিরিয়া ঐ বলাবলি করিতেছে। কান্তি ঠিক বুঝিতে পারিল না প্রমীলা কে। সহসা ঘরের ভিতর নূপুরের রুণু রুণু, মলের ঝম্ ঝম্ ও বলয়ের ঠুন্ ঠুন্ শব্দ ভীষণ ভাবে বাজিয়া উঠিল,—কান্তি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল প্রায় চারি পাঁচ জন যুবতী প্রভাকে জোর করিয়া টানিয়া এই ঘরের ভিতর আনিতেছে, প্রভা বিস্তর বাধা দিতেছে। ইহাদের ধস্তাধস্তিতে ঐরূপ শব্দ উৎপাদিত হইতেছে। তাহারা প্রভাকে আনিয়া কান্তির পার্শ্বে ধপ্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—"নিন্ মশায়, আপনার কবিত্রী। রোজ রোজ ভক্তিভরে এঁর পূজা কর্ব্বেন।" বিস্মিত কান্তি বলিল "কি রকম?" রমণীরা উচ্চহাস্য সহকারে বলিল—"প্রমীলা দেবীর নাম শুনেছেন ত? যিনি সাহিত্যজগতে চাঁদের মত জ্যোৎস্নাধারা বিলাচ্ছেন। আপনার এই প্রভাই প্রমীলা!" কান্তি চক্ষু স্থিরনেত্র করিয়া বলিল--"প্রভাই প্রমীলা!" "হ্যাঁ গো হ্যাঁ। প্রমীলা এর ছদ্মনাম।"

কান্তির চক্ষুর সম্মুখ হইতে প্রহেলিকার যবনিকাটা

হঠাৎ সরিয়া গেল। যুগপৎ ভয়, লজ্জা ও হর্ষে সে অভিভূত হইয়া পড়িল।

আঃ, এই কি সেই প্রমীলা দেবী, তাহার স্বপনে জাগরণে চিন্তার ধন? যাহাকে সে এতদিন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্না বিদুষী নারী বলিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে, যাহার স্মৃতির সহিত কত শ্রদ্ধাভক্তি জড়িত রহিয়াছে,—সেই প্রমীলা দেবী তাহারই পত্নী, তাহারই জীবনসঙ্গিনী! কান্তিচন্দ্রের মনে হইল সমস্ত-বিশ্বে যেন একটা বিরাট বিপ্লব ঘটিয়া গেল। স্বপ্ন আজ সত্যে পরিণত হইল, কল্পনা আজ মূর্ত্তিমতী হইল! একি আনন্দ, একি সুখ! সে প্রমীলার স্বামী, সে এত ভাগ্যবান! * * * আঃ, ইহারই অপযশ রটাইবার জন্য সে কত চেষ্টা করিয়াছিল। তবু ভাগ্যি সে নিজকে ছদ্মনামে প্রকাশ করিয়াছিল, নতুবা?

## দশম পরিচ্ছেদ।

রাত্রিতে যখন নিমন্ত্রিতা রমণীগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং বাড়ীর পরিজনবর্গ বিশ্রামার্থ স্ব স্ব শয্যায় আশ্রয়গ্রহণ করিল তখন শয়নকক্ষে বসিয়া প্রভা ও কান্তি কথোপকথন করিতেছিল। কান্তি কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"প্রভা, তুমিই প্রমীলাদেবী! কই এতদিন ত পরিচয় দাও নি।" প্রভা অবনত মুখে বলিল—"তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই। আর তুমিই যে বিখ্যাত সমালোচক শ্রীশ বাবু তাহা ত তুমিও বল নাই।" কান্তি লজ্জায় মরিয়া গেল, পত্নী তাহার ছদ্ম আবরণ কি করিয়া ভেদ করিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। প্রভাও বলিল না। কান্তি ভরা গলায় বলিল—"শ্রীশচন্দ্র মরিয়াছে, আর তাহার কথা বলিও না।"

প্রভা। "না, সাহিত্যক্ষেত্রে ওরূপ সমালোচক থাকা দরকার। তাঁহার তীব্র সমালোচনায় আমার খুব উপকার হইয়াছে। লেখাতে ভাষা ও ব্যাকরণের ভুল আছে জানিয়া আমি নানা গ্রন্থ ও ব্যাকরণ পড়িয়া নিজের ভুল সংশোধন করিয়া লইয়াছি। আশা করি এখনো তুমি পূর্ব্বের মত আমার গল্পের সমালোচনা করিবে।" * * * *

তদবধি কান্তিচন্দ্র পত্নীর গল্প পড়িয়া গোপনে গোপনে সংশোধন করিয়া দিত; কিন্তু মাসিক পত্রিকাতে কেহ সমালোচক শ্রীশচন্দ্রের নাম দেখিতে পাইত না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস্-সি।

## "বিজয়া"

(১)

থেমে গেছে উৎসবের গান।<br>
নীরব কোকিল-বধূ, পাপিয়া ঢালে না মধু,<br>
সুধাকর-কর ধীরে ম্লান।<br>
শ্যামল ঘাসের পরে প্রকৃতির অশ্রু ঝরে,<br>
দিকে দিকে বিদায়ের তান;<br>
শরতের আজি অবসান।

(২)

এসেছিলা হৃদয়ের রাণী,<br>
দুঃখ তাপ অমঙ্গল, সবি গেছে রসাতল,<br>
হেরি মা'র চরণ দু'খানি।<br>
স্নেহের পরশে ধরা সোনার ফসলে ভরা,<br>
কমলারে আনিয়াছে টানি,<br>
কোথা আজি আবাহন বাণী?

(৩)

শতকণ্ঠে তোল জয়গান—<br>
সুদূর কৈলাস হতে আশীষ আসিছে স্রোতে,<br>
নীরবে ভরিয়া যাক্ প্রাণ।<br>
ভেদাভেদ সবি ভুলি প্রেমানন্দে প্রাণ খুলি<br>
গাহ জননীর জয় গান;<br>
লহ শিরে বিজয়ার দান।

শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী।

# রায় হরিচরণ শর্ম্মা বাহাদুর।

## পূর্ব্ব কথা।

জন্ম মরণ লইয়া সংসার। ইহার লক্ষ লক্ষ প্রাণী কালের সাগরে বুদ্বুদের মত ফুটিতেছে, ফাটিতেছে, ফলের মত ফলিতেছে, ঝরিতেছে, কে তার গণনা রাখে? দু' একজনা আত্মীয়ের মনে দু'চারদিন একটা বেদনা জাগিয়া থাকিতে পারে, দু'একজনা বিরহিতের অশ্রু-জলে দু'চারদিন একটা তীব্র ব্যথা জড়াইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজের মনের মধ্যে এসব জীবন মৃত্যু কোনই স্থায়ী সংবাদ রাখিয়া যায় না, একটি দাগও ফেলিতে পারে না। এই বিশ্বমানবস্রোতের মধ্যে উদাস মনটার কাছে ধরা পড়ে কেবল সেই, যে ইহাকে চিরন্তন কিছু দান করিয়া যাইতে সক্ষম হয়। সে দান ভালই হউক, মন্দই হউক, সে দান অশোকের শিলা-লিপিতেই হউক, বা নাদীর শার তলোয়ারের মুখেই হউক, ইতিহাস তাকে যুগযুগান্ত আপনাতে জাগাইয়া রাখে। পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রতিধ্বনি যেমন শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গে, কন্দর হইতে কন্দরে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে, সে দানও তেমনি হৃদয় হইতে হৃদয়ে, পুরুষ হইতে পুরুষে, দেশ হইতে দেশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ইহা নির্জ্জীবকে সজীব করিয়া তোলে, ঘুমন্তকে জাগা-ইয়া তোলে, ভ্রান্তকে পথ দেখাইয়া দেয়। শিরায় শিরায় যেমন রক্তের সঞ্চালন, তারায় তারায় যেমন আলোকের কম্পন, লোকে লোকে তেমনি সেই মহা-পুরুষের আহ্বান। কবে কোন বিস্মৃত বৎসরের বিলুপ্ত আশ্রম-প্রাঙ্গনে মহর্ষি দধীচির প্রাণাত্যয় হইয়াছিল, চৈতন্যের প্রেমবন্যা কতকাল হইল বাংলাদেশে ঢেউ খেলাইয়াছিল, কতকাল হইল অভাগী পান্না রাজকুমারের প্রাণের বিনিময়ে আপনার নাড়ীছেঁড়া সন্তানকে কালের পায়ে ডালি দিয়াছিলেন,—কবে তাঁহাদের শ্মশান-ভস্ম ধূলিকণায় মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে আদর্শ তাঁরা ধরিয়াছিলেন, যে প্রাণের স্রোত তাঁরা বহাইয়াছিলেন, আজিও তা' লক্ষ লক্ষ লোকের মর্ম্মে মর্ম্মে স্পন্দিত। লক্ষ মানবের বীরত্ব, প্রেম, রাজভক্তি আজিও সে মন্ত্রে উদ্দীপ্ত।

মহাপুরুষগণ তাঁহাদের অমূল্য দানের দ্বারা যদিও মানুষের মনে অমর হইয়া বসেন তবুও তাঁদের পূর্ব্বাপর বংশের সঙ্গে কিন্তু লোকইতিহাসের কোনই সম্পর্ক থাকে না। সে দানের পুণ্য তাঁদের সগোত্র পূর্ব্বপুরুষ-গণকে নির্ব্বিচারে ইতিহাসের স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। এই জন্য আমাদের বহু মহাপুরুষকে আমরা বিশ্বমানবস্রোতের মধ্যে একটা ঢেউয়ে ভাসা অমৃত ফলের মত দেখিতে পাই। সেখানে তাঁর স্থান কোথায়, পূর্ব্বাপর তাঁর সম্পর্ক কি, সাধারণের চক্ষে তা ধরা পড়ে না। সুর্ম্মা উপত্যকার রায় হরিচরণ শর্ম্মা বাহা-দুরকেও আমাদের তেমনি একটি বৃন্তহীন ফুলের মত মনে হয়। তখনকার কাছাড়ের অন্ধকার নাট্যশালায় বীর অভিনেতা হরিচরণের স্থান কোথায়? যে দেশ আত্মকলহে জর্জ্জর, নাগার "ভাগানে" মগের "ভাগানে", (১) পীরের "ভাগানে" যে দেশ জনশূন্য, পনরজন লোকের আক্রমণে যেখানকার রাজা রাজ্য ছাড়িয়া পালায়, সে দেশে বীর হরিচরণের জন্ম হইল কি করিয়া, এ একটা জটিল সমস্যা।

দুঃখের বিষয়, এসমস্যাটি এতদিন আমাদের চোখে পড়ে নাই। সমুদ্রের অসংখ্য বুদ্বুদের মধ্যে চিরন্তন পদ্মফুলটির মত যিনি ফুটিয়াছিলেন, দুর্দ্দম পার্ব্বত্য জাতি গুলিকে লইয়া যিনি পুতুল খেলা খেলিয়াছিলেন, সরল রাজভক্তিতে ও অটল বীরত্বে যিনি ইংরাজরাজকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন সেই হরিচরণকে এতদিন আমরা দেখিতেই পাই নাই, বুঝিতে পারা ত দূরের কথা। তাই আজ যখন হঠাৎ তিনি আমাদের নজরে পড়িলেন, তখন তাঁকে একটা ঢেউয়ে ভাসা ফলের মতই মনে হইতেছে।

কিন্তু কালের স্রোতে কোথাকার ফল কোথায় ভাসিয়া আসে, আর ভবিতব্যকে ঘটাইবার জন্য ঘটনার জাল চারিদিকে কেমন আশ্চর্য্য রকমে জড় হইয়া উঠে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যখন আমরা সে

---

(১) এক একবার নাগা মগ ইত্যাদিরা দলবদ্ধ হইয়া কাছাড় লুণ্ঠন করিতে আসিত, আর লোকে তখন ধন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিত। এইরূপ ব্যাপারকে এদেশের লোকে 'ভাগান' বলে।

স্রোতের অনুসরণ করিতে পারি, এবং চারিদিকের ব্যাপারকে তারই সঙ্গে মিলাইয়া পাঠ করিতে পারি, তখনি সেই আকস্মিকতার ধাঁধা মিলাইয়া যায়। আর তা হইলেই আমরা জাতব্যকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি।

হরিচরণকে জানা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনও। বাঙ্গালীর অপবাদ—বাঙ্গালী কাপুরুষ। মানুষের বিশ্বাস বাঙ্গালাদেশে চাষা জন্মায়, পণ্ডিত জন্মায়, কিন্তু বীর জন্মায় না। এই বিশ্বাস আমাদের ভূপালকে, বিজয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সপ্তদশ অশ্বারোহী দিয়া বাংলা জয় করাইয়াছে। তাই বাঙ্গালী বালকের শিক্ষার জন্য আমাদের বিলাতী ইতিহাস ঘাটিতে হয়। তাই আমরা আত্মনির্ভরের দৃষ্টান্তের জন্য স্মাইল্‌সের দিকে চাই, আত্মত্যাগের জন্য গেরিবল্ডির দিকে তাকাই, সাহস, শৌর্য্য, বীর্য্যের জন্য সার জন মুরের জীবনী পাঠ করি। কিন্তু এদেশেরও কতলোক যে দুর্দ্দৈবের সঙ্গে জীবনভরা সংগ্রাম করিয়াছে, আমাদেরও ঘরের কোণে যে কত ক্রস, পিট, দানেকরের জন্ম হইয়াছিল, কে তার সন্ধান নিয়াছি? কয়জনকে তাদের আমরা এই বুভুক্ষু বাঙ্গালীশিশুর চক্ষুর সম্মুখে ধরিতে পারিয়াছি? এই হরিচরণ, য়ুরোপে যদি ইঁহার জন্ম হইত, তবে আজ পর্য্যন্ত তাঁর জীবনীর কত সংস্করণ বাহির হইয়া পড়িত এবং ঘরে ঘরে শিশুদের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ রচনা করিয়া রাখিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, এই ভারতবর্ষের এক কোণে জন্ম নিয়াছিলেন, তাই তাঁকে আজ আমরা কেহই জানি না।

হরিচরণ বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর কলঙ্ক লাঘব করিবার জন্য এবং বাঙ্গালী শিশুর শোচনীয় অভাব দূর করিবার জন্য হরিচরণকে আমাদের জানিতেই হইবে, বুঝিতেই হইবে। (২)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংসারের বহু ক্ষণজন্মা পুরুষকে আমরা একটি আকস্মিক ব্যাপারের মত দেখিতে পাই; কিন্তু সে আকস্মিকতার ধাঁধা পরিষ্কার হইয়া যায়, যদি আমরা তার পূর্ব্বাপর সকল সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিয়া নেই। হরিচরণ সম্বন্ধেও এই এক কথা। তাঁকে একটা ঝরে-পড়া ফলের মত গ্রহণ না করিয়া তাঁর রহস্যময় জীবনযাত্রাকে সময় ও সমাজের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে গেলে তাঁর পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ খুঁজিতে হইবে, তাঁর বংশস্রোতের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু এটা দুষ্কর ব্যাপার। সরকার বাহাদুরের কাগজপত্রে ও বন্ধুবান্ধবের মনের মধ্যে হরিচরণ অমরতা লাভ করিলেও তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ মরণ-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া কোথায় যে ভাসিয়া গিয়াছেন, তার উদ্দেশ নাই। আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় সে বিস্মৃত আখ্যায়িকার যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই পরিচ্ছেদে তাই উপস্থিত করিলাম।

যে শক্তি কাছাড়ের সরিৎ-শৈলের ঘাত প্রতিঘাতে একটা দৈব লীলার মত জাগিয়া উঠিয়াছিল, যা পার্ব্বত্য বর্ব্বরতার দুর্গম লীলাক্ষেত্রে ব্রিটিশসভ্যতার মঙ্গলযাত্রার জন্য সেতু রচনা করিয়াছিল, তার বীজ আসিয়াছিল রাঢ় দেশ হইতে।

বৈদিক শ্রেণীর শ্রোত্রীয় কুশারিবংশে হরিচরণের জন্ম। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ রাঢ় দেশ হইতে আসিয়া বিক্রমপুরে কাঁচাদিয়া গ্রামে বাস করেন। কাঁচাদিয়ার হরিৎক্ষেত্রের পাশে তখন পদ্মার খরস্রোত সূতায় ঝুলা খাঁড়ার মত কাঁপিত। খাঁড়া একদিন ঝুলিতে ঝুলিতে ছিঁড়িয়া পড়িল; কাঁচাদিয়া পদ্মার কাছে আত্ম-সমর্পণ করিল। কুশারিবংশীয় রামজীবন শর্ম্মা তখন দুই ভাই রামেশ্বর ও রামচন্দ্রের সঙ্গে দেশছাড়া হইলেন।

শ্রীহট্ট সেকালে গৃহহারা বাঙ্গালীর আশ্রয়স্থান ছিল। বিধর্ম্মীর ভয়ে ও পদ্মার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বহু বাঙ্গালী হিন্দু প্রাণ মান লইয়া এই প্রাচুর্য্যময়ী শ্রীভূমির কোলে স্থান লইত। রামজীবনও সেই পথ গ্রহণ করিলেন। তিন ভাইতে মিলিয়া বানিয়াচঙ্গের ঘোষের পাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন।

---

(২) হরিচরণ সম্বন্ধে ঢাকা-রিভিউতে যে ইংরাজী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তার সমালোচনায় সুবিখ্যাত বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত লিখার কিয়দংশ আমাদের উক্তির সমর্থন করিবে বিবেচনায় এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

কিন্তু 'যে তৃণ একবার স্রোতে ভাসিয়াছে, ঘা খাইয়া খাইয়া সে কেবল ভাসিতেই থাকে।' বানিয়াচঙ্গে আসিয়াও কুশারি পরিবারের স্থিতি হইল না। বহুদিন হইল সেখানে মুসলমান দেওয়ানের আধিপত্য চলিয়া আসিতেছিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণ রামেশ্বর বিধর্ম্মীর প্রাধান্য নির্ব্বিকার চিত্তে সহিতে না পারিয়া তীর্থদর্শনে বাহির হইয়া গেলেন—আর ফিরিলেন না। রামজীবন ভাই রামচন্দ্রকে নিয়া কোঁড়ুয়া পরগণায় ভিটা বাঁধিলেন।

সেখানে দুই ভাইয়ের মনোমালিন্য হইল। ভাইয়ের হাঁড়িতে রামচন্দ্রের অন্নের ভাগ ফুরাইয়া গেল, তিনি তরপে গিয়া ঘর করিলেন।

রামজীবনের এক পুত্র ছিল, নাম কামদেব। কামদেব কামদেবেরই মত সুপুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মে তাঁর নিষ্ঠা ছিল, কর্ম্মে তাঁর দক্ষতা ছিল। দেখিয়া ঈশাখপুরের ভট্টাচার্য্যগণ (২) লুব্ধ হইলেন। যথাকালে সেই বংশের কুলবতী দেবীর সঙ্গে কামদেবের বিবাহ হইয়া গেল। আভিজাত্যে ও গুণে, অদৃষ্টে ও পুরুষকারে মিলন হইল।

এই শুভবিবাহের কল্যাণফল জগন্নাথ তর্কবাচস্পতি। তর্কবাচস্পতি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শ্রীহট্টের শ্যামল সমতলে ঢেউ খেলাইয়া কাছাড়ের নীল শৈলমূলে ঊর্ম্মিমালায় ভাসিয়া পড়িল। হেড়ম্বরাজ (৩) লক্ষ্মীচন্দ্র এই কীর্ত্তিমান পুরুষকে আপন রাজধানী খাসপুরের রাজসভায় নিমন্ত্রণ করিলেন।

খাসপুর নূতন রাজধানী—লক্ষ্মীচন্দ্রের কীর্ত্তি। ইতিপূর্ব্বে কাছাড়ীদের রাজধানী মাইবংএ, এবং তারও আগে ডিমাপুরে ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কাছাড়ীদের রাজা ত্রিপুরার রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বরাকের উপত্যকা যৌতুক পাইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভ কাল হইতে জয়ন্তিয়ারাজ মাইবং আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাই লক্ষ্মীচন্দ্র আনুমানিক ১৭৪৫ খৃঃ অব্দে পর্ব্বত ছাড়িয়া সমতলে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। এখানে হিন্দুদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠেন। তাঁর সময় হিন্দুসভ্যতার অনুকরণে রাজগুরু, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদের সৃষ্টি হয়। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও ঢাকা হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ আসিয়া সমতল কাছাড়ে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে লক্ষ্মীচন্দ্রের সময়েই কাছাড়ের বর্ত্তমান সমাজের সূত্রপাত।

মহারাজ লক্ষ্মীচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর রাজসভায় সভাপণ্ডিতের অভাব ছিল না। তাঁহাদের সঙ্গে তর্কবাচস্পতির তর্ক হইল—সে দিনমান ভরিয়া জটিল তর্ক। আগন্তুকের বিদ্যাবত্তা দেখিয়া লক্ষ্মীচন্দ্র একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। দরিদ্র তর্কবাচস্পতির অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল; তিনি সুন্দাউরা ও কুলাপাড়া নামে দুটি গ্রাম, ও ৫০ হাল (৪) জমি নিষ্কর পাইয়া আর হেড়ম্বরাজ্যের রাজপণ্ডিত হইয়া খাসপুরের রাজসভা উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, উন্নতির মুখে এই বিধাতার মারা পরিবারের উপর আবার দুঃসময় আসিয়া পড়িল। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের চার পুত্র—গোবিন্দ, অনন্তকিশোর, আনন্দকিশোর ও সর্ব্বানন্দ। ইহাদের শিক্ষা পূর্ণ না হইতেই তাঁহার কাল হইল। সাধ্বী অন্নপূর্ণা দেবী পতির অকালমৃত্যুতে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন; আর তার একমাস পরে জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দও যখন পিতার অনুসরণ করিলেন, সে আঘাত সহ্য করা তাঁর পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইল। বাজপোড়া লতার মত তাঁর শরীর নিঃশেষে শুকাইয়া গেল; দিনশেষের শুকনা ফুলের মত তিনি ঝরিয়া পড়িলেন।

ভাগ্যদেবতার অনুগ্রহ যে তর্কবাচস্পতির ভায়রা ভাই রামকান্ত ভট্টাচার্য্যও কাছাড়ে বাড়ী করিয়াছিলেন।

---

(২) ইহারা রাজগুরু বংশ, শ্রীহট্ট জিলায় খুব সম্মানিত। তান্ত্রিক সাধনায় এককালে ইহাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

(৩) কাছাড় জিলার অপর নাম হেড়ম্ব দেশ। কাছাড়ীয়ের বিশ্বাস, তাহারা ভীমের পুত্র ঘটোৎকচের বংশধর।

(৪) এক হালের সমান প্রায় ৩ একর ৭॥ রত্ত।

তিনি পিতৃমাতৃহীন তিন ভাইর অভিভাবক হইলেন। দিনকয়েক পর বালক সর্ব্বানন্দকে মেসোমহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দুই ভাই আনন্দকিশোর ও অনন্তকিশোর পিতা মাতার ঊর্দ্ধদৈহিক কার্য্যের জন্য তীর্থযাত্রা করিলেন। পথে মুর্শিদাবাদে দারুণ বিসূচিকা রোগে অনন্তকিশোরের মৃত্যু হইল। গঙ্গার জলে পিতা মাতা ভ্রাতার অস্থি সংসারের সকল সুখবাসনার সঙ্গে বিসর্জ্জন দিয়া আনন্দকিশোর কাশীবাসী হইলেন।

এদিকে ভাইদের পথ চাহিয়া সর্ব্বানন্দ দিন গণিতে লাগিলেন। বছরের পর বছর চলিয়া গেল, তাহারা ফিরিলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া মেসো মহাশয়ের পরিবারেই মন বসাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রক্তের বন্ধন সহজে ছিন্ন করা যায় না। বয়সের সঙ্গে যখন ব্যক্তিত্ব ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগিয়া উঠিল, সর্ব্বানন্দ তখন আর মেসোমহাশয়ের স্নেহকেই পরম সুখ বলিয়া মানিয়া নিতে পারিলেন না। ভাইয়ের সন্ধানে গৃহবাসের সোয়াস্তিকে উপেক্ষা করিয়া তিনি পশ্চিমমুখী ছুটিলেন।

বিশ্বেশ্বরধামে দুই ভাইর সাক্ষাৎ হইল। সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু যে স্নেহের বন্ধন সংসারের নিষ্ঠুর আঘাতে ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে বন্ধন আনন্দকিশোরকে আর নূতন করিয়া বাঁধিয়া লইতে পারিল না। আনন্দকিশোর স্নেহের মোহ নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে হরিদ্বার, দ্বারকা, রামেশ্বর এবং—আরও কত তীর্থে স্নান করিতে গেলেন—সর্ব্বানন্দও পাছে পাছে ছুটিলেন। তখনকার দিনের দেশভ্রমণ কি কঠোর ব্যাপার। পথে ডাকাত, ঘাটে চোর, বনে বনজন্তু। মাথার উপর কাঠফাটা রৌদ্র, পায়ের তলায় সূচফোটা কাঁটাকঙ্কর। সর্ব্বানন্দ সব তুচ্ছ করিয়া ঝড় বাদল মাথায় লইয়া সে নির্ম্মম বৈরাগীর পাছে পাছে ঘুরিলেন; কিন্তু যে ভাইয়ের জন্য এত করিলেন, কোথাকার সুদূর কাছাড় হইতে কত পথ ভাঙ্গিয়া কত দেশে ছুটিলেন, সে ভাই কিছুতেই আর সংসারী হইতে চাহিলেন না। বিষয়ের সকল প্রলোভনের উপর, মায়া মমতার সকল আহ্বানের উপর তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে শান্তিজল ছিটাইয়া দিলেন। এতদিনের পোষা আশা ধূলিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

অথচ কেবল আশাভঙ্গেই যে মানুষের বিপদের শান্তি তা নয়। আশা যেমন চোখের উপর হইতে হঠাৎ আলেয়ার মত সরিয়া যায়, বিপদ তেমনি আড়াল হইতে হঠাৎ ঝড়ের মত উড়িয়া আসে। বহুদিনের রক্তশোষী পরিশ্রমের পুরস্কারের মত একরাশি বুকভরা কান্না লইয়া সর্ব্বানন্দ যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন সে রাজা নাই, সে মেসোমশায় নাই, ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জমিজমা অপরে দখল করিয়া নিয়াছে।

নিরুপায় সর্ব্বানন্দ নূতন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (৫) দরবারে হাজির হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র দয়া করিয়া নিঃসম্বল ব্রাহ্মণকুমারকে একহাল ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করিলেন। গাঙ্গপার ধূমকরে (৬) যে মুক্তার জন্ম হইবে, তার জন্য শুক্তির রচনা হইল।

এই সময় হীরারাম শর্ম্মার সঙ্গে সর্ব্বানন্দের পরিচয় হয়। হীরারাম ব্রহ্মোত্তরভোগী ব্রাহ্মণ ছিলেন। মানুষ চিনিতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সর্ব্বানন্দকে দেখিয়াই তিনি প্রকৃত জহুরীর মত তাঁর অন্তর বাহির পড়িয়া লইলেন। বুঝিলেন, এ ব্যক্তি যেমন সুপুরুষ, তেমনি কর্ম্মী, মেধাবী, দুঃখে কষ্টে মলিন হইলেও আলোকের মত তেজস্বী, দুর্ভাগ্যে দারিদ্র্যে পীড়িত হইলেও আকাশের মত উদার। হীরারামেরও দুই কন্যা ছিল—"রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী"। সুতরাং শুভদিনে জ্যেষ্ঠা কন্যা করুণাবতীর সঙ্গে সর্ব্বানন্দের বিবাহ হইয়া গেল।

এই বিবাহের ফলে সর্ব্বানন্দের বংশে একটি নূতন গুণের সঞ্চার হইল—তা নির্ভীক বীরত্ব, হরিচরণের মধ্যে যে গুণ দেখিয়া ইংরাজ সেনাপতি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বীরত্ব হীরারামের পরিবারের বিশেষত্ব; তার প্রমাণ আছে।

(৫) কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্মীচন্দ্রের পুত্র।

(৬) গাঙ্গপার ধূমকর হাইলাকান্দি মহকুমায়, ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। গাঙ্গের (নদীর) তীরে এবং ধূমকরী নাম্নী টিপরাই রাণীর জায়গীর বলিয়া ইহার নাম গাঙ্গপার ধূমকর।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, কাছাড়ের শৈলসঙ্কুল ক্ষেত্রে তখন ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাছাড় কাছাড়ীদের অধীন ছিল। চমৎকার জাতি এই কাছাড়ীরা; এককালে ইহাদের রাজ্য উত্তরে কামরূপ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (৭) পরিত্যক্ত নগর-প্রাচীর, বিচিত্র সিংহদ্বার, উন্নত কীর্ত্তিস্তম্ভ আজিও সে রাজ্যের সাক্ষ্যদান করিতেছে, দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ তাদের শিল্পকলার পরিচয় দিতেছে, ভগ্নদুর্গ ও প্রবাদগত বীরত্বকাহিনী তখনকার শতযুদ্ধের ইতিহাস বহন করিতেছে। আহম্, খাসিয়া, মণিপুরী, বর্ম্মী, কত শত্রুর সঙ্গে ইহাদের লড়িতে হইয়াছিল—আপনার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য! লড়িতে গিয়া তারা কখন জিতিয়াছে, কখন বা হারিয়াছে; কিন্তু কোনকালে কারো কাছে মাথা নোয়ায় নাই। স্বাধীনতার জন্য তারা যত্নে বাঁধা নগরসমূহ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়াছে, রাজপুতদের মত পাহাড়ী ফলে ও নির্ঝরের জলে প্রাণ রাখিয়াছে, তবু দাসত্বগ্রহণ করে নাই। আহা! সে শৈলমালার সন্ধিতে সন্ধিতে, কন্দরে প্রস্তরে কত রক্তই না ঝরিয়াছিল! কত কেল্লা যে ভাঙ্গিয়াছিল গড়িয়াছিল!—মনে করিলে সেকালটা একটা স্বপ্নযুগের মত মনে হয়। সে গুহায় গুহায়, উপত্যকায় উপত্যকায় সভ্যতার আলোক ছিল না, তবু একটা প্রাণ ছিল। সেই অসংস্কৃত সহজ প্রকৃতির মধ্যে, সেই অসংযত রক্তারক্তির মধ্যে একটা সঙ্গীতের সুরও ছিল, যা বিরাট কালপুরুষ তাঁর ভৈরব ঝঙ্কারে যুগযুগান্তের ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া বাজাইয়া আসিতেছেন!

কিন্তু কাছাড়ী রাজা যখন পর্ব্বত হইতে সমতলে আসিয়া রাজধানী করিলেন, তাঁর সিংহাসন তখনি ঘুণে ধরিল। কাছাড়ী প্রজাদের অনেকেই সমতল অপেক্ষা শৈলদেশে নিজেদের অধিকতর নিরাপদ মনে করিয়া রাজার সঙ্গে সমতলে বাস করিতে আসিল না। রাজাকে বাধ্য হইয়া সমতলের বাঙ্গালী প্রজাদের উপরই একটু বেশী নির্ভর করিতে হইল। এ সমস্ত প্রজার অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবী—নিরীহ—রণবিমুখ। খাইয়া ঘুমাইয়া দিনকাটানই তারা জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিত, রাজ্যরক্ষার কোন ধার ধারিত না। অথচ ইহাদের দ্বারাই সৈনিক বিভাগের পুষ্টিসাধন করিতে হইল। রাজশক্তি তাই ধীরে ধীরে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। যে রাজবংশ একদিন প্রবল শত্রু আহমের সঙ্গে সমানভাবে লড়িয়াছিল, সেই রাজবংশেরই কৃষ্ণচন্দ্র পীরের আক্রমণে রাজ্য ছাড়িয়া অরণ্যে পলায়ন করিলেন। অবশেষে যখন গোবিন্দচন্দ্র রাজা হইলেন, তখন হেড়ম্ব-রাজসিংহাসনের দুর্দ্দশার পূর্ণাহুতি হইল।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাঁহার বিধবা পত্নী মণিপুররাজ মধুচন্দ্রের দুহিতা ইন্দুপ্রভা তখন দেবর গোবিন্দচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিলেন। তুলারাম ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের সেনাপতি, যাঁর বীরত্বে এই পীরের ভয়ে ভীত রাজা তাঁর প্রথম জীবনের নষ্ট গৌরব অনেকটা ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। কিন্তু তুলারামের সেই বীরত্বই গোবিন্দচন্দ্রের ত্রাসের কারণ হইল। তিনি তাঁকে কৌশলে পদচ্যুত করিয়া মণিপুরী মহিষীর পিতৃব্য পক্ষীর সিংহকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। তুলারাম উত্তর কাছাড়ে গিয়া নূতন রাজ্য গঠন করিলেন। মণিপুরে তখন ঘোর অরাজকতা। দলে দলে মণিপুরী কাছাড়ের দিকে ছুটিল, এবং রাজপরিবারে আশ্রয় পাইতে লাগিল। রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ পুরাতন বিশ্বাসী কর্ম্মচারিরা ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিল এবং রাজশক্তির শেষ কণা তুলারামের সঙ্গে উত্তর কাছাড়ে গিয়া আশ্রয় লইল। এদিকে মধুচন্দ্রের মৃত্যুর পর মণিপুরের সিংহাসন

(7) "Captain Fisher, the first Superintendent of the District (Kacher) who took great pains in ascertaining the early history of the Kachari race, was of opinion that this rude tribe gradually acquired an empire over Assam, Sylhet, Mymensing and the valleys to the east of the Brahmaputra, their Capital seat being at Kamrup; and that their rule ultimately embraced everything from Kamrup down to the sea. It is supposed that the Tipperah Raja was a younger son of the house, the original Empire being divided into a northern and a southern part."—A Statistical Account of Assam. (Hunter). Vol II. P. 393.

লইয়া দুই ভাই সর্জ্জিৎ ও মার্জ্জিতে গোলযোগ বাধিল। মার্জ্জিৎ ব্রহ্মরাজের সাহায্যে রাজা হইলেন, সর্জ্জিৎ পলায়ন করিলেন। মার্জ্জিৎ রাজা হইয়া কাছাড় আক্রমণ করিলেন। সর্জ্জিৎ গম্ভীরসিংহের সঙ্গে যোগ দিয়া মার্জ্জিৎকে হারাইয়া দিলেন। তখন কাছাড়ে গম্ভীর সিং ও সর্জ্জিৎ সিংএর ক্ষমতা বদ্ধমূল হইয়া গেল।

বার বার প্রবলের অত্যাচার সহিয়া সহিয়া বাঙ্গালী প্রজাগণ দুর্ব্বল গোবিন্দচন্দ্রকে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করিতে লাগিল। গম্ভীর সিং সুযোগ পাইয়া রাজদণ্ড আপনার হাতে তুলিয়া লইলেন, গোবিন্দচন্দ্র পাঁচ বৎসর রাজত্বের পর বনবাসী হইলেন। এই সময় মার্জ্জিৎ সিং ও ব্রহ্মরাজের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। মার্জ্জিৎ পরাজিত হইয়া কাছাড়ে পলায়ন করিলেন ও ভাইদের কাছে আশ্রয় লইলেন। তখন কাছাড়ের সমতলভাগ তিন ভাই মণিপুরী সর্জ্জিৎ সিং, মার্জ্জিৎ সিং ও গম্ভীর সিং ভাগ করিয়া নিলেন।

কাছাড়ের যখন এই অবস্থা সর্ব্বানন্দের শ্বশুর হীরারামের তখন পূর্ণ প্রতাপের দিন। কোথাকার লোকে আসিয়া উড়িয়া পড়িয়া রাজাকে রাজ্যহারা করিয়া রাজ্য ভাগ করিয়া নিবে, এই রাজভক্ত বীর পরিবারের তাহা সহ্য হইল না। হীরারামের ভাই চূড়ামণি দুর্দ্দান্ত মণিপুরীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিলেন। হাইলাকান্দির নূতন মণিপুরী অধীশ্বর মার্জ্জিৎ সিং তাঁর কাছে পরাজিত হইয়া সরসপুর পরগণা তাঁকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

সর্ব্বানন্দের আর ছিল না কিছুই ; কিন্তু দিন ছিল বড় সহজ। চাউল ছিল টাকায় ৩ মণ আর ঘি ৪ সের। দুধের সের ছিল ১ পয়সা, কাপড়ের জোড়া ৷৹, ফলমূল ত কিনিতেই হইত না। কাজেই কায়ক্লেশে দরিদ্রের দিন চলিত। করুণাবস্তীর গুণে সর্ব্বানন্দ অতীতের সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে সংসারের প্রতি অনুরাগ তাঁর ফিরিয়া আসিল ; মুখে আবার হাসি ফুটিল ; পৃথিবীটা আবার নূতন হইয়া সুন্দর হইয়া দেখা দিল।

• দরিদ্রের এই বিচিত্র জীবনলীলার মধ্যে দুই পুত্র তিন কন্যার পর ঘর-আলো-করা হরিচরণের জন্ম হয়।

## বাল্য-জীবন।

১৭৪১ শকাব্দে ১৮ই বৈশাখ (এপ্রিল, ১৮২৬) কাছাড়ের গাঙ্গপার ধূমকর গ্রামে হরিচরণের জন্ম হয়। সংসারের বহুবিধ দুঃখের কশাঘাত তাঁহাকে বাল্যকাল হইতেই সহিতে হইয়াছিল। পিতা দরিদ্র ছিলেন, এক ভাই সংসারত্যাগী হইলেন, ঘরের দ্বারে জয়পতাকা উড়াইয়া নিষ্ঠুর মৃত্যু দুই ভাই তিন বোনকে লুণ্ঠন করিয়া নিয়াছিল। অপুত্রক হীরারাম মরণকালে যৎসামান্য ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন, মাতামহের জ্ঞাতিরা তা কাড়িয়া লইল—এমনি করিয়া সংসারই বেত্রধারী গুরুমহাশয়ের মত হরিচরণের শিক্ষাভার আপনার হাতে নিয়াছিল।

দরিদ্র পিতাও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার তত্ত্বাবধানে বালক হরিচরণ দুই ভাই রামচরণ ও নীলমণির সঙ্গে কলাপাতায় ও তালপাতায় "হরফ বানাইতে" বিশেষ পটু হইয়া উঠিলেন এবং চাণক্য শ্লোক আওড়াইয়া প্রতিবেশীকে মুগ্ধ করিয়া দিতে লাগিলেন। ভস্মের ভিতর দিয়া আগুনের জ্যোতি যেমন ফুটিয়া উঠে, দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া এই বালকের প্রতিভার জ্যোতিও তেমনি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও বোধশক্তি এমন প্রখর ছিল যে অতি অল্প বয়সেই তিনি ব্রাহ্মণের দশবিধ কর্ম্মে পরিপক্ক হইয়া উঠিলেন। পুত্রশোকের দাগা পাওয়া মা বাপের "বুলিঝাড়া" পুত্র হরিচরণ—সকলেই তাঁকে আদর করিত। কিন্তু আদর তাঁহাকে অধিকাংশ আদুরে ছেলের মত নষ্ট করিয়া দিতে পারে নাই। বরং তাঁহার প্রতিভা ও তেজ স্বাধীনভাবেই স্ফূর্ত্তি পাইতে পারিয়াছিল। তথাকথিত ডিসিপ্লিনের ষ্টিম রোলার টানিয়া আজকাল যে কোন কোন স্থলে শিশুপ্রতিভার ও চরিত্রের কোণাকানাগুলি পিষিয়া সমান করিয়া দেওয়া হয় সৌভাগ্য যে হরিচরণ তেমন কোন কলের কারখানায় পড়েন নাই। পড়িলে হয়ত আমরা কোন বিজ্ঞ উকিল কি ডাক্তার বা বড় জোর হাকিমকে পাইতাম, কিন্তু আমাদের বীর হরিচরণকে পাইতাম কি না সন্দেহ। এই বীর

শিশুর তেজস্বিতা ও স্বধর্ম্মপ্রীতি বাল্য জীবনেই কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

হরিচরণ নদীতে স্নান করিতে গেছেন, সঙ্গে পাড়ার বালকেরা। বালকদের উপর হরিচরণের সর্দ্দারের মত প্রভুত্ব চলিত। তাঁর চরিত্রে এমনি একটী শক্তি ছিল যে অন্যান্য বালকের ব্যক্তিত্ব তাঁর সাক্ষাতে ডুবিয়া পড়িত। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল প্রভুত্ব ও দাসত্বের সম্বন্ধ ছিল না, ভালবাসার সম্বন্ধও ছিল। আমোদ প্রমোদ, খেলাধূলা, স্নানাহারের ভিতর দিয়া তাঁদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। বন্ধুরা স্নান করিতে গেছেন, ধলেশ্বরীর (৮) কলকল্লোলে সাঁতার কাটিয়া ফিরিতেছেন এমন সময় এক নেয়ের সারিগান তাঁদের কানে গেল। নেয়েটী হিন্দু নয়; গানের কথায় হিন্দুদের প্রতি কটাক্ষ আছে, ভাষা রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রকাশ্য গান শুনিয়া হরিচরণের সর্ব্বাঙ্গে আগুণ ধরিল। তিনি বন্ধুদের সঙ্গে সাঁতরাইয়া গিয়া নৌকা ধরিলেন। নেয়ে মার খাইয়া দারোগার কাছে গেল। দারোগা বালকের কথাবার্ত্তায় বিশেষ প্রীত হইয়া নেয়েকে তাড়াইয়া দিলেন। হরিচরণের বাল্য জীবনের এমন বহু লীলায় (নীতিবাদীগণ যাহাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিবেন) তাঁর ভবিষ্যৎ কৃতিত্বের আভাষ পাওয়া যায়। যে সময়ের কথা বলিলাম তখন কাছাড়ে বৃটিশশাসন সবে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তার আগে কয়েকবৎসর ভয়ানক অরাজকতা চলিয়াছিল। মণিপুরী ও মগের আক্রমণে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বার বার পলায়নে দেশ প্রায় জনমানবশূন্য হইয়া পড়ে। বীর ছিলেন সেনাপতি তুলারাম, যাঁকে দেখিয়া শত্রুগণ ভয়ে কাঁপিত, বন্যহস্তী অভিবাদন করিত। কুক্ষণে রাণী ইন্দুপ্রভার পরামর্শে গোবিন্দচন্দ্র তাঁকে হত্যা করিতে সংকল্প করিলেন। তুলারাম পার্ব্বত্য কাছাড় নিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন, আর এদিকে সমতল কাছাড় মণিপুরী ও মগের হাতে নির্য্যাতনের একশেষ ভোগ করিতে লাগিল। গোবিন্দচন্দ্রের কোন শিক্ষিত সেনাদল ছিল না, আবশ্যকমত কৃষকদের ধরিয়া নিয়া সৈন্য সাজান হইত। এমন অবস্থায় পুনঃ পুনঃ পলায়ন ছাড়া শত্রুর হাত এড়াইবার আর কোনও উপায়ই ছিল না। ঘোর অশান্তিতে প্রজাগণ ক্ষেপিয়া উঠিল, গম্ভীর সিং সে বিদ্রোহের অনলে ফুৎকার দিতে লাগিলেন; গোবিন্দচন্দ্র রাজ্য ছাড়িয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন।

রাজ্যহারা গোবিন্দচন্দ্র তখন মতিহারা হইয়া একবার ইংরাজের আবার মগের, আবার ইংরাজের সাহায্য চাহিতে লাগিলেন। মগেরা কাছাড় আক্রমণ করিল; তিন ভাই মণিপুরী বীর রাজ্য ছাড়িয়া শ্রীহট্টে পলায়ন করিলেন। রাজ্য জুড়িয়া অত্যাচার ও লুণ্ঠন চলিল। অসহায় নিরুপায় নিরীহ প্রজাগণ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে পলাইল, জঙ্গলে লুকাইল, জলে ঝাঁপ দিল। তখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া পারিলেন না। বৃটিশের ভয়ে মগেরা সরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সে সময়কার যে অত্যাচার, মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। জেলে যেমন রজ্জুতে মাছ গাঁথে, মগেরা তেমনি মানুষকে সূক্ষ্মবেতে গাঁথিয়া লইয়া চলিল। স্ত্রীলোক, শিশু, রোগাতুর যারা চলিতে পারিল না, তাদের হাত পা কাটিয়া পথে পথে ফেলিয়া যাইতে লাগিল। তাদের আর্ত্তনাদে পর্ব্বতে পর্ব্বতে পাষাণ গলিয়া নির্ঝর বহিয়াছিল।

তারপর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে গোবিন্দচন্দ্র আবার জনশূন্য রাজ্যের অসার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন করদ মিত্ররাজরূপে। কিন্তু বীরত্বে হীন হইলেও লোভ ছিল তাঁর ষোল আনা। রাজ্য পাইয়াই তিনি উত্তর কাছাড় অধিকার করিবার আশায় তুলারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, সীমান্তদেশে আবার সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হইলেন, কিন্তু আগুণ জ্বলিতেই লাগিল।

অবশেষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ের সমস্ত অত্যাচার ও অরাজকতার সহিত এই অক্ষম রাজার প্রাণবায়ু ঘাতকের গুপ্ত আঘাতে বাহির হইয়া গেল; কাছাড় বৃটিশ অধিকারে আসিয়া বাঁচিল।

(৮) এই নদী লুসাই পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বরাক নদীতে পতিত হইতেছে। হাইলাকান্দি সহর ইহারই তীরে অবস্থিত।

হরিচরণের বয়স তখন পাঁচ বৎসর! জীর্ণ মলিন জর্জ্জর পুরাতনের অন্তর্দ্ধান আর অক্ষত উজ্জ্বল প্রবল নূতনের আবির্ভাব, এ উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে পাঁচ বৎসরের শিশু কি কল্যাণমন্ত্র শিখিতেছিলেন, তা কে বলিতে পারে?

বিধাতার রোষ একবার যার উপর পড়ে, সে আর সহজে নিস্তার পায় না। বৃটিশশাসনে আসিয়া কাছাড় এক বিপদ হইতে বাঁচিল, কিন্তু আর এক বিপদ তার দরজার কাছে আসিয়া উঁকি মারিতে লাগিল। সে আটসেরি নিদান। (৯)

১৮৩২ এর চৈত্র কি ভয়ঙ্কর চৈত্র,—আকাশে একখণ্ড মেঘ উঠিল না, ভূমিতে একবিন্দু জল পড়িল না। উলঙ্গ প্রকৃতি প্রখর রৌদ্রে খা খা করিতে লাগিল। বৈশাখ আসিতে না আসিতে মাঠের ঘাস সব আগুনে পোড়ার মত জ্বলিয়া গেল। ঘাসের অভাবে গরুগুলি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গেল। কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

জ্যৈষ্ঠের প্রথমে কিছু কিছু বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল; লোকে ভাবিল তবু বুঝি ভগবান সদয় হইলেন। কিন্তু হায় রে বিধাতা! তাদের প্রাণের আশা নূতন ধানের কচি পাতার সঙ্গে গজাইয়া উঠিতে না উঠিতেই দারুণ পাহাড়ী বন্যা আসিয়া সমস্ত ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া গেল; ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার।

অন্ধকারে মানুষ বসিয়া থাকে না; নিষ্ঠুর জড় প্রকৃতির সঙ্গে তাদের লড়াই চলিল। ভাদ্র মাসে জল সরিয়া গেলে কৃষকেরা ক্ষেত ফিরাইল। সাদা মাঠ আবার সবুজ হইয়া উঠিল, মানুষ আবার করজোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিল।

আশ্বিনের সংক্রান্তিতে মহালক্ষ্মীর পূজা দিয়া, ক্ষেতে ক্ষেতে "ওলা" (১০) দিয়া গৃহস্থরা আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। কার্ত্তিক মাস চলিয়া যাইতে লাগিল, বৃষ্টি হইল না। ধানে পোকা লাগিল। হাতলম্বা ডগডগা ক্ষীরভরা ছড়াগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া শুকাইয়া যাইতে লাগিল। কৃষাণপল্লীতে আবার হাহাকার উঠিল।

অবশেষে মানুষ যে বৃষ্টির জন্য হায় হায় করিতেছিল, সে বৃষ্টি দেখা দিল, সে কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে। সপ্তাহ খানেকের ঘোর বর্ষণে মাঠ ঘাট সব ডুবিয়া গেল। সে জল যখন সরিল, তখন সোণার ধানক্ষেতে মরুভূমি। বছর বছর যে সব মাঠে ভোর না হইতে কৃষকশিশুদের আনন্দকোলাহল জাগিয়া উঠিত, খোলা মাঠের খোলা বায়ু যেখানে "দাওয়ালের" (১১) কর্ম্মসঙ্গীতে হর্ষে আবেগে কাঁপিয়া উঠিত, সোণার রৌদ্র সেখানে নিতান্ত একেলা কাঁদিয়া মরিতে লাগিল, কোন সোণার চাঁদ শিশু তাতে ছুটাছুটি করিতে আসিল না। গৃহস্থের পুঁজি প্রথমে ফুরাইয়া আসিল তারপর তারা একবেলা খাইয়া একবেলা পেট বাঁধিয়া পড়িয়া রহিল, শেষে লতাপাতা ধরিল। দরিদ্র সর্ব্বানন্দের আগেকার বছরের যা সঞ্চয় ছিল, পৌষেই তা ফুরাইয়া গেল। মাঘ মাস হইতে কিনিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিনিবার টাকা আসে কোথা হইতে? চৈত্র পর্য্যন্ত কষ্টে সৃষ্টে চলিল। বৈশাখ হইতে একবেলা আহার আরম্ভ হইল। জ্যৈষ্ঠ হইতে কোন দিন আহার, কোন দিন না। এই সময় অনাহারী শিশুদের শীর্ণমুখের দিকে চাহিয়া মা

---

(৯) ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শিলেট ও কাছাড় জিলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। চাউলের দর টাকায় আটসের হইয়া দাঁড়ায়। আজকালকার পাঠকেরা হাসিয়া বলিতে পারেন—টাকায় আটসের চাউল, তাও আবার দুর্ভিক্ষ? কিন্তু তখন টাকার মূল্য ছিল অনেক বেশী। যার মাসিক পাঁচ টাকা আয়, সেও ধনী ছিল; আর যার দশ বারো টাকা আয়, সে বড় বড় জমিদারী কিনিয়া গিয়াছে। সুতরাং তখনকার টাকায় আটসের এখনকার টাকায় এক সেরের সমান। আটসেরি নিদানের কথা মনে করিয়া এখনো বুড়োরা চমকিয়া উঠেন।

(১০) চালতা পাতায় গাঁথা কাশখণ্ড। আশ্বিনের সংক্রান্তি দিন মেয়েরা মহালক্ষ্মীর পূজা দেয় ও ব্রতকথা বলে। সুন্দা মেথি পোড়াইয়া তেলে মাড়াইয়া মহালক্ষ্মীর কাছে নিবেদন করে। তারপর গৃহস্থ তা চালতা পাতায় মাখাইয়া তাতে কাশ ফুল গাঁথিয়া ক্ষেতে ক্ষেতে ছড়াইয়া দেয় ও বাড়ী ফিরিবার কালে কচি কচি ধানের মোচা লইয়া আসে ছেলে মেয়েরা চিবাইয়া খাইবে বলিয়া।

(১১) যারা চুক্তি করিয়া পরের ধান কাটিয়া দেয়।

বাপের চোখের জল আর বাঁধ মানিত না। বালক হরিচরণের কাছে অনাহারের চাইতেও বেশী অসহ্য ছিল চোখের জল। তিনি অসীম ধৈর্য্যের সহিত ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিতেন; পেট যখন জলিয়া যাইতেছে মুখে তখন হাসিতেন, নইলে পিতা মাতা অস্থির হইবেন। এক একদিন যখন চোখের জল থামাইতে পারিতেন না বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া নদীতীরে বসিয়া থাকিতেন। কত রৌদ্র তাঁর মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কত সন্ধ্যা তাঁর চোখের উপর রঙ্গীন ছায়া ফেলিয়াছে, কত চন্দ্র তারা অশ্রুজলের উপর নির্লজ্জের মত হাসি বর্ষণ করিয়াছে! হরিচরণ সব সহিয়াছেন।

একবার ত ভরা দিন রাত ক্ষুদকণাও পেটে পড়িল না। পরদিন সর্ব্বানন্দ টাকার খোঁজে বাহির হইয়া গেলেন। হরিচরণ দুপুরবেলা পর্য্যন্ত সহ্য করিলেন; কিন্তু তারপর চোখের জল সামলান শক্ত দেখিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার সময় সর্ব্বানন্দ একসের চাউল লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। রান্না হইল; কিন্তু হরিচরণ কোথায়? ঘরে ঘরে, পথে ঘাটে, এখানে সেখানে খোঁজ করা হইল, হরিচরণ কোথাও নাই। বাবা হায় হায় করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মা পাগলের মত আছাড় খাইয়া পড়িলেন—খটির কাণায় মাথা লাগিয়া রক্তধারা বহিয়া গেল। ভাই দুটি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। গোলমাল শুনিয়া পাড়ার লোক জড় হইল। অবশেষে দেখা গেল হরিচরণ নদীর ঘাটে একখানা ভাঙ্গা নৌকায় গলুইয়ের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

এমনি করিয়া বহু ঘটনার ভিতর দিয়া প্রকৃতি এই বীর বালককে গড়িয়া তুলিতে লাগিল। বিপদ তাঁহাকে সাহস শিখাইল, দুঃখ তাঁহাকে সহিষ্ণুতা শিখাইল, পার্ব্বত্য দেশের প্রাকৃতিক বিচিত্রতা তাঁর হৃদয়কে সৌন্দর্য্যবুদ্ধি দ্বারা মধুর ও জ্ঞানের দ্বারা উদার করিয়া তুলিল। অবস্থার হীনতাহেতু সাধারণ মানুষের সহিত মিশিতে যাইয়া তিনি মানবজীবনের হাসি কান্নার, আশা আকাঙ্ক্ষার সুরটি সম্পূর্ণ আয়ত্ব করিয়া লইলেন। এইরূপে মানবসমাজ ও জড়প্রকৃতি উভয়কেই তিনি শিক্ষকরূপে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষ ও জড়প্রকৃতি উভয়েরই কলকাঠিটিও তিনি ধরিতে পারিয়াছিলেন। এই শিক্ষার ফল আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে দেখিতে পাইব।*

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

* THE STORY OF AN UNKNOWN BENGALEE.

Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air.

So sang Gray in his Elegy and the lines have again and again been quoted when the story of some great unknown person is for the first time unearthed and laid before the public. These words occurred to us as we read the admirable account published in the current number of the "Dacca Review" of the hitherto unknown Rai Hari Charan Sarma Bahadur.... We note the fact, and we pass on to consider the brilliant career disclosed in the pages of the "Dacca Review", which closed several years ago and of which the world knew nothing and would probably have known nothing but for the enterprise of our Dacca contemporary.... The story is only matched by the adventures of the fighting Munsiff of Allahabad, Babu Peary Mohan Banerjee, who gave up the honour of the bench for the dangers of the battle-field and organized a body of fighting men to defend the Government which he served and for which he was prepared to lay down his life....

The life-story of such a man is an abiding national possession and is calculated to enhance our national self-respect. The old ideas about the Bengalee, to which the eloquence of Macaulay had given currency must be discarded as an exploded myth. The story of Hari Charan...and other incidents too numerous to be mentioned here, reveal the growth in courage, in self-reliance and in the possession of the manlier qualities for which young Bengal has earned a name and fame. It is the deepening desire to foster the development of these qualities which will re-act upon our social institutions and upon the whole circle of our lives and exercise an enduring and beneficent influence upon them. Therein lie the hopes of the future.

(The Bengalee, May 3, 1913.)

## অভাগিনী।

আমি যে ধুতুরা ফুল চির অভাগিনী।
নাহি শোভা, নাহি ঘ্রাণ,
তবু কাণে দেছ স্থান,
আমারে করেছ প্রভু, শিব-সোহাগিনী।
তোমা বিনা আর বা কে
পিনাকে পাপীকে ডাকে?
আলয়বিহীনা আমি প্রণয়-রাগিনী।
শ্মশানের ছাই আমি,
তোমারি কৃপায় স্বামী!
বিভূতি হয়েছি আজি তাই সে মানিনী;—
কখন দহন-শেষে
অলক্ষ্যে গোপনে এসে
কুড়ায়ে নিয়েছ বক্ষে আমিত জানিনি!
কালরূপী কালকূটে
ধরেছ অধর-পুটে,
বিষধর জটাজূটে—গলায় নাগিনী।
জরামৃত্যু কর পান,
অমৃত তোমারি দান,
শিঙ্গা ফুঁকে ধর তান;—জেগেও জাগিনি!
অমর করিয়া মোরে
রেখেছ স্নেহের ক্রোড়ে,
তুমি বাঘাম্বর—আমি বাঘিনী-ডাকিনী।
পতিতারে পায়ে দলি
রথিরা গিয়াছে চলি,
নিশীথে পথের মাঝে, আজি একাকিনী!
আমার কলঙ্ক খানি
শশাঙ্কের সঙ্গে ছানি
লেপিলে ললাটে—তাই সেজেছি মোহিনী।
তোমার বিষাণ বাদ্য—
বুঝাকি আমার সাধ্য?
কখনো ভৈরবরব—কখনো সোহিনী!
আমি তুচ্ছ ক্ষুদ্র অতি,
তোমার ও রুদ্র রতি
সহিতে শকতি কোথা?—আমি অভাগিনী।
বজ্র নিয়ে রুখে এসে
বুকে তুলে নিলে হেসে,
বারাঙ্গনা আজি তব বরাঙ্গভাগিনী,
পতিতারে করিয়াছ পতিসোহাগিনী!

শ্রীকুঞ্জচন্দ্র দে।

---

## লোক শিক্ষায় পুরাণ শাস্ত্র।

সংস্কৃত পুরাণশাস্ত্রের কাল নিরূপণ ও আখ্যায়িকা ভাগের সত্যতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও লোক-শিক্ষা বিষয়ে ইহার অসাধারণ ক্ষমতা ও মানব প্রাণে ইহার অনন্যসাধারণ প্রভাব বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে না। স্থির ভাবে লক্ষ্য করিলে উহার মূলে দুইটি প্রধান কারণের উপলব্ধি হয়। প্রথম কারণ এই যে পুরাণের প্রত্যেকটি আখ্যায়িকা ধর্ম্মমূলক; উপসংহারে ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, ভক্তির জয় প্রদর্শিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় কারণ, ঐ সকল আখ্যায়িকা এমনই প্রাণ-স্পর্শী ভাবে সাজান যে তাহা একবার পাঠ করিলে বা সুযোগ্য কথকের মুখে শ্রবণ করিলে মানবমাত্রেরই প্রাণে এক অপূর্ব্ব পবিত্র ভাবের আবির্ভাব না হইয়া পারে না। অল্পদিন পূর্ব্বেও বঙ্গদেশের নরনারীগণ পুরাণশাস্ত্রের সাহায্যে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া বঙ্গের সংসারে যে বিমল শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে একটি আখ্যায়িকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

### প্রহ্লাদের কল্পতরু ব্রত।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে প্রহ্লাদ নামে এক ধার্ম্মিক নরপতি বাস করিতেন। তিনি এমন দানশীল ছিলেন যে কখনও কোন যাচক তাঁহার নিকট আসিয়া বিফল-মনোরথ হয় নাই। একদা তিনি "কল্পতরু ব্রত" অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিলেন। ঐ ব্রতের নিয়ম এই যে, যে মহাত্মা এই পবিত্র ব্রত অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে তিন দিন পর্য্যন্ত যে যাহা চায় তাহাই দান করিতে হয়। এমন কি যদি কেহ এই

সময়ের মধ্যে প্রাণ পর্য্যন্তও প্রার্থনা করে তাহা দান করিতে হয়; নচেৎ তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

অল্পদিনের মধ্যে মহারাজ প্রহ্লাদের ঘোষণা রাজ্যের চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। দলে দলে যাচকগণ রাজধানীতে আসিতে লাগিল। রাজপ্রাসাদ লোকে লোকারণ্য। আজ ব্রতের প্রথম দিন মহানুভব নরপতি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। দলে দলে যাচকগণ সিংহাসনপ্রান্তে উপস্থিত হইতে লাগিল। ভূপতিও প্রফুল্ল চিত্তে প্রত্যেক যাচককে তাহার প্রার্থিত বস্তু স্বহস্তে প্রদান করিতে লাগিলেন। কেহ অন্ন, কেহ বস্ত্র, কেহ ভূমি কেহ বা ধনরত্নাদি প্রার্থনা করিল। যে যাহা প্রার্থনা করিল সে তৎক্ষণাৎ তাহা লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সভাগৃহের মুক্ত প্রাঙ্গনে আসিতে লাগিল। আজ হিরণ্যকশিপুর রাজধানী সুপুত্র প্রহ্লাদের গুণে স্বর্গের নন্দনকাননের শোভা ধারণ করিল। দেখিতে দেখিত সূর্য্য অস্তমিত হইল। মহারাজ প্রহ্লাদ গাত্রোত্থান করিয়া হৃষ্টচিত্তে অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

এইরূপে দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিন প্রভাতে রাজাধিরাজ প্রহ্লাদের মনে একটু অহমিকার ভাব হইল। তিনি অন্য দুইদিনের ন্যায় আজও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন। মন্ত্রিগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া শতমুখে রাজাধিরাজ প্রহ্লাদের এই মহাব্রতের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অর্থিগণ দলে দলে সিংহাসন প্রান্তে আসিয়া দান গ্রহণ করিতে লাগিল। একদল যাচকের পশ্চাতে এক অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্ন কালে রাজসিংহাসন প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রার্থনা জানাইতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—'মহারাজ, আমার প্রার্থিত বস্তু অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং তাহা আপনি দিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তবে যদি আপনি সর্ব্বজনসমক্ষে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করেন যে আপনি তাহা দিবেন, তাহা হইলে আমি আমার প্রার্থনার কথা জানাইব নচেৎ তাহা প্রকাশ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।'

গর্ব্বিত প্রহ্লাদ, ব্রাহ্মণের এই প্রকার উক্তিশ্রবণে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং অবিলম্বে ব্রাহ্মণের প্রার্থিত বস্তু তাঁহাকে প্রদান করিবেন বলিয়া পুনরায় প্রতিশ্রুত হইলেন।

দর্পহারী ভগবান সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান। আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহির্ভূত নহে। যিনি যত বড় মহৎই হউন না কেন যখন তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও অহঙ্কারের উদয় হয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার পতন অনিবার্য্য। অতিবড় ধার্ম্মিকেরও হৃদয়ে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইলে তাঁহার সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম বিফল হইয়া যায়। মহারাজ প্রহ্লাদের ও তাহাই ঘটিল। ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া সভাসদ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—'সভ্যগণ, আপনারা মহারাজ প্রহ্লাদের প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করুণ, তিনি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন আমি যাহা প্রার্থনা করিব আমাকে তাহাই দান করিবেন। আমি তাঁহার সত্য ভিক্ষা করিতেছি; তিনি আমাকে তাঁহার সত্য দান করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করুন।'

ব্রাহ্মণ এই কয়েকটি কথা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া নীরব হইলেন। সভাসদ্‌গণ নীরব। মহারাজাধিরাজ প্রহ্লাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এতক্ষণে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি মনে মনে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ম্রিয়মাণ হইলেন। তখনও তাঁহার কর্ণে ব্রাহ্মণের বাক্যের শেষ ধ্বনিটি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; তিনি শুনিতে লাগিলেন—'নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করুন।'

তখন রাজ্যেশ্বর প্রহ্লাদ নিরুপায়। তিনি শৈশবে যে সত্যপালনের জন্য অসীম পরাক্রমশালী পিতা হিরণ্যকশিপুকে হারাইয়াছেন, যে সত্য রক্ষা করিতে গিয়া অনলে গরলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আজ কেমন করিয়া সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সত্যকে বিসর্জ্জন করিবেন? প্রহ্লাদের চক্ষে জল আসিল।

সে অশ্রুপাতে অর্হম্মিকা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। তখন তাঁহার হৃদয়ে নববলের সঞ্চার হইল, তাঁহার স্মরণ হইল, চিরদিন তাঁহার জীবন মরণের সহায় দয়াময় হরি তো তাঁহার নিকটেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভক্তবৎসল হরির শরণাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণকে সত্য দান করিলেন।

ধার্ম্মিকপ্রবর যখনই সত্য দান করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর হইতে এক দিব্য জ্যোতি নির্গত হইল; দেখিতে দেখিতে ঐ জ্যোতিঃ এক রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রহ্লাদের সমক্ষে উপস্থিত হইল। প্রহ্লাদ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা, তুমি কে?' ঐ রমণী মূর্ত্তি উত্তর করিল—'আমি রাজলক্ষ্মী, যেখানে সত্য থাকে না সেখানে আমার অবস্থান নাই' ইহা বলিতে বলিতে ঐ দিব্য মূর্ত্তি ব্রাহ্মণের শরীরে বিলীন হইল।

সভাসদ্‌গণ পুনরায় সবিস্ময়ে দর্শন করিলেন, মহারাজ প্রহ্লাদের সর্ব্বাঙ্গ পূর্ব্ববৎ কম্পিত হইতে লাগিল এবং অচিরকাল মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় এক স্বর্গীয় অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ সেই শরীর হইতে নির্গত হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষে অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। মহারাজ প্রহ্লাদ পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তিপূর্ণ চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া কহিলেন—'মা, তুমি কে?' ঐ রমণীমূর্ত্তি উত্তর করিল, 'আমি শান্তি, যে খানে সত্য থাকে না, সেস্থানে আমার অবস্থান নাই।' প্রহ্লাদ পুনরায় প্রণাম করিলেন; দেখিতে দেখিতে সে মূর্ত্তিও ব্রাহ্মণের শরীরে বিলয় প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে বিবেক, সরলতা প্রভৃতি মানবজীবনের সাধুবৃত্তি সকল একে একে প্রহ্লাদের শরীর হইতে অন্তর্হিত হইল। পরিশেষে এক দিব্যতেজোময় পুরুষ মূর্ত্তি প্রহ্লাদের শরীর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল। প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবন, আপনি কে? কোথায়ই বা গমন করিতেছেন?' দিব্যপুরুষ উত্তর করিলেন—'মহারাজ, আমি ধর্ম্ম, আপনি অবগত আছেন যে সত্যই ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয়। সত্যবিহীন হইয়া ধর্ম্ম কখনও জীবন ধারণ করিতে পারেনা; সুতরাং যেখানে সত্য গমন করে ধর্ম্মও সেই স্থানেই বিদ্যমান থাকে।' ইহা বলিয়া সেই দিব্যপুরুষ গমনে উদ্যত হইলে, প্রহ্লাদ সবিনয়ে বলিলেন,—'সে কি দেব! আমি প্রতিজ্ঞাপালন দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিতে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় সত্য দান করিয়াছি তথাপি আমাকে ত্যাগ করিয়া কিরূপে যাইতে পারেন?' ইহা বলিয়া মহারাজ প্রহ্লাদ ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইলেন। সেই তেজোময় মূর্ত্তি তখন ধীরে ধীরে প্রহ্লাদের দেহে প্রবিষ্ট হইল। ক্রমে শান্তি, ধৃতি, বিবেক প্রভৃতি ধর্ম্মের অনুসরণ করিল। রাজলক্ষ্মী আর কতকাল দূরে থাকিবেন! তিনিও প্রিয় সহচরীগণের অনুসরণ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন। প্রহ্লাদ সবিস্ময়ে দেখিলেন তাঁহার চিরবাঞ্ছিত লীলাময় হরি ব্রাহ্মণের আসনে দণ্ডায়মান!

শ্রীদ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।

# উত্তরাপথ ভ্রমণ

## ( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

সুদীর্ঘ দণ্ড ধারণ করিয়া আমরা অতিশয় উল্লাসে পথে বাহির হইলাম। এতদিন ধরিয়া নানা বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিলাম, আজ হৃষীকেশ পরিত্যাগ করিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এখন হইতে দুর্ভেদ্য হিমালয়ের উন্নত প্রাচীর ভেদ করিয়া বরাবর আমাদিগকে পদব্রজে যাইতে হইবে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাস্তার বামভাগে উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত কৈলাস মঠ দর্শন করিতে গেলাম। মঠের চতুষ্পার্শ্বস্থিত পার্ব্বত্য বনরাজির নিস্তব্ধতা মঠটীকে সাধনার অত্যন্ত অনুকূল করিয়া তুলিয়াছিল। অদূরে নিম্ন প্রবাহিনী গঙ্গা, তার সেই অবিশ্রান্ত কলতান যেন মঠবাসীদিগকে অনাহত নাদ শ্রবণ করাইতেছিল। মঠের ঠিক মধ্যস্থলে দুইটী মন্দির, তাহার একটীতে মর্ম্মর প্রস্তরের শিবলিঙ্গ ও অপরটীতে মার্ব্বেল নির্ম্মিত আচার্য্য শঙ্করের সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। চতুর্দ্দিকে সন্ন্যাসিদিগের আবাস-গৃহ। সন্ন্যাসিদিগের অনেকেই নিবিষ্ট মনে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেছেন। বাস্তবিকই এই মঠটী এখানকার শাস্ত্রালোচনার একটী প্রধান কেন্দ্র, পূজ্যপাদ আচার্য্য বিবেকানন্দ এখানে কিছুদিন শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মঠটী দর্শন করিয়া চলিয়া আসিতেছি এমন সময় গৈরিক পরিহিত একজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসী ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে আমাদিগকে আহ্বান করিলেন—"Baboo, here come"—নিকটে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"You Bengalee Baboo?" আমরা সম্মতি জ্ঞাপন করিলে তিনি আমাদিগকে বসিতে বলিয়া নিকটস্থ পুঁটুলী খুলিয়া একটী খাতা বাহির করিতে করিতে বলিলেন—"What's the aim of your life, baBoo?" আমি বলিলাম—"To realise the highest truth." তিনি আমার কথা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"What meaning the highest truth?" আমি বলিলাম—"ব্রহ্ম, the Supreme." তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন ও খাতা খুলিয়া তাহাতে ইংরাজীতে একটী Motto লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। নীরদ বাবু লিখিলেন—"Awake, arise and stop not till the goal is reached." সাধু আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, হিন্দিতে তাহার উচ্চারণ ও অর্থ লিখিয়া রাখিলেন। তাঁহার আচরণে বুঝিলাম তিনি ইংরেজী শিখিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাই ইংরেজী বলিতে তাঁহার এত আগ্রহ। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া গঙ্গার তীর দিয়া চলিতে লাগিলাম, নিবিড় অরণ্য পরিবেষ্টিত পার্ব্বত্য পথ ক্রমশঃ উপরের দিকে চলিয়াছে। এইরূপে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কয়েকখানা ইষ্টক নির্ম্মিত সিঁড়ি বাহিয়া বাহিয়া কিছু নীচে নামিয়া লছমনঝোলায় পঁহুছিলাম। তখনও সন্ধ্যা হইতে অনেক বিলম্ব ছিল, সুতরাং সেখানে অবস্থান না করিয়া লছমনঝোলার লৌহ সেতু পার হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বদ্‌রি-যাত্রিদিগকে এই প্রকার আরও অনেক পুল পার হইতে হয়। দুস্তর পার্ব্বত্য নদীসকলের উপর এই সকল পুল বড়ই দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত হইয়াছে, নদীর দুইদিকের পর্ব্বত গাত্রে সংলগ্ন দুইটী বৃহৎ শিকল ব্যতীত ইহাদের অন্য কোনও অবলম্বন নাই। এই সকল সেতু নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে একপ্রকার দড়ির ঝোলার সাহায্যে এই সমস্ত গিরিপ্রস্রবণ পার হইতে হইত, কাযেই পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ছিল। লছমনঝোলায় লছমনজী (লক্ষ্মণ), গনেশজী ও মহাবীরের মন্দির। পুলের উপরে দাঁড়াইলে গঙ্গার দুই পারে সারি সারি পর্ণকুটীর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করিয়া তপস্যায় কালাতিপাত করেন। চতুর্দ্দিকে নিবিড় অরণ্যানীসমাবৃত সমুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী, মাঝে কলনাদিনী জাহ্নবী, তীরে মনোরম দেবমন্দির ও সর্ব্বত্যাগী সাধুদিগের আবাসভূমি সেই তপোবনকে যেন স্বর্গের শোভা দান করিতেছিল।

লছমনঝোলা ত্যাগ করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদের বামভাগে, রাস্তার ঠিক নিম্নে, গভীর গর্জ্জনে গঙ্গার উন্মত্ত জলধারা ছুটিয়া চলিয়াছে।

দক্ষিণে দিগন্তপ্রসারিত সমুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী, অস্তাচলগামী সূর্য্যের লোহিত আভা শিরে ধারণ করিয়া সগৌরবে দণ্ডায়মান। আরও অনেক যাত্রী সে পথে চলিয়াছে। সকলেরই হৃদয়ে উল্লাস, তাহাদের মুখনিঃসৃত "গঙ্গে হর হর" প্রভৃতি ধ্বনি বনভূমির নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া পর্ব্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। পর্ব্বতশীর্ষ হইতে কত ছোট ছোট ঝরণা কুলু কুলু রবে নামিয়া আসিয়া গঙ্গাসলিলে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে। চতুর্দ্দিকেই পক্ষিগণের কলরব, দূরে ময়ূরের কেকারব শ্রুত হইতেছিল। 'কাণ্ডওয়ালা' দৌলতরামকে পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলাম। পথে একদল বাঙ্গালী যাত্রীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল, তাহাদিগকেও পশ্চাতে রাখিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে, সাত মাইল পথ সানন্দে অতিক্রম করিয়া আমরা ফুলবাড়ী নামক চটীতে পঁহুছিলাম।

পূর্ব্বে চটী সম্বন্ধে আমার একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল, এখানে আসিয়া তাহা সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গেল। রাস্তার দুইধারে সারি সারি জীর্ণ পর্ণকুটীর, তাহার চারিদিকই প্রায় খোলা, এক পার্শ্বে এক এক হাত অন্তর একটী করিয়া চুলা। ঘরের এক কিনারায় চটীওয়ালার দোকান, তাহাতে প্রধানতঃ চাউল, আটা, ডাল ঘি ও নুণ এই কয়টী দ্রব্য পাওয়া যায়, কোনও কোনও চটীতে আলু কুম্‌ড়া প্রভৃতিও মিলে। যিনি দোকান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবেন তিনিই চটীতে থাকিতে পারিবেন, তদ্ব্যতীত চটীর কোনও ভাড়া নাই। আমরা একটী ঘর বাছিয়া তাহার এক পার্শ্বে স্থান লইলাম। ইতিমধ্যে দৌলতরাম আসিয়া পঁহুছিল। রাত্রিতে আলুভাতে ভাত পাক হইল। অনেকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে খালিপেটে পথ চলিলে Hill diarrhoea হইবার সম্ভাবনা, সেইজন্য পরদিন প্রত্যূষের জলযোগের নিমিত্ত কয়েকখানা আটার রুটী তৈয়ার করা হইল। জীবনে কেহ কখনও এরূপ রুটী তৈয়ার করি নাই, তাই দৌলতরামের নিকট সে কৌশল শিখিয়া লইলাম। হাতে ঠুঁকিয়া মোটা মোটা করিয়া রুটী তৈয়ার করা হইল। তাহা যেরূপ হইল তাহা সহজেই অনুমেয়।

রাত্রিতে বিমল জ্যোৎস্নাবিধৌত পর্ব্বতমালার অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে দৌলতের সঙ্গে নানাকথা কহিতে লাগিলাম। দৌলত বড়ই ভাল মানুষ, টিহরির নিকটেই তাহার বাড়ী। গৃহে তাহার স্ত্রী ও তিন চারিটী পুত্র কন্যা আছে। প্রতিবৎসর এই সময়ে সে একবার করিয়া বদরিনারায়ণে ঝোলা লইয়া যায়, তাহাতে তাহার যে ৩০।৩৫ টাকা উপার্জ্জন হয় তদ্দ্বারা শ্রীনগর হইতে কাপড়চোপড় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া লইয়া আইসে। এতদ্ভিন্ন দেশে তাহার জমিজমা আছে, তাহারা শস্যেই তাহার পরিবারপোষণ হয়। কথাপ্রসঙ্গে দৌলতকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে দেশে তাহারা ভাত খায় কি না, সে সম্বন্ধে উত্তর করিল—"কেঁও নেহি খায়েগা বাবুজী, ম্যয় জিম্‌দার * হ্যায়, হাম্‌কো বহুত্ চাউয়ল হোতা হায় চাউয়ল ভি খাতে রুটি ভি খাতে।"

সন্তোষামৃততৃপ্ত সরল পর্ব্বতবাসীর কথায় আমরা মুগ্ধ হইলাম। কতকষ্টে দেড়মণ বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া, কত পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া, শত শত মাইল চলিয়া, তবে সে ৩০৲ কি ৩৫৲ টাকা পাইবে, কিন্তু তবু একদিনের তরেও তাহার মুখে একটী দুঃখের কথা শুনি নাই। কঠোর পর্ব্বতের ক্রোড়ে পালিত, সহনশীলতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি—ইহারাই বাস্তবিক সুখী, আর আমরা বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়া কেবলই হাহাকার করি, কিন্তু জীর্ণ কম্বল পরিধান করিয়া, নিজের ক্ষেতের শস্যে জীবন ধারণ করিয়া ইহারা হাসিমুখে দিন কাটাইয়া যায়।

একটু একটু শীত করিতেছিল কাজেই কাপড় গায়ে দিয়া শুইতে হইল। ভোর হইতে না হইতেই দৌলত্ ডাকিতে লাগিল "বাবুজী খাড়া হও"। উঠিয়া বিছানা বাঁধিতে বাঁধিতে গাহিতে লাগিলাম "চল মোসাফের·

---

* জমিদার—পশ্চিম অঞ্চলে সাধারণতঃ কৃষিজীবিদিগকে জেমিদার বলা হয়।

বাঁধ গাঁঠেরিয়া, বহুদুর যানা হবেগা হো"। দেশে থাকিতে অনেকদিন সে গানটী গাহিয়াছি কিন্তু তাহা সেদিনকার মত হৃদয়ের তন্ত্রীতে তেমন করিয়া কখনও ঝঙ্কার উৎপন্ন করিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না।

দৌলতকে রওনা করিয়া দিয়া আমরাও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে চলিতে লাগিলাম। উষার আলোকে নির্জ্জীব প্রকৃতি যেন সজীব হইয়া উঠিল। গাছে গাছে ঘুঘু, দোয়েল, বন্য কুক্কুট ও কত অজ্ঞাতকুলশীল পক্ষিকুলের কলরবে পার্ব্বত্যভূমি মুখরিত। প্রভাতের শীতল বাতাস বৃক্ষপত্রগুলিকে ঈষদান্দোলিত করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। অপূর্ব্ব উল্লাসে আমাদের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, আনন্দে গাহিতে গাহিতে চলিলাম :—

"হর হর হর, বম্ বম্ বম্, বামে শোভে গৌরী"। পথের সমস্ত যাত্রী আমাদিগের পানে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতেছিল,—তিনজন সমবয়স্ক বাঙ্গালী যুবক,—প্রায় একই রকম পোষাক পরিহিত, হস্তে একই প্রকারের লাঠি,—তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছি,—কাজেই আমরা একটা দেখিবার জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া একজন পর্ব্বতবাসী অপরকে বলিল—"দেখো বাঙ্গালী বাবা ক্যায়সে দম্ দম্ করকে যাতা"। অন্য একজন নিকটে আসিয়া আমাদিগকে বলিল—"বাঙ্গালী বাবা, আপ্‌কো দেখকে হামারা দেশকা আদমিকা বড়া আনন্দ হোতা হ্যায়। বাঙ্গালী বাবা রামজীকা মূর্ত্তি।" অবশ্যই আমরা কি জন্য যে "রামজীকা মূর্ত্তি" হইয়া দাঁড়াইলাম সে কথা সে পর্ব্বতবাসীই জানে, কিন্তু তাহাদের নিকট আমরা সে খুব বড় "শেঠ্‌জী" বনিয়া গিয়াছিলাম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু 'শেঠজীর' যাহা কর্ত্তব্য, যথা পাণ্ডাদিগকে প্রচুর অর্থদান ও সাধুদিগকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করা প্রভৃতি, তাহার কোনটীই যে যথারীতি সম্পন্ন করিয়াছিলাম তাহা নহে। যাহা হউক কতলোকে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াও যে সম্মান লাভ করিতে উৎসুক আমরা বিনা অর্থব্যয়ে তাহা লাভ করিয়াও যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম তাহা নহে, কারণ 'শেঠ্‌জী' বলিয়া পরিচিত হইলেই অর্থী সাধুগণের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিতে হয়, কেহবা সাধুভোজনের লম্বা ফর্দ্দ লইয়া হাজির—"শেঠজী, বার মূর্ত্তি হ্যায়, পাঁওর পাওর আটা দেলা দিজিয়ে, আপ্‌কো যাত্রা সুফল হো যায়গা"।

এইরূপ কত প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আমরা চলিতেছিলাম। পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ে অবস্থিত বিহঙ্গনীড়ের ন্যায় পাহাড়ীদিগের ঘরগুলি বড়ই মনোরম দেখায়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে তাহারা চাষ করে। উচ্চ পর্ব্বত হইতে নালা কাটিয়া ঝরণার জল ক্ষেত্রের কিনারা দিয়া লইয়া আসে, তাহাতেই ক্ষেত্রে ভাল শস্য হয়। গমই ইহাদের প্রধান শস্য, কোন কোন স্থানে রেঁায়া ধানও হয়, তাহারই সুঘ্রাণ চাউল এদেশে পাওয়া যায়।

লছমনঝোলা অতিক্রম করিয়াই আমরা দিগন্তপ্রসারিত পর্ব্বতশ্রেণীর ক্রোড়ে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। চতুর্দ্দিকেই গগনচুম্বি পর্ব্বতমালা যেন আমাদের পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান, দূরে অতিদূরে পর্ব্বতের পর কেবলই পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। কখনও বিজন অরণ্যের মধ্য দিয়া, কখনও বা পর্ব্বতের গাত্র কাটিয়া, অপূর্ব্ব রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া কত বনজঙ্গল, নদী নির্ঝরিণী, পর্ব্বত উপত্যকার ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ফুলবাড়ী হইতে রাস্তা গঙ্গার তীর ছাড়িয়া হিংজল নামক একটী পার্ব্বত্য নদীর তীর দিয়া চলিয়াছে। এখান হইতে প্রায় পাঁচ মাইল অগ্রসর হইলে সুদীর্ঘ বিজনির 'চড়াই' * আরম্ভ হয়। যাত্রিদিগের সুবিধার জন্য রাস্তার পার্শ্বে স্থানে স্থানে ঝরণা হইতে pipe লাগাইয়া জলের কলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রায় দুই তিন মাইল অন্তরই এক একটী চটী পাওয়া যায়। পাহাড়ীগণই চটিতে বেচাকিনা করিয়া থাকে। তাহাদের প্রকৃতি বড়ই সরল ও উদার, ছল চাতুরী তাহারা জানে না। তাহাদের চেহারা সুন্দর, গঠন দৃঢ়,

* যেখানে রাস্তা পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া গিয়াছে তাহাকেই 'চড়াই' এবং যেখানে নীচের দিকে নামিতে হয় তাহাকে 'উৎরাই' বলে।

বর্ণ গৌর, নাসিকা উন্নত, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু ভাসা, মস্তকে দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ। সামান্য একখানা কম্বলের লেংটী ও গায়ে একটী কম্বলের জামা তাহাদের পরিচ্ছদ। সকলেই টুপী ব্যবহার করে। ইহাদের ভিতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি আছে, প্রায় সকলেই চাষবাস করে। স্ত্রীলোকদের নাসিকা চাপা ও চোখ ছোট। তাহারা কটিতে কম্বলের ঘাঘরা, গায়ে জামা ও মাথায় ছোট ঘোম্‌টা পরিধান করিয়া থাকে। অবরোধ প্রথা তাহাদের নাই, তাহারা মুক্ত বিহঙ্গিনীর ন্যায় স্বচ্ছন্দে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, ক্ষেত্রে কাজ করে, ও গো মহিষাদি চারণ করে। বাস্তবিক ইহাদিগকে দেখিলে মনে হয় ইহারাই যেন পুরাণোক্ত গন্ধর্ব্বগণের বংশধর!

ইহাদের গম পিষিবার কৌশল বড়ই সুন্দর। ঝরণার উপরে ইহারা ছোট ছোট এক প্রকার ঘর নির্ম্মাণ করে, সেই ঘরের নীচ দিয়া ঝরণা বহিয়া যায়। ঝরণার জলের সঙ্গে ঘর হইতে একটী কাঠের চাকা ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, জলের বেগে সেই চাকা ঘুরিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সেই চাকার সহিত সংলগ্ন ঘরের ভিতরের বড় বড় পাথরের যাঁতাগুলিও ঘুরিতে থাকে, তাহাতেই গম পিষা হয়। এইরূপে মিস্ত্রীকাজ প্রভৃতি অন্যান্য অনেক কাজ ইহারা ঝরণার জলের বেগের সাহায্যে করিয়া থাকে।

বিজ্‌নির 'চড়াই' করিতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। ছয় মাইল পথ ক্রমাগত পর্ব্বতারোহণ করিয়া একটী উন্নত পর্ব্বতশ্রেণীর শিখরে আরোহণ করিতে হয়। তারপর 'উতরাই' আরম্ভ হয়। চড়াই করিতে কি পরিশ্রম! কয়েকপদ চলিলেই পদদ্বয় আড়ষ্ট হইয়া আইসে, দম্ যেন বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। এই দারুণ শীতের রাজ্যেও সর্ব্বাঙ্গে স্বেদোদ্গম হইতে থাকে। পাহাড়ীরা বলে "কঠিন ভূমি, কোমল পদগামী"। অর্থাৎ এই সকল কঠিন ভূমিতে ধীরে চলাই যুক্তি-সঙ্গত। অনেক সময় অনভ্যস্ত উদ্যমে দ্রুতপদে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিয়া আমরা অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িয়াছি। শুনা যায় বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ এইরূপ করিয়া অনেক সময়ে 'Heart fail' করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিজ্‌নির পর্ব্বতের সমুন্নত শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া বড়ই আনন্দ হইল। চতুর্দ্দিকেই নিবিড় মেঘমালার ন্যায় প্রতীয়মান "ধুম্র পাহাড়ের" শ্রেণী। যতদূর দৃষ্টি যায় শ্রাবণের জলদাবৃত আকাশে কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার ন্যায় স্তরে স্তরে নানাকৃতির শৃঙ্গশ্রেণী ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। পর্ব্বতশৃঙ্গে ঘুঁই-ফুলের মত শাদা এক প্রকার ফুল ফুটিয়া এই বিজন পথের ক্লান্ত যাত্রিদিগকে অকাতরে সৌরভ বিলাইতেছিল। প্রায় দুই মাইল নিম্নে ক্ষুদ্র গিরিনদী হিংজল, কেঁউটে সাপটীর মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, কখনও বা পর্ব্বতের আড়াল হইতে, কখনও বা দৃষ্টির সমক্ষে থাকিয়া, তার সেই অবিরাম কলতান আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছিল।

অনেক স্থানে সঙ্কীর্ণ রাস্তা এমনভাবে উঠিয়াছে যে কোনও প্রকারে পদস্খলিত হইলে একেবারে দুই মাইল গড়াইয়া পড়িতে হইবে। বিজ্‌নি হইতে নামিয়া রাস্তা পুনরায় গঙ্গাতীর দিয়া চলিয়াছে। আমরা মধ্যাহ্নে ছোট বিজ্‌নি নামক চটীতে আহারাদি করিয়া বৈকালে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশে কালমেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল, থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুত চমকিতেছিল। 'পথপ্রদর্শিকা' খুলিয়া দেখিলাম দুই মাইলের মধ্যে চটী নাই, কাজেই দ্রুতপদে উৎসাহ করিয়া কোনও প্রকারে বন্দর চটীতে পঁহুছিলাম। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া পার্ব্বত্যপথ আরও দুর্গম করিয়া তুলিল। দৌলতরাম অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে, সে বেচারার জন্য বড়ই চিন্তিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরেই চটীর অন্য ঘরে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, সে চটীতে আমাদিগের সন্ধানে একজনকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল—"টোপ ওয়ালে তিন বাঙ্গালী বাবুকো মালুম্ হায়?"—আমরা মাঝে মাঝে মাথায় Gurkha hat পরিধান করিতাম সেই জন্যই বোধ হয় সে আমাদিগের এইরূপ নামকরণ করিয়াছিল। তাহাকে

ডাকিয়া আনিলাম, সে সম্পূর্ণ ভিজিয়া গিয়াছিল, বেচারা বোঝা নামাইয়া শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল। কিন্তু এত কষ্ট পাইয়াও সে আমাদের জিনিষপত্র সম্পূর্ণ শুষ্ক রাখিয়াছে। আমরা সঙ্গে একটুকরা oil cloth নিয়াছিলাম, তদ্বারা সে বোঝা উত্তমরূপে জড়াইয়া বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাহাকে একখানা কম্বল বাহির করিয়া দিয়া চুলার ধারে বসাইলাম। আমরা পূর্ব্বেই চটীওয়ালার নিকট হইতে জিনিস পত্র কিনিয়া ও বাসন ধার লইয়া খিচুরী চড়াইয়া দিয়াছিলাম। কোন প্রকার চাল ডাল সিদ্ধ করিয়া খাইয়া কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

তখনও ভাল করিয়া ফর্সা হয় নাই, তখনও সোণার উষা রাঙ্গাপায়ে মধুর হাসি হাসিয়া ধরিত্রীর গায়ে সুধার ধারা ঢালিয়া দেয় নাই। নিদ্রা ও জাগরণের সেই সুপবিত্র সন্ধিক্ষণে আমরা পথে বাহির হইলাম। ঘুমন্ত প্রকৃতিরাণী বন্যবিহগের সুমধুর কাকলীতে যেন ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছিলেন। নীরদ বাবু তান ধরিলেন—

"অয়ি সুখময়ি উষে, কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক-সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল?"

পরে সকলে সমস্বরে গাহিতে গাহিতে চলিলাম—

"তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা, ব-ব-বম্‌ বাজে গাল,
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল-মাল।"

বড়ই আনন্দে সাত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নে 'সেমল' চটীতে আহারাদি করিলাম। কেদার বদ্রী রওনা হইবার পূর্ব্বে পূজনীয় শুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট আমরা একটী হাস্যোদ্দীপক ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম। গাড়োয়ালীদের বিষয় দুই এক কথা বলিতে বলিতে তিনি একটি গল্প বলেন, এই চটীতে তদনুরূপ একটী ঘটনা ঘটে; এজন্য স্বামী শুদ্ধানন্দ কথিত গল্পটী এখানে উদ্ধৃত করিলাম। গল্পটী এই:—তাঁহারা কয়েকজন বাঙ্গালী সাধু যখন নিঃসম্বলে হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন একদিন ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহারা ভিক্ষার্থ অনেকের দ্বারে দ্বারে ফিরিলেন, কিন্তু নিরীহ বাঙ্গালী সাধু বলিয়া কেহই তাঁহাদিগকে গ্রাহ্য করিল না, অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া যখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেছেন তখন দীর্ঘকায়, বলিষ্টদেহ, বিভূতিভূষিত, একজন হিন্দুস্থানী সাধুর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তখন বাঙ্গালী সাধুদিগকে কাতর দেখিয়া তাঁহার বুঝি দয়া হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহাদের কিছুই খাওয়া হয় নাই, অগত্যা তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার্থ বাহির হইলেন। প্রথমেই সকলে মিলিয়া গ্রামের 'মোড়লের' বাড়ী উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই মোড়লের বাড়ী হইতেই তাঁহারা বিতাড়িত হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থানীসাধুর নির্দ্দেশানুসারে সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া মোড়লকে ডাকিতে লাগিলেন—"এ পাধান্ পাধান্ হো!" 'পাধান্' বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। হিন্দুস্থানী সাধু দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"প্রাঁচ পান্‌সের আটা আউর সেরভর ঘিউ লাও"। 'পাধান' অমনি নতশিরে গৃহে প্রবেশ করিল, বাঙ্গালী সাধুগণ ত অবাক। অন্য সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অত আটা ও ঘি দ্বারা কি হইবে। সাধু তাঁহাদিগকে চুপ করিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে একটী থালায় সেরখানেক আটা ও ছটাক্ আন্দাজ ঘি লইয়া 'পাধান' উপস্থিত হইল, সাধুগণ তাহা গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। হিন্দুস্থানী সাধু বাঙ্গালী সাধুদিগকে বলিয়াছিলেন—"গাড়োয়ালছে দাতা নেহি, বেগর লাঠিছে দেতা নেহি"। অর্থাৎ গাড়োয়ালবাসীর ন্যায় দাতা নাই, কিন্তু বিনা লাঠিতে তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা শক্ত।

আমরা চটীতে বিশ্রাম করিতেছি এমন সময়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দুইজন নাগা সাধু তথায় প্রবেশ করিল। 'লোটা কম্বল' মাটিতে রাখিয়া তাহাদের একজন চটীওয়ালাকে রুক্ষস্বরে সম্বোধন করিয়া কহিল—"হামলোক ধুপমে একদম্ দশ মিল্ (মাইল) চেলা আয়া, বহুত পিয়াস হুয়া, জাতি পানি পিলাও।" চটীওয়ালা শশব্যস্ত হইয়া তাহার ঘটীটী খুঁজিয়া বাহির করিয়া, বেশ করিয়া মাজিয়া নিকটস্থ ঝরণা হইতে জল আনিয়া সাধুদ্বয়ের নিকটে স্থাপন করিল। কিন্তু সন্তুষ্ট হওয়াত দূরের কথা, চটীওয়ালা যে সাধুর নিকট শুধু জল উপস্থিত করিতে

সাহসী হইয়াছে সে জন্ত সাধু তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল। পরক্ষণেই সোজা হুকুম—"আভি সরবৎ লাও"। চটীওয়ালা বেচারা নেহাৎ জড়সড় হইয়া উত্তর করিল—"মাহারাজ, হামকা পাশ্ তো শক্কর (শর্করা) নেহি হ্যায়"। সাধু সে কথা কাণেও তুলিল না, রুক্ষস্বরে হুকুম হইল—"শক্কর নেহি হ্যায় তো হাম্ কেয়া করে? দোস্‌রা দোকানসে মাঙ্গা লেও, সাধু পিয়াস্‌ছে মর যায়গা?" চিনি আনিবার জন্ত চটীওয়ালা সাধুর নিকট পয়সা চাহিলে সাধু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিয়া উঠিল—"কেয়ারে বেইমান, সাধুকা পাশ পায়সা মাঙ্গতে, সাধুকো নেহি সরবৎ পিলায়েগা তো হিন্দু ধরম্ ছোড় দেও, মুছলমান্ হোকে উত্তরাখণ্ডছে চেলা যাও"। অগত্যা সাধু ঝুলি হইতে দুইটী পয়সা চটীওয়ালার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিল—"হামকো পাশ দো পায়সা হ্যায়, তোম ইসমে আউর চার পয়সা লাগা দেও, আভি ছে পায়সাকা শক্কর লেকে, দোনো আদ্‌মিকো সরবৎ পিলাও, যাস্তি বাত হাম্ নেহি কর শেক্তে।" চটীওয়ালা নিরুপায়, অগত্যা তাহাই করিল। সাধুদ্বয় সরবৎ পানে ঠাণ্ডা হইয়া দুই এক কল্কি চরস ধ্বংস করিয়া প্রস্থান করিল। আমরাত দেখিয়া শুনিয়া অবাক, তখন আমরা স্বামী শুদ্ধানন্দজীর সেই গল্পের কথা বলিয়া হাসির ধুম লাগাইয়া দিলাম।

সেমল চটিতে মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া বৈকালে সাত মাইল চলিয়া ব্যাসঘাট পঁহুছিলাম। ব্যাসঘাট লছমনঝোলা হইতে ৩২ মাইল দূরে। এখানে নয়ারনদী নামক একটী শীর্ণ প্রস্রবণের সঙ্গে গঙ্গা মিলিত হইয়াছে। ব্যাসঘাটের পূর্ব্বেই একটী ক্ষুদ্র 'চড়াই' সেটী 'উৎরাই' করিয়া নয়ারনদীর উপর সুন্দর ঝুলন্ত পুল পার হইলেই ব্যাসঘাট চটী। চটীটী বেশ বড়। এখানে আলু মশলা প্রভৃতি পাওয়া যায়। একটী ক্ষুদ্র ডাকঘরও সেখানে আছে। এখানে আসিয়া আর একদল বাঙ্গালী যাত্রির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল; আহারাদি করিয়া বসিয়া বসিয়া গল্পগুজব চলিতে লাগিল। সেদিন আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল, চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমার বিমল জ্যোৎস্নাসিক্ত হইয়া সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ যেন অনুপম হাস্যচ্ছটায় চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছিল, গঙ্গার ফেণিল বক্ষে চাঁদের রজত রশ্মিমালা যেন নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছিল। সেই সুন্দর রজনীতে একদল পাহাড়ী চটীর প্রাঙ্গনে মিলিত হইয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া অদ্ভুত নৃত্য করিতে করিতে নাকি সুরে এক প্রকার গান গাহিতে লাগিল। তাহাদের সেই অপূর্ব্ব নৃত্যগীত আমাদিগের নিকট বড়ই আনন্দজনক বোধ হইল। আমরা তাহাদের সেই নাকি সুরের সঙ্গীত অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া বড়ই আমোদানুভব করিলাম। দেশে ফিরিয়া কলেজের ছেলেদের নিকট এই সঙ্গীতের তালিম্ দিতে পারিলে কেমন মজা হইবে, এই ভাবিয়া বালক যজ্ঞেশ্বরের আনন্দ আর ধরে না।

কথায় কথায় ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় দুই ঘণ্টা থাকিতেই হিন্দুস্থানী সহযাত্রিদিগের কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিল। তাহারা "বদ্রি বদরি বিশাল লাল কি জয়" প্রভৃতি জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া একে একে পথে বাহির হইতেছিল। আমরা তখনও কম্বলমুড়ি দিয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম কিন্তু পরক্ষণেই দৌলতের চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল—"বাবুজী খাড়া হও"। কাজেই এবার উঠিতেই হইল। আবার রোজকার পথচলা আরম্ভ হইল। গঙ্গা বামে রাখিয়া সুন্দর রাস্তায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আজ আর মোটেই চড়াই উৎরাই নাই, কাজেই আজ হাঁটায় খুব আনন্দ; সমতল পথ পাইয়া আজ খুব জোরে march করিয়া চলিতেছিলাম, কোন যাত্রীই হাঁটায় আমাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যাত্রীদিগের মধ্যে বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকই অধিক, আমাদের মত অল্প বয়স্ক বড় কেহ একটা ছিল না। এমনকি অনেক অন্ধ সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে, কত খঞ্জ লাঠিভর করিয়া কোন প্রকারে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের সে অপূর্ব্ব তীর্থানুরাগ দর্শন করিলে প্রাণ জুড়ায়। একটী হিন্দুস্থানী বৃদ্ধার পড়িয়া গিয়া আঘাত লাগাতে জ্বর হইয়াছে, তবু সে চলিতেছিল, কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই সে শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িতেছিল,

তবু সে চলিবে। আমরা তাহাকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু সে কথা কে শুনে। বদরি দর্শনের উদ্দেশ্য লইয়া বরং মরিয়া যাইবে তবু সে ফিরিবে না। ক্ষোভ ও দুঃখে ধর্ম্মপ্রাণা বৃদ্ধার চক্ষে অবিরল ধারে অশ্রু বহিতেছিল, আমরা কি করিব ভাবিয়া না পাইয়া মূকের ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিলাম, বুঝি ভাবিতেছিলাম—এইটুকুই বাস্তবিক ভারতের বিশেষত্ব; অন্ধ বিশ্বাসই বল, আর যাই বল, যে বিশ্বাস এমন করিয়া নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করিতে শিক্ষা দেয়, তাহা কি একটা অর্থহীন কুসংস্কার মাত্র, তাহার কি একটা মূল্য নাই? এই অতুলনীয় ধর্ম্মানুরাগ যদি ভারতের অবলম্বন না হইত, যদি এই জীর্ণ ভেলা খানি ভারত আজও আঁকরাইয়া ধরিয়া না থাকিত তবে দুস্তর কালসমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষোভিত ঘূর্ণমাণ আবর্ত্তে পড়িয়া সে কোন্‌দিন যে দিশেহারা হইয়া ডুবিয়া মরিত, তাহার নির্ণয় কে করিবে?

বৃদ্ধাকে অনুরোধ করা বৃথা, কিন্তু এই অবস্থায় চলিলে সে যে মানবদেহে বদরিবিশালের চরণতলে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিবে, সে বিষয় ভাবিয়া বড়ই কষ্ট হইল। কিন্তু উপায় নাই কাজেই পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম; প্রায় আট মাইল পথ অতিক্রম করিলে অনতিদূরে পাহাড়ের গায়ে 'দেব প্রয়াগ' দেখা যাইতে লাগিল। দূর হইতে ছোট পাথরের ঘরগুলিকে যেন পাহাড়ের গায়ে আঁকা বলিয়া মনে হইতেছিল। দেব প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী হইলে পাণ্ডার দল আমাদিগকে বিরক্ত করিতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছিলাম পাণ্ডার কবলগ্রস্ত হইব না. কাজেই সকলকেই আমরা সোজা জবাব দিতেছিলাম—"আমাদের পাণ্ডা স্বয়ং বদরিনারায়ণ"। পাণ্ডাগণ বুঝিল পাত্র সোজা নয়, কাজেই আমাদের খৃষ্টানি মত, আমাদের বদরি যাত্রা বৃথা, প্রভৃতি শ্লেষোক্তি করিতে করিতে তাহারা প্রস্থান করিল। কিন্তু একজন নেহাৎই নাছোড়বান্দা, সে কিছুতেই আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে না, অগত্যা পুলিশের ভয় দেখাইয়া তাহাকে নিরস্ত করা হইল।

(ক্রমশঃ)

'ভবঘুরে'।

## শীতারম্ভে

হিম-সিক্ত বায়ু পরশে
স্বর্গীয়-সুখে সরসে
হৃদয় উঠিল নাচিয়া সহসা কেনবা আসিয়া
দূর করি দিয়ে আলসে।

হৃদয়ে গভীর ভাবনা,
তত্ত্ব জানিতে বাসনা,
কাহার আদেশে মোহন আবেশে
শিহরিল আজ তনুখানা।

কোন্ সুদূর কোমল তানে
প্রেমগীতি পশে কাণে ?
প্রকৃতি সুন্দর কুসুম তুল্য
মুখখানি, কার ধেয়ানে ?

দাও ওগো মোরে বলিয়া,
যেওনা চলিয়ে চলিয়া,—
কার সত্তা জাগে হিম-কণা ভাগে
কে আছে বিশ্ব জুড়িয়া ?

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ

## "কবে ?"

হৃদয়ের যত সাধ একে একে গেছে ঝরি,
শূন্য এ হৃদয় নিয়ে একধারে আছি পড়ি ;
মরমে নিভৃতে বাজে বিষাদের ক্ষীণতান,
ক্ষুধিত অভাব শুধু গ্রাসিবারে চায় প্রাণ !
মরণের সেতু দিয়ে সর্ব্বদুঃখ পদে ঠেলি
সাথী যারা ছিল ভবে একে একে গেছে চলি।
হৃদয় আঁধার নাশি, মুছাইয়া অশ্রুধার,
অন্ধকার হ'তে মোরে কবে করে দিবে পার ?
প্রীতি-ফুল্ল হৃদি নিয়ে, পূতস্নিগ্ধ শুভ্রবাসে
কবেবা দাঁড়াব আসি তোমারি চরণ পাশে ?
তোমার চরণে প্রভু ঢালিয়া তাপিত প্রাণ
গাহিতে পারিব কবে তোমারি মহিমাগান ?
মিলনের শুভলগন কবে সে আসিবে হায় !
এ শূন্য হৃদয় নিয়ে বসে আছি সে আশায় !

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

# বৈষ্ণব-পদাবলির রস-বৈচিত্র্য।

## ( বাৎসল্য-রস )

পদাবলি-সাহিত্যে 'মধুর-রস' বা নায়ক নায়িকার প্রেম-বিষয়ক পদের নিতান্ত প্রাচুর্য্য থাকায় এবং বৈষ্ণবকবিদিগের কবিত্বের উদাহরণ স্বরূপে প্রায় সর্ব্বত্রই সেই মধুর-রসের পদাবলি উদ্ধৃত হওয়ায়, বৈষ্ণবকবিগণ যে অন্যান্য রসের চিত্রাঙ্কনে কিরূপ নিপুণ ছিলেন, তাহা অধিকাংশ পাঠকেরই বোধহয় সুবিদিত নহে। বস্তুতঃ এজন্য পাঠকবর্গের উপর দোষারোপ না করিয়া বৈষ্ণবকবিগণের পদাবলির প্রাচীন ও আধুনিক সংগ্রাহক ও প্রকাশকগণের উপরই দোষারোপ করিতে হয়। বৈষ্ণবপদাবলির প্রাচীন সংগ্রাহক ও পদকর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার সঙ্কলিত 'পদামৃত-সমুদ্র' নামক প্রসিদ্ধ পদসংগ্রহে 'মধুর-রস' ব্যতীত 'বাৎসল্য', 'সখ্য' প্রভৃতি রসের পদাবলি মোটেই সন্নিবেশিত করেন নাই। বৈষ্ণব দাসের সঙ্কলিত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থকে বৈষ্ণবপদাবলির বিশ্বকোষ ( Encyclopedia ) বলা যাইতে পারে। এইরূপ একটি বিরাট পদ-সংগ্রহে সকল প্রকার রসের সমাবেশ না থাকিলে সংগ্রহকারের উদ্দেশ্য সফল হয় না বলিয়া যদিও তিনি 'বাৎসল্য', 'সখ্য' প্রভৃতি রসের পদাবলি পদকল্পতরু গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন কিন্তু তিনি ১ম ও ২য় শাখায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ প্রেমলীলা প্রদর্শিত করিয়া, তৃতীয় শাখার এক প্রান্তে পূর্ব্বাপর-সংযোগহীন কয়েকটি ক্ষুদ্র পল্লবের আকারে সেইগুলির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মুখ্য প্রেম-লীলার মধ্যে যে সেগুলির স্থান নাই এবং সেগুলিকে মাত্র অবান্তর লীলা ( Episode ) রূপেই কথঞ্চিৎ গ্রাহ্য করা যাইতে পারে, ইহাই বুঝাইয়াছেন। আমাদিগের বোধহয় কেবল সংগ্রহকর্ত্তারাই এজন্য দায়ী নহেন; যে কারণেই হউক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সকল প্রাচীন ও নব্য পদকর্ত্তা 'মধুর-রস' সম্বন্ধে যত পদ রচনা করিয়াছেন বোধ হয় অন্য কোন রসের পদ, তাহার শতাংশের এক অংশও রচনা করেন নাই; করিয়া থাকিলেও অধিকাংশ পদাবলি-সংগ্রহে উহা স্থান প্রাপ্ত না হওয়ায়ই বোধ হয় অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকবিদিগের পদাবলি-সংগ্রহে এক মধুর-রসেরই নানা বৈচিত্র্য ব্যতীত আমরা অন্যান্য রসের চিত্র অতি অল্পই দেখিতে পাই। এমন কি 'বাৎসল্য', 'সখ্য' প্রভৃতি যে রসগুলি মূলতঃ প্রেম হইতে ভিন্ন নহে এবং কেবল পাত্রভেদেই স্বতন্ত্র নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, উক্ত কবিগণ সেই সকল রসের প্রতিও যেন বিলক্ষণ অনাদরই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ পদ-কর্ত্তাদিগের অনাদর বা পদ-সংগ্রহকারদিগের ত্রুটী—ইহার যে কারণেই হউক পদাবলি-সাহিত্যে যে 'বাৎসল্য', 'সখ্য' প্রভৃতি রসের অপেক্ষাকৃত অল্পতা দৃষ্ট হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কদাচিৎ কোন ক্ষুদ্র বীজ হইতেও যেমন বিশাল বনস্পতি উদ্ভূত হইয়া স্নিগ্ধ-নিবিড় শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত বনভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের 'বাৎসল্য', 'সখ্য' প্রভৃতি রসের বীজ-স্বরূপ সেই পদাবলি বঙ্গ-সাহিত্যের সরস ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া কবির কাব্যে, কথকের কথকতায়, পল্লীর গ্রাম্য গীতে, ভিক্ষুকের গোষ্ঠগানে যেরূপ পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বাঙ্গালী নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধার অতুলনীয় প্রেম অপেক্ষাও যে মা যশোদার বাৎসল্য-রসের ও শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি ব্রজবালক-দিগের সখ্য-রসের আস্বাদনেই অধিক বিভোর হইয়া রহিয়াছে, ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রামায়ণ ও মহাভারতে মাতৃস্নেহের ও সখ্য-স্নেহের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের অভাব নাই;—কিন্তু ভাগবতের বিশেষতঃ বাঙ্গালার বৈষ্ণব-পদাবলির বর্ণিত যশোদার মাতৃ-স্নেহ ও ব্রজবালকদিগের সখ্য-স্নেহের সমুজ্জ্বল উচ্ছ্বাসময় চিত্রের নিকট যেন ঐ সকল চিত্রও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে; সুতরাং কেবল পরিমাণ দ্বারা উৎকর্ষের বিচার না করিয়া যদি সমাজ ও সাহিত্যের উপর অসাধারণ ও স্থায়ী প্রভাব দ্বারা উৎকর্ষ স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণব কবির অঙ্কিত এই বাৎসল্য ও

সখ্য-রসের চিত্র যে অতুলনীয়, ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমরা আজ পাঠকবর্গকে বৈষ্ণব কবির অঙ্কিত মূর্ত্তিমতী বাৎসল্যরূপিণী মা যশোদার কয়েকটি মাত্র চিত্র দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব। প্রথমেই একজন অজ্ঞাতনামা পদকর্ত্তার অঙ্কিত ক্রীড়া-চঞ্চল শিশু রাম ও কানাইর মূর্ত্তি দেখুন—

"নাচেরে নাচেরে মোর রাম দামোদর।
যত নাচ তত দিব খির ননি সর॥
আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আর বার।
গলায় গাঁথিয়া দিব মণিময় হার॥
তাতা থৈয়া তাতা থৈয়া বলে নন্দরাণী।
কর-তালি দিয়া নাচে রাম যদুমণি॥"

'আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আর বার' পংক্তিটিতে মা যশোদার অতৃপ্ত শিশুনৃত্য-দর্শন-বাসনা কিরূপ সুকৌশলে ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহা রসজ্ঞ পাঠক প্রণিধান করিবেন। শিশু কৃষ্ণ মা যশোদার অনুপস্থিতিতে লড়ি ঘায়া ননীর ভাণ্ডে ছিদ্র করিয়া ননী খাইয়াছেন—হঠাৎ মায়ের পদশব্দ শুনিতে পাইয়া পীতধড়ার অঞ্চল দিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিয়াছেন কিন্তু মৃত্তিকায় ও শিশুর বুকে ননীর ধারা দেখিয়া মা যশোদার ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু তা বলিয়া কি মাতা পরাণের পরাণ নীলমণিকে তাড়না করিতে পারেন? গোপালকে আদরে ক্রোড়ে লইবার জন্য—

"দুবাহু পসারি আগে ধায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥
গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপনয়নে রাণী চাহে চারিভিত॥
হেদেরে নবনী-চোরা বলি পাছে ধায়।

রাণীর কর হইতে গোপাল গেলা পলাইয়া।
আকুল হইলা রাণী গোপাল না দেখিয়া॥"

গোপাল ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া নবনীত খাইয়াছে, ঘরের মাঝে দধি ও নবনীতের স্রোত বহিয়া যাইতেছে—সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, মাতা অপার শিশুটিকে ক্রোড়ে বান্ধিয়া রাখার জন্য বাহু-পাশ বিস্তার করিয়া পাছে পাছে ধাবিত হইতেছেন কিন্তু অবাধ্য শিশু মাতার এই প্রেমের বন্ধনেও ধরা দিবে না—ইহা কি মাতা সহ্য করিতে পারেন? তিনি বলরামকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আমি কিছু নাহি জানি ভাঙ্গিয়াছে খির ননী
তোমারে সোধাই ইহার কথা।
না দেখি গোকুল চান্দ কেমন করয়ে প্রাণ
বল না গোপাল পাব কোথা॥
আমি কি এমন জানি কোলে লৈয়া যাদুমণি
বাছারে করাইছি স্তনপান।
মোরে বিধি বিড়ম্বিল উথলি গো-রস গেল
তা দেখি ধরিতে নারি প্রাণ॥
ভুলিলাম রোহিণীর বোলে গোপাল নামাঞা কোলে
সে কোপে কোপিত যাদুমণি।
কোপিত নয়ান-কোণে চাঞা ছিল আমা পানে
আমি কি এমন হবে জানি॥
তোমরা করিছ খেলা গোপাল আমার কোথা গেলা
দড় করি বোল এক বোল।"

যশোদার বিশ্বাস তিনি যে গোপালকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া রাখিয়া দুগ্ধ নাড়িতে গিয়াছিলেন সেই আ-যোগেই তাঁহার আদরের ধন নীলমণি তাঁহার প্রতি কোপিত হইয়া গৃহে ঐরূপ উৎপাত করিয়াছে এবং কোন মতেই আর তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবে না বলিয়া কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার আলিঙ্গন-পাশ হইতে ছুটিয়া পলাইয়াছে। মাতৃ-স্নেহের ইহা অপেক্ষা সুন্দর ও স্বাভাবিক চিত্র আর কি হইতে পারে?

মা যশোদার এই কাতর-জিজ্ঞাসা হইতে সখ্য-প্রেমের একটি উৎস উদ্ভূত হইল,—উহা যশোদার বাৎসল্য-প্রেমেরই অঙ্গীয় ও পরিপোষক বটে। যশোদার মুখে গোপালের নিরুদ্দেশ-বার্ত্তা শুনিয়া দাদা বলরাম গর্জ্জিয়া উঠিল—

"কি বলিলা নন্দরাণী হারাইয়াছ নীলমণি
কানাই বিনে না রাখিব হিয়া।
ক্ষুধা বন্যা ভাই গেলা সেই হৈতে রৈয়াছে খেলা
আমরা রৈয়াছি মুখ চাঞা॥

হেদে শ্রীদামের মা    শুন গো রোহিণি মা
এ পথে দেখ্যাছ গোপাল মোর।
আর এক বিপরীত    যাইতে না দেখি পথ
কাল হৈল নয়ানের লোর॥"

তৎপরে—

"মায়েরে কর্য্যাছ রোষ    সাঙ্গয়ার কিবা দোষ
কোথা আছ বোল ডাক দিয়া।
যদি থাকে মনে রোষ    ক্ষেম ভাই সব দোষ
যশোদা মায়ের মুখ চায়্যা॥
শুনিয়া শ্রীদামের কথা    মরমে পাইয়া বেথা
ত্বরিতে আইলা নীলমণি।
মরণ শরীরে যেন    পাইল পরাণ দান
শুনিতেই নূপুরের ধ্বনি॥"

কি সুন্দর ও স্বাভাবিক বর্ণনা!

গোপাল আজ সখাদিগের সঙ্গে গো-চারণে যাইবে, তাই সোহাগ করিয়া মা যশোদাকে বলিতেছে—

"ওগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া    মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণে ত পরাহ নূপুর॥"

মাতার প্রাণে কি ইহা সহ্য হইতে পারে? তাই তিনি ব্রজ-বালকদিগের জনে-জনের মুখের পানে চাহিয়া সকাতরে বলিতেছেন—

"গোপাল নাকি যাবে দূর বনে।
তবে আমি না জীব পরাণে॥
দধি মন্থন কালে    সম্মুখে বসিয়া খেলে
আঙ্গিনার বাহির না করি।
আঙ্গিনার বাহির হৈয়া    যদি গোপাল খেলে গিয়া
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
গোপাল যাইবে বনে    কি শুনিলাম শ্রবণে
যাদু মোর নয়ানের তারা।
কোরে থাকিতে কত    চমকি চমকি উঠি
নয়ান নিমিখে হই হারা।"

পুনশ্চ—

"বলরাম, তুমি নাকি আমার প্রাণ
লইয়া বনে যাইছ।
যারে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ॥
বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের ছাওয়াল বনেরে বিদায় দিয়া
দৈবে মরিবে বুঝি মায়।

* * * *

ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে ঘরে যাইতে পথ ভুলে
দুটি হাত মুখে দিয়া কান্দে।
আউলাইয়া কটি-ধড়া দুচরণে লাগে বেড়া
আপনা আপনি পড়ে ফান্দে।"

শেষের কলিটিতে কবি কয়েকটি সুনিপুণ রেখাপাতে যে অপূর্ব্ব শিশু-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—তাহার তুলনাস্থল পদাবলি-সাহিত্যেও অতি বিরল।

যখন কোন মতেই গোপালকে বনে না পাঠাইয়া পারিতেছেন না, তখন মা যশোদা গোপালকে সকাতরে বলরামের হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিতেছেন—

"হের আয়রে বলরাম হাত দে মোর মাথে।
ধড় রাখিয়া প্রাণ দিয়ে তোর হাতে॥
আর এক কথা কহি শুন হলধর।
যশোদার বালক বলি না ভাবিহ পর॥
যাচিয়া নবনী দিহ নিকটে রাখিবে।
বেলি অবসান হৈলে সকালে আসিবে॥"

কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

"আমার শপতি লাগে    না ধাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু    পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে    আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম তার পাছে।
তুমি তার মাঝে রইহ    সঙ্গ ছাড়া না হইহ
মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥
ক্ষুধা হৈলে চাহি খাইহ    পথ পানে চাহি যাইহ
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।

কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইব কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥"

ইত্যাদি,

মাতার এই উচ্ছ্বাসময় বাৎসল্য প্রিয় শিশুটির হৃদয়ে কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা দেখিতে স্বভাবতই কৌতুহল জন্মে। পদকর্ত্তা আমাদিগের সেই কৌতুহল অপূর্ণ রাখেন নাই। বালক কৃষ্ণ বেলা অবসানপ্রায় দেখিয়া সখাগণকে বলিতেছেন—

"পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই না ম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মাতা পথ পানে চাইয়া॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে;
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥"

এখন মাতা যশোদা গোষ্ঠ হইতে গৃহাগত রামকানুকে ক্রোড়ে বসাইয়া বলিতেছেন—

"কোন বনে গিয়াছিলা ওরে রাম কানু।
আজি কেন চান্দ মুখের শুনি নাই বেণু॥
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুখাঞাছে হিয়া॥
মলিন হইয়াছে মুখ রবির কিরণে।
না জানি ফিরিলা কোন গহন কাননে॥"

জননীর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলরাম বলিতেছেন—

"ওগো মা, তোমার গোপাল কিবা জানয়ে মোহিনী
আমরা সঙ্গের ভাই তবুত না মন পাই
তোমারে ভুলাবে কত খানি॥
তৃণ খাইতে ধেনুগণ যায় যদি দূর বন
কেহ ত না যায় ফিরাইতে।
তোমার দুলাল কানু পূরয়ে মোহন বেণু
ফিরে ধেনু মুরলীর গীতে॥
আমরা ফিরাইতে ধেনু তাহা নাহি দেয় কানু
সদা ফিরে সুবলের পাছে।
সুবলে করিয়া কোলে প্রেমে গদ গদ বোলে
না জানি মরমে কিবা আছে।
কিবা লীলা করে এহ বুঝিতে না পারে কেহ
অপরূপ চরিত্র বিহরে।
বলরাম দাস ভণে বলাই দাদা নাহি জানে
আনে কিবা বুঝিবে অন্তরে॥"

এইরূপ বাৎসল্য-রসের অনেক সুন্দর সুন্দর পদ পদকল্পতরু গ্রন্থের ৩য় শাখার বিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ পল্লবে উদ্ধৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় আমরা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস বা জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের রচিত বাৎসল্য-রসের কোন পদ প্রাপ্ত হই নাই। বাৎসল্য-রসের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট পদ ঘনরাম, বংশীবদন ও বলরাম দাসের রচিত। বলরাম অতি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা; তিনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলার প্রায় সকল বিষয়েই পদ-রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বংশীবদনের পূর্ব্বরাগের পদগুলি অতি চমৎকার। ঘনরামের রচিত অন্য পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে একান্ত বিরল; তথাপি তাঁহার এই বাৎসল্য-রসের পদাবলির জন্য তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়,—ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। পদকর্ত্তা ঘনরাম ও "ধর্ম্মমঙ্গল" মহাকাব্যের প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্ত্তী অভিন্ন কিনা আমরা বলিতে পারি না। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়। পদকর্ত্তা ঘনরাম স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইলেও যিনি সখ্য ও বাৎসল্য-রসের এরূপ উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে অন্য কোন বিষয়ে পদ-রচনা করেন নাই,—এরূপ অনুমান সমীচীন নহে; সুতরাং ঘনরামের রচিত অন্যান্য পদাবলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে কিংবা বহু অনুসন্ধানে এখনও কিয়ৎপরিমাণে আবিষ্কৃত হইতে পারে—এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত বটে। আমরা এ সম্বন্ধে প্রাচীন-সাহিত্যানুরাগী পাঠকবর্গের সানুরাগদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

অধ্যাপক শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য কৃত

# সংস্কৃত নাটক কথা সংগ্রহ গ্রন্থাবলী

১। সেক্‌পীয়র নাট্যের অতুলনীয় সম্পদ লেম যেমন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অধিগম্য করিয়া তুলিয়াছেন গুরুবন্ধু বাবুর অভিনব উদ্যমে সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্যের রুদ্ধ দ্বার আজ তেমনি করিয়া খুলিয়া গেল। সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকারগণের গ্রন্থাবলী ছবি ও ছাপার চরমোৎকর্ষে ভূষিত হইয়া খণ্ডে খণ্ডে গল্পাকারে বাহির হইতেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম-এ, বিদ্যানিধি মহাশয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।৵ আনা। অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহক হইলে ( ১১ খণ্ডের জন্য ) সহ ডাকমাশুল ৪৷৴ টাকা।

বালক, যুবক, বালিকা ও যুবতীগণ অসঙ্কোচে পাঠ করিয়া ভারতীয় কবিগণের অলৌকিক কবিত্বের স্বাদগ্রহণ করিতে পারিবে।

এণ্টিক কাগজ, চমৎকার ছবি ও চমৎকার প্রচ্ছদপট—উপদেশ ও উপহার গ্রন্থ একাধারে এরূপ আর নাই।

২। লুপ্ত রত্নের উদ্ধার। মহাকবি ভাসের ( খৃঃ পূঃ ১৫০ ) সমগ্র সংস্কৃত নাট্য-গ্রন্থাবলীর অনুবাদ। দশ খণ্ড। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।৵ আনা। এণ্টিক কাগজ, চমৎকার ছাপা। শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়,

সিটি লাইব্রেরী, পাটুয়াটুলী, ঢাকা। গুরুবন্ধু গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ও একমাত্র এজেণ্ট।

---

## NOTICE.

1. Matriculation Pass guaranteed tutor. Apply for particulars with half-anna postage stamp to A. T. Mukherjee B. A. Kundala, Birbhum District.

2. Five silver medals to be awarded to students wo will write satisfactory Essays in English on "Victoria the Good"—an English poetical Reader price 4 ans. For particulars apply with half-anna postage stamp to A. T. Mukherjee B. A. Kundala (District Birbhum).

**"Victoria the Good"**

A poetical Reader in English contains poetical pieces full of loyalty and deep devotion to Her late Gracious Majesty Victoria Empress of India. In these days we should like to see our young boys cherish such respect for and devotion to their benign sovereign. The book should be given as a prize book to our juvenile readers :—

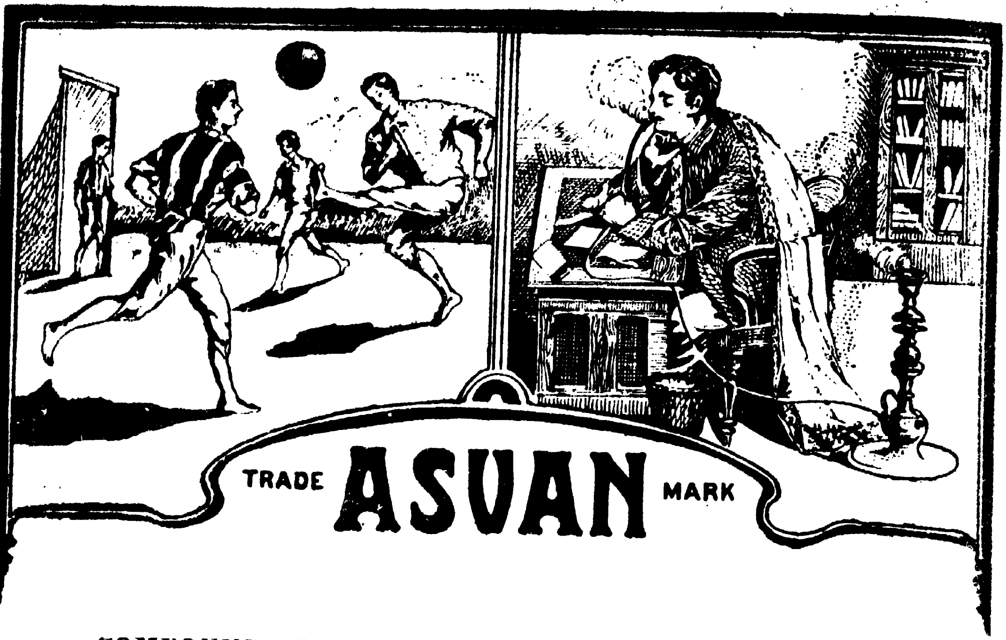


**COMPOUND ELIXIR OF ASWAGANDHA WITH SODIUM GLYCEROPHOSPHATE & FORMATE.**

**Now being prescribed by the leading physicians of Calcutta.**

This preparation [illegible] Aswagandha Rasayan [illegible] contains in addition some of the most powerful [illegible] a valuable [illegible] mental, nervous and muscular debility and [illegible]

CURES MENTAL AND PHYSICAL WEARINESS

**Rs. 1-8 a BOTTLE.**

**Bengal Chemical & Pharmaceutical Works, Ld.**

***91 Upper Circular Road, CALCUTTA.***

ট্রেড **"নির্ব্বেদিন"** মার্ক

## যাবতীয় বেদনা নিবারণে অমোঘ

মাথাধরা, মাথার কট্‌কটানি ও আধ কপালে প্রভৃতি যাবতীয় শিরঃপীড়া, দন্তশূল, স্নায়ুশূল, কর্ণ-শূল প্রভৃতি সকল প্রকার শূল ব্যথা আমাদের "নির্ব্বেদিন" ট্যাবলেটে তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়।

ছাত্র, শিক্ষক, উকিল প্রভৃতি যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জন্য শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকেন তাঁহারা এই ঔষধ সেবনে উপকার পাইবেন। মূল্য ১৬ ট্যাবলেট ।৵০ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

Regtd. No. C. 746.

VOL. 5. No. 10.

JANUARY, 1916.

SAHITYA ... LIBR

# THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.

AND

SATYENDRANATH BHADRA, M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . Rs. 5-0-0
Single Copy . . . . 0-8-0

**EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN**

But impartial verdict comes from the public and the Press

**USE**

# ORIENTAL SOAPS.

FOR

**They are the best for economy and complexion**

## THE ORIENTAL SOAP FACTORY,

*GOABAGAN, CALCUTTA.*

*Tel: "Kowstove," Calcutta.*

---

**By Special Appointment**

## To H. E. Lord Carmichael of Skirling Governor Of Bengal.

# S. A. MAJID & Co.

## Certificated Opticians

*12 Patuatuli, Dacca.*

**OPTO - Eye. METRY—to Measure.**

**A Peculiar Nationalist and Practical Unionist.**

**Prescriber of needful Tonics for the chronical Idleness of India**

**Specialist in attractive Designs, as to touch Human Feelings, to raise any National Subscription successfully.**

Professor for 10 years. in Eye-sight Testing and Spectacles Art.

Our methods of examination and tests of the EYES for the adaptation of lenses for the correction of defects of vision and relief of eyestrain and its accompanying symptoms, are based upon accurate measurements of the refraction and the associated functions of the eyes. Glasses fitted under this system are invariably found satisfactory and curative. The latest and most approved apparatus for accurate sight testing are used in our dark room. Examination by appointment preferred.

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca,

and

Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca

# Edwards Tonic

**The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.**

*Sole Agents* :—**B. K. PAUL & CO.,** 7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.

B. K. PAUL & CO'S,

## Gold Sarsaparilla

A SURE AND SAFE AGENT FOR PURIFYING BLOOD. A MARVELLOUS REMEDY FOR ALL SYPHILLITIC AND MERCURIAL DISORDERS.

*PRICE-EACH PHIAL Rs. 2/8.*

BUTTO KRISTO PAUL & Co,
CHEMISTS & DRUGGISTS,
CALCUTTA.

## Cytogen—An Ideal Digestive Tonic Wine

*Invaluable in* CONVALESCENCE *from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c., Extremely Useful in Anaemia, Nervous Debility, Loss of Appetite, Indigestion, Acidity &c.,*

**INDISPENSABLE AFTER PARTURITION**

Price Rs. 1-8-0 Per Bottle.

B. K. Paul & Co.,
CALCUTTA.

Branch Sovabazar Street.

Head office :—7 & 12 Bonfield's Lane Calcutta The Research Laboratory : —1 Sashi Bhuson Sarker's Lane

SAHITYA PARISHAD LIBRARY

# অধ্যাপক শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ এম, এ প্রণীত।

১। ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা ... ... ... ... ॥০
(2) Sanskrit learning in Bengal ... ... ... ॥০
(3) Pramâns of Hindu Logic ... ... ... ... ।০

আসাম, গৌহাটী গ্রন্থকারের বাসায় প্রাপ্তব্য।

## বহুচিত্রে শোভিত।

## প্রাইজ দেওয়ার নূতন পুস্তক।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

### ১। মহরম।

সকল জাতির নিকট সমান আদরের সেই মহরমের কাহিনী সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে মূল্য ।৵০ আনা। ৪ খানা ছবি।

### ২। প্রহ্লাদ।

হরিভক্ত প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত সরল ভাষায় লিখিত। মূল্য ।৵০ আনা।

পপুলার লাইব্রেরী—ঢাকা।

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

# শক্তি ঔষধালয়

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট, ঢাকা।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন রোড্ (হাওরা পুলের নিকট)
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১নং আপার সার্কুলার রোড্ (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—
৭১।১ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—৭২ দশাশ্বমেধ ঘাট।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

| | | |
|---|---|---|
| বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের। | দাদমার—৵০ কৌটা। | বহরের ননী—॥০ শিশি। |
| ——— | (এক দিনে দদ্রু নিশ্চয় আরোগ্য)। | (মালীষা, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ |
| অমৃতপ্রাশ ঘৃত—১০৲ সের। | ——— | মহৌষধ)। |
| ——— | দশন সংস্কারচূর্ণ—৵০ কৌটা। | ——— |
| ছাগলাদ্য ঘৃত—১০৲ সের। | (সর্ব্ববিধ দন্তরোগের মহৌষধ)। | অমৃতারিষ্ট—॥০ আনা শিশি। |
| মেধাস্মৃতি বর্দ্ধক ও ছাত্রগণের সহায়। | মরিচাদি মলম—৵০ কৌটা। | (ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত ও |
| ব্রাহ্মীঘৃত—৬৲ সের) | (খুজলী পাঁচড়ার মহৌষধ)। | সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ) |

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শক্তি বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

## অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ,

হিন্দুকেমিষ্ট এবং রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার

# অক্সফোর্ড প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকাবলী।

**আলেন্ কোয়াটারমেন**—সুপ্রসিদ্ধ লেখক সার্ রাইডার হাগর্ড প্রণীত

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১০ ফর্ম্মা। মূল্য ৸৹ আনা।

শ্রীজলধর সেন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ—

**প্রেমিক সন্ন্যাসী**—(The Cloister and Hearth নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ)

সুন্দর ছাপা ও কাগজ। মূল্য ৷৹ আনা।

**লে মিজেরাবল্**—(প্রায় ৫০ ফর্ম্মা, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী)।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত এবং

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

(যন্ত্রস্থ)

## ইউরোপীয় মহাসমর সংক্রান্ত পুস্তকাবলী—

**ইউরোপের মহাসমর**—(১৫ ফর্ম্মা ডবল ক্রাউন) ইহাতে মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত সকল বিষয়ই লিখিত আছে। টেলিগ্রাম, পত্রাদি গতিবিধি এবং অন্যান্য সমুদয় ব্রিটিশ white, বেলজিয়ম, গ্রে-বুক প্রভৃতি সরকারী নথি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। মূল্য ৸৴৹ আনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

**রণভেরী**—(Sir Arthur Conan Doyle) এর পুস্তকার বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৴৹ আনা মাত্র।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অন্যান্য পুস্তক শীঘ্রই বাহির হইবে।

Oxford University Press.
London New york Melbourne Cape town.
Bombay Hornly Road. Madras Sankarram Chetty.
Agents for Vernacular Publications—
Das Gupta &c. 54/8 College Street, Calcutta.
City Library Patuatoly, Dacca.

# DHARMA SAMAVAYA LIMITED.

## A CENTRAL CO-OPERATIVE ORGANISATION FOR PROMOTING UNION FOR CREDIT, THRIFT, TRADE, INDUSTRY, AGRICULTURE, INSURANCE, SN ITATION AND EDUCATION.

**Registered under the Indian Company's Act, in June, 1910**

---

Dividends on Shares, paid for the last three years, have been 25 per cent per annum. Dividends will be distributed quarterly for future years beginning with July, 1914.

The Memorandum of Association of the Samavaya provides for one hal of the net profits of each year being devoted to promotion of Religion Co-operation, and Economic Development of the Natural Resources.

Business transacted:—Builders, Engineers, Architects and Contractors-protectors of Cattle; Suppliers of pure and wholesome Dairy Produce; Purchase Sale and Efficient Management of Land; Establishment and Administration of Schools and Sanitariums; Housing on the Hire-purchase System; Land, Improvement on Co-operative Principles; Intensive Cultivation, Town-planning and Tenant-Co-partnership, on the Garden City and Suburb methods.

**SPECIAL NOTICE.**

Shares of DHARMA SAMAVAYA LIMITED, subscribed and paid for but between 16th April, 1914, and 31st May, 1914, will earn one-fourth of the Dividend, to be declared for our current financial year, ending 30th June, 1914. The list of Share-holders will remain closed, for the said year, during the month of June, 1914, and no sale or transfer of Shares will be transacted therein as for that year. Shares taken in June, 1914, will be sold at par value and earn full dividends from our next financial year, beginning with 1st July, 1914.

*Particulars supplied on application.*

SAMAVAYA MANSIONS,
CORPORATION PLACE, CALCUTTA.
*17th April,* 1914.

**A. C. UKIL,**
***Organiser.***

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor N. Bhadra. Nyabazar, Dacca.

All busines communications and all complaints regarding non-delivery of he Magazine should be addressed to—

*The Manager*, "DACCA REVIEW,"
*5, Nyabazar Road, Dacca.*

*N.B.*—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among others we may mention the names of:—

His Honour Sir Charles Steuart Bayley K. C. S. I.
The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Shamshul Huda, M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A., D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. H. Sharp, C.I.E., M.A.
„ Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C
„ Mr. J. Donald, I. C. S.
„ Mr. W. W. Hornell, M.A.
„ Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
„ Mr. L. J. Kershaw, C.I.E., I.C.S.
„ F. C. French Esq., I.C.S.
„ W. A. Seaton Esq., I. C. S.
„ R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.I I.C.S.
„ Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq., I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
G. A. Evans Esq., M.A., M. Sc I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S..
Rev. Harold Bridges, B. D.
J. R. Blackwood, Esq., I.C.S.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A. L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.Sc
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London.)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
„ Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B.A.
Professor R B. Ramsbotham M.A., (Oxon).
J. C. Kydd, M.A.
W. Douglas, M.A., B. Phil. B.D.
„ T. T. Williams M.A., B.Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
„ G. H. Langley, M.A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
„ Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Shushung.
The „ Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.

Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, Kt., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A., L. L. D. C. I. E.
„ Mr. N. Bonham-Carter, I.C.S.
„ Mr. J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
„ Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
Nawab K. Mahomed Yousuff.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esqr., I.C.S.
B. C Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G Hart, Esq., B.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Sarat Chandra Das, C. I. E.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandrs Singh
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
„ Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
„ Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L.
„ Radha Kamal Mukerji, M.A.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra.
„ Jaladhar Sen.
„ Jagadananda Roy
„ Benoy Kumar Sircar.
„ Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M. A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College

# CONTENTS.

| | | |
|---|---|---|
| Antique Civilisation and Art ... | Gouranga Nath Banerjee, M.A., B.L., M.R.A S., F.R.S.A., Asst. Professor Calcutta University ... | 285 |
| The Relation of Plants to their Environment | C. C. Calder, B. Sc., Curator, Herbarium, Sibpur Botanic Gardens ... | 301 |
| The Sikh Relics in Eastern Bengal | Sirdar Gurbux Singh (Supdt. Telegraphs) ... ... | 316 |
| Early English Voyages to the East Indies | Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon). Calcutta University Reader in History ... ... | 322 |
| Glories of the Sanskrit Literature ... | . Govinda Ch. Mukherjee M A, B.L., | 330 |


# সূচী

| বিষয় | লেখকগণের নাম | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|
| ১। বৈষ্ণব পদাবলীর রস-বৈচিত্র ... ... | শ্রীযুক্তসতীশচন্দ্র রায় এম্, এ, ... ... | ২৯৫ |
| ২। ভেলা (গল্প) ... .. | শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, টি ... ... | ৩০০ |
| ৩। স্মৃতি (গান) ... ... | শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত ... ... | ৩০৪ |
| ৪। দিব্য প্রবন্ধ বা দ্রাবিড় বেদ ... ... | শ্রীরামদাস ভট্টাচার্য্য এম্, এ, ... ... | ৩০৪ |
| ৫। শিশির (কবিতা) ... ... | শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম্, এ, ... | ৩১১ |
| ৬। বর্ণতত্ত্ব ... ... ... ... | শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সেন M. Sc. ... ... | ৩১২ |
| ৭। রায় হরিচরণ শর্ম্মা বাহাদুর ... ... | শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা ...<br>শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি,টি ... | ৩১৫ |
| ৮। এসেছি (কবিতা) ... ... | শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত ... ... | ৩২১ |
| ৯। উন্মাদ (গল্প) ... ... ... | শ্রীযুক্ত সুকুমার দাস গুপ্ত ... ... | ৩২১ |
| ১০। উত্তরাপথ ভ্রমণ ... ... ... | ভবঘুরে ... ... | ৩২৬ |

# THE DACCA REVIEW.

Vol. V. JANUARY, 1916. No. 10.

## "ANTIQUE CIVILISATION AND ART."*

(Greece, Egypt and India)

"Quand on veut comprendre un art, il faut regarder l'ame du public auquel il s'adressait."—H. Taine, "Voyage en Italie."

'In the elder days of Art
Builders wrought with greatest care
Each minute and unseen part;
For the Gods see everywhere."—
Longfellow, "The Builders."

The art of a country like the character of its inhabitants belongs to the nature of the land. The climate, the scenery, the contrasts of each country all clothe the artistic impulse as diversely as they clothe the people themselves. There can be no question of which art is intrinsically the best in the world; each is relatively best for its own conditions and each is out of place in other conditions. The only bad art is that which is mechanical, where the impulse to give expression has decayed and is reduced to mere copying of styles and motives which do not belong to its actual conditions. An age of copying is the only despicable age. It is but a confusion of thought therefore to try to pit the art of any one country against that of another. A Corinthian temple, an Assyrian Ziggurat, a Chinese pavillion, a Muhammedan Mosque, a Christian Cathedral, a Buddhist Vihara and a Burmese Pagoda are each perfect in their own conditions, for every work of art is but an interpretation of Nature.

Thanks to the numerous discoveries of the last fifty years, and the comparisons which they have suggested, thanks also to the theories for which they afford a basis, history has at last been enabled to render justice to certain nations whose activity had never before been properly understood, to give to them their proper place in the civilisation of ancient times. The result of

* Paper read before the Historical Seminar, Presidency College, Calcutta, on the 25th September, 1915.

these searches and discoveries was to show clearly that this ancient civilisation had sprung from two original sources, the one in the valley of the Nile and the other on the banks of the Tigris and the Euphrates. The widest, as well as the most sudden, enlargement of the horizon was due to a rapid succession of discoveries, some the result of persevering searches and lucky excavations, others rendered possible by feats of induction which almost amounted to genius. It seemed as though the curtain had been lifted, and behind the rich and brilliant scenery of Graeco-Roman civilisation, the real ancient world, the world of the East, the father of religions and of useful inventions, of the alphabet and of the plastic arts, were suddenly revealed to us. The great work which was compiled by the savants who accompanied Napoleon to Egypt first introduced the antiquities of that country to us and not long afterwards M. Champollion, the pioneer of the Egyptologists discovered the key to the hieroglyphics and thus rendered invaluable service to the forgotten pages of world's history. A little later, Layard and Botta freed Nineveh from the ruins of its own structures and again let in the light upon ancient Assyria. But yesterday, we knew nothing beyond the names of its mighty kings and yet it sprung again into the light of day, its monuments in marvellous preservation, its history pictured in thousands in bas-reliefs and narrated by their accompanying inscriptions. The information there obtained was supplemented by careful exploration of the ruins in Babylonia and Susiana. These had been less tenderly treated by time and by man than the remains of Nineveh. Ker-Porter, Texier and Flandrin provided us with more accurate descriptions of the imposing ruins of the palaces at Babylon and Persepolis. Thus to the labours of artists and archaelogists, who examined the country from the mountains of Armenia to the low and marshy plains of Susiana and from the deserts which border the Euphrates to the rocks of Media and Persia and to the philologists who deciphered the texts and classified the monumental fragments we owe our power to describe upon a sound basis and authentic materials the great civilisation which was developed in Western Asia, in the basin of the Persian Gulf.

But of the two great civilisations, the one flourishing in the valley of the Nile and the other in the basin of the Euphrates and the Tigris, the latter was probably the less ancient of the two and was nearer our own time than the epoch which witnessed the commencement of the long series of Egyptian dynasties with the reign of Menes. These two civilisations met and intermingled through the agency of the Phœnicians and an active and prolific interchange of ideas and products began, traces of which are still to be found both in Egypt and Assyria.

It still remained doubtful and the doubt has but lately been removed how the influence of these two great centres of culture was extended to the still barbarous tribes, the ancestors of Greeks and Romans, who inhabited the northern and eastern shores of the Mediterranean. But Greece—the Greece which Ottfried Müller worshipped and for which he was so ready to sacrifice her predecessors and teachers, to whom she herself was more just in her early legends—has lost nothing by the more exact information which is now at our command. Served by her situation on the confines of Europe and Asia and not far from Africa by the superiority of the genius of her people and the marvellous attitudes of her language, Greece was able to arrange and classify previous discoveries and to bring them to perfection, to protect from destruction and oblivion the machinery of progress, the processes of art, the newly-born scientific methods, in a word, all the complex and fragile apparatus of civilisation, which was so often threatened with final destruction, and which has more than once been overwhelmed for a time in the epoch of national conflict and social decadence.

But this is not a place for insistence upon all that Greece has accomplished in the domains of pure thought, philosophy and science, nor even for calling attention to her literature. We are concerned mainly with her arts, not her letters. A combination of circumstances that is unique in the history of the world gave to the contemporaries of Pericles and Alexander, the power of approaching more nearly to perfection, in their works of art, than men of any other race or any other epoch. In no other place or time have ideas been so clearly and completely interpreted by form; in no other place or time have the intellectual qualities been so clearly wedded to a strong love for beauty and a keen sensibility to it. It follows from this that the masterpieces of Greek artists, mutilated by time and accident as they are, serve as models and teachers to the painters and s ulptors of the present generation.

But our age is the age of history; it interests itself above all others in the sequence of social phenomena and their organic development, an evolution which Hegel explained by the laws of thought. It would be more than absurd in these days to accept Greek art as a thing self-created in its full perfection, without attempting to discover and explain the slow and careful stages by which it arrived at its apogée in the Athens of Pericles. To describe the birth of Greek culture, we must first study the early history of those races who heralded the dawn of civilisation in the world. The Greece which we call ancient entered late into history, when civilisation had already a long past behind it, a past of many centuries. In this sense, the words which as we are told by Plato in his Timaeus (p. 22) a priest of Sais addressed to Solon, were perfectly true, "you Greeks, you are but

children!" In comparison with Egypt, with Chaldaea, or Phoenicia, Greece is almost modern: the age of Pericles is nearest to our day than that which saw the birth of Egyptian civilisation, But the Greek race found itself by the accident of its geographical situation, from its birth in contactwith the Egyptian, Assyrian and Median Empires—the masters of the eastern Mediterranean.

Yet appearing later upon the scene, the Greeks excelled all other nations in the width and depth of their aesthetic sentiments; as their architects, their sculptors and their painters were superior both to their pupils and their masters, to the orientals on the one hand, and the Etruscans and the Latins on the other, we need feel no surprise at their central and dominating position in the history of antiquity. In the case of those oriental nations which were the teachers of the Greeks, they contributed to a large extent, it is true, to the foundation of Greek art and to its ultimate perfection; in the case of the ancient Italians, they assimilated the lessons of their instructors and they drew from their teachers, a method for the expression of their own peculiar wants and feelings and for the satisfaction of their own aesthetic desires.

For while the remains of oriental antiquity were being discovered at the beginning of the last century, secrets no less interesting and documents no less curious were continually coming to the surface to throw new light upon the history of classic antiquity. First came the marbles of Parthenon transferred to the British Museum by Lord Elgin in 1816. Both artists and connoisseurs after a short pause of hesitation, agreed in asserting that the bas-reliefs of the frieze and the sculptures of the two pediments excelled anything that had previously entered into any European museum. Artists declared that they experienced a sense of beauty never felt before; they were brought face to face for the first time with the ideal of the Greeks as it had been conceived and realised at that happy period of perfection which followed the disappearance of the last trace of archaic hardness. Art remained in Greece at a high level, longer than elsewhere. The word decadence can hardly be used in connection with the admirable works produced in the 4th century B. C. and yet it cannot be denied that so long as we were without original examples from the great epoch of Pericles, we had not the most necessary material for a history of Greek art, a knowledge of the most masterly, the most pure and the most elevated of her creations. The literary historian might as well have attempted to trace the course of her poetry without having read Sophocles without having heard of the Electra or the Oedipus Rex. Attention however being turned in this direction, discoveries followed each other in rapid succession. The statues from the pediments at Ægina, so ably restored by Thorwaldsen were.

brought to form the nucleus of the famous collection at Munich. They were discovered in 1811 amid the ruins of one of the temples at Ægina by a company of excavators presided over by Mr. Cockrell. They were bought by Prince Louis of Bavaria in 1812 and Thorwaldsen was occupied during several years in putting together and restoring them. They were first exhibited in the Glyptothek of Munich in 1820. In the same spirit, M. Blouet's interesting restorations of Olympia and Phigalia, published in the account of the French expedition to Morea, (Expedition scientifique de Morée, ordonnée par la Gouvernement Français. Architecture, Sculpture, Inscriptions, Meurees, dessinees. par A. Blouet) excited the emulation of the Academy students at Rome and opened to them a new course of study.

But the archæologists of the eighteenth century never dreamt of such researches as these still less of the results to whicht hey might lead ; few of them suspected what valuable aid might be afforded to the historian of art and antique civilisation by the multitude of small objects vases, gems, glass, mirrors, bronze plaques and figures, terra-cotta, bas-reliefs and statuettes which are now so eagerly sought after and which form valuable collections in the British Museum, Berlin Museum, and the Louvre. The small size of these objects also contributed to preserve them from destruction. In times of war and revolution, the poor and humble ones of the earth easily avoid the catastrophes which overwhelm those who are richer, more powerful and more conspicuous than themselves. So it was with these little memorials of antiquity. Their insignificance was their salvation in the overthrow of the civilisation to which they belonged. More numerous and better sheltered than the masterpieces of fine art, they survived when the latter perished. But these little monuments have preserved for us more than one myth of which no trace can be found in poetry or sculpture. Much of our present knowledge about the histories of past races is derived from the study of such objects *e. g.* Tanagra statuettes, Egyptian figurines and Assyrian terra-cotta bas-reliefs.

But there are characteristics which distinguish one style of art from another, the Assyrian from the Egypiian the archaic Greek style from that of the Phidian epoch or of the decadence, an Ionic column from Erechtheum, from one of the some order treated by a Roman architect. Between the contour of a figure from a Memphite bas-relief and that of one from Nineveh what difference is there? If we place three torsoes side by side, one of the sixth century, another of the fifth century, and the third of the time of Hadrian, a practised eye would at once assign its true date to each in acoordance with the manner in which the skeleton

was indicated under the flesh and the muscles drawn over it and attached to it. The whole history of art consists of the succession of subtle changes like these, and it would be impossible to convey them to the reader by the utmost precision of technical knowledge or the most brilliant and life-like descriptions.

But then, the more we study the past the more surely do we recognise the truth contained in those myths and traditions which betray the influence exercised upon Greece by the people of Egypt and Asia Minor. For, whatever may be thought of the initial date, Egypt remains, as has been so well said by M. Renan, "a light-house in the profound darkness of remote antiquity." Its period of greatest power was long anterior to the earlier traditions of the Greek race. A similar antiquity is claimed for the nations of the Western Asia. Thus to confine ourselves to the plastic arts, the historian of Greek art discovers forms and motives which had been employed in previous centuries and earlier civilisations, in exact proportion to the accuracy of his researches and to the number of his elements for comparison. He also finds that the Greeks borrowed from the same instructors those industrial processes which, although not in themselves artistic, are among the antecedent conditions of art: namely, metallurgy, ceramics, glass-making, embroidery, stone-working and carving, in a word all those trades which seem so simple when their secrets are known, but which, nevertheless, represent the accumulated efforts of countless unknown inventors. But as for the indirect borrowings of forms and motives which Greece received from Egypt through the Phoenicians, their transmission had come to an end before the Persian conquest, even before the time of Psammetichus. Egypt was represented either immediately or through the imitative powers of the Syrian manufacturers, in their fairest textiles, jewels and vases of clay or metal carried by the Sidonian merchants to the savage ancestors of the Greeks. In this roundabout manner she had propably more influence over Greece than in their periods of more direct communication. The rays kindled upon her hearth, the earliest of civilisation, fell upon the Hellenic isles as refracted rays, after passing through the varied media of Chaldaea, Assyria or Phoenicia.

Yet the art of Greece was profoundly original in the best sense of the word. In a way, it was superior to all that went before it, it alone deserved to become classic, that is, to furnish a body of rules and laws capable of being transmitted by teaching. Greek artists worked conscientiously for they generally worked for the Gods. And so their monuments are elaborated in all their parts, even in those that are least in view and are constructed so solidly that they exist to this day if they have not been violently destroyed. The Parthenon

was still intact in the seventeenth century. An explosion of gun-powder wrecked it. The architecture of the Greeks was at once solid and elegant, simple and scientific. Their temples have almost all disappeared ; here and there a very few, the most noted being the Parthenon at Athens, and the temple of Poseidon at Paestum in South Italy, wholly useless, in ruins, with roofs fallen in, often nothing left but rows of columns. And yet even in this state they enrapture those who behold them. Again among the Egyptians and the Assyrians sculpture was hardly more than an accessory ornament of their edifices; the Greeks made it their principal art. The most renowned artists Phidias, Praxiteles and Lysippus were sculptors. They executed bas-reliefs to adorn the walls of a temple, its facade or its pediment. Of this style of work is the most celebrated frieze of the Parathanaic procession which was carved around the Parthenon, representing young Athenian women and knights on the day of the great festival of the goddess. The most ancient statues of the Greeks are, it is true, stiff and rude, quite similar to the Assyrian sculptures. Little by little they become graceful and elegant. The greatest works are those of Phidias in the fifth century and of Praxiteles in the fourth, but the statues of the following centuries are more graceful but less noble and less powerful. There were thousands of statues in Greece for every city had its own and the sculptors produced without cessation for five centuries. Of all this multitude there remain to us hardly 15 complete statues. "Not a single example of the masterpieces," asserts M. Seignobos in his *Histoire de la Civilisation* "celebrated among the Greeks has come down to us. Our most famous Greek-statues are either copies like Venus de Milo, or works of the period of the decadence like the Appollo of the Belvedere." But still there remains enough uniting the fragments of statues and bas-reliefs which are continually being discovered to give us a very good conception of the Greek sculpture.

We leave out of account, the Greek painting–the art of Polygnotus, of Zeuxis and of Apelles. Of this we have but few remains, and we are obliged to take our ideas of its excellence from mere descriptions of ancient authors. We have indeed the wall-paintings of those companion cities which were so long buried under the ashes of Vesuvius ; paintings which were uncovered in great numbers under the Napoleonic domination, and in later times. Fragmentary mural paintings of the same kind have also been discovered in Rome and in a few other neighbourhoods. This amounts to the same as saying we know nothing of it.

Now turning to the Egyptians we see that they were the first to practise the arts necessary to a civilised people. They were the oldest artists of the world. And a singular point of attraction in the

study of Egyptian art is the extreme antiquity which carries us back, without seriously losing the thread of the story to a period when other races were still enshrouded in the impenetrable darkness of prehistoric times. A glance into so remote a past affords us a pleasure not unmingled with fear and bewilberment. Our feelings are like those of the Himalayan travellers, who standing upon some lofty summit, leans over the abyss at his feet, listens to the roar of the seething cauldron below and lets his eye wander for a moment over the immeasurable depths, in which forests and mountain streams can be dimly made out through mist and shadow. Long before the earliest centuries of which other nations have preserved any tradition, Egypt as she appears in her first creations, already possessed an art so advanced that it seems the end rather than the beginning of a long development. Twenty-five centuries before the Christian era, even before Greece and Rome existed in name only, Egypt had arrived at the point reached by the Romans under Cæsar and the Antonines ; and those Egyptian Pharaohs, whose achievements were sung by Pentaur, the Egyptian Homer, had artists in their service—artists who raised and decorated the Great Hypostyle Hall at Karnak, one of the wonders of architecture. But it may be well before embarking upon the study of Egyptian architecture, sculpture and painting to dispel a prejudice, which inspite of recent discoveries still exists in some minds : We mean the belief in the immobility of Egyptian art. This mistake is a very ancient one. The Greeks were the first to make it and they transmitted their error to us. We need not go back to the archaeologists of the 18th century whose credulity is to be accounted by their lack of materials for the formation of a better judgment. About the middle of the 19th century in his first lecture at the Bibliotheque Royale, M. Raoul Rochette turned his attention to Egypt. He had before his eyes in the Parisian Museums the works which dated from the finest periods of the Theban dynasties, although the still more ancient monuments which now form the glory of the Boulak Museum were not yet discovered. Yet he did say with consummate confidence "From the first of the Pharaohs to the last of the Ptolemies, the art of Egypt never varied." Such crude notions as this could no longer be upheld. M. Mariette says "The civilisation of Egypt went through all the different phases ; it went through many complete transformations, it had its sudden moments of brilliancy and its epochs of eclipse, its art was not so stationary as to prevent us from writing its history." Egypt had her great convulsions like the rest of the world. She met with disasters, and underwent periods of confusion like those which overtook the nations of the west between the reigns of Trajan and Charlemagne. Wars and invasions, the action and reaction of civilisation had

upon her the same influence as upon them and in transforming her sentiments and ideas, caused their plastic expression to pass through a series of changes in taste and style. The Theban tomb of the time of Ramses is very different from that of Memphite Empire ; the Theban Empire constructed no buildings lik the greater pyramids but its temples are larger and more magnificent than any of the predecessors. It is the same with sculpture. The differences are almost as well-marked as those which enable archaeologists to distinguish a torso of the time of Phidias from one of the school of Praxiteles or Lysippus. With this preliminary observations that the Egyptian art did not escape the law of change, we may procee:d to discuss the art of Egypt.

This early art however is much less known than that of the later epochs. While the great museums of Europe are filled with statues and reliefs from Thebes, or at least contemporary with the Theban and Saite dynasties, monuments from the Memphite period are still rare out of Egypt. Thanks to Mariette and Lepsius, Paris and Berlin are not without remarkable examples of the art in question but it is in Egypt itself, at the Boulak museum that any detailed study must be made. It is there that the masterpieces of an art whose very existence was unsuspected by M. Champollion are to be found ; the Khapra, the two statues from Medun, the bas-reliefs from the tomb of Ti and many others of similar style and value. The art of the Memphite dynasties has thus suffered much from the hand of time. The kings of this period erected temples in their cities and not to speak of the chapel of the Sphinx, we find in the remains still existing of these building chambres of granite, alabaster and limestone, covered with religious scenes like those of more recent periods although in some cases, the walls are left bare. Their public buildings have all or nearly all perished, breaches have been made in them by invading armies or civil wars and they have been altered, enlarged and restored scores of times in course of ages ; but the tombs of old kings remain and afford proof of the skill and perseverance exhibited by architects in devising and carrying out their plans. Many of the Mostabas occurring at intervals between Gizeh and Medum have indeed been hastily and carelessly built as if by those who were anxious to get them finished or those who had an eye to economy, but where the master mason has not been hampered by being forced to work hastily or cheaply he dispiays his conscientiousness and the choice of materials, the regularity of the courses and the homogeneousness of the building leave nothing to be desired. The facade was not wanting in a certain graceful severity ; the play of light and shade distributed ever the surface by the stelae, niches and deep-set doorways, varied its aspect in the course of

the day, without lessening the impression of its majesty and serenity which nothing could disturb. We thus find that art flourished here as nowhere else in the ancient world. Here again the Egyptian's attitude of mind was not wholly that which characterised the art of the later Greek period. Art as the pursuit and the production exclusively of the ideally beautiful was unknown to him. He loved beauty as found in nature, his spirit demanded such beauty in his home and surroundings. "The lotus blossomed on the handle of his spoon, and his wine sparkled in the deep blue calyx of the same flower, the muscular limb of the ox in carved ivory upheld the couch upon which he slept, the ceiling over his head was a starry heaven resting upon palm trunks each crowned with its graceful tuft of drooping foliage; or papyrus-stems rose from the floor to support the azure roof upon their swaying blossoms; doves and butterflies flitted across his in-door sky; his floors were frescoed with the opulent green of rich marsh-grasses, with fish gliding among their roots, where the wild-ox tossed his head at the birds twittering on the swaying grass-tops, as they strove in vain to drive away the stealthy weasel creeping up to plunder their nests." The Egyptians thus sought to beautify and to make beautiful all objects of utility, but all such objects served some practical use. He was not inclined to make a beautiful thing solely for its beauty. In sculpture therefore the practical dominated. The splendid statues of the old Kingdom were not made to be erected in the market place solely to be masoned up in the mastaba tomb, that they might be of practical advantage to the deceased in the hereafter. It was this motive chiefly to which the marvellous development of portrait sculptors in the Old Kingdom was due.

Egyptian art was also the faithful and skilful interpretation of the ideas of the people. What the Egyptians wished to say they did say with great clearness and rare happiness of plastic expression. To accuse them, as they have been sometimes accused, of a want of taste, would be to form a very narrow conception of art, to sin against both the method and the spirit of modern criticism. This latter seeks for originality and admires it and all art which is at once powerful and sincere arouses its interest. We do not however wish to deny that their conception of divinity was less favourable to the plastic arts than to the anthropomorphism of the Greeks. The value of an artistic result is in proportion to the difficulty of its achievement. The Greek sculptor had nothing beyond the bodily form and the features of man with which to give a distinct individuality to each God and Goddess of his mythology; he was therefore obliged to make use of the most delicate and subtle distinctions of feature and contour. This necessity

was a great incentive to perfection; it drove him to study the human form with a continuous energy, which unhappily for himself, was not required of the Egyptian sculptor or painter.

Thus it has long been a debatable question if the Egyptian statues of kings and private individuals can be regarded as faithful portraits or as merely approximate to their originals. No one has ever denied that their authors desired to make them as life-like as possible but we hesitate to believe that they succeeded in doing so. The air of uniformity lent them by the repeated employment of the same expressions and the same postures encouraged the notion, that judging themselves incapable of exactly transcribing the the details of bodily form or physiognomy proper to each individual, the sculptors decided that such details were not necessary for the kind of service to which the statues were destined: they considered that the task entrusted to them was sufficiently fulfilled if the "ka" or the double for which these statues provided an imperishable body, recognised in them enough of the perishable body to enable them to attach themselves to it without hurt in the course of their posthumous existence. The study of the monuments has however thoroughly dissipated those doubts first propounded by von Bissing. Any one who has carefully handled one of the Saite heads, the skull and face of which present so clearly individual characteristics, must acknowledge that so many details noted with such felicitous care indicate an absolute intention of transmitting exact appearance of the model to posterity. And, if proceeding forward, we reach the Second Theban period, we shall soon recognise the success with which the royal studios perpetuated in stone the effigies of their contemporaries. The profile of Seti I photographed in his coffin would coincide line for line with that of his bas-reliefs of Karnak or Abydos Let us go back 8 or 10 centuries and see how the master-sculptors of the first Theban period treated their Pharaohs. The statues of Amenemhat III and of Sanouseit have so personal a note that we should be wrong to imagine they could be anything but a sincere, almost brutal likeness. The Aphren of the Cairo Meseum were not long ago alone in suggesting to us the conviction that the Memphian times yielded nothing in this matter of resemblance to ages farther removed from us; the recent discovery of ten statues of Mykerinus, prevents any further doubt. Several Berlin Egyptologists whose natural ingenuity encouraged them to revise M. Mariette's criticisms on art, thought they discerned in certain details of the costume and ornamentation, a proof that if they were not figures of pure imagination, they were at best copies of ancient originals freely executed under one of the Saite dynasties and their theory, although opposed by

experts who had a longer experience, disconcerted the majority. It was soon upset by facts when Dr. Reisner and his Americans excavating at Gizeh in 1901 round about the third Pyramid brought to light monuments that with the best will in the world no one could assign to any other epoch than that of Mykerinus.

The art of imitating living forms in sculpture was no less ancient in Egypt than architecture. We do not mean to say that it already existed in those remote ages when the first ancestors of the Egyptian people built their mud cabins on the banks of the Nile; but as soon as their dwellings became something more than mere shelters and began to be affected by the desire for beauty, the figures of men and animals took a considerable place in their decoration. The oldest mastabas that have been discovered have bas-reliefs upon their walls and statues in their mummy-pits, and again when the Egyptian architects began to build the Hypostyle hall at Karnak or the pylons and obelisks of Luxor, the sculptors too produced master pieces in bas-reliefs and statuary, e. g. the fine statue of Ramses II (in Turin Museum) the colossal statue of Seti II (in the Louvre). But in most cases the Egyptian sculptor made man the centre and *raison detre* of his work and yet according to Madame du Staël the Egyptian sculptors impress with more sharpness of intellect in the portraying the figure of animals than that of human beings."

Thus until the rise of the Greek art, the artists of Egypt remained the great masters of antiquity. Her architecture by the beauty of its material, by its proportions, by its richness and variety was without a rival until the birth of the Doric temple. Her Sculptors displayed a singular aptitude in grasping and interpreting the features of individuals or of races and they succeeded in creating types which reached general truths without becoming strangers to individuality. Their royal statues were great, not so much by their dimension, as by their nobility of style and their expression of calm and pensive gravity. "The existence of a few child-like conventions from which they never shook themselves free cannot, says M. Chalas," prevent us from feeling admiration for the insight into life, the purity of contour, the freedom and truth of design which distinguish their bas-reliefs and paintings." The smallest works of an Egyptian craftsman are distinguished by a desire for grace which spreads over them like a reflection from art and beauty and they helped to carry some knowledge of the brilliant civilisation of Egypt to the most distant coasts of the ancient world.

During the earlier ages of antiquity the civilisation exercised upon the nascent art of neighbouring, and even of some distant people, an influence analogous to that which Greece in its later days was to wield over the whole basin of the Mediterranean. For many

a long century the style of Egypt enjoyed an unchallenged supremacy and offered a forecast of that universal acceptance which was to be the lot of Grecian art, when after 2 or 3000 years of fertility, of power and of prestige, the work of Egypt would be done and the time would arrive for her to fall asleep upon her laurels.

With a brief survey of the Indian art, we would like to close our dissertation. Before any one, be he artist or layman, attempts to draw any comparison between Indian and European art, it is necessary to have a clear understanding of the essential difference between the European and the Indian starting points in the higher planes of artistic expression. The common philosophical basis of art in all countries assumes that art is not merely an imitation or record of facts and phenomena in nature but an interpretation,—the effort of the human mind to grasp the inner beauty and meaning of the external fact of Nature. Realism to the Indian artist has a different meaning from what the Europeans attach to it. For Indian philosophy regards all we see in nature as transitory, illusive phenomena, and declares that the only reality is the Divine Essence or Spirit. So while European art hardly concerns itself with the unseen, and limits its mental range to the realm of nature and thus retains, even in its highest flights the sense and form of its earthly environment, Indian Art like the ancient Egyptian is always striving to realize something of the universal, the eterral and the infinite. European art has, as it were, its wings clipped: it knows only the beauty of earthly things. Indian art, soaring into the highest empyrean, is ever trying to bring down to earth something of the beauty of the things above.

The Greeks and the artists of the Renaissance who followed in their footsteps attempted to arrive at the highest type of beauty by a selection of what appeared to them to be the most admirable in various types of humanity and in natural forms and appearances. Physical beauty was to the Greeks a divine characteristic; the Hindu artist has an entirely different starting-point. He believes that the highest type of beauty must be sought after, not in the the imitation or selection of human or natural forms, but in the endeavour to suggest something finer and more suttle than ordinary physical beauty. Mere bodily strength and mundane perfections of form are rarely glorified in Indian art. When the Indian artist models a representation of the Divinity with an attenuated waist and abdomen and suppresses all the smaller anatomical details so as obtain an extreme simplicity of contour, the European draws a mental comparison with the ideas of Phidias or Michælangelo and declares that the Indian is sadly ignorant of anatomy and incapable of imitating the higher forms of Nature.

But the Indian artist in the best period of Indian sculpture and painting was no more ignorant of anatomy than Apelles or Praxiteles. He would create a higher and more subtle type than a Grecian athlete or a Roman Senator and suggest the spiritual beauty which according to his philosophy, can only be reached by the surrender of worldly attachments and the suppression of worldly desires.

Indian art is essentially idealistic, mystic, symbolic and transcendental. The artist is both priest and poet. In this respect Indian art is closely allied to the Gothic Art of Europe; indeed, Gothic art is only the Eastern consciousness expressing itself in a Western environment. But while the Christian art of the Middle ages is always emotional, rendering literally the pain of the mortification of the flesh, the bodily sufferings of the Man of Sorrows, Indian art appeals only to the imagination, and strives to realise the spirituality and abstraction of a supra-terrestrial sphere. There is and always will be, a wide gulf between these ideas and the naturalistic, materialistic view of Renaissance or the eclectic, archaeological art of modern Europe—the cult of the studio, the lay figure and the nude model.

Another familiar and more serious depreciatory criticism is based on the frequent introduction into Hindu art of monstrous and impossible forms often grotesque and not rarely hideous. Most of the Europeans condemn the representation of such forms on artistic grounds. But such monstrosities are legitimate in art considering the emotional and intellectual value of Indian Symbolism. Dr A. K. Coomarswamy quotes with approval the following rhetorical passage from the writings of Lafcadio Hearn, "Perhaps to uninitiated eyes" Hearn writes, "these many-headed, many-handed gods at first may seem as they seem always in the sight of Christian bigotry—only monstrous. But when the knowledge of their meaning comes to one who feels the divine in all religions, then they will be found to appeal to the higher aestheticism, to the sense of moral beauty, with a force never to be divined by the minds knowing nothing of the orient and its thought......as they multiply before research they vary and change; less multi-form, less complex, less elusive the moving of waters, than the visions of this ancient faith....... The stranger peering into its deeps, finds himself, as in the tale of Undine, contemplating a flood, in whose every surge rises and vanishes a face weird or beautiful or terrible, a most ancient shoreless sea of forms incomprehensibly interchanging and intermingling, but symbolising the protean magic of that infinite unknown that shapes and reshapes for ever, all cosmic being."

Indian art, it is true, was only in its cradle in the time of Alexander, while the artists of Greece were in full possession of all their powers, they had already

produced inimitable master-pieces in each of the great divisions of art, and yet their creative force was far from being exhausted. It was the age of Lysippus and Apelles; of those great architects, who in the temples of Asia Minor, renewed the youth of their Ioric order by their bold and ingenious innovations. Moreover artisans who had followed the Greek armies in their march towards the East, with the object of supplying the wants of any colonies which might be established in those distant regions, reproduced upon their vases and in their terra-cotta figures the motives of the paintings, sculpture and the architecture which they left behind. And like the Scythian tribes among whom the Great cities of the Euxine were planted, the nations to the north of India," says M. M. Perrot and Chepiez, "were astonished and delighted by the elegance of their ornament and variety of its forms. They imported from Bactriana, these products of an art which was wanting to them and soon set themselves, with the help perhaps of the foreign artists settled among them to imitate Grecian design in the courts of the Indian Rajas. And archæologists regard this Graeco-Roman type of Gandhara as the highest achievement of Indian art, only because it approaches nearer to the Greek idea. This habitual reference to western standards and ideals in their criticism of oriental work frequently leads European critics astray and makes them constitutionally incapable of doing justice to Indian art. It is always unsafe to assume that the Indian point of view is the same as the European; the probability is that it will always be different.

Nothing is more firmly rooted in the mind of the educated European than the idea that Indian civilization was a peculiar product of Greece; that the Greeks established æsthetic models for all times and all people, and that those who depart from them must be classed forthwith as decadents and degenerates. Because Indian sculptors and painters after coming into contact with debased Graeco-Roman art, deliberately formed their ideals upon a different art-philosophy, their work is treated by most Europeans as indicating a corrupt and depraved taste which places them beyond the pale of criticism. The Gandharan School however is not an example of Hellenistic influence upon Indian art but the reverse; it shows Graeco-Roman art being gradually Indianised. The Gandharan sculptors doubtless helped to execute many Indian monuments, but they never created an ideal of Buddha for Indians to imitate.

During the first three centuries of the Christian era, as Prof. Grunwedel himself shows, Greek art was an article of export and Greek artists travelled throughout the Roman Empire in search of employment. The Gandharan sculptors were craftsmen and very inferior craftsmen compared with those

of Pompeii and Herculaneum ; hirelings following more or less impure Hellenic traditions and engaged by the kings of Gandhar, to work under the orders of Buddhist monks. Their art, so far as it was Hellenic, was the dying art of Greece degraded into an inferior handicraft.

Professor Grunwedel, Dr. Fergusson and Dr. Burgess and many other orientalists have with profound learning and research catalogued the instances of Gandharan form and types which abound in later Indian art. But the origin of artistic ideas cannot be determined by the collection of archæological statistics, without correlating them with the intellectual and spiritual impulses which created the art to which they belong. The mere survival of these forms and types does not prove that Indian artists desired any inspiration from Gandhara ; neither artistically, nor technically is it possible to place the best Gandharan sculptures in the same plane with that of Borobadur, Elephanta or Ellora, or the most striking reliefs from Loriyan Tangoi. The suggestion can be easily made that the wonderfully fine modelling of some of the figures of Buddha and Bodhisattwa, as well as the pose are indicative of Greek influence. But however improved the Indian artist may have been by Grecian models, he has never departed from the Eastern ideal or made any attempt to create an Indian Hermes or Apollo.

But apart from the wanton destruction by bigots and Philistines, and the destructive influences of a tropical climate, there is a special reason, why master pieces of fine art seem to be rare in India compared with their number in Europe. This must always seem to be the case in an art which is entirely creative and imaginative instead of naturalistic. For, while imagination is the supremest virtue of the artist it is the most rare. Works of the highest imagination have not been more rare in Indian art than they are in any other country. An English writer of great repute even asserts, "Europe of the present day has in art far more to learn from India than to teach. Religious art in Europe is altogether lost ; it perished in our so-called Renaissance. In India the true spirit of it still lives." One illustration only will bear out the truth of Mr. Havell's assertion. It is one of two colossal war-horses placed outside the southern facade of the so-called Black Pagoda at Kanarak in Orissa, a temple dedicated to Surya, the sun-God, which is said to have been built by Narasimha. So late as the 13th century A.D. visions of the Mahabharata, the clash of battle in heroic ages and memories of the past triumphs of Indian chivalry must have inspired the sculptor of this noble figure and his prancing, war-harnessed steed pacing grandly forward over the prostrate foes. Here Indian sculptors have shown that they can express with as much fire and passion

as the greatest European art the pride of victory and the glory of triumphant war-fare. For not even the Homeric grandeur of the Elgin marbles surpassed the magnificent movement and modelling of this Indian Achilles and the superbly monumental war-horse in its massive strength and vigor is not unworthy of comparison with Verrocchio's famous master-piece at Venice.

In conclusion, one is constrained to admit that as every national art is an expression of national character, so when we compare the devout and reverent outlook upon nature shown in Amaravati reliefs, Borobudur sculptures, Ajanta frescoes or Sigirirja paintings with the utter vulgarity of Modern India, it is only too evident that in one respect our education falls immeasurably behind that of Greece and Ancient India, in the neglect of Plato's injunction "to use the beauties of earth as steps along which we mount upwards."

GOURANGA NATH BANERJEE,
M.A., B.L., M.R.A.S., F.R.S.A.

## THE RELATION OF PLANTS TO THEIR ENVIRONMENT.

To some of you whose opportunities for travel have been greater than such a privilege to the majority of us the great variation in vegetative type, the great dissimilarity in the appearance of the vegetation as a whole in different parts of the world, must have been something of a revelation.

But many of you who come into the category of plant lovers rather than into that of travellers or explorers must even if you are aware that all the earth is not alike in vegetation type, find it difficult exactly to picture what plant formation means, how the vegetation of the tropics differs from that of temperate or frigid zones, how for instance the views of the Sahara differ from those of Bengal or the rich tropical growth of Malay from the poor steppe wastes of cold northern Russia.

It will be my endeavour to-night to classify for you some of the main botanical formations of the world ; to show how such formations differ, in what respects thy differ and why ; in short to treat vegetation in terms of its environment.

If we leave the sea and fresh water life out of account, terrestrial vegetation is divisible into two main groups of formations according to the conditions which determine their presence. Such conditions are climatic where we have the production of formation depending on climate or terrestrial, geological or as we call it Edaphic conditions, where we have the production of a formation depending on the nature of the soil.

Let us approach the subject by thinking of the varying conditions under which plants have to live. Some succeed

only in the fierce hot rays of the tropical sun. Some prefer the cold dismal 6 months long night of arctic or antarctic regions.

The palms and aroids with their long drip pointed leaves flourish in the persistent torrential rains of Java, But the same prolonged precipitation would drench past recovery the rock vegetation of the dry South African plateau and had we such a water supply in the trans-Caspian steppe lands of Russia the small composites and grasses and the annual crop of Lilies and other monocotyledons might give place to forests of pines, beeches, willows at least to vegetation of a higher or more woody type. Precipitation, rainfall, water supply, therefore also vary.

Again atmospheric movements—winds as an element of climate, as a factor of environment, are not without their effect on the vegetation type.

We have only to think of the Musas and Zingibers, among the lower vegetation and of such trees as Barringtonia, the Indian cork tree in flower 2 months ago on the maidan among the taller plants,—plants which succeed only moderately when brought into the open—vegetation which normally flourishes in the stillness of the tropical woods, and to compare with them the vegetation which seems to defy the tropical nor' westers from whatever direction they may come or the hurricanes of the Alps.

We might look to the palms, to Acacia Spirocarpa of German, presently British, East Africa in the open tropical situations. We might gain a lesson from Auracaria braziliana in South America.

We might see the distinct efforts of winds being withstood by Primus and Cratægus on the exposed north coast of Denmark where there is no climatic benevolent neutrality and we might work back and judge what a poor show our Musas, Baringtonias our aroids and other climbing representatives which lead a quiter, less breezy life would put up against such conditions.

I have said enough of the effects which these various factors of climate—heat, light, moisture, winds have on the vegetation aspect of particular climatic regions.

But while climate is all-important in its effects there is another set of conditions which plants have to meet-conditions which are indeed to some extent bound up with the climate but more often distinct from it.

These conditions are geological rather than meteorological.—They are local or terrestrial or as I have called them edaphic.

They act and interact with climate in producing the plant's total environment.

Let me explain in greater detail what these conditions are and how their influence on vegetation works.

It is no longer a secret even to those of us who have not travelled that the whole world is not composed of Bengal

mud. We need not be concerned with why this is not the case nor with the views of geologists as to why this area or that is mud, this or that sand, this loam, that peat, this rocky, that boggy, this silicious that chalky and so on but just accept the fact that all these terrestrial or edaphic conditions exist and that certain plants find in one or other the conditions to which they have become used. We know now something of why a moor, given even the most favourable conditions of heat or rainfall can never produce other than the moorland type of vegetation; why this is usually herbaceous or if woody does get past the shrubby or stunted condition It is due to the decaying vegetation liberating poisonous acids which dare not be absorbed with the taller plant's water supply so the taller, more woody species must give place to the smaller herb with its limited water requirements and its greater power to reject the acids. We know now why the vegetation of Sind even in conditions of a plentiful rainfall shows all those curious xerophytic or power to resist drought characterstics. It is again a chemical reason bound up with the presence in the soil of abnormal quantities of salt which again dare not be taken into the plant's water system and so the soft tissuey leaf with no facilities for avoiding loss of water has to make room for the hard leathery leaf, for the fleshy leaf or for the plant almost leafless.

It is no wonder that the gypsum lands of Mesopotamia with their Achilleas, their Ferulagos, their Pimpinellas differ vegetation from the normal plant community f the Euphrates and Tigris valleys.

Their edaphic results are more immediate evidence than the climatic but they are not so important as the climatic for while climate determines the vegetation aspect over fairly large tracts of the Earth's surface local conditions of soil merely pick out and blend the mass materials supplied by the climatic factor.

We readily see how the vegetation of the swamp differs from that of dry land, how singular in its aspect is the vegetation of the seaside dunes; how the vegetation of the salt lakes by Calcutta differs from the inland where no salt affects the habit. We know how different the vegetation of the *lava and hot* spring districts of Java is from the normal tropical moist forests of that region. Edaphic influences crop up everywhere but we do *not* so readily see how climate determines over wide areas of the earth's surface dense evergreen forest, rain forest, savannah forest, deciduous forest, open forest scrub, bushland, grassland, prairie, steppe, semi-desert, absolute desert.

Of all the factors which make climate atmospheric Moisture, rainfall, precipitation in whatever form it comes is by far the most important in moulding the vegetation aspect. It is one of the many benefits which a comprehensive

and well equipped meteorological service renders to science that it furnishes botanists with the materials which form the basis of the study of plant geography. In our ignorance of the exact meteorological conditions which obtain over a series of years in many parts of the earth's surface we must often be at a loss to account for many of the phenomena of plant distribution. Why this species or that suddenly stops at a river bed or fails to extend beyond a certain range of hills is no doubt often simply a resultant of climate factors which properly understood would at once give the key to the plant's distribution. Rainfall is the most important factor. Heat comes next, then light and lastly atmospheric movement.

The influence of light is apparent rather in the individual plant than in the vegetation as a whole. It comes out in the orientation, the lie of the leaves and branches and of the green colouring bodies in the cells and in the colour of the vegetation. It is supposed to be due to this factor of light that the vegetation of Norway with the temperate influences of the gulf stream and its long day and its short night during the vegetative leafy period shows a much richer and much more uniform green than is to be found in southern Europe or even in the moist tropics.

The influence of heat is floristic rather than vegetative. It determines that the majority of a family or division of plants predominates in the hot tropics or in cool temperate regions. Thus the Musaceæ to which belongs the Banana, the Palm, the Arvidere to which a mass of tropical undergrowth belongs, the Anonaceæ to which belong many of our scrambling lianes climbers are heat-loving families. The Ericaceous to wich belong our heather. Rhododendrons, the Coniferæ with our firs, spruces, larches and so on and the Primulaceæ which has many members of our early spring flora at home, prefer a climate which those who have memories of them no doubt also prefer.

Let me now enlarge on the iufluence of heat in the determination of flora as contrasted with vegetation. Certain families are predominantly megathermic or heat-loving and among these many of the monocotyledons supply the most characteristic features of the tropical or heat-loving flora. In the first place this is true of the palms which are almost exclusively heat-loving plants. The Oreodoxas, queen of palms, the Borassus or palmyra palm of which the old Tamil song enumerates some 801 different uses, the Coryphas which like the palmyra preserves the ancient Hindu writings, the Cocoanut most useful of palms with a history so ancient that no one knows where it originated whether in the new world or the old. These and numberless other monocotyledons such as Ravellana madagascarinesis

with such a water supply that probing with a knife at the base of the leaf acts like the turning on of a water tap, give an aspect to tropical megathermic vegetation which is entirely lacking in temperate and frigid zones. We note their geometric proportions. The same sharp outline of form is not to be found in colder latitudes but probably if we search for a comparison we should pick out the Gymnosperms as showing something of the regularity which the palms afford. Here are some of the pines which characterise north temperate regions. To this category belong some of the Cypresses characteristic of the Italian landscape, the Cedars which the Eastern Mediterranean and north African coasts, all more or less sharp in outline and all of the class gymnospermus.

The same floral group is not however without its representative in the tropics—a representative which curiously enough is confined to the tropics. They are the Cycads-comparatively few species there are-but they are interesting relics—modern reminders of an older plant civilisation and again we note that they take on the palm aspect with its geometric outline.

But there is another tree reminding us somewhat of our pine woods. It is scarcely tropical but seems to find quite a congenial environment on the tropical climate. Casuarina equisetifolia the Belati-jhau of Bengal, a representative of Australia and the Australasian Islands introduced into India about a century ago and now well established especially on the Indian littoral. I do not like it overmuch. It has always seemed to me to be badly out of place beside a palm. It has great plasticity of form as of power to accommodate itself to varying climatic conditions. We have it in the neighbourhood of Calcutta as a tree, but in Madras I have seen it forming a small dense and very effective bushy hedge. Form amongst the dicotyledons is far too varied to admit of comparisons between their megathermic and mesothermic representatives, but no less in this class there are families exclusively heat-loving and others exclusively cold-loving I need not enter into a discussion of what families belong to the one, what to the other group. We think as I have said before of the anonaciæ to which belong many of our Lianes as heat-loving, the Piperaciæ and Aroids here belong to a similar class. We think of our Primulas as cold-loving, so also many of the Caryophyllaciæ. So also Armeria Alpina an old plant coming down to us from the ice age and still preferring to linger round terminal moraines and the lower limits of glaciers. The Cactaciæ on the other hand we think of as inhabiting (the caricatures of plants some of nature's jokes) sun-baked waters of the American tropics. We think of our Pines, our heathers, our Rhododendrons which creep into India only in the colder higher reaches of the Himalayas as cold-loving. So also our Salixes flourishing

just below the glacier region in Greenland.

The fact is that we find herbs, shrubs, trees, lianes, climbers in both megathermic and mesothermic vegetation and form does not seem to count but the families and orders—the larger groups rather than the smaller—have a tendency to segregate themselves towards one or other towards heat or cold. It will be sufficient if we recognise that temperature has an influence in determining the flora rather than the vegetation, that it more than any other climatic actor limits the geographical boundaries of families, determines which families shall inhabit the tropics, temperate or frigid zones but has little influence in determining whether these families shall be trees, shrubs, climbers or herbs. The influence of water is strongly in the vegetative domain, that of heat is rather in the floristic.

Water supply so far determines the vegetative type of regions that we may classify according to the prevalence of this necessary food. If water is always plentiful in the right form and at the right time for instance in the tropics we expect the result apparent in evergreen tropical forest; in temperate regions we have the result in less dense woodland. In colder regions where the presence of the frozen condition affects the whole plant's economy we have the production of stunted trees, shrubs and grassland where with a still more precarious water-supply cold desert alone might predominate. In the tropics and temperate belt where climate gives only a limited or very intermittent uncertain water-supply we have the production of grassland even though the factors of light, heat and atmospheric movement may be the most favourable. A further diminution in the available water results in the production of desert where only the most specialised plants succeed.

We have therefore a rough division of the Earth's vegetation into three main types, Woodland where the total environment may be looked on as most favourable to plant development; Grass-land where conditions are less favourable and desert where conditions are adverse and only high specialisation allows of success. Woodland, Grassland and Desert are by no means the product of soil or edaphic conditions. They depend primarily on climate and are only locally modified by local environment. Of course it would be incorrect to fail to admit that special kinds of soils have also their influence in the production of these 3 formations but probably few soils exist giving grassland or desert which could not with a more plentiful water-supply, with a more intense climatic environment produce a kind of Woodland.

Now just as climate varies little by little over the earth surface so also does the vegetation type. We have a merging from dense tropical evergreen jungle to rain forest, to open deciduous

forest to open woodland to scrub and bush land, to mixed grassland, to pure grassland and similar gradatious occur between grassland semidesert and again absolute desert, but we never find desert suddenly giving place to woodland unless edaphic, Geological, soil conditions abruptly interfere with climatic influence.

We find unmistakable evidences that the type of formation whether woodland grassland or desert or intermediate stages of these shows a very intimate relation to the climate it has selected. Tropical Woodland is no more haphazard production of soil than are the sands of the sahara to blame for the plant wilderness with we usually associate with them. It is easy to smile at the indigent Malay who can sit in the abundant tropical shade and wait till his breakfast falls from the nearest cocoanut but have we ever thought of it, that nature and nature's climate has been for long ages behind the quicker more active instinct of the wandering Bedouin who must strike his tent and migrate with his flocks towards what the desert climate affords for the abundance of vegetation no less than man takes on the impress which the surroundings compel ; no less than man do plants respond to their environment. Now as regards the general effect of tropical climate on plant life let as pick out a few characteristics which if not entirely confined to moist tropical vegetation are at least best developed under such conditions. One of these characteristics is the rate of growth. The rate at which much moist tropical vegetation grows far exceeds that of our temperate plants even where these grow in moist situa tions. Certain bamboos must be numbered among the representatives of the vegetable kingdom that grow most rapidly. It is not unusual to find some of these putting on growth at the rate of slightly under a foot a day Bambusa arundiviacea for instance has been found to grow 26 feet in height in the course of a month and Albruzzia moluccana, a leguminous tree in Java grows from a height of 16 feet at one year to 80 feet at six years of age—an average of about 13 feet a year with a circumference of 3 feet at the base. Such a rate of growth is entirely foreign to temperate or frigid vegetation.

A second characteristic of moist tropical life is its inability to withstand prolonged drought even where appliances for regulating transpiration or the loss of water are well developed. The vegetation of Sumatra for instance will take on a parched appearance four times as rapidly as European vegetation. Other characteristics appertain to the rapidity of orientation of the leaves which is greater in the tropics than in temperate regions. We naturally think of such plants as Mimosa and Desmodium-names which Professor Bose has made familiar in his work on Plant Responses. Still another is the characteristic mass of

shade-loving vegetation and the wonderful markings which some of it takes on. Probably the most evident and certainly the most interesting is the apparent but not real absence of leaf-fall, what we call the absence in periodicity of function. At this time of year the great proportion of European vegetation is leafless. It is a characteristic not entirely confined to temperate regions.

Here in Bengal we have a distinct leaf-fall during the cold weather but further south the periodicity in the leaf-fall and in many other activities of the plant is scarcely marked at all. The plant from year's end to year's end seems to pursue the same daily routine. In temperate latitudes we have the mass of vegetation putting on new leaf at one time—Spring, flowering at another—Summer, producing fruit at a third—Autumn, and reverting to a state of rest at a fourth—Winter.

In the tropics, especially in the moist tropics, we have nothing directly comparable to this. The same species may be found flowering in June as in January and even different branches of the same plant will flower and fruit at different times, sometimes years apart. The apparent difference is not however so real as it seems for it has now been ascertained that most tropical growth in a particular individual displays a constant if not well regulated periodicity. No individual can remain permanently in foliage, in flower or in fruit and the apparent lack of times of special activities is really due to the fact that climate throughout the year is unvarying and that there are no abrupt differences in environment in rainfall, heat or light to call forth abrupt changes in the plants' existence.

We might compare this phase of tropical plant life to the desultory individual activity of a battalion where no order has been given, where each unit reloads, aims, fires and ceases fire just as it suits himself and contrast with this the body under definite orders when the firing goes in volleys and there is no disturbance of the cease fire by individual reports.

So the moist tropical species with no definite order from climate maintains its individual activity—the temperate species follows the Spring order to take aim, the Summer order to fire and the Winter order to stand at ease. There is a very definite relation between cause and effect between climatic environment and the response.

With the abundance of water supply in moist tropical regions are correlated certain other features of plant life which if not confined to the tropics are at least best developed there than in temperate latitudes. There is much less need for protection against excessive loss of water and hence many trees fail to develop thick leathery leaves and the thick coating of bark both of which characters are associated with the xerophytic or water conserving habit. The possibility of a thin bark reacts on the tropical

plants' existence in a way which is seen only as an exception outside the tropics. The development of Cauliflory or the power to produce flower and fruit on the stems or older parts of the plant is a feature of much tropical vegetation.

We associate this with the thinness of the bark and with the consequent power of latent buds on older parts to break through and develop. We have many examples of this even in the neighbourhood of Calcutta. It is seen to best advantage in many of the figs but many others such as Phaleria, and the cannon-ball tree so named from the appearance of the fruit which hangs like so many cannon-balls to the stem. Parmentiera the candle tree fairly common in the district, and others show the same peculiarity.

It is not a general characteristic and there are naturally all gradations of age of parts of the plant showing it. We find it on the young shoots on the older and oldest branches as well as on the stems themselves on which last situation of course it is rarest.

But while cauliflory is a notable feature of such vegetation there are other structural and morphological responses ascribed now to the water or moist influence.

In the moist tropics but we find butresses developed to a degree which tropical conditions alone seem able to bring forth. We have them of two kinds, the simple semicircular or or circular supports and the broad flat or plant type of buttresses. The former development though not confined to tropical regions is found only meagrely supplied in meso and micro-thermic vegetation The latter is practically a product of the tropics.

They are both supposed to be associated with a plentiful supply of water or at least with a watery moist environment as the extreme example of Pandanus and much other mangrove vegetation would indicate.

It is in such plant formations as the mangrove that this peculiarity of tropical plant life is developed to its extreme limit—one dry land species alone Ficus bengalensis familiar to all, approaches the root support state in anything like the same perfection and here the supports come much less from the stem than from lateral branches. Thus they converge in general appearance; the two types are comparable *only in function* uamely as additional support.

Any mention of the special adaptations which the mangrove environment calls forth would be imcomplete without reference to the extraordinary response which the breathing roots show.

Let us think of the conditions in which the mangrove plant lives. We might view it from the sea during high tide when the whole country has the appearance of having been flooded to leave only the higher branches of the trees visible. If we await the ebb we look out on a vast expanse of apparently tangled growth with little or no ground vegetation and if we approach it the

tangled appearance gains some order when we observe that it is due to the stilt roots.

At ebb tide there appears to be nothing but a wilderness of mud in which the stilt and various kinds of breathing roots crop up as dense irregular impenetrable growths. They are one of the secrets of the mangroves success, one of those remarkable responses to environment which nature sometimes furnishes us with—a locus classicus for the scientist to study cause and effect in the plant world. Let us further consider the necessity for this curious root outgrowths or pneumatophores as they are called. All life must breathe and plants are no more an exception to this rule than animals. Their roots and underground parts must breathe just as their green parts where the manufacture of food takes place.

Only for a short time in the 24 hours are these not submerged, exposed to the air. It is as if the plant had to put in a vigorous breathing exercise while air was available because in a short time it will have to suffer the suffocation of the incoming tide. Even as the tide approaches it will soak the mud expelling what subterranean air there may be left and the plant will be left for the remainder of the 24 hours with its roots in the grip of suffocation. It is little wonder therefore that these special breathing-roots (for such is their only function) become developed. Their whole anatomical structure with a soft outer layer and a porous spongy tissue is calculated to give the best possible breathing service to the plant while it is free to breathe. We might even call them the functional lungs. But the mangrove shows its response to environment no less in the development of its fruits than it does in its breathing roots and a study of the means of propagating itself will no less repay the botanical student.

Roughly speaking the fruits or seeds of the mangrove vegetation may be classified into two types according to the dispersal requirements. We have them either heavy and club-shaped when they are suited to drop body bulk into the mud, attach themselves thus and develop lateral roots quickly or have them bulky and light, adapted to withstand prolonged submersion, to be floated about and perchance finally flung up on a higher muddy beach where germination may commence. There are few intermediate types and such as exist are suited rather to animal or to wind than to water dispersal. I should like in passing to refer to one mangrove species the distribution of which is interesting and which at present somewhat interests me. It is a typical mangrove plant showing all the characteristics, which that habitat brings forth in vegetation. Bruguiera parviflora. It is found in the Andamans, in the Philippines in the mangrove districts of S. E. Asia, but until quite recently has only once been reported some 80 years ago from the Sunderbuns. There is no evident

reason why the plant should not succeed in the Sunderbuns but it is evidently just one of those species which requires special climatic conditions to allow of its development. Although it has often been looked for between the date of its original discovery here and the present time it is only within the last few months that an authentic record is forthcoming. An example of one of those plants long lost probably always present but only very rarely come across. A discussion of the mangrove type of vegetation naturally leads one on to a comparison of inland plants growing in fresh waters. It is curious that the presence and absence of salt—the only difference between the two habitats—should have such an effect on the vegetation type. The mangrove vegetation is in no way comparable to that of inland fresh water. Whereas much of our mangrove is woody or bushy and herbs ever tend to take on the xenophytic or drought resisting character, nearly all our fresh water vegetation is herbaceous. Its structure is usually soft and thin-celled. There is little or no need for special breathing apparatus; the plant has on account of its size limited requirements in this respect even where it is constantly sub-merged, and there is always sufficient atmospheric gas dissolved in the water to meet these requirements : curiously enough all over the world fresh water calls forth the same vegetation type. A comparison of fresh water lakes and ponds in the tropics and in temperate and frigid zones, where the formation of ice is not so constant as to seriously affect all vegetable life shows us, different species it is true, but exactly the same specialisations and modifications are present in equatorial as in northern and southern latitudes. It is simply another hint at the comparative importance of water over all other climatic or edaphic factors in the moulding of the vegetative type. Probably on the whole life is more profuse in warm fresh water than in cold--temperature again shows its beneficial influence—but some of the species and many of the genus which we have in Europe are equally found in Bengal. Let me take one of these as a type of fresh water life. It is one which on account of its mode of living finds a place in all elementary text books of Botany. Not content with the staple food of plants, it turns flesh-eater. Utricutauria found in the sunny parts of fresh water, its whole structure shows, the most extraordinary response to environment. It is questionable and a question that can probably never be answered how many centuries, rather how many thousands and thousands of years this little water representation has taken to evolve to its present state of degenerate proficiency. There are some of its minute branches specialised out of all semblance to what one expects of a branch. They are small bags—submerged traps with a curtain of hairs which fold in the animal visitor as it enters but refuse to fold out once that

visitor is inside; it is a case of the spider and the fly over again. Darwin has shown that it even panders to the insect's craving for light by having a bright lens-shaped spot, which reflects any rays of light sufficiently to attract its prey. Crying out for a place in the sun highly specialised but degenerate in respect of its food supply, awaiting an opportunity with the distinctive apparatus it has evolved it destroys and devours all the innocent victims that come its way. In the plant world a veritable counterpart of a better known European type of Kultur—the aquatic Hun. We dare not follow the comparison too far however. Even Utriclaria may have its uses in the scheme of nature for may not mosquito larvæ have found a last resting place in the larger traps possessed by certain species. So far it remains in accordance with the established order of civilisation. So far at least it plays the game.

But Utricularia possesses bladders of a different kind and as the presence of these has not been noted until quite recently and credit for their discovery has not been allotted. I have been permitted by Mr. Ramaswami of the Botanical survey who now reports them, to refer to them here. When flowering time arrives it becomes necessary for Utricularia to raise its flower scape above water and to do so it has developed the assistance of minute air containing detachable bladders on the stem just at water level. These bladders like many others especially seen in marine vegetation serve as as a kind of float on which the flower scape rears itself.

The fact of their not being reported hitherto is to some extent to be accounted for by their extremely delicate and detachable nature. If a plant is taken at all roughly from the water these bladders float away and the handling which herbarium specimens receive readily separates them from the parent plant. So much for a glimpse at an interesting type of water-vegetation and a hint at a subject with which I cannot deal—plant and animal communities, their action and interaction—the animal environment of plants.

Nothing could be further removed from the aquatic type of vegetation than that of regions where plants have to depend on a scanty and precarious water supply and the relative difficulties against which the two types have to struggle may be represented as the inverse of the number of species found in the respective regions. It has been estimated by competent authorities that where one species dies of drowning ten die of thirst in the desert. Our water plants should therefore be ten times as numerous as our desert plants. If we take marine life into account the proportion would be multiplied many times—the necessity for water. We seem to get back to a fundamental idea in Œclogy. All plant life came up out of the ocean;—a harping back to primæval requirements—and our desert

representatives are merely objects of the self-inflicted penance of thirst.

Living in a world that offers many happier spots they eke out a precarious existence where conditions are about as uninviting as could well be imagineed, where there is little to eat and less to drink.

But the desert plant carries this analogy further. They are penitents in a further sense of the word. Like some whose penance takes the form of crawling to sacred places these desert inhabitants get on much better during the cool night when their actions are also hidden than during the day. Likewise though hidden the secret of their success is known.

It is bound up with the local climate which in many desert tracts over extensive areas so far as the heat element is concerned, fluctuates greatly both in diurnal and annual range. With the great diurnal reduction in temperature we have the precipitation as dew of such atmospheric moisture as is brought by winds and with this moisture production is correlated the ability of certain desert plants to absorb it directly as well as through the aerial and surface roots.

Plants of the desert are thus far specialised but the specialisation is most apparent in the abnormal development of the root system. In contrast with the roots of ordinary plants, desert vegetation shows us a system more specialised both morphologically and anatomically. It is largely due to the enormous length and continued lateral development of the root whereby subterranean water supplies are made available that desert vegetation succeeds at all. A further characteristic of most desert plants, is the development of the so called xerophytic or power to resist drought habit. We see how greatly reduced the leaves become, how the tendency is towards the reduction of vegetative shoots and the production of hard pointed thorny branches, towards the increased thickness and stumpiness of the stem rather than towards the development of the large leafy canopy characteristic of moist subtropical climate.

Unlike water vegetation which I have referred to as being of the same type in both tropical and temperate regions, desert vegetation seems to respond in a greater variety of ways to the desert climate.

We have desert conditions in all the continents. In none of them does the annual rainfall exceed 300 m.m. or about 11·7 inches a year. Usually it is very much less according to Wœikof's computations the point on the Earth that is poorest in rain as far as meteorological observations are available is Capiapo in Chili with an annual average of 10 M.M. or under half an inch.

Aden which we think of as one of the dryest and most unfavourable for plant life has about an average of 50 M M. or 2 inches and the latest computations of its flora gives it about 250 indigenous

species of flowering plants. The distribution of the scanty rainfall throughout the year also varies greatly. In the Sahara the atmospheric precipitations are irregular, though taking place chiefly in Spring and according to the distribution of the rainfall throughout the year, we have to distinguish between an ephemeral rain flora and a true desert or permanent flora. It is another reflection on the importance of water that the ephemeral as rain flora of the typical desert differs in no respect from that of regions with a plentiful water supply.

During the rains if these occur mostly at one time of the year, the same annual species are found in the desert as in adjacent rainy districts and such species show none of the structural modifications which characterise the true or permanent desert plant.

Among the features of desert vegetation, we note many adaptations which if not confined to such areas are at least best developed there. Here are some of the almost leafless thorny shrubs which characterise the East African Desert. Here are represented some of the structures which a desert climate brings forth. Here are some of the Aloes and Euphorbias of the South African Karoo. Succulence, rolling of the leaf or a non development of this water-losing organ, are all noteworthy adaptations.

Here we have another South African representative more resembling a carcass than a plant with leaves which continue to grow for upwards of 100 years and roots long enough to know all about the inside of Africa, wel-witschia mirabilis of Damaraland. All adaptations to gain (or having gained) to conserve the scanty water supply which nature affords. While speaking of the root system of desert plants I might refer to the observations made during the excavation of the Suez Canal when some of the Acacias which grow along its banks were found to go down to depths far greater than their heights above ground and the length of Calligonum, a Polygonacious plant of the Sahara has a root at least 20 times as long as its above-ground stem. I don't know that it would be wise to point to further analogies or make further comparisons but Calligonum goes a long way to get a drink.

The length of the root system is therefore another example of the many adaptations which the desert plant affords to secure a deep-seated water supply. During this brief survey of some of the more prominent botanical formations of the world, some of you may be haunted with the thought that much of it is very different to what has been described and this leads me on simply to note upon a third great formation beyond the climatic and edaphic. There is man's influence and he twists the vegetation aspect to have an appearance out of all relation to the natural. We can see tropical forest giving place to tea, to rubber, to coffee, to cinchona

plantations and we can see these neglected going back to jungle. We can see man's influence in the bog land turned to rice fields and the rice fields left untilled going back to bog land.

We can see man playing at Edaphic formations in his back garden and if he is our enemy we could see the property mortgaged and his garden going to waste. Man's influence is not a small one. The marks of his hand are everywhere on the vegetative type. We have only to look out on the Maidan to realise it.

I have often tried to fancy some of you who are interested in plant possibilities, may have amused yourselves and wasted your time likewise—how Bengal and in particular Calcutta vegetation would appear if man suddenly became extinct and nature was allowed some thousands of years in which to make up her handlcap. What should we find?

It is not easily pictured but what is there in this post-impressionist creation against a Dharamtolla where the water still readily drains away being covered with a crop of drought resisting Euphorbias or other xerophetic weeds with ferns and orchids and fig trees perched all along the crumbling house walls.

What would there be against a Chowringhee covered with tall grasses shrubs and twiners growing on the two feet of mud which the maidan worms had thoughtfully brought across and even were man extinct what is there against the inclusion of the inevitable garri-wallah waking up after his thousand years sleep to wonder what had become of the maidan now a jungle of trees climbers, bamboos and in popular terminology stuff—A maidan mass of tropical woodland.—A sudder street steppe.—A Dharamtolla desert.

The picture may be overdrawn but whether it would represent our immediate plant environment or not, we may be sure that climate would still be moulding our plant formations giving us woodland grassland or desert and that local effects of special soils would be merely picking out and sorting the main materials which climate supplied.

And behind all, the plant would be responding to the treatment which nature meted out moulding itself by virtue of its inherent plasticity to conditions with which to succeed it had to get on but which it could not control.

C. C. CALDER.

## THE SIKH RELICS IN EASTERN BENGAL.

### II

The next letter of the Guru was written not long after this and is a short one. In Guru's own words it reads as follows :—

**1. Aumkar Satiguru.**

"Bhai Hulaschand,

Bakhshishchand, the whole Congregation of Dhaka, the Sangat of Chatgaon (Chittagong) the Sangat of Sondip, the Sangat of Sylhet, and all others. May God make its business prosper. Blessed be the Sangat. Every Sikh who contributes even a Kowdi shall be happy."

It will be seen that a first class war elephant is asked for. The request was addressed to the proper quarter for more reasons than one, for the basin of the Meghna and generally the whole of Eastern Bengal was the home of elephants. The presents sent by Murshidquli Khan to the Emperor and the grandees at Delhi consisted of of Dacca cloth, sword blades, shields of rhinoceros hide, elephants and antelopes. An elephant was sent to the Guru as is clear from the postscript on the letter that followed. An elephant was also the primary cause of the commencement of hostilities against him by the Hill Raja of Bilaspur, who subsequently called in the Moghal to his help. The Sikh books relate that this was a Meghna elephant, a present from Raja Ratnarai of Assam. As contemporary history does not support the Sikh tradition, so far as Assam is concerned, the elephant in question might have been the one sent from Dacca and possibly a present from Raja Manikrai of Chittagong through the Dacca Sangat.

(4) The third letter of Guru Gobind Singh, evidently written only a few months after the one given above, shows that trouble with the Masands had commenced. The Third Guru had sent out a number of men to the different parts of the Punjab for the spread of Sikhism. The system was extended under his successors, till the original number 22 got very much multiplied. With the gradual transformation of Sikhism, this system also underwent a change, and the Bishops did not remain purely spiritual guides but became collectors of tithes etc. Towards the end they became very oppressive, and their extortionate methods were brought to the notice of the Guru in a farce played before him. He punished very severely those of the Masauds, against whom the charges were proved and abolished the whole system. But it is clear from these letters that the trouble lasted for some years and milder methods had failed. The men had gradually become very influential and in many cases independent of the Guru and had their own followings, who had to be boycotted. This was naturally resisted. Demand for clothes and weapons continues. The letter runs as follows :—

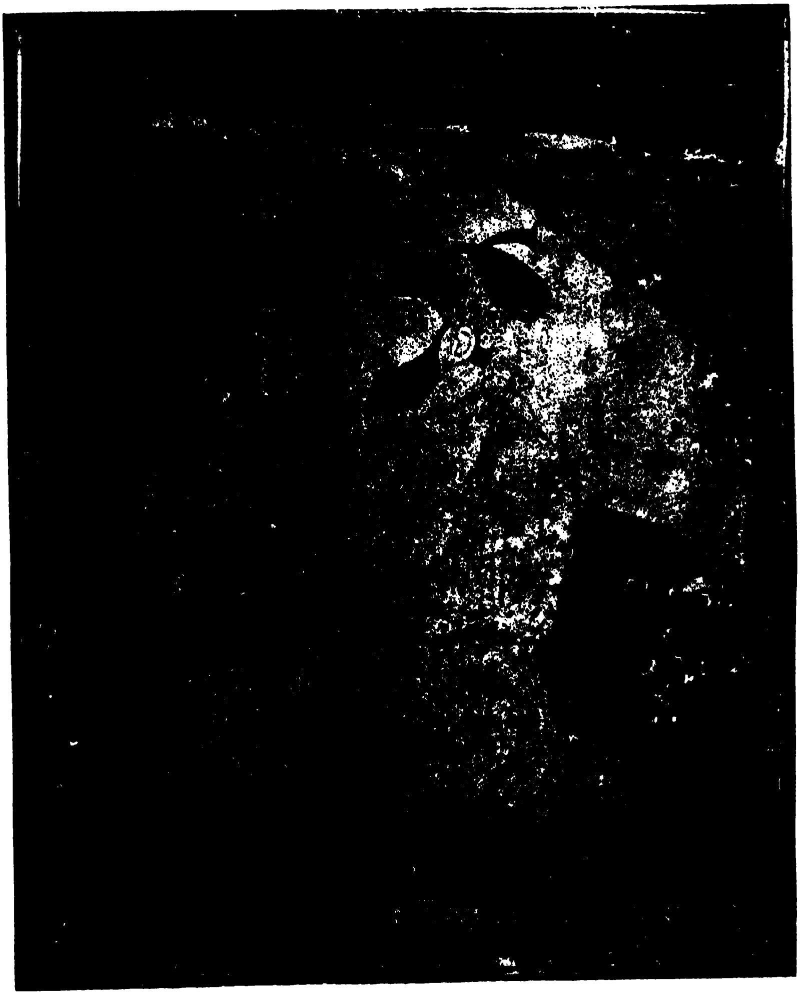

By courtesy of the Sikh Review.

### Of—1. Aumkar Sati Guru.

"(It is the Guru's order to) Bhai Hulaschand, Bhai Bakshishchand, Bhai Mehrchand (Bulakidas,* Sewak), Kanshiram, Lalchand, Baboorai (Maheshdash), Bindraban, and others of the Sangat at Dacca, the Sangat at Lashkar, the Sangat at Chatgaon, the Sangat of Sondip, the Sangat of Sylhet and all others. May God protect them all. Every Sikh who is a follower of the Guru is hereby ordered that all contributions on account of special work-funds, presents and thank-offerings etc., as also clothes, weapons, shields, in fact anything given for the Guru, should be made over to Bhai Hulaschand. It should not be given to anybody else. The Sangat's business is to obey my orders implicitly. Bhai Hulaschand ! please come to the Presence on the occasion of Diwali with the congregation and all collections. The Sikh who comes on pilgrimage, will gain merit thereby.

Bhai Gidharlal has come to the Guru. Bhai Mehrchand ! See that you do nothing in rashness. God will protect you. May you be happy.

Bring Tularam's grandson with you. Happy will be the Sikh who comes *on the occasion of the Dipawali.* God will make the Sangat prosperous and happy; God will fulfil all their desires. Bring also the congregation from the neighbourhood, and come with shields, head-dresses and clothes. May you be happy. Every one who contributes even a cowdi will be blessed.

Bring also with you a suit of clothes for the Guru's own use. Whoever helps in complying with the requisition, will flourish. I am very much attached to the Dhaka Sangat. Come quick. May the congregation be happy.

Have nothing to do with a Sangatia *i. e. Masandia.* God will make you prosper and happy. Guru will protect the Sangat. ( Guru will fulfil all the desires of the Sangat and there will take place the Khasmana. Bless you ).

*P. S.*—Send 7 *dupatas* (ladies') for the private * use, ( 2 silverlaced and 5 goldlaced. Bring them with you. May you be happy). Give (rupees fifty) 50/- (to the families of) the elephant-keepers (for their current expenses. Bring along with the congregation ; it will be the duty of Hazur Sangat to see to it)."

The words within brackets are as usual those added by the scribe. In translating these letters attempt has been made to bring out the spirit without being too literal. With this, end the duplicate letters.

(5) The fifth letter is in plain script only. It is in a different handwriting

* Bulakidas was the name of the local Masand at Dacca. The Guru's own letter omits this name, though the secretary reintroduces it along with two other names.

* The only discovery that my wife could make in these letters was that "Evidently the ladies of the Guru's family had very little of asceticism about them."

and would therefore appear to be separated from those that preceded it by some years. Luckily it is dated, so that the dates of the others are practically fixed. This letter asks for a draft of the value of Rs. 101, and bears the receipt and ledger marks of the firm which issued this ***hundi.*** Devotees are asked to come for ***darshan*** fully armed. Evidently the struggle of the Guru against the Moghals had not yet commenced. The rupture with the ***Masands*** had widened, but a conciliatory policy was still recommended. The letter is dated Sambat 1735, which means that the Guru was thirtyfive years old when this letter was written. The letter runs as below :—

### 1. Aumkar Satiguruji.

By the order of the Sriguruji, (*this letter is written to*) Bhai Bindraban, Gulalchand. May God protect you. Repeat guru, guru, guru, your lives will (thus) be well spent. You are my Khalsa. • Send a draft for Rupees 101/ one hundred and one immediately on seeing this order. Bring with you everything else that belongs to the Guru ; donot give it to anybody else. Devotees who came on pilgrimage fully armed will (best) please the Guru, and will be blessed. Do not mix with the ***masands*** and ***masandis*** and do not revere them. Take in every Sikh who wants to come to you ; do not create any (unnecessary) difficulties (in his way) ; take all who come. This is my order. May the congregation be happy.

Sambat 1758 miti Phalguni 10, seventeen fifty-eight. And on the reverse occurs the following postscript :—

Give rupees five 5/- to the messenger and the address :—

Bhai Bindraban Gulalchand of Dhaka, District Purah Rs. 101/-. The ledger marks and the receipt of the firm appear on the obverse side. It appears that this was the 12th draft against account No. 2902.

(6) The last letter I have to make a mention of is the one from Harimandar at Patna written about a century later in Sambat 1849. Its only importance lies in showing the change that diction and style of letter writing underwent, as also in telling us about the relation that existed between the four ***takhats*** (literally throne) or the arch-bishoprics and their respective dioceses, after the demise of the guru. A deputation goes out with an order to bring in collections. The inexpressive straggling prose of earlier letters, has given place to long adjectival phrases, which rhyme. This artificial and verbose style, evidently a copy of Persian Ruqqoa-nowisi, continued to our own day and has now disappeared before the simple, spontaneous letter writing introduced from the West. The script of course is modern with

• So the ***Khalsa*** has come into existence ; but mark that Non-Sikhs have been included among the ***Khalsa.***

few variations from the current forms. The letter opens with a seal containing a persian couplet, used by the Sikhs on coins first struck in the name of the Khalsa.

Next to the letters, come the several manuscripts, alluded to above. I reserve an account of them till the end and revert to the Sangats.

The one I have been just describing was called the Hazur Sangat as is clear from the letters; and it was to this Sangat that all communications were made by the Gurus or the *takhats.* As far as I have been able to ascertain there appears to have never been a permanent source of income in connection with this Sangat; and whatever other means for its maintenance existed have long since ceased. The present *pujari* has to work for his livelihood, want of which has been the cause of ruin of other Sangats and is likely to prove so in this case as well. With the hope that some means will be found to keep this one sangat at least going in Eastern Bengal, I take up the others.

We have seen that the Hukmnamas make mention of a number of them. The first among them is that of Lashkar. It is difficult now to decide which sangat was exactly intended by this title But 'more than a mile beyond the limits of the present city stand the remains of Idgah. Once the great city of Dacca lay close all around extending for miles on either hand. This Idgah was in the very centre of the busy life of court, and mart and almost contiguous to the camp was the Sangat sacred to Guru Nanak's memory, already described. It may be that this went by the name of *Lashkar ki Sangat* at that time, for no other name has come down to us.

The Sangat at Sylhet his disappeared within the memory of living men. It stood on the site where I hear a college is now under construction. Two manuscript copies of the Granth Sahib dated Sambat 1811 and 1849 respectively that belonged to this Sangat found their way to Dacca and are now preserved in the Hazur Sangat. It has been mentioned above that immigrants from outside had largely settled in Dacca. A very considerable portion of them was made up of Khatri traders, originally from the Punjab but settled for generations in Hindustan and Behar. In fact it was this Greater Punjab that made a forward move when Rajmahal ceased to be the capital of Bengal and squatted down in all the important trade-centres of the East. Some of these families acquired wealth and built up big estates traces of which have come down to us. These traders in Dacca were centred round the Bengalla Bazar where they had established a Sangat, after which the quarter took its name. Now the Portuguese had their factory also in this very quarter and their dealings with the Khatri traders. It was therefore quite natural that some of these traders should have

shifted further still and established themselves on the Sondip Island then under the Portuguese. It was thus that a Sangat was established there to disappear in course of time along with its founders. The last Sangat mentioned in Hukmnamas is that of Chittagong. A Sangat still survives these and enjoys a Jagir of about Rs. 1000/- a year, granted to the Sangat rather more than a quater of a century later, by one Diwan Mohan Singh, a Khatri of Patna. Born of poor parents, Mohan Singh gradually rose by his own ability so as to be made the Diwan of Chittagong. He early attracted the attention of Nawab Alirverdikhan, the Governer of Behar by reading a difficult Persian manuscript which no one else could decipher. "These were the days of the invasion of the Persian usurper Nadirshah; the central authority at Delhi was tottering to its fall. Its hold over the provinces of the furthest East had already practically become non-existent, and Serferazkhan (a grandson of Murshid Qulikhan) who seized the viceroyalty on his father's death in 1739, appears never to have been confirmed in office by the Emperor. Bengal left entirely to itself quickly became a prey to rival factions. The battle was to the strong and Serferazkhan, completely under feminine influence was not the man that the moment demanded. His rule was brief and in the following year he fell in the battle near Murshidabad and his rival Aliverdikhan, Governer of Behar, seized the viceroyalty." It was about this time * that Mohan Singh was entrusted with some important expedition in the district of Chittagong. He defeated the local chiefs of the rival faction and suppressed the mutinous zemindars of Dohazari, and as a reward was appointed the Diwan of Chittagong. Dewan Mohan Singh was no less a pious Sikh than a brave soldier and an able administrator. He made good his opportunity and established more than a dozen Sangats within his jurisdiction and attached Jagirs to one and all of them. Of course similar grants were made to Bairagi Thakurdwans and Mohammaden Shrines, but we are not interested in them just now. Jorarganj, Feni, Mirsarai, Sitakund, Kursira and Bhatiari, the halting stages on the road from Comilla to Chittagong; Kulgaon, Dohazari and Banskhali on the roads to the south and Dhulaghat, Hathazari, Rangunia and Kanchannagar to the north of Chittagong had each a sangat. Some of them could even boast of more than one; thus Kumira had two, and Kanchannagar, the head quarter of Diwan Mohan Singh, three sangats Ruins now mark the place where once stood his *haveli* and fort. The majority of the Sangats established by him have

* This is my conclusion. To begin with Raja Mansingh in Jehangir's time and to come down to one Mansingh who flourished more than a century later required a good deal of sifting.

had no better fate. With the exception of that at Banskhali, the southernmost one, none of them exists now. I have visited most of the places named above and made inquiries. The oldest man in the locality stares at you in wonderment when questioned about a Nanak panthi temple, so completely forgotten is their existence now.

The first place to be visited by me was Dohazari, a place sanctified by the pious feet of Guru Tegh Bahadur himself. It was here (so the story goes) that a dog belonging to the Guru was seized by a crocodile. The Local Mohammudan zeminder had an autograph of the Guru which was preserved till the other day with a reverence due to a valued family heirloom and a holy relic. The paper may yet be found in the Court of Wards. My inquiries at the place brought out the fact that the people had indeed heard of Nanak and this is what they had heard about him.

Hindu ka Guru, Mussulman ka Pir,
So nam Nanakshah Faqir.

And the temple? Yes, there used to be on the river bank a place where Sadhus stopped, but it was carried away in a flood many years ago.

It was not a very hopeful beginning, so it is not to be wondered that a day later when early in the morning I left my camp for Banskhali, I had expected to return disappointed before noon. Imagine my surprise when I found that not only the Sangat did exist in olden days, but that it flourished at the moment and was the principal temple at the place. The present Mohant is named Chanchaldas. He knows Gurmukhi and on festive occasions reads from his *pothis* to the few people that gather togather there. But the principal object of attention now is the image of Jagannath. A gentleman of the place used to celebrate the Rathajatra. He died some ten years ago and the people, finding no other means to continue it, persuaded Mahant Chanchaldas to take it up. It is perhaps the circumstances that make him what he is, otherwise I found him quite a good type of man and very obliging. I am indebted to him for a good deal of information about these Sangats, subsequently verified and corrected. The people of Banskhali itself, he told me, do not help him at all. Even for the *Rathajatra*, he has to add from Rs. 30/- to Rs. 40/- a year to the amount collected by public subscription. He has got about 40 families of sewaks in the neighbouring village. But the Sangat depends for maintenance on the permanent income of the Jagir which still remains attached to it and brings in Rupees 500 - or 80 a year. The Jagir however bids fair to disappear during the ministry of his *Chela* Gangram. Chanchaldas is the tenth in succession from the first mahant Suratram appointed by Dewan Mohan Singh. The names of others in order are Jhandadass, Lachhmandas, Karmprokash, Atmaprakash, Amardas, Iswardas, Gurudas and Ramdas. One

of the detached rooms in the Sangat is taken up by their *Sruadhis*. They were all Udasis, as were the mahants of all the other Sangats established by Diwan Monan Singh. Mohan Singh was also the founder of a Sangat at Maida and mother at Mannsha Chandi near Rajmahal. These three Sangats along with the one at Rajmahal belong to the *Akhara* at Morang in Nepal.

(*To be codtinued*).

GURBUX SINGH.

## EARLY ENGLISH VOYAGES TO THE EAST INDIES.

### II.

The first voyage set forth by the London East India Company was commanded by James Lancaster, one of the leading seamen of the Elizabethan era who received the honour of a knighthood for his notable services —services for which he is rightly regarded as "the founder of the English trade with the East Indies which led to the formation of the British Empire of India." The original manuscript journals of the voyage are unfortunately lost. The few points that I propose to place before you in this connection are taken from the narrative as given by Purchas, which, whenever practicable, I have collated with the papers included in the First Letter Book of the East India Company compiled by Sir George Birdwood, as also with the volume of Lancaster's voyages published by the Hakluyt Society. I may just as well state here that "the oldest existing manuscripts in the India-Office are fragments of three journals kept during the 3rd voyage (1606-1609) which was commanded by Captains Keelinge and Hawkins. Purchas gives abstracts of two journals of this third voyage, that of Keelinge from the document preserved in the India Office. The second is the important narrative of Captain Hawkins commanding the *Hector*, who was the first Englishman to obtain a concession for trading from the Great Mogul. It was at one time believed that the manuscript of the journal of Hawkins had been lost."[1] But it has now been fortunately found among the manuscripts in the British Museum (Egerton MS. 2100) though much injured by damp.

For the benefit of my younger friends, I may further explain that there were altogether twelve "Separate Voyages".[2]

[1] Markham.

[2] During the first twelve years of its existence the Company traded on the principle of each subscriber contributing separately to the expense of each voyage, and reaping the whole profits of his subscription. The voyages during these twelve years are therefore known as "separate voyages." But after 1612 the subscribers threw their contributions into a "Joint Stock," and thus converted themselves from a regulated Company into a Joint Stock Company which however differed widely in its constitution from the Joint Stock Companies of the present day.—ILBERT.

Of the "Joint Stock Voyages," the first, that in 1613 under Downton, is perhaps the only one on the Joint Stock account of general interest. "The fleet which sailed in January 1615 took out Sir Thomas Roe, on board the *Lion*, as Ambassador from James I. to the Court of the Great Mogul (Jehangier) at Agra." That which sailed in February 1616 had Edward Terry, (whose journal I shall have frequently to refer to later on), on board the *Charles* as Chaplain to the Hon'ble Sir Thomas Roe, Kt.

Of the twelve "Separate Voyages," "The First," 1601, under James Lancaster, consisted of the Red Dragon, Hector, Assention, Susan and Guift.

"The Second" 1604, under Henry Middleton, consisted of the Red Dragon, Hector, Assention, Susan.

"The Third," 1607, undei Keelinge, consisted of the Red Dragon, Hector and Consent, and William Hawkins, who commanded the Hector, left her at Surat and proceeded to Agra.

"The Fourth," 1601, under Sharpey, consisted of the Assention and Union ;

"The Fifth," 1909, was under David Middleton in the Consent, the only ship sent ;

"The Sixth," 1610, under Sir Henry Middleton, consisted of the Trades Increase, the Peppercorn, commanded by Nicholas Downton ; and the Darling ;

"The Seventh Voyage," was under Anthony Hippon in the Globe, the only ship sent ;

"The Eighth," 1611, under John Saris consisted of the Clove, Hector and Thomas ;

"The Ninth," 1612, was under Edmund Marlowe, in the James (James I.), detached from the "Tenth Voyage" :

"The Tenth," 1612, under Thomas Best, consisted of the Hoseander, Solomon ( *i. e.* James I. again ) and Red Dragon ;

"The Eleventh", 1612, under Best in the Solomon, detached from the "Tenth Voyage" ;

And "The Twelfth," also in 1612, was under Christopher Newport, in the expedition, which was commissioned chiefly to carry Sir Robert Sherly (brother of Sir Anthony), Ambassador from Shah Abbas to King James I, back to Persia, where he died in 1628.

Neither of the expeditions under Lancaster touched the shores of India proper. Their interest to the Indian historian, I venture to think, lies chiefly in the experimental nature of their operations. They familiarised English mariners with the route round the Cape of Good Hope. They spoke of the resources of the various stations and halting places on the way to India. They spoke of possible dangers, and thus forearmed succeeding voyagers by their forewarnings. But above all, to my mind, their interest lies in the fact that the first commercial treaty between England and an Oriental potentate ruling over an island of the Indian Archipelago, Sultan Alauddin, Sultan of Achim in the island of Sumatra, was

negotiated by Lancaster in course of the very first voyage set forth by the London East India Company. The negotiations which led to the ratification of the treaty illustrate that policy of caution and prudence, of sympathy and insight, of real statesmanship which characterise the doings of the principal agents of the East India Company from the beginning of its history, the policy which enabled it to triumph over its European rival on the mainland of India, and which has made England to-day the supreme power in the East. I propose to place before you this portion of the narrative of Lancaster's voyages *in extenso*, and you will gather that I do so not because of its graphic descriptions of the banquetings and dancing and merrymaking with which Lancaster was welcomed in Sumatra; not even because of the light which the narrative throws on the life of the people and the Court in the island—but because we have here a prefiguring of the future policy which indicated the surest way to empire building.

I would invite particular attention to the terms of the agreement and to the reasons which were adduced by Lancaster in course of the negotiations in justification of the establishment of a League of peace and amity between the two contracting parties.

The narrative relates :—

On the 5th day of June 1602, we came to anchor in the road of Achim, some two miles off the city. Here we found 16 or 18 sail of ships of divers nations, some of Bangala, some of Calicut, some Pegues which came to trade there. There came aboard of us two Holland merchants which had been left there behind their ships to learn the language and manners of the country. These told us we should be very welcome to the king who was desirous to entertain strangers and that the queen of England was very famous in these parts by reason of the wars and great victories which she had gotten against the king of Spain.

The third day, the general went a land very well accompained, with some thirty men or more to attend upon him, and first at his landing in the Holland merchants met him, and carried him home to their house, as it was appointed. For as yet, the general would make choice of no house of his own, till he had spoken with the king, but stayed at the Hollanders house, till a noble man came from the king, who saluted the general very kindly, and declared that he came from his Majesty, and represented his person. Then he demanded the queens letter of the general, which he refused to deliver; saying, he would deliver it to the king himself. For it was the order of Ambassadours, in those parts of the world from whence he came, to deliver their letters to the princes own hands, and not to any that did represent the kings person. So he demanded to see the subscription, which the general showed him, and he read

the same, and looked very earnestly upon the scale, took a note of the superscription, and did likewise write her magesties name; and then, with courtesie took his leave, and repaired to the court to tell the king what had passed. Who presently sent sixe great elephants, with many trumpets, drums and streamers with much people to accompany the general to the court, so that the presse was exceeding great. The biggest of these elephants was about thirteene or fourteene foote high, which had a small castle, like a coach upon his back, couered with crimson veluet. In the middle thereof was a great bason of gold, and a peece of silke exceeding richly wrought to couer it, under which her maiesties letter was put. The generall was mounted upon another of the elephants; some of his attendants rode, others went a foote, But when he came to the court gate, there a nobleman stayed the generall till he had gone in to know the kings further pleasure. But presently the said nobleman returned, and willed the generall to enter in. And when the generall came to the kings presence, he made his obeysance after the manner of the country, declaring that hee was sent from the most mightie Queen of England to congratulate with his highnesse and treat with him concerning a peace and amitie with his Maiestie, if it pleased him to entertaine the same. And therewithal began to enter into further discourse, which the king brake off, saying: I am sure you are weary of the long trauaile you haue taken, I would haue you sit downe and refresh your selfe. You are very welcome, and heere you shall haue whatsoeuer you will in any reasonable conditions demaund for your princesse sake, for she is worthy of all kindnesse and franke conditions, being a princesse of great noblenesse, for fame speaketh so much of her. The generall perceiuing the kings mind, deliuered him the queenes letter, which he willingly received, and deliuered the same to a noble man standing by him. Then the general proceeded to deliuer him his present, which was a bason of siluer, with a fountaine in the middest of it, weighing two hundred and five ounces, a great standing cup of siluer, rich lookingglasse, and head-piece with a plume of feathers, a case of very faire daggers, a rich wrought embroidered belt to hand a sword in, and a fan of feathers. All these were receiued in the kings presence by a nobleman of the court; onely he tooke into his owne hand the fanne of feathers, and cause one of his women to fanne him therewithall, as a thing that most pleased him of all the rest. The generall was commanded to sit downe in the kings presence, as the manner is, upon the ground; where was a very great banquet prouided. All the dishes, in which the meate was serued in, were either of pure gold, or of another metall, which (among them) is of great estimation, called tambaycke, which groweth

of gold and brasse together. In this banquet, the king, (as he sate aloft in a gallery, about a fathome from the ground) dranke oft to the generall in their wine, which they call racke. This wine is made of rice, and is as strong as any of our aquavita: a little will serue to bring one asleepe. The generall, after the first draught, dranke either water mingled therewithal, or pure water; the king gaue him leaue so to do, for the generall craued his pardon, as not able to drinke so strong drinke. After this feast was done, the king caused his damosells to come forth and dance, and his women to play musicke unto them; and these women were richly attired, and adorned with bracelets and jewels; and this they account a great fauour, for these are not vsually seene of any but such as the king will greatly honour. The king also gaue vnto the generall a fine white robe of calico, richly wrought with gold, and a very fair girdle of Turkey worke, and two cresses, which are a kind of daggers, all which a nobleman put on in the kings presence; and in this manner he was dismissed the court, with very great curtesies, and one sent along with him to make choyce of an house in the citie, where the generall thought most meete. But, at this time, he refused this kindnesse, and rather chose to goe aboord his ships; and left the king to consider of the queenes letter.

This letter, it is highly interesting to note, was a copy of that circular letter addressed to Oriental potentates which Elizabeth had drawn up.

"At his next going to the court. he had long conference with the king concerning the effect of the queenes letter, wherewith the king seemed to be very well pleased, and said if the contents of that letter came from the heart, he had good cause to thinke well thereof. And, for the league her Maiestie was desirous to hold with him, hee was well pleased therewith. And for the further demands the generall made from her in respect of the merchants trafficke, he had committed all these points to two of his noblemen to conferre with him, and promised what her Maiestie had requested should by all good meanes be granted. With this contented answere, after another banquet appointed for the the generall, he departed the court. And the next day he sent to those noblemen the king had named to him, to know their appointed time when they would sit upon this conference. The one of these noblemen was the chiefe bishope of the realme, a man of great estimation with the king and all the people; and so he well deserued, for he was a man of great estimation with the king and all the people; and so he well deserued, for he was a man very wise and temperate. The other was one of the most ancient nobilitie, a man of very good grauitie but not so fit to enter into these conferences as the bishop was. A day and a meeting was appointed, where many questions passed

betwixt them, and all this conferences passed in the Arabicke tongue, which both the bishop and the other nobleman well understood. Now the generall (before his going out of England) intertained a Jew who spake that language perfectly, which stood him in good stead at that time. About many demandes the generall made touching freedomes for the merchantes, the bishop said vnto him : 'Sir, what reasons shall we show to the king, from you, whereby he may (the more willingly) grant these things which you haue demanded to be granted by him ?' to whom the generall answered with reasons following :

'1. Her Maiesties mutuall loue.'

'2. Her worthiness in protecting others against the King of Spaine, the common enemie of these parts.'

'3. Her noble mind which refused the offer of those countries.'

'4. Nor will shee suffer any prince to exceed her in kindness.'

'5. Whose forces haue exceeded the Spaniards in many victories.'

'6. And hindered the Portugals attempts against these parts.'

'7. The Grand Signior of Turkie hath alreadie entered into league with her Majestie on honorable conditions.'

*'Reasons of another kind :'*

'8. More over, it is not unknowne to the king what prosperitie trade of merchandise bringeth to all lands, with increase of their reuenues, by the custome of these commerces.'

'9. Also princes grow into the more renowne and strength, and the more feared for the wealth of their subjects, which by the concourse of merchandises grow and increase.'

10. And the more kindly that strangers are entertained, the more trade doth grow ; the prince is thereby much enriched also.'

'11. As for Achem, in particular, this port lieth well to answere to the trade of all Bangala, Java, and the Moluccas, and all China. And these places hauing vent of their merchandise, will not let to resort hither with them ; so that, by this meanes, the royaltie of the kings crowne will greatly increase, to the decrease and diminshing of all Portugals trade, and their great forces in the Indies.'

12 And if it shall happen that his Majestie wanteth any artificiers, hee may haue them out of our kingdome, giuing them content for their trauaile : and free course to goe as they haue good will to come. And any other necessarie that our countrie bringeth forth and may spare, shall be at the king's command and service.

But I hope his Majestie will not vrge any demands more than Her Majestie may willingly consent unto, or that shall be contrarie to her honour and lawes and the league she hath made with all Chiristian princes, her neighbours.

Further, the generall demanded that Maiestie would cause present proclamation to be made for our safetie, and

that none of his people should abuse any of ours: but that they might doe their businesse quietly. And this last request was so well performed that, although there were a strict order that none of there owne peopie might walke by night, yet ours might goe both night and day without impeachment of any. Onely, if they found any of ours abroad at vnlawfull houres, the justice brought them home to the general's house, and there diliuered them.

After these conferences ended the bishop demanded of the generall notes of his reasons in writing, as also of his demands of the priuiledges he demanded in her Majestie's name for the merchants, and he would shew them to the king, and within few dayes he should haue his Majestie's answere to them. And with these conferences and much gratulation, and with some other talke of the affaires of Cnristendome, they broke vp for that time.

The generall was not negligent to send his demands to the noble men, which, for the most part, were drawne out before hand, for he was not vnreadie for these businesses before he came aland in the kingdome.

At his next going to the Court, and sitting before the king, beholding the cock-fighting (which is one of the greatest sports this king delighteth in), he sent his interpreter with his obeisance to the king' desiring him to be mindfull of the businesse, whereof hee had conferred with his noble men. Whereupon he called the generall vnto him, and told him that hee was carefull of his dispatch, and would willingly euter into peace and league with her Majestie, and (for his part) would hold it truely. And for these demands and articles he had set downe in writting they should all be written again by one of secretaries, and should haue them authorized by him. Which within fiue or six dayes were deliuered the generall by the king's owne hands with many good and gracious words: the tenor of which league and Articles of Peace are too long to be inserted. According to their desires was to the English granted: first, free entry and trade; secondly, custome free, whatsoeuer they they brought in or carried forth, and assistance with their vessels and shipping to saue our ships, goods, and men from wracke in any dangers. Thirdly, libertie, of testament to bequeath their goods to whom they please: Fourthly, stability of bargaines and orders for payment by the subjects of Acheme, etc. Fiftly, authority to execute iustice on their owne men offending. Sixtly, iustice against injuries from the natiues. Seuenthly, not to arrest or stay our goods or set prizes on them. Eightly, freedom of conscience. This league of peace and amitie being settled, the merchants continually went forward prouiding pepper for the lading of the ships.

On the eve of his departure, Lancaster was entrusted with a letter from

the king of Acheme to Queen Elizabeth which thus concludes—

You do affirm that you desire peace and friendship with us. To God be praise and thanks for the greatness of his grace. This therefore is our serious will and honourable purpose truly in this writing that you may send from your people unto our ports to trade and to traffic, and that whosoever shall be sent unto us in your highnesse's name, and to whomsoever you shall prescribe the time they shall be of a joint company and of common privileges.

The leave taking between the English General and the Oriental monarch was indeed affecting. But I desire to call your attention to it more for the truely edifying spectacle which it affords and the highly instructive example which it sets

"For a present to her Maiestie the king of Acheme sent three faire cloathes richly wrought with gold of very cunning wroke, and a very faire rubie in a ring: and gave to the generall another ring and a rubie in it. And when the generall tooke his leaue the king said vnto him: have you the Psalmes of David extant among you? The generall answered: Yea, and we sing them daily, Then said the king: I and the rest of these nobles about me will sing a Psalme to God for your prosperitie, and so they did very solemnly. And after it was ended the king said: I would heare you sing another Psalme, although in your owne language; So there being in the company some twelue of us, we sung another Psalme: and after the Psalme was ended the generall tooke his leaue of the king; The king shewed him much kindness at his departure: desiring God to bless vs in our iourney and guide us safely into our owne country, saying, if hereafter your ships returne to this port you shall find as good vsage as you haue-done; All our men being shipped, we departed the ninth of Nouember, being three ships, the Dragon, the Hector, and the Ascention. We kept company two days, in which time the generall dispatched his letters for England, and sent away the Ascention, she setting her course homeward toward the Cape of Buena Esperanza, and we along the coast of Sumatra, toward Bantam, to see if we could meete with the Susan, which had order to lade upon that coast.

J. N. DAS GUPTA.

## THE GLORIES OF THE SANSKRIT LITERATURE.

### VII.

Although Baladeva Vidyabhusan in commenting on the foresaid Sruti-text says, that the modifications included under the general term of Namarupa are brought about by Brahma, yet he is compelled to admit that Brahma in such cases is to be considered as endowed with the power called 'Jiva-Sakti.' আত্মনা জীবেনেতি সামানাধিকরণ্যেন জীবশক্তিমত্তব্যাপিনো ব্রহ্মণ এব তত্ত্বাভিধানাৎ।

গোবিন্দভাষ্যে।

There are other texts of an equally authoritative nature which do also support the conclusion arrived at by Ramanuj-Swami that the cosmic modifications are primarily brought about by Jiva. For example, the following may be cited :—

(১) জীবাৎ ভবন্তি ভূতানি। শ্রুতিঃ।

"All elements and elemental things originate from Jiva."—Sruti.*

(২) বিরিঞ্চো বা ইদং বিরেচয়তি বিদধাতি ব্রহ্মা বাব বিরিঞ্চ এতস্মাজ্জীবে রূপনামনী। শ্রুতিঃ।

"Birincha creates and supports all these ; Birincha is but another name of Brahma ; nama and rupa (*i.e.* the subjective and the objective world) take their rise from him"—Sruti.†

Brahma is but another name of Mahattatwa (মহত্তত্ত্ব) and is also known as Sutratma (সূত্রাত্মা) and Hiranyagarbha (হিরণ্যগর্ভ).‡ Brahma himself is described as a kind of Jiva and his world is said to be composed of the totality of the Jivas, as the following texts will show :—

(a) আপোময়মিদং সর্ব্বং আপো মূর্ত্তিঃ শরীরিণাম্।
তত্রাত্মা মানসো ব্রহ্মা সর্ব্বভূতেষু লোককৃৎ॥

মহাভারতম্।

In commenting on the second line of the couplet, Nilkantha remarks :—তত্রাপ্স্বাত্মা চিদ্রূপ পুরুষঃ মানসস্তদন্তর্গতে মনস্যভিব্যক্ত স এবোপাধিযোগাজ্জীবঃ স এব ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্তশ্চতুর্মুখো মুখ্যজীবঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিমত্ত্বাৎ। ইতি নৈলকণ্ঠিয়ে ভারতভাবদীপে॥

(b) স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে।

শ্রুতিঃ॥§

* ন ভূর্ন খং ভৌম্‌ তানি সর্বতো ন সুরাসুরাঃ।
নান্যদাসীদৃতে জীবমাসেদুর্ন তু সংহতম্॥ মহাভারতম্॥

† ত এতে ধাতবঃ পঞ্চ ব্রহ্মা যানসৃজৎ পুরা।
আবৃতা যৈরিমে লোকা মহাভূতাভিসংজ্ঞিতাঃ॥

মহাভারতম্॥

‡ (a) হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ বুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ।
মহানিতি চ যোগেষু বিরিঞ্চিরিতি চাপ্যজঃ॥

মহাভারতম্॥

(b) প্রজাপতির্বিরাট্‌ প্রোক্তো ব্রহ্মা সূত্রাত্মনামকঃ।

পঞ্চদশী॥

§ Vidyaranya-Swami in his Panchadasi denies the appellation of 'Jiva' as applied to Brahma on the ground that Brahma, although possessed of a subtle body (লিঙ্গদেহ) is not liable to Avidya or Ignorance :—

উদ্গীথব্রাহ্মণে তস্য মাহাত্ম্যমতিবিস্তৃতম্।
লিঙ্গদেহেঽপি জীবত্বং নাস্য কর্ম্মাদ্যভাবতঃ॥ পঞ্চদশী॥

কর্ম্মাদি is explained by Ramkrishna to include অবিদ্যা or ignorance, Kama or desire and Karma

" He is carried upwards by the Samamantras to the world of Brahma or Hiranyagarbha. Thus carried, he sees from that world—which is the receptacle of the totality of the Jivas—the supreme soul which impermeates everything."

Sankara explains **জীবঘনাৎ** as **সর্ব্বজীবাধারহিরণ্যগর্ভাৎ।** That is to say Hiranyagarbha or Brahma, who contains within himself all kinds of Jivas. Baladeva explains it as **সর্ব্বজীবাভিমানিনঃ চতুর্মুখাৎ,** that is to say Four-faced Brahma endowed with the totality of knowledge possessed by all the Jivas.* According to Panini the word 'Ghana' (**ঘন**) is affixed here in the sense of 'Murti' or shape.† In the vedas 'Hiranyagarbha' or Brahma is described as possessing an infinite number of organs such as eyes, faces, arms and feet as in the following text :—

**বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত**
**বিশ্বতস্পাৎ। শ্রুতিঃ॥**

In commenting on verse 48, Pt. I. chap. 9th of the Vishnupuran,‡ Sreedhar-swami cites a text without mentioning or deeds. But we think as Brahma himself is an individuality and as individuality signifies limitation, and limitation ignorance, therefore he cannot be ruled out of the category of Jiva, although he may be made up of the totality of all the Jivas. In the Vavishya-Puran, Brahma is included in those beings that are liable to Avidya or Ignorance :—

**আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তাঃ জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ।**
**প্রাণিনঃ কর্ম্মজনিত-সংসারবশবর্ত্তিনঃ॥**
**যতস্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ।**
**অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্ব্বে তে হি সংসারগোচরাঃ॥**
**ভবিষ্যপুরাণম্।**

(Compare also '**আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।' গীতা।**). Even Vidyaranya Swami admits that Brahma or Hiranyagarbaa or Sutratma is composed of the totality of the Jivas and as such is liable to Abhiman (**অভিমান**) or notion of individuality or separateness :—

**সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সর্ব্বজীবঘনাত্মকঃ।**
**সর্ব্বাহংমানধারিত্বাৎ ক্রিয়াজ্ঞানাদিশক্তিমান্॥ পঞ্চদশী।**

As for the **সার্ব্বজ্ঞ্য** or omniscience of Brahma quoted in Nilkantha's commentary on verse 22 of chap. 147, Cantiparva, Mahabharat, it is to be understood as used in a camparative sense and not in the sense of the absolute omniscience of the Supreme Lord or Paramatma.

* Not only is Brahma endowed with the totality of the knowledge possessed by all the Jivas, but these latter as 'Kshetrajnas' are said to have originated from his body :

**ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ। বিষ্ণুপুরাণম্॥**

This is explained by Sreedhar as follows :—

**তথা ধীমতঃ চেতনস্য সমষ্টিজীবস্য তস্য ব্রহ্মণো অবে-ভ্যোঽপি গাত্রেভ্যঃ উৎপদ্যমানৈর্দেহৈঃ তৎসম্বন্ধমাত্রাদ্ভূত-সংস্কারাধ্যস্তক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত আবির্ভূতা ইত্যর্থঃ। ইতি স্বামিকৃতবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং॥**

† **মূর্ত্তৌ ঘন ইতি পাণিনিঃ। মূর্ত্তৌকাঠিন্যেঽর্থেহভি-ধেয়ে হন্তের্ঘণ্ প্রত্যয়ো ঘনস্তাদেশো ভাবে ভাবিতি সূত্রার্থঃ। উদাহরণঞ্চ, দধিঘনঃ সৈন্ধবঘন ইতি। মূর্ত্ত্যভাবে প্রত্যয়া-দেশয়োরভিধানাদ্ঘনং দধীত্যাদি কথং প্রতীয় ইতি চেৎ সত্যম্। ধর্ম্মশব্দেন ধর্ম্মী লক্ষ্যতে ইতি। বেদান্তীয়ে গোবিন্দভাষ্যে।**

‡ The verse of the Vishnupuran referred to here is quoted below :—

**কারণং কারণস্যাপি তস্য কার্য্যকারণম্।**
**তৎ কারণানাং হেতুং তাং প্রণতাঃ স্ম সুরেশ্বরম্॥**
**বিষ্ণুপুরাণম্।**

In commenting on the above, Sreedhar-Swami remarks :—

**প্রকৃতেঃ পরোক্ষত্বাৎ প্রথমং ক্রিয়াশক্তিসূত্রং উৎপদ্যতে। ততো জ্ঞানশক্তি মহত্তত্ত্বং ততোঽহঙ্কার ইতি প্রক্রিয়ায়াং তৎকারণানাং ইত্যনেন বহুবচনান্তেন অহঙ্কারমহৎসূত্রাণাং গ্রহণম্। তদুক্তং "মহৎ মহত্ত্ব ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ সূত্রং**

the name of his authority, according to which such principles as Mahat and Ahankara are also to be regarded as Jivas; the text is cited below :— *

(3) "মহৎহঙ্কার ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ সৃজং মহানহমিতি প্রবদতি জীবং।" ইতি স্বামিকৃত বিষ্ণুপুরাণটীকোক্তবচনং।

To properly understand the texts cited above showing that the modifications of cosmic matter are brought about by the active interference of Jiva or Kshetrajna, it is necessary that we should have a clear notion of what is meant by the Rishis by the word 'Jiva' as used in such cases. From the texts quoted before from Panchadasi* and Mahabharat † it will be evident that the concept of Jiva is connected with a linga-deha or subtle body composed of the five subtle elements, an individual soul enclosed therein, the whole permeated by the universal soul or Paramatma.

The dimension of the Jiva is said to be of the minutest possible degree as the following texts will show :—

(1) বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥
শ্রুতিঃ।

"The dimension of the Jiva is like that of the hundredth part of the hundredth part of the topmost point of a hair, but although so infinitesimal in dimension it possesses potentiality enough to reach up to and be at one with the Infinite soul.—Sruti.

Baladeva explains আনন্ত্যায় as immortality (অমরত্ব). The other meaning is according to Nilkantha.

(2) অস্তি খল্বপরো ভূতাত্মা। শ্রুতিঃ।

"There is another kind of soul called 'Bhutatma' which is very minute in dimension"—Sruti. 'Bhutatma' of the text is the same thing as "Jiva or Jivatma."

(3) অণুং বদন্ত্যান্তরালাঃ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারতঃ।
রোম্ণঃ সহস্রভাগেন তুল্যাসু প্রচরত্যয়ম্॥
পঞ্চদশী।

"The antaralas say that from the fact of atma's (*i. e.* individual soul's) wandering over very fine pulses—in fact so fine that the dimension of each of them may be likened to that of the thousandth part of a hair divided lengthwise—it is to be inferred that the individual soul or Jiva must also be of very small dimension"—Panchadasi. (Vide also Vedanta-Darsan, chap. II. sec. iii. sutras 18, 19, 20 and 21).

Texts have been cited before to show that Jiva as kshetrajna is possessed of cognitive faculty, although that faculty being restricted to the special knowledge of the special attributes of matter is

---

মহানহমিতি প্রবদতি জীবং।" ইতি স্বামিকৃতবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং॥

As Brahma, Hiranyagarbha or Sutratma is the immediate creator of the universe, it follows as a corollary that Jiva is the proximate cause of the heterogeneity of the universe.

* চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ।
চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসংঘো জীব উচ্যতে॥
পঞ্চদশী।

† তেষাং মিশ্রাং যথা বিদ্যো ভূতাত্মা সততং গুণৈঃ।
সততিষ্ঠিতঃ পৃথক্ত্বেন্দ্রিয়গ্রামৈঃ॥ মহাভারতম্।

parviscient in nature in contradistinction to the omniscient and knowledge of the Supreme Lord. That it is a sentient being and its knowledge a limited one is also corroborated by the following texts :—

(১) চিত্তিমত্ত্বাচ্চেতনোঽয়মিচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নবান্ ।
পঞ্চদশী ।

"The individual soul is sentient because it is possessed of the quality of consciousness and also because it can desire, hate and make efforts"—
Panchadasi.

(২) জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ । শ্রুতিঃ ।

" There are two souls, both eternal, one omniscient another parviscient, one controller and the other controlled."— Sruti.

As regards the eternity of the individual soul there is much diversity of opinion regarding the meaning to be attached to it when considered eternal. According to Vidyaranyaswami, the author of the Panchadasi, the duality of the Soul is both Scriptural and Non-Scriptural and that both the views are to be entertained so long as their real nature is not known for want of the dawn of supreme knowledge (তত্ত্বজ্ঞান).* Others say that as primordial matter considered as a power of the Supreme Lord is said to be eternal, so Jiva being but another power of the same is also eternal †. In this case Jiva is identical with the cognitive faculty or 'kshetrajna-Sakti' of the creator. While a third party says that as Jiva is really a part and parcel of the omniscient and omnipotent soul, loosely attached, for the time being to matter which is essentially different from it and which somehow or other obscures its omniscience by making it parviscient, therefore it is essentially identical with the omniscient soul. ‡

(৩) অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা । বেদান্তদর্শনং ॥

" If it assumed that the Supreme Lord has a material body and is liable to the

---

* জীবদ্বৈতং তু শাস্ত্রীয়মশাস্ত্রীয়মিতি দ্বিধা ।
উপাদদীত শাস্ত্রীয়মাতত্ত্বস্যাববোধনাৎ ॥ পঞ্চদশী ॥

† এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ শ্রুতিঃ ॥

(b) নাত্মাশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ । বেদান্তদর্শনং ॥
Baladeva commenting on the Sutra remarks :—
আত্মা জীবো নৈবোৎপদ্যতে । কুতঃ শ্রুতেঃ । তথা তাভ্যঃ শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিত্যত্বপ্রতীতেশ্চ ; চেতনত্বং চ শব্দাৎ । কথং তর্হি শ্রুতি প্রতিজ্ঞাসুপরোধঃ । ইত্থং জীবস্যাপি কার্য্যত্বাৎ তদুৎপত্তিরিতি । সূক্ষ্মোভয়শক্তিকং ব্রহ্মৈবাবস্থান্তরাপন্নং কার্য্যং স্যাৎ । ইয়াংস্তু বিশেষঃ । প্রধানাদেরচেতনস্য ভোগ্যত্বস্য স্বরূপেণান্যথাভাবঃ জীবস্য তু ভোক্তুর্জ্ঞানসঙ্কোচবিকাশাভ্যামেবেতি । উভয়ত্রাপি কার্য্যত্বেনোভয়ৈক্যাৎ সা নোপরুধ্যতে । তস্মাৎ জীবস্যোৎপত্তির্নেতি । ইতি বেদান্তীয়ে গোবিন্দভাষ্যে ।

‡ (a) যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ শ্রুতিঃ ॥

(b) তথা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিসংজ্ঞাবরোধাদগো গুণাঃ ।
প্রকাশন্তে ন জন্যন্তে নিত্যা এবাত্মযোনিতঃ ॥
বিষ্ণুপুরাণম্ ॥

It is very probable that the Rishi-Sutrakar of the Vedanta-Darsan holds to the theory of the eternal distinction between Jiva (individual soul) and Paramatma (Uuiversal Soul) ; for in chap. IV. sec. iv., he distinctly lays it down in the 17th Sutra ( viz "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ ।" ) that the individual Soul emancipated from its material environment may equal the

influence of karma or Fate, then every distinction between Him and the Jiva disappears and He becomes parviscient and mortal like the Jiva, whereas the Srutis say that the Supreme Lord is omniscient and indestructible."—

Vedanta Darsan.

The majority of the Indian philosophers do also hold that the Jivas though infinitesimal in dimension are of innumerable variety and that the variation is brought about by 'Adrista' or Fate. The following texts may be cited as probative of the points raised here :—

(১) তদেবং বহূনাং ক্ষেত্রজ্ঞানামধিষ্ঠানং সমুদ্র ইবৌদকানাং ভাবানাং। সুশ্রুত-সংহিতা।

" As the ocean is the great reservoir of all kinds of water—be they river-water, stream-water or rain water—so Primordial Matter is the great stay of numerous individual souls called 'kshetrajnas"—Susruta-sanhita.

(২) নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। শ্রুতিঃ।

" The Universal Soul is the most eternal of the eternals (*i. e.* individual souls) and the most sentient of the sentients, which although without a second, fulfils the desires of many"—Sruti.

Supreme Lord in all His powers except His absolute power of controlling and directing all things material or immaterial or both, as well as the evolution and involution of the uuiverse. Besides, the assumption of a plurality of individual souls identical in all respects with the Supreme Lord leads one to the further assumption of a plurality of Supreme Lords, which is contradictory to the monistic theory of the Srutis.

(৩) অদৃষ্টানিয়মাত্। বেদান্তদর্শনম্।

To the question that although the Jivas are many in number they may possess the same quality and character, the vedantists answer that owing of the differentiation of Adrista or Fate, the Jivas are generically, specifically and individually different from each other.*

Now 'Adrishta' is but another name of 'karma' and as such is held to be without beginning.† But even such karma is said to owe its first initiation to the Supreme Lord as the following texts will testify :—

(ক) তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ। শ্রুতিঃ।

" Being superdirected by the Supreme Lord karma evolves in this world."—

Sruti.

(খ) কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।

গীতা।

'Know that karma (deed) arises from Brahma from the everlasting, eternal God'—Gita.

* Differences are said to be of three kinds, viz স্বগত or individual, সজাতীয় or specific and বিজাতীয় or generic. These are exemplified in the following couplet quoted from Panchadasi :-.

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥ পঞ্চদশী॥

† (a) কর্ম্ম চ অদৃষ্টাদিপদব্যপদেশ্যমনাদি বিনাশি চ ভবতি। ইতি বেদান্তীয়ে গোবিন্দভাষ্যে।

(b) ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ। বেদান্তদর্শনং॥

(*To be continued.*)

GOVINDA CH. MUKHERJEE.

# ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৫ম খণ্ড। ঢাকা—মাঘ, ১৩২২। ১০ম সংখ্যা

## বৈষ্ণব-পদাবলীর রস-বৈচিত্র।

### ( সখ্য-রস )

অদ্য আমরা বৈষ্ণব-পদাবলির সখ্য-রসের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের মধ্যে বলরাম ও সুবলের সখ্য-ভাবে কিছু বিশেষত্ব আছে। সুবলের কথা পরে বলিব। অগ্রজ বলরাম সখা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সহচরবর্গের ভক্তি-ভাজন; তাই মা যশোদা তাঁহার গোপালকে বনে পাঠাইতে যাইয়া, আর কাহারও নিকট গোপালকে দিয়া বিশ্বাস পান না,—শুধু বলরামের হাতে সঁপিয়া দিয়াই কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হন। বলরামও তাই নানা প্রবোধ বাক্যে মা যশোদাকে আশ্বস্ত করেন। আজ মা যশোদা গোপালকে বনে পাঠাইতে একান্তই শঙ্কিত হইতেছেন দেখিয়া দাদা বলরাম তাঁহাকে বলিতেছেন —

"নন্দরাণি গো মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
বেলি অবসান কালে গোপাল আনিয়া দিব
তোর আগে কহিনুঁ নিশ্চয়॥
সোঁপি দেহ মোর হাতে আমি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমরা জীবন হৈতে অধিক জানি যে গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥
সকালে আনিব ধেনু বাজাইয়া শিঙ্গা বেণু
গোচারণ শিখাব ভাইয়েরে।
গোপ-কুলে উতপতি গোধন-চারণ বৃত্তি
বসিয়া থাকিতে নাই ঘরে॥"

বলরামের এই সকল প্রবোধ-বাক্যে মা যশোদা অনেক-পরিমাণে আশ্বস্ত হইয়াছেন, গোপালকে গোধন-চারণ জন্য বনে না পাঠাইলে নহে ভাবিয়া গোপালকে রাখাল-বেশে সাজাইতে যাইতেছেন, কিন্তু

"আভরণ পরাইতে আভরণের শোভা।
প্রতিঅঙ্গ চুম্বইতে মনে হয় লোভা॥
বান্ধিতে বিনোদ চূড়া নিরখিতে কেশ।
আঁখিযুগ ঝরঝর না হইল বেশ॥"

এ ভাবে কি বেশ-রচনা শেষ হয়? তাই—

"যতনে কানাই-চূড়া বলাই বান্ধিল।

অঙ্গদ বলয়া হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জাহার॥
পীতধড়া আঁটিয়া পরায় কটি-তটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পীঠে॥"

তাই শ্রীদাম দেখিলেন দাদা বলাইর দ্বারা সকল কাজ সম্পন্ন হইবে না; তাই—

"ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরিয়া॥"

শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে কিরূপে বনে যাইতেছেন তাহার একটি চিত্র দেখুন—

"প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় ধেনুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-ক্ষুর-রেণু
শুনি সভার হরষিত মন॥
আগে আগে বৎসপাল পাছে ধায় ব্রজ-বাল
হৈ হৈ শবদ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে যে বলরাম
ব্রজ-বাসী হেরিয়া বিভোর॥
নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর-বেশ।
আসিয়া যমুনা-তীরে নানা রঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ॥
কেহো যায় বৃষ-ছান্দে কেহো কারো চড়ে কান্ধে
কেহো নাচে কেহো কেহো গায়।
এ দাস মাধব বলে কি শোভা যমুনা-কূলে
রাম কানাই আনন্দে খেলায়॥"

এখন পদ-কর্ত্তা মাধব দাসের অঙ্কিত রাম ও কানাইর খেলার একটি চিত্র দেখুন—

"সকল রাখাল মেলি খেলা আরম্ভিল।
রাম কানাই দুই ভাই দুইদিগে দাঁড়াইল॥
শ্রীদামে কানাইয়ে খেলা বলাইয়ে সুবলে।
এই মত আর সব শিশুগণ খেলে॥
কানাই হারিয়া কান্ধে করয়ে শ্রীদামে।
সুবল হারিয়া কান্ধে করে বলরামে॥
বংশী বটের তলে রাখিবারে যায়।
হেরি সব শিশুগণ শিঙ্গা বেণু বায়॥
শ্রীদাম কানাইর কান্ধ হইতে নামিল।
আবা আবা রব দিয়া নাচিতে লাগিল॥"

যে বালক-রূপী ভগবান্ নিজের অলৌকিক বল-বীর্য্য দ্বারা ব্রজ-ধামের কত প্রবল শত্রু পরাজিত করিয়া ব্রজবাসীর জীবন দান দিয়াছেন, তিনি যে কিজন্য ভাই শ্রীদামের সহিত ক্রীড়ায় হারিয়া তাঁহাকে কান্ধে করিতেছেন,—পদ-কর্ত্তা আমাদিগকে সেই রহস্যটি বুঝাইয়া বলিতেছেন—

"এ দাস মাধব বলে অপরূপ নহে।
প্রেমের অধীন কানাই সাধু লোকে কহে॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটি তাঁহার সখাগণের সকল সময়ে ভাল লাগে না; তাই আর একদিন শ্রীকৃষ্ণের খেলার সাথী শ্রীদাম খেলায় হারিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিরূপ প্রেমাভিমান-পরায়ণ হইয়াছেন তাহার একটি চিত্র দেখুন—

"আজি খেলায় হারিলা কানাই।
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশী বটের তলে যাই॥ ধ্রু॥
শ্রীদাম বলাই লইয়া চলিতে না পারে ধাঞা
শ্রম-জল-ধারা পড়ে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানাইর সঙ্গে॥
কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তভু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইর কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘন-শ্যাম॥
মত্ত বলাই-চান্দে কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে
ঘনরাম দাস দেখি কয়॥"

যেরূপ সর্ব্বদা হয়, সেরূপ আজও শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাস্পদের মান বাড়াইবার জন্য খেলায় হারিয়া শাস্তি স্বরূপ নিজে প্রিয়তম ভাই সুবলকে কান্ধে করিয়া তাঁহাকে বংশী-বটের

ছায়াতে রাখিতে যাইতেছেন! যিনি হেলার সহিত বাম-হস্তে বিশাল গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে ছত্রের ন্যায় ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছেন আজ শিশু লীলার অনুরোধে ক্ষুদ্র সুবল ভাইটিকে স্কন্ধে ধারণ করিতে যাইয়া তিনি অক্ষমতার অভিনয় করিয়া কটিতে বস্ত্র আঁটিয়া বান্ধিতেছেন! দাদা বলাইকেও তিনি কান্ধে লইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু দাদা বলাই যে নিজের সুপুষ্ট দেহের ভার প্রিয়তম ভাইটির স্কন্ধে প্রাণান্তেও দিবেন না,—এ অবস্থায় কৃষ্ণ কি করিবেন? অগত্যা তাঁহার ক্রীড়ার সাথী শ্রীদামকেই বলাই দাদাকে স্কন্ধে বহন করিতে হইতেছে; কিন্তু সে ভার বহন করা ত সহজ নহে! শ্রীদাম বলাইকে কান্ধে করিয়া অতি কষ্টে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছেন; তাঁহার শ্রম-জলে অঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে; তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমাভিমান করিয়া বলিতেছেন—আর কখনও কানাইর সাথী হইয়া খেলিব না; আবার যখন খেলিব—তখন বলাইর সাথী হইব; কেন না—কানাই কখনও খেলায় জিতেন না—জিতিতে পারিলেও কি জানি কি জন্য ইচ্ছা করিয়া হারেন; সুতরাং বলরাম হারিবার উপক্রম হইলেও শেষে জিতিয়া যান! বলাইর সাথী হইয়া খেলিলে দুই রকমেই সুবিধা হইবে। বলাইর সাথী হইলে খেলায় জিতিয়া, হয় কানাইর কান্ধে চড়িব—না হয় ত খেলায় হারিয়া প্রাণের ভাই কানাইকে কান্ধে লইব—যে রূপেই হউক না কেন কানাইর অঙ্গ-স্পর্শ ত ঘটিবে?

ঘনরাম দাস অল্প কয়েকটি কথার ইঙ্গিতে শ্রীদামের কৃষ্ণপ্রেম যেরূপ উজ্জ্বল-ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন তাহা অতি অপূর্ব্ব! 'খেলিয়া বলাইর সঙ্গে, চড়িব কানাইর কান্ধে, নহে কান্ধে নিব ঘন-শ্যাম' বাক্যটি অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রজ-বালকদিগের এই ক্রীড়ার স্থল যমুনার পুলিন—

"ভাগ্যবতী যমুনা মাই।
যার একূলে ওকূলে ধাওয়া ধাই॥
শ্বেত শাঙল দোন ভাই।
যার জলে দেখে আপন ছাই॥"

ক্রীড়ায় ভঙ্গীই বা কত? পরিশ্রান্ত ও পিপাসিত হইয়া যমুনার জল-পান করিতে যাইয়া যমুনার নীলাভ জলে আপনাদের শ্বেত ও শ্যামল ছায়া দেখিয়া বলাই ও কানাই-এর কৌতুকই বা কত? কিন্তু বেলা অবসান-প্রায় হইয়াছে গোচারণ শ্রম ও নানাবিধ ক্রীড়ায় সকলেই পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন; তাই এখন বন-ভোজনের অনুষ্ঠান হইতেছে; তাহাই বা কত মধুর! একটি চিত্র দেখুন—

"খেলা সমাধিয়া শ্রমযুত হৈয়া
সখাগণ লৈয়া সঙ্গে।
ভোজন-সম্ভার ছিল ভারে ভার
ভোজনে বসিল রঙ্গে॥
যমুনা-পুলিনে বেড়ি সখাগণে
মাঝে করি বৈসে কানু।
পাড়ি বন-পাত তাহে নিল ভাত
জল ভরি শিঙ্গা বেণু॥
সব সখা মেলি করিয়া মণ্ডলী
ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল কৈয়া মুখ হৈতে লৈয়া
সভে দেই কানু-মুখে॥
সভে কহে ভাই আমার কানাই
মোরে বড় ভাল বাসে।
আমার সম্মুখে বসি খায় সুখে
সদা রহে মোর পাশে॥
এহি করি মনে করয়ে ভোজনে
আনন্দ-সাগরে ভাসে।
বিশ্বম্ভর দাস করি মনে আশ
রহে সুবলের পাশে॥"

আমরা বলিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলরামের ও সুবলের সখ্যভাবের কিছু বিশেষত্ব আছে। বলরামের বিশেষত্ব কি, পদ-কর্ত্তাদিগের বর্ণনায় পাঠকবর্গ তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন; সুবলের সখ্য-ভাবে কি বিশেষত্ব তাহা এখন বুঝা আবশ্যক; নতুবা কি জন্য যে পদ-কর্ত্তা বিশ্বম্ভর দাস মনে কি এক গূঢ় আকাঙ্ক্ষা করিয়া, অন্যান্য সকলকে ছাড়িয়া সুবলের পার্শ্বে রহিলেন তাহার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না।

শ্রীকৃষ্ণ সমদর্শী হইলেও তাঁহার প্রতিজ্ঞা—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।' সুবল সখাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃ-কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার হৃদয়টি যেন প্রেমামৃত দিয়া গড়া; কিসে শ্রীকৃষ্ণের ক্লেশ ও কিসে তাঁহার আনন্দ—ইহা সুবল যেমন বুঝিতে পারেন, এরূপ আর কেহ পারেন না। ইহা পারেন বলিয়াই যে দিন কালীয়-দমন-সময়ে হ্রদ-তীরে সমাগত ব্রজাঙ্গনাদিগের মধ্যে অসমোর্দ্ধ-রূপ-লাবণ্যবতী শ্রীরাধাকে দৃষ্টি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিমোহিত ও হৃত-চিত্ত হইয়া সাধের মুরলী-বাদন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, সেই দিন শ্রীকৃষ্ণের মলিন-কান্তি মুখের দিকে চাহিয়া কোমল-হৃদয় সুবলের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; তাই তিনি প্রাণের সখাকে অন্যের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন—

"অনুখণ হেরিয়ে তোহে আন-চিত।
দূরে গেও মুরলি-আলাপন গীত॥
মরম না কহ কেন প্রাণ-সাঙ্গাতি।
তুয়া মুখ হেরি জলত মঝু ছাতি॥"

শ্রীকৃষ্ণও প্রিয় সখার সেই আকুল সমবেদনায় উপেক্ষা করিতে পারেন নাই,—তাই লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট সকল কথা—হৃদয়ের সকল আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই রহস্য সুবল ব্যতীত আর কেহই জানেন না; তাই যখন শ্রীরাধার জন্য হৃদয় বড় আকুল হয়, শ্রীকৃষ্ণ সুবলের নিকট মনের কথা বলিয়া মনে একটু শান্তি লাভ করেন। কেবল ইহাই নহে। সুবলের আকৃতি অনেকটা শ্রীরাধার ন্যায় এবং তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তিও অসাধারণ। সুবল নিজে শ্রীরাধার বেশভূষা পরিধান করিয়া শ্রীরাধার গৃহে থাকিয়া শ্রীরাধাকে নিজের বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া সঙ্কেত-কুঞ্জে কতদিন কত কৌশলে অভিসারে প্রেরণ করিয়া প্রিয় সখার ও প্রিয়সখীর অতুলনীয় প্রীতি সাধন করিয়াছেন! সুবলকে দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের রাধা-ভাবের উদ্দীপন হয়; সুতরাং এ অবস্থায় তিনি যে সখাগণের মধ্যে সমধিক সৌভাগ্যশালী ও শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রেম-বিশ্রম্ভের পাত্র হইবেন—তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? পদকর্ত্তা বিশ্বম্ভর সুবলের এই সৌভাগ্যের বিষয় ভালরূপেই জানেন, তাই আজ বন-ভোজন-লীলায় তিনি মনে কোন গূঢ় অভিপ্রায় পোষণ করিয়া, সুবলের পাশে সুবলের অনুগত হইয়া রহিয়াছেন। দুঃখের বিষয় যে, বিশ্বম্ভরের স্ব-রচিত পদে আমরা তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায়টী জানিবার সুযোগ পাই নাই; কিন্তু তাঁহারই সম-ধর্ম্মা পদকর্ত্তা উদ্ধবদাসের বর্ণিত পরবর্ত্তী পদ হইতে আমরা তাহার মনের ভাবটি টের পাইয়াছি।

ভোজন করিতে করিতে সুবলের একটি আবদার মনে হইয়াছে; তাই তিনি প্রিয় সখাকে বলিতেছেন—

"তোর আইঠ বড় মিঠ লাগে কানাই রে।
খাইতে বড় সুখ পাই তেঞি তোমার আইঠ খাই
খেতে খেতে যেতে হৈতে দিতে হইল ভাই রে॥
ও রাঙ্গা অধর মাঝে না জানি কি মধু আছে
আমরা তোর চাঁদমুখের বালাই খাইরে।
এই উপহার নেও খাইয়া আমাদিগে দেও
এ দাস উদ্ধবে কিছু দিতে চাইরে॥"

তখন—

"ভোজন সমাপি সবহুঁ ব্রজ-বালক
বৈঠল নীপক ছায়।
কালিন্দি-নীর সমীর বহই মৃদু
শীতল করু সব গায়॥"

পুনশ্চ—

"নব নব পল্লব সেই সখাগণ
বীজই দুহুঁ জন-অঙ্গে।
কোকিল ভ্রমর কানু-মুখ হেরি হেরি
গাওই শবদ-তরঙ্গে॥
আলস তেজি বৈঠল নন্দ-নন্দন
ঘুরহিঁ গেও সব ধেনু।
হেরইতে যতনে এক যোগ কারণে
বাওই মোহন বেণু॥"

আমরা এখন শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুর রবে উন্মত্তা হইয়া ব্রজাঙ্গনারা যে যমুনা-পুলিন-স্থিত মঞ্জু নিকুঞ্জে অভিসার করিতেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

আবরা সঙ্গীত-প্রিয় অনেক পুরুষকেও সমধুর সঙ্গীত-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া গায়ক কিংবা বেণু-বাদকের পশ্চাদনুসরণ করিতে দেখিয়াছি! আবার সেখানে কোন ধ্বনি প্রিয়তমের সঙ্কেতের সূচনা করে, সেখানে ধ্বনি মিষ্ট হউক কি কটু হউক প্রণয়িনীর কর্ণে যে তাহাতে অমৃত বর্ষণ করিবে, তাহাতেই বা কি সন্দেহ আছে? তাই ত সুরসিক প্রাকৃত-কবি লিখিয়াছেন—

'"বাণীর-কুডঙ্গোড্ডীন সউণি-কোলাহলং সুণন্তীএ।
ঘর-কম্ম-বাবড়াএ বহুএ সীঅন্তি অঙ্গাইঁ॥'

অর্থাৎ—

সঙ্কেত-বেতস-কুঞ্জ 'পরে শুনি পক্ষি-গণ-কোলাহল।
গৃহ-কর্ম্ম-রতা অঙ্গনার অঙ্গ সব হইল বিকল॥

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনিতে ব্রজাঙ্গনারা বিমোহিত হইবেন ইহা আর বিচিত্র কি? শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনির চমৎকারিত্ব এই যে, তাহাতে পশু, পক্ষী, এমন কি তরু-লতা পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়াছে। তাই বৈষ্ণব-কবি লিখিয়াছেন—

"মুরলীর আলাপনে	পবন বহিয়া শুনে
যমুনায় বহয়ে উজান।
না চলে রবির রথ	বাজী নাহি পায় পথ
দরবয়ে দারু পাষাণ॥"

তাই আজ—

"ধেনু না দেখিয়া বনে	চকিত রাখালগণে
শ্রীদাম সুদাম আদি সভে।
কানাই বলিছে ভাই	খেলা ভাঙ্গা হবে নাই
আনিব গো-ধন বেণু-রবে॥
সব ধেনু নাম কৈয়া	অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পূরিল উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব	ধায় ধেনু বৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
ধেনু সব সারি সারি	হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ-স্রবি পড়ে বাঁটে	প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাবী শ্যাম-অঙ্গ চাটে॥
দেখি সব সখাগণ	আবা আবা ঘনেঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী	কানাইর মুরলি শুনি
পশু পাখী পাইল চেতন॥"

যেই দেশের ঋষিগণ লোকোত্তর প্রতিভার বলে জড়-জগতেও চৈতন্যের গূঢ় সত্তার উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন—সর্ব্ব-ভূতে এক পরমাত্মার লীলার বিকাশ ও লীলা দেখিয়া সম-স্বরে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই অপূর্ব্ব সত্যের ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের অবতার-লীলায় এই বিশ্ব-প্রেমের বিকাশ না হইলে আর কোথায় তাহার বিকাশ হইবে?—সেই দেশের কবি এই বিশ্ব-প্রেমের মধুময় চিত্র অঙ্কিত করিতে না পারিলে আর কে তাহা অঙ্কিত করিবেন? যাঁহার কৃপায় ভগবানের এই সুমধুর মানুষ-লীলা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে, সেই ঋষির চরণে আমরা কোটি কোটি নমস্কার করি; যে বৈষ্ণব-কবিগণের প্রসাদে সেই লীলা আমাদিগের এরূপ সুখ-বোধ্য হইয়াছে, তাঁহাদিগের চরণে আমরা কোটি কোটি নমস্কার করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

# ভেলা।

( গীতি গল্প )।

[ প্রাচীন কালে কাছাড় ও দক্ষিণ শ্রীহট্টের মাঝখানে একটী সুসভ্য জনপদ ছিল। ইহার একপ্রান্তে ছিল উনকোটী আর অপর প্রান্তে ছিল ভুবন। ভুবনের উপরে বিস্তৃত সুরঙ্গ পথ এখনও রহিয়াছে, আর উনকোটীর পাহাড়ের গায়ে খোদা উনকোটী দেব দেবীর মূর্ত্তি এখনও বিলীন হইয়া যায় নাই। বহুপরে এখানে কিছুকাল ত্রিপুররাজগণের রাজধানী স্থাপিত ছিল, কিন্তু বঙ্গে মুসলমান আক্রমণ কালে ত্রিপুররাজগণ (১) দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করায় এই অঞ্চল শ্রীহীন ও অরণ্যে পরিণত হইয়া যায়। বর্ত্তমান কালে লোকবাসের জন্য এই অঞ্চলের হাওর (২) বা সমতল ভূমি আবাদ হওয়ায় প্রাচীন কালের কত চিহ্ন—কত দীঘী, বাঁধা ঘাট, গৃহভিত্তি, ও ইষ্টকস্তূপ লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে! এই অঞ্চলের অধিকাংশ এখন ধর্ম্মনগর নামে পরিচিত। প্রাচীন ধর্ম্মনগরের লোক অসভ্য ছিল না—তাহারা সমতলে স্থায়িভাবে বাস করিত, পাহাড়িয়া লোকের মত "টীলার (৩) উপরে মাচান বাঁধিয়া ছড়ার (৪) জলপান করিয়া দিন কাটাইত না! ধর্ম্মনগর হইতে রাজধানী উঠিয়া গেলে কিছুকাল চারিদিকে অরাজকতা বিস্তার লাভ করে। ইহার পরে এইস্থান কুকীগণের অত্যাচারে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়।

কাছাড় হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বহুল প্রচলিত একটী প্রাচীন গ্রাম্য গীতি আজিও এই যুগের একটী চিত্র সজীব রাখিয়াছে। এই কাহিনীর নায়িকা সোনাবারুইর নামক জনৈক সম্পত্তিশালী গৃহস্থের একমাত্র দুহিতা ভেলা। শিলচর হইতে পাঁচ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে বরাক নদীর তীরে সোনাবারুইর ঘাট এখনও তাহার স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। গল্পের নায়ক মদন হাওলদার, সরলচিত্ত পিতৃহীন ধনি সন্তান, কালারাজা নামক এক-ক্ষুদ্র রাজার ভাগিনেয়। মদনের প্রতিদ্বন্দী ক্রূরমতি পিরুরাজা স্থানীয় অধিপতি। সকলেরই নিবাস ধর্ম্মনগরের পূর্ব্ব সীমান্তে—বর্ত্তমান কাছাড় জিলায়। কাছাড়ে প্রচলিত গীতি অবলম্বনে গল্পাংশ রচিত হইল।]

সোণাবারুই ও রূপাবারুই দুই ভাই। সোণার পাঁচছেলে কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার কোনও কন্যা সন্তান হয় নাই; তাই তাহার "ঝি আটকুড়ে" নাম ঘুচে না। তাহাদের বাড়ীর পাশ দিয়াই সাধু সন্ন্যাসিগণ পর্ব্বত চূড়ায় বাবা ভুবনের দর্শনে যাইতেন। বারুই পত্নী সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের নিকট হইতে কত তাবিজ কবজ আনিয়া সযত্নে ধারণ করিতেন। তবুও হাতের জল শুদ্ধ হইল না! অবশেষে রূপসী তীর্থে বারুই-পত্নী হত্যাদিলেন। বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষ, তথায় দেবী অধিষ্ঠান করেন। দেবী স্বপ্নে আদেশ করিলেন "আমার আসনে বসিয়া প্রতি অমাবস্যায় একবার আমার কথা পাঁচটী এয়োকে শুনাইও তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে"। আঠারমাস পরে সত্য সত্যই দেবীর কৃপায় বারুই পত্নীর সন্তানসম্ভাবনা হইল। বুঝি এতদিনে "ঝি আটকুড়ে" অপবাদ ঘুচিল!

বারুই ভারী খুসী হইলেন, তাই কোন অনুষ্ঠানেরই ক্রটী করিলেন না। চতুর্থমাসে বালুহীন সুগন্ধমাটী আনাইয়া বাড়ীতেই উৎকৃষ্ট "শিক্রিমাটী" তৈয়ারী করাইলেন। তার পর ছয়মাসে ষষ্ঠীপূজা, সাত মাসে সাবিত্রী ব্রত, আট মাসে অষ্টমী পূজা, নয় মাসে সাধ ভক্ষণ, একে একে সকলই সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। দশমাস দশদিন পরে সোণাবারুইর ঘরে রূপসী দেবীর মত পরমাসুন্দরী এক কন্যা জন্মিল। মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল; নট, ভাট, গাইন, একে একে অপূর্ব্ব গায়নের সৃষ্টি করিল। বারুইর ঘরে কন্যা হইয়াছে শুনিয়া আচার্য্য দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি পুথি হাতে করিয়া উপস্থিত হইলেন। গোয়ালার ছেলে দুগ্ধ উপহার লইয়া আসিল। আর মালীর ছেলে আনিল—রঙ্গন, কেওয়া, কেতকী ও নাগেশ্বর ফুল। প্রাঙ্গনে 'নেতের'

---

(১) পৌরাণিক ত্রিপুররাজ্য জব্বলপুরের নিকট নর্ম্মদা তীরে। এস্থলে আধুনিক ত্রিপুররাজ্যের কথা বলা হইতেছে।

(২) সাগর—হাগর—হাওর—জলাই সমতল ভূমি।

(৩) টীলা—ক্ষুদ্র খণ্ড পর্ব্বত।

(৪) ছড়া—স্রোত, ঝরণা।

শ্বেত পতাকা চারিদিকে শুভ সংবাদ প্রচার করিতে লাগিল।

চারিদিনের দিন "গোয়ালিনী" ভার লইল—নবজাত শিশুকে গোদুগ্ধের পরিবর্ত্তে মাতৃস্তন্য পান করিতে দেওয়া হইল। ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজা। সারা রাত্রি ঘিয়ের বাতি জ্বালাইয়া বারুইপত্নী মেয়ে কোলে করিয়া রাখিলেন। শেষ রাত্রে সবে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, অমনি বিধাতাপুরুষ সুযোগ বুঝিয়া শিশুর কপালে লেখনী ধরিলেন—ভালমন্দ সব লিখিয়া ফেলিলেন। প্রভাত হয় হয় এমন সময় বিধাতাপুরুষ চলিয়া যাইবেন, সহসা বাতী নিবিয়া গেল। বারুইপত্নীরও তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে দরজা আগলাইয়া বিধাতার নিকট মেয়ের বিধিলিপি জানিতে চাহিলেন। বলিলেন "ঠাকুর কি লিখ্‌লে তা না বলত তোমাকে স্ত্রীবধের ভাগী হইতে হইবে।" সতীর প্রার্থনা, অগত্যা বিধাতাপুরুষ বলিলেন "কন্যা রূপসী-দেবীর ন্যায় সুন্দরী আর বিপুলার ন্যায় সতী বলিয়া চিরদিন পূজিত হইবে। কিন্তু উহার সৌন্দর্য্য সযত্নে ঢাকিয়া রাখিও, নতুবা কন্যার রূপই তাহার কাল হইবে "

নবজাত শিশুর নাম রাখা হইল রূপসী—সেত রূপসীদেবীরই দান আর বেহুলার মত সতী হইবে বলিয়া ডাক নাম হইল ভেলা। বার মাসের তের পার্ব্বণ নিয়াই বালিকা ব্যস্ত। ব্রত নিয়ম আচরণে বালিকা তন্ময় হইয়া যাইত। বৈশাখী ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, আষাঢ়ী পূর্ণিমা ব্রত, নাগপঞ্চমী, কার্ত্তিকব্রত, রাউলের ব্রত প্রভৃতি বারমাসের ব্রত নিয়ম বালিকা প্রাণ ঢালিয়া অনুষ্ঠান করিত। পরিধানে মলিন বস্ত্র, রুক্ষকেশ, গায়ে ভস্ম কিন্তু বালিকার সেইদিকে একটুকুও ভ্রুক্ষেপ নাই।

বালিকার বয়স তখন সাত বছর। বালিকা ভাবিল, একদিন সমারোহের সহিত শিবপূজা করিবে, স্নানান্তে নিজ হস্তে পুষ্পচয়ন করিবে। আজ মা মেয়েকে সাজাইয়া দিলেন। আঁবের চিরুণী দ্বারা চুল বেশ করা হইল, পকপাক দেওয়া মোহন খোপার উপর সুগন্ধ পঙ্কফুল শোভা পাইতে লাগিল। ভস্মের পরিবর্ত্তে আবার চন্দনে দেহ সিক্ত হইল। আর "ভুটিয়া" কাপড়ের পরিবর্ত্তে দশ অবতার অঙ্কিত বিচিত্র সাড়ী পরিধানে, তার উপর আঁবের উড়নী। কপালে কপোলে বিচিত্র পত্রাবলী মেঘাবৃত চাঁদের মত শোভা পাইতে লাগিল। সিঁথীর মধ্যে সিন্দুরের রেখা অমানিশা রাত্রের বিজুলীর মত ঝলমল করিতে লাগিল। নাসিকায় বেশর, কর্ণে কুণ্ডল, পায়ে রুণুঝুণু নেপুর, আর হাতে ফুলের সাজি।

সেদিন ধনী সওদাগরের ছেলে মদন হায়দার মাতুল বাড়ী হইতে ঘোড়া চড়িয়া আসিতেছিল। পথে বারুইর "জাঙ্গালে" ঘোড়া বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল। বালিকা অদূরে পুষ্পবাটিকায় মনের সাধে সাজি ভরিয়া ফুল তুলিতেছিল। সহসা তাহার দৃষ্টি বালিকার দিকে আকৃষ্ট হইল। সৌন্দর্য্যের আভায় তাহার চক্ষু ঝলসিয়া উঠিল। বালিকার অপার্থিব রূপরাশি যুবকের চারিদিকে একটা স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিল। মুগ্ধ উন্মত্ত যুবক অমনি ঘোড়া ছুটাইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ি গিয়া তাহার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বাড়ীর সকলে আসিয়া কত ডাকিল, তবু দরজা খুলিল না, বা একটী কথাও বলিল না। অবশেষে তার মা আসিয়া দিব্যি করিলেন। বলিলেন "জীবন যদি যায় তবুও বাছা তোমার মনের সাধ পুরাইব, দরজা খুলিয়া একবার তোমার মনের কথা খুলিয়া বল।" আশায় উৎফুল্ল হইয়া মদনহায়দার ধীরে ধীরে বারুই কন্যার কথা বলিল। আরও বলিল "এই বিবাহে অমত থাকিলে আমি বারুই গৃহে যাইয়া হাঁস কবুতর রাখিব আর ভৃত্যভাবে মনের সাধে বারুই কন্যার অপরূপ রূপরাশি দূর হইতে দেখিয়াও চক্ষু সার্থক করিব।" পুত্রের দুঃখে বৃদ্ধা জননীর মন বিচলিত হইল। প্রত্যুষে গুয়া পানের "ঝাঁপি" লইয়া "জুড়ুনী" করিবার জন্য বৃদ্ধা স্বয়ং বারুইগৃহপানে যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া বারুই যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। মনের ভাব গোপন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "যাহার বিবাহ তাহাকে না হয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।" বালিকা এদিকে পণ রাখিয়া বলিল "বসাং হইতে বাণিজ্য করিয়া গজমতিহার আনিয়া দিলে পর, সে হার দেবতার গলায় পরাইয়া দিব,

তারপর বিবাহ হইবে। তাহা না হইলে কিছুতেই বিবাহ হইতে পারিবে না।" অগত্যা মদনের মা তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। মদন আহ্লাদে আট-খানা হইল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল "রসাংএর বাণিজ্য! এত কিছুই নয়। আচ্ছা আমি তাই করবো।" বাটা ভরিয়া আত্মীয়স্বজন মধ্যে গুয়া, পুষ্প, চন্দন বিতরিত হইল। সমারোহে ঝুড়ুনী ব্যাপার সম্পন্ন হইল। অবিলম্বে মদন হায়দার "রসাং" যাত্রা করিল।

দেখিতে দেখিতে ভেলা অপরূপ রূপ লইয়া বার বছরে পা দিল। ঝুড়ুনী কন্যার স্বাধীনতা অনেকটা খর্ব্ব। ভেলা তাই এতদিন বাহিরে ছুটাছুটি করিতে বা নদীর স্নানে "কট্" খেলিতে পারে নাই। তোলা জলে আর গিলা বাটিয়া বাড়ীতেই সে স্নান করিত। তারপর ভস্ম গায়ে মাখিয়া ও মলিন বস্ত্রে রূপ ঢাকিয়া ঘরের কোণে দিন কাটাইত। কিন্তু কি জানি কেন একদিন নদীতে স্নান করিবার জন্য তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মার কাছে অনুমতি চাহিল। বলিল "বাটা গিলা ও তোলা জলে স্নান আর ভাল লাগে না। শুধু এক দিনের জন্য নদীতে খৈ, ডিম দিয়া শেষ জলখেলা করিব।" ভেলা মা বাপের বড় আদরের মেয়ে। কখনও তাহার আব্দার কেহ অবহেলা করে নাই। মা বলিলেন, "ওমা এত বড় মেয়ে আবার নদীতে স্নান করবে! তা হতেই পারে না। তুমি মদন হায়দরের ঝুড়ুনী কন্যা, তোমার এমন জেদ করা শোভা পায়না। বাড়ীর ধারে দীঘী খনন করিয়া দিব ইচ্ছামত তুমি 'বাইছালী' খেলাইও।" মেয়ে তবু জেদ ছাড়িল না; তার আব্দারের কাছে কোন ওজর আপত্তি টিঁকিল না। ভেলা গঙ্গার জন্য ডিম, খৈ, তৈল, সিন্দুর আর স্নানের জন্য বাটা গিলা, আমলকি, হরিদ্রা আর পিঠালী লইয়া আগে পাছে দাসীবেষ্টিত হইয়া চলিল। নদীকে বন্দনা করা হইলে দাসিগণ বাটা গিলা লইয়া ভেলাইর চুলে মাখাইয়া দিল। এইবার "কট্" খেলা। বালিকা জল খেলায় মত্ত হইল। রূপসীর রূপে জলের বুকে ফোয়ারা ছুটিল। বেলা বাড়িতে চলিল, বালিকার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই।

এদিকে হরিণ শিকার করিয়া দুপুর বেলা পিরুরাজা বাড়ী ফিরিতে ছিলেন, সে রূপ তরঙ্গ তাঁহাকেও স্পর্শ করিল। মুগ্ধ পিরুরাজা বাড়ী যাইয়াই একটি পানে মন্ত্র পড়িয়া পানটী এক বালকের দ্বারা পাঠাইলেন। বলিয়া দিলেন "জানিয়া আসিও কাহার কন্যা বা কাহার স্ত্রী; আর পানটী তাহার কাছে ফেলিয়া দেখিও কি বলে"। বালক প্রথমে পরিচয় লইল, তারপর পানটী ভেলার গায়ে ফেলিয়া দিল। বালিকা রাগে ফুলিয়া উঠিল। ঘৃণায় চোখ মুখ লাল করিয়া পানটী ছুড়িয়া ফেলিল। তারপর চন্দ্র, সূর্য্য, দেব, দুর্গা সাক্ষী রাখিয়া নদীতে ডুব দিয়া শুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চোখ মুখ মুছিতে মুছিতে মলিন মুখে মলিনবস্ত্রে বাড়ী ফিরিল।

দাসিগণ বিলম্বের কারণ গোপন রাখিল না। কাজেই বারুইগৃহে নিরানন্দের রোল উঠিল। এদিকে সোণা-বারুইকে রাজবাড়ী লইয়া যাইবার জন্য পাইক আসিয়া উপস্থিত হইল। বারুই ব্যাপার কতকটা বুঝিলেন। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ঝুড়ুনী কন্যা জোর করিয়া লইয়া গেলে সমাজে আর মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে না। বারুই পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ ফুলাইলেন। অস্থির হইয়া ভূমিশায়ী হইলেন।

বারুই ধীরে ধীরে পিরুরাজার বাড়ী উপস্থিত হইলেন। অন্যান্যদিন বারুই প্রথমেই নমস্কার করেন কিন্তু আজ পিরু স্বয়ং সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া বারুইকে অভ্যর্থনা করিলেন। সোণার বাটায় পান দেওয়াইলেন। ক্রমে পিরুরাজা মনের কথা প্রকাশ করিলেন। বারুইর বুক দুঃখে ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, কিন্তু মুখে তাহার একটী কথাও ফুটিল না। কৌশলে বা মিষ্ট কথায় কিছুই হইবার নয় দেখিয়া ক্রোধে পিরু আদেশ করিলেন "বুকে পাথর চাপা দিয়া বারুইকে গোয়াল ঘরে হাত পা বাঁধিয়া রাখ, দুয়ারের কাছে খড়ের আগুনে মরীচ পোড়া দাও।" বুক ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল, ধুয়ায় শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল, তথাপি বারুই মুখফুটিয়া কিছু বলিলেন না, নীরবে সব সহ্য করিলেন। পিরুরাজা বারুইর দেহের উপর শাসন করিলেন বটে, কিন্তু মনের উপর শাসন করিতে পারিলেন না।

বাতাস নীরবে এই দুঃসংবাদ বহন করিয়া বারুই গৃহে পৌঁছাইল। বারুইপত্নী স্বামীর দুঃখে আকুল হইলেন—কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বারুইপুত্রেরা আত্মীয় স্বজনের সাহায্যের জন্য পাঁচদিকে ছুটিল। রূপাবারুই অশ্বপৃষ্ঠে কালা রাজার বাড়ী ছুটিলেন। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! রবে আকাশ পাতাল প্রতিধ্বনিত হইল।

এদিকে ভেলা আর স্থির থাকিতে পারিল না। পিতার বিপদে নিজের বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পিতার মুক্তির জন্য স্বেচ্ছায় হৃষ্টচিত্তে আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইল। দোলা ঠিক হইল। একে একে ভেলা সকলেরই নিকট বিদায় লইল। গুরুজনের পায়ে মাথা লুটাইয়া শেষ ভিক্ষা চাহিল, "পুকুর পাড়ে "জলটঙ্গী" ঘর বানাইও—নায়র আসিয়া তথায় থাকিতে পারিব।" দোলায় উঠিবার সময় গোপনে খোপার ভিতর হীরার কাটারী ও ঝাঁপি ভরিয়া গুয়াপান লইল। দোলা চলিল।

পিরুর জাঙ্গালে বাহকগণ বিশ্রাম করিবার জন্য দোলা রাখিয়া গাছতলায় বসিল। রূপসী তাহাদিগকে পানগুয়া দিল এবং নিজেও কিছু খাইল।

এই অবসরে সতীকন্যা নিজ গলায় হীরার কাটারী বসাইয়া দিল। বৃন্তচ্যুত কুসুমের মত সতীর মৃত দেহ দোলায় পড়িয়া যেন ম্লানমুখে হাসিতে লাগিল!

দোলাবাহকগণ আবার চলিল। রক্ত টপ্ টপ্ করিয়া দোলা বাহিয়া পড়িতে লাগিল। সহসা রক্ত বিন্দু দেখিয়া এক বাহক শিহরিয়া উঠিল। তখন তাহার সঙ্গী বলিল— "জাতবারুইর কন্যা পান খাইয়া পিক ফেলিতেছে!" সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল। আবার দ্রুতপদে তাহারা দোলা বহিয়া চলিল।

দোলায় কন্যা স্বয়ং আসিয়াছে একথা বাড়ীতে প্রচার হওয়া মাত্র পিরুর মা কন্যাকে দোলা হইতে ঘরে উঠাইয়া লইবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। দোলার ঘেরাও উঠাইয়া এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিলেন। তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মাথায় হাত দিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"হতভাগ্য পিরু না ধরিতে না ছুইতেই, সতীকন্যা আত্মঘাতী হইয়া আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিল!"

দেখিতে দেখিতে বারুইর পাঁচপুত্র আত্মীয় স্বজন লইয়া উপস্থিত হইল। এদিকে রূপাবারুইও কালা রাজাকে সঙ্গে করিয়া সসৈন্যে হর হর বম্ বম্ শব্দে রাজপুরী আক্রমণ করিল। পিরু পরাভূত হইলেন। তাহার ঘরবাড়ী ভস্মীভূত হইল। লোকলস্কর পিরুর বাস্তুভিটায় দীঘী খননে প্রবৃত্ত হইল এবং দীঘীর জলপান করিয়া প্রতিহিংসা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিল; কিন্তু সোণার পাঁচপুত্রের প্রতিহিংসা তাহাতেও নিবৃত্তি হইল না, তাহারা দীঘীর মধ্যে শূল পুতিয়া পিরুকে নিহত করিল।

এদিকে কোথা হইতে মদনহায়দার আসিয়া সকলের চোখে ধূলা দিয়া সতীদেহ লইয়া কোথায় চলিয়া গেল। কেহ দেখিল না, খুঁজিয়াও মৃত দেহের সন্ধান পাইল না! তখন নিরাশ হৃদয়ে সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তদবধি মদনহায়দারেরও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; কিন্তু আজিও রূপসী ভেলার অপূর্ব্ব কাহিনী লোকের ঘরে ঘরে পুণ্য কাহিনীর মত গীত হইতেছে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি, টি।

## স্মৃতি।

( গান )

( মিশ্র ইমন্ )

তোমারি হাসি তোমারি বাণী
তবরূপ রাশি জাগিছে মনে,
তোমারি ভাবনা, বিরহ বেদনা—
বাজিছে হৃদয়ে বাঁশীর তানে!
যদিও সুদূর প্রবাসে থাকি,
পরাণ মন তোমাতে রাখি,
তোমারি মূরতি হৃদয়ে আঁকি,
তোমারি মাধুরী মাখি এ প্রাণে।
তোমারি স্মৃতির লহর লয়ে,
জীবন তটিনী যেতেছে বয়ে,
ভালবাস যদি মিশিবে এ হৃদি
তোমারি হৃদয় সিন্ধু সনে।
তোমারি হাসি, তোমারি বাণী
তব রূপ রাশি জাগিছে মনে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

## "দিব্য প্রবন্ধ" বা "দ্রাবিড়বেদ"।

ভারতবর্ষ চিরকালই ধর্ম্মপ্রাণ—"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ" ইত্যাদি গীতোক্ত বাক্য তাহার প্রমাণ স্থল। এই ভারতভূমিতে পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস প্রথমতঃ বেদ বিভাগ করিয়া পশ্চাৎ লোকরক্ষার্থ মহাভারত নামক গ্রন্থ রচনা করেন—"ভারত ব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ" ( শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম স্কন্ধ )—অর্থাৎ মহাভারত উপদেশচ্ছলে আম্নায় অর্থাৎ বেদের অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইল, যাহাতে স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট সকলেরই সমান অধিকার আছে। ইহাতে মহাভারতের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইল। অপিচ "ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমোবেদ উচ্যতে" (শ্রীমদ্ভাগবত) অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদ—সুতরাং রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি দিব্য গ্রন্থ সকলেরই আদরণীয় বস্তু। বেদের উপপাদ্য বস্তু ঐ সকল দিব্য গ্রন্থে রহিয়াছে। বেদ, ইতিহাস, পুরাণ এবং বেদবেদাঙ্গ-পারগ আপ্ত মননশীল মহাত্মাগণ সকলেই এক কণ্ঠে একই বস্তু প্রতিপাদন করেন। সকলের মুখে একই কথা—সকলেরই উদ্দেশ্য একই। এই উদ্দেশ্য কেবল মাত্র "অর্থ পঞ্চক বিজ্ঞান" ভিন্ন আর কিছুই নহে। "অর্থ পঞ্চক বিজ্ঞান" বলিলে পাঁচটী জিনিষ বুঝায়—উহা এই—

(১) "স্বস্বরূপ জ্ঞান"—অর্থাৎ "আমি কে?" ইহার যথার্থ জ্ঞান।

(২) "পরস্বরূপ জ্ঞান" অর্থাৎ "ঈশ্বর কে?" ইহার জ্ঞান।

(৩) "উপায়স্বরূপ জ্ঞান," অর্থাৎ আমি কি উপায়ে ঈশ্বরকে পাইতে পারি তাহারই স্বরূপ জ্ঞান।

(৪) "ফল-স্বরূপ জ্ঞান" অর্থাৎ ঈশ্বরকে পাইলে কি ফল লাভ হয়।

(৫) "বিরোধীস্বরূপ জ্ঞান"—অর্থাৎ কিজন্য আমি ঈশ্বরকে পাইতেছি না—ভগবৎ প্রাপ্তির বিরোধী কি কি তাহারই স্বরূপ জ্ঞান।

নিম্নলিখিত শ্লোকটী জানা থাকিলে উক্ত পাঁচটী বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ থাকিবে। যথা—

"প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণোরূপং, প্রাপ্তুশ্চ প্রত্যগাত্মনঃ।
প্রাপ্ত্যুপায়ং, ফলংপ্রাপ্তে, তথা প্রাপ্তিবিরোধী চ॥
বদন্তি সকলা বেদাঃ সেতিহাস পুরাণগাঃ॥
মুনয়শ্চ মহাত্মানো বেদ বেদাঙ্গ পারগাঃ॥"

এই শ্লোকটীর অর্থই পূর্ব্বে সরল বঙ্গভাষায় কথিত হইয়াছে প্রথম পদটীর অর্থ ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান, অথবা, 'পরস্বরূপ জ্ঞান' 'পর' শব্দে 'পরব্রহ্ম' বুঝায় উহাই প্রত্যেক জীবের প্রাপ্যবস্তু। দ্বিতীয় পদের অর্থ এইঃ—'প্রত্যগাত্মা' শব্দে 'জীবাত্মা' বুঝায় উহাই ৬ষ্ঠী বিভক্তিতে 'প্রত্যোগাত্মনঃ' হয়। এই শব্দের বিশেষণ 'প্রাপ্তুঃ'—অর্থাৎ 'প্রাপ্ত' যে 'জীবাত্মা' তাহারই। জীবমাত্রই ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ধাবমান। জীবকে

'প্রাপ্ত' বলা হইল এই জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞান দ্বিতীয় পদের অর্থ। প্রাপ্ত্যুপায়ং এই তৃতীয় পদটীর অর্থ ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় কি কি? কি উপায়ে ভগবানকে পাওয়াযায় তাহারই যথার্থ জ্ঞান। চতুর্থ পদ, 'ফলং প্রাপ্তেঃ' অর্থাৎ ভগবান কে পাইলে কি ফললাভ হয় তাহার সম্যগ্‌জ্ঞান। পঞ্চমপদ 'প্রাপ্তি বিরোধী' অর্থাৎ কিজন্ত আমরা ভগবানকে পাইনা ভগবৎ প্রাপ্তির বিরোধি বস্তু কি কি? তাহারই স্বরূপজ্ঞান। এই পাঁচটী কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই বেদ, পুরাণ, ইতিহাস ( রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ) এবং বেদবেদাঙ্গপারগ আত্মমননশীল মহাত্মাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য। সকলেই এককণ্ঠে এই অর্থপঞ্চক-বিজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।

আমরা অনেকেই রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া থাকি কিন্তু রামায়ণ মহাভারত যে সাক্ষাৎ বেদ এবং উহাতে যে অর্থপঞ্চকবিজ্ঞান নিহিত রহিয়াছে তাহা কয়জনের ধারণা আছে? যাহা বেদে আছে, ঠিক তাহাই রামায়ণে আছে। সদগুরুর কৃপা ভিন্ন উহা কিছুতেই জানা যায়না।

"বেদবেদ্যেপরে পুংসি জাতে দশরথাত্মজে।
বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাৎ রামায়ণাত্মনা॥

বেদবেদ্য ( বেদের দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় ) পরব্রহ্ম যখন দশরথপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন তখন স্বয়ং বেদও প্রাচেতস ( বাল্মিকি ) মুনি হইতে রামায়ণ রূপে আবির্ভূত হইলেন। হয় ত কেহ বলিবেন যে 'পরব্রহ্মের' আবার জন্ম কোথায়? তাহার উত্তর এই—যে বেদ বলেন, পরব্রহ্ম 'অজ' (জন্মরহিত), সেই বেদই আবার বলিতেছেন—

"অজায়মানো বহুধা অজায়ত॥"

অর্থাৎ তিনি জন্ম রহিত হইলেও বহু প্রকারে ( অনেক রূপে ) জন্মিয়াছেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটী কথা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধে সকলের এক প্রকার ধারণা নহে। কেহ ভাবেন তিনি "নিরাকার" কেহ ভাবেন তিনি 'সাকার' কেহ বলেন তাঁহার 'প্রতিমা' নাই আবার কেহ বলেন তিনি 'সপ্রতিম'। কেহ বলেন তিনি 'আবাঙ্মনসগোচর' ( মন ও বাক্‌পথের অগোচর ) আবার কেহ বলেন তিনি "সর্ব্বগোচর"। কেহ ভাবেন তিনি "দুর্জ্ঞেয় ও দুর্লভ" অপরে ভাবেন তিনি "অত্যন্ত সুজ্ঞেয় ও সুলভ"। কেহ মনে করেন তিনি সুদূরে অবস্থিত আবার কেহ ভাবেন তিনি 'সদা সন্নিহিত' ( অতি নিকটে আছেন )। ইহার তথ্য এই যে, যাহা যাহা বলা হইল, সমস্তই সত্য। শ্রুতি ( বেদ ) বলেন তিনি নিরাকার অথচ সাকার; তিনি অপ্রতিম অথচ সপ্রতিম; তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সুজ্ঞেয়; তিনি দুর্লভ, তিনি সুলভ ইত্যাদি।

আবার সেই শ্রুতিই (সেই বেদই) অন্যত্র বলিতেছেন যে উপরে যাহা বলা হইল তিনি তাহা নহেন—উহাকে 'নিষেধশ্রুতি' বলে; শ্রুতি অন্যত্র 'নেতি' 'নেতি' করিয়া তাঁহাকে নিরূপণ করেন অর্থাৎ তিনি ইহা নহেন, তিনি উহা নহেন—তিনি না পুরুষ, না স্ত্রী, না ষণ্ড ( নপুংসক ), না সৎ, না অসৎ, না সাকার, না নিরাকার, না সপ্রতিম, না অপ্রতিম তিনি এ নয়, তিনি ও নয় তিনি তাহা নয় ইত্যাদি ইত্যাদি যথাসাধ্য বলিয়া শেষে শ্রুতি (বেদ) বলিতেছেন, "যাহা অবশিষ্ট থাকিল তিনি তাহাই।"

ন স্ত্রী, ন ষণ্ডো, ন পুমান্ ন জন্তুঃ
... ... ন সন্নচাসন্নিষেধশেষো
... ... জয়তাদশেষঃ॥"

তিনি 'নিষেধ শেষ' অর্থাৎ তিনি ইহা নয়, উহা নয়, তাহা নয়, ইত্যাদি বলিতে বলিতে, শ্রুতি যতদূর বলিতে পারেন উক্ত প্রকারে তাঁহাকে নিরূপণ করিতে করিতে শেষে আর বলিতে না পারিয়া বলিলেন যে, তিনি "নিষেধশেষ" এবং তিনি 'অশেষ' তিনি সদা জয়যুক্ত হউন।

উপরে 'নিষেধশ্রুতির' কথা বলা হইল। উক্ত বেদ ঈশ্বরকে "নিষেধশেষ" এবং "অশেষ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এইরূপ বেদে পরব্রহ্মকে নানাপ্রকারে বর্ণনা করিয়াও অবশেষে বলিলেন,

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধসা, ন বহু শ্রুতেন॥"

অর্থাৎ এই 'আত্মা' ( পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম ) 'প্রকৃষ্টবচনের দ্বারা' ( শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির বচন সমূহদ্বারা ) লভ্য নহেন, 'মেধা' (বুদ্ধি) দ্বারাও লভ্য নহেন, বহুপ্রকার 'শ্রুতিবাক্য' দ্বারাও নহেন; কিন্তু ইনি ( পরব্রহ্ম ) স্বয়ং

যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন, এবং তাঁহারই হয়েন।

"যমেবৈষঃ বৃণুতে তেনৈব লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা॥"

তুলসীদাস সরলভাষায় ইহাই গাহিতেছেন; যথা—

"সোহি জানে প্রভু, যাকো তুমহি জানাই।"

অর্থাৎ হে প্রভো, আপনি স্বয়ং যাহাকে জানান কেবল সেই আপনাকে জানিতে পারে অন্যে নহে। পারমহংস্য সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে জ্ঞানিপ্রবর উদ্ধব গাহিতেছেন, হে প্রভো যেখানে কৃষ্ণার্পিতচিত্তগোপিকাগণ সদা বিচরণ করেন, এবং যেখানে সদা ইঁহাদিগের পদধুলি পতিত হয়, সেই স্থানের গুল্ম, লতা, ওষধি প্রভৃতির মধ্যে অন্যতম হইয়া যেন আমার জন্মলাভ হয়—কেন না এই গোপীরা অতি দুঃখেও যাহা ত্যাগ করা যায়না তাহাই (স্বজন প্রভৃতি) এবং তৎসঙ্গে আর্য্যপথও (বৈদিকমার্গও) পরিত্যাগ করিয়া মুকুন্দের (মুক্তি ও ভক্তিদায়ক পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের) শ্রীপাদপদ্ম ভজনা করিয়াছে—যে পাদপদ্ম স্বয়ং শ্রুতিও বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হয়েন না—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাম্।
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্॥
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য পথঞ্চ হিত্বা।
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে শ্রুতি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াও যে মুকুন্দ পদবী লাভে সমর্থ হয়েন না গোপীরা অনায়াসে সেই পদবী লাভ করিল। 'শ্রুতি' এবং 'স্মৃতি' ভগবানের আজ্ঞা এবং ভগবদ্‌গুণমহিমা প্রচারিণী ভগবদ্দাসী। সুতরাং যখন সেই 'অজ' (জন্মহীন) পরমেশ্বর, ভক্তানুগ্রহকারক, ভক্তরক্ষার জন্য ভূতলে "দশরথপুত্র"রূপে অবতীর্ণ হইলেন—তখন তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনীদাসী শ্রুতিও "রামায়ণ"রূপে প্রাচেতস অর্থাৎ বাল্মিকি মুনি হইতে অবতীর্ণা হইলেন। যথা—

"বাল্মিকের্মুনিসিংহস্য কবিতা বনচারিণঃ।
শৃন্বন্ রামকথানাদং কোন যাতিপরাং গতিং॥
কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরং।
আরুহ্য কবিতা শাখা বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্॥

ইত্যাদি শ্লোকোক্ত প্রমাণবচন হইতে 'শ্রীরামায়ণের' সারবত্তা সহজেই অনুমেয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদ এবং 'মহাভারতে' আম্নায়ার্থ (বেদার্থ) প্রদর্শিত হইয়াছে—এবং শ্রুতিস্মৃতি ইতিহাস পুরাণ ও বেদবেদাঙ্গপারগ আত্মমননশীল মহাত্মাগণ সকলেই এককণ্ঠে 'অর্থপঞ্চকবিজ্ঞান' নামক উদ্দেশ্যভূত পাঁচটী বস্তু প্রতিপাদন করিতেছেন। ইহাও বলা হইয়াছে রামায়ণ প্রভৃতি সকলেই পড়িয়া থাকেন, কিন্তু, উহার অন্তর্গত 'অর্থপঞ্চক বিজ্ঞান' কাহারও ভাগ্যে ধারণা ঘটেনা। তাহার কারণ যেমন বেদে 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি' উভয় মার্গই প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্রূপ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণরত্ন বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থেও প্রবৃত্তিও নিবৃত্তি উভয় মার্গই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রবৃত্তিমার্গের অধিকারী অনেকেই; প্রায় সকলেই। কিন্তু নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী মুমুক্ষু চেতন সংসারে অতি বিরল। "হসন্তিকাপঙ্কজন্যায় হসন্তিকা পঙ্কজন্যায়" বৎ সংসারে নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী মুমুক্ষু মহাপুরুষ অথবা জীবন্মুক্ত মহাত্মা অতীব সুদুর্লভ।

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"
(গীতা)

যাঁহারা মোক্ষের জন্য যত্ন করেন বা জীবন্মুক্ত তাঁহারা সৎপুরুষ। যাঁহাদিগের কেবলমাত্র ভোগবিলাসেই চিত্ত আসক্ত; "কদা ভগবানকে পাইব", 'কদা বা ভগবানের ও তাঁহার দাসবর্গের ভৃত্যানুভৃত্য হইয়া উজ্জীবন লাভ করিব', এই সৎচিন্তা ও সদাগ্রহ যাঁহাদিগের ভ্রমেও কখন চিন্তাপথে উদিত হয় না—তাঁহারা "আত্মঘাতী" বা "অসৎ" বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত হয়েন। নিম্নোক্ত শ্লোকে উহা অতি সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

"অসন্ত এবাত্র হি সম্ভবন্তি।
হসন্তিকায়ামিব হব্যবাহঃ॥
অত্রৈব সন্তো যদি সম্ভবন্তি।
তত্রৈব লাভঃ সরসীরুহানাম্॥"
(বেদার্থ সারসংগ্রহে)

অর্থাৎ অত্র সংসারে অসৎ পুরুষই জন্ম গ্রহণ করেন। যেমন হসন্তিকাতে (অগ্নি রাখিবার পাত্রে)

কেবল মাত্র অগ্নিই থাকে। কিন্তু অত্র সংসারে যদি কদাচিৎ সৎপুরুষগণ দৃষ্ট হয়েন, তাহা হইলে, উহা 'হসন্তিকাতে' অর্থাৎ অগ্ন্যাধার পাত্রে কমলসমূহ লাভবৎ অসম্ভব সম্ভব মাত্র আর কিছুই নহে। তাৎপর্য এই যে, এই সংসারে সাধুসঙ্গ লাভ 'হসন্তিকা পঙ্কজন্যায়বৎ' অলভ্যলাভ বলিতে হইবে—সংসারে তাদৃশ সৎপুরুষ অতি দুর্লভ; ইহা স্বয়ং ভগবানও গীতাতে বলিয়াছেন—ভগবানের কৃপা যখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখনই জীবের সৎসঙ্গ লাভ হয়, তখন তাঁহার মুক্তির অভিলাষ জাগিয়া উঠে। তখন তিনি সেই সৎসঙ্গ লাভের ফলস্বরূপ 'অর্থপঞ্চকাবজ্ঞান' জনিত আনন্দানুভব করতঃ তদনুষ্ঠান বা সদনুষ্ঠান পরায়ণ হইলে 'জীবন্মুক্ত' সংজ্ঞালাভ করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে আ'জ কা'ল মহাপুরুষগণ কোথায় দৃষ্ট হয়েন? তাহার একমাত্র উত্তর এই যে এসময়ে (এই ঘোর কলিযুগে) মহাপুরুষগণ কোনও কোনও স্থলে লক্ষিত হয়েন; কিন্তু দ্রাবিড়দেশে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হইবেন। যেখানে তাম্র-পর্ণী নদী, কৃতমালা নদী, পয়স্বিনী নদী, মহাপুণ্যা কাবেরী নদী এবং প্রতীচীনাম্নী মহানদী আছে, সেই-খানে বহুসংখ্যক মহাপুরুষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়েন। এই পঞ্চ মহানদী তটস্থ মনুষ্যগণ এবং এই সকল পুণ্যতোয়া নদীর জল যাঁহারা পান করেন তাঁহারা সকলেই 'বাসু-দেব পরায়ণ' ও 'অমলাশয়' (নির্ম্মল চিত্ত) মহাপুরুষ। উক্ত আছে যে—

"কাবেরীতোয়মাশ্রিত্য, বাতো যত্র প্রবর্ত্ততে।
তদ্দেশবাসিনাং মোক্ষঃ কিমুতত্তীরবাসিনাম্॥"

অর্থাৎ কাবেরী নদী জল সংস্পৃষ্ট বায়ু যেখানে যেখানে যায় সেই সেই দেশবাসি জীবসমূহের মোক্ষ স্বভাবতঃ লাভ হয়, আর যাঁহারা কাবেরী নদীর তীরবাসী তাঁহা-দিগের ত কথাই নাই—অর্থাৎ তাঁহাদিগের যে মোক্ষ হইয়া থাকে ইহা কৈমুত্য ন্যায় সিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে উহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যথা—

"কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলুভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ৩৮
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥ ৩৯
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥ ৪০"

এই শ্লোকত্রয়ের ভাবার্থ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাতে দেখা যাইতেছে, গীতাতে ভগবান যাহা বলিয়াছেন, "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ" (অর্থাৎ বাসুদেবপরায়ণ মহাত্মা অতি দুর্লভ) ঠিক তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত তিনটী শ্লোকে ও কথিত হইয়াছে।

কলিযুগে দ্রাবিড়দেশে তাম্রপর্ণী প্রভৃতি পঞ্চ-নদীতীরে মহাত্মাগণের আবাসভূমি। এই তাম্রপর্ণী নদীতটে কলিযুগের প্রারম্ভে শ্রীবৈকুণ্ঠনিকেতন ভগবানের সেনাধীশ, শ্রীমান্ বিষক্‌সেন কুরুকাপুরী (দ্রাবিড়ভাষায় আধুনিক নাম আম্বার তিরুনগরী) নামক দিব্যদেশে অবতার গ্রহণ করতঃ যাহাতে সকলেই বেদগান করিয়া ভগবৎ তত্ত্ব অবগত হইয়া এবং ভগবৎপরায়ণ হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র সংস্কৃতবেদ দ্রাবিড় ভাষায় গান করিয়া মোক্ষের উপায় অতি সহজ করিয়া দেন। উহারই নাম "দিব্যপ্রবন্ধ" বা "দ্রাবিড়বেদ"। সংস্কৃতবেদে সকলের অধিকার নাই—যেহেতু উহা আয়ত্ত করা অতীব দুঃসাধ্য কিন্তু দ্রাবিরবেদে স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই সমান অধিকার। কলিযুগে মোক্ষের উপায় অতি সহজ করিবার জন্যই শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ হইতে তাঁহার পার্ষদ্ শ্রীমান্ বিষক্‌সেনকে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার অনুমতি প্রদান করেন। তিনিও অবতার গ্রহণ মাত্র মলমূত্র বর্জ্জিত হইয়া মাতৃস্তন্য পর্য্যন্ত পান না করিয়া অষ্টাঙ্গ যোগবলে কেবল লক্ষ্মীপতিকে হৃদয়ে অনুভব করতঃ চন্দ্রমার কলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; ইঁহার অবতার বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। কুরুকাপুরিপালক কারিমাননামক রাজা অনপত্য নিবন্ধন—কুরুকাপুরি নগরীতে অধিষ্ঠিত আদি-

নাথ ভগবানের উদ্দেশে বহুকাল যাবৎ সস্ত্রীক কঠোর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে উক্ত ভগবান কারিনামক রাজাকে বরপ্রদান করিতে চাহিলে তিনি প্রার্থনা করেন যে, যেন ভগবানের ন্যায় তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। বৈকুণ্ঠবাসী সকলেই ভগবানের ন্যায় আকার বিশিষ্ট—সকলেই শ্রীবৈকুণ্ঠপতির ন্যায় চারু-চতুর্ভুজশ্যামকলেবর—অরবিন্দলোচন পঙ্কোপনিষন্ময় বিশিষ্ট। সুতরাং কারিরাজঃ যখন নথ ভগবানের ন্যায় একটী পুত্র কামনা করিলেন, তখন আদি-নাথ ভগবান তৎক্ষণাৎ শ্রীমান্ বিষ্বক্সেনকে ভূলোকে অবতীর্ণ হইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। ইনি অবতার গ্রহণ করিয়া মনুষ্য চেষ্টা বিবর্জ্জিত হইলে, ( অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসা হাস্য রোদন মলমূত্রত্যাগ প্রভৃতি বর্জ্জিত হইলে, ) কারিরাজা ও তাঁহার পত্নী উভয়েই পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আদিনাথ ভগবানের মন্দির গমন করতঃ তাঁহার সম্মুখে পুত্রকে শয়ান করাইয়া উভয়ে নেত্র নিমীলন করিয়া বহুক্ষণ ভগবানের ধ্যান করতঃ তাঁহাকে নিবেদন করিতে লাগিলেন যে "হে ভগবান্ আপনার কৃপায় আপনাতুল্য পুত্র পাইলাম বটে, কিন্তু, এই পুত্রের জন্মাবধি অতিমানুষ চেষ্টা দেখিয়া আমরা ভয়বিস্ময়াভিভূত হইয়া পুনরায় আপ-নারই শরণাপন্ন হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যখন এই পুত্র মনুষ্য চেষ্টাবর্জ্জিত—মাতৃস্তন্যপান না করিয়াও এবং মলমূত্র রহিত হইয়া ও দিন দিন সুবর্দ্ধিত হইতেছে এবং যখন এই সদ্যোজাত শিশু সর্ব্বতোভাবে মনুষ্য চেষ্টাবিবর্জ্জিত তখন এ যে সংসারের কার্য্যের উপযোগী হইবেনা—ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে অতএব এই পুত্রের ভার আপনি স্বয়ংই গ্রহণ করুন—আমরা ইহাকে লইয়া কি করিব? যখন রাজা ও রাণী ধ্যানস্থ হইয়া উক্ত প্রকার স্তব স্তুতি ও প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগের শিশুপুত্র সেই অবতার পুরুষ নিঃশব্দে গড়াইতে২ অগ্রসর হইয়া ভগবানের মন্দির স্থিত শেষরূপী ( অর্থাৎ অনন্তদেবের অবতাররূপী সুবৃহৎ তিন্তিড়ীবৃক্ষের ( তেঁতুল গাছের ) সুবৃহৎ কোটরে পতিত হইয়া সেই কোটর মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া রহিলেন, এবং সেই দিব্যবৃক্ষ কোটরেই অর্থাৎ অনন্তদেবের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া অষ্টাঙ্গ যোগ পরায়ণ হইয়া ষোড়শবর্ষ যাবৎ ভগবদ্ধ্যান পরায়ণ হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং এই অবতার পুরুষই শ্রীমান্ শঠকোপমুনি বা শঠারিআম্বার' নামে সুপ্রসিদ্ধ॥ এই সময় মধুরকবি নামক কোনও দ্রাবিড়দেশ বাসী মহাপুরুষ তীর্থ পর্য্যটন করিতে২ অযোধ্যাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে কার্য্যবশতঃ একাকী সরযূতীরে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলেন যে দক্ষিণ দেশ হইতে এক প্রকার দিব্য জ্যোতিঃ ভূতল হইতে আকাশ পথে পরিব্যাপ্ত হইয়া দক্ষিণদেশ উদ্ভাসিত করিতেছে। তিনি উপর্য্যুপরি তিন চারি রাত্রি যাবৎ উক্ত জ্যোতিঃ অবলোকন করিয়া এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া উক্ত জ্যোতিঃ লক্ষ্য করিয়া কেবল রাত্রি কালে পর্য্যটন করিতে করিতে বহুকাল পরে এবং অনেক কষ্টে কুরুকানগরীতে উপস্থিত হইয়া গভীর রজনীকালে দেখিতে পাইলেন যে উক্ত নগরীস্থিত আদিনাথ ভগবানের মন্দিরস্থিত তেঁতুল গাছের কোটর হইতে ঐ দিব্যজ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছে। নিকটে যাইয়া দেখিলেন সেই বৃক্ষের কোটরে এক দিব্যপুরুষ ধ্যান নিমগ্ন আছেন। তিনি পূর্ণ যৌবন ও অলৌকিক রূপ লাবণ্য বিশিষ্ট দিব্যদেহধারী অষ্টাঙ্গযোগনিমগ্ন। তাঁহাকে কোনও অবতার বিশেষ বলিয়া তাঁহার অনুভব হইল। তিনি সবিশেষ পরীক্ষা দ্বারা তাঁহাকে শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী নিত্যসূরি ও অবতার পুরুষ বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পন করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য হইলেন। মধুরকবি স্বামী তেঁতুল বৃক্ষের কোটরস্থিত অষ্টাঙ্গ যোগিশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ শঠকোপ স্বামীর শিষ্যত্ব লাভ করিয়া জগতে প্রচার করিলেন যে মোক্ষদাতা আচার্য্যের উপ-কারের প্রত্যুপকার সম্পূর্ণ অসম্ভব। মনু ও বলিয়াছেন যে "উৎপাদকাদন্নদাতুর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা" ( মনু-সংহিতা )—অর্থাৎ জন্মদাতা ও অন্নদাতা এই উভয়বিধ পিতৃদ্বয় হইতে ব্রহ্মদ পিতা ( মোক্ষদায়ক পিতা ) শ্রেষ্ঠ।

আচার্য্যদেবের প্রত্যুপকারাশক্য উপকার সদা অনুভব করতঃ শ্রীমান্ মধুরকবি আল্বার ( 'আল্বার' শব্দে 'জ্ঞানি শ্রেষ্ঠ' ইহা তামিল শব্দ ) "কণ্ণিণুন্শিরুত্তাম্বু" নামক স্বরচিত দিব্যপ্রবন্ধে আচার্য্য মহিমা সবিশেষ প্রচার করিলেন তিনি আচার্য্যগতপ্রাণ। আচার্য্য ব্যতীত অন্য কোন ও দেবতারই উপাসনা করেন নাই । যথা "দৈবমন্য ন্নজানতঃ যথা স মধুরঃ কবিঃ" ইত্যাদি প্রকারে মধুরকবি আল্বারের আচার্য্যভক্তি দক্ষিণদেশে সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ আছে॥ শ্রীমান্ মধুরকবি স্বামী সম্যক্ সেবা দ্বারা স্বীয় আচার্য্যকে প্রসন্ন করিলেন। আচার্য্য প্রবর শ্রীমান্ শঠকোপ স্বামী তাঁহার প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শন করিয়া লোকরক্ষার্থ এবং মোক্ষপথ অতি সহজ করিবার নিমিত্ত বেদের সারাংশ তামিল ভাষায় ( দ্রাবিড়ভাষা বিশেষ ) গান করিলেন, এবং শ্রীমান মধুরকবি উহা জগতে প্রচার করিলেন। উক্ত 'তামিল বেদই' দ্রাবিড়বেদ 'দ্রাবিড়োপনিষৎ' বা "দিব্য প্রবন্ধ" নামে সুপ্রসিদ্ধ। উহারই আর একটী নাম "সহস্র গীতি"। এই "সহস্র গীতি, নামক গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ, বৃন্দাবনধামের শেঠজীর মন্দির প্রতিষ্ঠাতাও শেঠজীর আচার্য্যদেব পরমপূজ্যপাদ অবতার বিশেষ শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন রঙ্গাচার্য্যস্বামী প্রণয়ন করিয়া তামিল ভাষানভিজ্ঞ শ্রীবৈষ্ণব কুলের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। শ্রীমান্ শঠকোপ স্বামী বিরচিত এই দিব্যপ্রবন্ধের মহিমা নিম্নলিখিত শ্লোকে সুব্যক্ত রহিয়াছে। যথা—

"ভক্তামৃতং বিশ্বজনানুমোদনং, সর্ব্বার্থদং শ্রীশঠকোপ বাঙ্ময়ং।
সহস্র শাখোপনিষৎ সমাগমং, নমাম্যহং দ্রাবিড়বেদ সাগরম্॥"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই দ্রাবিড়বেদে সকলেরই সমান অধিকার আছে। সংস্কৃতবেদে সকলের অধিকার নাই এবং উহা কলিযুগে আয়ত্ব করাও অতীব দুঃসাধ্য। এই জন্যই শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী নিত্যহরি শ্রীমান্ বিম্বক্সেন ভগবান কলিযুগের প্রারম্ভে ভূতলে দ্রাবিড়দেশে কুরুকাপুরী নগরীতে শ্রীমান্ কারিরাজার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তামিলভাষায় বেদগান করিয়া বেদকে সকলের আয়ত্বাধীন করিয়া লোকরক্ষার্থ মোক্ষোপায় অতি সহজ করিয়া দিলেন। যথা

"সর্ব্বাধিকার ইতি বৈভবসম্ভবায়
বেদা অনাদি নিধনা দ্রাবিড়োক্তিরূপা।
'দিব্যপ্রবন্ধ' বপুষা যত আবিরাসন্
তাদৃক্ শঠারিচরণৌ শরণং প্রপদ্যে॥"
( শ্রীশঠারিপ্রপত্তিঃ )॥

অর্থাৎ অনাদিনিধনবেদ'—বেদের আদিও নাই অন্তও নাই। বেদ অনাদি, বেদ নাশরহিত, বেদ অভ্রান্ত। যাহাতে সকলেরই সমান অধিকারবৈভব সম্পন্ন হয়, সকলেই যাহাতে উহা সহজেই পাঠ করিতেও উহা আয়ত্বাধীন করিয়া, তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে পারে, কেবল সেই নিমিত্তই তাদৃগ্‌-বৈভববিশিষ্ট অনাদি-নিধন-বেদ "দিব্যপ্রবন্ধবপু" ধারণ করতঃ যাঁহা হইতে আবির্ভূত হইলেন, সেই শ্রীমান্ শঠারির ( শঠকোপমুনির ) শ্রীচরণে আমি অনন্যশরণ ও অনন্যগতি হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

এই "দিব্যপ্রবন্ধ" যাঁহারা অভ্যাস করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন--তাঁহাদিগের তৎক্ষণাৎ মোক্ষ হইতে লাগিল। তৎকালে সকলেই এই সদ্‌গ্রন্থের এতাদৃশ মহিমা অনুভব করাতে সকলেই উহা আদর পূর্ব্বক পাঠ করিবামাত্রই মোক্ষলাভ করিতে লাগিলেন। এমন কি স্ত্রী শূদ্রপ্রভৃতি এবং আচণ্ডাল অতি নীচ জাতিও উহা পাঠ করিবামাত্র মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে লাগিল—এইরূপে সকলেই মোক্ষলাভ করাতে একেবারে নগর ও গ্রাম মনুষ্য-শূন্য হইতে লাগিল—ইহা দেখিয়া ঘোর সংসারী লোকেরা ( অর্থাৎ যাহারা ঘোর সংসারী, যাহারা ভোগবিলাস প্রিয়, যাহাদিগের ভ্রমেও কখন মোক্ষচিন্তা মনে উদিত হয় না ) দুষ্টবুদ্ধি প্রেরিত হইয়া "দিব্যপ্রবন্ধকে" "মারকগ্রন্থ" বলিয়া উহার অপবাদ করিতে আরম্ভ করিল—সজ্জনবর্গ তাহাতেও উহার পাঠ হইতে নিরস্ত না হওয়াতে, দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত মহাপাপীরা উক্ত সদ্‌গ্রন্থ খানি তাম্রপর্ণী নদীতে ডুবাইয়া উহাকে একেবারে জগৎ হইতে বিলুপ্ত করিল। যখন শঠকোপ

স্বামী দিব্যপ্রবন্ধ গান করিতেন, তখন তাঁহার শিষ্য শ্রীমান্ আচার্য্যগতপ্রাণ "মধুরকবি স্বামী" উহা স্বহস্তে লিখিয়া ফেলিতেন এবং উহাই "শ্রীশঠারি সূক্তি বা "দিব্যপ্রবন্ধ" নামে অদ্যাপি সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে॥ এক খানি মাত্র গ্রন্থ "মধুরকবি" অতিকষ্টে লিখিয়াছিলেন। উক্ত মূল গ্রন্থ যখন তাম্রপর্ণী নদীগর্ভে বিলীন হইল, তখন সজ্জন মাত্রেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে "নাথমুনি" নামক আর একজন অষ্টাঙ্গ যোগী মহাপুরুষ একদিন তাম্রপর্ণীনদীতে স্নান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে একখানি তালপত্র বা তদাকার বিশিষ্ট কোনও বস্তু নদীর স্রোতের বিপরীত মুখে ভাসিয়া যাইতেছে। তালপত্রের ন্যায় লঘু পদার্থ খরতর স্রোতের বিপরীত ধারায় ধাবিত হইতেছে দেখিয়া মহাপুরুষ উহা মহাপ্রভাব বিশিষ্ট কোনও অলৌকিক পদার্থ বলিয়া জানিতে পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তরণ পূর্ব্বক অতিকষ্টে উহা হস্তগত করিয়া পুনরায় তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। যখন উহা অনিমিষনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে উক্ত পত্রে কিছু লেখা রহিয়াছে। পরে যখন অনেক যত্ন ও প্রয়াসের পর উহা পাঠ করিতে পারিলেন, তখন তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। দেখিলেন যে উহা নদীগর্ভে বিলুপ্ত "শ্রীশঠারি সূক্তির" একখানি পাতা মাত্র। যাহা পাঠ করিলেন তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া কি প্রকারে উহা আদ্যোপান্ত অবগত হইতে পারিবেন, এই চিন্তায় আকুল হইয়া অহরহঃ অস্থির হইতে লাগিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে তিনি কুরুকানগরীতে উপস্থিত হইলে তত্রত্য কোনও মহাপুরুষের নিকট স্বীয় বৃত্তান্ত (অর্থাৎ যেরূপে সেই তালপত্রের ন্যায় পাতাখানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা) বিশেষরূপে বর্ণন করিলে মহাপুরুষ উহা পাঠ করিয়া উহা "শঠারি সূক্তির" কিয়দংশ বলিয়া জানিতে পারিলেন। এবং যখন নাথমুনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যে 'শঠারি প্রবন্ধ' সমগ্র জানিবার কোনও উপায় আছে কি না, তখন মহাপুরুষ দয়াপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেনঃ—

"এই গ্রামে আচার্য্যগতপ্রাণ শ্রীমান্ মধুরকবি আমার, স্বীয় আচার্য্যদেব শঠকোপ মুনির পরমপদ প্রাপ্তি হইলে (অর্থাৎ তিনি বৈকুণ্ঠ গমন করিলে), আচার্য্য শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইলে, শঠকোপমুনি তাঁহাকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া বলিলেন, যে তাম্রপর্ণী নদী হইতে তাম্র উদ্ধার করিয়া সেই তাম্রের দ্বারা তাঁহার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বেদবিধি অনুসারে উক্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক উহা বেদবিধানানুযায়ী অর্চ্চনা করিলে, তাঁহার (মধুর কবির) আচার্য্যবিরহতাপশান্তি হইবে মধুরকবি তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া শঠকোপমুনির আবির্ভাব স্থলে তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি বিধিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করাইয়া উহা বিধিপূর্ব্বক নিত্যপূজা করিতে আরম্ভ করিলে উক্ত প্রতিমাময়ী দিব্যমূর্ত্তি সাক্ষাৎ শঠকোপমুনির জীবিতাবস্থার বিগ্রহবৎ দিব্যপ্রভাববিশিষ্ট ও অলৌকিক তেজঃপূর্ণ হইল। মধুর কবি দিবানিশি সেই মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া, দিবানিশি সেই মূর্ত্তির অগ্রে শঠকোপমুনি বিরচিত দিব্যপ্রবন্ধ পাঠ করিতেন। ইহাতে শঠকোপমুনির সম্পূর্ণ তেজ উক্ত মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল এবং ঐ মূর্ত্তি সাক্ষাৎ শঠকোপমুনির ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল—তখন মধুরকবির আচার্য্য বিরহতাপ নির্ব্বাপিত হইল। মধুরকবি শ্রীবৈকুণ্ঠ নিকেতন গমনকালে কুরুকানগরবাসী লোকদিগকে এই বলিয়া আশ্বাসিত করিয়াছিলেন যে, শঠকোপমুনির মূর্ত্তির সম্মুখে যে কেহ মধুর-কবি-চরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবে, শঠকোপমুনি তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিবেন। অতএব শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সেই দিব্যমূর্ত্তি সন্নিধানে একাগ্রচিত্তে মধুর-কবি-চরিত শ্রবণ মনন ও কীর্ত্তন করিলে শঠকোপস্বামী প্রসন্ন হইবেন—তখন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই ঐ দিব্যমূর্ত্তি জাগরিত হইয়া অন্তরাল হইতে দিব্যপ্রবন্ধ গান করিতে থাকিবেন। তুমিও স্বহস্তে উহা লিখিয়া লইয়া "দিব্যপ্রবন্ধ" পুনরায় জগতে প্রচার কর।"

কুরুকাবাসী মহাপুরুষের এই সদুপদেশ শ্রবণে পরম পরিতৃপ্ত শ্রীমান্ নাথমুনিস্বামী তাহাই করিলে, শঠকোপমুনির তাম্রময়ী দিব্যমূর্ত্তি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ শঠকোপমুনির ন্যায়, সমগ্র দিব্যপ্রবন্ধ পুনরায় বিধিপূর্ব্বক স্বরযুক্ত ও তানলয় সংযোগে গান করিতে লাগিলেন—নাথমুনিও

উহা সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিয়া দিব্যপ্রবন্ধের বিধিপূর্ব্বক পাঠ ও গান পুনরায় জগতে প্রচার করিলেন। কিন্তু তৎকালে শঠকোপমুনির মূর্ত্তি অর্চ্চকমুখে এই প্রত্যাদেশ করিলেন যে অতঃপর দিব্যপ্রবন্ধ পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ মোক্ষলাভ না হইয়া পাঠকারীর দেহাবসানে মোক্ষলাভ হইবে; সুতরাং ইহাতে দিব্যপ্রবন্ধের আর কেহও ছিদ্রান্বেষণে সমর্থ হইল না—পূর্ব্বে "মারকগ্রন্থ" বলিয়া দুষ্টলোকেরা নিন্দা করিত, এক্ষণে উক্ত দুষ্টলোকেরাই উক্ত গ্রন্থের মহিমা জগতে প্রচার করিতে লাগিল। নাথমুনির অধ্যবসায়ে দুষ্টপ্রকৃতিলোকসকলের সুমতিলাভ ও দিব্যজ্ঞান জন্মিলে উহারা নিম্নলিখিত শ্লোকোচ্চারণ করতঃ অহর্নিশ শ্রীমান্ শঠকোপমুনির শ্রীপাদবন্দনা করিয়া তাঁহাকে ভক্তিভাবে পূজাকরতঃ তাঁহার বিরচিত দিব্যপ্রবন্ধ সদা অনুসন্ধান করতঃ দেহাবসানে মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। যথাঃ—শঠকোপমুনিং বন্দে শঠানাং বুদ্ধিদূষণং ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীরামদাস ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

# শিশির।

কোন্ কল্পকাননের ঝরে-পড়া পবিত্র উশীর?
হে ক্ষুদ্র শিশির!
কোন্ হবির্ধূমগন্ধি, ইঙ্গুদীর স্নেহ-দীপ-জ্বালা,
শান্ত তপোবনচ্ছায়ে পুষ্পে পর্ণে অর্চ্চনার ডালা,
সেথা কি চন্দনলেখা অঙ্গলীন বনতুলসীর?
হে ক্ষুদ্র শিশির!

অথবা কি পূজাশেষে সিঞ্চিত এ সুগন্ধ নির্ম্মল
পূত শান্তিজল?
বিশাল মণ্ডপতলে তরুলতা অবনত শির,
অগণিত ভক্তসম নির্ণিমেষ আনন্দ-নিবিড়,—
ঝর ঝর নতশিরে মাঙ্গলিক আশীস তরল
একি শান্তিজল?

বিবশা ধরণী জাগে নিদ্রাহীন বাসক-শয্যাতে
শুভ্র মধুরাতে;—
বাঞ্ছিতের আলিঙ্গনে তরঙ্গিত শোণিত উচ্ছল,
রোমাঞ্চিত কিশলয়ে বিকশিত পুলক চঞ্চল,
শিথিল মুকুতামালা লাজারুণ শারদ প্রভাতে,
নিদ্রাহীন রাতে।

কিম্বা বিশ্বমাতৃস্নেহ বিগলিত করুণা তরল
একি অশ্রুজল?
নিরুদ্ধ বাসনা হেরি' বিকশিত নিখিলের মাঝে
বুঝি তৃপ্ত মাতৃত্বের মর্ম্মগান স্নেহ-গাথা বাজে,—
জননীর উৎসারিত স্নেহধারা আবেগ-উচ্ছল
একি অশ্রুজল?

নিখিলের চিত্তসিন্ধু-বিমথিত প্রমূর্ত্ত কল্পনা,
অয়ি হিমকণা!
ক্ষুদ্র মর্ম্মণতলে বিম্বিত কি নিখিলের হাসি?—
সীমার বন্ধন মাঝে অসীমেরে তুলেছ বিকাশি'!—
তপঃসিদ্ধা গৌরীসমা পরিপূর্ণ অন্তর-বাসনা,
অয়ি হিমকণা!

উষার আলোক-স্নাত অম্বরের চুম্বন অধীর,
হে ক্ষুদ্র শিশির!
বাঞ্ছিতেরে বক্ষে লভি' পলে পলে হে ক্ষুদ্র মহান্!
নিঃশেষিত বাসনায় অবহেলে কর আত্মদান;
কোন্ দীপ্ত জ্যোতিপথে ভেসে যাও মুক্তঅশরীর?
হে ক্ষুদ্র শিশির!

শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ।

# বর্ণতত্ত্ব।

এই দৃশ্যমান জগতের দিকে তাকাইলেই আমরা বিবিধ বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই। একটি ফুল বাগানের দিকে চাহিলে কাহার হৃদয় না পুলকে নৃত্য করিতে থাকে, প্রকৃতির এই বিবিধ বর্ণের বিকাশে কাহার হৃদয় না বিস্ময়ে অভিভূত হয়। অনুসন্ধিৎসু মানব এই সমস্ত দেখিয়া কখন চুপ করিয়া থাকিতে পারেনা, তাই তাহারা বিচিত্র বর্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন, এই বর্ণতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কি? দৃশ্যমান জগতে এই বর্ণবিকাশে কি কাহার বিশেষ কোন উপকার হইয়াছে? ইহার সহিত মানব জগতের কোন বিশেষ সম্পর্ক আছে কি? এই সব তত্ত্ব আলোচনা করিবার শক্তি আমার নাই তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে মানুষের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই জগতে অনেক জিনিষেরই কোন প্রয়োজন ছিল না, সুধু এই বর্ণ বিকাশ কেন? বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখিলে তবু মানুষের চিত্ত অন্ততঃ কিছু কালের জন্য পুলকিত হয়; কিন্তু এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা মানুষের বিশেষ কোনও কাজে আসে না। সুতরাং এই জগতে যাহা আছে তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা জানিবার জন্যই মানুষ উৎসুক হইয়া ঐ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছে এবং করিতেছে।

বর্ণতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে বর্ণ বা রং জিনিষটা কি। ঐ জিনিষটা লোহিত বর্ণের, ঐ জিনিষটা পীতবর্ণের—একথা গুলি সব সময়েই ঐ জিনিষ গুলির পক্ষে প্রযোজ্য নহে, বিশেষ বিশেষ আলোর ভিতর দিয়া দেখিলে জিনিষ গুলিকে বিশেষ বিশেষ বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন যে কোন পীত বর্ণের জিনিষ রাত্রে পীত বলিয়া বোধ হয় না পরন্তু উহাকে প্রায় সাদা (Grey) বলিয়াই মনে হয়। বর্ণ কেবল ইথার তরঙ্গমালা ব্যতীত আর কিছুই নহে। গাছের পাতা সবুজ বর্ণ ইহা বলিলে এই বুঝায় যে ঐ পাতা গুলির প্রত্যেক বিন্দু ইথারে সর্ব্বদা ছোট ছোট ধাক্কা দিতেছে; ঐ ধাক্কা ইথারের ভিতর একটা আলোড়ন উপস্থিত করিয়া রীতিমত একটি তরঙ্গমালা সৃষ্টি করিয়াছে এবং সেই ঢেউগুলি আমাদের চোখের (Retina) উপর পড়িয়া মস্তিষ্কের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। এই আন্দোলন হইতেই বর্ণের অনুভূতি হইয়াছে। ইথারের এই তরঙ্গগুলি সব এক মাপের নহে পরন্তু বিভিন্ন মাপের হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ উহাদের দৈর্ঘ্য ও গতি মাপিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি যে বিশুদ্ধ রং সাতটি লোহিত, কমলা, পীত, হরিত, নীল, ইণ্ডিগো এবং ভায়োলেট (বেগুনি)। কাল এবং সাদা কোন বিশেষ রং নহে; সাতটি রঙ্গের সমস্তগুলি মিশ্রিত হইলে সাদা এবং সমস্ত গুলিরই অভাব হইলে কাল রং হয়। সূর্য্য রশ্মি যদি একটি অতি সূক্ষ্ম ও লম্বা ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটী ত্রিকোণ বিশিষ্ট কাচ ফলকের (Prism) উপরে ফেলান যায় তবে দেওয়ালের গায়ে আমরা সাতটী রং দেখিতে পাই। মেঘস্থিত জলকণাগুলির কার্য্য কাচফলকের ন্যায়। সুতরাং ঐ জলকণাগুলির উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে আমরা আকাশে রামধনু দেখিতে পাই। উপরোল্লিখিত সাতটী রঙ্গের কোনটিকেই এই উপায়ে কাচখণ্ড সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায় না বলিয়া উহাদিগকে বিশুদ্ধ রং বলে। কিন্তু ঐ সাতটিই মৌলিক রং নহে, মৌলিক রং মাত্র তিনটী—লোহিত, হরিত, নীল; এই তিনটী রং হইতেই আবার চারিটী রং উৎপন্ন করা যাইতে পারে এবং উহাদের নির্দ্দিষ্ট ভাবে মিশ্রণে সাদার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ইথারে উৎপন্ন তরঙ্গগুলির মধ্যে যে গুলি খুব দীর্ঘ কিম্বা যে গুলি খুব ক্ষুদ্র তাহারা আমাদের চোখের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কের কার্য্য করিতে পারে না। যে ঢেউগুলি মাঝামাঝি রকমের সে গুলি হইতেই আমাদের বর্ণের অনুভূতি হয়। যে তরঙ্গগুলি হইতে লোহিত বর্ণের উৎপত্তি হয় সেগুলিই বর্ণোৎপাদক

ঊর্ম্মিমালার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ; ভায়োলেট বা বেগুনি রঙ্গের ঢেউ সর্ব্বাপেক্ষা ছোট এবং কমলা রঙ্গের ঢেউ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী।

জগতে যাবতীয় পদার্থের মধ্যে কয়েকটী মাত্র পদার্থের মধ্য দিয়া তরঙ্গ অবাধে যাইতে পারে। কতকগুলির মধ্য দিয়া তরঙ্গমালা আংশিকভাবে চলিয়া যায় এবং যে গুলি যাইতে না পারে সেগুলি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে আর কতকগুলির মধ্য দিয়া তরঙ্গমালা মোটেই চলিতে পারে না। কাচের ভিতর দিয়া সব ঢেউই চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সব ঢেউই সমান গতিতে কিম্বা একই পথে যায় না। প্রত্যেকটিই বিভিন্নরূপ বক্রপথে চলিয়া থাকে। পীতোৎপোদক ঢেউগুলির পথ যত বাঁকা লোহিতোৎপোদক ঢেউগুলির পথ তত বাঁকা নহে। ভায়োলেটের পথগুলি আবার সকলের চেয়েও বাঁকা। কাজেই বিভিন্ন রঙ্গের মিশ্রণে উৎপন্ন সাদা আলো কাচের ভিতর প্রবেশ করিয়া বাহির হইবার সময় বিভিন্ন পথে বিভিন্ন ভাবে বাহির হইয়া আসে। সূর্য্যরশ্মি জলকণার উপর পড়িয়া এরূপ বিভিন্ন পথে বাহির হয় বলিয়াই আমরা বৃষ্টির প্রাক্কালে আকাশে রামধনু দেখিতে পাই।

এই বর্ণবিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটী দেখিয়া আমরাও বিজ্ঞানাগারে সূর্য্যরশ্মিকে ভাগ করিতে শিখিয়াছি। প্রথমে একটী বড় জলবিন্দু একটী গোল কাচের পাত্রের ভিতরে রাখিয়া সূর্য্যরশ্মিকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং রামধনুর তুল্য একটী ধনুতে সকল রঙ্গের বিকাশ দেখিতে পাই কিন্তু উহা রামধনুর মত তত স্পষ্ট হয় না। ত্রিকোণ একটী বোতলের ভিতর জল রাখিয়া সূর্য্যরশ্মি পাতিত করিলে দেওয়ালের গায়ে বর্ণমালার বিকাশ দেখিতে পাই। জলের পরিবর্ত্তে তারপিন তৈল, বাদাম তৈল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াও বিভিন্ন বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূর্য্য রশ্মি বিশ্লিষ্ট বর্ণমালাকে spectrum বলে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি একই বস্তু আলোকের বিভিন্নতায় বিভিন্ন বর্ণের দেখা যায়। একটী নীলবর্ণ বিশিষ্ট জিনিষের নীল রংটী যদি বিশুদ্ধ হয় তবে ইহাকে সূর্য্য রশ্মিবিশ্লিষ্ট বর্ণমালার (spectrum) নীল ছাড়া অন্য যে কোন বর্ণের ভিতরে রাখিলেই কাল দেখা যাইবে। কেবল নীল আলোক ভিতরে রাখিলেই নীল দেখাইবে। ইহার কারণ কি? নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করা কতদূর সাধ্যায়ত্ত জানিনা তবে বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ইহার এই উত্তর দেওয়া যায় যে ঐ নীল পদার্থটী নীল ছাড়া অন্য কোন আলোককেই ফিরাইয়া দেয় না। উহাতে কেবল মাত্র নীল আলোকটী প্রতিফলিত হয় তাই আমরা ঐ জিনিষটীকে সূর্য্যের আলোকে নীল দেখি। তবে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক জগতে বিশুদ্ধ রঙ্গের জিনিষ বড় পাওয়া যায় না। আমরা যাহা নীল কিম্বা লাল দেখি তাহা বিশুদ্ধ নীল বা বিশুদ্ধ লাল নহে পরন্তু কতকগুলি রঙ্গের মিশ্রণ মাত্র। কোন রং বিশুদ্ধ কি না তাহা পরীক্ষা করিতে গেলে সেই জিনিষটী সূর্য্যরশ্মিমালার প্রত্যেক রশ্মির ভিতর দিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যদি বর্ণটী বিশুদ্ধ হয় তবে সেই বর্ণের রশ্মির ভিতর দিয়াই উহাকে ঐ বর্ণবিশিষ্ট দেখা যাইবে এবং অন্য বর্ণের ভিতর দিয়া দেখিলে উহাকে কাল দেখা যাইবে। কিন্তু যদি ঐ বর্ণ কতকগুলি বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয় তবে সেই বর্ণের আলোর ভিতর দিয়া দেখিলে উহা বিভিন্ন প্রকারের রং বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইবে। একটা ভায়োলেট নীল ও হরিতের মিশ্রণে নীল রং বিশিষ্ট কোন পদার্থ, যদি লোহিত পীত কিম্বা কমলা রঙ্গের আলোর ভিতর দিয়া দেখা যায় তাহা হইলে উহাকে কালো দেখা যাইবে কিন্তু ভায়োলেটের ভিতর দিয়া দেখিলে ভায়োলেট, হরিতের ভিতর দিয়া দেখিলে হরিত এবং নীলের ভিতর দিয়া দেখিলে নীল দেখা যাইবে।

পদার্থমাত্রই পরমাণুদ্বারা নির্দ্দিষ্টভাবে গঠিত। বৈজ্ঞানিকগণ ঐ পরমাণু সন্নিবেশের সঙ্গে বর্ণোৎপাদনের সম্বন্ধ বাহির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং কিয়ৎপরিমাণে যে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, তবে এখনও এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। কতকগুলি ধাতু আছে যেমন তামা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রমিয়াম্, কোবল্ট—উহারা যে জিনিষের

মধ্যে আছে তাহারা সকলেই প্রায় নানা বর্ণের বিকাশ করে। আল্‌কাত্‌রা হইতে বহুবিধ রং বাহির হইয়াছে—এগুলিও পরমাণু সন্নিবেশেই হইয়াছে।

এ রংটা কেন লাল হইবে, ঐ রংটা কেন নীল হইবে এ সকলের কি উত্তর আছে বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ নানা উপায়ে আজকাল পীত কিম্বা কমলা রংকে হরিত, নীল কিম্বা ভায়োলেটে পরিবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারা শুধু অণুপরমাণু সন্নিবেশের বিভিন্নতা দ্বারাই ইহা করিতেছেন। এনিলিন রংএর কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। এনিলিনের নামানুসারেই অনেক গুলি রংএর সাধারণ নামও "এনিলিন রং" হইয়াছে। এই এনিলিন পরিবার ভুক্ত রংগুলি কৃত্রিম উপায়ে নির্ম্মিত এবং তাহারা বাজার হইতে প্রকৃতিজাত রংগুলিকে সম্পূর্ণ রূপে দূর করিয়া দিতেছে। এলিজিরিন, নীল প্রভৃতি আজকাল রসায়নাগারেই তৈয়ারী হইতেছে এবং উহাদের পরমাণুসন্নিবেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ তজ্জন্য আরও অনেক প্রকার রং প্রস্তুত করিতেছেন।

উদ্ভিদের একটা সাধারণ বর্ণ আছে তাহা হরিত। হরিতবর্ণের পরমাণু সন্নিবেশ ঠিক করা এ যাবত হয় নাই। ঐ হরিতবর্ণকে ক্লোরোফিল বলা হয়। রক্তের লালবর্ণকে হিমগ্লোবিন বলে। উহাদের পরমাণু সন্নিবেশ ঠিক হইলে বিজ্ঞানাগারেই কৃত্রিম উপায়ে ঐ জিনিষ গুলি তৈয়ার করা সাধ্যায়ত্ত হইবে সন্দেহ নাই।

ফুলের রং বৈচিত্রপূর্ণ। উহাদের মধ্যে নানাপ্রকার বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। এক একটী ফুল বিশ্লেষণ করিয়া পীত এবং লাল কিম্বা নীল প্রভৃতি রংএর অবস্থান দেখা গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাগারে ঐ পীত রঙ্গের পরমাণু সন্নিবেশ ঠিক করিয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা উহাকে নীল কিম্বা লাল রঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং ঐবর্ণ গুলির একত্র অবস্থানে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইবার নাই। বিজ্ঞানাগারে যে প্রণালীতে ঐ পীতরংকে লাল কিম্বা নীলে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে প্রাকৃতিক জগতেও ঐরূপ কোনও প্রক্রিয়ার দ্বারাই বিভিন্ন রংএর উৎপত্তি হইয়াছে। তবে যাবতীয় প্রাকৃতিক জিনিষ গুলিকে কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ারী করা কতদূর সাধ্যায়ত্ত হইবে তাহা বলা যায় না, কিন্তু পণ্ডিতগণ যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীকুমুদবিহারি সেন।

# রায় হরিচরণ শর্ম্মা বাহাদুর।

## চা-বাগানে।

হরিচরণ আবার মোক্তারি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দিনমান মক্কেল লইয়া গলাবাজি করা তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। নূতন নূতন জ্ঞান লাভের জন্য সর্ব্বদাই তিনি অবসর খুঁজিতেন আর মেঘের ডাকে ময়ূর যেমন পুলকিত হইয়া উঠে, বিপদ দেখিলে হরিচরণও তেমনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন ইহার সাক্ষ্য বহন করিবে।

এই সময় কাছাড়ে চা গাছের আবিষ্কার হয়। ইহার ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ জানিয়া দলে দলে ইংরাজ আসিয়া কাছাড়ে চা-বাগান খুলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে শিলচরের এলাকায় ঘুংগুরপার বাগিচার পত্তন হইল। হরিচরণ সেখানে ২০৲ টাকা বেতনে বড় বাবুর পদে ভর্ত্তি হইলেন।

একএকটা চা-বাগান চালান যে কত বড় শক্ত ব্যাপার, ভুক্তভোগী ছাড়া তাহা কেহ সম্যক্ বুঝেনা। প্রতি বাগানে তিন চারিশত হইতে দুই হাজার লোক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে থাকে। ইহারা কোল সাওতাল প্রভৃতি সমাজের নিম্নস্তরের মজুর। এতগুলি লোকের রক্ষণাবেক্ষণ, আর জঙ্গল আবাদ ও নালা তৈয়ার হইতে চা প্রস্তুত ও চা রপ্তানি পর্য্যন্ত প্রত্যেককে যথা সময়ে নিজ নিজ কাজে নিয়োগ করা, এবং অলসদের নিকট হইতে কাজ আদায় করা সহজ ত নহেই, ইহাতে ভয়ও পদে পদে। এই কার্য্যে দেহের বল চাই, পরিশ্রমের শক্তি চাই এবং অসাধারণ শাসন ক্ষমতা চাই। হরিচরণের ইহার কোনটিরই অভাব ছিল না। তিনি নিজে খাটিতে জানিতেন, এবং হিংস্র পশুর তুল্য এই শত শত লোককে কলের মত কি করিয়া খাটাইতে হয়, তাহাও জানিতেন। কি করিয়া সংসারের কলকাঠি ঘুরাইতে হয়, হাতিখেদার কাল হইতেই তিনি তাহাতে শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিলেন সুতরাং ঘুংগুরপার বাগান ক্রমেই উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কাছাড়ে চা কৃষি প্রথম আরম্ভ হইবার কালে বাগানের উৎপন্ন হইতে অর্থ লাভের কল্পনা কাহারই ছিল না। সকলেই মনে করিত আগেরদিন চা-বাগানের ছলে কিছু ভূমি পত্তন করিয়া পরদিন তাহা বিক্রয় করিয়া রাতারাতি ধনকুবের হইয়া দাঁড়াইবে। আর তার একটুকু সুবিধাও হইয়াছিল। কাছাড়ে চা বাগিচা খোলা আরম্ভ হইতেই ১৮৫৪ অব্দের আইন এখানেও প্রবর্ত্তিত হইল। সেই আইন অনুসারে পত্তনি ভূমির এক চতুর্থাংশ চিরকালের জন্য নিষ্কর। বাকী তিন চতুর্থাংশ প্রথম ১৫ বৎসর নিষ্কর। তারপর দশবৎসর একর প্রতি খাজানা তিন আনা মাত্র। তারপর ৭৪ বৎসর একর প্রতি দুয়ানা। ধনকল্পনার কবিদের পক্ষে এ লোভ সম্বরণ করা বড় শক্ত। সুতরাং কোম্পানির পর কোম্পানী গঠিত হইতে লাগিল, বাগিচার পর বাগিচা পত্তন হইতে লাগিল। সে সব বাগিচার কোন মূল্য ছিল না; অনেক স্থলে একটি দুইটি চায়ের ডালা পুঁতিয়াই বাগিচার নামকরণ হইত। কোন কোন স্থলে বা পত্তনির হস্তান্তর হইলে বাগিচার অস্তিত্ব দলিলমাত্রে আশ্রয় লইয়াছে দেখা যাইত। শেষকালে এর চরম আসিল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। বহু উদ্যম ফেইল পড়িয়া গেল। বহু কোম্পানি সর্ব্বস্বান্ত হইল।* টিকিল কেবল তারা, যারা কল্পনা ছাড়িয়া বাস্তবের পূজা করিয়াছিল এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত শেষকালের প্রতীক্ষা করিতেছিল। যাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অমোঘ বুদ্ধিপ্রয়োগে কয়েকটি মাত্র কোম্পানী ধ্বংসের হাত এড়াইতে পারিয়াছিল, হরিচরণ তাহাদের মধ্যে একজন।

একএকটি বাগান তৈয়ারি করিতে খাটুনি যথেষ্ট। প্রথমে ডিসেম্বর—জানুয়ারীতে চাষ করিতে হয়।

---

* "Scarcely any one interested" says Mr. Edgar, who was Deputy Commissioner at that time, "looked forward to obtaining his return from the produce of his cultivation. Everyone looked forward to becoming suddenly and immensely rich by getting a piece of land, planting it out with tea and then selling it for a vastly greater sum than he had expended on it."

Assam District Gazetter.
Vol. I, Chap. IV, P. 79.

চারা গুলি তিন চারি ইঞ্চি উচুঁ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ছায়ায় রাখিতে হয়। এপ্রিল ও জুলাই পর্য্যন্ত রোপণের সময়। তখন হইতে দৃষ্টি রাখিতে হয় যেন বাগানে জল জমিয়া না যায়। চার পক্ষে গরম ও আর্দ্র বায়ু খুব ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত ভিজা মাটি বড় খারাপ। তাই জল নির্গমের জন্য নালা কাটিয়া দিতে হয়, আর বৎসরে কয়েকবার মাটি কোদলাইয়া দিতে হয়।

কিন্তু এসব পরিশ্রমের উপরেও গুটি সংগ্রহ। কারণ বাগানের উন্নতি বীজ বা গুটির গুণ ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সে সময় অনেকগুলি বাগান একসঙ্গে খোলায় বীজের বড়ই অনটন ঘটে। সুতরাং তখন গুটি সংগ্রহই চা-বাগানের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম হইয়া পড়িল।

মণিপুরী গুটির জন্য তখন খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। কারণ মণিপুরী চা গুণেও ভাল, ফসলও দেয় বেশী। বিচক্ষণ হরিচরণ মণিপুরের সঙ্গে এই গুটির কারবার একচেটিয়া করিয়া নিবার জন্য কোম্পানীর আদেশ লইয়া মণিপুর যাত্রা করিলেন।

হরিচরণকে তিন মাস কাল মণিপুরে থাকিতে হইল। এই তিন মাসে তিনি মণিপুরী ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইলেন। জ্যোতিষেও তাঁর অধিকার ছিল, আর সকলের উপরে, তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী, জ্ঞানী, ও ধর্ম্মাচরণশীল। পরকে বশ করিতে তাঁর বেশী সময় লাগিত না। তার উপর যখন তিনি একদিন রাজসভায় বসিয়া মণিপুরী পণ্ডিতদের সঙ্গে কুষ্ঠী বিচারে জয়লাভ করিলেন, মণিপুরের রাজা চন্দ্রকীর্ত্তি তখন তাঁর সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া গেলেন। হরিচরণের মণিপুর যাত্রার উদ্দেশ্য তখন আর অপূর্ণ রহিল না। তিনি তিন মাস পর চন্দ্রকীর্ত্তির কাছে বিদায় লইয়া এক জোড়া শাল, এক জোড়া সুবর্ণ বলয় ও একসেট্ কাণের অলঙ্কার উপহার পাইয়া কাছাড়ে ফিরিয়া আসিলেন। কোম্পানী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁর বেতন ২০৲ টাকার স্থলে ৫০৲ টাকা করিয়া দিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ কাহারও ভুলিবার নয়। সিপাহী-বিদ্রোহের প্রবল বন্যা তখন সমস্ত ভারতের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে বিদ্রোহীর দল হারিয়া হারিয়া দিগ্‌বিদিকে পালাইতে থাকে। মার্চ্চ মাসে একদল বিদ্রোহী সৈন্য চট্টগ্রাম হইতে কাছাড়ের দিকে পলায়ন করে। চা-বাগানের সাহেবেরা এ সংবাদে যার পর নাই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তার পর যখন খবর আসিল যে লাতুতে * বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরকারী সিপাহিদের এক লড়াই হইয়া গিয়াছে, ঘুঙ্গুরপারের ডেভিড্‌সন্ সাহেব তখন অস্থির হইয়া পড়িলেন। নির্ভীক হরিচরণ তাঁহাকে সাহস দিয়া বাগিচা রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র এক দল গঠন করিলেন। দলে ছিল ২৫ জন লোক—বাঙ্গালী শিকারী ও কুলি চৌকিদার। এই ক্ষুদ্র দলটি বন্দুক কাঁধে করিয়া রোজ কসরৎ করিত ও পাহারা দিত। হরিচরণ স্বয়ং ছিলেন তাদের দলপতি।

এক দিন খবর আসিল, বাগিচার তিন চারি মাইল দক্ষিণে ১০ | ১২ জন বিদ্রোহী জড় হইয়াছে। শুনিবা মাত্র হরিচরণ তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। বিদ্রোহীরা প্রথমে আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু হরিচরণের দলে একটি লোক ছিল—রূপাই চৌকিদার, হাত তার কখন কাঁপিত না; লক্ষ্য তার কখন ব্যর্থ হইত না। তার প্রথম গুলিতেই বিদ্রোহীদের সর্দ্দার ধরাশায়ী হইল। তখন বাকী বিদ্রোহীরা যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। হরিচরণ আপনার লোকদের লইয়া তাহাদের অনুসরণ করিলেন, কিন্তু তিনটি স্ত্রীলোক ছাড়া আর কাহাকেও ধরিতে পারিলেন না। অগত্যা হত ব্যক্তির মৃতদেহ এবং এই স্ত্রীলোক তিনটিকেই শিলচরের ডেপুটি কমিসনর ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কাছে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিবার জন্য, একটি মেডেল, নগদ পাঁচশত টাকা, এবং বিনা খাজানায় দশ বৎসরের জন্য চাতলবিল নামক জলমহালের বন্দোবস্ত দিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

এই বিদ্রোহ ব্যাপার ভিন্ন আরও বহু ঘটনায় আমরা হরিচরণের নির্ভীক বীরত্বের প্রমাণ পাই। ঘুঙ্গুর-

* সিলেট জেলায়, করিমগঞ্জ সবডিভিসনে।

পার বাগিচার ম্যানেজার সাহেব একদিন মদ খাইয়া মাতাল হইয়া এক প্রকাণ্ড ছোরা লইয়া কুলিদের তাড়া করিল। কুলিরা ভয়ে দৌড়াদৌড়ি ও চেঁচাচেচি করিতে লাগিল, কিন্তু সাহেবকে বাধা দিতে কেহই সাহস করিল না। হরিচরণ বাহির হইয়া দেখেন মারাত্মক ঘটনা; এই মাতালকে কেহ ধরিতে না পারিলে দুই একটি লোক খুন এখন হইতেই বা কতক্ষণ? সাহসে ভর করিয়া তিনি সাহেবের দিকে ছুটিলেন। পেছন হইতে বহুলোকে বাধা দিতে লাগিল, কিন্তু তাঁর করুণ হৃদয় আর্ত্ত বিপন্ন কুলিদের জন্য আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, প্রাণের ভয় তাহাতে স্থান পাইল না। সাহেব যখন দৌড়াইতে দৌড়াইতে একটি অসহায় স্ত্রীলোককে ধরিয়া তার মাথার উপর আষাঢ়ী মেঘের বিদ্যুৎলেখার মত তার প্রকাণ্ড ছোরাখানা তুলিয়াছে, হরিচরণ তখন পেছন হইতে তাকে ধরিয়া ফেলিলেন। সাহেবের ছোরা উঠিতে না উঠিতেই তাঁর বজ্রমুষ্টির মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া গেল। হরিচরণ ছোরা কাড়িয়া লইয়া সাহেবকে একদিকে সরাইয়া দিলেন ও স্ত্রীলোকটিকে আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেব বিষম রাগ করিয়া বলিল "কি? তুই আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলি? আমি তবে ডুবে মরুব।" এই বলিয়া সাহেব নদীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

বর্ষার পার্ব্বত্য নদী তখন আবর্ত্তে ফুলিয়া ফুলিয়া চলিয়াছে। পাহাড় কাঁপানো সে জলের গর্জ্জন, পাষাণ উড়ানো সে স্রোতের বেগ। সাহেব তাহাতে ঝাঁপ দিল! এখন কে এ পাগলকে বাঁচাইবে? এ বিষম স্রোতে, নিজের প্রাণ লইয়া উঠিয়া আসাই একজনের পক্ষে শক্ত; তার উপর সাহেব সাঁতার জানেন না, আর তারো উপর কোট, প্যাণ্ট, জুতা, ভিজিয়া বিষম ভারি হইয়াছে। ইহাকে তুলিতে যাওয়া, আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা। কিন্তু এসব ভাবিবার আর সময় নাই—তিল মাত্র অবকাশ নাই। একমুহূর্ত্ত বিলম্বের অর্থ একটি বিধাতার জীবের অকাল মৃত্যু। লোক তীরে দাঁড়াইয়া তার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, এদিকে হরিচরণ দুর্গা দুর্গা বলিয়া সেই নাচন্ত মৃত্যুস্রোতে লাফাইয়া পড়িলেন। যেখানে তিনি ম্যানেজার সাহেবের নাগাল পাইলেন সৌভাগ্য বশতঃ সেখানে পাড় ভাঙ্গিয়া একটি প্রকাণ্ড গাছ কাৎ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি এক হাতে সাহেবের দেহ ও একহাতে সেই গাছের ডাল আঁকড়িয়া ধরিলেন এবং সেই গাছের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে সাহেবকে কূলে টানিয়া তুলিলেন। জলে পড়িয়া সাহেবের সকল নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল, উদ্ধার পাইয়া তিনি হরিচরণের শিরে ধন্যবাদের রাশি বর্ষণ করিলেন।

## বিবাহ।

সংসারের যন্ত্রঘরে বিধাতার হাতের যে কলকাঠিটি, তার নাম সাম্য বা রক্ষণ। দেব দানবে, জড়ে অজড়ে যে এই বিশ্বব্যাপী একটা প্রকাণ্ড নাড়াচাড়া আর ভাঙ্গা গড়া চলিতেছে, এর মধ্যে একখানে যে টুকু তিলমাত্র ক্ষতি হয়, আরখানে তার নিক্তির ওজনে পূরণ হইয়া যায়। গ্রীষ্মের উত্তাপে একদিকে যেমন নদী পুকুর শুকাইয়া যায়, আরদিকে তেমনি বায়ুমণ্ডল জলকণায় ভরিয়া উঠে। বর্ষার স্রোতে একদিকে যেমন পাহাড় কাটিয়া নামায়, আর দিকে তেমনি পলির পর পলি ফেলিয়া নিম্নভূমিকে উন্নত করিয়া তোলে। যেমন জড় জগতে, তেমনি অন্তর্জ্জগতে এ অপূর্ব্ব কলকাঠি ঘুরিতেছে। এক মানুষ যদি দুঃখী হইয়া জন্মে, দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য আর মানুষের হৃদয়ে দয়ার সাগর উথলিয়া পড়ে। অন্ধ যদি পথে দাঁড়াইয়া কাঁদে, তাকে পথ দেখাইবার জন্য চক্ষুষ্মানের হৃদয় আকুল হইয়া উঠে। আর এই যে পুরুষ সমস্তটা দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বাহিরের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে শ্রান্তদেহে ক্লান্তপ্রাণে বাড়ী ফিরিয়া আসে, ঘরে আসিলে এরও জন্য একটা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে,—তা মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর ভালবাসা, পুত্রকন্যার আদর। ষোল বৎসর হরিচরণ গৃহহারা বনবাসীর মত ঘুরিলেন, বনে বনপশুর মধ্যে, পাহাড়ে বর্ব্বরদের মধ্যে, কখনো অনাহারে কখনো অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইলেন—জীবনের সমস্ত ক্ষতিকে অকুণ্ঠিত চিত্তে অতর্কিত আগ্রহে গ্রহণ করিলেন—এখন তাঁর ক্ষতি পূরণের কাল আসিল। লাভের অঙ্ক তাঁর বাকীর ঘরেই কেবল জমা হইয়া উঠিতেছিল—ভগবান তার

আহারের ব্যবস্থা করিলেন। যে সোণার স্বপ্ন সফল করিবার জন্য মানুষ জীবনের শত দুঃখকে পরম লাভের মত বরণ করিতে পারে, যে সুখের ক্ষণিক আস্বাদে সংসারের তীব্র কষাঘাত মানুষ বনপথের বনলতার আঘাতের মত ভুলিয়া যায়, হরিচরণের জন্য অভ্রান্ত নিয়তি সেই পুরস্কার ব্যবস্থা করিল—হরিচরণের ঘরে সতী লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইল!

শ্রীহট্টজিলায় করিমগঞ্জ সবডিভিসনে বীরশ্রী গ্রাম। জানি না, এই অপূর্ব্ব নামটির কোন সার্থকতা আছে কি না, কিন্তু যে শ্রী আমাদের কর্ম্মবীর হরিচরণকে বরণ করিয়াছিলেন, বীরশ্রী গ্রামেই তাঁর জন্ম হইয়াছিল। ইনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সনাতন চক্রবর্ত্তীর কন্যা মহামায়া। শুভদিনে শুভক্ষণে তাঁর সঙ্গে হরিচরণের বিবাহ হইয়া গেল। মা করুণাময়ী ধান দুর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া নববধূকে কোলে তুলিয়া নিলেন। সে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে।

বিবাহের পর হরিচরণ আরামে গা ঢালিয়া দিলেন না। নূতন কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁর শ্রান্ত হৃদয়কে পরশমণির জীয়নকাঠি ছোঁয়াইয়া জাগাইয়া তুলিল। নূতন তেজে আবার তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলেন।

শ্রাবণের ঘন বর্ষণের পর ভাদ্রমাসের শেষে আকাশ যখন আবার নীল হইয়া আসিল, পার্ব্বত্য প্রকৃতি যখন স্নাতের মত পবিত্র, ভুক্তের মত শান্ত, নিদ্রিতের মত সমাহিত দেখাইতে লাগিল, হরিণ শিশুর সহজলম্ফে ও বলাকামালার হর্ষকাকলিতে বাতাস যখন মুখর হইয়া উঠিল, হরিচরণ তখন আবার শৈলপথে মণিপুর যাত্রা করিলেন। কীর্ত্তিচন্দ্র এবারে তাঁকে গুরুবৎ ভক্তি করিতে লাগিলেন এবং নির্জ্জনে তাঁহার কাছে ধর্ম্মের আলোচনায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। একদিন হরিচরণ রাজমণ্ডপে উপস্থিত হইতে না পারিলে রাজা চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। রাজ্যের পাত্রমিত্র যাহারা ছিলেন, হরিচরণের এ প্রতিপত্তি তাহাদের একেবারেই ভাল লাগিল না। তাঁরা আরও ক্ষুব্ধ হইলেন, যখন দেখিলেন যে, হরিচরণের জ্ঞানের কাছে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি রাজার চক্ষুতে নিতান্তই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। এর উপর এক ঘটনা ঘটিল।

রাজার এক তহসিলদার তহবিল-তছ্রূপ অপরাধে অভিযুক্ত হয়। মণিপুরের রাজধর্ম্মমতে এ অপরাধের একমাত্র দণ্ড মৃত্যু। অপরাধীর উপরও সে কঠোর আজ্ঞা প্রচার হইল। হরিচরণ সন্ধ্যার সময় ইষ্টপূজার আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় অপরাধীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সারা দিবসের সকল কর্ম্মাকর্ম্ম ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া দিবার সময় অপরিচিতা রমণীর বিপন্নমূর্ত্তি দেখিয়া হরিচরণের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাবিলেন, "জানি না এ নারী কি চায়, কেন কাঁদে, কিন্তু এর চোখের জল মুছাইতে হইবে—নহিলে আমার ইষ্টপূজা সার্থক হইবে না।"

মনে মনে সংকল্প করিয়া হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও মা? তোমার চোখে জল কেন?" হতভাগী মা কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা খুলিয়া বলিল, আর বলিল "বাবা, আমার অন্ধের নড়ি একমাত্র পুত্র, তাকে তোমার বাঁচাইতেই হইবে নইলে তোমার দুয়ারে আজ নারীহত্যা।"

হরিচরণ চিন্তিত হইয়া বলিলেন "মা, এত বড় শক্ত কাজ। তোমার সন্তান অপরাধী, এবং অপরাধের দণ্ড দেওয়াই রাজধর্ম্ম। আমি কি করিয়া রাজাকে রাজধর্ম্ম লঙ্ঘন করিতে অনুরোধ করি?"

"দণ্ড কর, আমার তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু প্রাণ নিও না। প্রাণদণ্ড ছাড়া কি তোমাদের শাস্ত্রে শাস্তির বিধান নাই?"

"মা, মণিপুরের আইন মতে তহবিল তছ্রূপের শাস্তি প্রাণদণ্ড, এবং সেই আইন মানিয়া চলাই রাজধর্ম্ম।"

রমণী বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। এলো কেশের সিক্তগুচ্ছ চোখের উপর হইতে সরাইয়া লইয়া কাতর দৃষ্টিতে উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, তোমার রাজধর্ম্ম কি কেবল প্রাণ নেওয়াতেই? প্রাণ রাখাতে নয়? রাজার কর্ত্তব্য কি কেবল যত অনাথ অভাগী মায়ের মাথায় বজ্রাঘাত ফেলা, আর তার চোখের জল মুছানো নয়? তিনি কি শুধু রাজকোষের জমাখরচের খাতাই পড়েছিলেন? আর শিশুহারা মা'র অন্তরের

ব্যথা পড়ে নাই?" রুদ্ধকণ্ঠ নারী হরিচরণের মুখের-দিকে চাহিয়া রহিল—হরিচরণ স্তম্ভিত! পুত্রশোক কাতরার এ প্রশ্নের কি উত্তর?

হরিচরণ অনেকক্ষণ ভাবিলেন। রাজাকে অনুরোধ করিলে রাজা রুষ্ট হইবেন নিশ্চয়। রাজ রুষ্ট হইলে গুটির কারবারে সুবিধা হইবে না। কোম্পানীর কাছে তাঁকে খাটো হইতে হইবে; হয়ত চাকুরী লইয়াই টান পড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে রাজার ভক্তি ত হারাইবেনই। এদিকে আবার এক হতভাগিনী মাতার এই যে প্রশ্ন, আপন হৃদয় রাজ্যের দুয়ারে এর জবাব কিসে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন "যাও মা, আমার অনুরোধে যদি হয়, তোমার সন্তান প্রাণ পাইবে।" রমণী হরিচরণের পায়ের ধূলা লইয়া বিদায় হইল।

পরদিন সভায় হরিচরণ রাজার কাছে অপরাধীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। প্রার্থনা শুনিয়া রাজার মুখের উপর একখানা কালো ছায়া ঘনাইয়া উঠিল কিন্তু তিনি কোন উত্তর করিলেন না। অবজ্ঞার অপমানে ক্ষুণ্ণ হরিচরণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; তার মুখে চোখে রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিল। আর দুষ্ট সভাসদেরা চোখ ঠারাঠারি আরম্ভ করিল।

রামসিং মেজরের বাড়ীতে হরিচরণের বাসা ছিল। সন্ধ্যার সময় মেজর হরিচরণকে মিষ্টভর্ৎসনায় বলিলেন "ছি! এমন করিয়া কি নিজের প্রতিপত্তি খোয়াইতে আছে?" হরিচরণ উত্তর করিলেন "আমি যা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি, তাহাই করিয়াছি; ইহাতে প্রতিপত্তি থাকে থাক, যায় যাক।" রামসিং হাসিয়া বলিলেন "তুমি জ্ঞানী, কিন্তু পাগল!"

সন্ধ্যার পর মনের ক্ষোভের বোঝাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া হরিচরণ ইষ্টপূজা করিলেন। তার পর রান্না করিয়া ভাতের থালা লইয়া বসিলেন—সেদিন এই তাঁর প্রথম অন্ন গ্রহণ হইবে। এমন সময় রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র আসিয়া তাঁর রান্নাঘরের দরজায় উপস্থিত। হরিচরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিতে যাইতে ছিলেন, কীর্ত্তিচন্দ্র তাঁকে বাধা দিয়া বলিলেন, "উঠিবেন না—গুরুর ভোজন হইলে আজ শিষ্য প্রসাদ পাইবে।" হরিচরণ বিষম লজ্জায় পড়িলেন; এই কি রাজ ভোগ? এই সিদ্ধ ডাল আর ভাত? কিন্তু রাজা কিছুতেই ছাড়িবেন না। প্রসাদ আজ চাইই—আশীর্ব্বাদের আজ নিতান্তই প্রয়োজন। অগত্যা হরিচরণকে হার মানিতে হইল।

আহারের পর গভীর নিশার নিঝুম অন্ধকার কৃষ্ণা-দ্বাদশীর ক্ষীণচন্দ্রলেখায় কাঁপিয়া না উঠা পর্য্যন্ত আবার ধর্ম্ম আলাপ চলিল। বিদায় হইবার কালে কীর্ত্তিচন্দ্র বলিলেন "আপনার আজ একি আদেশ ছিল? রাজা হইয়া রাজধর্ম্মের মর্য্যাদা আমি কি করিয়া লঙ্ঘন করি?" হরিচরণ উত্তর করিলেন "মহারাজ, হিন্দুশাস্ত্রে আট রকম মৃত্যুর বিধান আছে; তার একটি অপমান। প্রকাশ্যসভায় মাথামুড়াইয়া অপরাধীকে দেশান্তর পাঠাইয়া দিলে রাজার আইন এবং ব্রাহ্মণের অনুরোধ দুইই রক্ষা পাইত।" রাজা চিন্তিত মনে বাড়ী ফিরিলেন।

পরদিন যখন সেই অপরাধী তহশীলদারের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইয়া গেল, তখন রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "না? এ বাঙ্গালী মণিপুর রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিবে।"

মন্ত্রী নির্জ্জনে রাজমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "এই হরিচরণঠাকুর ইংরাজরাজের গুপ্তচর। মহারাজকে বশ করিয়া মণিপুরের সর্ব্বনাশ করিবে। আপনি আপনার সন্তানকে রক্ষা করুন।" রাজমাতা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! যাও যাও! সত্বর এর ব্যবস্থা কর। যেরূপে পার—এই পাপটাকে সরাও।" মন্ত্রী ইঙ্গিত পাইয়া আনন্দে বাড়ী ফিরিলেন। সেইদিন হইতে হরিচরণের পাছে গুপ্তঘাতক ফিরিতে লাগিল।

এসংবাদ রাজরাণীর কাণে গেল। তিনি কীর্ত্তিচন্দ্রকে বলিলেন—"হরিঠাকুরকে বিদায় করুন, নইলে কিন্তু রাজ্যে ব্রহ্মরক্তপাত হইবে।" কীর্ত্তিচন্দ্র বিস্মিত ও রুষ্ট হইয়া বলিলেন "কি ব্রাহ্মণের রক্তপাত করবে, আমার রাজ্যে কার ঘাড়ে এতটা মাথা?" রাণী উত্তর করিলেন "সেও আপনার পরমগুরু মাতৃদেবী। আপনার নিরাপদের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন—হরিঠাকুরকে তিনি বিশ্বাস করেন না।"

কীর্ত্তিচন্দ্র চিন্তিতমনে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন।

এরপর হরিচরণ যতদিন মণিপুরে ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার শরীররক্ষী থাকিত। রাত্রিকালে বিশ্বাসী সিপাহী বন্দুক কাঁধে করিয়া তার ঘরের চারিদিকে ঘুরিত।

কাত্তিকের শেষে তিনি শিলচর ফিরিলেন। কীর্ত্তিচন্দ্রের লোকজন তাঁকে লক্ষীপুর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিল। এবৎসর শুটির কারবারে বিলক্ষণ লাভ হওয়াতে কোম্পানী তাঁহার বেতন ১০০৲ টাকা করিয়া দিল। সে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হরিচরণ আবার মণিপুরে যান, এবং মণিপুরের রাজার কাছ হইতে একটি হাতী ও একটা ঘোড়া উপঢৌকন পান। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মৌরাপুর বাগিচার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। তখন ব্যারিম্বিথ কোম্পানীর ছ'খানা বাগিচা ছিল—ঘুঙ্গুরপার, লতাকান্দি শিলকুড়ি, সাবাজপুর, মৌরাপুর এবং কেন্দ্রীগুল। ১৮৫৫ অব্দে তিনি ১৫০৲ বেতনে এই ছয় বাগিচার ইন্‌স্পেক্টর, এবং তার ছ'আনা অংশের মালীক হইলেন।

একদিন যার দুবেলা আহার জুটিত না, মাসিক চারিটাকা উপার্জ্জনে একদিন যার দিন কাটিত, সেই হরিচরণ আজ দেড়শত টাকা বেতনভোগী এবং ছয় বাগিচার দুআনা অংশের অধিকারী। কেবলে সংসারে পুরুষকারের পুরস্কার নাই?

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

## এসেছি।

তোমারি দুয়ারে এসেছি আজ!
দেখা দিবে বলে কোথায় লুকালে
কেন লোক ভয় কিসের লাজ?
সুমধুর বাঁশী প্রকৃতির হাসি
উঠেছে ফুটীয়ে ধরণী মাঝ,
হৃদয় আকুল পরাণ ব্যাকুল
হেরিতে তোমার মোহন সাজ।
তোমারি দুয়ারে এসেছি আজ!

২

সাজায়ে রেখেছি হৃদয় কুঞ্জ
মানস-মোহন কুসুম-দলে,
পরাব কণ্ঠে মোহন মালিকা
গেঁথেছি আকুল নয়ন-জলে।
প্রাণ ভরা আশা, প্রেম, ভালবাসা—
ঢালিবে নিরাশা ভাবিনি আজ।
দেখা দিবে বলে কোথায় লুকালে?
এই কি তোমার উচিত কাজ?
তোমারি দুয়ারে এসেছি আজ।

৩

থাকিয়া থাকিয়া গাহিছে পাপিয়া,
সেফালী বিলায় মধুর বাস!
সুনীল গগনে সুধা বরিষণে
চাঁদিমা ছড়ায় মধুর হাস!
মধুর চাঁদিনী হাসিছে যামিনী
নিখিল প্রকৃতি মোহিত আজ,
গোলাপী অধরে সুধা হাসি ভরে
দেখা দাও মোরে কিসের লাজ?
তোমারি দুয়ারে এসেছি আজ!

৪

নারিকেল বন, কুঞ্জ শ্যামল,
রেখেছে মাধুরী তোমার লাগি,
আকুল পরাণে পোহাব রজনী
তোমারি তরে একেলা জাগি!
বাসনা কুসুম উঠেছে ফুটীয়ে,
মরমে তোমার পিয়াসা জাগে,
দেখা দিতে এসে উঠগো ফুটীয়ে
—প্রভাত-তরুণ অরুণ-রাগে।
এই শেষ দেখা দেখে নিব একা,
তুমি না দেখিলে মুদিও আঁখি,
তোমার স্মৃতির নবীন আলোকে
তপ্ত জীবনে অমিয় মাখি।
প্রকৃতির হাসি সুমধুর বাঁশী
উঠেছে ছুটীয়ে ধরণী মাঝ,
তোমারি দুয়ারে এসেছি আজ।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

## উন্মাদ

(গল্প)

(১)

পূজার ছুটিতে কর্ম্মস্থল হইতে একাকী বাড়ী ফিরিতে ছিলাম। একটু ধরিতে বাটী পৌঁছিব ভাবিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে অন্যান্য পরিজনবর্গকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

ইন্টারক্লাসের টিকেট করিয়াছি। চারিদিকে চাহিয়া দেখি সকল গাড়ীই একেবারে পরিপূর্ণ। কোন মতে অতিকষ্টে একখানাতে উঠিয়া পড়িয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। গাড়ীর ভিতরে একটু বসিতে সক্ষম হইয়া চারিদিক খুঁজিতে লাগিলাম—দেখি কোন পরিচিত বন্ধুর সহিত দেখা হয় কি না। কিন্তু সে জনসঙ্ঘের মধ্যে কাহারও পরিচিত মুখ আমার চক্ষে পড়িল না। অগত্যা একখানা পুস্তক খুলিয়া বসিলাম।

যে বেঞ্চে আমি আসন নিয়াছি তাহারই বিপরীত দিকের বেঞ্চে গাড়ীতে উঠা অবধি আমার মাঝে মাঝে দৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি লক্ষ্য করিলাম একটী মলিন বসন ভদ্রলোক বারেবারেই আমার দিকে চাহিতেছেন। তিনি যেন আমাকে চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না। আমারও মনে হইতেছিল

কোথায় যেন কোন দিন উঁহাকে দেখিয়াছি। ভদ্রলোকটীর বয়স অনুমান চল্লিশ একচল্লিশ বৎসর অর্থাৎ আমারই প্রায় সমবয়সী হইবে, নগ্নপদ, গায়ে একটী ছিন্নসার্ট, পরিধানে ছিন্ন বসন, মাথার দীর্ঘচুল ও মুখব্যাপ্ত দাঁড়িগুলি রুক্ষ। মুখখানি বড়ই বিষণ্ণ। বুঝিলাম, বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন স্রোত বহিতেছে। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে কেবল উভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম—উভয়েই বিস্মিত ও নির্ব্বাক। ক্রমে আমার মনে হইতে লাগিল—এ কালিমামাখা মুখখানি যেন বহুদিনের পরিচিত কোনও বিস্মৃত মূর্ত্তি। তাঁহারও সকরুণ দৃষ্টি নীরবে যে তাহাই বলিতেছিল।

অনেকক্ষণ এরূপ থাকিয়া আমি বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিতেছিলাম। তাই আর অধিকক্ষণ ভদ্রতার সরমবাঁধনে রহিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে কত রকম তোলপাড় করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার নিবাস কোথায়"?

—"পোড়াদহে"।

আবার কিছুক্ষণ থামিলাম। পোড়াদহের নাম শুনিয়া আমি আরও বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিছুই যে মনে আসে না। অবশেষে সেই ভদ্রলোকটী অতিশয় বিনম্র বচনে আমাকে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি কোথায় যাবেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

—"আমি যাব রাজনগরে। সেখানেই আমার বাড়ী"।

আবার উভয়ে নীরব, ভদ্রলোকটী যেন আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। আবার আমি বলিতে লাগিলাম,—"দেখুন, আজকাল নাম জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতা বিরুদ্ধ। আমি বড়ই কৌতুহলী হইয়াছি, মহাশয়ের নামটী জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"—"আমার নাম শ্রীপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়!" এবার যেন আমার চমক ভাঙ্গিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—"বাড়ী পোড়াদহে নাম বলিতেছে পরেশ মুখোপাধ্যায়।" বহুদিনের একটা পুরাতন স্মৃতি যেন জাগিয়া উঠিল। চকিতে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম—"আপনি কি কোনদিন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িয়াছেন?"

বিস্মিত হইয়া ভদ্রলোকটী অতি ধীরে উত্তর করিলেন.—"আজ্ঞে, হাঁ, সে অনেকদিনের কথা বটে। আপনার নামটী জানিতে পারিব কি?"

আমি তাঁহার হাবভাবে বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলাম। পরিচয় দিবার সুবিধা হইল বলিয়া আরও বিচলিত হইতে লাগিলাম। বলিলাম, "আমার নাম, ননীগোপাল—"। আমার মুখের কথা শেষ না হইতে হইতেই সে মলিনবদন, শতছিন্নবসন ভদ্রলোকটী তাড়িতবেগে উন্মাদের ন্যায় এক লম্ফে সেই জনসঙ্ঘ মধ্যে আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুই কি আমার সেই ননী?" আর বলিতে পারিলেন না। নিমেষ মধ্যে আমারও বিস্ময়-যবনিকা ভেদ করিয়া বাহির হইল— বহুদিনের সঞ্চিত কৃপণের রত্নরাশির মত—একখানি কৈশোরের নববিকশিত অতীত মূর্ত্তি! এ যে আমার সেই পরেশ!—এক সময়ে, যে আমার সকল আদর্শ, সকল ধর্ম্ম, সকল কর্ম্ম ও মনন ব্যাপিয়া মহাগৌরবে একাধিপত্য করিত! এ যে আমার সেই পরেশ!—যে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে আমার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার জীবনের অনন্ত আদর্শ স্থাপন করিয়া দিন দিন আমাকে উন্নতির পথে চালিত করিতেছিল! "পরেশ, ভাই পরেশ" বলিয়া আমিও তাহাকে সজোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম। ভুলিয়া গেলাম, যে অগণিত যাত্রীর সম্মুখে আমরা দুই প্রৌঢ় ব্যক্তি এক মহানাটকের অপূর্ব্ব অভিনয় করিতেছি।

তারপর তাহার দিকে নয়ন উত্তোলন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম; অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোর এ দশা কেন রে ভাই?" আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল—উভয়ে কিয়ৎক্ষণ আবার নীরব রহিলাম। কিছুকাল পরে সে বিকটস্বরে বলিয়া উঠিল,—"শুনবি যদি, স্থির হ'য়ে তবে কাণ পেতে থাক্। বলে যাচ্ছি এ মরুভূর জলকথা!" আবার কাঁদিয়া ফেলিলাম—এ কি অদ্ভুত কথা!

"যাক ভাই এখন। আজ চল্ তবে আমাদের বাড়ী।"

হো হো করিয়া সে হাসিয়া উঠিল—"না, না এখানেই

তোকে শুন্‌তে হবে। তোর সাথে হয়তো বা আর দেখাই হবে না। আর তোর বাড়ী ঘরেও যে আমার যাওয়া হবে না"

আমার বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম না আমি জাগ্রত কি স্বপ্নাবিষ্ট। স্বপ্নের ঘোরে যেন শুনিতে লাগিলাম—অতীতের স্মৃতিপট হইতে ভাসিয়া উঠিতেছে যেন এক বিরাট আগ্নেয়-গিরির ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য।

(২)

"সেই কৃষ্ণনগর কলেজে তোমার সাথে একত্র বি, এ, পরীক্ষা দেই। তুমি পাশ করিলে আর সংসারের তীব্র তাড়নে আমার আর পাশ করা হইল না। তুমি এম, এ, পড়িতে গেলে আর আমি পিতৃদেবের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া গৃহে ফিরিলাম। এখানেই আমার জীবন-যজ্ঞের প্রথম আহুতি। বিধবা মাতা, অষ্টম-বর্ষীয়া একটী ভগ্নী, পত্নী ও তিনমাস বয়স্ক শিশুপুত্রকে নিয়া আমি একুশ বৎসর বয়সে সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। কোনমতে পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া অন্নের খোঁজে বাহির হইলাম। কিছুদিন পরেই আমাদের বাড়ী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে এক জমিদার পুত্রের ৫০৲ টাকা বেতনে গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। সেইখানেই আমাকে থাকিতে হইত—মাঝে মাঝে বাড়ী আসিতাম।

কোনমতে যখন একটু স্থির হইয়াছি এবং আমার সুখদুঃখের সমভাগী ক্ষুদ্র পরিবারটীকে নিয়া শান্তিতে কাল হরণ করিব ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়াছি—আমার সামান্য স্বচ্ছন্দও নিষ্ঠুর বিধাতার চক্ষুশূল হইল; সংসারের প্রতি পদবিক্ষেপে যেন আমার কর্ণে কোন এক ভৈরবীমূর্ত্তির শাসনবাণী নিশিদিন বাজিতে লাগিল—

"শান্তিতে থাক্‌বি ?—আচ্ছা তবে !"

আমাদের বাড়ীর অন্য এক গৃহস্থের সহিত বহুদিন ধরিয়া পিতার মনোমালিন্য চলিতেছিল; সামান্য সরিকী বিবাদ হইতে ইহার মূলোৎপত্তি হইয়া অবশেষে এক বিরাট বিষবৃক্ষে পরিণত হইতেছিল। সে লোকটা ছিল একটা স্খলিত চরিত্র, মাদকদ্রব্যসেবী ভীষণ গোঁয়াড়। গ্রামের সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া চলিত। কতক গুলি নিম্নশ্রেণীর লোক তাহার দুষ্কর্ম্মের অনুচর ছিল; তাহাদিগের সাহায্যে সে আড়ালে থাকিয়া গ্রামবাসীগণকে বড়ই উৎপাত করিত। কোন সময় সন্দেহে পুলিশ রিপোর্ট আসিলে সে অনায়াসে থানার পুলিশকে বশ করিয়া লইত। একজ গ্রামবাসী সকলেই তাহাকে ভয় করিত আর কেহই উচ্চরব করিতে সাহসী হইত না।

পিতার মৃত্যুর পরে হতভাগা আমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। আমার পরিবারটী স্বচ্ছন্দ ভাবে চলিতেছে ইহা তাহার সহ্য হইল না। আমাকে ত কর্ম্মস্থলেই থাকিতে হইত—ইতিমধ্যে সে তাহার প্রতাপে আমার গৃহটীকে তোলপাড় করিয়া তুলিত। কোন দিন সে আমার অংশের ফলবৃক্ষগুলি কাষ্ঠের জন্য ভূমিসাৎ করিত কোনদিন বা পুকুরের মাছগুলি নষ্ট করিত বা পুকুর পাড়গুলি কাটিয়া ফেলিত; মাতা কোনদিন প্রতিবাদ করিলে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিত। প্রায় দিবসই গৃহে চুরি হইত—আজ প্রকাণ্ড সিঁদ কাল ভাঙ্গাবেড়া, এমন করিয়াই দিন কাটিত।

এইরূপে কি গৃহমধ্যে, কি গৃহের বাহিরে হতভাগা সকল স্থানেই আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিল। গ্রামবাসীগণ আমাকে সপরিবারে কর্ম্মস্থলে যাওয়ার পরামর্শ দিল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে একবার এ গৃহ ছাড়িয়া গেলে আর এ পৈত্রিক ভিটাতে আমার পদার্পণ করার অধিকার থাকিবে না। যাহা কিছু সকলই উহার করতলগত হইবে।

উহার দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ যখন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল তখন আমি আর কোন উপায় না দেখিয়া এক অসমসাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার মনিব জমিদার বাবুর সহিত সদরের পুলিশ সাহেবের পরিচয় ছিল। তাঁহার সাহায্যে পুলিশ সাহেবকে আনিয়া পাষণ্ডের নামে ফৌজদারী ১১০ ধারা রুজু করা গেল। সাহেব গ্রামবাসীগণকে ডাকিলেন কিন্তু জীবনের আশঙ্কায় কেহই উহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে রাজী হইল না। অনন্যোপায় হইয়া তিনি চলিয়া

গেলেন এবং বলিলেন যে গোপনে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা যাইবে।

এবার আর আমার রক্ষা নাই। বাস্তুভিটার মায়া ছাড়িয়া দিয়া সপরিবারে কর্ম্মস্থলে যাওয়ার সঙ্কল্প করিলাম। পাষণ্ডের প্রতিহিংসানল ক্রমশঃই জ্বলিতে ছিল। পুলিশ সাহেব চলিয়া গেলে সে আমাকে শাসাইয়া দিল—"দেখ্‌ব তোর কোন্‌ জমিদার বাবা এবার তোকে রক্ষা করে!" আমি অনতিবিলম্বে কর্ম্মস্থলে সকল বন্দোবস্ত করিতে চলিলাম।

আমার গৃহ হইতে ফিরিবার পরদিবসই একজন গ্রামবাসী শশব্যস্তে আমাকে খবর দিয়া আসিল— "তোমার মাতা পীড়িতা, শীঘ্র চলিয়া আইস।' বুঝিতে বাকী রহিল না, পাষণ্ড অবশ্যই ভয়ানক কিছু করিয়াছে। মায়ের অসুখ একরাত্রে এমন কিছু সাংঘাতিক হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ব্যস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাহা দেখিলাম--আবার যখন জ্ঞান হইল চক্ষু মেলিয়া চারিদিক চাহিয়া আবার অজ্ঞান হইলাম। মুহুর্ম্মুহু জীবন্মৃত অবস্থায় পতিত হইতে লাগিলাম—কিন্তু এ কঠিন প্রাণ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল না।

আমার গৃহগুলির চিহ্নমাত্রও নাই, স্তূপীকৃত ভস্মরাশি তথায় বিশ্বশ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে। আর প্রাঙ্গনোপরি অর্দ্ধদগ্ধা আমার মাতা ও পত্নী অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; অদূরে ভস্মরাশি মধ্যে আমার ভগ্নী ও শিশুপুত্রের কঙ্কালরাশি মিশিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে নয়নকোণের অশ্রুরেখা শুকাইয়া গেল! আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। সে ভীষণ জ্বালা পৃথিবীর কেহ বুঝিতে পারে না।

মনী, একবার চাহিয়া দেখ্‌ এই ভাঙ্গা বুকের দিকে এই শতজীর্ণ পরিধানের দিকে! কি, আর জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা আছে কি—'তোর এ দশা কেনরে ভাই ?'

তারপর আবার শুনিতে থাক্‌;—ওকি, অমন শিহরিয়া উঠ্‌লে কেন? চেয়ে দেখ দেখ, এ বুক খানা কোন্‌ আগুনে খাক্‌ হইয়া গেল!

দুইদিন পরে মা ও স্ত্রী দুইজনকেই শ্মশানে নেওয়া গেল। কাছে বসিয়া দেখিতে লাগিলাম—অগ্নিরাশি জ্বলিতে জ্বলিতে আমার সকল গ্রাস করিয়া ফেলিল। সে আগুনে ঝাপাইতে পারিলাম না—বুকের আগুন জ্বলিতেছিল—আমি যে তাহারই আহুতি।

মনী, সেদিন অবধিই আমি ভবঘুরে। দেশে দেশে শুধু ঘুরিয়া দেখিতেছি,—এমন আগুন আর কোন শ্মশানে দাউ দাউ জ্বলে কি না! সব ভাঙ্গিয়া গেল— এ জীবনের আর কিছু বাকী নাই—আছে শুধু সারা বুক জুড়িয়া বিরাট একটা আগ্নেয়গিরি;—"

অশ্রুবিগলিতনেত্রে আমি পরেশের মুখ চাপিয়া বলিলাম "আর না যথেষ্ট হইয়াছে"। উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলাম। পরেশ যেন স্থির, নির্ব্বাক, এক পাষাণ মূর্ত্তি।

কিয়ৎক্ষণ পরে উহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলাম "ভাই পরেশ, আমার গৃহে তুই চল। আমার মা যে তোরও মা। এমন ভবঘুরে থাকিয়া কি লাভ হইবে। বিধাতা করুণাময় তোর এ জীবনে তিনি একদিন শান্তি দিবেন।"

পরেশের মূর্ত্তি বিকটভাব ধারণ করিল। সিংহের মত সে গর্জ্জিয়া উঠিল, "কে বলে বিধাতা করুণাময়! ওই পাষাণ প্রতিমার মতই তোর রাক্ষস বিধাতা নির্ব্বিকার। পাষাণের মন্দিরে আমার মাথা নত হইবে না। তোর নিষ্ঠুর বিধাতা কি চায় জানিস?—শুধু রক্ত—নররক্ত! আর চিতাগ্নিতেই তার অধিবাস!

—না, না—তোর সে শান্তিময় গৃহে আমার যাওয়া হইবে না। আমি চাই শ্মশানের আগুন, এখনও সে আগুন তেমন জ্বলে নাই। দিন দিন জ্বলিতেছে; আরও জ্বলিবে—আরও জ্বলিবে!"

তারপর আমি অনেক কথা বলিতে চেষ্টা করিলাম। কি বলিয়াছি আমার স্মরণ নাই। কিন্তু সে আর কোন কথার উত্তর দিল না। তাহার অদ্ভুত জীবন কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। সহসা আমার অলক্ষিতে পথিমধ্যে কোন একটা ষ্টেশনে সে নামিয়া পড়িল। আমার কাতর অশ্রু, সংস্র সাধ্য সাধনা—সকল ব্যর্থ হইয়া গেল। আমি যেন আর একজন হইয়া গৃহে ফিরিলাম।

(৩)

আরও ৩।৪ বৎসর কাটিয়াছে। অনেক স্থানে ঘুরিয়াছি, কোথাও পরেশের সাক্ষাৎ পাই নাই। প্রতিদিন তার কথা ভাবিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করি। যে আগুনে সে জ্বলিতেছে তাহারই ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমাকে সহসা প্রদান করিয়া কোথায় যেন সে মিলাইয়া গেল। আমি অন্যস্থানে বদলী হইয়াছি। একদিন একাকী বেড়াইতে বেড়াইতে সহরপ্রান্তে আসিলাম। নিকটে একটী শীর্ণকায়া নদী—তাহারই তীরভূমে সহরের শ্মশান স্থান। দূর হইতে দেখিতে পাইলাম পরিত্যক্ত কাপিপরিহিত অর্দ্ধউলঙ্গ একটা পাগল নৃত্য করিতেছে। চারিপাশে ছেলের দল হৈ চৈ করিতেছে, কেহ বা গায়ে থুথু ফেলিতেছে। পাগলের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—কিয়দ্দূরে একটা চিতা জ্বলিতেছে, তাহারই দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া সে আপনমনে নৃত্য করিতেছে।

চিনিতে বাকী রহিল না। দূর হইতে শুধু একবার দেখিয়া গেলাম, বাসায় গিয়া সারাটা রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইলাম। পরদিন আবার আসিলাম—আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। সে আজ গানে মত্ত, যাহা মনে আসে তাহাই গাহিতেছে। সে কখনও হাসে, কখনও গায়, কখনও কাঁদে—আর দূর হইতে শব বাহক দেখিলেই নৃত্য করিতে থাকে। কেহ খাবার দিলে সামান্য একটু মুখে দিয়াই বাকীটা ছড়াইয়া ফেলে।

প্রতিদিন আমি তাহাকে খাবার পাঠাইতাম। একদিন সে আমাকে দেখিতে পাইয়া অমনি চক্ষু ফিরাইল। মনে হইল যেন চিনিতে পারিল না। প্রতিদিন তাহার নিকটে একবার অন্ততঃ যাইতে বাধা হইত না; কিন্তু কোন দিনও কথা বলিতে সাহস পাই নাই।

অবশেষে একদিন একখানা নূতন কাপড় ও কিছু খাবার নিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। সাহস করিয়া খাবার দিলাম। আমার মুখের দিকে বিকট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহা ফেলিয়া দিল। কাপড় খানা দিতে দিতেই সে একটা অর্দ্ধদগ্ধ কাঠ কুড়াইয়া আমাকে প্রহার করিতে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"দূরহ! দূরহ!"

পরদিন অবধি আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেলনা। কিন্তু সে সহরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না। অহর্নিশি তাহার উন্মত্ত প্রলাপ যেন আমার কাণে বাজিতে লাগিল। স্বপ্নের ঘোরেও যেন দেখিতে পাইতাম শ্মশানের কঙ্কালরাশি মধ্যে, ভস্মরাশি গায়ে মাখিয়া, কাপিপরিহিত এক অপূর্ব্ব উন্মাদের ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য!

শ্রীসুকুমার দাসগুপ্ত।

# উত্তরাপথ ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেবপ্রয়াগ উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত একটী তীর্থস্থান, এখানে ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গম হইয়াছে। অলকানন্দার উপরে একটী সুবৃহৎ লৌহসেতু বিদ্যমান, সেটী পার হইয়া সঙ্গমস্থলে যাইতে হয়, তীরে সারি সারি দোকান পসার ও পাণ্ডাদিগের বাড়ীঘর। বদরির পাণ্ডাদিগের এই স্থানেই প্রধান আড্ডা, এই স্থানেই তাহারা সপরিবারে বাস করে।

আমরা বাবা কম্বলীওয়ালার ধরমশালায় স্থান লইয়াছিলাম, ধরমশালায় অনেক লোক সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু তা সত্বেও সেখানকার তত্বাবধায়কের যত্নে আমাদের কোনও অসুবিধা হইল না। দেবপ্রয়াগ স্থানটী বেশ বড়, এখানে পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ আফিস, ডাক্তারখানা, পুলিশ চৌকি, প্রভৃতি অনেক সরকারি আফিস আদালত আছে। দৌলতরাম আসিলে জিনিষ পত্র, টাকাকড়ি, তাহার তত্বাবধানে রক্ষা করিয়া, আমরা সকলে স্নান করিতে চলিলাম। পুল পার হইয়া বাজারের মধ্য দিয়া কতকটা অগ্রসর হইলেই, প্রস্তরে বাঁধান ঘাট, নীচে সঙ্গমের ভৈরব দৃশ্য। একদিক্ হইতে অলকানন্দার উদ্দাম জলপ্রবাহ ভীমবেগে ছুটিয়া আসিতেছে, অন্যদিক হইতে ভাগিরথী অমিতবিক্রমে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া যেন অলকানন্দার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতেছে, পরক্ষণেই আবার সুদৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া, দুয়ে মিলিয়া এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হইয়া, শত বাধা বিঘ্ন অবহেলা করিয়া সাগরের উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে। সঙ্গমের নিকটেই এক একটী বিরাট প্রস্তরখণ্ড, সে বিপুল জলরাশি ভীমগর্জ্জনে ফেণরাশি উদ্গীরণ করতঃ, তৎসমুদয় হেলায় উল্লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আহা কি সে অদ্ভূত জলপ্রপাত! হৃদয় আলোড়নকারী কি সে ভীম গর্জ্জন!

ঘাটের নিকটে, প্রস্তরে সংলগ্ন বৃহৎ শিকল, সে শিকল জোর করিয়া টানিয়া ধরিয়া সভয়ে ডুব দিয়া উঠিলাম, যদি তাহা কোন প্রকারে হস্তচ্যুত হয়, তবে বোধ হয় জলের ভীষণ বেগে, প্রস্তরে আঘাত লাগিয়া শরীরের একখানি হাড় ও আস্ত থাকিত না, কিন্তু এই খরস্রোতেও অসংখ্য মৎস্য স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দেবপ্রয়াগেও পিতৃপুরুষের পিণ্ডপ্রদান করিবার প্রথা আছে। ঘাটের উপরেই, রঘুনাথজী ও মহাদেবের মন্দির, রঘুনাথজীর মূর্ত্তি জগন্নাথদেবের মূর্ত্তির ন্যায় অদ্ভুত। দর্শনাদি করিয়া ধরমশালায় ফিরিয়া আসিলাম, রন্ধনাদি সমাপনান্তে আহার করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পরই, পুনরায় চলিতে লাগিলাম। দেবপ্রয়াগ হইতে রাস্তা দুইদিকে গিয়াছে। একটী অলকানন্দা পার হইয়া ভাগিরথীর তীর দিয়া গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর দিকে চলিয়াছে, অপরটী বদরি-নারায়নের রাস্তা যাত্রায় গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী দর্শন হইবে না, কাজেই আমরা শেষোক্ত পথে চলিতে লাগিলাম।

দেবপ্রয়াগ হইতে গাড়োয়ালের রাজধানী টিহিরি যাইবার রাস্তা আছে। টিহিরি এখান হইতে অধিক দূর নহে, এই টিহিরির সন্নিকটেই আমাদের 'কাণ্ডিওয়ালা' দৌলতরামের বাড়ী। সে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে সেই রাস্তা আমাদিগকে দেখাইয়া দিল। বৈকালে ৮। মাইল চলিয়া রাণীবাগ নামক চটীতে রাত্রিবাস করিয়া পরদিবস প্রত্যুষে আবার চলিতে লাগিলাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে সুগন্ধি পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া উষার শীতল বাতাসকে সুবাসিত করিয়া তুলিতেছিল। প্রকৃতির স্বহস্তলালিত সেই স্বর্গীয় পুষ্পোদ্যানের কি অনুপম শোভা! পাতায় পাতায় স্বচ্ছ নীহার বিন্দু প্রভাত সূর্য্যের কিরণে মুক্তাফলের ন্যায় ঝিক্ ঝিক্ করিতেছিল। ঝোপের মধ্য হইতে বিহগকুলের সুমধুর কাকলি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। স্বাধিনা প্রকৃতির সেই অনুপম গরিমা, প্রাণে প্রাণে অনুভব করা যায়, কার সাধ্য তাহা ভাষায় প্রকাশ করে!

কিছুদূর অগ্রসর হইলে, রাস্তা শস্যশ্যামলা উপত্যকার উপর দিয়া চলিল, দুই দিকের গম ও ধানের গাছগুলি প্রভাত সমীরণে কম্পিত হইতেছিল। পাহাড়ী রমণীরা তাহাতে কাজ করিতেছে। আমরা গাইতে গাইতে চলিয়াছিলাম, আর তাহারা কাজ ফেলিয়া আমাদের

দিকে ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া তাকাইতেছিল। ২।১টী সুন্দর পাহাড়ী বালক আমাদের নিকট আসিয়া, সুন্দর ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে পয়সা চাহিল। দুই একটী পয়সা পাইলে তাহারা মৃগশিশুর ন্যায় আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান করিল। অদূরে পর্ব্বতের কোলে তাহাদের ছোট ছোট পাথরের ঘরগুলি যেন একটা শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার আভাস দিতেছিল।

প্রায় নয়টায় 'বিল্বকেদার' নামক একটী সুন্দর চটীতে স্থান লইলাম। চটীর ঠিক উত্তরেই অলকানন্দা, দক্ষিণে গগনচুম্বী পর্ব্বতশ্রেণী, পশ্চিমে 'খণ্ডা' নামক একটা ছোট গিরিনদী। চটীর ঠিক মধ্যস্থলে বিল্বকেশ্বর শিবের মন্দির। বৃটিশগাড়োয়ালের প্রধান সহর শ্রীনগর নিকটে হইলেও এমন সুন্দর চটীটী ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। বড়ই আনন্দে সেখানে বাস করিলাম, তবে, এখানকার সকল স্থানেই, দিনে মাছির ভয়ানক অত্যাচার, একসঙ্গে এত মাছি আমি জীবনে কখনও দেখি নাই, আবার কোন কোন চটীতে ভীষণ বিচ্ছুর প্রাদুর্ভাব, তাহাদের দংশনে অনেক যাত্রীকে অনেক সময় অত্যন্ত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, তবে পাহাড়ীরা অনেকেই বৃশ্চিক দংশনের ভাল ঔষধ জানে, তাহাতেই রক্ষা।

বৈকালে তিন মাইল অতিক্রম করিয়া শ্রীনগর পৌঁছিলাম। হিমালয়ের বিজন ক্রোড়ে এই ক্ষুদ্র সহরটী বড়ই মনোরম। এখানে আফিস আদালত বিদ্যালয় ডাক্তারখানা প্রভৃতি আছে। একজন শ্বেতাঙ্গ ডেপুটী কমিশনার এই স্থানের কর্ত্তা। মোটের উপর সুদূর পর্ব্বতের এই নিভৃত কোণে, একটী সহরে যাহা থাকিবার আশা করা যায়, এখানে তাহার কিছুরই অভাব নাই। অবশ্যই সহর বলিতে যদি কেহ, গাড়ীঘোড়া কিংবা বৈদ্যুতিক আলোর দাবি করিয়া বসেন তবে আমরা নিরুত্তর। সহরে একটী মাত্র রাস্তা, তাহার দৈর্ঘ্যও পোয়া মাইলের অধিক নহে, এই রাস্তার দুই ধারে অনেক দোকান পসার। যাত্রিদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ এখানে পাওয়া যায়। নীচ হইতে অশ্বপৃষ্ঠে এখানে মাল সরবরাহ হয়। একদিকে অলকানন্দা ও অপরদিকে সমুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী স্থানটীকে বড়ই সৌন্দর্য্য প্রদান করিতেছিল। বাবা কমলী-ওয়ালার তত্রত্য ধরমশালার কর্ম্মচারী আমাদিগকে পরম যত্নে একটি প্রকোষ্ঠে স্থান দিলেন। বাস্তবিকই বাবা কমলীওয়ালার অফুরন্ত ধনভাণ্ডার যেন তিনি সাধু সন্ন্যাসী ও নিঃস্ব যাত্রীদিগের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। স্থানে স্থানেই তৎপ্রতিষ্ঠিত ধরমশালায় সদাব্রত, ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই বিপদসঙ্কুল পথে এইরূপ সদনুষ্ঠান করিয়া, তিনি যে কত শত যাত্রীর অশেষ উপকার করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই মহানুভবতার জন্য তিনি যে কেবল বদরি-যাত্রিদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন তাহা নহে, পরন্তু সমগ্র হিন্দুজাতির ধন্যবাদার্হ।

জিনিষপত্র প্রকোষ্ঠে বন্ধ করিয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম। রাস্তার যত লোক, সকলেরই দৃষ্টি আমাদের দিকে। আমাদের বেশভূষায় তাহারা বোধ-হয় বিশেষ নূতনত্ব লক্ষ্য করিতেছিল, তাই তাহাদের এত বিস্ময়।

সহরটী খুব ছোট, লোকসংখ্যাও অধিক নহে, এখানেও অনেক সাধুসন্ন্যাসী বাস করেন। ধরমশালায় সুখে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে পুনরায় পথ চলা আরম্ভ করিলাম, ধরমশালার সন্নিকটেই একদল গৈরিক পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক বাল ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাহারা সারি বাধিয়া শঙ্কর বিরচিত 'নির্ব্বাণ ষটক্' সমস্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে পর্য্যটন করিতে যাইতেছিল, একজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসী তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন, ঊষার অস্পষ্ট আলোকে তাহাদিগকে যেন দেবকুমার বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া ভারতের সেই অতীত গৌরবের কথা মনে পড়িয়া গেল, যখন ঋষীকুমারদিগের কণ্ঠনিঃসৃত পবিত্র বেদধ্বনি সুদূর বিমান কম্পিত করিয়া, বুঝিবা স্বর্গারূঢ় দেবতাদিগের চরণতলে মূর্চ্ছনায় বাজিয়া উঠিত। ব্রহ্মচারীগণ ধীরে ধীরে, ভিন্নপথে চলিয়া গেল, আহা কি পবিত্র তাহাদের এই নবীন সন্ন্যাসী জীবন! সংসারের আবিলতা হইতে অতি ঊর্দ্ধে, প্রকৃতির সেই

মেঘের ক্রোড়ে, যোগীঋষিগণের অদ্ভুত ত্যাগের পুণ্য-স্মৃতি বিজড়িত, এই সুদূর হিমালয়ের বিজন প্রদেশে, তাঁহাদের এই ত্যাগোজ্জ্বল সন্ন্যাসী-জীবন কত গরিমাময়!

নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে চলিতে লাগিলাম, পথ চলাই এখন আমাদের প্রধান কার্য্য। উষার অরুণ আভা পর্ব্বতের চূড়াগুলিকে রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বেই আমরা চটী ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িতাম। বেলা প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত চলিয়া পরিষ্কার চটী দেখিয়া, সেখানে মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিতাম। হৃদয়ে সর্ব্বদাই সেই এক আশা, কবে সেই চির অভিলষিত দেবদর্শন হইবে। চটীতে যে সময়টুকু বিশ্রাম করিতাম তাহার অধিকক্ষণই এই সব বিষয় আলোচনাতেই অতিবাহিত হইত। আহার্য্যের মধ্যে সুঘ্রাণ অন্ন, কদর্য্য মহিষাঘি, নুন ও গুড়ই প্রধান, তবে কখন কখন আলু ও ডাইল পাওয়া যাইত, সেগুলি আবার সিদ্ধ হইত না; তার উপর মসলার অভাব, হলুদ মরিচ অনেক স্থানেই পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে মহিষের দুগ্ধ মিলিত, তাও খাইতে কেমন ঘৃণা বোধ হইত। কাজেই আমাদের প্রধান খাদ্য নুনভাত ও গুড়ভাত। কঠোর পরিশ্রমের পর পরম তৃপ্তির সহিত তাহাই ভোজন করিয়া আনন্দে আমাদের দিনগুলি কাটিয়া যাইত। এইরূপে আমাদের অজ্ঞাতসারে, ভগবান যেন তাঁহার দিব্যদর্শন লাভের পূর্ব্বে আমাদের পঙ্কিল মনকে, একপ্রকার ব্রতানুষ্ঠান করাইয়া পবিত্র করিয়া লইতেছিলেন।

সামান্য চড়াই উৎরাই করিয়া সাড়ে সাত মাইল চলিয়া, ভট্টিসেরাচটীতে মধ্যাহ্ন যাপন করিলাম। চটীটার ঠিক সম্মুখ দিয়াই, একটী ক্ষীণ প্রস্রবণ, চটীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়া কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইতেছিল। বড়ই আনন্দে সেখানে মধ্যাহ্ন যাপন করিয়া, বৈকালে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। ঐ বেলা বড়ই শক্ত চড়াই ছিল। উন্নত পর্ব্বত-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া রাস্তা চলিয়াছে। ক্রমাগত চড়াই করিয়া আমরা সকলেই বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কাজেই ৩৷০ মাইল মাত্র চলিয়া ধাঁকুরা নামক চটীতে রাত্রিবাস করা গেল।

যাত্রিদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট বিশেষ যত্ন নেন। এই সমস্ত চটী একজন সেনিটেরী ইন্‌স্পেক্টরের (Sanitary Inspector) তত্ত্বাবধানে। প্রায় প্রত্যেক চটীতেই দুই একজন করিয়া মেথর আছে। তাহারা সর্ব্বদা চটীর নিকটবর্ত্তী স্থান পরিষ্কার রাখে। চটী হইতে কিছু দূরে দুই দিকে দুইটী নিশান পোতা থাকে, তাহাকে "ঝাণ্ডা" বলা হয়, যাত্রিদিগকে শৌচে যাইতে হইলে সেই "ঝাণ্ডার" বাহিরে যাইতে হয়। মেথরগণ দুই তিন ঘণ্টা রাত্রি থাকিতেই জাগ্রত হইয়া যাত্রিদিগকে উদ্দেশ করিয়া ক্রমাগত চীৎকার করিতে থাকে "মহারাজ টাট্টিখানা তো ঝাণ্ডাকা বাহারখানা"। মেথরের সেই গগনভেদী বিকট চিৎকারে জাগ্রত হইয়া যাত্রিগণ একে একে পথে বাহির হইতে থাকে।

পরদিন প্রত্যূষে ধাঁকুরা চটী পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে চলিতে লাগিলাম। খুব উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া রাস্তা চলিয়াছে। রাস্তার প্রায় ১ মাইল নীচে প্রবাহিতা, অলকানন্দার শুভ্র জলরাশিকে উপর হইতে যেন একখণ্ড সাদা কাপড়ের মত দেখা যাইতেছিল, কিন্তু তার সেই গভীর গর্জ্জন সর্ব্বক্ষণই শ্রুত হইতেছিল। মাঝে মাঝেই উচ্চপর্ব্বতচূড়া হইতে ছোট ছোট ঝরণা সকল রাস্তার কিনারা দিয়া নামিয়া গিয়াছে, কাজেই অলকানন্দা এত নীচে থাকিতেও যাত্রিদিগের প্রায়ই জল কষ্ট হয় না।

সাড়ে সাত মাইল চলিয়া রুদ্রপ্রয়াগ পঁহুছিলাম। উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে ইহাই দ্বিতীয় প্রয়াগ, এখানে, অলকানন্দা ও স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর সঙ্গম হইয়াছে। অলকানন্দার উপর সুন্দর ঝুলন্ত পুল পার হইয়া একটী চটীতে স্থান লইলাম। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সুন্দর ছোট ছোট অনেক পাথরের ঘর, দূর হইতে মনে হয়, যেন কোনও নিপুন চিত্রকর তুলিকা দ্বারা সেগুলি আঁকিয়া, পাহাড়ের গায়ে আটকাইয়া রাখিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে সারি সারি পাথরের ঘর, তাহাতে কয়েকখানা দোকানপসার আছে, একটী

ছুত্র পোষ্ট আফিসও সেখানে আছে। দেবপ্রয়াগের ন্যায় এখানেও দুইটী বিভিন্ন রাস্তা মিলিত হইয়াছে, একটী মন্দাকিনীর তীর দিয়া কেদারনাথ হইয়া বদরির দিকে গিয়াছে, অন্যটী সোজা বদরির পথ।

জিনিষপত্র দৌলতের তত্ত্বাবধানে চটীতে রাখিয়া আমরা স্নান করিতে সঙ্গমে উপনীত হইলাম। নীচেই সঙ্গমের ভৈরব দৃশ্য, তীরে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া সেই ভীম জলপ্রপাত দেখিতে লাগিলাম। যুগপৎ ভীতি ও বিস্ময়ে সর্ব্বাঙ্গ যেন কম্পিত হইতে লাগিল, হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল। জলপ্রপাতের ও বজ্রগম্ভীরনিনাদে কর্ণ যেন বধির হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। হঠাৎ পুরাণের সেই ঐরাবতের গঙ্গা গতিরোধ করিতে যাওয়ার কথা মনে হইয়া হাসি পাইল। মদমত্ত মাতঙ্গরাজের সাধ্য কি যে সে রুদ্রতেজের সম্মুখে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে। এক একটী বিরাট প্রস্তর খণ্ড সেই ভীষণ জলপ্রপাতের মধ্যস্থলে পড়িয়া রহিয়াছে। ভীম অট্টহাস্যে সেগুলি উল্লঙ্ঘন করিয়া, চতুর্দ্দিকে শুভ্র জলকণা বিক্ষিপ্ত করিয়া অলকানন্দার সে উন্মাদ জলপ্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে। আবার অন্যদিক হইতে মন্দাকিনীর শীতল স্বচ্ছ জলধারা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া, অলকানন্দার ফেনিল আবর্ত্তে মিশিয়া যাইতেছে। আহা কোমলতা ও কঠোরতার সে কি অপূর্ব্ব সমাবেশ! ভয়ে ভয়ে মন্দাকিনীর জলের ধারে গিয়া, কোনও মতে স্নান করিলাম, সঙ্গমের নিকটে যাইতে মোটেই সাহস হইল না। সঙ্গমের উপরেই রুদ্রেশ্বর শিবের মন্দির। স্নান পূজা সমাপণ করিয়া বাসায় ফিরিলাম, কিন্তু তখনও যেন সঙ্গমের সেই ভৈরব নিনাদ কাণে লাগিয়াছিল, একটা অনিশ্চিত ত্রাসে হৃদয় তখনও যেন কম্পিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল, এই সমস্ত বাড়ী ঘর কি নিমেষের মধ্যে ঐ বিপুল জলরাশির মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতে পারে না? আহা কি দেখিলাম! কেমন করিয়া, কোন্ ভাষায় বর্ণনা করিব, কি সেই বিরাট দৃশ্য দেখিলাম, মনে করিতে আজও শরীর শিহরিয়া উঠে, সেই গভীর গর্জ্জন যেন আজও আমার কর্ণে বাজিয়া উঠে!

(ক্রমশঃ)

"ভবঘুরে"

We have carefully examined three parts of "Model Handwriting or হাতের লেখা" by Mrs. Suniti Debi, Governess Hindu Zenana Home Education. They are slips of paper beautifully printed and stitched together. Their novel feature is that they can be placed directly over the handwriting book of a child line by line and can readily catch his eyes—so that there is little chance of his ever missing a good model. The idea was conceived by Miss Garrett, late Inspectress of Schools and admirably executed by Mrs. Suniti Debi. It is only fair to say that these "Model Handwritings" are a distinct and scientific advance in the line of Bengali Handwritings.

## অধ্যাপক শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য কৃত

# সংস্কৃত নাটক কথা সংগ্রহ গ্রন্থাবলী

১। সেক্ষপীয়র নাট্যের অতুলনীয় সম্পদ লেম্ব যেমন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অধিগম্য করিয়া তুলিয়াছেন গুরুবন্ধু বাবুর অভিনব উদ্যমে সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্যের রুদ্ধ দ্বার আজ তেমনি করিয়া খুলিয়া গেল। সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটকারগণের গ্রন্থাবলী ছবি ও ছাপার চরমোৎকর্ষে ভূষিত হইয়া খণ্ডে খণ্ডে গল্পাকারে বাহির হইতেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম-এ, বিদ্যাসুধি মহাশয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। প্রতিখণ্ডের মূল্য ৷৹ আনা। অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহক হইলে ( ১১ খণ্ডের জন্য ) সহ ডাকমাশুল ৪৷৵ টাকা।

বালক, যুবক, বালিকা ও যুবতীগণ অসঙ্কোচে পাঠ করিয়া ভারতীয় কবিগণের অলৌকিক কবিত্বের স্বাদগ্রহণ করিতে পারিবে।

**এণ্টিক কাগজ, চমৎকার ছবি ও চমৎকার প্রচ্ছদপট—উপদেশ ও উপহার গ্রন্থ একাধারে এরূপ আর নাই।**

২। লুপ্ত রত্নের উদ্ধার। মহাকবি ভাসের ( খৃঃ পূঃ ১৫০ ) সমগ্র সংস্কৃত নাট্য-গ্রন্থাবলীর অনুবাদ। দশ খণ্ড—প্রতিখণ্ডের মূল্য ৷৹ আনা। এণ্টিক কাগজ, চমৎকার ছাপা। শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়,

**সিটি লাইব্রেরী, পাটুয়াটুলী, ঢাকা। গুরুবন্ধু গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ও একমাত্র এজেন্ট।**

---

# NOTICE.

1. Matriculation Pass guaranteed tutor. Apply for particulars with half-anna postage stamp to A. T. Mukherjee B. A. Kundala, Birbhum District.

2. Five silver medals to be awarded to students wo will write satisfactory Essays in English on "Victoria the Good"—an English poetical Reader price 4 ans For particulars apply with half-anna postage stamp to A. T. Mukherjee B. A Kundala (District Birbhum).

## "Victoria the Good"

A poetical Reader in English contains poetical pieces full of loyalty and deep devotion to Her late Gracious Majesty Victoria Empress of India. In these days we should like to see our young boys cherish such respect for and devotion to their benign sovereign. The book should be given as a prize book to our juvenile readers :—

**COMPOUND ELIXIR OF ASWAGANDHA WITH SODIUM GLYCEROPHOSPHATE & FORMATE.**

**Now being prescribed by the leading physicians of Calcutta.**

This preparation [illegible] Aswagandha Rasayan of the ancients and contains in addition some of the most powerful [illegible] mental, nervine and muscular debility and a valuable sustainant during prolonged [illegible]

CURES MENTAL AND PHYSICAL WEARINESS

Rs. 1 8 a BOTTLE.

**Bengal Chemical & Pharmaceutical Works, Ld.**

***9.1 Upper Circular Road, CALCUTTA.***

ট্রেড **"নির্ব্বেদিন"** মার্ক

## যাবতীয় বেদনা নিবারণে অমোঘ

মাথাধরা, মাথার কট্‌কটানি ও আধ কপালে প্রভৃতি যাবতীয় শিরঃপীড়া, দন্তশূল, স্নায়ুশূল, কর্ণ-শূল প্রভৃতি সকল প্রকার শূল ব্যথা আমাদের "নির্ব্বেদিন" ট্যাবলেটে তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়।

ছাত্র, শিক্ষক, উকিল প্রভৃতি যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জন্য শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকেন তাঁহারা এই ঔষধ সেবনে উপকার পাইবেন।

মূল্য ১৬ ট্যাবলেট ।৶০ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা

Regd. No. C. 746.

VOL. 5. Nos. 11 & 12.

FEB. & MAR., 1916.

GIYA SAHITYA PAR
LIBRARY.

# THE Dacca Review

CONDUCTED BY

BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.

AND

SATYENDRANATH BHADRA, M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . . . Rs. 5-6-0
Single Copy . . . . 0-8-0

**EVERY BODY PRAISES WHAT IS HIS OWN**

But impartial verdict comes from the public and the l·

**USE**

# ORIENTAL SOAPS.

FOR

**They are the best for economy and complexion**

## THE ORIENTAL SOAP FACTORY,

*GOABAGAN, CALCUTTA.*

*Tel: "Kowstove," Calcutta.*

---

**By Special Appointment**

## To H. E. Lord Carmichael of Skirling Governor Of Bengal.

## S. A. MAJID & Co.

## Certificated Opticians

*12 Patuatuli, Dacca.*

**OPTO—Eye. METRY—to Measure.**

**A Peculiar Nationalist and Practical Unionist.**

**Prescriber of needful Tonics for the chronical Idleness of India**

**Specialist in attractive Designs, as to touch Human Feelings, to raise any National Subscription successfully.**

**Professor for 10 years, in Eye-sight Testing and Spectacles Art.**

Our methods of examination and tests of the EYES for the adaptation o' lenses for the correction of defects of vision and relief of eyestrain and it accompanying symptoms, are based upon accurate measurements of the refractio and the associated functions of the eyes. Glasses fitted under this system ar invariably found satisfactory and curative. The latest and most approved apparatus for accurate sight testing are used in our dark room. Examinati appointment preferred.

---

Printed by P. B. CHAKRAVARTI, at the Sreenath Press, 25, Nayabazar Road, Dacca
and
Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca

# Edwards Tonic

**The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.**

*Sole Agents* :—**B. K. PAUL & CO.,** *7 & 12, Bonfield's Lane,* *CALCUTTA.*

B. K. PAUL & CO'S

## Gold Sarsaparilla

A SURE AND SAFE AGENT FOR PURIFYING BLOOD. A MARVELLOUS REMEDY FOR ALL SYPHILLITIC AND MERCURIAL DISORDERS.

*PRICE-EACH PHIAL Rs. 2/8.*

BUTTO KRISTO PAUL & Co,
CHEMISTS & DRUGGISTS,
CALCUTTA.

## Cytogen

AN IDEAL DIGESTIVE TONIC WINE

*Invaluable in* CONVALESCENCE *from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c., Extremely Useful in Anaemia, Nervous Debility, Loss of Appetite, Indigestion, Acidity &c.,*

INDISPENSABLE AFTER PARTURITION

Price Rs. 1-8-0 Per Bottle.

B. K. Paul & CO.,
CALCUTTA.

Branch Sovabazar Street.

Head office :—7 & 12 Bonfield's Lane Calcutta   The Research Laboratory :—18 Sashi Bhuson Sarker's Lane

# অধ্যাপক শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ এম, এ প্রণীত।

১। ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা ... ... ... ... ॥০
(2) Sanskrit learning in Bengal ... ... ... ॥০
(3) Pramâns of Hindu Logic ... ... ... ।০

আসাম, গৌহাটী গ্রন্থকারের বাসায় প্রাপ্তব্য।

## বহুচিত্রে শোভিত।

## প্রাইজ দেওয়ার নূতন পুস্তক।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

### ১। মহরম।

সকলজাতির নিকট সমান আদরের সেই মহরমের কাহিনী সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা। ৪ খানা ছবি।

### ২। প্রহ্লাদ।

হরিভক্ত প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত সরল ভাষায় লিখিত। মূল্য ।৵০ আনা।

পপুলার লাইব্রেরী—ঢাকা।

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

# শক্তি ঔষধালয়

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড্। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট, ঢাকা।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন্ রোড্ (হাওরা পুলের নিকট)
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১নং আপার সার্কুলার রোড্ (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—৭১।১ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—১২ দশাশ্বমেধ ঘাট।

## আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

| | | |
|---|---|---|
| বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের। | দাদ্‌মার—৵০ কৌটা। | বহরের ননী—।০ শিশি। |
| | (এক দিনে দদ্রু নিশ্চয় আরোগ্য)। | (নালীঘা, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মহৌষধ)। |
| অমৃতপ্রাস ঘৃত—১০৲ সের। | | |
| | দশন সংস্কারচূর্ণ—৵০ কৌটা। | |
| ছাগলাদ্য ঘৃত—১০৲ সের। | (সর্ব্ববিধ দন্তরোগের মহৌষধ)। | অমৃতারিষ্ট—।০ আনা শিশি। |
| মেধাস্মৃতি বৰ্দ্ধক ও ছাত্রগণের সহায়। | মরিচাদি মলম—৴০ কৌটা। | (ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত ও |
| ব্রাহ্মীঘৃত—৬৲ সের) | (খুজ্‌লী পাঁচড়ার মহৌষধ)। | সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ) |

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শাস্ত্র বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ,
হিন্দুকেমিষ্ট এবং রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্‌মাষ্টার

# অক্সফোর্ড প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকাবলী।

**আলেন্ কোয়াটারমেন**—সুপ্রসিদ্ধ লেখক সার্ রাইডার হাগর্ড প্রণীত

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১০ ফর্ম্মা। মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীজলধর সেন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ—

**প্রেমিক সন্ন্যাসী**—( The Cloister and Hearth নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ )

সুন্দর ছাপা ও কাগজ। মূল্য ৷৷০ আনা।

**লেমিজেরাবল্**—( প্রায় ৫০ ফর্ম্মা, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী )।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত এবং

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

( যন্ত্রস্থ )

ইউরোপীয় মহাসমর সংক্রান্ত পুস্তকাবলা—

**ইউরোপের মহাসমর**—( ১৫ ফর্ম্মা ডবল ক্রাউন ) ইহাতে মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত সকল বিষয়ই লিখিত আছে। টেলিগ্রাম, পত্রাদি গতিবিধি এবং অন্যান্য সমুদয় ব্রিটিশ white, বেলজীয়ম, গ্রে-বুক প্রভৃতি সরকারী নথি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। মূল্য ৸৴০ আনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

**রণভেরী**—(Sir Arthur Conan Doyle) এর পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত

অন্যান্য পুস্তক শীঘ্রই বাহির হইবে।

Oxford University Press.
London New york Melbourne Cape town.
Bombay Hornly Road. Madras Sankarram Chetty.
Agents for Vernacular Publications—
Das Gupta &c. 54/8 College Street, Calcutta.
City Library Patuatoly, Dacca.

# DHARMA SAMAVAYA LIMITED.

## A CENTRAL CO-OPERATIVE ORGANISATION FOR PROMOTING UNION FOR CREDIT, THRIFT, TRADE, INDUSTRY, AGRICULTURE, INSURANCE, SNITATION AND EDUCATION.

**Registered under the Indian Company's Act, in June, 1910**

Dividends on Shares, paid for the last three years, have been 25 per cent per annum. Dividends will be distributed quarterly for future years beginning with July, 1914.

The Memorandum of Association of the Samavaya provides for one hal of the net profits of each year being devoted to promotion of Religion Co-operation, and Economic Development of the Natural Resources.

Business transacted :—Builders, Engineers, Architects and Contractors· protectors of Cattle ; Suppliers of pure and wholesome Dairy Produce ; Purchase Sale and Efficient Management of Land ; Establishment and Administration of Schools and Sanitariums ; Housing on the Hire-purchase System ; Land, Improvement on Co-operative Principles ; Intensive Cultivation, Town-planning and Tenant-Co-partnership, on the Garden-City and Suburb methods.

**SPECIAL NOTICE.**

Shares of DHARMA SAMAVAYA LIMITED, subscribed and paid for but between 16th April, 1914, and 31st May, 1914, will earn one-fourth of the Dividend, to be declared for our current financial year, ending 30th June, 1914. The list of Share-holders will remain closed, for the said year, during the month of June, 1914, and no sale or transfer of Shares will be transacted therein as for that year. Shares taken in June, 1914, will be sold at par value and earn full dividends from our next financial year, beginning with 1st July, 1914.

*Particulars supplied on application.*

SAMAVAYA MANSIONS,
CORPORATION PLACE, CALCUTTA.
*17th April*, 1914.

**A. C. UKIL,**
***Organiser.***

**It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra. Nyabazar, Dacca.**

**All busines communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—**

*The Manager,* "DACCA REVIEW,"
*5, Nyabazar Road, Dacca.*

*N.B.*—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among others we may mention the names of :—

His Honour Sir Charles Steuart Bayley K. C. S. I.
The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Shamshul Huda, M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A., D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. H. Sharp, C.I.E., M.A.
" Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. J. Donald, I. C. S.
" Mr. W. W. Hornell, M.A.
" Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
" Mr. L. J. Kershaw, C.I.E., I.C.S.
" F. C. French Esq., I.C.S.
" W. A. Seaton Esq., I. C. S.
" R. B. Hughes-Buller, Esq., C.I.E., I.C.S.
" Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Marshall, K. C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
" Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq , I.C.S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
G. A. Evans Esq., M.A., M. Sc., I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S..
Rev. Harold Bridges, B. D.
J. R. Blackwood, Esq., I.C.S.
Dr. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A. B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London.)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., B.Sc. (Lond.)
P. N. Datta, Esq., Geol. Dept., G. of I.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
" Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A
" Rai Lalit Mohon Chatterji Bahadur, M. A.
" J. R. Barrow, B.A.
Professor R B. Ramsbotham M.A., (Oxon).
" J. C. Kydd, M.A.
" W. Douglas, M.A., B. Phil., B.D.
" T. T. Williams M.A., B.Sc.
" Egerton Smith, M. A.
" G. H. Langley, M.A.
" Rai B. N. Das Bahadur, M.A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
" Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Shushung.
The " Maharaja Bahadur of Nashipur.
The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.

Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, Kt., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A., L. L. D. C. I. E.
" Mr. N. Bonham-Carter I.C.S.
" Mr J. H. Kerr, C.I.E., I. C. S.
" Mr Justice B. B. Newbould, I.C.S.
" Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
" Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
Nawab K. Mahomed Yousuff.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esqr., I.C.S.
B. C Allen, Esq., B.A., I.C.S.
S. G Hart, Esq., B.A , I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
F. P. Dixon, Esq., I.C.S.
N. E. Parry, Esq., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq , M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
" Sarat Chandra Das, C. I. E.
" Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
" Sures Chandrs Singh
Khan Bahadur Syed Aulad [redacted]
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
" Pramatha Nath Tarkabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
" Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
" Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh
" Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L.
" Radha Kamal Mukerji, M.A.
" Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
" Hemendra Prosad Ghose.
" Akshoy Kumar Moitra.
" Jaladhar Sen.
" Jagadananda Roy
" Benoy Kumar Sircar.
" Gouranga Nath Banerjee.
" Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M. A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College

# CONTENTS.


Language and Literature ... .. J. R. Barrow, M.A. (Oxon), Fellow of the Calcutta University. ... 335

Sikh Relics in Eastern Bengal ... Sirdar Gurbaksh Singh. (Superintendent of Telegraphs.) ... 375

The Arctic Home in the Rig-Veda : an Untenable position (ii) ... ... Prof. N. K. Dutt, M.A. ... 379


# সূচী।


| | বিষয় | লেখকগণের নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ | মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রবাচস্পতি | ৩৩১ |
| ২। | কবিতার প্রাণ ... ... ... | শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ... | ৩৪১ |
| ৩। | মুসলমানগণের সংস্কৃত জ্ঞান ... ... | শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর ... ... | ৩৪৭ |
| ৪। | প্রবাস স্মৃতি ... ... ... | শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম্, এ, ... | ৩৫৪ |
| ৫। | রায় হরিচরণ শর্ম্মা বাহাদুর ... ... | শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি | ৩৫৮ |
| ৬। | কৃত্তিবাস-স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন ... | মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রবাচস্পতি | ৩৬৬ |
| ৭। | সমালোচনা ... ... ... | শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ... | ৩৭৪ |

HOIYA ... LIBRARY


# THE DACCA REVIEW

VOL V. FEB. & MARCH, 1916. No. 11 & 12.


## LANGUAGE AND LITERATURE.

Some time ago I wrote a little paper, ultimately published in this Review, in which I made an attempt to examine the question how far we are right to use the great English authors as we do, as text-books for instructing boys in English. I tried to examine this question with reference both to their matter and their style; and I came to the conclusion that from either point of view such writers are quite unsuited for the purpose for which we use them. My views since then have undergone some modification and development, but no fundamental change; and what follows is an effort to set them down with rather more elaboration.

Since writing this paper I have sent it to two or three of those gentlemen who are often described as "eminent educationists," but who are really quite human in private life; feeling sure that, however extensive and peculiar they might consider my ignorance of educational theory, they would endeavour to be lenient. It was slightly disconcerting, though no great matter for surprise, to learn that in much of what I had said I was merely repeating what is now accepted by the orthodox. And one of my critics informed me that I had failed to realize that the system in force is really an attempt to put the orthodox theory into practice. The idea is, he explained, that the schools teach the language and the colleges then teach the literature. He added that of course the schools do not teach the language. I would reply that, in that case, the colleges are trying to build a house without any foundations.

Another of my critics remarked that while my observations were platitudinous enough, the views set forth had not really won their way in India: and he went on to say, if I remember, that he did not entirely agree with them himself. I hope, in any case, that there may be some readers of the Dacca Review who, though they may not be prepared to tackle a library of books about th "Direct Method," may think it worth

while to consider for an hour or two a criticism of the system with which they are familiar. The importance of the subject can hardly be overrated, directly affecting as it does every one of that vast number of Bengalis who have any concern with the way in which English is taught in the schools and colleges of the Presidency. And I think it cannot be doubted that, whatever the value of my arguments may be, the results of our present method are very far from satisfactory. On this point I have provided some evidence in the appendices.

What in the first place is our object? Has this ever been clearly formulated? Are we trying to teach the English language, as now spoken and written? or to teach English literature (if such a thing is possible)? or to teach the language first and the literature afterwards? or to give a sound knowledge of English first to all our pupils, and then to add, in the case of those who have a real linguistic faculty and literary taste, some knowledge and appreciation of English literature?

Beyond doubt, in my opinion, this last should be our object; but I see nothing to show that it is so. Confused, as it seems to me, partly by our recollection of the methods traditional in English Schools and Universities for the teaching of Greek and Latin, partly by the knowledge that we possess in English one of the great literatures of the world, we have hesitated to exclude the great writers from our curricula, and have adopted the policy of trying to teach the language through the medium of the literature. We have tried by this method to combine two objects, and have failed, I think, in both. We have failed to teach the language; and have failed to impart an appreciation of the literature.

To attempt to teach a language through the medium of its literature is an unnatural inversion of the proper process. A man may speak and write a language easily and correctly enough, who yet knows and cares nothing about its literature. Thousands of English people do so. But he cannot appreciate literature unless he possesses, first this easy familiarity with the language of every day, and secondly something more: a wider vocabulary, a finer taste for words and phrases and rhythms. And this wider vocabulary and finer taste cannot be built up apart from the ordinary process by which a language is acquired. It results from an extension of that process. The vocabulary of a man with a taste for letters includes that of the man who has no such taste-it does not differ from it; his faculty of discriminating between this word and that corresponds with the other man's faculty, but is both more penetrating and more complex. Given a nature not irresponsive, the power to appreciate literature depends on knowledge of the language, a knowledge wider and truer than that of a man with this taste undeveloped, but resting on the same

basis of familiar use. To expect a person with a very scrappy knowledge of a language to appreciate its literature is surely absurd. It is equally absurd to try to convey a knowledge of the language through the literature. The language must be taught thoroughly first, and then those who have an appreciation of language beyond the common, an interest in the expression of thoughts and feelings through this particular medium, will be equipped for the gradual understanding of writings in which the resources of the language have been most skilfully and effectively used.

All this, it may be said, is mere dogmatism. I shall try later to give reasons for my belief that familiarity with common speech is essential to a real appreciation of good writing: but first let us try to discover how far the methods we adopt for teaching the language are likely to be successful. Consider the way in which a child learns its mother-tongue. Probably no one ever becomes so familiar with another language as with that which he learnt first: no one has so good a chance of appreciating a foreign literature as his own. It must surely follow that the best way to learn a foreign language is that which resembles most nearly the instinctive process by which a child acquires the faculty of speech: and this holds good whether you aim merely at the power to speak and read and write it for the purposes of every day, or whether you hope to study and appreciate its greatest achievements. A child, as everyone knows, begins with a lengthy period of "babbling"-a process which apparently trains its vocal organs in the production of the various vowel and consonantal sounds. I do not advocate too strict an imitation of this stage in the acquisition of a language, if only because one must have some pity on the ushers, whose lot already is not a happy one; and imagination boggles at the thought of presiding over a babbling class. But I may point out that we pay hardly any attention to this fairly important matter of pronunciation (though I admit the difficulty of doing so effectively); and that this "babbling" phase seems significant of the methods of nature—apparently so slow and humble, at least in the earlier stages, yet in the result so rapid, and so incomparably superior to the pompous and futile methods of the class-room. Soon the child begins to pick up words, the names of things around it, which it hears scores and hundreds of times; and a little later it begins to notice phrases compo wholly or partly of words with which it has become familiar. It now resembles an intelligent parrot, repeating every thing it hears, and as its vocabulary widens it is enabled to form new phrases on the analogy of those which it has heard. Thus it is fairly launched on the double process—the acquisition of words and their combination into sentences. Its range of thought and

feeling is of course very limited: but step by step and with great rapidity, as that range widens, its power of expression widens too. It knows nothing of dictionary and grammar, but what it wants to say it is able to say, with accuracy and ease.

Trace the process further. The child will of course learn to read at a fairly early age, but not till he has acquired a ready command of colloquial speech. No attempt will be made at this stage by any sane parent to force the pace, or demand appreciation of books whose thought and expression are beyond his capacity. He will read for his own pleasure and amusement, and will only be given such books as he may fairly be expected to enjoy and understand. Books will to some extent introduce him to a new world outside his own practical experience; but reading with full enjoyment is itself a province of experience; and thus the principle will still hold good that his vocabulary widens step by step with his experience. One point however must be noted. All but the simplest books will soon introduce him to words and idioms rare in varying degrees in colloquial speech. But having already obtained a fluent command of colloquial speech before he is introduced to this new vocabulary, he will instinctively differentiate between the words he hears and the words he reads: just as in speech he has already learnt to differentiate between words he hears very often and those he hears very seldom, even though such words might be classed together as synonyms in the dictionary.

We here touch on a point of great importance. As Sir Walter Raleigh has truly remarked, "there are no synonyms": no word is precisely equal in force or co-extensive in range with another word, though their meanings may overlap. The subtle differences between a word and its "synonyms" spring from many different sources: sometimes it seems impossible to explain why one word should possess an elusive quality of suggestion that another lacks: but among the chief causes of distinction are the comparative rarity or commonness of a word, and its literary or colloquial character. I shall return to this point later.

Finally the boy, possessing a thorough knowledge of the vernacular, and a growing appreciation of literary art, is able, as his mind develops, more and more to understand those writings to which we give the name of literature,—writings which present a true and worthy record of the thoughts and feelings of natures great or sensitive beyond the common.

To sum up then, the features of the natural process by which a child learns its mother-tongue are as follows:—

(1) Acquisition of the power to pronounce the necessary sounds;

(2) Constant hearing and repetition of words;

(3) Constant hearing and repetition of phrases, and the instinctive formation of new phrases on the analogy of those absorbed;

(4) Simplicity of words and phrases so acquired, the child's faculty of speech widening with its experience;

(5) The postponement of reading till after the acquisition of a firm grasp of colloquial speech.

It may be replied that I have said nothing that is not obvious, but that the conditions under which a Bengali boy has to learn English are so different from those under which an English child learns its own language that no comparison is possible. It will be pointed out that whereas a child learning its mother-tongue has many teachers, a school-master has many pupils; that the school-master has to teach a language which is foreign to him, and of which his own knowledge is imperfect; and that owing to the large number of learners, nearly all the instruction from the beginning has to be conveyed through books. I of course admit the difficulties, but I believe that a far closer approximation than we attempt could be made to the natural process. It may also be urged that it is not fair to describe our method as an attempt to teach the language through the medium of the literature; that the books which school-boys read during their early years are quite sufficiently simple; and that it is only after they have matriculated, and have had ample time to acquire a satisfactory knowledge of simple modern English that they are set to read books of the sort that "no gentleman's library should be without."

In the appendices I have given lists of the books prescribed in High Schools by the Department of Public Instruction and for the various University examinations by the University. I have also given brief extracts from papers written by students at various stages of instruction. My object has been to contrast what may be called the standard indicated by the prescribed books with the actual standard of attainment. I am aware of course that there is a certain vagueness attaching to the phrase "the standard indicated by the prescribed books". Yet it has some meaning; and if an outsider unacquainted with our affairs were to read, let us say, the list of books for the Intermediate Examination, and learn that the candidates had studied selections from the writings of Tennyson, Gray, Milton, Cowper, Macaulay, Swift and Addison, and that further they were prepared to face a paper with the imposing title "Essay, Prosody and Rhetoric," I think that this would suggest a certain standard to his mind and that if he were then to read the answer papers submitted he would feel a good deal of surprise.

I should explain that in selecting passages for quotation in the appendices I have not gone out of my way to choose specially grotesque productions.

I have taken a few extracts from the papers of average candidates avoiding both the unusually good and the unusually bad.

The appendices then show, on the one hand, the sort of writing that boys produce after spending years over the study of English: and on the other, the books through the medium of which their education is, at the corresponding stages, imparted, and which, I suppose, they are expected to appreciate.

I should like now to take in order the five points I have enumerated above as characteristic of the natural process by which a child learns to speak, and see how we ignore that process, and shut our eyes to the lessons it conveys.

(1) Pronunciation: I think I should not be far wrong in saying that no genuine attempt is made to impart correctness of pronunciation. At the same time the difficulties in the way of doing so must be admitted to be very great, perhaps at present insuperable; since the masters, who are for the most part poorly paid and not highly qualified, have themselves a very imperfect command of English pronunciation. Improvement in this matter must proceed slowly by the gradual introduction of more highly qualified teachers. But the loss to the learner, both for practical purposes and for the appreciation of good writing, is distinctly serious.

(2) Constant hearing and repetition of words. If it is assumed that in the instruction of a Bengali boy in English, reading must in the main take the place of hearing, and writing of speech, the most obvious defect of the Reading Books in use is that there are not nearly enough of them. They should be a hundred times as many. I have before me five small volumes, "Longman's English Course for Indian Schools", numbered First Reading Book Second Reading Book, and so on to Fifth Reading Book These books, which are printed in good large type, contain respectively 43, 80, 165, 180, 219 and 687 pages in all. A good deal of the space is taken up (very properly) by illustrations; a certain amount also by questions and exercises. I do not intend to criticize these books in detail. I daresay they are good enough of their kind (though I should be glad to see all the verse cut out of them). My objection is that each of these little Readers, supplemented by one or two small Poetry books, and of course by Grammar and Dictionary (those two burdens between which the Bengali student couches down like Issachar) provides the whole English reading for a year's course; that the plodding through these few score pages, and the listening to "instruction through the medium of English" of a very inferior kind, are supposed to take the place of that day-long chatter *and reading* by which an English,

child absorbs a stock of words that, without any conscious effort of memory, will henceforth be at its disposal. I am not here concerned with the general objections to that extraordinarily drastic experiment by which all instruction after the elementary stage is given through the medium of English: an experiment which could only be justified, if at all, by the most complete and overwhelming success in the teaching of English, and which in my opinion has been a truly dismal failure. At another time it might be interesting to try and show how that method of teaching renders the master half dumb and the pupil half deaf. Here I only wish to point out that the method does, and can do, very little for the pupil's English. The subjects on which the master speaks to his class are limited in scope, and remote from the pupil's ordinary interests: their terminology (*e, g,* in Grammar, Geography, Geometry) is largely technical: while the master (who as a rule has not a wide or correct knowledge of English himself) is unable to use his medium of instruction with boldness and freedom, and tends to lapse into a stiff and stereotyped collection of often inaccurate phrases. Thus the Bengali boy in the course of a year's reading and study meets with a small stock of words of which even the commonest can recur but seldom. His vocabulary is hopelessly inadequate; and to recall even the few words that compose it needs an effort: while his total experience of the use of English being so limited, he necessarily lacks that power of differentiating between common, less common, and rare words which is so essential for the appreciation of shades of meaning. It must not be forgotten also that it is his reading alone that can definitely impress on his mind the vagaries of English spelling: and though I personally think an unreasonable degree of importance is attached to correctness of spelling, still it must be borne in mind that most people do think it important.

3. Constant hearing and repetition of phrases, and the formation of new phrases on the analogy of those absorbed.

Much that I have said above with regard to words will apply also to the combination of words. But in this matter we are confronted with a more stupefying production than the Dictionary, that is the Grammar.

As in other matters, so in the teaching of grammar and syntax it appears to me that we have deliberately inverted the natural process. Grammar is a subject of considerable interest; but *it is a subject for the expert and not for the beginner.* To stuff a boy's head with grammar rules on his first introduction to a language is like teaching a a child anatomy when it is just beginning to walk. (Probably most of us have heard an instructive fable about a centipede which tried to think out the order in which it had to move its legs

It became very puzzled indeed). Imitation and practice are what are needed, not books full of definitions and rules and examples. Here is a model of a parsing lesson taken from the Introductory English Grammar, which is put into the hands of small boys whose vocabulary probably consists of a few score words all told, and who can hardly write the simplest sentence without a blunder. The extract is rather long; but if it tires any one who reads this paper, let him reflect how much more it must tire the children for whom it is intended.

Sentence :—Upon reaching the station, we waited till the first train came in.

1. 'Upon' is a *compound preposition* linking the pronoun *we* with the noun *reaching*.

2. 'Reaching' is a *verbal noun*, object of the preposition *upon* and governing the noun *station*.

3. 'The' is a *demonstrative adjective* showing that some particular station is meant.

4. 'Station' is a *class noun*, singular number, neuter gender, objective case, being the object of the verbal noun *reaching*.

5. 'We' is a *personal pronoun*, of the 1st person, plural number, nominative case, being subject of the verb waited.

6. 'Waited' is an *intransitive verb*, weak, indicative mood, past imperfect momentary tense, plural number, 1st person. It agrees with its subject *we* in number and person,

7. 'Till' is a *subordinative conjunction*, joining the subordinate sentence "the first train came in" to the principal sentence "we waited".

8. 'First' is a *demonstrative adjective* in the superlative degree, qualifying the noun *train*.

9. 'Train' is a *class noun*, singular number, neuter gender, nominative case, being the subject of the verb *came*.

10. 'In' is an adverb of place, modifying the verb *came*. [From the Introductory English Grammar, prescribed for Class VI of High Schools.]

Compound preposition, subordinative conjunction, demonstrative adjective, past imperfect momentary tense !—What notion can these Gargantuan terms convey to the brains of the miserable little sinners who are supposed to learn them ? If they met such terms in their Readers, it would probably take them half an hour to arrive at the merest glimmering of the sense intended. And yet they are expected not merely to learn by heart rules containing these monstrous phrases, but to assimilate them so perfectly as to be able to apply them at sight in the course of their reading, and use them as guides to correctness in composition. I suggest that the children who have to batter their brains over this rubbish (it is rubbish for them) ought to be reading every day many pages of the simplest English, making summaries of what they have read, in Bengali and in English ; translating easy English into Bengali, and Bengali into English ; imitating and practising.

It is moreover worthy of note that in this fundamental matter of making boys practise composition, we have fallen away badly even from the system that prevails in England for the teaching of dead languages, the system on which, as I suppose, our method is based. Those who teach Greek and Latin in England pin their faith very largely to rules and parsing, and the rest of it (with far more excuse than we can urge, who are teaching a living language). But at least they combine this with a certain amount of steady practice in composition; with the result that the more elementary rules, at any rate, are firmly implanted in everybody. The Latin prose of an English Fifth form boy would, I doubt not, have made an ancient Roman 'stare and gasp:' but at least such a boy does not make false concords in every other line, or if he does, he hears about it. But almost every page of the examination papers, not of school boys only, but of candidates for the Bachelor's degree of this University, will show singular verbs tacked on to plural nouns, and similar blunders that ought to have been impossible to the writers for years: nor are they at all uncommon in the papers of would-be Masters of Arts. I shall be told that these youths make such blunders in the hurry of writing their answers within a limited time. Precisely. I do not suggest for a moment that they do not know that a plural noun should have a plural verb. It was probably one of the first rules they learnt. But the observance of the rule has never by constant practice become instinctive with them: and when they are in a hurry (or sometimes without that excuse) they forget to apply it. They know it only as a rule.

But such a limited amount of practice as English school-masters give in the writing of Latin and Greek would not I think go far towards teaching any but the most elementary points in regard to a living language: still less will it impart any sense of those refinements of speech where grammar and syntax merge into idiom. Nothing strikes the reader of papers submitted by College students more forcibly than their utter confusion of the articles, the use of 'a' instead of 'the', and 'the' instead of 'a;' the omission of articles when they are wanted, and their insertion when they are not— such mistakes occur, I had almost said, in every other line. Yet an English child finds no special difficulty with its articles. What is the inference? Surely that the rules governing the use of the articles are too difficult and complex to be learnt and deliberately applied. Practice will make their right use instinctive: and when that stage has been reached it may be of interest to find out what the rules are. How many English people, unless grammar happens to interest them, could give rules for the use of 'shall' and 'will', 'should' and 'would?' How many foreigners, though they may know the rules by heart, can be trusted

to apply them? Or take a small point in connection with the use of the relative:

The book which I left on the table has a red cover.

The book, which I left on the table, has a red cover.

A person who knows English perceives at once and by instinct the difference between these two sentences and if he has occasion to write them will feel no difficulty about inserting or omitting commas according to his meaning. The writers of that fascinating little book "The King's English" would call the first relative a defining, and the second a non-defining clause; and they state their rule thus: 'The function of a defining relative clause is to limit the application of the antecedent; where that is already precise, a defining clause is not wanted". That seems to me a most neat and comprehensive rule; and a person who has a fair knowledge of English, and is interested in this sort of thing, will find some pleasure in applying the rule, and seeing how well it covers different cases. I do not deny moreover that a person not perfectly sure of himself might find the rule of use in case of doubt. But to teach an absolute beginner such a rule and expect him to apply it—so topsy turvy a method is doomed to failure from the start.

The result of the method we follow is what we might expect. I have referred to some of the elementary blunders that college students make after they have spent years over English. And what actual benefit do they obtain from the process they have undergone? After they have matriculated they can perhaps (if they have studied their grammar diligently for six years or so) give examples of the "Future Imperfect Momentary Tense" or the "Present Perfect Continuous Tense." They have the advantage of knowing that the feminine of "jack-ass" is "jenny-ass"—how many English people know that?—that the plural of calico is calicoes whereas the plural of stiletto is stilettos; and many other facts of equal value. I venture to think that a man might live respected and die lamented without knowing any of these things. And in their college course the process is continued. They learn by heart perhaps a number of curious words—'hypallage', 'enaeresis,' 'hyperbole'— and of these they can give definitions and examples; but I think I should be within the mark in saying that many hundreds of graduates of the Calcutta University habitually form the simplest questions incorrectly, saying, not "When does he go?" or "When is he going?" but "When he goes?" And such elementary mistakes as "He asked that how—" "If it will be fine—" and the like are to be met with every day.

(4) Simplicity of words and phrases so acquired.

The child learning its mother-tongue learns the words that it wants and no

others: first, common words for common things; later, both from speech and from books, less common words for common things, and rare words for rare things: and so also with the complexities of grammar and idiom. Of course speech and thought react on one another. Speech helps thinking, as thought develops speech. But the child's vocabulary, as I have said, widens with its experience. Its grasp of grammar and idiom is formed by the same unconscious process. First it acquires a firm hold of simple and straightforward colloquial speech. This will give it the larger and the most fundamental part of its vocabulary, and no small amount of discrimination, moreover, between words and phrases that by the dictionary are synonymous. On this material will be embroidered later the more elaborate refinements of literary art, as the growing mind learns to appreciate and demand them.

I remarked on an early page of this paper that among the chief causes of distinction between so-called synonyms are their comparative commonness or rarity, and their colloquial or literary character. A few obvious instances will suffice to show, first how great a difference exists between so-called synonyms—a difference imperceptible save to those who, from a wide experience of the language, are able to judge of their comparative commonness, in speech and books, in prose and verse; and secondly how words derived from the same stock often come to acquire very different shades of meaning, which only constant practice will reveal. Such a group of words as sea, ocean, main, wave, illustrates the first point. Sea is the usual word, in speech and writing, prose and verse. Ocean is rare outside of a book, and uncommon in prose. Main, I imagine, is hardly to be found except in verse; while wave which, in this sense, is also confined to verse, has in prose a different though connected meaning. Again, it is one thing to say that you feel respect for a man, another to say that he is respectable. (Indians continually trip over this last word). To speak of a man's worth is a high compliment. To say that he is worthy is almost a mark of contempt. To say that a man is not fit for his post is to condemn him curtly as incompetent. To say that he is not fitted for his post is to *imply*, much more *mildly*, that though he has talents, they would be better employed on other work. Fool is, or may be, a strong word. Foolish is a trivial word. Oaths (I may remark incidentally) though not in themselves an important branch of speech, offer an odd and interesting example of the apparently arbitrary way in which words acquire a greater or less amount of force, without reference to their root-meaning. Sometimes, no doubt, the general tendency, in accordance with which words lose emphasis by constant use, is easily perceptible. "O Hell! what do mine eyes with grief behold?"

says Satan in Paradise Lost. He would hardly have said so to-day, I think, the popularity and the irritations of golf having combined to render *banal* an exclamation once full of misery and despair. But a number of words, in themselves mere interjections or intensives, are still regarded by many people as not merely in bad taste, but positively sinful ; while the emphasis attaching to others varies strangely from time to time, and from country to country. Quite a sensation was caused in England shortly before the outbreak of war gave people more important matters to think about, when Mr. Bernard Shaw put into the mouth of a woman on the stage an intensive which carries not the slightest meaning, either indecent or profane, and of which the worst that can be said is that it is a favourite expression with the working classes ; no very great objection in a democratic age. 'Damn', until lately regarded as too wicked to print in full, is rapidly becoming quite a lady-like expression. The infant Macaulay shewed a sound instinct when he declined to translate 'Mon Dieu' by its literal equivalent. On the other hand expressions such as Zounds, Gadzooks, and the like, which in origin are really irreverent, are freely used by the most innocent writers to give an air of verisimilitude to narratives about the Merry Monarch.

Every one is familiar with the way in which slang phrases leap into favour, flourish for a few months, and then as suddenly die and are no more heard. They are the extreme examples of this process of perpetual change.

Old words become obsolete, new words are invented. The ordinary tendency no doubt is for words, like coins, to grow dulled with usage. Annoy is a strong word in Shakespeare. Astonish' is a very strong word in Milton. Sometimes it happens however that words, like wine, develop a latent virtue. Such a word is affront. And examples are too many to quote of the way in which words, having shed one meaning, put forth another, like lizards that have lost a tail. Every page of a dictionary illustrates, to one who knows how to read it, this process of the waning, growing, changing emphasis of words.

Through all this bog of shifting and unstable meaning the surest guide is familiarity with the spoken language. It is that familiarity which provides one with a standard, attunes the ear to the quality of individual words, and shows their fitness for a particular context. Calverley obtains many of his most delightful effects by the unexpected insertion of a word pitched in the wrong key :—

I know that never, never may
her love for me return—
At night I muse upon the fact
with undisguised concern.

Undisguised concern is the sort of feeling with which you would realize that you had lost your railway ticket. Or take a little passage from Matthew Arnold :—"As to the instruction, the

thoughtful educator who was principal of the Lycurgus House Academy—Archimedes Silverpump. Ph. D., you must have heard of him in Germany?—had modern views. 'We must be men of our age' he used to say. 'Useful knowledge, living languages, and the forming of the mind through observation and experiment, these are the fundamental articles of my educational creed." (Friendship's Garland). This all sounds quite plausible. I admit the absurd names give the thing away rather too obviously. But, without them, the pompous word educator and the hackneyed phrase 'modern views' would be quite enough to shew that the writer is laughing at a quack.

It seems to me that a foreign reader who had tried to learn English by the method I am criticising might quite easily mistake these for serious passages of verse and prose.

Since language is perpetually undergoing this process of change, must it not be clear that the reading of books full of obsolete words and meanings, and unusual turns of phrase, must be gravely confusing to a learner who has not yet acquired a firm command of common speech? But the greater part of English literature is made up of poetry, old and new, of archaic prose, and of modern prose so elaborate and individual that it bears no plainer resemblance than poetry to the speech of every day.

The skipping king, he ambled up and down
With shallow jesters and rash bavin wits,
Soon kindled and soon burned; carded his state,
Mingled his royalty with carping fools,
Had his great name profaned with their scorns,
And gave his countenance, against his name,
To laugh at gibing boys, and stand the push
Of every beardless vain comparative.
(I. Henry IV, III, 2)

Will the reading of that improve a stumbling learner's command of English? Or even of this, from the most lucid of modern poets?

He made a feast, drank fierce and fast,
And crown'd his hair with flowers—
No easier nor no quicker pass'd
The impracticable hours.
(M. Arnold. Obermann once more).

Consider some old-fashioned prose:—

It is a Ridiculous Thing, and fit for a Satyre, to Persons of Judgement, to see what shifts these Formalists have, and what Prospectives, to make *Superficies* to seeme *Body*, that hath Depth and Bulke.

(Bacon, Essays, Of Seeming Wise)

And, finally, a passage of 19th Century prose:—

I have no ear.

Mistake me not, reader,—nor imagine that I am by nature destitute of those exterior twin appendages, hanging ornaments, and (architecturally speaking)

handsome volutes to the human capital. Better my mother had never borne me.— I am, I think, rather delicately than copiously provided with those conduits; and I feel no disposition to envy the mule for his plenty, or the mole for her exactness, in those ingenious labyrinthine inlets— those indispensable side-intelligencers.

(Elia, A Chapter on Ears).

It may be urged that, in so far as these passages vary, in this way or that, from the ordinary speech of to-day, they will prove confusing to an English as well as to an Indian boy. But surely that is not so. If the reader has acquired in the natural manner a command of ordinary speech, the use of obsolete terms and meanings may puzzle him, but will not affect his own spech. When for instance he reads in Hamletof a king,

Upon whose property and most dear life
A damn'd defeat was made,

His attention will at once be arrested by the use in such a context of the word defeat. But if the word defeat was previously unfamiliar to him, there would be nothing to show that it did not ordinarily mean destruction. And the use of uncommon words, employed with intention, will produce the desired effect upon him, just because he knows they are uncommon *e. g.*

There is no sound, no echo of sound,
in the deserts of the deep,
Or the great grey level plains of ooze
where the *shell-burred* cables creep.
(Kipling, the Deep Sea Cables).

But the learner who is set to read 'literature' before he has acquired a grasp of modern English finds at every step *the obsolete or the unusual pressed on his attention as normal and right.* It is as though, without any knowledge of modern customs, he were to be taken to a fancy dress dance, and see people masquerading in the fashions of every period from the 16th century to our own.

The results of our method are such as we might expect. We fail to give boys the masses of simple reading that are necessary to provide them with an adequate vocabulary readily available, to impart to them some perception of the character of words, and to instil in their minds an instinctive sense of right grammatical usage. And while their handling of the language is still extraordinarily feeble and hesitating, we make matters worse by introducing them to "literature," of which the greater part is poetical, or archaic, or eccentric. The result is inevitable. Their handling of the language remains feeble and hesitating, but becomes much more erratic than before. Their stock of words and phrases becomes a jumble of old and new, common and rare, poetical and prosaic. These are the well-known features of Indian English, as ruthlessly pounced upon and caricatured for example by Mr. Anstey. They are precisely the *features which à priori* one would have expected our method of teaching to produce.

And yet, unnatural as our method is, it seems to me we make by no means the best use of it. Just as in the teaching of grammar we have fallen away badly, as I remarked, from that steady practice in composition that schoolmasters give their boys in England, so also in this matter of words and idioms. The great majority of school and college boys in Bengal have no idea of precision in the use of English words They have never been made to discrimininate, even within the narrow limits of their vocabulary, between the word that conveys their exact meaning and that which conveys something like it. If they must learn through the medium of literature and the dictionary, they should at least be taught how to use the dictionary. Here are two examples of slovenly writing that I noticed recently in looking over some M.A. examination papers. One candidate, trying to give the gist of Shakespeare's 44th sonnet ("If the dull substance of my flesh were thought" etc.) wrote "My thought would run to you by the squeezing of a lemon." He must, I suppose, have seen somewhere the phrase invented by an 18th century toper who, being obliged to leave his friends for a short time, assured them that he would return "in the squeezing of a lemon." It had never occurred to this youth to ascertain the point of the phrase. To him it meant simply *in a short time*, and in that sense he inserted it (or something like it) in his answer-paper. Another candidate, describing the passing of Arthur spoke of "a barge manned by three mysterious ladies." Perhaps anybody might make such a slip. But this kind of slap-dash writing is too common for such a plea to be admitted. It is not exceptional, but typical.

(5) Reading a superstructure imposed on a firm basis of colloquial speech.

I have tried in the preceding section to show why I think that a premature introduction to literature must, by bringing obsolete or abnormal meanings into undue prominence in the learner's mind, cause grave confusion. Yet I hold it to be no less true that familiarity with colloquial speech is essential to the appreciation of literature, and that to set boys to read literature before they have acquired that familiarity is utter waste of time. It may be objected that such a belief is inconsistent with what I have been saying: that if there is all this difference between the language of the great writers and the language of everyday, then it should be possible to appreciate those writers even if one is unfamiliar with the language of every day. Such a view I believe to be based on a complete misconception. The vocabulary of literature, as I remarked at the beginning of this paper, includes that of ordinary life; it is not a different thing, but a larger thing. Literature is only speech, but speech uttered with a more deliberate motive, and recorded in a more durable form. Its devices and complexities are

therefore more elaborate. The writer sits down to say things more effectively than he has either the desire or the time to say them when conversing with a friend. And he produces his effects by variations, small or great, from the normal. Lamb, for instance, in the passage I quoted, is playing with the dictionary, using elaborate terminology for a joke. But unless you know which of a group of synonyms is the common word, you do not know which is the rare word either. Mathew Arnold, again, produces his effect by a variation from the speech of every day. A note on the verse given above would probably talk about double negatives, and cite an example or two, and leave the learner with the impression that "no easier nor no quicker" was the same as "no easier and no quicker". But it is not the same. The old-fashioned usage, with its literary associations, carries an air of imposing gravity that the modern ordinary phrase would lack. But to perceive that, you must know that it is old-fashioned. For the speaker and for the writer a common standard is necessary ; a norm to judge both the normal, and variations from the normal.

But at least, it may be urged, this hardly applies to writings so plainly archaic as *e. g.* those of Shakespeare and Bacon. I shall be reminded that in the previous section I have been emphasising the mutability of language. Where then is the standard common to the speech of today and the writings of three centuries ago ? I think it beyond dispute that, other things being equal, a contemporary of Shakespeare's must have been able to understand him better than a reader of today. Many passages of Shakespeare—whole tracts of Cymbeline for example —appear meaningless on a casual reading. In the lines I quoted about "the skipping king" there are a number of unfamiliar terms which have to be looked up, and the full effect of which the dictionary cannot convey. Again one sees, I think, how in passages of Milton like the following,

> Begin, and *somewhat loudly* sweep
> the string. (Lycidas)
>
> He ceased, for both seemed *highly*
> *pleased*
> (Paradise Lost, II. 845)
>
> *No wonder*, fallen such a *pernicious*
> highth !
> (Paradise Lost, I. 282).
>
> Swinish gluttony
> Ne'er looks to heav'n amidst his
> gorgeous feast,
> But with besotted base ingratitude
> Crams, and blasphemes his feeder.
> *Shall I go on ?*
> *Or have I said enough ?* (Comus)

—phrases that, when they were written, were doubtless suitable enough have become so hackneyed as to appear undignified in their respective contexts. Indeed the questions with which the lady in Comus pauses to take breath, after a string of abusive ephithets, sound so absurd that perhaps Milton's most obvious and characteristic defect is

partly responsible. In any case such passages do not strike a modern ear quite as they struck those that heard them first. The standard has changed; and in so far as it has changed we are less fitted than our forefathers for the appreciation of Shakespeare and Milton.

Nevertheless the importance of such changes must not be exaggerated. To learn a language through the medium of archaic writings is indeed to invite confusion. The course of centuries has printed many changes on the face of the language. But considerable as those changes of vocabulary and idiom appear when scrutinized in detail, they are superficial. The main features subsist. The changes move upon the surface. Underneath is a solid bulk, the body of the language, shaped by its spirit and genius. What strikes one first, on opening an old writer, is the difference between his language and ours. In much the same way, when one sees again a face that one has not seen for years, one is first struck by the difference. But the familiar features gradually emerge from behind the changes wrought by time; and the more one reads the old writers the more apparent, I think, grows the fundamental likeness to the speech we know. I would suggest that any one who doubts this should read *e. g.* the speech, too long to quote, which closes the Second Act of Hamlet. Examine this bit by bit and you will find plenty of obsolete meanings and unfamiliar turns of speech, such as would make it a bad model for any one trying to learn English. Yet the whole, as you read it through, sounds as idiomatic as if it had been written yesterday.

The most casual speech and the most elaborate work of literary art derive their qualities from the same essential facts— the vocabulary that makes up the language, the powers of the human voice, the sound of the spoken word. I hold that to read Shakespeare before one has a firm command of English must prove an obstacle to its acquisition But I cannot believe that there can be any true appreciation of good writing by those who are unfamiliar with the diction, the idiom, the rhythm of daily speech.

(a) Vocabulary and Diction.

The method (if it is a method) by which the Indian boys are set to learn English appears to me to offer quite a number of different obstacles to the appreciation of the books which, at a far too early stage, they are set to read. The first difficulty is caused by the meagreness of their vocabulary—a vocabulary based on half a dozen small Readers and the "instruction through the medium of English" to which they have listened in their school course. To have to refer perpetually to the dictionary or to notes in order to arrive at the bare, literal meaning of a sentence is a drudgery that distracts attention from more important matters. It defeats the enjoyment of all except two classes of readers: those who are really less anxious to *read* than to find "something

craggy to break their brains upon," as Byron said; and those whose passion for literature is so great that no trouble is too much for them. Boys seldom belong to either class. And to suppose that you will actually make a boy care about a difficult author by subjecting him to this process—that you will not rather give him a deep and permanent distaste for that author—is a piece of optimism that would be impossible to any but the idealists in the teaching profession. We demand too much, it seems to me, in the way of sheer endurance, by setting Indian boys, with the scrappy knowledge of English they possess, to read difficult, or even simply long, books. An active and vigorous man can enjoy a ten or a twenty mile walk. It would be absurd for him to take a child with him. A novel of Scott or Thackeray is too long for any one who does not take in the meaning as fast as he reads. Perpetual stoppages to find out the meaning of a word, a sentence, an allusion, are fatal The mind is absorbed in detail, and fails to grasp the whole. The eye cannot see the wood for the trees. Let any honest man who has not a devouring passion for literature test his own experience. It may be regrettable, but few English people, outside the two classes I have mentioned, read Chaucer: and I suspect that Shakespeare, even among his own countrymen, receives a great deal more lip-worship than intelligent appreciation. In fact, it is no joke for a reader unless, in addition to a taste for poetry or drama, he has a real liking for puzzling out a meaning, to be brought up short on every other page by such a passage as this :—

Should I, damn'd then,
Slaver with lips as common as the stairs
That mount the Capitol; join gripes with hands
Made hard with hourly falsehood—falsehood, as
With labour; then by-peeping in an eye
Base and unlustrous as the smoky light
That's fed with stinking tallow; it were fit
That all the plagues of hell should at one time
Encounter such revolt.

(Cymbeline, I. 6. 103.)

Not long ago I was reading the play in which these lines occur with an M.A. class; and could not help reflecting that this sort of thing must have increased the dislike which they probably felt already for their author.

But when a reasonably large vocabulary has been acquired much more is necessary for the true appreciation of literature: a familiarity with the individual character of words which can only spring from a thorough acquaintance with the spoken language. I do not wish to push the doctrine of "the right word" to exaggerated lengths. Loosely used, when there is nothing very important to say, many words are

no doubt synonymous : one will do as well as another. And the straining after the right word, or rather perhaps the excessive abhorrence of any commonplace word, is apt to lead to the preciosity of the minor poet :—

The light thrilled towards her filled
With angels in strong level lapse.
(Rossetti, The Blessed Damozel).

Nevertheless when language is being used at high tension, synonyms do practically disappear, as a reader may easily see for himself by taking any passage of fine poetry and attempting to substitute a word of his own for a word of the poet's. The writers who employed the "poetic diction" fashionable in the 18th century were at fault in this, that they ignored the characters of words.

What avails.........
This pomp of nature ? What their balmy meads
Their powerful herbs and Ceres void of pain ?
(Thomson, Seasons)

This would convey as much, or as little, to a foreigner trained, as Indian students are trained to read English, as it does to an Englishman. That is what is wrong with it. I believe it is only by constant and familiar use that we arrive at so intimate a knowledge of the characters of words as to be able to recognize the supreme fitness of this word or that for the work it is doing. Every reader of poetry knows too how sometimes a word—it may be rare or common—seems to have a mysterious quality of suggestion beyond that pre-eminence of fitness to which I have referred : but this may be due to some chance association that the word possesses for the reader, and the stirring of a dormant memory.

There is at any rate one special feature of poetry in regard to which the appreciation of the single right word, as apart from the phrase, is indisputably capable of affording the finest pleasure, and that is when the great describers make a direct appeal to one of the bodily senses. The senses of smell and taste have hardly developed any language of their own, though it is interesting to notice how often Milton at any rate makes use of their help in the only way open to him, to add vividness to his descriptions e. g. The smell of grain, or tedded grass, or kine,
Or dairy. (P. L. IX. 450)

They * * * instead of fruit,
Chewed bitter ashes which the offended taste
With spattering noise rejected : oft they assayed
Hunger and thirst constraining ; drugged as oft,
with hatefullest disrelish writhed their jaws,
With soot and cinders filled.
(P. L. X. 564)

There are no great phrases here, but a careful selection of descriptive words. Frore is admirably fitted to express a particular feeling in—

The parching air
Burns frore, and cold performs the effect of fire.
(P. L. II. 594)

The suggestion of sound by sound is of the very essence of language. Examples of this are too common to quote. I do not know how far the descriptive word (supplemented as it usually is by the sound of the whole sentence) can appeal to ears unfamiliar with the sound of the spoken language. Less obvious examples of the absolutely right word are provided by appeals to the eye :

The wandering moon,
*Riding* near her highest noon,
* * * * *
And oft, as if her head she bowed,
*Stooping* through a fleecy cloud.
(Il Penseroso).

(That Milton was very pleased with stooping, as he had a right to be, is shown by the repetition in Comus.

Thou, fair moon,
Stoop thy pale visage through an amber cloud).

Tennyson is perhaps the greatest adept in the choice of the single descriptive word in English :—

Yonder cloud
That rises upward always higher,
And onward drags a labouring breast,
And *topples* round the dreary, west,
A looming bastion fringed with fire.
(In Memoriam, XV.)

So far as the dictionary-meaning is concerned, there seems little reason why you should not put *bending* for *stooping*, and (if the metre allowed) *overbalances* for *topples*. In the first instance you would knock all the poetry out by doing so : in the second you would make the thing absurd.

(b) Idiom and Phrase.

Inseparably connected with diction are idiom and phrasing. Indeed, apart from the single descriptive word which suggests to the reader a physical sensation, it is rather as a member of a phrase than by its individual merits that the rightness of a word, used by a master of language, in generally apparent. The power of coining the perfect phrase—the summoning to alliance of those words that by their harmony of sound and meaning will best express an idea in a particular context—is perhaps the power which more than any other distinguishes the great from the commonplace writer. It is an extension of the faculty of choosing the single right word. (Of course I do not suggest that those writers whom I have quoted above are not also masters of poetic phrase). It depends partly on the perception of the character of each word, partly on that intimate familiarity with the very genius and spirit of a language by which idiom, and slang, also are created.

A large portion of literature is made up of plays, novels, and personal essays in which a close familiarity with the idiom of every day is obviously necessary

to enable the reader to catch more than the bare, literal meaning of the words. And as the object of literary art is not in the main to convey fact or argument, the perception of bare literal meanings is a very small part of what a reader has to aim at.

The printed page has an extremely complicated task to perform. It has to convey not merely the words, but, with such help as stops can give, to supply the place of all those aids to apprehension which, in actual speech, are given by the speaker's appearance, his expression, the tones of his voice, his pauses, his gestures. Take the dialogue between Dugald Dalgetty and the Son of the Mist, in the dungeon of Inverary.

"Craven Saxon," said the prisoner, "tell him I am the raven that, fifteen years since, stooped on his tower of strength and the pledges he had left there—I am the hunter that found out the wolf's den on the rock, and destroyed his offspring—I am the leader of the band which surprised Ardenvohr yesterday was fifteen years, and gave his four children to the sword."

"Truly my honest friend," said Dalgetty, "if that is your best recommendation to Sir Duncan's favour, I would pretermit my pleading thereupon, in respect I have observed that even the animal creation are incensed against those who intromit with their offspring forcibly, much more any rational and Christian creatures, who have had violence done upon their small family. But I pray you in courtesy to tell me, whether you assailed the castle from the hillock called Drumsnab, whilk I uphold to be the true point of attack, unless it were to be protected by a sconce."

"We ascended the cliff by ladders of withies or saplings," said the prisoner ......... "The owl whooped around us as we hung betwixt heaven and earth; the tide roared against the foot of the rock, and dashed asunder our skiff, yet no man's heart failed him. In the morning there was blood and ashes, where there had been peace and joy at the sunset."

(Legend of Montrose, Chap. XIII)

The contrast between the enthusiastic utterance of the Highlander and the patronising pedantry, half humorous, half brutal, of the mercenary, is complete. You lose it all, unless your knowledge of the spoken language is such as to enable you to hear the two voices speaking, and to attach a figure to each voice. It is the same when you turn to Shakespeare. Take a brief prose soliloquy.

Fal. You rogue, here's lime in this sack too: there is nothing but roguery to be found in villainous man: yet a coward is worse than a cup of sack with lime in it: a villainous coward:—Go thy ways, old Jack; die when thou wilt. If manhood, good manhood, be not forgot upon the face of the earth, then am I a shotten herring. There

live not three good men unhanged in England, and one of them is fat, and grows old: God help the while: a bad world, I say. I would I were a weaver; I could sing psalms or anything. A plague of all cowards, I say still.

(I Henry IV. II 4.)

There seems little point in reading this unless you catch the grumbling tones of a voice rendered husky by good living; or this that follows, unless you hear the note of exultant memory:—

*Char.*

'T was merry when,
You wagered on your angling; when your diver
Did hang a salt-fish on his hook, which he
With fervency drew up;

*Cleo.*

That time—O times!
I laugh'd him out of patience; and that night
I laugh'd him into patience: and next morn,
Ere the ninth hour, I drank him to his bed;
Then put my tires and mantles on him, whilst
I wore his sword Phillippan.

(A. and C. II. 5)

Ballads and lyrics are essentially idiomatic—common speech, even slang speech, heightened by a touch of feeling to the level of poetry:—

When she is by, I leave my work,
I love her so sincerely;
My master comes like any Turk
And bangs me most severely—
But let him bang his bellyful,
I'll bear it all for Sally;
She is the darling of my heart,
And she lives in our alley.

* * * * *

He hadna been awa' a week but only twa,
When my father brak his arm, and the cow was stown awa;
My mother she fell sick, and my Jamie at the sea—
And Auld Robin Gray came a-courtin' me.

* * * * * *

My heart it said nay; I look'd for Jamie back;
But the wind it blew high, and the ship it was a wrack;
His ship it was a wrack—why didna Jamie dee?
Or why do I live to cry, Wae's me?

* * * * *

Coming to a higher level of poetry, it seems to me that in such a speech as this of Othello's, in which every line is a memorable phrase, it is as essential as in any ballad or lyric to hear the voice of the speaker, as it rises from a forced calm to a passion of grief, then pauses, grimly collects itself, and works up to a crisis of violent action:—

I pray you, in your letters,
When you shall these unlucky deeds relate,
Speak of me as I am; nothing extenuate,
Nor set down aught in malice; then must you speak.

Of one that loved not wisely, but too well;
Of one not easily jealous, but, being wrought,
Perplex'd in the extreme; of one whose hand,
Like the base Indian, threw a pearl away
Richer than all his tribe; of one whose subdu'd eyes,
Albeit unused to the melting mood,
Drop tears as fast as the Arabian trees
Their medicinable gum. Set you down this;
And say besides that in Aleppo once
Where a malignant and a turban'd Turk
Beat a Venetian and traduced the state;
I took by the throat the circumcised, dog,
And smote him—thus.

An intimate knowledge of English, such as can only be obtained by speaking it and hearing it spoken, is as necessary to the writer and the reader of this as to the writer and the reader of "Sally in our Alley." No familiarity with the spoken language will give a poet his phrases, when—

The fairy fancies range,
And, lightly stirr'd,
Ring little bells of change,
From word to word:

but it is a necessary part of his equipment—and of his reader's equipment also. Only so equipped has his instinct for the right combination of words a chance of working. It is this knowledge which sets his materials ready to his hand, and tells him what he can do with them. His knowledge gives him a touch-stone with which he can test his inspirations. It will tell him that this is in accord with the spirit of the language, and that is not. I suggest that every great writer's phrases, whatever his individual manner may be, from the magical simplicity which is Wordsworth at his most characteristic and best:—

The light that never was on sea or land—
The silence that is in the starry sky,
The sleep that is among the lonely hills—
Old, unhappy, far-off things,
And battles long ago—

to Shakespeare's daring and comprehensive grasp, that could match Wordsworth's simplicity—

Tales
*Of woful ages long ago betid*—

could mingle the common and the rare, and did not scruple to invent—

No, this my hand will rather
The multitudinous seas incarnadine,
Making the green one red—

and drew its material easily from all the corners of the earth—

Not poppy nor mandragora,
Nor all the drowsy syrups of the world,
Shall ever medicine thee to that sweet sleep
That thou ow'dst yesterday—

all depend on a familiarity with the sound and spirit of the language so intimate that it works as if by instinct.

And the reader must have his share of this instinct also ; since it takes two to make a poem as to make a friendship or a quarrel. A reader whose mind does not recognize and welcome the right word, the striking phrase, and fails to hear voices speaking from his book, cannot appreciate more than the elements, the bare substratum of what he reads.

Finally I come to rhythm and metre.

Rhythm and Metre.

Whatever may be thought of my remarks on diction and phrase, it can, I should think, hardly be disputed that an ear for rhythm, especially with a language dependent rather on accent than quantity like English, can only be developed by familiarity with the spoken word. It is impossible to acquire a sense of the movement of the language through books : and our inversion of the natural method, to which I have referred so often, is nowhere more glaringly apparent than in this, that boys who have never had a chance of hearing the language properly spoken are taught prosody. They are taught words like *iambic* and *trochee.* They are required to 'name the metre'—as if the names of metres could be of the slightest conceivable importance to any one on earth except to expert students of metre, who naturally require terms and definitions.

Of the importance of an ear for rhythm in prose it is hardly necessary to say anything. It works in unison with a familiarity with words and idioms to enable the reader to catch the 'vocal quality' of what he is reading. And of course it is capable, in prose as in verse, of giving a cultivated ear the keenest enjoyment : but this latter function is more prominent in verse than in prose. Rhythm and metre are indeed of such fundamental importance in verse that I think it might almost be laid down that to 'have no ear' is a sufficient reason for avoiding poetry altogether. And apart from the delight which the mere music of good verse produces, the ear is of course a perpetual guide to the sense or the mood of the poet. Often the movement of the verse directly imitates a physical movement :—

> The upper air burst into life !
> And a hundred fire-flags sheen,
> To and fro they were hurried about !
>
> * * * *
>
> O swallow, swallow, flying, flying south.

Every well-marked metre, (if I may be forgiven for writing down such platitudes) has a character of its own, so that it would be a sheer impossibility to translate the Essay on Man into the Spenserian stanza. Blank verse on the other hand, which permits of so much modification of rhythm within the metre, is capable of great variety of effect. The reader of blank verse therefore needs a delicate ear to follow the indications of changing mood. Here is a rather obvious instance from the end of Tennyson's Lucretius, where

the hurrying, agitated verse is broken short by a line of slow pauses:—

With that he drove the knife into his side:
She heard him raging, heard him fall; ran in,
Beat breast, tore hair, cried out upon herself
As having failed in duty to him, shriek'd
That she but meant to win him back, fell on him,
Clasp'd, kiss'd him, wail'd: he answer'd, Care not thou!
Thy duty? What is duty? Fare thee well!'

The speeches that close *The Cenci*, profoundly sad and calm, lose their significance for a reader who fails to detect the tone of quiet conversation in which they are uttered: while one who cannot scan blank verse at all will naturally fail to perceive how the faltering accents of a stricken old man speak in the broken lines of a famous passage of King Lear:—

Lear. Pray, do not mock me:
I am a very foolish, fond old man,
Four score and upward, not an hour more nor less:
And, to deal plainly,
I fear I am not in my perfect mind
* * * *
Do not laugh at me;
For, as I am a man, I think this lady
To be my child Cordelia.
Cor. And so I am, I am. (IV. 7)

All this is so obvious that I should perhaps apologise for stating it at so much length. And I shall no doubt be met with the objection that what I have said is not only obvious but pointless, since Indian students *can* scan. To this I oppose my belief that for the most part they *cannot* scan, and my reasons for that belief. I do not doubt that if you were to put before them a verse in which each deliberate syllable is given its due place, e. g.,

Queen and Huntress, chaste and fair,
Now the sun is laid to sleep,
Seated in thy silver chair,
State in wonted manner keep:
Hesperus entreats thy light,
Goddess excellently bright—

they could find their way through it by counting the 'trochees.' Possibly they could 'name the metre' (whatever its name may be). But I do not think they would appreciate the delicate grace, the easy precision, of these lines; while blank verse I believe they only "contrive to guess at," as Elia said of the thorough bass, "from its being supereminently harsh and disagreeable."

My opinion is based partly on the average student's manner of reading, partly on certain experiments which I have tried. Recently I put a Third Year class, with which I am reading Milton, to the question. There are about sixty students in the class. As soon as they understood that they had nothing to lose by candour (they had also nothing to gain), *they confessed that they could see no difference between the*

*movement of Paradise Lost and that of ordinary prose.* There was not a single exception in the class. 'When they do agree their unanimity is wonderful.' Every one of these youths had passed an examination in which a knowledge of 'prosody' is demanded. I have more than once tried the experiment of giving third and fourth year students a few lines of blank verse written so that there is nothing to mark the line-endings, and asking them to rewrite them as verse. The results, had I not expected them, would have been acutely distressing. Here is a quite average specimen of a fourth year student's re-arrangement of Paradise Lost. I. 84-91.

If thou beest,
He-but oh how fallen how changed from him
Who, in the happy realms of light, clothed with
Transcendent brightness, didst out-shine myriads
Though bright—if he whom mutual league, united
Thoughts and counsels, equal hope and hazard
In the glorious enterprise, joined with me
Once, now misery hath joined in equal ruin.

I would ask any one who reads this paper to repeat to himself these lines as they should be repeated; and then to ask himself seriously how much advantage you can derive from reading Milton's verse if *that* is how it sounds to you; if, further, you do not know how to pronounce the individual words (so that a line like 'sonorous metal blowing martial sounds' has nothing particular to distinguish it from a line like 'A Mr. Wilkinson, a clergyman'); and if Milton's choice and phrasing of words convey to you just so much meaning as you can extract from a dictionary and a grammar. The bare bones of the story have no more interest than the bare bones of any other story. The theology is merely boring when it ceases to be repulsive. Nothing remains except the possibility that a really imaginative boy here and there may in a manner pierce through all the layers of difficulty that obstruct his vision; and may still draw a faint enjoyment from what he dimly sees of some tremendous picture, like that of

Paradise, so late their happy seat,
Waved over by that flaming brand; the gate
With dreadful faces thronged, and fiery arms.
(P-L. XII. 642)

But to the ordinary reader, to the vast majority, the hindrances to any sort of appreciation are too great: and the game is not worth the candle.

The youth whose notion of blank verse I have given above had passed (let me rub this in) the Intermediate Examination: and the Intermediate Examination includes not only a considerable amount of verse, but a paper that deals (among other subjects) with

prosody. Possibly however it may still be contended that I am generalising on insufficient evidence, and that the youths with whom I have come in contact, must be, in this respect, unusually bad. I would say in reply that I have formed my opinion of the stock from samples taken at random in two different colleges; that I would accept with pleasure a challenge to try a similar experiment in any other college; and that I should be delighted to find myself wrong.

If blank verse causes so much confusion, the irregular lines of Lycidas or the Ode on Intimations of Immortality, the perpetually changing metres of Atalanta in Calydon, must appear the merest chaos. It is useless however to labour the point further. To me it seems painfully clear that for the great majority of college students the only difference between English verse and English prose lies in "the jingling sound of like endings." Where this feature is absent, no difference exists. How great a loss this means to a reader of poetry it would be futile to try and calculate.

So far then I have tried to explain my reasons for thinking (1) that you cannot teach a language through the medium of its literature, and (2) that you cannot appreciate the literature without a through knowledge of the language. It is obvious, further, that Indian boys have to contend with another most serious obstacle in their attempts to understand the work of English writers, I mean their ignorance of English life. Not only have they to penetrate as best they can through the veil of a foreign language, but they have also to assume a mental attitude in many ways very different from their own, to rid theslves of many of their own instinctive feelings, and to adopt an alien tradition.

Of course this difficulty arises, in greater or less degree, in every attempt to read a foreign literature, or an old literature; and it is neither possible nor desirable that any man should read only the literature of his own time and country. But considering the many other difficulties that confront an Indian student, we should realize how great this additional difficulty is, and should take advantage of all possible means to diminish it. For instance not nearly enough use is made, in my opinion, of books with illustrations. It is one thing to read a book which sets out to describe the features of a country, and the manners of its people, and quite another to read, and be expected to appreciate, writing in which a knowledge of such matters is assumed. The mere physical differences between an English and an Indian landscape, and between the figures and the buildings to be seen in them, are enormous. Yet no particular attempt is made, so far as I know, to portray what is unfamiliar in the readiest manner, through the eye. George Gissing—no bad judge—a great lover both of poetry and of England, pronounced Gray's *Elegy* to be perhaps

the most essentially English poem ever written. It is a poem which is constantly set for University Examinations. Consider a few lines of it:

Beneath those rugged elms, that yew-tree's shade,
Where heaves the turf in many a mouldering heap,
Each in his narrow cell for ever laid,
The rude forefathers of the hamlet sleep.
Oft did the harvest to their sickle yield,
Their furrow oft the stubborn glebe has broke:
How jocund did they drive their team afield!
How bowed the woods beneath their sturdy stroke!

With wonderful art the poet calls up before the mind's eye a series of characteristic pictures: but he can hardly do so if the bodily eye has never seen a country churchyard, or a harvester, or a woodman, or a ploughman walking by his team.

Possibly, as I have remarked, illustrations might do something to help in such matters. When we come to more subtle suggestions of a peculiar atmosphere, a colour of the mind, so to say, which only certain unique conditions could produce, I confess myself pessimistic.

"Coming into an inn at night—having ordered your supper—what can be more delightful than to find lying in the window-seat, left there time out of mind by the carelessness of some former guest —two or three numbers of the old Town and Country Magazine, with its amusing *tête-à-tête* pictures—"The Royal Lover and Lady G ———;" "The Melting Platonic and the Old Beau",—and such-like antiquated scandal? Would you exchange it—at that time, and in that place—for a better book?"

(Elia, Detached Thoughts on Books).

These, it may be said, are toys, pretty enough, but not indispensable: the real stuff of life, as pictured in the greatest literature, is the same everywhere. I do not know where the real stuff of life is presented more persuasively than in the Elegy; still, it may be freely admitted that the soliloquies of Hamlet, or the great speech of Prospero, are to a great extent independent of their setting, as Gray's meditation is not. Yet no man of sense will underrate the differences of view which time and place, religion and custom, constantly produce. It is a truism that in so fundamental a matter as the relations between men and women the differences go deep. Apart from the difficulty of language and obscure allusion, it is not always easy for a modern Englishman to read even Shakespeare, the most wide-minded of men. The conquering young persons in "The Merchant of Venice" are rather too unfeeling towards the beaten Jew (unless you take the view that Shakespeare meant to show them up). The underlying idea of "The Taming of the Shrew" is becoming almost as obsolete as the

hero's methods. Most startling of all perhaps is the preposterous bet that Posthumus makes with a stranger regarding his wife's honour—an action which to modern ideas stamps him as a person to avoid with care. His subsequent attempt to have Imogen murdered is a trifle by comparison, easily understood and readily condoned. However obvious it may be that Shakespeare took the outlines of his stories ready-made, it is rather too much of a strain on a modern reader's sympathetic faculty to have this hero held up as a model of excellence. And if we meet with occasional difficulties of this sort in Shakespeare, we meet them far more frequently in Milton, who perpetually "tips you," as Edward FitzGerald said, "out of Paradise, or even Hell, into the School-room, worse than either". And most of this is due to the lapse of eight or nine brief generations.

I shall not attempt to discuss further the obstacles which Indians students must meet on every page from their ignorance of English life; except to touch briefly on one point, which I have already indicated, and which crops up at every turn, the relations, I mean, between men and women. It may be, as is sometimes maintained, that this topic occupies an unduly large place in English literature—a larger place than in actual life. I express no opinion on that question. The fact at any rate is that it is extremely prominent: and (though I speak with great diffidence on the point), I imagine that the picture drawn must be puzzling, if not unintelligible, to Indian boys. English boys, I dare say, may not find the subject particularly interesting; but at any rate they approach it with a more or less instinctive knowledge of the conventions—the rules of the game. "As You Like It" is a play that I have once or twice had to read with college students. Most people who are able to read it with any understanding would probably agree that Rosalind is one of the most attractive young women it would be possible to meet. It would be interesting (though I dare say irritating) to have a candid opinion about her from some of the third and fourth year students who "sketch her character" in examination-papers. Of course the whole affair is merely a pretty fancy of the "golden world", and the actual episodes would be as impossible in France or England as anywhere else. But I think it probable that even when an Indian student has been told this, he must still find that the facts impose too heavy a burden on the play of his imagination; especially as he will not be helped by any perception of the lightness and gaiety with which the dialogue dances along. The facts, as elicited by the damning evidence of dictionary and grammar, are that Rosalind puts on doublet and hose, goes off with her cousin into a forest, and there amuses herself in a singularly unrestrained manner with a youth whom she has only seen once in her life, engaged in a

public wrestling match. All this may seem very odd behaviour to an English boy: but with the help of some nimbleness of fancy he should be easily able (unless he is a great stickler for propriety) to follow Rosalind's movements with sympathy and delight.

If I am right in my contentions that you cannot teach a language through the medium of its literature: that you cannot appreciate its literature without a thorough knowledge of the language: and that their ignorance of English life offers to Indian boys at every turn further obstacles to a right understanding of books which reflect that life—is there any reason for continuiug our present methods? I have already suggested that our method of teaching English is probably copied from the method, traditional in English schools and univversities, of teaching Latin and Greek. For some hundreds of years these languages, or literatures rather, which are slowly yielding their place to other kinds of learning, have been regarded in Europe as the basis of all liberal education. But they are dead languages: nothing remains of them but their literature. No method is open to the teachers of these languages except to teach them though so much of the literature as survives. And as the teachers' object (at any rate since Latin ceased to be the medium of communication between learned men of different countries) has been merely to enable their pupils to read the literature, the method is not so very bad. Our position is entirely different.

But, it will be argued, there must be counterbalancing advantages. English literature is, by universal admission, a great literature: and it contains in Matthew Arnold's phrase, 'the best that has been thought and said' (science apart) by English people. Therefore a boy who is brought up in English literature, though he may fail to learn the English language, will at any rate learn something of great value.

For my part, I do not believe he learns anything of any value at all. It is necessary to clear one's mind of the idea that a good book is good and equally good—for every one, and to try and analyse the process by which reading affects us. Art is the expression of feelings and ideas through various media—painting, music or whatever it may be. Literary art is the expression of feelings and ideas through the medium of words. To understand any work of art two things are requisite: the technical knowledge and perception which will enable you to appreciate the craftsmanship; and a nature so in sympathy with the artist's as to respond to his meaning.

If the second is lacking, the first is wasted; if the first is lacking, the second gets no chance. But if both are present in some degree, the fit reader will catch something of the excitement and the thrill with which the artist created his work.

It must be obvious that the benefit we derive from an artist is quite different in kind from that which we derive from a scientist. A scientist gives you facts and arguments, and the presentment is of little importance. An artist does not give you facts, nor proceeds by the way of argument. (No doubt there is a borderland common to both, but that is the broad distinction. The artist's business is to suggest ideas and stimulate feeling, and the present ment is vital to his success. The familiar story of the scientific person who, after reading Homer, remarked that he "did not see that it proved any thing" merely puts in a nutshell the difference between the object with which we read let us say, the Origin of Species and the object with which we read Hamlet. In Hamlet the facts—which are no facts—are completely unimportant in themselves. They provide the frame and canvas, as the dictionary provides the paint for that picture of life which Shakespeare gives us.

How far then are the very young men in our Colleges capable of appreciating the pictures, painted by great masters, which we set before them? I have explained at considerable length my reasons for thinking that their lack of familiarity with the English language, not to mention English life, offers an insuperable obstacle to any true appreciation of English literature. But if that obstacle were removed, their remains another almost as great; the immaturity of their own minds.

The best abused poem in English, I should fancy, is 'We are Seven'. It may be freely admitted that 'We are Seven' is not one of Wordsworth's triumphs. Yet it has a certain impressiveness. It owes its unpopularity, I believe, to the fact that, in spite of the plain warning conveyed in the very first verse, it is constantly taught to children; who, being thus compelled to concentrate their minds on a subject totally unfit for them to think about, imbibe a lasting distaste for a poem that might have interested them at a maturer age.

It was a blunt dictum of Tennyson's, based on his own experience, that "Boys can't read Shakespeare." Yet Tennyson was English, and a very exceptional boy. I believe that most men—at any rate ordinary men, who form the great majority—if they will make an honest attempt at recollection will agree. Personally (if I may mention my own experience) I can only remember having had a very slight and inadequate appreciation of some five or six plays.

The point I want to make is that literature is an intensely individual affair, both in the writing and in the reading; and boys and very young men are no more suitable as readers of great works than they would be as companions for the authors of those works. Why is it necessary for boys to read famous books? Men of genius—and they, one would think, must be the best readers—treat books as things to be enjoyed, not as

things with which an educated person ought to be acquainted. How significant is Keats's Sonnet written before re-reading "King Lear."

Once again the fierce dispute
Betwixt Hell torment and impassion'd clay
Must I burn through.

That is the right way to read. Of course such intensity of appreciation is only possible to a reader as sensitive as Keats: that is, it is hardly possible to anyone. But unless that excitement is present in some degree, unless the mind vibrates in some measure to the thrill which moved the writer, what use is there in reading a work like King Lear? None, I believe.

Aubrey de Vere tells an interesting story of two conversations which he had on the same day with Tennyson and Wordsworth successively, regarding the poetry of Burns. Tennyson praised Burns vehemently, adding "Of course I mean his songs. You forgive for their sake those stupid things, his serious pieces." Wordsworth's praise of Burns was even more enthusiastic; but he was careful to explain, "Of course I refer to his serious poems. Those foolish little amatory songs of his one has to forget". It does not seem to me to matter in the least (assuming that it is really possible to say) whether Tennyson was right, or Wordsworth. The point is that each of them found something that strongly appealed to him in Burns; and they found that something in different parts of him.

It is always striking and refreshing in Letters and Memoirs to see how great writers speak of each other: clearly following their own predilections; under no constraint to preserve a reputation for good taste by admiring the right thing judging frankly and easily, as men judge their peers. Imagine Wordsworth and Tennyson reading Burns as a duty, and learning up what they ought to say about him!

There is a peculiar tendency however, which we obey, to treat literature as something which it is important to know about. When a scientist tells you something of the facts of Astronomy, Geology, Biology, he gives you information that corrects the imperfect evidence of your senses, and helps you to form a truer estimate than you could form unaided of the meaning of Space and Time, and that long adventure which is the history of Man. The literary artist—poet, dramatist, novelist, essayist—works by another method. He does not tell you facts. He shows you the world as it appears to him—a meaningless picture to those whose view-point is different, or whose natures are immature: for the immature mind can appreciate the discoveries of great minds in the realm of fact better than the immature nature can appreciate the experiences of great natures in the realm of feeling. You may show a boy experiments with a prism, and he will understand; but you cannot convey the beauty of colour to a person who has no sense of it.

The value of a work of art to each reader is subjective, whereas we tend to treat the works of great writers as a collection of facts of intrinsic importance like the discovery of steam power, or the conversion of Constantine, or the experiments of Mendel. It will perhaps be said that the work of a man like Shakespeare is a great fact, as important as any I have mentioned. I know that such statements are sometimes made in what seems to me a very loose and random manner: but I do not know how they can be supported. Shakespeare may have been, as some say, the most remarkable man that ever lived, that is the man whose powers most transcend the normal: but his importance is for those who can read him; whereas the act of a ruler, or the discovery of a scientist, affects millions who know nothing of the motives which prompted the act, or the train of thought which led to the discovery.

We apparently proceed however on the notion that the reading of a good book must be a good thing: and developing the idea, we seem to think also that it is good for students to know the opinions that are currently held by critics of repute about these great writers; without considering whether their works convey anything to the students in question, or even whether they have read them at all. At the present time I am reading Sir Walter Raleigh's book on Milton with a Fourth Year class. I have no doubt that the case of these youths is similar to that of the great majority of the candidates who next year will enter for the B. A. degree. (I have referred above to their utter inability to follow the movement of Milton's verse). They have read L' Allegro, Il Penserso, and the first two books of Paradise Lost—these having been prescribed for them on some previous occasion. On the strength of this smattering they are set to read a highly allusive criticism of Milton. If it is said that there is nothing to prevent me from making them read enough of Milton to give them some understanding of the book, I answer that there is everything to prevent me; that the knowledge these boys possess of English (not to mention English history) is so limited that really to equip them for the understanding of Sir Walter Raleigh's book would require a far greater amount of time than they have at their disposal. Besides, as will have been shown by this paper, I hold that it would serve no really useful purpose to make them read Milton. However the case of these Fourth Year boys is open to very little criticism compared with that of candidates for the M. A. degree. The first of eight papers set to these youngmen is one on the General History of English Literature. Most of the English they have read is "literature" of one sort or another; but it amounts to remarkably little all told, and to confront them with such a paper is simply forcing them

to cram criticism of books which they have never read, and never intend to read, from some " History of Literature."

Histories of Literature are curious productions. They are, I suppose, the work of men of extraordinary industry and voracious appetite who, having read "everything one ever heard of, and almost everything one never heard of" (as somebody says), proceed to sit in judgment and classify famous names, much as an examiner allots marks. "It is wonderful", wrote Edward Fitz Gerald, with bland astonishment, of Macaulay, "how he, Hallam and Mackintosh could roar and bawl at one another over such questions as Which is the Greatest Poet? Which is the greatest Work of that Greatest Poet? etc. like boys at some Debating Society." The attitude seems rather different from that of Keats in the Sonnet I quoted. I cannot fancy Keats writing a History of Literature if he had lived to be as old as Methuselah. Still it takes all sorts to make a world. Macaulay at any rate was a genuine book-lover, with a portentous range of reading, an abnormal memory, and a passion for argument: so perhaps his disputations were not so surprising after all. The historians of literature, I imagine, have much the same qualities in their degree; and if they add to them a critical gift of any value, they may produce works of great interest. But that interest is strictly limited: it affects only those readers who have read, are reading, or at least intend to read the books with which the critics deal. To read the opinions of other men about books which you have *not* read, and do *not* intend to read—is not that one of the most elaborate methods of wasting time that ever was invented?

It is worse than waste of time. It develops a tendency latent in most men and certainly not absent in Indian students—the tendency to talk nonsense about what you have not begun to understand. Take the subject of prosody for instance: I have given some reasons for my opinion that the average student has no ear for English rhythm or that his ear is utterly undeveloped. But will that prevent him from expressing views on the subject? Naturally it will not, since we invite him to express them, and mark him for doing so: and accordingly he will reproduce phrases, to him quite unmeaning, about the 18th century being "under the bondage of the heroic couplet," and so forth: and all this with 'not a trace upon his face of diffidence or shyness.' A reader who has sufficient ear for rhythm to appreciate the incomparable force and point with which the heroic couplet arms a skilful writer, and who also perceives its limitations, may be allowed, without offence, to utter such criticism of the great metre of Dryden and Pope and Crabbe: it is objectionable in a person who cannot by ear tell the difference between their metre and Spenser's. Dismal overworked phrases

about Classical poetry, the Romantic revival, the worship of 'nature,' occur again and again in text books, in notes, and of course in examination papers. Surely these husks of criticism at least from which the life has departed, might be put in the dustbin. Let me echo the dry observations of Leslie Stephen on all this: The whole matter is, perhaps, of less importance than is sometimes attached to it......I never see the word [nature] without instinctively putting myself on my guard against some bit of slipshod criticism or sham philosophy. I heartily wish that the word could be turned out of the language." 'Pope was not a poet' 'Macaulay wrote party pamphlets' 'Tennyson lacked ideas'. We are all familiar with these sweeping criticisms—the stock-in-trade of every foolish person who writes a text-book. Exaggeration produces reaction: and if Pope, Macaulay and Tennyson were overrated in their own lifetimes, I venture to think they are underrated now. But even if such phrases held a far larger proportion of truth than they do, I think there would still be strong objection to encouraging students to learn them by heart and reproduce them without understanding. A reader who equals or excels the author he is criticizing, in feeling, in knowledge, or in originality of mind may fairly give vent to such opinions. Coleridge had a right to withhold from Pope the name of poet. His opinion was not necessarily true; and he afterwards apologized for "the presumption of youth" but at any rate his view was entitled to consideration and respect. And of course lesser men may fairly adopt such opinions (with due modesty and caution) provided they have sufficient knowledge of the author in question to understand their point. But the glib profanity which utters abuse without knowledge is detestable. Yet we seem to encourage, and even deliberately teach it.

And yet it is hardly more irritating than uninstructed eulogy. When the author of an ill-spelt, ungrammatical answer-paper informs us that Spenser's love of beauty is so delightful and his language is so charming that when we turn over the pages of the Faerie Queene we are careless of the flight of time (every examiner knows the sort of stuff), are we not as certain as if the thing were capable of mathematical proof that the writer is talking utter nonsense? That his words convey nothing of what is in his mind—absolutely nothing whatever?

We make, as I think, a great mistake in choosing books because they are great and famous. But it is noteworthy that, having chosen them, we almost entirely ignore the great qualities that have given them fame. We prescribe them because they are "literature." But in the classroom and the examination-hall we treat them as meterial for questions. (At least I think that is a fair inference from the character of the

papers set). Suppose that a couple of Shakespeare's plays, let us say, Othello and Richard II have been set for an examination A candidate will be expected to have a certain rather scrappy knowledge of the facts of Shakespeare's life, and the times he lived in (though considering his ignorance of English life and history, it is doubtful how far those facts convey any ideas to his mind). He will be expected to know the sources from which Shakespeare took the plots of the plays, and any modifications which he may have thought fit to introduce. In the case of the history-play he will be required to know something about the historical characters and above all he will be expected to be capable of explaining obscure allusions, and clearing up difficult passages.

It seems to me that most questions of this sort are quite unimportant, and have no interest whatever except for those readers whom their appreciation of Shakespeare's great qualities may have led to take a keen interest in all the details of his life and writings. (Again therefore we invert the natural process).

If you have a great admiration and affection for a man, it may interest you to know that he comes from Stoke Poges, and was christened Albert after the late Prince Consort. Otherwise these details will leave you cold. It is precisely the same with details about Shakespeare. What does it matter (unless you are interested in him) whether he was born at Stratford or at Stow? If his writings have so excited you that you want to form a mental picture of him, the tales of his youthful indiscretions and the law-suits of his later years will seem to you interesting and significant; not otherwise. It does not matter at all, unless you have come to care about that sort of thing, where the plot of Othello came from. The plot, analysed in half a dozen lines has as much, or as little, interest as any other plot: none at all, that is to say. What does matter is that the reader should not be deaf to the voice of Desdemona's bewildered innocence:

'Tis meet I should be us'd so, very meet
* * * *
It is my wretched fortune,
* * * *
O Good Iago,
What shall I do to win my lord again?
Good friend, go to him; for by this light of heaven
I know not how I lost him.
* * * *
Dost thou in conscience think—tell me, Emilia-
That there be women do abuse their husbands
In such gross kind?

Nor deaf to Othello's frenzy of remorse:—

O ill-star'd wench,
Pale as thy smock! When we shall meet at compt,
This look of thine will hurl my soul from heaven,

That friends will snatch at it.

And in Richard II, though I quite admit that poetry should be read carefully, still it really matters extremely little whether you can explain, for instance, the passage about the perspectives, (II, 2, 15), or such an odd sentence as

Grief boundeth where it falls,
Not with the empty hollowness, but weight (I. 2. 58).

A reader who has appreciated the many beautiful and interesting passages in this remarkable play will be reluctant to leave such puzzles unsolved: a reader who really cares about the works of the Elizabethans will note with a certain pleasure such examples of their curious and characteristic elaboration of an idea. But you will not make a boy keen on the Elizabethan drama by bothering him with enigmas.

I am not attacking examiners for asking questions of this sort. I ask them myself: though personally, as I need hardly explain, I regard the spelling, grammar and style of the answers as much more important than their accuracy; and I suggest below what I think is a better and simpler type of question paper. I imagine that, the conditions being what they are, examiners ask the kind of question which experience has shown to serve some purpose from the examiner's special point of view; questions, the prospect of which will at least demand some diligence in the preparation; and the answers to which will enable them to classify the candidates. If the classification of candidates is to be regarded as an end in itself, well and good. But it should be realized that questions of this sort, are no test of a reader's appreciation of what he has read, and reading of this sort serves no purpose but that of the examiners.

I have endeavoured to explain why I think that you cannot teach the English language by the methods that we adopt: that to use English literature for the purpose is not useless only, but positively harmful: that you cannot appreciate literature without a thorough knowledge of the language: that, owing to their ignorance of English life, English literature presents further special difficulties to Indian boys: that in any case boys cannot appreciate great literature because they are too immature: that the reading of literature without appreciation is absolutely pointless: and that our examination papers reduce the reading of the literature prescribed to mere exercises of memory.

It will naturally be expected that, after so much criticism, I should suggest alternative methods. But indeed my suggestions are very simple, and result naturally from the principle I laid down in the earlier part of this paper: that we should approximate as closely as possible to the process by which a child learns its mother-tongue. I think (to recapitulate) the features of that

process are (1) slow and careful learning of the right pronunciation of the various sounds, (2) constant hearing and repetition of words, (3) constant hearing and repetition of phrases, and the formation of new phrases by analogy, (4) simplicity of words and phrases which should be only those the learner requires for his growing needs, (5) reading as a superstructure based on familiarity with colloquial speech. The difference of conditions will naturally introduce some necessary modifications of the process. I have already confessed myself pessimistic about the pronunciation. The distinction between the constant hearing and repetition, which form the basis of the natural process, and the reading, which forms the superstructure, will resolve itself into a distinction between the reading of large masses of very simple colloquial stuff * and the later reading of real books. (In each case 'reading' must imply also constant writing by way of imitation and practice). If I could have my way, all books that deserve the name of literature, with perhaps a single exception, would be absolutely barred until a stage at which the pupil had acquired a real grasp of modern English. The one exception is the Bible. This is the one body of great literature with which English children become familiar at an early age: and its phraseology has sunk into the very bones of the language. But I suppose it is unreasonable to expect that, in a land of rival religions, a neutral Government should prescribe a book which is regarded as the standard of one particular religion.

By a real grasp of modern English I mean the power to read, for example, a column of an English newspaper as easily as Bengali, and to write, it fluently and correctly. Experience would soon show how long the average pupil would take to reach this stage. Grammar would be abolished. The use of the dictionary would be reduced to a bare minimum.

In the earlier part of his instruction the pupil would be provided with large masses of very easy reading. Only simple, everyday words would occur in these books, and they would occur over and over again. Every day the pupil would be required, in speech if possible, or in writing, to practise by repetition, imitation, translation, the use of the words and phrases he had read. Gradually it would be possible to put into his hands real books that had not been written for purposes of education. There would be no attempt to teach him literature" (Literature after all is a perfectly arbitrary term.) But there exist large masses of books which, though they are not in the least likely to be immortal, are quite as correct as

* Of course conversations would be better but I doubt whether the masters with their large classes would be able to control conversation or have themselves at present an adequate knowledge of colloquial English.

everyday conversation and therefore quite a good enough substitute for conversation as a means for teaching English to Bengali boys. Throughout, the greatest care would have to be taken not to force the pace as regards the subject-matter any more than as regards the style: not to give a boy this or that book because it ought to do him good either from a moral or an aesthetic point of view. This unaccountable craze for improvement is death to the teaching of a language. It would have to be taken as a fundamental principle that interest and enjoyment are (in this branch of teaching more even than in others) incomparably the best schoolmasters; while a sense of duty and the fear of examinations are the merest dingy ushers in comparison.

I should myself have thought it indisputable that Sherlock Holmes would teach a boy more English in a week than 'Self-help' by Samuel Smiles (that great and good man) would teach him in a year: but I have been so often assured by Indian boys that they like 'Self-help' that I begin to think it must be true. That however is a mere matter of taste. Whatever they like, let them have that, provided the English is tolerably correct, and not pedantic.

I shall no doubt be told that the writing of hundreds of Readers instead of five or six would be a considerable task. Of course it would. But what about it? Are all the talent and industry which year by year produce such swarms of annotated text-books incompetent to bring forth a few hundred very easy pamphlets in which the same words are to occur again and again?

And if the stock of books were to run short, newspapers would furnish for all but those in the earliest stage a supply of reading which to boys who are growing up should prove interesting enough.

Examinations would be greatly simplified. Their object would be merely to test the candidate's ability to read and write English. They would consist of an essay, and of translations from English into Bengali and from Bengali into English. Such examinations would, I believe even under our present system, be an infinitely better test of the candidates' understanding of the books they have read than the kind of papers that are actually set. It may be impossible to give a perfect translation, of poetry at any rate, perhaps of any but the most commonplace writing, in another language: but there is no better proof of appreciation than an intelligent attempt at such a rendering. I may add, there is no better way of opening a reader's eyes to the difficulties, the beauties, the full meaning, of a passage than to make him translate it.

I hear my critics asking, with varying degrees of indignation, whether to banish literature from the course of the Calcutta University would be consonant with the

dignity of that institution. I am not greatly concerned for its dignity, which I think may be too dearly bought. Or rather let me say that I think its true dignity would be vastly increased if its thousands of graduates and undergraduates possessed a sounder knowledge of the language over which they have spent so many years of their lives. It has sometimes occurred to me that the selection of famous works which figure as text-books for examinations may be due to the impressive appearance they make when printed in the curriculum. (Vide appendices).* But I do not think "literature" need be completely banished, so long as it was clearly recognized that our first object must be to impart a knowledge of the English language as spoken and written at the present day. I think it likely that more reasonable methods would give boys quite a good command of English by the time they had matriculated. It does not follow that they would then be fit to read Shakespeare—because questions of language apart, he would probably not interest such very young men: but selections from the works of more modern authors, chiefly in prose, might be given them. And there can be little doubt that students of more than average merit (who alone, I should hope, would be allowed to go in for Honours and for the M. A. degree) would be fit to read perhaps the sort of books that are now set for the intermediate examination; though some of these are decidedly difficult.

There are of course plenty of Indians who, trained under the system I have criticized, nevertheless speak and write English exceedingly well. But these are men with an exceptional talent for languages, and often, moreover men who, since the close of their college career, have had daily opportunities, at the Bar and elsewhere, of hearing English spoken by those to whom it is familiar. If this paper finds any readers, it is largely among this class that it will find them; and that is in a manner unfortunate. It needs a distinct effort for any man to admit, even in his own mind, that a system which has brought him to the top of the tree can be radically wrong. Such men should however reflect firstly that the University regulates the instruction not merely of a few exceptional students but of thousands of medicore ones: and secondly that almost any system, good or bad, will bring the really superior men to the front; but we have more to aim at than the mere classification of candidates.

Whatever faults there may be in my argument, I can hardly believe that any one who is brought into close contact with the working of the present system can regard it as really satisfactory: and I venture therefore to ask what is the precise object which we set

* The appendices are unavoidably held over for next issue.

before ourselves under that system : and whether it really springs, from a reasoned attempt to discover the best way of teaching whatever we are trying to teach; or whether it is an ill-considered and degenerate copy of the system traditional in England for the teaching of two dead languages.

J. R. BARROW.

## SIKH RELICS IN EASTERN BENGAL.

Bad as is the outlook at Banskhali it is worse at Chittagong. I drove one day with a guide and was led to a Bairagi Thakurdwan ; then another mile and we reached a place which hardly bad the look of a temple. Entering through a breach in the enclosure wall and passing a foul-smelling well and a dirty veranda I stood before the Sanctuary. A peep through the bars of the doorframe disclosed a regular army of thakurs on a pretentious Singhasan. Once bitten, twice shy. I thought I had been misled again. The door was locked and there was no body to attend to the visitors. I was about to leave, when a Bengali gentleman walked over from his house across the road and assured me that that was the place I was looking for. The Mahant is a minor and a Brahmin has been appointed to look after the temple and these thakurs have been placed there by him. We have thus an illustration of the manner in which Buddhism disappeared from the land and its fanes and holy of holies became appropriated to the successful rival creed. There are from forty to fifty Sikhs at Chittagong in the A. B. Railway Workshops, but they live far off. They used to visit the temple at one time and took interest, a visible sign of which is the neat wooden shelf for the Granth Sahib, attached to the wall. The key of the shelf remains with them at their quarters at Pahartali. I had to return disappointed and to satisfy my curiosity on the occasion of a subsequent visit to Chittagong, when I could examine the book and make my notes at leisure.

Sangats also existed at one time or other at Comilla, Agartola, Karimganj, Moulvibazar, Brahmanbaria and perhaps at Barisal and Noakhali, But these must have come into existenee much later than those mentioned above. The only trace that we find now about them is the tradition and a few families scattered about here and there in these parts who still possess manuscript copies, (some times more than one in a family), of the Sikh Sacred Book. Mahant Chanchaldas told me that he saw twelve copies with one family alone at Comilla and that one of the copies was

illuminated. A family in Dacca, not long ago had a large number of them, as well as some other books. The family has now shifted to Barisal. A "Lalababu" near Brahmanabaria has a copy, which he believes to be three hundred years old. I have not been able to secure or see any of these copies in private possession.

But I have examined all the manuscripts in temples and compared them with each other and with printed copies. I have obtained some important results which upset some of our settled conclusions. I find for example that these manuscripts range themselves in three classes, and each group follows a different recension, and that a number of apocrypha appears in each one of them. It is commonly believed among the Sikhs that only two copies of the Granth Sahib differing slightly from each other existed till the third copy was dictated by Guru Gobind Singh from memory alone, and that it was he who for the first time added the hymns of his father Guru Tegh Bahadur to the book somewhere about Sambat 1764-65. But here in the Dacca Sangat we actually possess a copy dated 32 years earlier, which was completed in the very year that Guru Tegh Bahadur was beheaded at Delhi. This copy includes the hymns of Guru Tegh Bahadur correctly arranged under Rags as in printed copies, and appears to be a copy in *toto* of some early archetype. This discovery gains in importance from the fact that though the two earlier copies are extant, yet they are not available for purposes of comparison or detailed examination. It is claimed, in a colophon, for a particular portion of it (*i. e.* the Japji) that it is the eighth copy in succession from the one in the handwriting of the Fourth Guru Ramdass; and it is certainly copied with strict regard to accuracy, as I have found on a minute comparison of this portion, letter for letter, with the best printed-copy. A detailed account of these results will be out of place in this review, as it will not be of much interest to its readers.

Among the memoranda noted in these manuscripts there are some items of considerable importance and interest. One of them is an itinerary of a pilgrim to the Sikh temples in Southern India and Ceylon. Whoever wrote it, it is clear that he existed long before Sambat 1732, and had actually travelled as far as Ceylon. There may be exaggerations in his account of the victuals consumed at the daily Yagya at the principal temple in Ceylon, but it can not be denied that his account has every appearance of truth. He gives a circumstantial and correct account of the route. Evidently on his way out he took boat at Negapettam on the Coromandel Coast and returned through Malayalam. He says he met Mayadaman, the grandson of Shivanabhi and found stray colonies of Bhatra Sikhs in Malayalam. It may appear at first rather difficult

to credit this story of Shivanabhi, in fact it has been considered to be entirely fictitious by Dr. Trumpp and others, but there is nothing very strange about it. We are so far removed from those days that we do not know much about the movements of population at the time and therefore fail to take them into account. We are beginning however to see, it may be dimly at present, that the trading classes of the Punjab showed a great spirit of enterprise in ancient days. They had as if by mutual consent come to an understanding about their markets even. While the Aroras as a rule went north to Kabul, Kandahar, Balakh, Bukhara and Russia, the Khatris monopolised the markets of India to the East and the South. These movements perhaps were arrested by the political rise of the Sikhs in the Punjab. I have stated above how large colonies of Khatri traders had established themselves at Agra, Prayag, Benares and Patna, and later on right away as far as Dacca, Chittagong and Sondip. Practically the whole petty trade of Assam and of many districts in Eastern Bengal is in the hands of Marwaris now, whom you meet in most out of the way places. I have found the same all over Central India and have come across Khatri families in small villages where I least expected to find them. Though now as a rule in straitened circumstances, some of them undoubtedly have seen better days. One thing which has greatly struck me about them is the great reverence they have for the Gurus and which they retain till now though cut off from the old connections for ages. Evidently these emigrants from their native home considered Sikhism as their national faith and the fact that the Gurus were Khatris appealed strongly to their racial pride, which grew stronger the further away they were from home. In the Punjab itself, jealousies were to a certain extent inseparable from the ordinary run of life, but distance had a chastening effect. So that when Guru Tegh Bahadur was persecuted by the enmity and jealousy of his Sodhi brethren, and when even the *mutsaddies* of the Sikh Temple at Amritsar shut the door of the Temple on his face, then it was these trading people who had spread far and wide who welcomed him and supported him. Even our own Sakhis bear witness to affluent Punjabi emigrants trading beyond the seas. Makhanshah, who decided the question of the succession to the Gaddi in favour of Guru Tegh Bahadur, was one of them. What wonder then that some Punjabi traders had travelled south and settled in Singhadip, not more than a day's journey from Rameshwar and gradually acquired influence and power. Maharajah Sir Kishen Pershad and the Maha[illegible] of Burdwan come of families of [illegible] Khatris. Shivnabhi might hav[illegible] a big landlord. So the itine[illegible] the unknown pilgrim to Southe[illegible] may be found useful in some fu[illegible] search in those parts.

But of much greater importance is the item which contains the dates of deaths of the first nine Gurus and that of Baba, Gurditta. In the Ramna Sangat Copyr two important colophons and some othea details are added to the dates. The data furnish us with a very early corroboration of many of the dates and help ns to correct others. Details about Guru Hargobind's death are given by an eyewitness, and copied by the Eighth Guru. In this account there is no suggestion of the kind which Mr. Macauliffe says he has found in some books, He gives the following footnote on page 235 of IV. of his Work :—"Hinduised Sikh chroniclers have invented a story that the Guru caused himself to be shut up in Patalpuri and ordered Guru Harrai to lock the door and not open it until the 7th day. This accorcing to Abul Fazzal was deemed by the Hindus the most meritorious form of death and so ignorant and superstitious persons have attributed to the Guru this form of suicide. Had it occurred it would certainly have been recorded by Muhsan Fani, among the other details given by him." Dr. Trumpp gives 1638 A. D. as the date of death of Guru Hargobind, but adds the following footnote ; "There is a great diversity of opinion about the death of Hargobind's death. The year given is that commonly recorded by the Sikhs. In the Dabistan, the year 1645 is mentioned, corresponding to the Hejri 1055. Muhsan Fani says (II. 281) that he saw Hargobind in the year of the Hejri 1053 (=1643 A. D.) at Kiratpur. We do not know how to reconcile these two dates which differ by seven years. Perhaps there is a mistake in the Arabic cyphers of the Dabistan."

But I have seen the date given in the Dahistan-i-maganib not in figures, but in words. Trump says in another place : "Some say that Gurditta had died already before his father, but this is by no means certain. He died at Kiratpur where a splendid tomb was built to him." Our records solve all these difficulties and show how the mistake about the date of Guru Hargobind's death originated in the entry about Baba Gurditta without his name. So Muhsan-i-Fani is right and the common Sikh books wrong. Our data also correct the date of Guru Harirai's death.

A third item of interest is a decalogue or Ten Commandments ascribed to the Fifth Guru. They naturally come very near those of Moses. One manuscript makes a slight addition in one of them, showing some extraneous influence. Another of these ten commandments indicates that the Sikhs had been boycotted and were finding it difficult to marry.

GUR BAKSH SINGH,

## THE ARCTIC HOME IN THE RIG-VEDA: AN UNTENABLE POSITION.

ii

The Five Tribes lived to the east of the Bipas and the Satudri ; and this explains why Sudas is described as having marched eastward "প্রাচা (Pracha)." In the foregoing Rik, we are, moreover, told that Sudas had several "non-Aryan Kings" "দাসা" (Dasa) as well as "Aryan Kings" "আর্যানি" ( Aryani ), arrayed against him in this great war. Again, the hymns of Bharadwaja, the chief priest of the Five Tribes, also abound in references to an intertribal war. The following passages will speak for themselves :—

1 . "যঃ নঃ স্বঃ নিষ্ট্যঃ জিঘাংসতি।
দেবাঃ তং সর্বে ধূর্বন্তু ॥" VI. 75, 19.

[ Yah nah svah nishtyah jighamsati ।
devah tam sarve dhurvantu ॥ ]

"May all gods destroy him who is our kith and kin, and yet seeks to kill us from a distance".

2. "জনং বজ্রিণ্ মহি মন্যমানম্ এভ্যঃ নৃভ্যঃ রন্ধয় যেষু অস্মি।" VI. 19, 12.

[ Janam Vajrin mahi manyamanam evyah nrivyah randhaya yeshu asmi । ]

"O Wielder of thunder, suppress him who regards himself superior to these people among whom I live."

3. "ইন্দ্র সর্গে অর্বতঃ চোদয়াসে মহাধনে।
অসমনে অধ্বনি বৃজিনে পথি শ্যেনান্ ইব
শ্রবস্যতঃ ॥" VI. 46, 1.

[ Indra sarge arvatah, chodayase mahadhane । asamane adhvani vrijine pathi shyenam iva shravasyatah ॥ ]

"O Indra, thou sendest our horses over uneven and difficult paths, like hungry hawks flown along a crooked path across the sky to the great war already begun."

Now, it is evident from these references that there was a great intertribal war in which King Sudas sent an expedition against the Five Tribes, the people among whom Bharadwaja lived, from a distance and the Five Tribes met force with force, and caused a great havoc among the invaders. We are further told that, in this great war, there was a coalition of "ten" kings against Sudas, and that Shruta, Kavasha' Bridha, Druhya and Ayu were among them. The Rig-Veda further tells us that some of Sudas's adversaries, forming the coalition were "non-Aryans" "দাসা" (Dasa), and that these endeavoured to drown Sudas, with his entire force, by breaking open the banks of the Purushni. But the stratagem failed entirely, and Shruta, Kavasha, Bridha, Druhya were themselves drowned with their children in their efforts to drown Sudas with his hosts. Here are some Riks in point, which will be read with great interest:—

1. "দুরাধ্যঃ অদিতিং স্রেবয়ন্তঃ অচেতসঃ
বিজগৃভ্রে পরুষ্ণীম্ ।" VII. 18, 8.

[ Duradhyah Aditim srevayantah achetasah vijagribhre Purushnim । ]

"The wicked and mischieveous enemies broke the embankments of the Purushni by digging."

2. "ঈয়ুঃ অর্থং ন ন্যর্থম্ পরুষ্ণীম্ আশুঃ চ ন
ইৎ জগাম অভিপিত্বম্।
সুদাসে ইন্দ্রঃ সুতুকান্ অমিত্রান্ অরন্ধয়ৎ
মানুষে বধ্রিবাচঃ ॥" VII. 18, 9.

[ Iyuh artham na nyartham Parushnim ashuh cha na it jagama abhipitvam ı Sudase Indrah sutukan amitran arandhayat manushe vadhrivachah ॥ ]

"Indra made the Purushni flow along the proper channel and not otherwise; and the charger of Sudas reached its destination. And Indra subjugated the garrulous enemies with their children, for the human King Sudas"

Now, the very use of the word, "বধ্রিবাচঃ" (vadhrivachah) "garrulous", in the foregoing Rik, clearly shows that Shruta, Kavasha, Bridhā, Druhya and Ayu, concerned in the stratagem referred to above, were all non-Aryan Kings. Evidently therefore, the five Aryan kings of the Five Tribes were the remaining five members of the coalition.

But the Rig-Veda tells us that though the stratagem contrived by the non-Aryan members of the coalition failed, the expedition involved a severe strain on the resources of King Sudas, and that, for a time, Bharatas, his hosts, were surrounded by the enemies and were about to be completely crushed. Fortunately, however, Vasishta joined Sudas's forces with his followers at this juncture, and assumed the function of the High priest. And we are told that under Vasishta's ministration and guidance, Sudas's forces multiplied in number, and the combined forces of the enemies were completely crushed. The following Riks will speak for themselves:—

1. "আসন্ পরিচ্ছিন্নাঃ ভরতাঃ অর্ভকাসঃ।
অভবৎ চ পুরঃ এতা বসিষ্ঠঃ আৎ ইৎ
তৃৎসূনাং বিশঃ অপ্রথন্ত ॥" VII. 33. 6.

[ Asam parichhhinnah Bharatah arbhakasah ı abhavat cha purah yeta Vasisthah at it Tritsunam vishah aprathanta ॥ ]

"The Bharatas were few in number and surrounded by enemies. Whereupon Vasishta became the Priest and the forces of the Tristus multiplied in number."

2. "দাসরাজ্ঞে সুদাসং প্রাবৎ ইন্দ্রঃ ব্রহ্মণা বঃ
বসিষ্ঠাঃ।" VII. 33. 3.

[ Dasarajne Sudasam pravat Indrah Vramhana vah Vasisthah ı ]

"O Vasishtas, on account of your hymns, Indra saved Sudas in the war against the coalition of the ten kings."

1. "তৎ সিংহং চিৎ পেত্বেন জঘান ইন্দ্রঃ।
প্রযচ্ছৎ চ বিশ্বা-ভোজনা সুদাসে

(Tat-Sinhan chit petvena jaghana Indrah.
Prayachat cha vishva bhoyāman Sudase.

"Indra then (in that war) caused a lion to be killed by a jackal, and procured Sudas immense...riches (or food)."

And lastly, in III. 23, 4 we find two Bharatas, Devasmava and Devarata, invoking Agni to shine forth, with riches, among their own men, dwelling on the banks of the Drishadvati, the Apaya, and the Saraswati. And this clearly indicates that, after the conquest of

the Five Tribes, the Bharatas or a detachment of them settled on the fertile banks of the Saraswati and its tributatries. The passage referred to above runs as follows :—

"দৃষদ্বত্যাং মানুষে আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবৎ অগ্নে দিদীহি।"

(Drishadvatyain Manusha Apayaam Seraswatyam revat didihi).

'O Agni, shine forth, with riches among (our) men, dwelling on the Drishadvati, the Apaya and the Saraswati.'

But unfortunately as has already been said, a great confusion prevails among the Vedic scholars as to the real and ultimate object of the celebrated march of the Bharatas under Viswamitra across the Satudri and the Bipas referred to above, as well as about the identity and the positions of the various tribes involved in the great war against Sudas. Here are some extracts from Dr. Macdonell's account of the same :—

1. "The most important part, if not the whole, of the Indian Aryan is meant by the "five tribes", an expression of frequent occurrence in the Rig-Veda. It is not improbable that by this term were meant the five tribes enumerated together in two passages, the Purus, Turvashas, Yadus, Ayus and Druhyus".

2. "A more important name among the enemies of Sudas is that of the Bharatas. The Bharatas were defeated by Sudas and his Tristsus, who were aided by the invocation of Vasishtha, the successor and rival of Viswamitra".

3. "Five Tribes......are mentioned as allied with Sudas in the great battles."

4. "The Tritsus appear to have been settled somewhere to the east of the river Purushni, on the left bank of which Sudas may be supposed to have drawn up his force to resist the coalition of the ten kings attempting to cross the stream from the west."

Now, the foregoing extracts are full of palpable historical blunders. First of all, the Five Tribes were, as we have seen, the Aryans who lived on the banks of the Saraswati and its tributaries, and against whom the Aryan king Sudas sent his great expedition. It is therefore absurd to identify the Five Tribes with the entire body of the Indian Aryans. We have further seen that Shruta, Kavasha, Bridha, Druhya, and Ayu were, in their efforts to drown Sudas with his forces, themselves drowned (Ayu escaped the general fate) with their children and that many of them were subjugated. We have been clearly told in that connection that those concerned in this stratagem were "বধ্রিবাচঃ," (Vadhrivachah) 'garrulous.' In the Rig-Veda the word, "বধ্রিবাচঃ" (Vadhrivachah) 'garrulous,' has always been applied to the non-Aryans. And we have also been clearly told that some members of the coalition against Sudas were "দাসা" (Dasa), 'non-Aryans.' It is, therefore, quite clear that Shruta, Kavash, Bridha, Druhya, and Ayu concerned in the stratagem, were the non-

Aryan members of the coalition, who made common cause with the Five Tribes, in their efforts to crush Sudas' forces. It is, therefore, equally absurd to identify the Five Tribes with "the Purus, Turvashas, Yadus, Anus and Druhsus"; Dr. Macdonell's statement seems, therefore, entirely wrong.

Dr. Macdonell has committed another serious blunder in representing the Bharatas as "the enemies of Sudas." The Bharatas, on the country, originally formed, it appears, the bulk of Sudas' own force under Viswamitra. But they were, we are told, hard-pressed by the enemies and were about to be completely crushed; and that it was at this juncture that Vasishta joined Sudas' forces with the Tritsus, and that uuder Vasista's ministrations and guidance the tide of events turned and the coalition of the ten kings was completely crushed; Dr. Macdonell's statement is, therefore, entirely unsupported. On Vasistha's assumption of the function of the chief priest, the relations between Viswamitra, and Vasistha became, no doubt, considerably strained, but there was never any war between them, or anything of the sort. Dr. Macdonell is also guilty of an equally unpardonable confusion of thought in maintaining that the "Five Tribes......are mentioned as allied with Sudas in the great battle."

The extract No. 3 contains another serious blunder committed by Dr. Macdonell. Sudas' forces were, no doubt, drawn up on the left (eastern) bank of the Purushni. But when the expedition was about to march "প্রাচা" (Pracha) 'eastward', against the Five Tribes on the banks of the Saraswati and its tributaries, the five non-Aryan members of the coalition, referred to above, tried to drown Sudas, with his hosts, from behind, by breaking open the embankment of the Purushni. The Five Tribes, the Aryan members of the coalition, therefore, evidently lived far away from the Purushni to its east, and it was only the non-Aryan members of the coalition who tried to drown Sudas' forces from behind. It, accordingly, follows that the aforesaid non-Aryan Members of the coalition alone lived on the right (western) bank of the Purushni. It is, therefore, simply absurd to represent, as Dr. Macdonell has done, all the ten kings of the coalition as attempting to cross the stream from the west." The description evidently applies only to be five non-Aryan members of the coalition, but is totally inapplicable to the Five Tribes on the banks of the Saraswati and its tributaries against whom the expedition was chiefly directed. Dr. L. D. Barnett, in his Antiquities of India, has also after Dr. Macdonell and others, wrongly represented Druhyus, and Turvasas as some of the Aryan tribes. From what has been said above, it is clear that Dr. Macdonell's account of the war is full of gross historical blunders.

N. K. DUTT.

# ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৫ম খণ্ড। | ঢাকা—ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২২। | ১১শ, ১২শ সংখ্যা

## উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

১৯১৬।

### সভাপতির অভিভাষণ।

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা
বিনা স্বদেশের ভাষা—পূরে কি আশা।"

বঙ্গভাষা আজ আর উপেক্ষিত নহে, বাঙ্গালী বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা বরং অপেক্ষিত। যখন বাঙ্গালীর ছেলে, বঙ্গভূমির বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা, বা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকে লজ্জাজনক, কতকটা বা প্রত্যবায়জনক মনে করিতেন, সে দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে, সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে।

মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে কবিবর ডাক্তার রবীন্দ্র নাথ পর্য্যন্ত বহু যশস্বী বঙ্গসন্তান, বঙ্গবাণীর স্বর্ণমন্দির রচনায় সাহায্য করিয়াছেন, রাজা রামমোহন, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, অমর বঙ্কিমচন্দ্র, চিন্তাশীল অক্ষয় ঘোষ প্রভৃতি বহু প্রতিভাশালী সারস্বতগণ সেই মন্দির-গাত্র নানাবিধ শিল্পসৌন্দর্য্যে খচিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষা এখন বাঙ্গালীর একটা প্রকৃত স্পর্দ্ধার পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী ভারতের যে প্রাচীন মহা বংশের ভগ্নাংশ, সেই প্রাচীন আর্য্যজাতির ভাষা এবং সাহিত্য-ভাণ্ডার অনন্ত ও অমূল্য রত্ন-রাজিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙ্গালীকে নিজের জাতীয় সাহিত্য-গঠনে সম্পূর্ণরূপে পরের প্রত্যাশী হইতে হয় নাই। জগতের অপর অপর শিক্ষিত ও সমুন্নত জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় সাহিত্য লইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতায় বাঙ্গালী এখন বঞ্চিত নহে, একথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানে বঙ্গভাষার যতটা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহাই যে বর্দ্ধিষ্ণু বঙ্গবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত, একথা আমি কদাচ স্বীকার করিতে পারি না।

ক্ষেত্র কর্ষণ পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য হইলেও, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বপন ও উপযুক্ত সেচনাদির দ্বারা

অঙ্কুরিত বীজের রক্ষণ এবং পরিবর্দ্ধন, অধিকতর পরিশ্রমসাধ্য ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। অঙ্কুরিত শস্যের আপদ্ অনেক। সেই সমস্ত আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শস্যকে ফলোন্মুখ করিয়া তোলা বড়ই দক্ষতা-সাপেক্ষ। যে সময়ে জলসেচনের প্রয়োজন তখন জল, যখন আতপ নিবারণের প্রয়োজন তখন ছায়ার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমুদয়ের কোন একটির অভাবেই কর্ষিত ভূমি শস্যশালিনী হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও ঐ রীতির অনুসরণ বিধেয়। বহুকাল, বহুশত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের আরাধ্য বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি, সেই কর্ষিত ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধনের নিমিত্ত নানা আয়াস করিয়াছেন। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের এখন, সেই ভূমির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; সকলেই সুফলের আশায় সেই ভূমির দিকে লোলুপনয়নে চাহিতেছেন। কত উচ্চ আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি ও আদর সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; এমন সময়ে, দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, উৎকণ্ঠা পূর্ণ সময়ে ঐ কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইবে। সুতরাং তাহাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন, কত পূর্ব্বাপর বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা বঙ্গবাসিমাত্রেরই বিশেষ বিবেচ্য। এতদিনের চেষ্টায় যে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র পারপাটীরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যদ্ বংশধরগণের অবিবেচনার ফলে, তাহা যেন নষ্ট না হয়, তাহার উর্ব্বরতা যেন কতগুলি আবর্জ্জনাজনিত ক্ষারদাহে দগ্ধীভূত না হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।

"বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ" কেন বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি!

এতকাল অর্থাৎ প্রায় গত সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গভাষা যে ভাবে, যে গতিতে বঙ্গীয় জনসমাজে প্রসার লাভ করিতেছিল, এখন বঙ্গভাষার সেই গতির ক্ষিপ্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। পূর্ব্বে ছিল, যাঁহারা শিক্ষিত, কি প্রতীচ্য কি প্রাচ্য, উভয়বিধ শিক্ষার কোন একটিতে যাঁহারা সম্পন্ন, বঙ্গভাষার কতিপয় কমনীয় গ্রন্থ সেই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির অবসরবিনোদনের উপাদান মাত্র হইত। কার্য্যান্তরব্যাপৃত চিত্তকে কদাচিৎ প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গভাষার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। প্রকৃত-পক্ষে যাহাদের লইয়া বঙ্গদেশ, যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্তই বাদ পড়ে, সেই বঙ্গের আপামর সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার আদর কতটা ছিল? একপ্রকার ছিলই না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস কাশীদাস ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহিত্য-রথীর নাম বঙ্গের জন-সাধারণের মধ্যে সুপরিচিত? শিক্ষিত-জনসঙ্ঘের সংখ্যা সাত কোটি বঙ্গবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও অতিরঞ্জন হয় না। এই মুষ্টিমেয় সমাজে যে বঙ্গভাষা এত দিন আবদ্ধ ছিল, এখন সেই বঙ্গভাষা অতি ক্ষিপ্রগতিতে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে ভাষা যাহাতে সংযত-চরণে চলে, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, সেপক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের উদ্বোধন-কর্ত্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর সেই সঙ্গেই, আমাদের সুন্দরী মাতৃভাষা কি উপায়ে সুন্দরীতমা হইতে পারে, তাহাও ভাবিতে হইবে। কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা গল্পগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট্ সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বার্ত্তাশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি,—সর্ব্বপ্রকার রত্নের সমাবেশ আবশ্যক। সর্ব্ববিধ কলার বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিলসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা তাহাকে অসঙ্কোচে "জাতীয় সাহিত্য" বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান কালে, যখন, বঙ্গভাষার প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি অল্পবিস্তর ভাবে নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ ভাষার গতিকে, বঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুকূলভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য গঠন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সেই জাতীয় সাহিত্য কিরূপভাবে গঠিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কি প্রকারে, কোন্ দিকে জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত

করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে, সেই সম্বন্ধেই আমি দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে "শিক্ষিত" বলিতে আমরা কি বুঝি? সর্ব্বসাধারণে কোন্ সম্প্রদায়কে "শিক্ষিত" বলিয়া স্বীকার করে? বর্ত্তমান কালে, আমাদের দেশে শিক্ষার কেন্দ্র মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, দেশবাসিগণ অসঙ্কোচে তাঁহাদিগকেই শিক্ষিত আখ্যা এবং শিক্ষিতের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। ভারতবর্ষের নানা বিপ্লবের মধ্যেও যাঁহারা পরম যত্নে বুকে বুকে রাখিয়া, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররাজি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অধ্যাপকবর্গের আসন দেশবাসী এখনও অনেক উচ্চে প্রদান করিয়া থাকেন; যদি অধ্যাপকবৃন্দ আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে উত্তরকালেও সে উচ্চাসনে তাঁহারা অধিকারী থাকিবেন, সত্য, কিন্তু সংখ্যাগত হিসাব ধরিলে, বঙ্গের প্রতি পল্লীতেই প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যেখানে হয়ত পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদৌ প্রচার ছিল না, বর্ত্তমানে, সেস্থানেও উক্ত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর দেখা যাইতেছে। যেরূপ ভাবে, গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার ভূয়ঃপ্রচার ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গে, যথায় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব এমন পল্লী থাকিবে না। সুতরাং বঙ্গের ভবিষ্যৎ জন-মত পরিচালনের এবং জন-সাধারণের মত-গঠনের ভার উক্ত শিক্ষিতগণের হস্তেই ক্রমে ন্যস্ত হইবে। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, যদি অকপট ভাবে ইচ্ছা করেন, তবে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশীদিগের, চতুপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পল্লীবাসীগণ তাঁহাদিগের নিকটে অনেক আশা করেন। যে যে পল্লীতে তাঁহাদের বাস, সেই পল্লীর এবং তৎ তৎ সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষাপকর্ষের জন্য তাঁহারাই অনেকটা দায়ী। আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় অনেকটা দায়ী, কেন না লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না, সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণপূর্ব্বক, যদি তাঁহারা বিবেচনা সহকারে লোকমত পরিচালনা করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রতিবেশীরা অম্লানমনে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবে। যে যে গুণ থাকিলে, মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়। শিক্ষিতগণের শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই গুণে সম্পন্ন হইতে হইবে। দয়া, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সত্যপ্রিয়তা, বিনীতভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে, বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাকেই শিক্ষার চরমফলপ্রাপ্তি বলিতে পারি না। স্বজাতিকে আত্মমতের অনুকূল করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে স্বজাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ আবশ্যক, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল সামাজিক, বা কেবল রাজ-নৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হয় না। প্রাত্যহিক কার্য্যের যেমন একটা তালিকা অন্ততঃ মনে মনে থাকিলেও কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়, সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য গঠনের প্রকৃত ভার এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত হইতেছে। অবকাশ মত, কোন ভাবুক, জীবের স্রোতে ভাসিয়া দু'একটি কবিতা রচনা করিলেন, বা চিন্তাপূর্ণ দু'একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত গঠন হইবে না। তপস্যার ন্যায় একাগ্রতা-পূর্ণ চেষ্টায় ঐ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায়ও বঙ্গভাষার অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন হইতেছেন। এই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে বঙ্গভাষায়

ভবিষ্যদ্ উন্নতির ভার নিহিত। সুতরাং তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দু'একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই ইংরাজী শিক্ষিতগণ যদি, একটু আদরের সহিত স্ব স্ব মাতৃভাষার আলোচনা করেন, মাতৃভাষারই হিত-কল্পে মাতৃভাষার আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফলের আশা অনেক। দেশের যাঁহারা উচ্চশিক্ষা-বর্জ্জিত, সেই জনসাধারণকে তাঁহারা অতি অল্প আয়াসেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহ-সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কেন না,—তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মত গঠনের ও সাধারণ সদনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ বা এক হিসাবে কর্ত্তা হইবেন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে, ঐ মাতৃভাষাকে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বরেণ্য করিয়া তোলা ইংরাজী শিক্ষিতগণের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কেননা, তাঁহারা প্রতীচ্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া, সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। লোকসমাজের স্পৃহণীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন,—তাঁহাদের কথায়, তাঁহাদের আচার ব্যবহারের, তাঁহাদের আচরিত রীতিনীতির উপর জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই সাধারণকে স্বমতের বশবর্ত্তী করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্য বড়ই গুরুতর। তাঁহাদের সামান্য স্খলনে, সামান্য উপেক্ষায়, একটি মহতী জাতির—উদীয়মান জাতিরও স্খলন বা অধঃপতন হইতে পারে।

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"

এই মহাবাক্য স্মরণপূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে পাদক্ষেপ করিতে হইবে। তরণীর কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক। অন্যথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী।

যাহারা বঙ্গের অশিক্ষিত, বা অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া, পরে আবার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, এরূপ আশা কদাচ করা যায় না। তাহাদিগকে, সেই mass অর্থাৎ সাধারণ জনসঙ্ঘকে, সৎপথে পরিচালিত করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ, সেইরূপ, তাহাদিগকে, অসৎপথে—উৎসন্নের পথে অধঃপতিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদেরই হস্তে। সরলবিশ্বাস-সম্পন্ন, জনসঙ্ঘের চিত্ত, শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাকচিক্যে বশীভূত করিয়া, যে দিকে ইচ্ছা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ্ এবং বিপদ্ এই দুইএরই হেতু নিহিত রহিয়াছে। এক হিসাবে ইহাও এক মহাআতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা! যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ্ বিপদ্—উভয়ই নির্ভর করিতেছে,—তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে কত গুরুতর, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দেশের জন-সঙ্ঘকে যদি সৎপথেই লইয়া যাইতে হয়,—মানুষ করিয়া তুলিতে হয়,—বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও, যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্ম-সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে,—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ,—আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে, আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ, আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয়, আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, পাশ্চাত্য আয়ুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে। দু'একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ ইউরোপের ইতিহাস। ইতিহাস অল্পবিস্তর প্রায় সকল জাতিরই কিছু না কিছু আছে। বর্ত্তমান কালে, ইউরোপ জগতের অভ্যুদিত দেশ-সমূহের শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা-পূর্ব্বক দেখিতে হইবে, যে, কেমন করিয়া, কোন্ শক্তির বলে, বা কোন্ গূঢ় কারণে ইউরোপের কোন্

জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, কোন্ পথে পরিচালিত হওয়ায়, কোন্ জাতির কি উন্নতি হইয়াছে, সেই উন্নতির কারণ এবং পথ আমাদের এ দেশীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য কি না, তাহার প্রয়োগে আমাদের এদেশে কতটা মঙ্গলের সম্ভাবনা,--ইত্যাদি বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া, যদি সঙ্গত মনে হয়, এদেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে, সেই পথে, আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সেই প্রবর্ত্তনের একমাত্র সহজ পথ,—ঐ সকল কারণ, ঐ সকল উপায়, প্রণালী, অতি বিশদরূপে আমাদের মাতৃভাষার দ্বারা, সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এই প্রচারের একমাত্র কর্ত্তা, যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও যাঁহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে, মাত্র তাঁহারাই, অন্যে নহে।

দেশের কল্যাণ কামনায় এবং স্ব মাতৃভাষার পরিপুষ্টি বাসনায় যাঁহারা এই মহাব্রতে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ইউরোপীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা। মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রচারকর্ত্তাদের সামান্য ত্রুটীতে আমাদের অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেশের শিক্ষিতগণের প্রতিপদবিক্ষেপেই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

যেমন এই অভ্যুদয়ের কথা বলিলাম, তেমনই এই সঙ্গে দেখিতে হইবে, কোন্ পথে যাওয়ায়, কোন্ দুর্নীতির আশ্রয় বশতঃ, ইউরোপীয় জাতির অধঃপাত ঘটিয়াছে, বা ঘটিতেছে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোন্ জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াও কোন্ কর্ম্মের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত হইয়াছে,—পতনের সেই সেই কারণনিচয় অতি সুস্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করিয়া, সেই সেই সর্ব্বনাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষার স্বচ্ছদর্পণে এই ভাবে দোষগুণের প্রতিবিম্বন পূর্ব্বক দোষের পরিহার ও গুণের গ্রহণের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য জন্মাইতে হইবে।

ইহকালই জীবনের সর্ব্বস্ব নহে। এই ইহকালকেই একমাত্র সার ভাবিয়া কার্য্য করার ফলে, ঐহিকবাদী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব আদৌ নাই বলিলেই হয়, ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত অভাবের ফলেই বর্ত্তমান শোণিততরঙ্গিণী রণভূমিতে ইউরোপ বিপর্য্যস্ত। ইউরোপের ঐ অসদ্ভাবের অর্থাৎ ঐহিকবাদিতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বরং যতটা সম্ভব, উহার দূরে সরিয়া যাইয়া আমাদিগের জাতীয়তা ও চিরস্পৃহনীয় ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি, ধর্ম্মভাবের উপর স্থাপিত করিয়া, উহাতে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সমাবেশ পূর্ব্বক, সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। যাহা আছে, মাত্র তাহা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এ দুর্দ্দিনে জাতীয়-সম্পদের যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বতঃপ্রকারে, তাহা করিতে হইবে।

তার'পর ইউরোপের সাধারণ সাহিত্য অর্থাৎ কাব্য—নাটকাদি। আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই অংশে বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত, প্রভৃতি জটিল বিষয় সমূহের আলোচনা অপেক্ষা, এই সমুদয় আপাতরম্য কাব্য নাটকাদির আলোচনায় ইংরাজী শিক্ষিতগণের অনেকেই কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তারুণ্যের অরুণ আভায় এই সকল বিদেশীয় চিত্র প্রথমতঃ বড়ই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়। হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। আমাদের বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখা দরকার যে, পাশ্চাত্য সমাজের চিত্র তদীয় জাতীয় কাব্য নাটকাদিতে কি ভাবে প্রতিফলিত। ইউরোপের সামাজিক চিত্রাবলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাবভাব, বিলাস কৌশল প্রভৃতি আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে গ্রহণ যোগ্য কিনা,—ঐ ঐ চিত্রাবলীর আদর্শে যদি আমরা স্বকীয় সমাজ চিত্রের ছায়াপাত করি, তবে তাহাতে আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি না, অথবা ঐ বিদেশীয় চিত্র আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য কি না,—এই চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া ইউরোপীয় কাব্য নাটকাদি পাঠ করিয়া, উহার যে সকল অংশ উৎকৃষ্ট, অনুকরণীয় এবং কল্যাণ-জনক, তাহা আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণের গোচর করিতে হইবে। সাধারণের মানসসম্পদের উৎকর্ষ বিধান করিতে হইবে।

এইরূপ করিতে পারিলে, আমার মাতৃভাষারও লাবণ্য বর্দ্ধিত হইবে। যাহা সৎ, যাহা সাধু, নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ, তাহা যে জাতির বা যে সমাজেরই হউক না কেন, সাগ্রহে গ্রহণ করিতে হইবে।

"গুণাঃ পূজাস্থানং
গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ"

এইভাবে জাতীয় সাহিত্য যদি গঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের সাহায্যেই, আমাদের নব-জাতা জাতীয়তা সুগঠিত হইবে, এবং জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত আমরা সমকক্ষতা করিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। ইতিহাস এবং কাব্য-নাটক উপন্যাসাদি সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, ইউরোপীয় দর্শন এবং অপরাপর কলা (art) প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। যাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই উত্তম, সুতরাং আমাদের গ্রাহ্য, বা যাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই অস্পৃশ্য, সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য,—এরূপ কথা বলিতে আমি সাহস করি না। বিদেশীয় বা স্বদেশীয় বুঝি না, যাহা উত্তম, তাহা যে দেশীয়ই হউক না কেন, সর্ব্বথা গ্রাহ্য, আর যাহা সর্ব্বথা দোষমুক্ত নহে, তাহা, আত্ম-পরজ্ঞান বর্জ্জনপূর্ব্বক, পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সোজা পথ ছাড়া, ইহার অন্য কোন সমাধান জাতীয় সাহিত্যের বা সমাজের অনুকূল হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। এমন অনেক প্রথা থাকিতে পারে, অথবা আছেও, যাহা, ইউরোপীয় সমাজের কতকটা অনুকূল হইলেও আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সেরূপ প্রথার প্রচলনে প্রয়াস করা যে কেবল পণ্ডশ্রম, তাহাই নহে; তাহাতে, আমাদের স্মরণাতীত কাল হইতে সুসংবদ্ধ সমাজেরও বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। যেমন ইউরোপীয় বিবাহপদ্ধতি। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে উহা যতই সুন্দর ও আপাতরম্য মনে হউক না কেন,—এদেশের অস্থিমজ্জার সহিত যে সংস্কার অবিভাজ্যরূপে বিজড়িত, ঐ বিবাহপদ্ধতি সেই সংস্কারের এবং সেই সংস্কার-পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত সমাজের পক্ষে কদাচ হিতকরী হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশী পদ্ধতির ঐন্দ্রজালিক চিত্রে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করা অনুচিত। যাহা তোমার সমাজের বা জাতীয়তার পরিপন্থী, তাহাকে আড়ম্বর-পূর্ণ সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া, সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে তোমার স্বজাতির আপামর সাধারণকে মজাইও না। মনে রাখিও, তুমি যে পথ আজ নির্ম্মিত করিয়া যাইতেছ, উত্তরকালে তোমারই দেশের শত সহস্র যাত্রী সেই পথে গমনাগমন করিবে। সুতরাং আপাত প্রশংসার ও যশের প্রতি উদাসীন থাকিয়া, যাহা তোমার স্বজাতীয় এবং স্বসমাজের হিতকর, তাদৃশ চিত্র অঙ্কিত কর, তাদৃশ আদর্শ তোমার সাহিত্যের মন্দিরে স্থাপিত কর, যাহার অনুকরণে, তোমার ভবিষ্যৎ জাতি সমুন্নত হইবে। তোমার যে বিবাহপদ্ধতি আছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির পদ্ধতি অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, সুতরাং ঐ উৎকৃষ্ট পদ্ধতির যে যে অংশ অশিক্ষিত, সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ জন-সমাজে এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুবোধিত হয় নাই, তাহা তোমার স্বজসাহিত্যের সাহায্যে ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে, সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত কর। এবং পার ত তোমার সেই উৎকৃষ্ট চিত্রের সম্মুখে, বিদেশীয় চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া তুলিয়া ধর, তুলনায় তোমার স্বজাতিকে বুঝাইয়া দাও, যে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা তোমার পক্ষে গ্রাহ্য ও তোমার সমাজের অনুকূল। মোহের ঘোরে যাহার মস্তিষ্ক বিকৃত, তাহার যাহাতে মস্তক শীতল হয়, সেইরূপ ভৈষজ্যের বিধান কর। যাহাতে রোগ বৃদ্ধি হয়, তোমার জাতীয় চিকিৎসা গ্রন্থে তাদৃশ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সমাজকে উৎসন্ন করিও না। তোমার প্রাচীন শাস্ত্রভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি স্তূপীকৃত রহিয়াছে, এখনও যাহাদের আবরণ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই, মাত্র কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণে এখনও যে সমুদয় রত্নের অতুল কান্তি নিরীক্ষণ করে নাই, তোমার জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে, সেই সেই রত্নের মালা গাঁথিয়া তোমার স্বজাতির কণ্ঠে পরাইয়া দাও, তাহাদিগকে বুঝিতে দাও, শিখিতে দাও, দেখিতে দাও, এবং দেখিয়া, তুলনা করিয়া ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে দাও; দেখিবে, তাহারা. এদেশের

অপরাজিতা বা শেফালিকা ফেলিয়া, অন্যদেশের ভায়লেট্ মাথায় করিবে না। নিজেদের কি আছে, কি ছিল, ইহা যাহারা না জানে, তাহারাই পরের দ্বারে উপস্থিত হয়। তোমার স্বদেশবাসীদিগকে, তোমার প্রাচীন সম্পদের পরিচয় দাও, বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও, তাহাদের মনে আত্ম-সম্মান উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল। তবেই ত তোমার জাতীয়তা গঠিত হইবে। সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন কর, তবে ত জাতির গঠন হইবে। নতুবা সমস্তই আকাশ-কুসুম।

মনে কর, বিলাতের ব্যবস্থাপক সভা, (বা পার্লিয়ামেণ্ট) তোমার দেশের পক্ষে, বর্ত্তমান সময়ে, ঐরূপ সভার উপযোগিতা কতদূর তাহা বিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু বিলাতের লোকতন্ত্র যেরূপ ভাবে গঠিত, তাহার পক্ষে, ঐ সভার উপযোগিতা প্রচুর। সে দেশের পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাই যে এ দেশেরও আবশ্যক, ইহা বলা বড়ই দুষ্কর। দেশভেদে, দেশবাসিভেদে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাভেদে, এবং দেশের শিক্ষা দীক্ষার ভেদে, দেশের পরিচালন সভাসমিতিরও ভেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তোমার দেশের পক্ষে তোমার প্রাচীন পদ্ধতিই অনুকূল, না বিদেশীয় পদ্ধতি অনুকূল, তাহা বিশেষ বিচার করিয়া, তোমার জাতীয় সাহিত্যের দর্পণে, ঐ উভয় ছবিরই দোষগুণের আলোচনা কর, এবং দেশবাসীদিগকেও বুঝিয়া লইতে দাও যে, কোনটা তাহাদের গ্রাহ্য। মুক্ত পুরুষের ন্যায়, আর্য প্রকৃতির ন্যায়, নিরপেক্ষ হইয়া, লোকের হিতকামনায় সাহিত্য গঠন কর, দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে। ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের আদর্শে যদি তোমার স্বদেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চাও, মনে রাখিও, বর্ত্তমান সময়ে তোমার বিফলাশ হওয়াই সম্ভব। হৈমন্তিক শস্যের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত, তাহাতে আশু ধান্যের বীজ বপনে, মাত্র কৃষকের মনস্তাপের বৃদ্ধি হয়, আর সেই সঙ্গে বীজ ধ্বংশ ও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে দেশের শাস্ত্রে, শিক্ষায় দীক্ষায় ও রাজনীতিতে রাজা মানব নহে, দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই ভারতবর্ষে, পাশ্চাত্য রাজনীতির ছায়াপাতে, সেই দেবতাকে আবার মানবের আসনে অধঃপাতিত করিও না। তোমার প্রাচীন রাজনীতির উজ্জ্বল-চিত্র উত্তমরূপে নিজে নিরীক্ষণপূর্ব্বক, প্রতিভার সাহায্যে তাহা তোমার মাতৃভাষায় আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতির সহিত তুলনায় সর্ব্ব-সাধারণকে বুঝিতে দাও, যে, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের, রাজনৈতিক ধারণা কত উচ্চ ছিল। গুপ্তহত্যা, রাজবিদ্বেষ এবং রাজদ্রোহ, কেবল ঐহিক নহে, পারত্রিক অকল্যাণেরও আকর, একথা তোমার ধর্ম্মশাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছে। যদি এই সকল কঠিন সমস্যা, মাতৃভাষার সাহায্যে সমাধান করিতে পার, তবেই, প্রকৃতপক্ষে, তোমার মাতৃভাষার সেবা সার্থক হইবে, তোমার জ্ঞানার্জ্জন সার্থক হইবে, আর সেই সঙ্গে, বঙ্গভাষার সেবা করিয়া তোমার জন্মও সার্থক হইবে। অবশ্য এই কঠিন কার্য্য এক সময়ে, বা একের দ্বারা কদাচ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এই পথে যদি একবার তোমার জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পার, তবে দেখিবে, আরও কত পথিক, তোমার প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিবে। পথ যদি, উত্তম, সুগম এবং সুশীতল ছায়া সম্পন্ন হয়, তবে তাহাতে কোন দিনই যাত্রীর অভাব হয় না। যাহা ভাল, নিষ্পাপ এবং নির্দ্দোষ তাহার সেবা কে না করিতে চায়? সেই সেবায় সেবিতের লাভালাভ কিছুই নাই, কিন্তু সেবকের আত্মতৃপ্তি অপরিসীম। এই গুরুতর কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠাতৃগণের মনে রাখিতে হইবে, যে, কেবল অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদে বা মাত্র তাহার উজ্জ্বল অংশের প্রদর্শনেই, আমাদের ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না; প্রত্যুত, তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনাপূর্ব্বক, তাহার অসদংশের বর্জ্জন করিয়া সদংশ, যাহা এদেশের অনুকূল, ঐ ঐ অংশ, যদি তাহাতে কোনরূপ দোষলেশ না থাকে, তবে, তাহাই আমাদের মাতৃভাষার কমনীয় আভরণে অলঙ্কৃত করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের গ্রাহ্য অংশগুলি যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তবেই— ক্রমে আমাদের বঙ্গভাষা আশাতীত ভাবে পরিপুষ্ট

লাভ করিবে। ইউরোপীয় ভাষায় অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ থাকিয়াও এদেশবাসীরা ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষার উত্তম ফলে বঞ্চিত থাকিবে না। প্রত্যুত, ক্রমেই তৎ-তৎফলে সম্পন্ন হইবে। প্রাচীন জাপান এই উপায় বলেই অধুনাতন নবীন জাপানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই একটা বিষয়ে সর্ব্বদা আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অশ্বের উপরে নর্ত্তনাদি করিয়া, যাহারা দর্শকদিগের প্রীতি ও কৌতুক উৎপাদন করে, তাহারা যেমন, প্রধানতঃ সর্ব্বদাই স্মরণ রাখে, যে, "অশ্বপৃষ্ঠ হইতে স্খলিত না হই,"—তদ্রূপ, আমাদিগকেও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা এই কার্য্য করিতে যাইয়া স্খলিত না হই। অর্থাৎ আমাদের যাহা মজ্জাগত সংস্কার, সেই পবিত্র ধর্ম্মভাব হইতে যেন বিচ্যুত না হই। আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির কোনটিই ধর্ম্মভাব শূন্য নহে। ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এমনই একটা গুণ আছে যে, এখানে ধর্ম্মভাব বর্জ্জিত কোন বস্তুই স্থায়ী হইতে পারে না, এপর্য্যন্ত পারে নাই। যাহাদের আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান, তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের কোন চিত্র যদি ধর্ম্মভাব-ব্যঞ্জক না হয়, তবে তাহা কদাচ বাণীর পাদপদ্মে অর্পণ করা যাইবে না। সে চিত্র, গোধূলি-গগনের লোহিত মেঘখণ্ডের মত, অতি অল্পকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী প্রভৃতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; রাম যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দধীচি, কর্ণ যাহাদের সাহিত্যের আদর্শ-পুরুষ, কবিগুরু রত্নাকর, মহর্ষি দ্বৈপায়ন, কবিকুলরবি কালিদাস, ভবভূতি যাহাদের জাতীয়-সাহিত্য-সঙ্গীতের গায়ক, আর সর্ব্বোপরি, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যাহাদের শ্রৌতসঙ্গীতরূপ অমৃতের নির্ঝর, তাহাদের নবীন জাতীয় বঙ্গসাহিত্যে কোনরূপ অপবিত্র ভাব বা আচার যেন প্রবেশ না করে, তৎপক্ষে সর্ব্বদাই প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন। সকল জাতিরই এক একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। আছেও। লক্ষ্যহীন জাতি কদাচ অভ্যুদয়শালী ও কালজয়ী হইতে পারে না। এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে যে জাতি অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা স্থির লক্ষ্য ছিল। এবং সেই লক্ষ্য ধরিয়াই তাহারা ক্রমে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে পারিয়াছে। লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে, কিছুই অসম্ভব নহে। অতি দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। এই যে ইউরোপ এত অতুল ঐহিক শ্রীবৃদ্ধিতে সম্পন্ন, ইহার কারণ কি? অর্থ বা অর্থকর বাণিজ্য উহাদের একমাত্র লক্ষ্য। আজ যে জাপান এত উন্নত, ঐ অর্থকর বাণিজ্য উহার একমাত্র লক্ষ্য। ঐ লক্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি আছে বলিয়াই, অন্য কোন বাধাবিপত্তিতে উহাদিগকে ব্যাহত করিতে পারে না। লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য, প্রাণকেও উহারা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। লক্ষ্য স্থির ছিল বলিয়াই, ধর্ম্মপ্রাণ অগ্নি উপাসকগণ অম্লানবদনে, ইরাণ ছাড়িয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন,—আমেরিকার পিউরিটানেরা মাতৃভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক, গহনবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে যে জাতি যে যে বৃহৎ কার্য্যই করুক না কেন, তাহার মূলে কিন্তু একটা স্থির লক্ষ্য থাকা চাই। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের এই জাতীয় সাহিত্যের মন্দির নির্ম্মাণেও একটা স্থির লক্ষ্য আবশ্যক। অন্যথা আমরা সফলকাম হইতে পারিব না। আমাদের সেই লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? কোন্ লক্ষ্যে স্থিরচিত্ত থাকিয়া, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারিয়াছিলেন? কোন্ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া নিবন্ধনই আমরা ক্রমে অধঃপতিত হইতেছি? ইহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য ও বিবেচ্য।

ভারতবর্ষ যে এত উন্নত হইয়াছিল, সে একমাত্র ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া। যদি ভারতকে আবার বড় করিতে চাও, যদি আবার তোমাদের লুপ্ত সম্পদের, বিনষ্ট-সম্মানের পুনরধিকার চাও, তবে সেই পিতৃপিতামহের লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির কর। একাগ্রচিত্ত হও, অবাধে তোমার অভিপ্রেত মৎস্যচক্র ভেদ করিতে পারিবে। ধর্ম্মভাব হিন্দুজাতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ধর্ম্মভাবকেই তোমার বর্ত্তমান জাতীয়তারও প্রধান লক্ষ্য কর। তোমার সাহিত্য, তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার,

ব্যবহার, সর্ব্বত্রই সেই ভারতস্পৃহনীয় ধর্ম্মভাবের স্ফূরণ কর। দয়া, সমবেদনা, পরার্থপরতা, সত্য, তিতিক্ষা, প্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে তোমার সাহিত্য-কানন যদি সম্পন্ন করিতে পার, তবেই তোমার জাতীয় অভ্যুদয় হইবে। অন্যথা যাত্রার দলের প্রহ্লাদের ন্যায়, তুমি ভক্তের ভাণ করিবে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তোমার কোনই শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। অন্তরের সমস্ত আবেগ, উৎসাহ ও নির্ভর একত্র করিয়া, যদি জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে পার, দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে।

এইভাবে অন্যের সুচারু ও সদ্ভাবপূর্ণ পদার্থ লইয়া নিজের জাতীয় সাহিত্যের নির্ম্মাণ ও জাতীয় আদর্শের গঠন ইতঃপূর্ব্বেও হইয়াছে। বরঞ্চ ইতঃপূর্ব্বে, অতি প্রবলরূপেই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমের নিজের জাতীয় সম্পদ্ আমাদের প্রাচীন সম্পদের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে ছিল না; আমাদের সহিত তুলনা করিলে, রোমের প্রাচীন সম্পদ্ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। রোমে যখন জাতীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ হইল, তদানীন্তন প্রধান জাতির অভ্যুদয় দর্শনে, রোমবাসীদের হৃদয়েও যখন জাতীয়তাগঠনের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল, জগতে বরণীয় হইবার আকাঙ্ক্ষায় রোমবাসিগণের অন্তঃকরণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা মাত্র নিজের পরিমিত প্রাচীন সম্পদেই আর পরিতুষ্ট থাকিতে পারিল না। পিপাসার্ত্ত হইয়াই যেন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তখন গ্রীসের চরম উন্নতির সময়। সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বাংশে গ্রীস তখন জগতের একটা আদর্শ জাতি। বীরত্বে ধীরত্বে, জ্ঞানে সম্মানে, গ্রীস তখন সকলের শ্রেষ্ঠ। গ্রীসের সেই চরম অভ্যুদয়ের সময়ে, রোমের লোলুপ দৃষ্টি গ্রীসের প্রতি পতিত হইল। গ্রীসের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, গ্রীসের কলাবিদ্যা, গ্রীসের শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সমস্তই রোম ক্রমে স্বীয় জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে লাগিল। গ্রীসের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্তই রোম নিজের জাতীয়তা গঠনের প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে, রোম গ্রীসের সমকক্ষ, এমন কি, অনেকাংশে গ্রীস অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। গ্রীসের অনুকরণ করিতে যাইয়া কিন্তু রোম স্বীয় জাতীয়তার বিসর্জ্জন করে নাই। গ্রীসের যাহা কিছু উত্তম পরিচ্ছদ, যাহা কিছু সুন্দর অলঙ্কার, তাহা রোমের জাতীয় ছাঁটে ছাঁটিয়া, জাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া রোম পরিধান করিল, এবং নবীন সাজে সাজিয়া, রোম যখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, তখন রোমের সেই নানারত্ন-খচিত কিরীটের প্রভায়, প্রাচীন গ্রীস যেন কতকটা হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। প্রাচীন গ্রীসের অঙ্গে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে সমুদয় জরাজনিত পলিতত্বাব জন্মিয়াছিল, যাহা কিছু অসুন্দর ছিল, তাহার পরিবর্জ্জন করিয়া, রোম গ্রীসকে যেন একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। রোমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের মস্তক হেঁট হইল।

কিন্তু এই গ্রীস রোমের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না। রোমীয়দিগের নিজের প্রাচীন দ্রব্যসম্ভার তত অধিক ছিল না, তাহাদের গৃহ এক-প্রকার শূন্য ছিল, হয়ত গৃহের কোন এক কোণে, দু'একটি প্রাচীন পদার্থের কঙ্কাল মাত্র পড়িয়া ছিল, তাই রোমীয়গণ দু'হাতে গ্রীসের যতটা পারিয়াছে, দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া নিজের শূন্যপ্রায় গৃহ পরিপূর্ণ করিয়াছে। তত সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিতে হয় নাই।

আমাদের কথা ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। আমাদের প্রাচীন সম্পদ্ প্রচুর। তাহার ভাণ্ডার অক্ষয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। আমাদের যাহা আছে,—তাহার কোন একটিরও মর্য্যাদার হানি হইতে পারে, এমন কোন পরস্ব আমরা কদাচ গ্রহণ করিব না। অথচ, আমাদের যাহা নাই, অন্যের প্রচুর আছে, সেইরূপ পদার্থ, যদি আমাদের জাতীয়তার পরিপন্থী না হয়, তবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিব না। রোমের ন্যায় আমাদের গৃহ শূন্য নহে যে, যে ভাবে পারি, গৃহ পূর্ণ করিব; আমাদের ঘর পরিপূর্ণ, সেই পরিপূর্ণ গৃহের শোভা বৃদ্ধির পক্ষে যাহা

অনুকূল, সেই পরিপূর্ণ গৃহের অনুরূপ যে সাজ সরঞ্জাম, তাহা যদি অন্য কোন জাতির নিকটে পাই, তবে অম্লান-হৃদয়ে গ্রহণ করিব। যাহা আমার জাতীয়তার অনুকূল নহে, তাহা কদাচ স্পর্শ করিব না। আমার নিজের জাতীয়তায় কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ হইতে পারে, এরূপ আবর্জনা কদাচ আমার জাতীয়-সাহিত্যের অঙ্গে জাগিতে দিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিবেচনার সহিত পাদক্ষেপ করিতে পারি, কিংশুক পরিহারপূর্ব্বক কমল চয়ন করিতে পারি, তবেই আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সম্পদ্, এই দুইই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

আমাদের যাহা নিজস্ব, যাহা লইয়া আমরা গৌরব করি, আমাদের সেই জাতীয় গৌরবের বস্তু, প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষা, শিল্পকলা, দর্শন ইতিহাস, প্রভৃতির যাহাতে কোনরূপে অঙ্গহানি ঘটে, এরূপ কার্য্য যেন আমরা কদাচ না করি, কদাচ যেন জাতীয়তার বিসর্জ্জন না দিই। অথচ, যে ভাবে হউক, যদি ঐ ঐ বস্তুর কোনক্রমে কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, তবে তাহাতে যেন বদ্ধ-পরিকর হই। নিজের যাহা আছে, তাহাত আছেই, কেহ তাহা অপহরণ করিতেছে না, সুতরাং সেপক্ষে নিশ্চিন্ত থাকিয়া, যাহা অন্যের আছে, অন্যে যাহার বলে বলীয়ান্, অথচ আমার নাই, তাহা পাইবার জন্য যদি আমার আন্তরিক আগ্রহ না জন্মে, তবে কদাচ আমি ঐ বলবানের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিব না। কেবল পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া, পূর্ব্বের অতীত সম্পদের আলোচনা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে কোনই ফলোদয় হয় না। নিজের জাতীয় জীবনের শক্তি যাহাতে বৰ্দ্ধিত হয়, তাহার প্রয়াস স্বতঃপরতঃ করিতে হইবে। শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। আমার এই ছিল, আমি এই ছিলাম, এইরূপ ব্যর্থ ও অলস চিন্তায় কোনই লাভ নাই, বরং ক্ষতিই অধিক। এই ভাবে, লক্ষ্যস্থির রাখিয়া যদি আমরা আমাদের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারি, তবেই আমাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, আমরা এই ঘোর দুর্যোগেও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ, ধর্ম্মভাব-বর্জ্জিত, তাহা উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিহার করিয়া, যাহা সুন্দর, নির্ম্মল, নিষ্পাপ, মনোহর, যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সদ্ভাবপুষ্প চয়ন করিব, এবং সেই সদ্ভাব-কুসুমে আমার জননী, অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃতা করিব, মায়ের সন্তান আমরা, মাতৃপূজা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব। যে বায়ু মধুকণা বহন করে না, তাহা আমরা আঘ্রাণ করিব না, যে নদী মধুমতী নহে, যে লতা মধুময় কুসুমে কুসুমিত নহে, তাহার প্রতি আমরা চাহিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের অনুকূল হইবে, সহায় হইবে। নিঃসপত্নভাবে আমরা পর্ব্বোদিত চন্দ্রমার ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিব। হিমাচল যে দেশের পর্ব্বত, জাহ্নবী যমুনা যে দেশের প্রবাহিনী, সাম যে দেশের সঙ্গীত, রামায়ণ মহাভারত যে দেশের ইতিহাস, আমরা সেই দেশের অধিবাসীর যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব। আপনারা আজ আমাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন,—বঙ্গবাণীর চরণপ্রান্তে বসিবার সুযোগ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশপূর্ব্বক আমি আবার বলি, আপনাদের ভাষা, আপনাদের ভাব, আপনাদের চিন্তা—এ সমস্তই সুন্দর হউক, অন্যের অনুবেজক হউক, যাহারা আপনাদের সন্নিকর্ষে আসিবে, তাহাদিগকেও উন্নতির পথে লইয়া, আপনারা নিজে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায়, অবাধিত গতিতে, উন্নতির অমৃতময় পারাবারে মিশিয়া যাউন। নিজের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতের বরেণ্য হউন। বিধাতার কৃপায়ঃ—

মধু ক্ষরতু তে বিত্তং মধু ক্ষরতু তে মুখম্।
মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকো মধুময়োঽস্তু তে॥

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

# কবিতার প্রাণ

কবিতা বিশ্বজগতের সঞ্জীবনী শক্তি। সৌন্দর্য্য ও আনন্দ দান—কবিতার প্রাণ। কোন্ দূর অতীতে কবে কোন্ শুভ লগ্নে কবিতার উদ্ভব—সে ইতিহাস কেমন তাহা কে বলিতে পারে? আর্য্যঋষিরা বিশ্বনিখিলের বৈচিত্র্যপূর্ণ রস সৌন্দর্য্য দেখিয়া যে শ্লোক-গাথা গাহিয়া গিয়াছেন,—যে আনন্দ-মাধুর্য্যে স্মরণাতীত-কালের মানব-প্রাণের সহিত বর্ত্তমানযুগের বিশ্বজনের অনন্ত মিলন-রাগিনী ঝঙ্কৃত—উহাই কবিতার আদি সৃষ্টি। তারপর তমসার তীরে ব্যাধ-নিপীড়িত ক্রৌঞ্চ-বধূর বিয়োগ ব্যথায় বাল্মীকির শ্রীমুখোচ্চারিত মধুর ছন্দ-গীতি যে কমনীয় শোক চিত্রের বিকাশ হৃদয়ে জাগাইয়া তোলে, তাহা হইতেই কবিতার ক্রমবিকাশের অভিব্যক্তি কি না সে কথা পণ্ডিতগণের বিবেচ্য। আমার সে ইতিহাস আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই।

আমার যাহা বক্তব্য ও আলোচনার বিষয় তাহা প্রথমেই বলিয়াছি—আমি দুইটী কথায় কবিতার অর্থ এই বুঝি যে সৌন্দর্য্য ও আনন্দ এই দুইটিকে কেন্দ্র করিয়াই প্রকৃত কবি-হৃদয় হইতে নানা রসে নানা ভাবে কবিতা ফুটিয়া উঠে। পৃথিবী মানবজাতির নিকট এক মায়াপুরী। যে দিকে চাও সে দিকেই মায়াবিনী বিশ্বসুন্দরী তোমাকে আহ্বান করিতেছে—এস বঁধু, এস! প্রভাতের শান্ত সৌন্দর্য্য, নীল নির্ম্মল গগনে দীপ্ত দিনমণির প্রথম উন্মেষ, লোহিত মেঘমণ্ডলের অপূর্ব্ব বিভব, বিশ্বের নবীন চেতনা—ভাবমুগ্ধ হৃদয়কে এক নবীন উদ্বোধনে উদ্বোধিত করে। তারপর মধ্যাহ্নের খর সৌন্দর্য্য, সন্ধ্যার বিষাদ ম্লান ছবি, আর নিশীথের সেই কল্পলোকের দৃপ্ত, উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা পরিশোভিত মহান্ শোভা—কখনও চন্দ্রের হাসি, কখনও জ্যোছনার দিব্য হাসিভরা মুখ—কত সুরে কতইনা ছন্দে সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গ উচ্ছ্বাসের ন্যায় ঘুমন্ত মানব চিত্তকে জাগাইয়া তোলে। রূপ কথায় সেই ঘুমন্ত পুরীর নিদ্রিতা রাজকন্যার ন্যায় প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া আপনা হইতেই চিত্তকে কুসুম কলিকার ন্যায় ফুটাইয়া তুলিতে চাহে। তারপর নানা দেশে নানা শোভা—কোথাও অনন্ত বিস্তৃত নীলাম্বুরাশি, কোথাও তুষার মণ্ডিত গগনস্পর্শী বিরাট গিরীন্দ্র শেখর, কোথাও মরুভূম—ধূ ধূ করে বালুরাশি, কোথাও নির্ঝর, কোথাও নদী, কোথাও নিবিড় বন, কোথাও সমতল সবুজ সুন্দর মাঠে তরঙ্গায়িত শস্য লীলা—এমন মাধুরী-মণ্ডিত শোভার আগার ধরণীর বুকে জন্ম লাভ করিয়া কবির রসে চিত্ত ভরপূর হইবে না কেন? প্রকৃতি অনুক্ষণ আমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

> 'তাঁহারি আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
> এস সবে নর নারী আপন হৃদয় লয়ে।
> সে আনন্দে উপবন, বিকশিত অনুক্ষণ,
> সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা বয়ে।
> সে পুণ্য নির্ঝর-স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান।
> রাখ সে অমৃতধারা পূরিয়া হৃদয় প্রাণ,
> চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
> চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
> সে আনন্দ রস পানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
> দহে না সংসার তাপ সংসার মাঝারে রয়ে।'

কবি সত্যই বলিয়াছেন—'সে আনন্দ রসপানে চির প্রেম জাগে প্রাণে।' প্রকৃতির আনন্দধারা পান করিয়া বিভোর প্রাণে 'অতি সুন্দর' এই বাণী জ্ঞানে কি অজ্ঞানে মুখ দিয়া নির্গত হয় নাই এমন লোক পৃথিবীতে নাই। এখানে শিক্ষিত অশিক্ষিতের কোনও তারতম্য নাই।

সকলের প্রাণেই উপলব্ধি আছে, কিন্তু বিকাশ করিবার শক্তি থাকে না। বিশ্ব সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিলেই কবি আখ্যায় আখ্যায়িত হইতে পারি না,—যিনি উহা উপলব্ধি করিয়া তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন, মনের গোপন কথাগুলি শ্লোকে ছন্দে গাঁথিয়া পিপাসী নর নারীর চিত্ত বিনোদনের জন্য ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনিই কবি—তাই বলিয়াছিলাম, সৌন্দর্য্য ও আনন্দ দান কবিতার প্রাণ। আনন্দ কিসে নাই? সৌন্দর্য্য কিসে নাই? আনন্দ ও সৌন্দর্য্য শুধু কবিতার প্রাণ নহে, বিশ্বনিখিলের প্রাণ। মানুষের

শোকে, দুঃখে, বিরহে, ব্যাথায়, ভালবাসায়, মিলনে, ভক্তিতে, প্রত্যেকের ভিতরেই আনন্দ আছে। সে আনন্দ উপলব্ধি করিবার শক্তি সাধনা সাপেক্ষ। তাহা হৃদয়ের অনুভূতির পরিচায়ক, তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। পুত্রহারা জননী পুত্র বিয়োগ ব্যাথায় পুত্রের জন্য কাঁদিতেছেন, এই যে ক্রন্দনের ভিতর আমরা স্নেহময়ী জননীর বিয়োগ ব্যাকুল হৃদয়ের মহিমামণ্ডিত আলেখ্য দেখিতে পাই, প্রাণের যে অকৃত্রিম স্নেহের প্রকাশ জানিতে পারি—তাহা কি কেহ বলিয়া বুঝাইতে পারে! এ শোক বড় মধুর—এই স্নেহের এই শোকের প্রকাশানন্দ বড় করুণ—ইহার দ্বারা এই মাতৃ হৃদয়ের সঞ্জীবনী শক্তিদ্বারাই জগৎ সঞ্জীবিত, তাই একজন পাশ্চাত্য কবি গাহিয়াছেন—"Our sweetest songs are those that tell of the saddest thoughts."

আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিদের ন্যায় এই সৌন্দর্য্য ও আনন্দের প্রকাশ আর কোন দেশের কোন কবি করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহারা এমন অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন—এমন অনেক ভাব-সৌন্দর্য্যের মোহন মাধুরী অঙ্কিত করিয়াছেন, যে তাহা পাঠ করিতে করিতে প্রাণ বিভোর হইয়া উঠে। প্রকৃতির সহিত, বিশ্বমানবের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে ঐরূপ গান কেহ রচনা করিতে পারে না। যেখানে ঐরূপ মিলন নাই—শুধু কথার বাঁধুনি আছে—সেখানে কবিও মুগ্ধ হইতে পারেন না, পাঠকও আনন্দ লাভ করেন না। কবিতা যদি নিখিল মানবের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিতে না পারে, তাহা হইলে উহা দ্বারা মানব সমাজের কখনও কোন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। সরলতা না থাকিলে, প্রকৃতির সুরে সুর মিলাইতে না পারিলে, কবিতার বিকাশ হয় না। এ কথাটার একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আকাশে ইন্দ্রধনু উঠিয়াছে—অমনি একজন দেখিয়া নিকটস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল 'দেখ, দেখ, কি সুন্দর! কেমন সুন্দর ইন্দ্র ধনু'; এই সাধারণ দৃষ্টান্তটি হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, মানবের সাধারণ প্রকৃতি—যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া নিজে মুগ্ধ হই, সে সৌন্দর্য্য অপরকে দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ। যেখানে ইহার অভাব, সেখানে কবিত্ব বা সৌন্দর্য্য জাগিতে পারে না। রাখিয়া ঢাকিয়া বলিলে কখনও কবিতার প্রাণ থাকে না।

বৈষ্ণব কবিগণের কবিতার মাধুরী সরলতা।

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো'
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে!

এই কবিতার মধ্যে প্রাণের যে সুন্দর সরলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বরাগের যে একটী মাধুরী মাখা চিত্রের আভাষ ইহাতে দেদীপ্যমান, তাহা একমাত্র বৈষ্ণব কবিগণের কবিতায়ই সম্ভবে। বৈষ্ণব কবিগণের কবিতা দ্বারা আমরা মানবের বিরহ কথা, মিলনানন্দ ও ঋতু-বৈচিত্র্যের, প্রেমের অপূর্ব্ব নিষ্ঠার যে পরিচয় পাই তাহার করুণ আঘাতে হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরের যে সুপ্তবীণা বাজিয়া উঠে তাহা ভাবুক ছাড়া রসজ্ঞ ছাড়া বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। ভালবাসা প্রেম বা প্রীতির চরম কোথায়? প্রকৃত প্রেম কি? রূপ কি? রস কি? বাৎসল্য সখ্য কি? এ সকলের প্রকৃত অর্থ তাহাদের কবিতায় পরিস্ফুট। আমরা এখানে বৈষ্ণব কবিগণের নানা রসের কয়েকটী কবিতা লইয়া আলোচনা করিতেছি। প্রথম দৃশ্য পূর্ব্বরাগ। শ্রীমতী রাধা শ্যাম কেমন দেখেন নাই, শ্যামকে জানেন না, শুধু শ্যামের নাম শুনিয়াই বলিতেছেন,—"না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো! বদন ছাড়িতে নাহি পারে।" তারপর রাধিকা, সখির নিকট চিত্র দেখিলেন, দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন "কোটি মদন ধনু নিন্দিত শ্যাম তনু" দেখিয়া "ধরম করম দূরে তেয়াগিনু মনেতে লাগিল যে!" তখন চিত্ত রস বিহ্বল—মিলন প্রয়াসী—

"রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥"

এ সকল পূর্ব্বরাগের কবিতার পর রাধিকার আত্ম নিবেদন বড় সুন্দর। ভালবাসার গভীরতা অন্তরেন্দ্রিয়ের উপলব্ধি দ্বারা পরিস্ফুট হয়। যখন মান অপমান থাকে না, যখন আপনার কথা মনে হয় না, যখন কলঙ্ক লজ্জা ভয় দূর হয়, যখন মানব প্রাণ মিলনের জন্য খরস্রোতা পার্ব্বত্য তরঙ্গিণীর ন্যায় উদ্দাম আকুল আবেগে চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠে, তখনই প্রকৃত আত্মনিবেদনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাই শ্রীরাধার মুখে শুনিতে পাই,—

'বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি          তোঁহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ          তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী          হাম অতি দীনা
না জানি ভজন পূজন।
কলঙ্কী বলিয়া          ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া          কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥'

আর

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি।"

এমন প্রাণের পিপাসা এমন প্রাণের ব্যাকুলতা যেখানে সেখানেই প্রকৃত কবিত্বের বিকাশ।

বৈষ্ণব কবিগণের কবিতা স্বর্গের, পৃথিবীর নহে। তাঁহারা কখনও প্রিয়তমের রূপে মুগ্ধ হইয়া বলেন—

'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়ে যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মুরছা যায়॥'

আবার কখনও প্রাণ বঁধুকে দেখিতে পাইয়া অধীর হইয়া পড়েন, কেমন করিয়া তাঁহাকে আদর করিবেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে সোহাগ করিবেন, তাই গাহিয়া উঠেন,—

"এস এস বঁধু এস          আধ আঁচরে বস
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।"

কিন্তু রূপ দেখিয়া কি কখনও কাহারও সাধ মিটে? রূপ সৌন্দর্য্য, সে যে অনন্ত—অনন্ত জীবনের অনন্ত সঙ্গী। জনম অবধি রূপ দেখিয়াওত রূপ দেখার সাধ মেটে না। তাই মানুষ রূপ সাগরে ঝাঁপ দেয়। নিখিল ব্যাপী রূপ—যে দিকে তাকাও সে দিকেই রূপ—সেই রূপের সাগর সর্ব্বআকর্ষণ সার রূপের নিধি যখন আমাদের হৃদয়ে আসেন, তখন নয়ন ভরিয়া দেখা ছাড়া আরত আমরা কোনও আকাঙ্ক্ষা করিতে পারিনা। সে রূপের পরশে শতদল ফুটিয়া উঠে। যখন—

"যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরী তরঙ্গ॥"

এই অনন্ত রূপের নিধি যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, তখনই আমরা অভিসার বেশে সাজিয়া থাকি, তখনই প্রতি পলে প্রতিক্ষণে নানা রূপে নানা ভাবে তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হই। কখনও কখনও—

"কুসুম শয়ন সাজি পুন নিন্দই পুন সাজই কত বেরি। আভরণ তেজি বহু পুন পহিরহি নিজ তনু পুন পুন হেরি"॥ কখনও—

"গগনে গরজে ঘন নিশি আঁধিয়ারি।
কুঞ্জহি শো রচয়ে বরনারী॥"

আবার কখনও—

"ডাকে ডাহুক ঝমক ঝমকল ঝারি ঝলকত ঝারিয়া।
ডিণ্ডিমাধ্বিত মণ্ডুকীবর ময়ূর নাচত সাজিয়া॥
রে ঘন ঘন ঘন গহন দুরগহ গগনে ঘন ঘন গর্জ্জিয়া।
হানে তনু মন পলক পলকন ঝলকে যামিনী কাঁপিয়া॥"

এইরূপ নানা অবস্থান্তরের পর, মান অভিমানের শেষে মিলন, সেই শুভ মিলন দিনে আপনা হইতেই কণ্ঠে মিলন-গীতি গুঞ্জরিয়া উঠে। তখন বিরহিনী আত্মা বধূ গাহিয়া উঠে—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়মুখ চান্দা।"

আমার বক্তব্য বিষয়টুকু—এ সকল কবিতার মধ্যে প্রকৃত কবি হৃদয়ের এবং কবিতার পরিচয় পাই। এখানে

উদ্ধৃত প্রত্যেকটী কবিতার মধ্যে বিশ্ব নিখিলের সংযোগ আছে। শত রূপে শত ভাবে এই সকল কবিতা গুলি রচিত। মনের কোন কথা এখানে আপনাকে ঢাকিয়া রাখে নাই। প্রত্যেকটী গান প্রত্যেকটী শব্দ প্রত্যেকটী পদ পাঠে আপনা হইতেই অর্থ উপলব্ধি হয়। চিত্তে সৌন্দর্য্য চিত্র, মাধুর্য্য চিত্র, বাৎসল্য চিত্র, প্রভৃতি নানা রসের ভাব বিকশিত হয়।

মার্কিণ কবি এমারসন বলিয়াছেন—"The poet is the sayer, the namer and represents beauty." এই একটী পংক্তি দ্বারাই প্রাচীন বৈষ্ণবকবিগণের কবিতার সম্বন্ধে সব কথা বলা হইল বলিতে পারি।

বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিতার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে তিনভাগে বিভক্ত করিলে সুবিধা হয়। প্রথম যুগ চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় যুগ সপ্তদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর আদিভাগ এবং তৃতীয় যুগ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত।

আদিযুগের কবিতা নানা স্তরে নানা ভাবে নানা ধর্ম্মের শাখায় বিভক্ত হইয়া রচিত হইয়াছে। মধ্যযুগকে প্রাচীন সঙ্গীতের যুগ বলিলেই শোভন হয়। তৃতীয় যুগকে আমরা গুপ্তকবি হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত বিভাগ করিয়া লইলাম। প্রাচীন যুগের কবিতা পদাবলীর যুগ বলাই অধিকতর উপযোগী, কারণ সে সময়ে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি অসংখ্য বৈষ্ণব কবিগণ কেবল পদ রচনা করিয়াছেন। ঐ সমুদয় পদাবলী সুরলয়ে গীত হইত, কাজেই আদি বা প্রথম যুগকে পদাবলীর যুগ আখ্যায় আখ্যায়িত করাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। পদাবলীর যুগের অব্যবহিত পরেই বৈষ্ণবচরিতরচয়িতাগণের উদ্ভব হইয়াছিল, বিবিধ অনুবাদ ইত্যাদিও এ সময়েই বঙ্গসাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই যুগের তৃতীয় স্তরেই রামপ্রসাদ, আজুগোসাই, নিধুবাবু, নানাশ্রেণীর কবিরগান, দাশরথী রায়ের পাঁচালী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি নানাকবি ও যাত্রাগায়কগণের উদ্ভব হয়। প্রাচীন কবিশ্রেণীর কবিগণের মধ্যে ও নব্য কবিগণের ও সাহিত্যিকগণের আদিগুরু হিসাবে গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রের নাম চিরস্মরণীয়।

বর্ত্তমান যুগের কবিগণের কাব্য মধ্যে প্রকৃত প্রাণ কি পরিমাণ আছে সে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করিবার পূর্ব্বে যে ভাবে সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল, ইংরেজী শিক্ষার পরে, ইংরেজ রাজত্বের প্রভাবে, তাহার মূলসূত্র একরূপ আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কাজেই বর্ত্তমান যুগের কবিগণের কাব্য-কথা আলোচনা করিতে হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির স্রোত কিরূপ নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তৎসম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া মূল বক্তব্য বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রকৃত বাঙ্গালীর কবি—প্রকৃত অকৃত্রিম দেশীয় ভাবের কবিতা, এখন দেশে নাই; এখন পাশ্চাত্য সাহিত্যানুরাগী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে ভাসমান কবি, লেখক, পাঠক ও জনসাধারণের মর্ম্মবাদ আলোচনা না করিলে বর্ত্তমান কবিত্বের সমালোচনা বা তাহার প্রাণ কোথায় তাহা বিশদভাবে জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা সম্ভবপর নহে বলিয়াই আমরা এখানে গুপ্তকবির কবিতার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মধ্যযুগের কবিগণের মধ্যে কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কন, কাশীরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতির সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কাশীরামের মহাভারত, রামপ্রসাদের সঙ্গীত, ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রতি-নিয়ত পঠিত ও গীত হইয়া আসিতেছে। ইহাদিগকেই প্রকৃত জাতীয় কবি বলা যাইতে পারে। ইহাদের গান ও কবিতা জানে না বা পড়ে নাই এমন লোক বঙ্গদেশের কোথাও আছে কিনা জানি না। সুদূর পল্লীর নিভৃত কুটিরে যাও সেখানেও শুনিতে পারিবে দ্বিপ্রহরের ঘন নিস্তব্ধতার মাঝখানে বৃদ্ধ পল্লীবাসী গৃহআঙ্গিনায় সুশীতল তরুছায়ায় বসিয়া পাঠ করিতেছেন,—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান।"

আর কৃত্তিবাস, সেত লোকের মুখে মুখে—রামায়ণ গান, সেত পুণ্য কর্ম্ম। তারপর রামপ্রসাদের গানগুলি, সেত ভাবুকের প্রাণের জিনিষ—সাধারণের অমূল্য সম্পত্তি! এমন কেহ কি এখানে আছেন যিনি কোন দিন রামপ্রসাদের সঙ্গীত শুনিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া পারিয়াছেন? এমন কেহ কি আছেন যিনি কোন দিন সংসার বেদনা ব্যথিত চিত্তে গাহিয়া উঠেন নাই—

"মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।"

রামপ্রসাদ ভক্তকবি। রামপ্রসাদ শ্রেষ্ঠ সাধক। রামপ্রসাদ তত্ত্বজ্ঞ মহাজন।

শ্মশান অনলে প্রিয়জনকে চিতাশয্যায় বিসর্জ্জন দিয়াও কি কখনও কোন ব্যথিত ব্যক্তি গাহিয়া উঠেন নাই,—

"বলদেখি ভাই কি হয় মেলে?"

আর রামপ্রসাদের কালী কীর্ত্তনের ন্যায়, বাৎসল্য রসের কবিতার ন্যায়, কবিতা অতি অল্পই আছে,—

"গিরিবর! আর আমি পারিনাহে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান,　　নাহি করে স্তন পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি,　　গগনে উদয় শশি,
উমা বলে ধরে দে উহারে।
আমি পারি নাহে,　　প্রবোধ দিতে উমারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আখি,　　মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে!"

কোন্ জনক জননী স্নেহের পুতুলী শিশু পুত্রকন্যার এরূপ আব্দার পূরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হন নাই! তার পর—

"আমি কহিলাম তায়　　চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে!"

অতুলনীয়! শত কবির কাব্য ভূষণ,—'ফেলিয়া মোরে মারে', এই পংক্তিটির মধ্যে বিদ্যমান। এ স্নেহের আঘাত এমন করিয়া যে কবি ফুটাইতে পারিয়াছেন তাঁহার কবিতার সমালোচনা করিবার শক্তি আমাদের কোথায়?

রামপ্রসাদের কথা শেষ করিবার আগে আজু-গোসাইর সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। আজু গোঁসাই ও রামপ্রসাদ উভয়ে বিশেষ বন্ধু ছিলেন, দুইজনে আবার বেশ প্রতিযোগিতা ছিল। কবিরঞ্জন কোন পদাবলী শ্লোক পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ বিরচিত শ্লোকদ্বারা আজু গোঁসাই তাহার উত্তর দান করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উভয়কে একত্র করিয়া সেই আমোদ উপভোগ করিতেন। কবিরঞ্জন যেমনি গাহিলেন—

"গিরীশ গৃহিণী গৌরী গোপবধূ বেশ।
কষিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস॥
সুরভির পরিবারে সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে যার বেণু॥"

আজুগোঁসাই উত্তর করিলেন,—

"না জানে পরমতত্ত্ব,　　কাঁঠালের আমসত্ত্ব
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায়রে!
তা যদি হইত,　　যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায়রে?"

কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়ে সমসাময়িক। ভারতচন্দ্রের কবিতায় কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য্য দৃষ্ট না হইলেও তাঁহার কবিতার ন্যায় সুললিত ও সুমধুর কবিতা বঙ্গসাহিত্য সমাজে অতি অল্পই আছে। ভারতচন্দ্র নিজেই গৌরব করিয়া লিখিয়াছেন,—

"ভারতের, রচিতের, অমৃতের ভার।
ভাষাগীত, সুললিত, অতুলিত সার॥"

অন্নদামঙ্গল ভারতের শ্রেষ্ঠ রচনা। অন্নদামঙ্গলের হরগৌরী রূপ বর্ণনা কি কেহ ভুলিতে পারেন?

আধ বাঘ ছাল ভাল বিরাজে,
আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে,
আধ মণিময় কিঙ্কিনী বাজে,
আধ ফণি ফণা ধরে রে!
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা,
আধ মণিময় হার উজালা,

আধ গলে দোলে গরল কালা,
আধই সুধা মাধুরী রে।
* * * *
দোঁহার আধ আধ শশী,
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী
আধই চারু কবরী রে।"

রামনিধি গুপ্ত বা নিধু বাবু অনেক প্রণয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাহা বর্ত্তমানযুগেও বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার

"তোমারই তুলনা তুমিই প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।"
"আকাশের পূর্ণ শশী সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে।"
"সৌরভে গৌরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে।"

আবার—

"সে কেনরে করে অপ্রণয় ও তার উচিত নয়।
জানি আমি তার সনে কভুত বিচ্ছেদ নয়॥
কখন কি বলেছি মানে, আজ কি তা আছে মনে।
তা বলে কি মানে মানে অভিমানে রইতে হয়॥
সখিগো আমার হয়ে, বল তারে বুঝাইয়ে।
পীরিতি করিতে গেলে সুখ দুঃখ সব সয়॥
দিনান্তে প্রাণান্ত হ'ত, একবার যদি দেখা দিত।
তবে কেন অবিরত হৃদয়-মাঝে উদয় হয়॥"

নিধু বাবুর সমকালের কয়েকজন কবি ও পাঁচালী গায়কেরও দুই একটী সঙ্গীতে প্রকৃত কবিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। হরুঠাকুর, রামরাম বসু প্রভৃতি কবি-গায়কগণের স্থানও এক সময়ে সাহিত্য সমাজে উপেক্ষণীয় ছিল না। গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গীত বঙ্গসাহিত্যের কৌস্তভ-ভূষণ,—ইহা অতিশয়োক্তি নহে, খাঁটি সত্য কথা। মধ্যযুগে পূর্ব্ব-বঙ্গের কবিত্ব সমৃদ্ধিও নেহাৎ কম ছিল না। সে সময়ে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত জয়নারায়ণ সেন, রামগতি, আনন্দময়ী প্রভৃতির কবিতাও প্রাণশক্তি বিহীন ছিল না।

আমাদের প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল। দীর্ঘ হইবার কারণ এই যে আমরা কবিতার প্রাণ যাহা বুঝিয়াছি—সে কথাটা পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার জন্যই আনুষঙ্গিকভাবে প্রাচীন প্রত্যেক কবির কবিতা হইতেই যথেচ্ছাক্রমে উদ্ধৃত করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস ঐ সকল অংশ হইতে আমাদের বাক্য সমর্থিত হইয়াছে, সৌন্দর্য্য ও আনন্দদান কবিতার প্রাণ—উহা প্রাচীন যুগের কবিরা যেমন বুঝিতেন বর্ত্তমান সময়ে তথাকথিত কবিরা তেমন বোঝেন না। আমাদের এই প্রবন্ধটী প্রথম প্রস্তাব—দ্বিতীয় প্রস্তাবে ঈশ্বরচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রির যুগের কবিগণের কার্য্যকথা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব। ত্বরতা হেতু এই প্রবন্ধে কোন কথাই তেমন করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারি নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

# মুসলমানগণের সংস্কৃত জ্ঞান।

ভারতের পারসীক-ভাষা-নিবদ্ধ ইতিহাস সমূহ পাঠকালে কখনও কখনও দেখা যায় যে, মোগল বাদশাহগণের নিদেশক্রমে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ পারসীক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস যে, আকবর বাদশাহের সভাকবি সুপ্রসিদ্ধ ফৈজীই মুসলমানগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এমনকি, Elphinstone, (১) Dow, (২) Briggs, (৩) প্রভৃতি ভারতের মুসলমান যুগের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ লেখকগণও এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। পরন্তু, মুসলমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ইসলাম ধর্ম্ম স্থাপনের অনতিকালপর হইতেই আরবে ও পারস্যে অল্পাধিক পরিমাণে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা চলিতেছিল। বোগ্দাদের প্রাচীন খালিফাগণের রাজত্বকালে এবং ভারতে মুসলমান অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীক ও আরব্য ভাষায় ভাষান্তরিত হইবার বিষয় অবগত হওয়া যায়।

সুপ্রসিদ্ধ খালিফা আল্ মামুনের রাজত্বকালকে আরব্য ভাষার স্বর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে মহম্মদ বিন্ মুসা সংস্কৃত একখানা বীজগণিত ভাষান্তরিত করেন। Colebrooke সাহেব এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। (৪) Dr, Frederic Rosen ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এই আরব্য বীজগণিত ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। (৫) খালিফা আল্ মামুনের সময়ে মিকা এবং ইব্ন্ দাহান্ সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে কতিপয় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই ব্যক্তিদ্বয় আরবপ্রবাসী ভারতবাসী ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। (৬) আল্ মামুনের সময়ে সম্পাদিত এই অনুবাদ গ্রন্থসমূহ হইতে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীত হয় যে, তৎকালে তদ্দেশে সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ মুসলমানের অসদ্ভাব ছিল না।

বর্ণিত কালেরও পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্র চরকসংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা আরব্য ভাষায় অনূদিত হওয়াতে আরবগণের মধ্যে ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি বিস্তার লাভ করিতেছিল। (৭) আরব সভ্যতার উন্মেষাবধিই চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি তাহাদের বিশেষ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়, এবং এই ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তাহাদের এতাদৃশ উৎসাহ ছিল যে, পৃথিবী-বিখ্যাত খালিফা হারুন্-র্ রসিদ মঙ্ক এবং সালি নামক দুইজন ভারবাসীকে তদীয় দেহ-চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (৮) এই মঙ্ক বিষ সম্বন্ধীয় একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীক ভাষায় অনুবাদ করেন। (৯)

খালিফা রাজত্বের আদিযুগে আরবগণ বিবিধ বিষয়ক বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আরব্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা

(১) "Faizi was the first Musalman that applied himself to the diligent study of Hindu Literature and Science."—ELPHINSTONE, *History of India* Vol. ii., p. 317.

(২) "Faizi was the only Musalman we ever heard of, who understood Shanscrita."—DOW, *Indostan*, Vol. i., pp. vi, vii.

(৩) "We have no reason to believe the Mahomedans ever studied Sanskrit. Shaik Faizy appears to be the only exception, of whom we have any account."—BRIGGS, *Ferista*, Vol. iv., p. 451.

(৪) COLEBROOKE, *Miscellaneous Essays*, Vol. ii. pp. 444—500.

(৫) *The Algebra of Mohamed Ben Musa*, edited and translated by Dr. F. ROSEN, London, 1831 (Published by the *Oriental Translation Fund.*)

(৬) *Biographical Dictionary*, L. U. K., Vol. ii., p. 242.

(৭) DIEZ, *Analecta Medica*, pp. 126—140.

(৮) *Journal of Education*, Vol. iii., p. 176; J. FORBES ROYLE, *Antiquity of Hindoo Medicine*, London, 1837, p. 64; *Oriental Magazine*, March, 1823; MAJOR DAVID PRICE, *History of Arabia*, London, 1824, Vol. ii., p. 88; *Biographical Dictionary*, L. U. K., Vol. ii. p. 300; *J. R. A. S.*, Vol. vi., p. 107; *Modern Universal History*, Vol. ii., p. 155; এতদ্ভিন্ন, D'Herbelot, Abu-l Faragii, Dietz, Reinaud, Rampoldi, Wnstenfeld, Ritter, প্রভৃতি বহু বৈদেশিক পণ্ডিত প্রণীত গ্রন্থসমূহে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।— (Vide ELLIOT, *Historians*, Vol. V. p. 572, foot note).

(৯) *Ibid.*

জননীর জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠে তাহার বহু প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই। Michael Casiri নামক জনৈক স্পেন দেশীয় পণ্ডিত হিস্পানী ভাষায় **Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis** নামক একখানা সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ১৭৬০—৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্পেন দেশের রাজধানী ম্যাড্রিড্ নগরী হইতে দুইখণ্ডে প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, উক্ত যুগে জ্যোতিষ, (১০) সঙ্গীতকলা, (১১) দ্রব্যগুণ-বোধ, (১২) প্রভৃতি বিষয়ক কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, ফলিত জ্যোতিষ,(১৩ হিন্দুধর্ম ও পৌরাণিকদের আখ্যায়িকা ( Theogony ) (১৪) হিন্দুশাস্ত্র, (১৫) জন্ম কোষ্ঠি গণনা, (১৬) আকৃতি দৃষ্টে স্বভাব নির্ণয় (Physiognomy), (১৭) সামুদ্রিক বিদ্যা,(১৮) কৃষি,(১৯) বিষ চিকিৎসা,(২০) প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থনিচয় সম্বন্ধে যে সকল পুস্তকে আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের সাহায্যের জন্য নিম্নে পাদটীকায় তাহা যথাযথরূপে উল্লিখিত হইল।

আরব ও পারস্য পরিত্যাগ করিয়া ভারতেতিহাস অন্বেষণ করিলেও এতদ্বিষয়ক বহু তথ্যই সংগৃহীত হইতে পারে। ভারতে মুসলমান অধিকার স্থাপনের অনতিকাল পরেই সুপ্রসিদ্ধ আল্ বারুণী প্রভৃত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, এবং অচিরেই উহাতে এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, তিনি সংস্কৃত হইতে নিজ মাতৃভাষায় এবং মাতৃভাষা হইতে সংস্কৃতে গ্রন্থাদি অনুবাদ করিয়াছিলেন। তদীয় গ্রন্থপাঠে (২১) অনুসন্ধিৎসু পাঠক এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

ভারতে মুসলমান অধিকারের আদিযুগে মহম্মদ বিন্ ইস্রাইল আল্ তামুখি নামক জনৈক মনীষী ভারতীয় ঋষিগণের প্রবর্তিত জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষার্থ এতদ্দেশের নানাস্থানে বহুকাল পর্য্যটন করেন। (২২) আবুল ফজল তদীয় 'আইন্-ই আকবরী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইঁহারও পূর্ব্বে আবুমাজার নামক আর একজন মুসলমান জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থ বারাণসীতে গমন করেন। (২৩) সুবিখ্যাত Leo Africanusএর গ্রন্থপাঠে ইহার চারি শতাব্দী পরে ইব্ন্-আল্ বাতিহার নামক আর একজন মুসলমানের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থ ভারত ভ্রমণের বিষয় অবগত হওয়া যায়। (২৪)

(১০) MICHAEL CASIRI, Vol. i., p. 246.

(১১) *Ibid*, p. 427.

(১২) *Ibid*, p. 401.

(১৩) J. H. HOTTINGERI, *Promptuarium*, Heidelbergæ, 1658, p. 254; REINAUD, *Aboul feda*, Paris, Vol. i., pp. 42, 46, 49.

(১৪) GILDEMEISTER, *Scriptorum Arabum de Rebus Indicis, loci et opuscula*, Bonnæ, 1838, pp. 104—119; DE GUIGNES, *Mem. de'l Academ. des Inscript.*, tom. xxvi., p. 791 et seq.

(১৫) D' HERBELOT, Arts, *Anbertkend, Ambahoumatah, Behergir*; see also *Ketab alkhafi, Ketab Roi al Hendi*, and several other articles under *Ketab*. RAMPOLDI, Vol. iv., p. 328.

(১৬) HAJI KHALFA, *Lexicon Bibliographicum et Encyclopædicum etc.*, Leipzig, 1835—58, Vol. i., p. 282; DIEZ, *Analecta Medica*, p. 118; D' HERBELOT, Art. *Cancah*.

(১৭) D' HERBELOT, *Bibliotheque orientale ou Dictionnaire universel*, tom iv., p. 725; DIEZ, *Analecta Medica*, p, 117.

(১৮) HAJI KHALFA, *Ibid*, Vol. i., p. 263.

(১৯) GILDEMEISTER, *Ibid*, ix.

(২০) DIETZ, p. 118: D' HERBELOT, *Ketab Roi al Hendi*.

(২১) AL BERUNI, *India*, Translated by C. E. SACHAU London, 1888.

(২২) MICHAEL CASIRI, *Biblotheca Arabico-Hispana Escurialensis*, Vol., p. 439

(২৩) *Ain-i-Akbari*, Vol. ii., p. 288; GILDEMEISTER, 79. "There seems no good authority for this statement of Abul Fazl."—ELLIOT, *History of India*, Vol. v., p. 573.

(২৪) HOTTINGERI, *Bibl. quadrup.* ap.; GILDEMEISTER, *Scriptt. Arab.*, p. 80; Mod. Univ. Hist., Vol. ii., p. 274; REINAUD, *Aboul feda*, Vol. i. p. 55; *Memoire*, pp. 6, 289, 316, 336.

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট ফিরোজ টোগ্‌লক্‌ কর্তৃক নগরকোট আক্রান্ত হয়। সঙ্গে তথায় গমনকালে পথিমধ্যে জ্বালামুখী তীর্থের দেববিগ্রহ দর্শন করিবার জন্ত সম্রাট তথায় গমন করেন, এবং সসম্ভ্রমে স্বহস্তে বিগ্রহের মস্তকোপরি হেমচ্ছত্র ধারণ করেন। কথিত আছে, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট সুলতান মহম্মদ শাহ্‌ বিন্‌ টোগ্‌লক্‌ শাহ্‌ও ঐ বিগ্রহকে ঐরূপ সম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন। (২৫) ফিরোজ শাহ কর্তৃক নগরকোট অধিকৃত হইলে একটি মূল্যবান্‌ সংস্কৃত পুস্তকাগার তাঁহার হস্তগত হয়। তাঁহার আদেশে মৌলানা ইজুদ্দিন্‌ খালিদ্‌খানি এই পুস্তকাগার হইতে দর্শন, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভবিষ্যবাণী সম্বন্ধীয় একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীক ভাষায় অনুবাদ করিয়া উহাকে 'দলাইল্‌-ই ফিরোজ শাহী' নাম প্রদান করেন। (২৬) এই মৌলানা নিশ্চয়ই সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, নচেৎ সম্রাট্‌ কখনও তাঁহাকে এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন না।

ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে সম্পাদিত ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় একখানা সংস্কৃত গ্রন্থের পারসীক অনুবাদ লক্ষ্ণৌ নগরীতে নবাব জালাল-উদ্দৌলার পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। (২৭) ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা মুসলমানগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ শাহ্‌ খিল্‌জির আদেশে সংস্কৃত হইতে পারসীক ভাষায় অনুদিত পশু চিকিৎসা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ লক্ষ্ণৌ রাজকীয় পাঠাগারে রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থের নাম 'কুরুরুতউ-ল্‌ মুল্‌ক্‌' এবং ইহা অধুনা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। সুশ্রুতের অধ্যাপক 'সালোতর' (?) (Salotar) নামক একজন ব্রাহ্মণ রচিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ৭৮৩ হিঃ অব্দে (১৩৮১ খৃষ্টাব্দে) পারসীক ভাষায় অনুদিত হইয়া উক্ত পুস্তক রচিত হয়। ইহার ভূমিকায় লিখিত আছে যে, "ভবিষ্যতে যাহাতে আর অবিশ্বাসী হিন্দুগণের গ্রন্থের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন না হয়; তজ্জন্য ইহা বর্ব্বর হিন্দীভাষা হইতে সুসংস্কৃত পারসীক ভাষায় অনুদিত হইল।" ইহা ৪১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১৩ লাইন করিয়া লিখিত আছে। এই গ্রন্থ একাদশ অধ্যায়ে এবং ৩০টী গর্ভাধ্যায়ে বিভক্ত। যদিও ইহা ৭৮৩ হিঃ অব্দে অনুদিত বলিয়া স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, তথাপি এই তারিখের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়; কারণ, যে সময়ে ইহা অনুবাদ হয়, তখন মাহ্‌মুদ্‌ শাহের পুত্র গিয়াস্‌-উদ্দীন মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল বলিয়া বর্ণিত গ্রন্থে উল্লিখিত আছে; অথচ, ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ৭৮৩ হিঃ অব্দে ঐ নামীয় কোন নৃপতি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। ৭৬৯ হইতে ৭৭৫ হিঃ অব্দ পর্য্যন্ত গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ আজিম শাহ্‌ বিন্‌ সেকন্দর শাহ্‌ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন। (২৮) গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ নামের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে, হয়ত ইঁহার রাজত্বকালেই বর্ণিত গ্রন্থ অনুদিত হইয়াছিল। যদি ইঁহার পরিবর্ত্তে সুলতান গিয়াস্‌-উদ্দীন টোগ্‌লককে তৎস্থলাভিষিক্ত বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বকাল উল্লিখিত তারিখ (৭৮৩ হিঃ) হইতে ৬০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে, এবং যদি মালবের নৃপতি সুলতান গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ শাহ্‌কে ধরা যায়, তবে তাহা হইতে এক শতাব্দী পরবর্ত্তী হয়। (২৯)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, 'স্যলোতর' নামক জনৈক সুশ্রুতাধ্যাপক ব্রাহ্মণ লিখিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীকে অনুদিত হইয়া 'কুরুরুত্‌-উ-ল্‌ মুল্‌ক্‌' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অনুসন্ধানে 'সালোতরি' নামক আর একখানা পশু চিকিৎসা বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের পারসীক অনুবাদের বিষয় অবগত হওয়া যায়, অথচ তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত

(২৫) SHAMS-I SIRAJ AFIF, Tarikh i Firozshahi, as in ELLIOT, *Historians*, Vol. iii., p. 318.

(২৬) ELLIOT, *History of India*, Vol. v., p. 573.

(২৭) ELLIOT, *History of India*, Vol. v., p. 573.

(২৮) মক্কার ইতিহাসে এই নৃপতির উল্লেখ আছে, এবং তদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, তৎকালে বঙ্গদেশের সহিত আরবের নানাবিষয়ে যথেষ্ট আদান প্রদান ছিল।

(২৯) ELLIOT, *History of India*, Vol. v., p. 574.

কোনরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ বাহাদুর ফিরোজ জঙ্ যখন মেবার রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন চিতোরের রাণা অমর সিংহের নিকট হইতে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ লুণ্ঠন করিয়া আনয়ন করেন। তন্মধ্যে 'সালোত্তরি' নামক এই মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া সম্রাট্ সাজাহানের রাজত্বকালে বৃদ্ধ বয়সে সৈয়দ আবদুল্লা নিজেই উহা পারসীক ভাষাতে অনুবাদ করেন। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ১৬,০০০ শ্লোকে সমাপ্ত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থ 'সালোত্তর' নামক ব্রাহ্মণ রচিত পূর্ব্ববর্ণিত গ্রন্থের দ্বিগুণাপেক্ষাও বৃহত্তর। (৩০) অভিন্ননামা গ্রন্থকারদ্বয়ের রচিত গ্রন্থদ্বয়ও অভিন্ন ছিল কি না, অধুনা তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন।

পূর্ব্বোক্ত 'জুরুরুত্ উ-ল্ মুলুক্' গ্রন্থ অনূদিত হইবার বহু পূর্ব্বে বোগ্দাদ্ নগরীতে পশু-চিকিৎসা বিষয়ক আর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আরব্য ভাষায় 'কিতাব্ উ-ল্ বাইতারাৎ, নামে অনূদিত হয়। কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। (৩১)

ইসলাম ধর্ম্ম স্থাপনের অনতিকাল পর হইতেই আরবে ও পারস্যে এবং মুসলমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে মুসলমানগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা প্রচলিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে আকবরের রাজত্বকাল হইতেই মুসলমানগণের মধ্যে সংস্কৃত জ্ঞান প্রসারের প্রতি রাজদৃষ্টি পতিত হয়। আকবর বাদশাহের উদার ধর্ম্মমত, বিদ্যোৎসাহিতা, এবং হিন্দুগণের প্রতি শ্রদ্ধা হইতেই ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়, এবং তাঁহার আদেশ ও ইচ্ছা ক্রমে বহু মুসলমান সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীক ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁহার রাজত্বের সংস্কৃত অনুবাদকগণের মধ্যে ফৈজী আবদুলকাদির বদাউনী, নকিব খাঁ, মোল্লা শাহ্ মহম্মদ, মোল্লা শিরি, সুলতান হাজি, ইব্রাহিম সির্‌হিন্দী, প্রভৃতি অনেকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (৩২)

এরূপ সন্দেহ অনেকে উপস্থিত করিয়াছেন যে, যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ হিন্দীতে ভাষান্তরিত হইয়াছে, মুসলমান অনুবাদকগণ তাহারই অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এমন কি, তবকত্-ই আকবরী প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ নিজাম্-উদ্দীন্ আহাম্মদ একস্থানে লিখিয়াছেন যে, 'আবদুল কাদির কতিপয় গ্রন্থ হিন্দী হইতে পারসীকে ভাষান্তরিত করেন।' আমাদের বোধ হয়, মুসলমানগণের ব্যবহৃত হিন্দী শব্দদ্বারা কেবল হিন্দীভাষাই বুঝাইত না। হিন্দুগণের ভাষাকেই তাহারা হিন্দী বলিত। কবিশ্রেষ্ঠ আমীর খস্রু প্রণীত 'আসিকা' এবং 'নুহ্-সিপাহ্‌র্' পুস্তকদ্বয়ে ইহার প্রমাণ আছে। প্রথম খানাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, হিন্দী অর্থ সংস্কৃত। (৩৩) বত্রিশ সিংহাসন, মহাভারত, অথর্ব্ব-বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ হিন্দীভাষায় কখনও ভাষান্তরিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না, অথচ এই সমস্ত গ্রন্থ আকবরের রাজত্বকালে পারসীক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেই ইহাদের অনুবাদ করা হইয়াছিল, ইহাই অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইলিয়ট্ সাহেবও এই মতানুবর্ত্তী। (৩৪)

সম্রাট আকবরের আদেশ ক্রমে বহু সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্য, ইতিহাস, চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি পারসীক ভাষায় অনূদিত হয়। তন্মধ্যে মহাভারতের অনুবাদই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। নিজাম্-উদ্দীন্ আহাম্মদ, আবুল্ ফজ্‌ল্, আব্দুল কাদির বদাউনী, ফিরিস্তা প্রভৃতি আকবর রাজত্বের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকগণ সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে এই অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩০) *Ibid*, p. 574, footnote.

(৩১) *Ibid*, p. 574.

(৩২) *Ibid* p. 578.

(৩৩) "In the *Ashika* and *Nuh-Siparh* of Amir Khusru there are two important passages, showing that in the former Hindi means Sanskrit."—ELLIOT, *History of India*, Vol. v., p. 571, footnote.

(৩৪) *Ibid*, p. 571.

তবকত্-ই আকবরী গ্রন্থে নিজাম্-উদ্দীন্ আহাম্মদ লিখিয়াছেন,—'রাজত্বের উনত্রিংশতম বৎসরে (৩৫) ব্রাহ্মণগণের প্রধান ঐতিহাসিক গ্রন্থ মহাভারত পারসীক ভাষায় অনুবাদ করিতে সম্রাট (আকবর) আদেশ প্রদান করেন। অনুবাদ কার্য্য সমাপ্ত হইলে উহা 'রজ্ম্-নামা' (যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ) আখ্যাপ্রাপ্ত হয়।' (৩৬) Prof. Dowson কৃত তবকতের অনুবাদে (৩৭) মহাভারতের অনুবাদকগণের নামোল্লেখ নাই। তবকত্-ই আকবরীতে এই অনুবাদ কার্য্য পূর্ব্বোদ্ধৃতরূপে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে আইন্-ই আকবরী, ফিরিস্তা, সিয়র্-উল্ মুতক্ষরীণ প্রভৃতি গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে যথাস্থানে বিবৃত হইবে। মোল্লা আবদুল-কাদির বদাউনী প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ মুন্তাখাব্-উত্ তারিখ্ গ্রন্থে মহাভারতের অনুবাদ কার্য্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে উক্ত গ্রন্থ হইতে কতকাংশ বঙ্গানুবাদ করিয়া দিলাম। (৩৮)

'এই বৎসরের (৩৯) প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর মধ্যে মহাভারতের অনুবাদ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহা ইহা হিন্দুগণের প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ। কাহারও কাহারও মতে চতুঃসহস্র, এবং সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে অশীতি সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে ভারতের অধীশ্বর কুরু ও পাণ্ডু বংশীয়গণের মহাসমর বৃত্তান্ত বর্ণন প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে বহুবিধ আখ্যায়িকা, নৈতিক চিন্তা ও উপদেশাবলী, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনা, হিন্দুজাতির বিভিন্ন বর্ণ সমূহের বৃত্তান্ত, পূজা পদ্ধতি, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

'সম্রাট মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া কতিপয় হিন্দু পণ্ডিত (৪০) একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে উহার ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিতে নিযুক্ত করিলেন। সম্রাট আকবর স্বয়ং কয়েক (Blochmaun সাহেবের অনুবাদ অনুসারে—দুই) রাত্রি ধরিয়া নকিব খাঁর নিকট মহাভারতের অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে তাহার অর্থ বুঝাইলেন, এবং তাঁহাকে পারসীক ভাষায় উহার সার সঙ্কলন করিতে আদেশ করিলেন। তৃতীয় রাত্রিতে সম্রাট আমাকে (বদাউনীকে) আহ্বান করিয়া, নকিব খাঁর সহযোগে মহাভারত অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে আমি তিন চারি মাসের মধ্যেই উহার অষ্টাদশ পর্ব্ব মধ্যে দুই পর্ব্বের অনুবাদ সম্পন্ন করিয়া সম্রাটের নিকট স্থাপন করিলাম।

অতঃপর, নকিব খাঁ, ও মোল্লাশিরি একযোগে মহাভারতের কতকাংশ এবং থানেশ্বরের সুলতান হাজি

---

(৩৫) আকবর রাজত্বের উনত্রিংশতম বৎসর ইলিয়ট সাহেবের মতে ৯৯১—৯৯২ হিঃ অব্দ। (Vide Elliot, V., p. 428.) কিন্তু বদাউনীর মতে ৯৯০ হিঃ অব্দে আকবর মহাভারতের অনুবাদের আদেশ প্রদান করেন। (Vide *Ibid*, p. 537)

(৩৬) *Tabakat-i Akbari*, as in ELLIOT, *History of India*, Vol. v., p. 429.

(৩৭) Introduction to *Tabakat-i Akbari*, by Prof. John Dowson.—ELLIOT, *History of India*, Vol. v., p. 185.

(৩৮) আবদুল কাদির বদাউনী প্রণীত মুন্তাখাব্-উত্ অথবা তারিখ্-ই বদাউনী গ্রন্থ Elliot's *History of India as told by its own Historians* নামক সুপ্রসিদ্ধ সংগ্রহ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া Sir. H. M. Elliot এবং Prof. John Dowson কর্ত্তৃক [ Vide Vd. V., Preface, P. viii ] আংশিক ভাবে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে অধ্যাপক W. H. Lawe সমগ্র মুন্তাখাব্-উত্ তারিখের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ক অংশ ইলিয়ট সাহেবের গ্রন্থে Lowe কৃত অনুবাদ হইতে আংশিকরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। Mr. H. Blochmann তৎসম্পাদিত আইন্-ই আকবরীর (ইংরেজী অনুবাদের) বোধ সৌকর্য্যার্থ মুন্তাখাব্-উত্ তারিখ হইতে বহু অংশ বিক্ষিপ্ত ভাবে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া তদীয় গ্রন্থের পাদটীকা স্বরূপে সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। মহাভারত অনুবাদ বিষয়ক অংশও তন্মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৩৯) বর্ত্তমান প্রবন্ধের ৩৫ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৪০) এই হিন্দু পণ্ডিতগণের মধ্যে এক জনের নাম 'দেবী' ছিল বলিয়া বদাউনীর গ্রন্থপাঠেই জানা যায়!—"a Brahman named Debi, who was one of the interpreters of the *Mahabharata*," etc.—W. H. LOWE, *Muntakhabu-t-Tawarikh*, 1884, Vol. ii.. p. 265.

নিজেই অপরাংশ অনুবাদ করেন। (৪১) তাঁহাদের অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন হইলে, সম্রাট্ সেক ফৈজীকে অনুবাদের লালিত্যহীন ভাষা সুখপাঠ্য গদ্য ও সুললিত পদ্যে রূপান্তরিত করিবার আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু ফৈজী মাত্র দুই পর্ব্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন। (৪২) পূর্ব্বোক্ত হাজি থানেশ্বরী এই দুই পর্ব্ব পুনঃ সঙ্কলন করেন, এবং তাঁহার স্বরচিত অংশের প্রথম সংস্করণে যে সমস্ত ত্রুটি ছিল, এবং যে সকল কথা বাদ পড়িয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার সংশোধন করেন। তিনি স্বকীয় অনুবাদ মূলের সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া যখন লিখিত একশত পৃষ্ঠা (ujz) দেখেন, এবং তাহা এতই মূলানুযায়ী হইয়াছিল যে, তাহাতে মূলের মৃত মক্ষিকার চিহ্নও বাদ পড়ে নাই। কোনও কারণ বশতঃ [ Elliot কৃত অনুবাদ অনুসারে—তাঁহার দ্বিতীয় সংস্করণ সমাপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই ] হাজি থানেশ্বরী বাকরে নির্ব্বাসিত হন, এবং এখন তিনি নিজ জন্মস্থান থানেশ্বরে আছেন।

'মহাভারতের অনুবাদ "রাজম্-নামা" নামে অভিহিত হয়, এবং যখন উহা সুস্পষ্টভাবে লিখিত ও চিত্রশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইল, তখন সম্রাট ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহ লাভার্থ আত্মীয়গণকে উহার অনুলিপি গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। সেখ আবুল্ ফজল্ এই গ্রন্থের দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এক খোত্‌বা (৪৩) (ভূমিকা) লিখিয়া দেন।' (৪৪)

মহাভারত অনুবাদের বিস্তৃত বর্ণনা বিবৃত করিয়া এখন আমরা আকবরের রাজত্বে অন্যান্য যে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ পারসীক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ প্রদান করিব।

আইন্-ই আকবরী এবং আকবরের রাজত্বকালের অন্যান্য ইতিহাসে রামায়ণ অনুবাদের উল্লেখ থাকিলেও বদাউনীর গ্রন্থেই এই অনুবাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আইন্-ই আকবরীতে আবুল্ ফজল্ মহাভারত অনুবাদকগণের যে যে নাম প্রদান করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে (৪১) নম্বর পাদটীকায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। রামায়ণ অনুবাদ সম্বন্ধেও আইন্-ই আকবরীতে লিখিত আছে :—'যে পণ্ডিতগণ মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ( অর্থাৎ, নকিব খাঁ, বদাউনী ও সেখ সুলতান থানেশ্বরী ) রামায়ণেরও পারসীক অনুবাদ করেন। ইহাও হিন্দুস্থানের একখানা অতি প্রাচীন গ্রন্থ, এবং ইহাতে রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত এবং তৎসহ বহু শিক্ষাপ্রদ দার্শনিক তথ্য বিবৃত আছে।' (৪৫)

(৪১) আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ মহাভারত অনুবাদকগণের নাম বিভিন্নরূপে প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে তাহা যথাযথরূপে বিবৃত হইল।

"The Mahabharat which belongs to the ancient books of Hindustan has been translated' from Hindi into Persian, under the superintendence of Nagib Khan, Maulana 'Aboul Quadir of Badaon, and Shaikh Sultan of T'hanisar. The book contains nearly one hundred thousand verses : His Majesty calls this ancient history ***Razmnamah***, the book of wars."—*Ain-i Akbari*, as translated by H. BLOCHMANN, Calcutta, 1873, Vol. i., p. 104.

[ আইন-ই আকবরী প্রদত্ত অনুবাদকের তালিকা, এবং Sprenger প্রদত্ত তালিকা অভিন্ন।—*Vide* SPRENGER, *Bibl.*, pp. 52, 63.

"The author of the *Siyaru-l Muta-akhkhirin* (Vol. i.) ascribes it to 'Abdu-l Kadir and Shaikh Muhammad Sultan Thanesari."— ELLIOT, *History of India*, Vol. V., p. 571, footnote.

(৪২) ফিরিস্তার উক্তি অনুসারে সমগ্র মহাভারতই ফৈজীর কর্তৃত্বাধীনে অনূদিত ও সম্পাদিত হয়।

Firishta tells us that the *Mahabharata* was translated into Persian from the *Hindi*. He ascribes the work chiefly to Faizi."—ELLIOT, History of India' Vol. v., p. 571.

(৪৩) আবুল্ ফজল্ লিখিত এই ভূমিকার উল্লেখ আইন্-ই আকবরীতেও দৃষ্ট হয়। (Vide Blochmann, Ain-i Akbari, Vol. i, p. 210. এই ভূমিকাতে মহাভারত অনুবাদকগণের নাম প্রদত্ত হয় নাই; কিন্তু, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় কতিপয় পণ্ডিত কর্তৃক উহা সম্পাদিত হয়, এইরূপ উল্লিখিত আছে। (Vide ELLIOT, V., p. 571, footnote).

(৪৪) W. H. LOWE, *Muntakhabu-t Tawarikh*, Bib. Ind. Ed., Vol. ii, pp. 329, 330.

(৪৫) BLOCHMANN, *Ain-i Akbari*, Vol. i., p. 105.

রামায়ণ অনুবাদক সম্বন্ধে আইন্-ই আকবরী এবং বদাউনীর গ্রন্থে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। বদাউনী একাকীই রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

'এই বৎসর ( ৯৯২ হিঃ ) সম্রাট আমাকে মহাভারত হইতেও শ্রেষ্ঠতর' রামায়ণের পারসীক অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। ইহাতে ২৫,০০০ শ্লোক আছে, এবং প্রত্যেকটি শ্লোক ৬৫ অক্ষর সমন্বিত। এই গ্রন্থে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। * * * * "চারি বৎসর পরিশ্রমের পর ৯৯৭ হিঃ অব্দের (৪৬) জমাদল্ আওয়াল্ মাসে আমি রামায়ণ অনুবাদ শেষ করি। সমগ্র গ্রন্থখানা পদ্যে লিখিত হইয়াছিল।' (৪৭)

সম্রাট আকবরের আদেশে অথর্ব্ববেদের পারসীক অনুবাদ হইয়াছিল। আইন্-ই আকবরীতে (৪৮) এবং বদাউনীর গ্রন্থে এই অনুবাদের উল্লেখ আছে। সম্রাট প্রথমে বদাউনীকে ইহার অনুবাদ করিতে আদেশ করেন, কিন্তু বৈদিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকাতে তিনি উহাতে অস্বীকৃত হইলে সম্রাটের আদেশে হাজি ইব্রাহিম সিরহিন্দী অথর্ব্ববেদ সন্তোষজনকরূপে অনুবাদ করেন। (৪৯) বদাউনী তদীয় গ্রন্থে ইহার যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল (৫০) :—

'এই বৎসর ( ৯৮৩ হিঃঅব্দ, অথবা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ ) দক্ষিণ দেশ প্রত্যাগত ভগবান (Bhagawan ) নামক জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট হিন্দুগণের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ব্বেদের একতম অথর্ব্ববেদ অনুবাদ করিতে তাঁহাকে আদেশ করেন। এই গ্রন্থের কতিপয় সূক্ত ইসলাম ধর্ম্মের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। অথর্ব্ববেদ হিন্দী হইতে (৫১) পারসীকে অনুবাদ করিতে আমি ( বদাউনী ) নিযুক্ত হইয়াছিলাম। অনুবাদকালে ইহার বহুঅংশের অর্থবোধ না হওয়াতে, এবং সেক ভগবানও তাহার ব্যাখ্যাকার্য্যে অক্ষম হওয়াতে আমি সম্রাটকে ইহা জ্ঞাপন করিলাম। অতঃপর তিনি সেক ফৈজীকে এবং হাজি ইব্রাহিমকে অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ফৈজী ইচ্ছা থাকিলেও এতদ্বিষয়ে কিছু লিখিলেন না।'৫২

বদাউনী যদিও বৈদিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন না হওয়াতে অথর্ব্ববেদ অনুবাদে সক্ষম হন নাই, তথাপি রামায়ণ, মহাভারতের ন্যায় বিপুল গ্রন্থ অনুবাদে তাঁহার কৃতিত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি বত্রিশ-সিংহাসন, রাজতরঙ্গিণী, প্রভৃতি আরও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীকে অনুবাদ করিয়াছিলেন; নিম্নে তাহা যথাযথরূপে বিবৃত হইতেছে। আকবরের রাজত্বের সংস্কৃতজ্ঞ মুসলমানগণের মধ্যে বদাউনী একজন প্রধানতম ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।

---

(৪৬) ইলিয়ট সাহেবের অনুবাদ অনুসারে ৯৯৯ হিজরী অব্দ। —*Vide* ELLIOT, *History of India*, Vol. v., p. 539.

(৪৭) W. H. LOWE, *Muntakhabu-t Tawarikh*, Bib. Ind. Ed., Vol. ii., pp. 347, 378.

(৪৮) "Haji Ibrahim of Sarhind translated into Persian the *At'harban*, which, according to the Hindus, is *one* of the four divine books."— BLOCHMANN, *Ain-i Akbari*, Vol. I., p. 105.

(৪৯) ELLIOT, *History of India*, Vol. v., p. 571.

(৫০) W. H. LOWE, *Muntakhabu-t Tawarikh*, Vol. ii., pp. 216, 424.

(৫১) অথর্ব্ববেদ হিন্দীতে কখনও অনূদিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। সেক ভগবান বদাউনীর বোধসৌকর্য্যার্থ উহ হিন্দীতে ব্যাখ্যা করিতেন, এবং বদাউনী তদবলম্বনে পারসীকে অনুবাদ করিতেন, এইরূপই অনুমিত হয়।

(৫২) ফৈজী হিন্দুর ছদ্মবেশে বারাণসীর জনৈক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট বেদ অধ্যয়ন্ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইলে ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু, ফৈজী কখনও বেদ অনুবাদ করিবেন না প্রতিজ্ঞা হওয়ায় তিনি আত্মহত্যা হইতে বিরত হন। গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাতি স্মরণ করিয়াই বোধ হয় ফৈজী সম্রাটের আদেশ এবং নিজ ইচ্ছা সত্ত্বেও অথর্ব্ববেদ অনুবাদ হইতে বিরত হন। প্রবন্ধ শেষে ফৈজীর আখ্যায়িকা দ্রষ্টব্য।

# প্রবাস-স্মৃতি।

সাঁওতাল পরগণার স্বভাবসুন্দর ক্রোড়ে একটি অখ্যাত পল্লীগ্রামে আমরা গুটিকয়েক প্রাণী বাসা লইয়াছিলাম,—উদ্দেশ্য, নষ্টস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার। হতভাগ্য বঙ্গদেশের বহু ম্যালেরিয়াশীর্ণ অধিবাসী প্লীহা-স্ফীত উদরের পরিধি কমাইবার নিমিত্ত প্রতিবৎসর এ অঞ্চলে আগমন করিয়া থাকেন।

তখন ফাল্গুন মাস। বসন্তের মিঠে হাওয়া দিয়াছে। শীতের কয়মাস পাহাড়ের গাছপালাগুলি ম্লান হইয়া যাওয়ায় ছোট ছোট পাহাড়গুলি যেন বিশীর্ণ কঙ্কালের মত দেখা গিয়াছিল। বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আবার সবুজ অরণ্যানীতে পাহাড়গুলি ভরিয়া উঠিয়াছে। শাল ও মহুয়া গাছে নবপত্রোদ্গম হইয়াছে। অজ্ঞাত-কুলশীল অসংখ্য বন্যবিহঙ্গের কাকলীতে বনভূমি মুখরিত।

আমরা গিয়াছিলাম বায়ুসেবন করিতে, সুতরাং হাতে কোনই কাজ ছিল না। হাতে কাজ না থাকিলে সাধারণতঃ নানাপ্রকার অদ্ভুত কল্পনা মনকে পাইয়া বসে। আমরা সবশুদ্ধ সাত আট জন একদিন স্থির করিয়াছিলাম জনশূন্য শ্বাপদসঙ্কুল পাহাড়ের উপর জ্যোৎস্নালোকে সারারাত্রি কাটাইয়া দিব, কিন্তু মাতুল মহাশয়ের রক্তচক্ষুর ভয়ে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসী হই নাই। আর এক দিন স্থির করিয়াছিলাম, হাঁটিয়া দেওঘর যাইব। আমাদের আবাস হইতে দেওঘর প্রায় ত্রিশ মাইল। ম্যালেরিয়াশীর্ণ স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিগণের এই সকল উৎকট কল্পনা অবশ্য অভিভাবক-গণ বেশী দূর অগ্রসর হইতে দেন নাই।

সেদিন এমনি কি একটা অদ্ভুতরকমের আয়োজনে আমরা জনকয়েক ব্যাপৃত ছিলাম। এমন সময়ে মামা আসিয়া জানাইয়া দিলেন যে দশমাইল দূরে একটা নূতন অভ্রের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তিনি একঘণ্টা পরেই তাহা দেখিতে যাইতেছেন। কথাটা শুনিয়া আমাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল, সকলে ভয়ে ভয়ে জানাইলাম যে, আমরাও তাঁহার অনুগমনের প্রয়াসী। বিস্তর সাধ্যসাধনার পর মামা জানাইয়া দিলেন যে, আমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারি কিন্তু কোন প্রকার অমঙ্গল বা অশুভকর পরিণামের জন্য তিনি দায়ী হইবেন না।

উৎসাহে আমরা অধীর হইয়া উঠিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে স্নানাহার শেষ হইয়া গেল। তারপর যাত্রার আয়োজন। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে ভৃত্যবর্গ প্রমাদ গণিল, পথচারী পান্থগণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। পার্ব্বত্যপথ দিয়া দশ মাইল হাঁটিয়া যাওয়া ও দশ মাইল ফিরিয়া আসা—এ দস্তুর মত অ্যাড্‌ভেঞ্চার! অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আঁটসাঁট জামাকাপড়ে সজ্জিত হইয়া আমরা সপ্তরথী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলাম। প্রত্যেকের হস্তে এক একটি সূক্ষ্মাগ্রমুখ পর্ব্বতা-রোহণের লাঠি,—কারণ, কত চড়াই উৎরাই করিতে হইবে। *

কিয়ৎকাল পরে মাতুল মহাশয়ও আমাদের অভি-ভাবক স্থানীয় আরও তিনটি ভদ্রলোক প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। আমরা যাত্রী হইলাম দশজন। আমাদের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা বর্শা হস্তে একটা সাঁওতাল শীকারী পথপ্রদর্শকরূপে চলিল।

আমরা যখন রওনা হইলাম তখন বেলা আটটা। ফিরিতে রাত্রি হইবে মনে করিয়া প্রচুর পরিমাণে লুচী, তরকারী ও হালুয়া সঙ্গে লওয়া হইল।

প্রভাত সূর্য্যের নির্ম্মল কিরণধারায় চারিদিক ঝলমল করিতেছিল। নববসন্তের মদির বায়ুহিল্লোল অঙ্গে অঙ্গে আবেশের রোমাঞ্চ তুলিয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিতেছিল। দু'ধারে নবপল্লবমন্ডিত তরুবীথি, শ্যামায়মান অরণ্যানী বন্যকুসুমের সুগন্ধে আমোদিত। কোথাও বা কঙ্করময় বারিহীন নদী—কেমন যেন হা হা করিতেছে, মাঝখানে শুধু রজতসূত্রবৎ একটি ক্ষীণ-স্রোত প্রবহমান। এখানে সেখানে পল্লীবালকগণ খেলা-ধূলায় মত্ত হইয়াছিল, অকস্মাৎ এতগুলি 'বঙ্গালে

* 'উত্তরাপথ ভ্রমণ'-কারী 'ভবঘুরে' মহাশয় হয়ত হাসিবেন, এজন্য পুনরুল্লেখ দরকার যে আমরা তখন সকলেই ম্যালেরিয়া রোগী।—লেখক।

বাবু'র সমাগম দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। কোথাও বা পল্লীবধূ শিরস্থিত জলপূর্ণ কলসী হস্তদ্বারা স্পর্শমাত্র না করিয়া ধীরমন্থর পদক্ষেপে ছায়া-শীতল পথ বাহিয়া গৃহে ফিরিতেছিল।

ক্রমে আমরা গ্রাম ছাড়াইয়া অরণ্য ও পার্ব্বত্য ভূমিতে পৌঁছিলাম। চারিদিক নির্জ্জন। ছায়ানিবিড় বনপ্রদেশ নানাজাতীয় পক্ষীর কলকূজনে মুখরিত। মাঝে মাঝে দু'একটা খরগোস ঝোপের আড়াল হইতে ছুটিয়া পলাইতেছিল। সঙ্গীতপ্রিয় ননী বাবু গুণ্ গুণ করিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন, আমরা সমতালে পা' ফেলিয়া তাল দিতে লাগিলাম।

কিছুকাল পরেই বৃক্ষবর্জ্জিত প্রকাণ্ড প্রান্তর, তৎপরেই পাহাড়ের চড়াই ও উৎড়াই। এদিকে সূর্য্যের তাপ প্রখর হইতে প্রখরতর বোধ হইতেছিল। প্রচুর ঘর্ম্মে পরিধেয় জামাকাপড় সিক্ত হইয়া গেল, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। কিন্তু মুখে কাহারো কিছু বলিবার জো ছিল না, কারণ আমাদের অগ্রগামী মাতুল মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কিছুই বলিতেছিলেন না।

যখন বেলা প্রায় ১২টা তখন আর সহ্য হইল না। ইতিপূর্ব্বে আমরা দুই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও জল মিলে নাই। তৃষ্ণায় তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঊর্দ্ধে সূর্য্যদেব নিরুদ্বেগে অগ্নিবর্ষণ করিতেছিলেন, নিম্নে প্রস্তর ও কঙ্করময় পথ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত। অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গ সহচর সাঁওতালটাকে ক্রমাগত ধমকাইতে-ছিলেন,—"কোথায় লইয়া আসিলি, হতভাগা? প্রাণে মারিবি নাকি? টাকা দিতেছি, এক কলসী জল লইয়া আয়।"—সে বেচারা নির্ব্বিকারচিত্তে কেবলি বলি-তেছিল,—"হুজুর, এই আর এক ক্রোশ গেলেই জল পাইবেন।"

—এক ক্রোশ!—আর এক পা'ও চলা অসম্ভব।—আমি একটা বাঁশঝোপের ছায়ায় বসিয়া পড়িলাম। ননী বাবু পূর্ব্বেই সেখানে 'উবু' হইয়া পড়িয়া 'খাবি' খাইতেছিল। বনবিহারী বনবিহারে ক্লান্ত হইয়া করুণ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। মুল-কায় কান্তি বাবু (ইনি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত নহেন) পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পায়ে ফোস্কা, গায়ে ঘর্ম্মের নির্ঝরধারা; চাহিয়া দেখিলাম তিনি নগ্নপদে ও নগ্ন দেহে জুতা ও জামা হাতে লইয়া খঞ্জগতিতে আসি-তেছেন। আমরা সপ্তরথী যুদ্ধে আহত বীরের মত সেই জনহীন প্রান্তরে পতিত হইয়া মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। মাতুল মহাশয় চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"নাঃ, চারিদিকে কোথাও জলের চিহ্ন নাই, চার মাইলের মধ্যে কোন বস্তিও নাই।"—শুনিয়া ননী বাবু কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল,—'তবে কি হইবে? উপায় কি?'—উপায় যে কি বলিতে না পারিয়া সকলেই নিস্তব্ধ রহিল।

কীর্ত্তি বাবুর পকেটে 'লবঙ্গ' ছিল, সকলকে ভাগ করিয়া দিয়া বলিলেন,—'মুখে রাখ, তৃষ্ণা কমিবে।'—তাহা মুখে দিতে জিহ্বার সহিত আটকাইয়া গেল, 'থু থু' করিয়া ফেলিয়া দিলাম।

তখন মনে পড়িল মরুভূমির কথা, মরীচিকার কথা, তৃষ্ণাতুর বাদশাহ হুমায়ুনের কথা,—আরো কতকি, আজ আর সব মনে নাই।

সাঁওতালটা ইতি মধ্যে কোথায় গিয়াছিল, হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিল আধমাইল দূরে একটা কূপ আছে। সকলে লাফাইয়া উঠিলাম, প্রাণের মায়ায় ছুটিয়া চলিলাম, কান্তিবাবু মুক্তকচ্ছ অবস্থায় জুতা জামা হাতে লইয়া কোন প্রকারে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিলেন।

সকলে হাঁপাইতে হাঁপাইতে যাইয়া দেখি—সত্যই একটা কূয়া, কিন্তু তাহা এত গভীর যে দড়ী ও ঘটী ছাড়া জল তোলা অসম্ভব। সকলে কূয়ার ধারে উপুড় হইয়া সুদূর নিম্নস্থিত স্বচ্ছ জলরাশি লোলুপদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু কিরূপে জল তোলা যাইতে পারে কেহই স্থির করিতে পারিল না। কান্তিবাবু একবার বলিলেন,—'সকলের চাদর একত্র করিয়া আমার পায়ে বাঁধিয়া আমাকে ফেলিয়া দাও।'—কথাটা শুনিয়া সেই দুঃখেও সকলের হাসি পাইল।

এমন সময় দেখা গেল একটা সাঁওতাল দূরে একটা বাঁকা মাথায় লইয়া যাইতেছে। আমাদের 'গাইড'

দৌড়িয়া যাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিল। সে মুদীর ব্যবসায় করে, তাহার ঝাঁকার মধ্যে নুণ, আলু, লঙ্কা ও একহাঁড়ী গুড়। অবিলম্বে তাহার ঝাঁকা নামাইয়া গুড়ের হাঁড়ী হইতে গুড় ঢালিয়া ফেলা হইল। লোকটা হাঁউমাউ করিয়া উঠিতেই কীর্ত্তিবাবু তাহাকে দুইটা টাকা ফেলিয়া দিলেন।

তখন সেই হাঁড়ীর গলায় চাদর বাঁধিয়া জল তোলা হইল ও তাহা মন্থনোত্থিত অমৃতের মত আকণ্ঠ পূরিয়া সকলে পান করিলাম। কি সে তৃপ্তি, কি সে মুক্তি—তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তখন গুড়দ্বারা সরবৎ করা হইল এবং লুচী প্রভৃতিরও কিয়দংশের সদ্ব্যবহার হইল।

তৃষ্ণা ও শ্রান্তি দূর হইলে আবার সকলের মুখে হাসি ফুটিল। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের দুর্দ্দশা যদিও আমাদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম হয় নাই তবুও তাঁহারা আমাদের প্রথমে অসহিষ্ণুতার কথা তুলিয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন।

খঞ্জগতি কান্তিবাবুর উপর অনুকম্পা বশতঃ পদক্ষেপ ধীরতর করিয়াও আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অভ্রের খনিতে যাইয়া পৌঁছিলাম। খনিটিতে তখনও ভাল করিয়া কাজ আরম্ভ হয় নাই। চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম অনেক স্থান গভীর করিয়া খনন করা হইয়াছে, স্থানে স্থানে অভ্ররাশি পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। মাটির রং লাল; অনেক স্থলেই মাটির পরিবর্ত্তে শুধুই অভ্রের স্তর, টানিলে উজ্জ্বল ও পরিষ্কার এক একটি স্তর উঠিয়া আসে। সেখানে লোকজন কেহই ছিল না, অনুসন্ধানে জানিলাম তাহারা তখন 'ক্যাম্পে' বিশ্রামার্থ গিয়াছে।

দেখিবার মত তেমন কিছুই ছিল না। সকলেরই মুখে একটা নিরুৎসাহের ভাব দেখা গেল। প্রকাণ্ড একটা বেলগাছের ছায়ায় সকলে উপবেশন করিলাম। অদূরে সাঁওতাল পল্লী, গাইডের সাহায্যে এবার যথেষ্ট জল ও কিঞ্চিৎ মহিষ দুগ্ধ মিলিল। কান্তিবাবু কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া দুগ্ধটুকু নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। মহিষ-দুগ্ধের প্রতি অপর কাহারও প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু কান্তিবাবুর নিকট বর্ণসামঞ্জস্যই যথেষ্ট। যথাসময়ে লুচী তরকারীর স্তূপ অবলীলাক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল, অর্দ্ধপক্ক কতিপয় বিল্বফলও সদ্ব্যবহারে নিয়োজিত হইল।

বেলা প্রায় চারিটার সময় প্রত্যাবর্ত্তনের সারা পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে কেহ কেহ কিঞ্চিৎ নিদ্রা উপভোগ করিয়া লইয়াছেন, আমি ও ননীবাবু কীর্ত্তি বাবুর লজঞ্চুসের ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া অদূরে তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া সঙ্গীতানুশীলনে ব্যাপৃত ছিলাম।

প্রাতঃকালের অতিরিক্ত ক্লান্তির পর একটু আয়েস করায় সকলেই একটু অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং ফিরিবার পথে আলস্যজড়িত মন্থর পাদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিলাম। আমরা 'ঘরমুখো বাঙ্গালী' বলিয়াই হউক কিম্বা বাসন্তী সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলের স্পর্শেই হউক সকলেই খুব উৎফুল্ল বোধ করিতেছিলাম। ননীবাবু গাহিতে লাগিল,—'বেলা গেল তোমার পথ পানে চেয়ে'। অগ্রগামী ব্যক্তিগণও মাঝে মাঝে বাহবা দিতে লাগিলেন।

সহসা সাঁওতালটা বলিয়া উঠিল,—'দেখিয়ে বাবু দেখিয়ে'! চাহিয়া দেখি অদূরে তৃণগুল্মের মধ্য দিয়া দুইটি হরিণশিশু ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। নিমেষের মধ্যে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। কিছুকালের মধ্যেই প্রতিপদের চাঁদ তরুবীথির অন্তরালে হাসিয়া উঠিল। 'ফাল্গুনী চাঁদের জ্যোৎস্না-জোয়ারে' চারিদিক প্লাবিত হইয়া গেল। আশে পাশে মৃদু মর্ম্মর তুলিয়া ঝির ঝির করিয়া 'দখিণা' বহিতেছিল। দূরে দূরে পাহাড় ও অরণ্যানী সেই শুভ্র আলোকসাগরের মধ্যে দ্বীপচিহ্নের মত প্রতিয়মান হইতেছিল। আমাদের সম্মুখে আকাশের নীল সমুদ্রে বাসন্তী জ্যোৎস্নার রজত-নির্ঝর, নির্ণিমেষনেত্রে তাকাইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলাম। ননীবাবু গাহিয়া উঠিল,—'ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম, অপূর্ব্ব শোভাময় ভবজলধির পার—জ্যোতির্ম্ময়।'

এমন সময় হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়ার সহিত গোলাপ ফুলের সুগন্ধ আমাদিগকে বিহ্বল করিয়া দিল,—মনে হইল যেন অকস্মাৎ এক ঝাঁক জ্যোৎস্না-বিহারিণী পরীর দল তাহাদের সুগন্ধবাসিত পক্ষ সঞ্চালন করিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া গেল। সম্মুখে প্রায় এক মাইল স্থানব্যাপী গোলাপের বাগান, জনৈক ভদ্রলোক গোলাপের ব্যবসায় করিয়া থাকেন। গাইড্ আমাদিগকে ভিন্নপথে লইয়া আসিয়াছে।

সে এক বাস্তব স্বপ্ন! চারিদিকের দৃশ্য—যেন একখানি কবিতা! দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে অসংখ্য গোলাপের ক্ষেত, গাছগুলি ফুলভরে অবনত। কত বর্ণের, কত আকারের সংখ্যাহীন পুষ্পরাশি বায়ু-সঞ্চারে মৃদু মৃদু আন্দোলিত। ঊর্দ্ধে তরল জ্যোৎস্নার অনন্ত প্লাবন, নিম্নে ধরণীর অপরূপ বাসক-শয্যা। বাতাশ যেন সে সুগন্ধের গুরুভার বহন করিতে না পারিয়া পাগল হইয়া উঠিতেছিল। এক একবার মনে হইতেছিল যেন আরব্যরজনীর স্বপ্নের মত অজ্ঞাতসারে পারস্যের বসোরা-বাগে নীত হইয়াছি। গুলাব, হেনা, বুলবুল, মদিরা ও মেহেদিরঞ্জিত কোমলকরপল্লবের সহস্র কবিকল্পনা অন্তরের মধ্যে একটা অপরূপ আবেশের সৃষ্টি করিল। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে বাসন্তী হাওয়ার মৃদুহিল্লোল গুঞ্জন তুলিয়া বহিয়া যাইতেছিল। দূরে একটা পাখী ক্রমাগত ডাকিতেছিল,—'বউ কথা কও'। হতভাগ্য বিরহীর সেই কাতর মিনতি নিথর জ্যোৎস্নাপ্রবাহে ঊর্ম্মিচাঞ্চল্য তুলিতেছিল। ননী বাবু গাহিয়া উঠিল,—

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী,<br>
সখি, জাগো জাগো জাগো!<br>
মেলি রাগ-অলস আঁখি<br>
সখি, জাগো জাগো জাগো!<br>
আজি চঞ্চল এ নিশীথে<br>
জাগো ফাল্গুন-গুণ-গীতে,<br>
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে!<br>
মম নন্দন-অটবীতে<br>
পিক মুহু মুহু ওঠে গাহি,—<br>
সখি, জাগো জাগো জাগো!"

উচ্ছ্বসিত সুধাস্বরে নৈশ আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল। আমরা তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলাম। এক একবার মনে হইতে লাগিল, বুঝিবা এ স্বপ্ন! বাস্তবিক, কল্পনা যেখানে শরীরিণী, ভাবনা ও বাস্তবে যেখানে প্রভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে সেখানে মানুষের সহজ দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে স্বভাবতঃই একটু ইতস্ততঃ করিতে হয়। সঙ্গীত-ঝঙ্কৃত, জ্যোস্না-বিহ্বল অনন্ত নীলাকাশও প্রস্ফুট কুসুমদামের সুগন্ধে ভরপুর দিগন্ত বিস্তৃত গোলাপক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেবলই মনে হইতেছিল—সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যই বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণ, বাহিরের অনন্ত বৈচিত্র্য শুধু তাহারই বহির্বিকাশ মাত্র। সেই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর ভাষাহীন আনন্দতরঙ্গের অভিঘাতচাঞ্চল্য বক্ষে লইয়া যখন ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলাম তখন প্রভাতের অবসাদ-স্মৃতির রেখামাত্রও মনে ছিল না।

গভীর রাত্রিতে ক্লান্তদেহ শয্যায় প্রসারিত করিয়া তন্দ্রার হিন্দোলায় দোল খাইতে খাইতে দিবসের লাভ ক্ষতির অঙ্ক কসিবার আর সময় হয় নাই। প্রাণ তখন আবেশে ভরপুর, মন তখন নেশায় বিহ্বল।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ এম্, এ।

# রায় হরিচরণ শর্ম্মা বাহাদুর।

## পুরুষকারের পরিচয়

ভাগ্য দেবতার আশীর্ব্বাদে হরিচরণের পুরুষকার পুরস্কৃত হইল—তিনি অর্থ ও সম্মান, উভয়ই লাভ করিলেন। কিন্তু ধন-মানের গরিমায় আত্মহারা হওয়া তাঁহার স্বভাব ছিল না। একদিকে তাঁহার অসীম [illegible], অপরদিকে তাঁহার জ্ঞানলাভের পন্থা শৈশবে যে কত সঙ্কীর্ণ ছিল সেই স্মৃতি, উভয়ে মিশিয়া তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগ্রত করিয়া তুলিল। সে কর্ত্তব্য—তাঁহার দেশের বালকদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার উপায় চিন্তা।

কাছাড়ে শিক্ষার অবস্থা তখন বড় শোচনীয় ছিল। ১৮৫৭ অব্দ পর্য্যন্ত কাছাড়ে একটি পাঠশালাও ছিল না। ১৮৬০ অব্দে সমস্ত জিলায় একটি মাত্র পাঠশালা ছিল, তার ছাত্রসংখ্যা ১৩। ডেপুটিকমিশনর সাহেব প্রস্তাব করিলেন, মাসিক দুইটি টাকা করিয়া চাঁদা তুলিতে পারিলে বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে। তখন শিলচরের উকিল, মোক্তার, আম্‌লা, সকল মিলিয়া দরখাস্ত করিলেন—মাসিক এত চাঁদা উঠাইয়া স্কুল চালান অসম্ভব; সরকার বাহাদুর সাকুল্য ব্যয় ভার না নিলে কিছুই হইবে না। শিক্ষার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া হরিচরণ ইহা সংস্কার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮৬৫ ইংরাজীতে তাঁহার যত্নে একটি শিক্ষাসমিতি গঠিত হয়। দেশের বালক বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার পথ এই সমিতির সাধনায় অচিরেই উন্মুক্ত হইয়া গেল।

১৮৬৮ ইংরাজীতে ব্যরিসিথ কোম্পানি ঋণদায়ে ফেইল পড়িয়া যায়; বাগিচা নীলাম হইয়া যায়; সেই সঙ্গে হরিচরণের অংশও সমূলে নষ্ট হয়। অগত্যা তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসেন। তিনি নিজের অংশের জন্য আদালত করিয়াছিলেন, এবং বাগিচার খরচের ছ আনা অংশ দিলে নিজের ছ আনা অংশের অধিকার ফিরিয়া পাইবেন, এরূপ ডিক্রীও হইয়াছিল। কিন্তু একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় খরচের অংশ পাঁচ হাজার টাকা বাহির করিয়া দেওয়া সমীচীন মনে করিলেন না।

১৮৬৯ ইংরাজীর ১০ই জানুয়ারী কাছাড়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। তেমন ভূমিকম্প এ অঞ্চলে আর কখনো হয় নাই। ১৮৯৭ ইংরাজীর ভূমিকম্পের প্রসার ছিল বেশী, এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বহু দালানকোঠা ভূমিশায়ী হইয়াছিল। ১৮৬৯ ইংরাজীতে কাছাড়ে দালানকোঠা বেশী কিছু ছিল না; কিন্তু যা ছিল,—দারিদ্র্যের কুটীর, কৃষকের মাঠ, পাহাড়তলীর বাজার, প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল কাছাড়ী রাজাদের কীর্ত্তিচিহ্ন—প্রাচ্য স্থাপত্যের নিদর্শন সমস্তই ধ্বংস হইয়াছিল। আর ধ্বংস হইয়াছিল মানুষের সুখশান্তি। সাতদিন ভরিয়া পাগলের মত ছুটাছুটি! কারো ভাঁড়ার ভাঙ্গিয়া ধান পড়িয়াছে; কারো ক্ষেতের সোণা বালি উঠিয়া ডুবিয়া গিয়াছে, কারো ভিটা খালি করিয়া ঘরদরজা আঙ্গিনায় শয়ন করিয়াছে! কারো পুকুর ভরিয়া মাঠ, কারো উঠান ফাটিয়া নদী! মাটিতে কম্পন—বাতাসে গন্ধকের গন্ধ। মানুষের সোয়াস্তি কোথায়? হরিচরণ এই সাতদিন ভরিয়া বিপন্নের সেবা করিলেন। ভগবান তাঁহার মস্তিষ্কে শক্তি দিয়াছিলেন, শরীরে বল দিয়াছিলেন—তিনি তাহা সার্থক করিলেন। সংসারে বহুলোক বিধাতার অমূল্য দানগুলিকে অপব্যবহারের দ্বারা অপমানিত করিয়া তুলে। কিন্তু হরিচরণের প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। সার্থকতার মহত্ত্ব দেখাইবেন বলিয়াই সর্ব্বমঙ্গলময় তাঁহাকে শৈশব হইতে নানা দুঃখ বিপত্তির ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। শৈশবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষেরকালে দরিদ্র হরিচরণের যে শিক্ষা লাভ হইয়াছিল, আজ ৩৭ বছর পর দরিদ্রপালক হরিচরণের সে শিক্ষার প্রয়োগ হইল। অনাহারে অনিদ্রায় তিনি দ্বারে দ্বারে ভগবানের অভয়বাণীর মত ঘুরিতে লাগিলেন—তাঁহার কঠোর পরিশ্রমের ফলে বহু বিপন্নের ধন প্রাণ রক্ষা পাইল।

### লুসাই প্রসঙ্গ।

এবার তাঁহার পৌরুষের শেষ পরীক্ষা। কেন্দ্র লুসাই,

বিষয় লুসাই যুদ্ধ। কিন্তু তার আগে লুসাইদের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি।

পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম; উত্তরে কাছাড় ও মণিপুর, দক্ষিণে আরাকান;—মধ্যে কুঞ্চিত-কুন্তলা নির্ঝরজড়িতা বনাবগুণ্ঠিতা শৈলভূমি—নাম লুসাই, আয়তন ১০,০০০ বর্গমাইলেরও উপর।

এই দেশের অধিবাসীদের নামও লুসাই।* আর লুসাই এবং এদিককার সকল পার্ব্বত্য জাতিকেই শ্রীহট্টে ও কাছাড়ে "কুকী" বলা হইয়া থাকে।

এই পার্ব্বত্য জাতি উত্তর দক্ষিণে নানা শাখায় বিভক্ত ছিল। সর্ব্বোত্তরে কাছাড় ও মণিপুরের সীমান্তে ছিল পুরাণ কুকী—বিটে ও রাঙ্খোল। ইহারাই সর্ব্বপ্রথমে কাছাড়ে প্রবেশ করে। ইহাদের দক্ষিণে ছিল থৈড়ু ও চাংসেন, তার দক্ষিণে লুসেই, তার দক্ষিণে পো। ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে ঠেলা খাইয়া দুর্দ্দান্ত পোজাতি লুসেইদের উপর ধাওয়া করে। লুসেই ধাক্কা খাইয়া থৈড়ুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং থৈড়ুর আক্রমণে কুকিরা কাছাড়ে গিয়া আশ্রয় লয়। এইরূপে পার্ব্বত্য জাতির সংঘর্ষে বরাকের বাম তীরের উর্ব্বর ভূমি জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়া যায়। এখনো দূর লুসাই সীমান্তে পার্ব্বত্যনদীর পাশে পাশে বিলুপ্ত জনপদের সমৃদ্ধি চিহ্ন অতীত জীবনের স্মৃতির মত পড়িয়া আছে।

এই পরিত্যক্ত বনদেশ তখন পার্ব্বত্য জাতির মৃগয়া ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তার পর বৃটিশ শাসনে জনবসতি দক্ষিণদিকে অতি দ্রুত বিস্তৃত হইতে লাগিল। জঙ্গল সব আবাদ হইয়া যাইতে লাগিল। এবং সর্ব্বশেষে যখন চা'র আবিষ্কার হইল, ও অপর্য্যাপ্ত লোভের প্রলোভনে বাগানের পর বাগান পত্তন হইয়া ধলেশ্বরীও সোনাই উপকূল পর্য্যন্ত সব বনভূমি আবাদ হইয়া গেল, লুসাইরা তখন আর উদাসীন থাকিতে পারিল না। মৃগয়ার ক্ষেত্র নিঃশেষে অধিকৃত এবং মৃগয়ার আনন্দ অপহৃত দেখিয়া তাহাদের বিজাতীয় ক্রোধ পর্ব্বত-বহ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল। তাহাদের প্রধান লক্ষ্যই হইল এই সব চা বাগান।* আর তাহাদের ক্রোধের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল কুকীদের মধ্যে যারা স্বতন্ত্র হইয়া বৃটিশ শাসনে আশ্রয় নিয়াছিল। সুতরাং এ উভয়ের বিরুদ্ধেই তারা মহাক্রোধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

লুণ্ঠনই এই দুর্দ্দান্ত জাতির যুদ্ধ নীতি। অতর্কিত ভাবে শেষ রাত্রে তাহারা শত্রুর গ্রাম আক্রমণ করিয়া হত্যায়, লুণ্ঠনে, অগ্নিমুখে আপন বিজয় বার্ত্তা ঘোষণা করিত, তার পর যত গুলি পারে বন্দী ধরিয়া তাহাদের মাথায় লুণ্ঠিত মাল চাপাইয়া দিয়া বাড়ীমুখে ছুটিত। হত শত্রুর মাথাগুলি কাটিয়া আনিতে তাহারা ভুলিত না; এই মাথা গুলি বাঁশের মাথায় চড়াইয়া তার দ্বারা নগর সাজান হইত! বন্দী ধরিবার সময় কেবল সবল ব্যক্তিদেরই তাহারা পছন্দ করিত কেননা উহারা ভারী মোট বহিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারিত। যে সব বন্দী পথিমধ্যে ক্লান্ত হইয়া পড়িত, বা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পা চালাইয়া না যাইতে পারিত, কুকীর বর্ষাঘাতে তাহাদের জীবনলীলা পথেই অবসান হইয়া যাইত। সর্দ্দারের যদি ছোট ছোট ছেলে থাকিত, হত্যাকাণ্ডে তাহাদের হাত পাকাইবার জন্য কয়েকটি করিয়া বন্দী ধরিয়া নেওয়া হইত। বন্দীদের কেহ কেহ মৃত সর্দ্দারদের সঙ্গে কবরে আশ্রয় পাইত, কেহ কেহ দুইটি বন্দুকের বিনিময়ে ক্রীতদাস রূপে ব্রহ্মদেশে বিক্রীত হইত।

এই লুণ্ঠন কার্য্য দ্বারাই তাহারা শত্রুরাজ্য জয় করে। লুঠ করিতে গিয়া যদি কোন গ্রামকে সতর্ক দেখিয়া তাহারা ফিরিয়া আসে, কুকী যুদ্ধ শাস্ত্রে তাহাকে ভীরুতা বলে না।

---

* লুসাই বলিতে এই অঞ্চলের বহু পার্ব্বত্য জ বুঝায়। বস্তুত এই নাম লুসেই শব্দের বিকৃতি। লুসেই লুসাইদের বহু জাতির একটি। পশ্চিমে কর্ণফুলি ও তার উপনদী টুইলিয়াংপুই, এবং পূর্ব্বে টীয়াও ও কোলাডাইন, এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী লুসাইভূমি ইহাদের অধিকারভুক্ত। থাঙবংশ ইহাদের শাসনকর্ত্তা।

* Even in 1864 Vonpilal's (chief of Mullo) messenger expressed great dread of the advance of tea gardens up the Sonai-land, regarded by them as their hunting grounds.

তাহাদের সর্দারে সর্দারে যুদ্ধেও এই একই নীতি—তবে সর্দার বধ তাহাদের যুদ্ধ শাস্ত্রের অনুমোদিত নয়। ইহাদের যুদ্ধের পরিচ্ছদ ধবধবে সাদা—একেবারে বকপক্ষের মত। কিন্তু লুণ্ঠন কালের পরিচ্ছদই খুব মানানসই। একখানা কাপড় কোমরে শক্ত করিয়া জড়াইয়া বাঁধা; এক কাঁধের উপর যুদ্ধ সামগ্রী ভরা একটি থলে—তার উপর বাঘের চামড়া, কি ভালুকের চামড়া, আর কাঁধে যুদ্ধের দাও; হাতে বন্দুক—লুণ্ঠন যাত্রী লুসাইর এই, ই সাজসজ্জা। এর উপর যদি কিছু থাকে, তবে দুটা বাঁশের চোঙা।—একটাতে ভাত, আরটিতে জল। এই দুর্দ্দান্ত জাতিকে দমন করা তখন সহজ ছিল না। প্রকৃতির দ্বারা রক্ষিত পর্ব্বত শৃঙ্গে তাহারা গ্রাম বাঁধিত। দেশ বনপূর্ণ ও পথহীন, আবহাওয়ায় অসহ্য, দীর্ঘকাল সে পর্ব্বত দেশে অবস্থান অসম্ভব, অধিবাসী এমনি নিঃস্ব যে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিলে তাহাদের কোনই ক্ষতি হয় না, এরূপ অবস্থায় ইহাদিগকে জব্দ করিবার পন্থা কি? সুতরাং তারা নির্ভয়ে লুণ্ঠনের দ্বারা শত্রুতা সাধন আরম্ভ করিল।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লাড়ু সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র লালচোক্লা মস্তক লুণ্ঠনে বাহির হইল। ১৬ই এপ্রিল গভীর রাত্রে দুইশত কুকী প্রতাপগড়ের মণিপুরী উপনিবেশ "কোচবাড়ী" ঘেড়াও করিল। সে ভীষণ রক্তমাখা অন্ধকারের মধ্যে কি যে তুমুল প্রাণ কাড়কাড়ি লাগিয়া গিয়াছিল, মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। শেষে কুড়িটি মাথা ও ছজনা জীবন্ত মানুষ বন্দী লইয়া সে অসুরের দল রাতারাতি সরিয়া পড়ে।

এই বৎসর জুন মাসে মণিপুরের খৈড়ু কুকীরা কাছাড়ের একটি কুকি গ্রাম আক্রমণ করে ও আটটি মাথা লইয়া যায়।

১৮৪৯ অব্দের নবেম্বর মাসে লুসাইরা শিলচরের দশ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া আসে এবং কুকিবস্তীগুলির উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে। একই সময়ে শিলেটের সীমান্তও আক্রান্ত হয়।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদিন এই দুর্দ্দান্ত জাতির স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার কোনই প্রয়াস পান নাই। কেবল অপরাধীর অনুসন্ধান করিয়া লালচোক্লার মত জন কয়েককে নির্ব্বাসিত ও অন্যরূপে দণ্ডিত করিয়াছিলেন মাত্র; ভাবিয়াছিলেন, ভয় পাইয়া ইহারা আর বৃটিশরাজ্যে উৎপাত করিতে আসিবে না। কিন্তু ভয় পাওয়া ত পরের কথা, তাহাদের অত্যাচার যখন বছর বছর বাড়িয়াই চলিল, যখন বৃটিশরাজ্যের শান্তিময় শ্যামলভূমি মানুষের রক্তে দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, গবর্ণমেণ্ট তখন আর তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

শ্রীহট্ট পদাতিসৈন্যের অধিনায়ক কর্ণেল লিষ্টারের উপর সমগ্র কার্য্যভার অর্পিত হইল। ১৮৫০, ৪ঠা জানুয়ারী তিনি সৈন্যসহ শিলচর হইতে যাত্রা করিলেন। ১৪ই জানুয়ারী কর্ণেললিষ্টার মুল্লা নামক সর্দ্দারের গ্রামে উপস্থিত হন। গ্রামের পুরুষপ্রাণীমাত্রই তখন গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় জানি লুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু ইংরাজ সেনাপতি অজ্ঞাত পথহীন দেশের দুর্গম জনপদগুলি ও দুর্ভেদ্য কেল্লাগুলি দেখিয়া এমনি বিস্মিত ও শঙ্কিত হন যে সেই রাত্রেই গ্রামখানি জ্বালাইয়া দিয়া সত্বর অপসৃত হন। প্রায় হাজারখানি শস্যপূর্ণ গৃহ সেদিন ভস্মীভূত হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া লুসাইদের সম্বন্ধে কর্ণেল লিষ্টার রিপোর্ট করিয়াছিলেন—

The Lushais are a very powerful tribe under the Government of six sirdars, of whom one is the acknowledged chief.

The fighting part of the Lushai population are composed, first, of Lushais, who appear to be a cross between the Kookies and Burmese; secondly a certain number of true Burmese entertained for the purposes of warfare; and, thirdly, of refugees and outlaws from Manipur.

The chief who is now at the head of these tribes, by name Barmooeelin, is said to have 300 Burmese in his service. His head quarters, which lay to the south west of Mulla's village,

I could see plainly with a telescope. It appeared to be a cantonment laid out with the utmost regularity, and containing, I should say, not less than three thousand houses. The whole of the sirdars are said to be able to raise from five to seven thousand fighting men, and from what I saw, and the information I have received, I do not consider this beyond the mark. The Burmese portion of the force armed with muskets and dows, and the remainder with spears and dows.

উপসংহারে কর্ণেল লিষ্টার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে এই দুর্দান্ত জাতিকে একেবারে নিরস্ত্র করিতে না পারিলে সীমান্ত প্রদেশে শান্তিরক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহাদিগকে দমন করিতে কমপক্ষে তিন হাজার সিপাহীর প্রয়োজন। হাজার পাঁচশতকে পথখোলা রাখিবার জন্যই নিযুক্ত রাখিতে হইবে। কারণ যে পার্ব্বত্য প্রদেশের পথ, পাথর ফেলিয়া সহজেই পেছন হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, এবং লুসাইরা তাহাতে সিদ্ধ হস্ত। লিষ্টারের প্রস্তাবের সারবত্তা বুঝিয়াও গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কার্য্যারম্ভ করিলেন না। শুধু ১০০ কুকীকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত করা হইল।

১৮৫০ অব্দে লুসাই সর্দ্দার সুকপিলাল ও অন্যান্য সর্দ্দারগণ কাছাড়ে মন্ত্রী পাঠাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল এবং পোদিগের হাতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য চাহিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সীমান্ত প্রদেশে শান্তিই ছিল। কিন্তু ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সুকপিলাল ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ করিল। স্ত্রী পুত্র লইয়া মানুষ গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল—সীমান্ত প্রদেশ জনহীন অরণ্যে পরিণত হইয়া গেল।

গবর্ণমেণ্ট সুকপিলালের কাছে প্রতিকার চাহিলেন, সুকপিলাল কোন সাড়া দিল না। সুতরাং ১৮৬৬ অব্দ হইতে যুদ্ধায়োজন চলিতে লাগিল। সুকপিলাল এদিকে সখ্য স্থাপনের বাসনা জানাইল। ১৮৬৮ পর্য্যন্ত যুদ্ধঘোষণা স্থগিত রহিল।

## লুসাই অভিযান।

(১৮৬৯—৭০)

১৮৬৮র শেষভাগে লুসাইরা আবার মণিপুর সীমান্তের এক নাগাপল্লী আক্রমণ করিল। ডিসেম্বরে আদমপুর লুণ্ঠন করিল, এবং ১৮৬৯ অব্দের ১৫ই জানুয়ারী মাসে কাছাড়ের লোহারবন্দ বাগান জ্বালাইয়া দিল। গবর্ণমেণ্ট আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। কমিশনার মিঃ সিম্‌সন্ (Simson) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিঃ নাথলের (Nuthall) সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে ৪৪ নং এবং ৭নং দেশীয় পদাতি এবং য়ুরোপিয়ান ব্যাটারি অব্ আর্টিলারির এক অংশ মিলিয়াই দল সৈন্য গঠিত হইবে। ইহারা কাছাড় হইতে একদল ধলেশ্বরী তীর দিয়া সুকপিলালের গ্রামমুখে ও একদল সোণাই তীর বোণপিলালের গ্রামের দিকে —অগ্রসর হইবে। আর ৭নং পদাতির অপর অংশ ও পোলিস শ্রীহট্ট হইতে দিয়া অগ্রসর হইয়া ধলেশ্বরী সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইবে।

ইতিপূর্ব্বে হরিচরণ চাবাগানের কর্ম্মচারীরূপে লুসাইদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার চোখের উপর বাগানের পর বাগান লুণ্ঠিত হইয়াছিল—চায়ের পাতা মজুরদের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল—ধনজন পরিপুষ্ট শান্তি শীতল গ্রামগুলি জনহীন অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল! দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দুঃখে ও ক্রোধে ভরিয়া উঠিত; অথচ প্রতিকারের কোন পন্থা ছিল না। কিন্তু আজ যে কর্ম্মবীরের কর্ম্মসাধনের প্রকৃত অবসর উপস্থিত—আর কি উপেক্ষা করা চলে? দেশের শান্তিবিধান ও রাজার সেবাযোগে তিনি নিজকে সার্থক করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের কাছে লুসাইযুদ্ধে তাঁহার সহায়তা গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিয়া তাঁহার উপর রসদ ও কুলি যোগাইবার ভার অর্পণ করিলেন।

এইরূপে সমস্ত বন্দোবস্তই প্রায় ঠিক হইল; কিন্তু ২২শে ফেব্রুয়ারীর আগে আর্টিলারি আসিয়া পৌঁছিল

না। ইহাতে যাত্রার বিলম্ব হইয়া গেল, এবং যাত্রা শুরু হইতে না হইতে বৃষ্টিরও শুরু হইল।

যাহাই হউক, সৈন্যদের ধলেশ্বরী বিভাগ উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাথলের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কালনাছড়ার দুই দিনের পথ উজানে পুকুয়ামুখ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। কিন্তু তখন চৈত্র মাসের বনের মাথায় মৌসুমী হাওয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছে, এবং অবিশ্রান্ত বাদল ধারা পাহাড় বন ভাঙ্গিয়া পার্ব্বত্যপথে ঢেউ খেলাইতেছে। হরিচরণ সে মুসলধারা মাথায় করিয়া সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন এবং প্রাণ তুচ্ছ করিয়া মজুরদের সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ওটুরমুখ পর্য্যন্ত জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা খোলা হইল

সেনাপতি নাথল কষ্টে বুলুঙপাক নদীর তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন কিন্তু সে পার্ব্বত্য নদী জলবেগে এমন ফুলিয়া উঠিয়াছিল যে হাতী ও কামানের নৌকা পার করিয়া নেওয়া অসম্ভব হইল। সুতরাং তিনি সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

শিলেট বিভাগ মিঃ বেকার দ্বারা পরিচালিত হইয়া ওতরেমুখ পর্য্যন্ত পৌঁছিল। সেখান হইতে সুক্‌পিলালের কেল্লা দেখা যায়। সুক্‌পিলালের কেল্লাও তাহার ভগিনী বথিতাজিরির "পুঞ্জি" দুটি পাশাপাশি পাহাড়ের উপর শয়ান ধলেশ্বরী বিভাগের সঙ্গে যোগ দিয়া সেই লুসাই সর্দ্দারের পুঞ্জি আক্রমণ করাই শিলেট বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দিনের পর দিন অপেক্ষা করিয়াও ধলেশ্বরী বিভাগের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। আবার চারিদিকে লুসাইদের সঙ্কেতবহ্নি জ্বলিতে লাগিল। লক্ষ্যে অলক্ষ্যে বনান্তরাল হইতে গোলাগুলি আসিয়া শিবিরের উপর পড়িতে লাগিল। তার উপর দুর্দ্দিনের ঘনবর্ষণ, পথঘাট রুদ্ধপ্রায়, খাদ্যের অনাটন ঘটিয়াছে, রসদের নৌকা পাছে পড়িয়াছে, সুতরাং মিঃ বেকারও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে পূর্ব্ব বিভাগ জেনারেল ব্রিকেন্‌সন দ্বারা পরিচালিত হইয়া সোনাই তীর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। স্বয়ং ডিপুটি কমিসনার মিঃ এডগার ইহার সাথী। ঘোর বৃষ্টিপাতে এবং উচ্ছ্বসিত নির্ঝরের জলস্রোতে সে পথ ও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু বৃটিশ সৈন্য সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ১৬ই মার্চ্চ সোনাই নদীর তীরে বাজারঘাটে উপস্থিত হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে বন্‌পিলালের মৃত্যু হইয়াছিল; তার মা ইম্পানু এবং শিশুপুত্র ইমাপ্‌লু নানা উপঢৌকন সহ আসিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইল। লুণ্ঠন ব্যাপারের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব তাহারা অস্বীকার করিল। বিশেষতঃ সুক্‌পিলালকে শাস্তিদেওয়াই ইংরাজ পক্ষের অভিপ্রায়; সুতরাং ইহাদের উপর কোন অত্যাচার না করিয়া তাঁহারা সৈন্যগণ সহ কাছাড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এই রূপে প্রথম লুসাই অভিযান শেষ হইল।

এই অভিযানে হরিচরণের কার্য্য তৎপরতায় প্রীত হইয়া অ্যাসিস্‌টেণ্ট কমিশনার উইলিয়মস্‌ সাহেব লিখিয়াছিলেন—

"The force was always well-supplied with *rusud*. The arrangements made by Hari Charan Thakur who was in charge of the stores were excellent, and the energy with which he carried them out, most praiseworthy Had the Expedition been a success no small share in its success would have been due to him."

মূলকথা এই অভিযান কৃতকার্য্য হইলে হরিচরণ তার এক প্রধান কারণ হইতেন।

কাছাড়ের অফিসিয়েটিং ডেপুটি কমিশনার এডগার সাহেব হরিচরণের প্রশংসা করিয়া সারকিট ঢাকা জেলার কমিসনারের কাছে লিখিয়াছিলেন—হরিচরণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়াছেন। ঝলনাছেরারদিকে সমস্ত বন্দোবস্তই তাঁর উপর ছিল। রসদ সংগ্রহ, কুলিখাটানো, ওটুরমুখেরদিকে পথ কাটা—এবং আরওবহু কার্য্যে তাঁহার সাহায্য আমাদের পক্ষে পরম কার্য্যকরী হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পত্রে তিনি লিখিয়াছেন "লুসাইতে শান্তি স্থাপন বিষয়ে হরিচরণ আমাকে কায়মনোবাক্যে সাহায্য

করিতেছেন। সুর্কপিলালের কেল্লার উত্তরাঞ্চলের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রমে তিনি দল সংগ্রহ করিতেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দারকে শীতকালের পূর্ব্বেই আমাদের বশে আনিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।" এই উদ্যোগী পুরুষের গুণে যে গবর্ণমেণ্ট মুগ্ধ হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ১৮৬৯ ইং জুন মাসে তিনি তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ ১০০৲ বেতনে হাইলাকান্দির তহশিলদারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এর কিছুদিন পরে হরিচরণের মাতৃ-বিয়োগ হয়। একদিন দুর্ভিক্ষের দিনে যে সন্তানের মুখে দুটি অন্ন তুলিয়া দিতে না পারিয়া করুণাময়ী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া ছিলেন, আজ সেই সন্তানকে অর্থে ও সম্মানে, সমাজে ও রাজদ্বারে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তিনি মনের সুখে মরিতে পাইলেন—ভগবানের রাজ্যের এ বিচিত্রতা নূতন নহে। হরিচরণ যথেষ্ট সমারোহে মাতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

১৮৬৯ অব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড মেও এইরূপ অসামরিক প্রথায় লুসাইতে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিলেন এবং লুসাই সীমান্তে আশ্রিত "লুসাই পুঞ্জি" স্থাপন করিতে প্রস্তাব করিলেন। এই উদ্দেশ্যে এড্গার সাহেব লুসাই ভ্রমণে বাহির হইবেন মনস্থ করিয়া ১৮৬৯ ইং ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকার কমিসনরের কাছে পত্র লিখিলেন।

"লুসাই অঞ্চলের আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি যে টুরে বাহির হইব মনে করিয়াছি, হরিচরণ বাবু তাতে আমার সঙ্গী হইবেন। গত বারের কার্য্যের জন্য যাহাতে তিনি যথেষ্ট পুরস্কৃত হন, আমি তার জন্য ত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছি।"

ডিসেম্বরের শেষ ভাগে এড্গার তাঁহার সঙ্কল্পিত ভ্রমণে বাহির হইলেন—সঙ্গে হরিচরণ এবং দুই পল্টন সিপাহি। এই অভিযানের একটি গৌণ উদ্দেশ্যও ছিল। তা গবর্ণমেণ্টের শক্তি কতদুর, এবং লুসাইর মঙ্গল কিসে, তাই বুঝাইয়া দিয়া এই বর্ব্বর জাতিকে তাদের দুষ্কার্য্য হইতে বিরত করা; দ্বিতীয়তঃ এই দুর্গম পার্ব্বত্যাঞ্চলের পথ ঘাট ভালরূপে পরিচয় করিয়া আসা; তৃতীয়তঃ সর্দ্দারদের পুঞ্জি ও লুসাইদের নাম ধাম অবস্থা ইত্যাদি যথাসম্ভব জানিয়া আসা।

১লা জানুয়ারী (১৮৭০) মিঃ এড্গার, সোনাই তীরে লুসাই ঘাটে তাঁবু ফেলিলেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে লাগিলেন। এই সময় হরিচরণের বুদ্ধি সাহস এবং কর্ম্মপটুতাই তাঁহার প্রধান সম্বল ছিল। লুসাইদিগকে বুঝিতে এবং বুঝাইতে হরিচরণ, দুর্গম পাহাড়ীপথ ভাঙ্গিয়া লুসাইদের পুঞ্জিতে পুঞ্জিতে ঘুরিতে হরিচরণ, যমালয়ের মত লুসাই কেল্লায় গিয়া লুসাই সর্দ্দারের সংবাদ নিয়া আসিতে হরিচরণ! পরামর্শে, সাহসে, কার্য্যে, হরিচরণ ভিন্ন এড্গারের চলিত না। কতদিন এই ব্রাহ্মণের সন্তানকে অনাহারে লুসাই পুল্লীতে দিন কাটাইতে হইয়াছে, বর্ব্বর দেশের গাছতলায় কতদিন তাঁহাকে অসহায় ভাবে রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে তার গণনা নাই। কিন্তু দেশের দিকে চাহিয়া,—লুণ্ঠিত, বিদগ্ধ, জনহীন জনপদ গুলির কথা মনে করিয়া—আর রাজ-সেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া তিনি সকল শ্রম ও সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়াছেন!

লুসাইজাতি দুর্দ্দান্ত হউক বর্ব্বর হউক—তারা প্রকৃতির সন্তান। বন্য জন্তুর মত যদি তারা হিংস্র হয়, বন্য জন্তুর মত তারা পোষও মানে। সিংহ শিশুর মত তারা দয়া বুঝে, হস্তিশাবকের মত তারা দয়ায় বশ হয়; প্রকৃতির এইটুকু সরলতা সকল অসভ্য জাতির মধ্যেই আছে, এবং হরিচরণ তাহা জানিতেন। সুতরাং তিনি এড্-গারকে এই পুষ্পবাণ নিক্ষেপের জন্যই প্রথম পরামর্শ দিলেন। মহামনা এড্গার তাঁর উপদেশের যুক্তি-যুক্ততা বুঝিয়া দানের ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। দরিদ্র লুসাইদের মধ্যে ভারে ভারে চাউল আর কাপড় বিতরণ চলিতে লাগিল। রাঙ্গা কাপড় তাদের বাহির, এবং মাদক মদে তাদের অন্তর রঞ্জিল হইয়া উঠিল।

মদনের পঞ্চশরের মত এই অমোঘ বাণবর্ষণে বহু লুসাই বশ হইল—অন্ততঃ বর্ত্তমানের জন্য। এড্গার যখন এ শক্রপুরে আপনাকে অনেকটা নিরাপদ মনে

করিলেন, তখন সর্দারদের জন্ত লোক পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, কোন সর্দারই আসিল না। অবশেষে পশ্চিম লুসাই হইতে সুক্‌পিলালের মা পিবুক হইতে দুইজন মন্ত্রী এবং সুক্‌পিলালের পুত্র খালকোম হইতে দুইজন মন্ত্রী যোরণ উপহার লইয়া আসিল এড্‌গার সে উপহার গ্রহণ না করিয়া দৃঢ়বাক্যে তাদের কাছে প্রধান অপরাধী সুক্‌পিলালের উপস্থিতি দাবী করিলেন। কড়ামিঠা তাহার ব্যবহার—তর্জ্জন আর দান, গর্জ্জন আর মদের পেয়ালা। মন্ত্রীরা বশ মানিল; তাহারা বুঝিল সুক্‌পিলাল উপস্থিত না হইলে সন্ধি হইবে না। অথচ সুক্‌পিলাল উপস্থিত হইলে সন্ধি হওয়া কত সহজ।

এদিকে পূর্ব্ব লুসাই হইতে কিন্তু এখনো কোন সংবাদ আসিল না। চর ফিরিয়া আসিয়া বলিল বোন্‌পিলালের মা ইম্পানুর মেয়ে মারা গেছে, সে শোক করিতেছে। একি প্রকৃতই শোক না বিদ্রোহ? এড্‌গার চিন্তিত হইলেন।

হরিচরণ বলিলেন "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নিজে গিয়া খবর লইয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি পোষাক পরিয়া একখানি ছোরা কোমরে বাঁধিয়া ও একটি পিস্তল পকেটে ফেলিয়া শত্রু পুরীতে রওয়ানা হইলেন।

ইম্পানু যখন এলো চুলে মাটির উপর লুটাইয়া কাঁদিতেছিল, হরিচরণ তখন তার দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতৃহৃদয়ের সেই করুণ ছবি তাঁকে ব্যথিত করিল। এ কেমন সময় কিসের সংবাদ লইয়া তিনি আসিলেন? বুকে যার আগুন জ্বলিতেছে, সংসারের বিষবাণ তার কপালে বিদ্ধ করিতে কোন্ নিষ্ঠুর সাহস পায়? ক্ষণকালের জন্ত তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানুষকে যে অনেক সময় নিষ্ঠুরই সাজিতে হয়। হরিচরণ সেই কর্ত্তব্যের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে কোন শব্দ না করিয়া তিনি সেই রোরুদ্যমানা লুসাই রমণীর পাশে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন এবং একটিও সান্ত্বনার কথা না বলিয়া একখানি চিত্রিত বস্ত্র তার সম্মুখে ধরিলেন। রমণী বিস্মিত হইয়া হরিচরণের মুখের দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন "ইংরাজ বাহাদুর সন্ধির জন্ত তোমার তলব দিয়াছেন।" ইম্পানু তার জলভরা চক্ষু দুটির নীরব তিরস্কার হরিচরণের মুখের উপর স্থাপন করিল, তারপর বলিল "তোমাদের যা খুসি, আমি তাতেই রাজি আছি; কেবল দোহাই তোমাদের—আমাকে আমার হারাধনের জন্ত একটুখানি শোক করিতে দাও।" *

একটা বুকভরা বেদনা লইয়া হরিচরণ ইম্পানুর কেল্লা হইতে বিদায় হইলেন।

হরিচরণ তাঁবুতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই দূরে ঘন ঘন ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সুক্‌পিলালের পুত্র খালকোম আসিয়া উপস্থিত। এই লুসাই যুবকের হৃদয় ভয়ে ও অবিশ্বাসে পূর্ণ ছিল। কিন্তু সকল দ্বিধা মদের পেয়ালায় পড়িয়া দ্রব হইয়া গেল। খালকোম চিরজীবনের জন্ত "সাহেবের লোক" হইতে স্বীকার করিয়া মন্ত্রীদের উপর কর্ম্মভার দিয়া প্রস্থান করিল।

৮ই ফেব্রুয়ারী এড্‌গার সুক্‌পিলালের গ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন। সুনাই ও ধলেশ্বরী উপত্যকার মাঝখানে রেঙ্‌টি শৈলমালা। ইহা শিলাবন্ধুর ও বনসঙ্কুল। বহুকষ্টে রাস্তা কাটিয়া তাহা পার হইতে

---

* "To test the truth of Impanus excuses, Hurri Churn Surma, Mr. Edgar's right hand man, who from long residence on the frontier knew the Lushais and their ways, and *through whom every thing was done in this expedition*, went up to Dollong, and there, truly he found the old lady sunk in grief and haggard with weeping, but seeking some solace for her woes in smoke—drying the corpse of her daughter over a low fire. Nothing daunted, the Baboo sat him down beside her and broached to her then and there Mr. Edgar's wishes; She assented readily to everything."

—Pioneer, the 19th July 1870

হইল। ২০শে ফেব্রুয়ারী বেপারীবাজারে তাঁবু গাড়িয়া এড্গার সুক্পিলালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুক্পিলালের দেখা করিবার আর অবসর হয় না। তার দূত আসে, মন্ত্রী আসে, সত্য মিথ্যা বহু কথা বলিয়া যায়, কিন্তু তার নিজের কোনই সংবাদ নাই। দিনগুলি বৃথা চলিয়া যাইতে লাগিল; আহার নিদ্রার কষ্টে মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ টলমল করিতে লাগিল, এড্গার উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে একেবারে সুদীর্ঘ একটি মাসের প্রতীক্ষার পর ২১শে মার্চ্চ সুক্পিলালের খবর আসিল—তিনি তাঁর অপূর্ব্ব পাহাড়ী কায়দায় সজ্জিত হইয়া ইংরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। দূরে কাঁশর করতাল বাজিয়া উঠিবামাত্র সকলে সেই দুর্লক্ষ্য-চরিত্র সুচতুর লুসাই বৃদ্ধকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই তার কঠোর মুখশ্রী ও অপ্রসন্ন দৃষ্টি লইয়া সে রাজপুরুষদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইল। হরিচরণ তখন অভিনন্দনের পেয়ালা লইয়া তার সম্মুখে ধরিলেন। দেখিয়া বর্ব্বরের মেঘাচ্ছ চক্ষুদুটি আনন্দে জল্ জল্ করিয়া উঠিল; আর সে তীব্র ব্রিটিশ মদ্যের নেশায় তার কঠিন জমাটবাঁধা অন্তর আগুণ ছোঁয়া বরফের মত গলিয়া গেল।

সময় বুঝিয়া এড্গার আপসের প্রস্তাব করিলেন। তার প্রথম সর্ত্ত লুসাই ও কাছাড়ের সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইবে; লুসাইর উত্তর সীমান্তে লুসাই পুঞ্জি স্থাপন করিতে হইবে। এড্গারের অভিপ্রায়, এই লুসাই পুঞ্জিই কাছাড়ের দক্ষিণ প্রাচীরের মত কাজ করিবে। এইস্থান জনশূন্য ও বনাচ্ছন্ন হওয়াতে কখন যে লুসাইরা লুকাইয়া আসিয়া বাঘের মত দক্ষিণ কাছাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িত, তাহা কেহ জানিতে পারিত না। সীমান্তে লোক-বসতি থাকিলে এই বন্য জাতির গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা অনেকটা সুবিধা। সে যাহাই হউক, সুরার দৌলবাহারী গুণে এড্গারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।—

"Sookpilal readily agreed to the proposal to fix a boundary to South Cachar, and promised to place a village on the line."

সন্ধির দ্বিতীয় সর্ত্ত ব্যবসায়িগণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পাশ লইয়া এবং লুসাই সর্দ্দারদিগকে নির্দ্দিষ্ট কর দিয়া গুটুর ও ধলেশ্বরী উপত্যকায় স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে যাইতে পারিবে। সুকপিলাল ইহাতেও রাজী হইল।—

"......and then was he clad in gorgeous raiment to delight his barbaric soul: a purple coat broidered with green and gold; loose drawers of green, flowered in gold and scarlet; a hat of silk, mixed green and white, a necklace of glass buttons and gold beads, and long glass earrings finished off the suit.

Placed, then, before a looking-glass the chief grew vain, smerked, grinned and finally fairly melted, flung himself on Hurri Thakur's neck and hugged him like an ecstatic bear" †

এইরূপে অভিযানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া এড্গার ২৩শে মার্চ্চ লুসাই হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হরিচরণের কার্য্যকরী প্রতিভা এই অভিযানে এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বিশেষ প্রীত হন এবং ১৮৭০, ১৮ই মে ঢাকার কমিশনরের বরাবরে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা ও
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টী।

---

† Pioneer, the 19th July, 1870.

# কৃত্তিবাস

## স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন।

**ব্যাস, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস**—সামান্য প্রণিধান সহকারে দৃষ্টি করিলেই যেমন উপলব্ধ হয় যে, সংস্কৃত অনার্য্য কাব্যাবলীর অধিকাংশের উপরেই ব্যাস বা বাল্মীকির প্রভাব সুপরিস্ফুট, কেহ মহর্ষি ব্যাস-বিরচিত কবিতা-কুঞ্জের পথিক, কেহ বা রত্নাকরের নানারত্নসমুদ্ভাসিত কবিতা-মন্দিরের যাত্রী; এক-ভাবে না এক-ভাবে যেমন ব্যাসবাল্মীকি এই উভয়ের একতরের কার্য্যের আদর্শ, পরবর্ত্তী অনার্য্য কবিকুলের কাব্যাবলীর উপজীব্য, তদ্রূপ, বাঙ্গালার মহাকবি কৃত্তিবাসের প্রভাব,—তাঁহার ভাষার প্রভাব, ভাবের প্রভাব, রচনাভঙ্গির প্রভাব, তৎপরবর্ত্তী বঙ্গীয় কবি-কুলের উপর সম্যক্‌রূপে সুপরিস্ফুট। কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী কবিবৃন্দ, যে সমুদয় সুরভিকুসুমে বীণাপাণির পাদপূজা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই তদীয় কবিতারূপী কল্পনা কানন হইতে সংগৃহীত। এই হিসাবে, সংস্কৃত কাব্যাবলীর সহিত ব্যাসবাল্মীকির যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার কাব্যাবলীর সহিত কৃত্তিবাসেরও সেই-ই সম্বন্ধ।

**কালিদাস ও কৃত্তিবাস**—আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পর কালিদাস আবার সেই রাম-চরিত্রেরই পুনর্ব্বর্ণন করিলেন। রামায়ণ শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশও শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য। কালি-দাসের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে রামায়ণ ভারতের সকল সমাজে কীর্ত্তিত, গীত, অধীত ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুত হইত। তথাপি কালিদাসের রঘুবংশ ভারতের বিদ্বজ্জন সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহার হেতু কি? একান্ত সুপরিচিত, সর্ব্বদা শ্রুত বৃত্তান্তের পুনঃ পঠন-পাঠনে এই যে আগ্রহ, এত যে আদর, তাহার একমাত্র কারণ কালিদাসের প্রাঞ্জল ভাষা ও ভাবের সুস্পষ্টতা। যদি ভাষা এত সুন্দরী এবং সম্পত্তি-শালিনী না হইত, তাহা হইলে, কেবল ভাবের তরঙ্গলীলায় বা কল্পনার ক্রীড়ায় কালিদাসের কাব্য সুধী-সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত না। কল্পনা বিষয়ে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের তুলনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবুও যে, কালিদাস এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার সুমধুর ভাষা। কালিদাস ব্যতীত আরও অনেকে রামায়ণ উপজীব্য করিয়া কাব্যাদি বিরচন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ জন-সমাজে রঘুবংশাদির ন্যায় আদৃত হয় নাই। এই আদর-অনাদরের একমাত্র নিদান, ভাষাগত প্রাঞ্জলতার উৎকর্ষাপকর্ষ এবং ভাবের সুস্পষ্টতা। কালিদাস এমন মনোহারিণী ভাষায় তদীয় কাব্যাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে, যে কোন সময়ে, যে কোন সমাজের লোকেই তাহা পাঠ করুক না কেন, বিমুগ্ধ হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ভাষাগত উৎকর্ষের জন্য যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যেও তেমনই ভাষাগত উৎকর্ষের নিমিত্ত কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠতা। যে ভাষা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য উপনিবদ্ধ, অর্থাৎ কেবল শিক্ষিত বা কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত, ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ, ইহার একতরের উদ্দেশ্যে যে ভাষা গ্রথিত, তাহা কদাচ স্থায়ী বা সকলজনসম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না। তাদৃশী ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থাদি কখনও কালজয়ী হইতে পারে না। তাহাকে প্রকৃত ভাষা বলা যায় না। তাদৃশী ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদি কালের তরঙ্গে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া যায়। অল্পকাল মধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

যে ভাষা কোনও সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে, সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা ধমনী কৈশিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে "আমার" বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত অপণ্ডিত, সকলে সমানভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ ভাষা। কালিদাস যেমন তাদৃশী সর্ব্বতোগামিনী সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তদীয় কাব্য, সকল সম্প্রদায়ে, সকল সময়ে সকলের প্রিয় পদার্থ, মহাকবি কৃত্তিবাসও তদীয় অনাড়

রামায়ণ কাব্য সেইরূপ সর্ব্বকালানুযায়িনী সর্ব্বতোগামিনী ও সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া, তদীয় রামায়ণ, এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সমুদয় কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল নহে, বা ভাবও সুস্পষ্ট নহে, সেই কাব্যাদির প্রভাব সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষা ও ভাব উভয় সম্পদে সম্পন্ন বলিয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণ কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস এবং বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাস এই দুই জন একই কারণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

**কৃত্তিবাস ও অন্যান্য রামায়ণকারগণ।** কৃত্তিবাসের পর আরও অনেক কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি রামায়ণ রচনাপূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের দ্বারাই যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা কঠিন।

এপর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে কৃত্তিবাসই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় রাম-চরিত নিবদ্ধ করেন। তাহার পরে আরও চতুর্দ্দশ ব্যক্তি রামায়ণী কথায় পুস্তক রচনা করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। কালে হয়ত, আরও অনেক নাম পাওয়া যাইবে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার ইতিহাস লেখক অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এতদুভয়ের সমবেত চেষ্টার ফলেই আমরা আজ কৃত্তিবাসকে প্রকৃত ভাবে চিনিবার অবসর পাইয়াছি। কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে প্রকার পাঠ-বৈষম্য ঘটিয়াছে, তাহাতে কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও দুর্ল্লভ। তবুও যতটা পাওয়া যাইতেছে, তজ্জন্য, সাহিত্যপরিষদ এবং দীনেশ বাবু বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কৃত্তিবাস এবং তৎপরবর্ত্তী অনেকে একই রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্য আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয়, সকল সমাজের আদরণীয় হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কি?

কৃত্তিবাস মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণমাত্র অবলম্বন করিয়াই কাব্য লিখেন নাই। আমাদের দেশে কথকতায়, যাত্রায়, গোষ্ঠিবন্ধনে, সর্ব্বত্রই নানা ভাবে ও নানা আকারে রামবিষয়ক বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে, কৃত্তিবাসের বহু পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ফলতঃ লোকমুখে স্ত্রীপুরুষ সমাজে রামসীতার কথা কীর্ত্তিত হইত, এখনও হইতেছে। কৃত্তিবাস তদীয় গ্রন্থরচনায় এই লোকপরম্পরাগত গাথার অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল অনুবাদে মহর্ষি-চিত্রিত আলেখ্যাবলীর পুনশ্চিত্রণেই যদি কৃত্তিবাস রত থাকিতেন, তাহা হইলে, তদীয় কাব্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার পরবর্ত্তী রামায়ণ-লেখকগণের অনেকের গ্রন্থে কৃত্তিবাসোচিত মৌলিকতা নাই। অধিকাংশ স্থানেই অনুবাদ মাত্রে পর্য্যবসিত। কোনও রামায়ণকার স্বকীয় কল্পনার চঞ্চল বৈদ্যুতী প্রভায় গ্রন্থের কচিৎ ভাস্বর করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কল্পনামান্দ্য দোষে গ্রন্থের শ্রীহানি ঘটিয়াছে। এই স্থলে কবিচন্দ্রের নাম উল্লেখ্য। কবিচন্দ্র স্বীয় রামায়ণে অঙ্গদ রায়বার নামে যে অধ্যায় লিখিয়াছিলেন, যাহা আজ কৃত্তিবাসের বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশ গৃহে আদৃত, সেই অধ্যায়টি বাস্তবিকই অনেকটা কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই অনুপাতে কবিচন্দ্রের গ্রন্থের অপরাংশ সমূহ গ্রহণ করা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত অনেকে যেমন দু'একটি মনোহারিণী কবিতা রচনা করিয়া থাকেন, প্রাচীনকালেও করিতেন; যে কবিতাগুলি "উদ্ভট" আখ্যায় জন-সমাজে প্রচারিত, কিন্তু ঐ উদ্ভট-কর্ত্তাদের কোনও বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য কবিতা গ্রন্থ পাওয়া যায় না, চঞ্চল কল্পনার ক্ষণিক অনুগ্রহে মাত্র দু'চারিটি হৃদয়াকর্ষিণী কবিতাতেই তাঁহাদের কবিত্ব পরিসমাপ্ত, তদ্রূপ অন্যান্য রামায়ণকারগণের অনেকেরই দুই একটি, বা কাহারও দু'চারিটি রসভাবপূর্ণ অধ্যায় রচনার পরই কবিত্বের পর্য্যবসান ঘটিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে কবিতায় উচ্ছলিত তরঙ্গলীলা একমাত্র কৃত্তিবাসেই পরিদৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাস জানিতেন যে, যাঁহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি চান, কতটুকু বা কতটা তাঁহাদের অভিলষিত? কিরূপ আলেখ্যে তাঁহাদের নয়ন রঞ্জন হইবে? কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে

তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্ব্বদা এই মন্ত্রের স্মরণ পূর্ব্বক কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে। এই জন্যই কেবল বাল্মীকির আদর্শই তাঁহার উপজীব্য ছিল না, তিনি প্রয়োজনমত অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ প্রভৃতি হইতেও তিনি আদর্শ সঙ্কলন করিয়াছেন।

অনেক কাব্য কবির সমসাময়িক সমাজের রুচি এবং ছায়ার অনুসরণে নির্ম্মিত হওয়ায়, সেই নিয়মিত সমাজে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই কাব্য আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তী ও পরিবর্ত্তিত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া যায়। যে কবির কাব্য, যত অধিক পরিমাণে এইরূপ সাময়িক ভাবে পরিপূর্ণ, সে কবির কাব্য, ততই অল্পকালস্থায়ী। অন্যান্য অনুবাদকগণের রামায়ণ গ্রন্থের অপ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহাদের রামায়ণের যে যে অধ্যায়গুলি এই প্রকার কোন বিশেষভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে, সকল সময়ের অনুগত করিয়া লিখিত, সেই সেই অধ্যায়গুলির মর্য্যাদা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে কবিচন্দ্রের "অঙ্গদরায়বার" ও রঘুনন্দন গোস্বামীর "রামরাবণের" অশোকবনবর্ণন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সরল ভাষা এবং সুস্পষ্ট ভাব,—এই দুই দুর্লভ সম্পদে কৃত্তিবাসের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতি সরল কথায়, সকলের বোধগম্য ভাষায়, তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভাষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাঁহার কাব্য কুত্রাপি দুষ্ট হয় নাই। তিনি যখন যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। যে কবি, যত অধিক পরিমাণে প্রাঞ্জলভাষায় মনের ভাবরাশি, তদীয় সমাজের সমক্ষে অতি সুস্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত অধিক আদৃত হইবেন। কৃত্তিবাস সেইটি অতি উত্তমরূপে পারিতেন বলিয়াই, তাঁহার "রামায়ণ" অপরাপর "রামায়ণ" অপেক্ষা ভাবুক সমাজে, অথবা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সমাজেই এত প্রিয় হইয়াছে।

দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে মানব দেবতা হয়, আবার এইগুলির অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস এই মহনীয় গুণাবলীর এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন, যে, পাঠকালে, হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। মহাকবি ভবভূতি যেমন তাঁহার উত্তর চরিতের নিরবদ্য ও নয়নরঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাবলী হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে, সেই আদর্শের উপর নৈপুণ্য সহকারে বর্ণসংযোগ করিয়া আনন্দময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে মূর্ত্তির গরিমায় সংস্কৃত সাহিত্য গৌরবিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসও সেইরূপ মহর্ষিকৃত আদর্শের উপর সতর্ক হস্তে বর্ণসংযোগ-পূর্ব্বক, তৎ তৎ চিত্রাবলী বঙ্গীয় সমাজের অনুগত ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অলঙ্কারের গুরু ভারে বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্লিষ্ট হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্র একভাবে, ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় তর তর করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ দুষ্ট হয় নাই, বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অমর্য্যাদা ঘটে নাই। অন্যান্য কবি অপেক্ষা তদীয় প্রাধান্যের এইটিই মুখ্য কারণ। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতার সহিত তাঁহার আশ্চর্য্যচিত্রনৈপুণ্যের সম্মিলনে তদীয় কাব্য ত্রিবেণীসঙ্গমের ন্যায় পবিত্র ও সর্ব্বজনসেব্য হইয়াছে।

## কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রক্ষেপ—

কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার প্রায় এক শত বৎসর পরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। চৈতন্যের আবির্ভাবের এবং তদীয় প্রেম-বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হস্তলিখিত কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুস্তক এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদি কখনও পাওয়া যায়, তবে তখন কৃত্তিবাসের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির সমাধানের উপায় অনেকটা সহজ হইবে। চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বঙ্গদেশে যে ভক্তির স্রোত, প্রেমের "বাণ" বহিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালের রামায়ণ-

সমূহে তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যে সময়ে যে ভাব দেশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দেশটাকে বিভোর করিয়া ফেলে, সেই সময়ের জাতীয় সাহিত্যাদিতেও সেই ভাবের প্রভাব প্রবিষ্ট হইয়া, তাবৎ সাহিত্যকে 'তদ্ভাবভাবিত' করিয়া তোলে। তাই পরবর্ত্তী কালের কৃত্তিবাসে আমরা কি বীর, কি করুণ, সকল রসেই নদিয়ার ভক্তির তরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। লিপিকারগণ, সুবিধা পাইলেই রামের স্থলে শ্যাম করিয়াছেন। পরিবর্ত্তিত কৃত্তিবাসের অনেক অনাবশ্যক স্থলে অতর্কিত বৈষ্ণবী দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত বীরবাহু, পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব লিপিকারগণের কৃপায়, দীনাতিদীন বৈষ্ণব সেবক-গণের ন্যায়, করযুগল জুড়িয়া ধরণীতে লুটায়। তুলসীতলার মৃত্তিকায় অঙ্গরাগ করিয়া বৈষ্ণব যেমন "শ্রীবাসের আঙ্গনায়" মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রণাম করেন, সেইরূপ রাক্ষসগণও কপিগণকে গল-লগ্নবাসে প্রণাম করে। এইরূপ অনেক স্থলেই বৈষ্ণবীয় কোমলতার ও দীনতার চরম দেখিতে পাই। এ সমস্তই চৈতন্যের পূর্ণ প্রকটের পর, কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সংক্রামক রোগের পরিচয় আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের দুই একটি স্থলের ঈষৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক, কোথাও বা প্রমাণসূত্রটিকে বদলাইয়া, সমগ্র গ্রন্থখানিকে "হিন্দু" করিয়া তোলা হইয়াছে। কৃত্তিবাসে পাঠবৈষম্যের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। বহুকাল পূর্ব্বের হস্তলিখিত যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের ত মিল নাই-ই, এমনকি ১৮০৩ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের দ্বারা প্রথম যে "কৃত্তিবাস" মুদ্রিত হয়, তাহার সহিতও বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে আদৌ মিল নাই। মিশনারিদের পুস্তকে যেখানে আছে।

"পাকল চক্ষে রামেরে পানে চাহিলেক বালি।
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি॥"

সেই স্থানে—পরবর্ত্তী কালের সংশোধিত বটতলার সংস্করণে আছে।—

রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি।
দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি॥

পরবর্ত্তী কালে ভাষার পরিমার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার আদিকবি কৃত্তিবাসও "পরিমার্জ্জিত" হইয়াছেন!! কবির কাব্য পরিষ্কৃত করিতে যাইয়া, সংশোধকগণ আবর্জ্জনারাশির দ্বারা কৃত্তিবাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন! এই ব্যাপারের মূলে আর একটি সত্যও নিহিত আছে। আমাদের দেশে, যখন যে কোনও নূতন জিনিষের আবির্ভাব হইয়াছে, আমরা তাহাকে 'ধীরে ধীরে পুরাতনের সহিত মিশাইয়া নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করিয়া "আপন" করিয়া লইয়াছি। আমাদের এই adaptability আছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সাহিত্য এখনও টিকিয়া আছে। নবীন নানাবিধ ভঙ্গিরাগবিভূষিতা, শ্রুতিমোহিনী বঙ্গভাষায় যেমন আবির্ভাব হইল, অমনি আমরা আমাদের প্রাচীন, দুর্ব্বোধ্য শব্দসঙ্কুল ভাষাকে তাহার অনুগত করিয়া লইলাম, তাই আমার প্রাচীন।

"অমিয় সায়রে শিনান করিতে সকলি গরল ভেল"
ইহার স্থলে।

"অমিয় সাগরে শিনান করিতে সকলি গরল হলো"
করিয়া ফেলিলাম। প্রতিমার মূল পঞ্জরের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করিলাম না বটে, কিন্তু একটু নূতন ভঙ্গিতে বর্ণযোজনা করিয়া, প্রাচীনাকে নবীনা করিয়া তুলিলাম। ইহাতে প্রাচীনার অঙ্গহানি ঘটিল। এইরূপে মূল কৃত্তিবাসের অর্দ্ধসংস্কৃত, অর্দ্ধ-হিন্দি অনেক শব্দ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে ক্রমে বর্ত্তমান বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাই প্রাচীন কৃত্তিবাসের

"মুঞি" "তিলক" "কর্য্যা" "থুয়্যা" "পাকল" প্রভৃতি অধুনা অপ্রচলিত শত শত শব্দের পরিত্যাগ সাধিত হইল। ইহা কালের নিরঙ্কুশ বিধান। ইহার উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব তত অধিক নাই। যাহা গ্রাহ্য, কাল তাহার গ্রহণ করিবে। যাহা বর্জ্জনীয়, কাল তাহার বর্জ্জন করিবে।

শাক্ত এবং বৈষ্ণব—এই দুই সম্প্রদায়ের লিপিকারগণের কল্যাণে কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে যেমন শাক্ত

প্রভাব পরিপুষ্ট হয়, তেমনই বৈষ্ণবপ্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া, অন্যান্য পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি হইতে অনেক মনোরম অংশও লিপিকারগণ বাছিয়া আনিয়া কৃত্তিবাসে জুড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক নূতন কবিতার প্রণয়ন করিয়া কৃত্তিবাসের গ্রন্থে পূরিয়া দিয়া, স্ব স্ব আত্মাভিমানের পূজা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃত্তিবাস হইতে শত শত স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, ঐতিহাসিকের সে কার্য্য হইতে আমি বিরত হওয়াই সঙ্গত মনে করি।

**কৃত্তিবাসের কল্পনা তাহার গন্তব্য পথ**—রামায়ণী কথার আশ্রয়ে কালিদাস ভবভূতি রঘুবংশ উত্তরচরিত প্রভৃতির রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যেস্থানে যেরূপ প্রয়োজন, তাঁহারা নূতন মূর্ত্তিও গঠন করিয়াছেন। কবিরা কল্পনার বৈদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিমান্। সেই সতত চঞ্চলা শক্তি কদাচ কোন নির্দ্দিষ্ট পথে, কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবিকৃত সৃষ্টিতে, অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহর্ষিক্ষুণ্ণপথ কল্পনার দৌত্যে অল্পবিস্তর ছাড়িয়া, অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃত্তিবাসও সেইরূপ অনেক স্বকল্পিত আলেখ্যের অঙ্কনপূর্ব্বক, তদীয় গ্রন্থ সুচারুতর করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বীরবাহু তরণীসেন প্রভৃতির সৃষ্টি তাঁহার আত্মকল্পনার উপর চরম উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলিসঙ্কেতে চলেন না। কল্পনা কাহারও দাসীত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাসচঞ্চলা মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুষারমণ্ডিত কমলের কেশরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া কবিকে কত নিভৃত সৌন্দর্য্য দেখায়। উন্মাদিনী চঞ্চলার ন্যায় কবির উন্মাদিনী কল্পনা কাহারও অঙ্গুলিসঙ্কেতে পরিচালিত বা ভ্রূকম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবেই আপনি বিভোর হইয়া ছুটে, পরের ভাবে ভুলে না। কৃত্তিবাসের স্বৈরচারিণী কল্পনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও বা নূতন পথে যেখানে যেমন ইচ্ছা, সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে। তরণীসেন বীরবাহু প্রভৃতির সৃষ্টি এই নূতন পথে যাত্রারই ফল।

**কবির পরিচয়।**—আনুমানিক ১৩৫৩ শক ১৪৩২ খৃষ্ট অব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের প্রতিগৃহে যে দিন বীণাপাণির চরণকমল অর্চ্চিত হইতেছিল, "সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ" বলিয়া যেদিন ভক্তি-গদগদকণ্ঠে স্তব করিতে করিতে হিন্দু তাহার চিরপ্রার্থিত দেবতার চরণে মস্তক স্থাপন করিতেছিল, সেই শুভক্ষণেই যাঁহার জন্ম, তাঁহার জীবন যে সেই বাগ্‌দেবতার অনুগ্রহে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবে তাহাতে আর কথা কি?

৭৩২ খৃষ্ট অব্দে আদিশূর কনোজ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে এ দেশে আনয়ন করেন, তাঁহাদের অন্যতম ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন নরসিংহ ওঝা বেদানুজ রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই বেদানুজ সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের স্বর্ণগ্রামের রাজা ছিলেন। আন্দাজ ১২৪৮ অব্দে এই নরসিংহ অরাজক স্বর্ণগ্রাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস করিবার সঙ্কল্পে ফুলিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ফুলিয়ার তখন বড় স্পর্দ্ধার দিন। কৃত্তিবাস নিজেই স্বীয় বংশ পরিচয়ের সময়ে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে এখানে "মালঞ্চ" ছিল, নানাবিধ ফুলের বাগান ছিল, তাই ইহার নাম হয়—"ফুলিয়া"। এই ফুলিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বীচিমালিনী ভাগীরথী রজতধারায় প্রবাহিত ছিলেন। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্যের ইহা লীলানিকেতন ছিল। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ নরসিংহ তাঁহার তদানীন্তন পদোচিত বিত্তবাদির সহিত এই মনোহর স্থানে আসিয়া একেবারে জুড়িয়া বসিলেন। কৃত্তিবাসের ভাষায়

"ফুলিয়া চাপিয়া হইল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥"

ফুলিয়া "চাপিয়া" তাঁহার বসতি হইল। এই নরসিংহের পরমধর্ম্মাত্মা পুত্র গর্ভেশ্বর কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ।

গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি ওঝা, কৃত্তিবাসের পিতামহ এক অতি প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার কোন গ্রন্থাদির পরিচয় পাই না। সত্য, কিন্তু কবি কৃত্তিবাস স্বয়ং তাঁহাকে ব্যাস মার্কণ্ডেয়াদির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

এই মুরারি ওঝার পৌত্র কৃত্তিবাসের নিজের উক্তি-তেই দেখিতে পাই, বাল্যে প্রথমতঃ চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করেন। এই চতুষ্পাঠীর শিক্ষাই তদীয় সংস্কৃত রামায়ণ পাঠের সোপান। পাঠ সমাপ্তির পর, তদানীন্তন প্রথা অনুসারে তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় আত্ম-পরিচয়ার্থ উপস্থিত হন। রাজা তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। "তথাস্তু" বলিয়া কৃত্তিবাস যখন সগর্ব্বে বাহির হইলেন, তখন সকলে "ধন্য ধন্য" বলিয়া কবির অভ্যর্থনা করিলেন।

"সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।
মুনিমধ্যে বাখানি' বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী"

বলিয়া সহস্র মুখে কৃত্তিবাসের প্রশস্তি সঙ্গীত উচ্চারিত হইল। কৃত্তিবাস স্বয়ং এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন, আত্মবংশের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে কত বড় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আমি আর বিশেষ কি বলিব। এখনও "ফুলিয়ার মুখটি" বলিয়া আমরা তাঁহারই বংশের স্পর্দ্ধা করি। রাঢ়ীয় শ্রেণীর প্রধান এবং মুখ্য বংশ "ফুলিয়ার মুখটি"—কৃত্তিবাসেরই অনুস্মৃতি মাত্র।

মাহেন্দ্রক্ষণে রাজা কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার অরুণ-রাগ-রঞ্জিতা উষার প্রথম আলোকচ্ছটা কৃত্তিবাসের মস্তকে প্রথম স্বর্ণকিরীট পরাইয়া দিয়াছিল,—বঙ্গভূমি, বঙ্গভাষা ও সেই সঙ্গে বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইয়াছে। পল্লী-প্রান্তরের স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায়, জন-পদ-বধূর গোষ্ঠীবন্ধনে, বর্ষীয়সী ললনাদিগের বিশ্রামকক্ষে, কৃত্তিবাসের বিরচিত গাথা গীত ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুত হইতেছে। ভাষায় যাহার সম্যক্ অধিকার নাই, সেই প্রাকৃত ব্যক্তিও প্রেম ভরে রামায়ণ গান করিয়া আত্মহারা হইতেছে, আর সেই সঙ্গে, নিরক্ষর সরল কৃষক সাশ্রুনয়নে ও ভগ্নহৃদয়ে সে গান শুনিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছে। এখনও একাদশীর অপরাহ্নে ধূসরবসনা বিধবারা সমবেত হইয়া, কোন ললিতকণ্ঠ বালকের দ্বারা রামায়ণ পড়াইয়া শুনিতেছেন, তাঁহাদের উপবাস-ক্লিষ্ট হৃদয়ের ভক্তির রস উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। মনোহর কল্পনা, মধুরভাব, অনুপম সৃষ্টিকৌশলে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত। কৃত্তিবাসের পর, আজ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তি বঙ্গবাণীর পদ পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পূজার উপকরণ—ফুল, ফল, পল্লব,—কৃত্তিবাসের ঐ রামায়ণরূপী কল্পকানন হইতে চয়িত ও সংগৃহীত। কৃত্তিবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাঁচশত বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে, বটে কিন্তু আজও প্রতিক্ষণে তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে, বিপণির পণ্যকুটীরে, চাষার আশার কৃষি-ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতেছে। আজ আর

"দক্ষিণে পশ্চিমে যা'র গঙ্গা তরঙ্গিণী"

সে "ফুলিয়া" নাই, সে "ফুলিয়ায়" কৃত্তিবাসের সেই "চাপিয়া বসতি"র চিহ্নও নাই, কিন্তু সেই "ফুলিয়া পণ্ডিতের" মোহন বাঁশরীর ঝঙ্কার এখনও বাঙ্গালীর "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতেছে, বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া, বিভোর করিয়া রাখিয়াছে।

কৃত্তিবাসের এই সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধির অপর কতিপয় কারণও পরিদৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা বড়ই কোমল, বড়ই উর্ব্বর। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীম, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী লোপামুদ্রা, ঔশীনরী প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেরই চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, নয়নে ভক্তির অশ্রু, ভারতবাসীরা তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে, প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃত্তিবাস এ রহস্য বুঝিতেন। তিনি আরও বুঝিতেন যে, নিশীথে নিস্তব্ধ রজনীর সৌম্যমূর্ত্তি যাহার চিত্তকে অভিভূত, বা অনুভূতির বিমলকর ধৌত করিতে না পারে, সে কদাচ ঐ নৈশ নীরবতার মাধুর্য্য অপরকে বুঝাইতে পারে না; সায়ংকালের শ্যামায়মানা বনভূমির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি যাহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইতে অসমর্থ,

সে কখনও সান্ধ্য-সুষমার পবিত্র আলেখ্য অঙ্কন করিতে পারে না। সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই। সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া হওয়া চাই, প্রাণ অকৃপণভাবে ঢালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত। কৃত্তিবাস অকৃপণভাবে, আত্মপ্রাণ কবিতাদেবীর পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আর কিছুই ছিল না, সমস্তই ঐ চরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাই তদীয় কবিতার কুত্রাপি কোনরূপ বাধা দেখিতে পাই না। সর্ব্বত্রই সমান এবং অপ্রতিহত গতি। অসম্ভব হইলেও মনে হয়, যেন, এক সময়ে, এক স্থানে বসিয়া, অন্য-চিন্তা-বিযুক্ত হইয়া, মহাকবি, তাঁহার সাধের রামায়ণ গান গাহিয়াছেন। তিনি নিজে সে গানে মজিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাহার শ্রোতৃবর্গও মজিয়াছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া, তাহার সেবা করিয়াছে, আচন্দ্র-দিবাকর করিবেও।

তুমি যখন অভ্রভেদী, শুভ্রতুষারশীর্ষ, হিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার কৃপায়, তখন যদি তোমার হৃদয়ে, কোন প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোন বিরাট শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি ঐ বিরাট হিমাচলের প্রশান্ত ভাবের, প্রশান্ত মূর্ত্তির কিয়দংশ হয়ত তোমার কল্পনা দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পার। অন্যথা, তোমার সাধ্য কি যে তুমি হিমাচলের ঐ গম্ভীর মাধুর্য্যের বর্ণন করিবে। তুমি যে স্থানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্ত্তমান, যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত, নিজকে মিশাইতে না পার, "তদ্ভাব-ভাবিত" করিতে না পার, তবে কদাচ, তদ্দেশীয় ও তৎকালীন ভাবের স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তোমার দ্বারা তদ্দেশবাসীগণের হৃদয় কদাচ বিমোহিত হইতে পারে না। দীপকরাগের সময়ে, তুমি বেহাগ পূরবীতে আলাপ করিলে, তাহা কখনও জমিতে পারে না। সে আলাপে শ্রুতির সুখ হয় না, বরং পীড়াই জন্মে। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীরা কি চায়, কি ভালবাসে এ তত্ত্ব মহাকবি কৃত্তিবাস বুঝিতেন। এদেশের লোকের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত, কোন্ উপকরণ তাহাতে অধিক, তাহা কৃত্তিবাস জানিতেন, তাই তাঁহার দেশবাসীগণের হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, তিনি তদীয় কল্পনার মোহন বীণায় ঝঙ্কার করিয়াছিলেন। তাই সে ঝঙ্কার বসন্তের পিকঝঙ্কারের ন্যায়, বঙ্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ, একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই হিসাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গলায় কৃত্তিবাস একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান, কতটুকু চান্, তোমার বীণার কোন্ তার স্পর্শ করিলে, তাহার ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে অনুরণিত হইবে, তাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে,—এজ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও না কেন, যত বড় কাব্যবিদ্যাবিশারদই হও না কেন, তোমার লেখার বা তোমার অঙ্কিত আলেখ্যে, তোমার সামাজিক বর্গের বা তোমার দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইবে না। তোমার সে লেখায় বা সে চিত্রে, ত্বদীয় দেশবাসী সহৃদয়বর্গের হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাঁহাদের লেখাই কালজয়ী হয়, থাকিয়া যায়; আর যাঁহাদের এই জ্ঞান নাই, তাঁহাদের লেখা ছিন্ন তুষারের ন্যায় অতি অল্পকাল মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। আর্য্য রামায়ণ অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ তন্মধ্যে যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রায় পাঁচশত বৎসরেরও অধিক কাল সমানভাবে বা উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ইতর ভদ্র সকল সমাজেই পূজিত হইতেছে, ইহার কারণ হইল, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান। কৃত্তিবাসের ঐ জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে দেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দেশের অধিবাসীরা কি ভালবাসে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই চাহিতেন ও ভালবাসিতেন। তাই, তিনি যদি কখনও সামান্য একটু গুণ্ গুণ্ করিয়া স্বরবিলাস করিয়াছেন, অমনি সেই গুণ্ গুণ্ ধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াই যেন, তদীয় দেশবাসীদিগের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে।

দিবাবসানে সাগরগামিনী তটিনীর প্রাণের আকুল গীতিকা, কুলকুল ধ্বনিতে যেমন শ্রান্ত পথিকের চিত্তে একটা জড়তা, একটা তন্দ্রা আনিয়া দেয়, পথিক একপদে তাঁহার কর্ম্মফল দীর্ঘ দিবসের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যান, কেমন একটা ঘুমের ঘোরে তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে, সেইরূপ, প্রেমিক কবি কৃত্তিবাসের মোহিনী বীণার ঝঙ্কারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত আনন্দালস হইয়া রহিয়াছে। কবে কোন্ দিন্ কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে "মা নিষাদ" বলিয়া বাল্মীকি গান ধরিয়াছিলেন, আর আজও যেন সেই গানের ধ্বনির বিরাম হয় নাই। সে স্বরলহরী যেন বাতাসে এখনও ভাসিয়া বেড়াইয়া, ভারতবাসীদের প্রাণে কেমন একটা তন্দ্রা জন্মাইয়া দিতেছে, সেইরূপ কবে কোন্ দিন্, শুভমুহূর্ত্তে পতিতোদ্ধারিণীর তীরে বসিয়া, তাঁহারই কুল কুল গীতির সুরে সুর মিশাইয়া ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধরিয়াছিলেন, আজ সে ফুলিয়া নাই, সে ভাগীরথীও দূরে সরিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু সেই সুরময়, আবেশময় তানের এখনও যেন শেষ লয় হয় নাই। সে রাম, সে অযোধ্যা, কিছুই নাই, তবুও সেই রামের কথা, রামের স্মৃতি যেমন ভারতের নরনারীর প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, আজীবন থাকিবেও, তদ্রূপ আজ সে ফুলিয়া নাই, সে জাহ্নবী নাই, সে কৃত্তিবাস নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি বঙ্গবাসী কদাচ বিস্মৃত হইবে না। রামসীতার পাদস্পর্শে অযোধ্যা চিরকালের মত তীর্থ হইয়া রহিয়াছে, কৃত্তিবাসের পাদস্পর্শে ফুলিয়া বঙ্গের সাহিত্যসাম্রাজ্যের প্রধান তীর্থ হইয়াছে। ফুলিয়ার মুখটী, শুধু ফুলিয়ার নহে, বাঙ্গালার গৌরব স্থান, পরমস্পর্দ্ধার ভাজন হইয়াছেন। জন্ম জন্মান্তরে কৃত্তিবাস কত তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে তপস্যার ফলে তিনি ত অমর হইয়াছেনই, তাঁহার মাতৃভাষাকেও অমরী করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যের স্বর্ণমন্দিরের তিনিই ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। যে দেশে এবং যে জাতিতে কৃত্তিবাসের ন্যায় কবি আবির্ভূত হন, সে দেশ ধন্য, সে জাতি বরেণ্য। কৃত্তিবাস বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিয়া দিয়াছেন; তিনি যে সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন, আজ এই পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যিনি যতটুকু পারেন, সেই সঙ্গীতের "[illegible]" করিতেছেন। তাঁহার সাধনার ফলে, তাঁহার স্বজাতীয় জাতীয় সাহিত্য ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। বাঙ্গালার যতই চক্ষু ফুটিতেছে, ততই তাহারা তাঁহার আদর করিতে শিখিতেছে।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং বন্ধুবর সতীশচন্দ্র আপনারা মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে অদ্য এই যে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন,—পূজ্য মহাপুরুষের পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এজন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে সমুন্নতবংশের কৃত্তিবাস অলঙ্কার ছিলেন, সেই ফুলিয়ার মুখটীর একজন কবিতা-রসবঞ্চিত অভাজনকে আপনাদের অদ্যকার উৎসবে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যে কুলে আমার জন্ম, সেই কুলের একজন প্রধান পুরুষের এবং বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান মহাকবির স্মৃতিবাসরে আমি উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া নিজকেও ধন্য ও কৃত কৃতার্থ মনে করিতেছি।

এস কৃত্তিবাস, তোমার বড় সাধের ফুলিয়ায় একবার ফিরিয়া এস, এই দেখ, তোমার উদ্দেশ্যে, কত শত ভক্ত আজ সজলনেত্রে ফুলিয়ায় উপস্থিত, তুমি তাহাদিগের সারস্বতভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্ন দিয়া গিয়াছ, সেই রত্নের গৌরবে তাহারা আজ গৌরবান্বিত, কৃত্তিবাসের স্বজাতি বলিয়া আদৃত। এস কবি, আবার আসিয়া

"পবন নন্দন হনূ, লঙ্ঘি ভীম বলে
সাগর, চালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরী ;
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।"

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

---

## মালা।

## ( সমালোচনা )

সম্প্রতি 'নারায়ণ' সম্পাদক সুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বি, এ, বার এটল প্রণীত দুইখানি নূতন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্তর্যামি ও মালা। অন্তর্যামি অন্তর্যামির কথায় পূর্ণ—মালাতে নানা ভাবের সঙ্গীতেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কবি 'মালার' নিবেদনে লিখিয়াছেন 'এই সব গুলি কবিতাই সাগর সঙ্গীতের অনেক আগে লেখা। দুএকটী মালঞ্চের আগে।'

'মালার' সুরে ও 'অন্তর্যামীর' সুরে একটু পার্থক্য থাকিলেও কবি অন্তর্যামীতে যে উচ্চ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন মালাতেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়। চিত্তরঞ্জন বাবুর কবিতার প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাহার প্রত্যেকটীই উচ্চ আদর্শ লইয়া রচিত। নদী যেমন সাগরের জন্য ব্যাকুল তেমনি তাঁহার প্রত্যেকটী সুর প্রত্যেকটী ছন্দ সেই অজানা দেশের অজানা রাজ্যের অধিপতির উদ্দেশ্যে রচিত। কবির প্রাণ—চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি তাহার সেই অজ্ঞাত প্রিয়তমের আকর্ষণে আকর্ষিত। তাই দেখিতে পাই

* * কি যে বেদনা বন্ধনে
টানিতেছে সর্ব্ব হৃদি তব সন্নিধানে!
কি ব্যাকুল বাসনার আকুল ক্রন্দনে
ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি সন্ধানে!
প্রজ্বলিত হৃদিমাঝে, শূন্য সব ঠাঁই!

হে প্রেম নিষ্ঠুর! আমি যে তোমারে চাই। কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? কবিহৃদয়ের আত্ম প্রকাশে। যেখানে কবি আপনাকে রাখিয়া ঢাকিয়া চলেন,—প্রতি পদে পদে সমালোচনা—প্রতি পদে সাধারণের মনের দিকে চাহিয়া শুধু শব্দ চয়ন করিয়া যান সেখানে কবি হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিতা পড়িতে পড়িতে কবি যদি পাঠকের নয়নপথের পথিক না হন, তাহাকে যদি আপনার করিয়া মনে মনে উপলব্ধি করিতে না পারি তাহা হইলে ঠিক্ কবিতা পড়িলাম কি কবিকে বুঝিলাম বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীর সকলদেশের সকল শ্রেষ্ঠ কবির কবিতায়ই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কবি কে? কাহাকে কবি বলিতে পারি? একথাটী ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইয়াছিল যে যখন আকাশের নীলিমায় সন্ধ্যার ধূসর আধারে হীরকের ন্যায় জ্যোতিষ্মান নক্ষত্র নিচয়কে গগনমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিতে দেখি—সেই অনন্তের অনন্ত সৌন্দর্য্য চিত্র যেমন আহ্লাদের চিত্তরঞ্জো বিরাট ভাবের বিরাট সৌন্দর্য্য রসের ভাব চিত্রে অঙ্কিত করে; তেমনি তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি যিনি দর্পণের বুকে প্রতিফলিত আলেখ্যের ন্যায় সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে মানস দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া সেই মহান্ চিত্রে সেই অতিন্দ্রিয় অনুভূতিকে ইন্দ্রিয়-গোচর করিতে সক্ষম। যাঁহার মন—যাঁহার চিত্ত সহসা কবিত্বের সেই পরশমণি—সেই সোণার দর্পণ পাইয়াও [illegible]তে পারে না—

কবে জেগে ছিলে [illegible]দীপ হে রহস্যময়ি!
কবে কোথাকার, ওগো! কোন্ [illegible]জনে?
সৃষ্টির প্রথম সে কি? ওগো মর্ম্মময়ী!
সৃষ্টির প্রথম সাঁঝে কোন্ বাম কাননে?
তখনও ধ্যান মগ্ন ভাববিভোর কবি
বুঝিতে পারে না, কে সে রহস্যময়ী?

কে সে অপরিচিতা! তাহার হৃদয় জুড়িয়া বসিতে চাহে? তারপর কি অপূর্ব্ব পুলক রহস্যে নীল যবনিকাখানি উত্তোলিত হইল! সেত কবি বুঝিতে পারিলেন না! তিনি আপনার মনে বাঁশী বাজাইতেছিলেন—যবনিকাখানি যখন উত্তোলিত হইল তখন দেখিলেন—মানস-স্বপ্ন সফল হইয়াছে! মূর্ত্তিমতী কল্পনালক্ষ্মী তাঁহার নয়ন সমক্ষে প্রকাশিত কি অপূর্ব্ব সেরূপ

চরণে প্রস্ফুট পুষ্প মস্তকে গগন।

ধ্যানের পর কবি তাঁহার সাধনার ধনকে পাইয়া কখনও আনন্দ-মনে

'সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালি, ধূপধূনা দিয়া, তাঁহার আরতি করিতেছেন, কখনও আরাধ্যাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিঃস্ব ভিখারী সাজিয়া বলিতেছেন

'সকল ঐশ্বর্য্যে আমি সাজায়েছি ডালি,
পরিপূর্ণ প্রাণে মোর করিয়াছি খালি,
আরো যে চাহিছ তুমি কি দিবগো আনি,
যাও যদি লয়ে যাও শুধু প্রাণখানি।'

যিনি আপনাকে দান করিতে পারেন—মান অভিমান যাঁহার থাকে না, ঐশ্বর্য্যশালীর সেই দানের তুলনা মিলে না। কবি সাধনার নানা স্তরের মধ্য দিয়া আসিয়া যখন প্রিয়নিধির সন্ধান পাইলেন তখন শুধু মূর্ত্তিমন্তরূপে দেখা দিলেন ধরা দিলেন না,—সেখান হইতেই কবির পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তারপর কবি আপনার বলিয়া যাহা কিছু ছিল তাহা নিবেদন করিয়া চাহিলেন

হে মোর বিজয়ী রাজা! এস তবে আজ,
সমর-উল্লাস-ভরা বিজয় হুঙ্কারে!

ছিন্ন কর বক্ষ মোর কৃপাণে তোমার
চূর্ণ করে দাও মোর আশার মন্দির!
পদিসাৎ হয়ে যাক্ হৃদয়-আমার,
বিজয় স্মৃতি তব বাজুক গভীর!
আমি অশ্রুজল চ'খে পরাইব আজ
জয়মাল্য তব কণ্ঠে ওগো রাজ রাজ!

'সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া' প্রাণ-প্রিয়তম তাহার আপনার হইলেন তখন কবির নিকট আর দূরত্ব রহিল না—তখন তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন,

তুমি হে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশায় আঁধার
জাগরণে কর্ম্ম তুমি,
শয়নের স্বপ্ন তুমি,
ওগো সব প্রাণময়! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশায় আঁধার।

আর—

আমার পরাণ ভরি উঠে যত গান
তোমার পরাণ হ'তে পায় যেন প্রাণ!
হে অনন্ত! হে মহান! তুমি প্রাণ-সিন্ধু!
পরাণ তরঙ্গে তব আমি প্রাণ-বিন্দু!
আমারে ভাসায়ে রাখ পরাণ পরশে
আমারে ডুবায়ে নাও পরশ-হরষে!

আনন্দবিভোর প্রাণ এখন শান্তিতে পূর্ণ। আরাধ্য নিধি হস্তগত-সাধনার সিদ্ধ হইয়াছে। এখন আর আত্ম নিবেদন ও নীরব প্রার্থনা ব্যতীত কি থাকিতে পারে? এখন শুধু পরিপূর্ণ আনন্দময় অন্তরের করুণ মিনতি,—

পূর্ণ করে দাও আজি শান্ত এ হৃদয়
হে অনন্ত! হে সম্পূর্ণ! নীরবে নিভৃতে
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর নিলয়,
ওই তব শব্দ হীন মহান সঙ্গীতে।

মালার কবিতা গুলিকে কয়েকটী স্তরে বিভক্ত করা যায় (১) প্রিয়তমের সন্ধান ব্যাকুলতা (২) প্রতীক্ষা (৩) অভাব (৪) আরতি—(৫) বেদনা (৬) আত্ম-নিবেদন ও মিলন। আমাদের মনে হয় ঠিক্ এই কয়টী ভাব মনে লইয়া কবিতা গুলি পড়িয়া গেলে সাধারণে পাঠকের কবিতা গুলি বুঝিতে কোন কষ্ট হইবেনা। নচেৎ একটু এলোমেলো মনে হইবে। বারান্তরে অন্তর্যামি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।